শংকর

ভ্রমণ সমগ্র

১

শংকর
ভ্রমণ সমগ্র

প্রথম খণ্ড

সাহিত্যম্ ॥ কলকাতা
www.nirmalsahityam.com

লেখকের নিবেদন

নতুন লেখার সংযোজনে আকার বেশ বৃদ্ধি পাওয়ায় অখণ্ড ভ্রমণ সংগ্রহকে দ্বিখণ্ডিত করাই যুক্তিযুক্ত মনে হলো।

যৌবনকালে যে আমাকে প্রথম বিদেশে পাঠাবার উদ্যোগ নিয়েছিল সেই সুপ্রিয় বনার্জি বেশ কয়েকবছর আগে কারও অনুমতি না নিয়ে সেই-ভ্রমণে বেরিয়েছে যেখান থেকে ফেরার কোনো তাগিদ থাকে না। নবকলেবরে নতুন এই সংগ্রহটি সুপ্রিয়র হাতে তুলে দিতে পারলে মন্দ হতো না, কিন্তু তা যখন সম্ভব নয় তখন চুপি-চুপি বলি, সুপ্রিয়, তুমি যেখানেই থাকো এই সংগ্রহের প্রথম কপিটি তোমারই জন্যে।

শংকর

সূচি

প্রথম খণ্ড

এপার বাংলা ওপার বাংলা	১১
যেখানে যেমন	২৫৫
এখানে ওখানে	৪১৫
অন্যান্য	৫৯৩

প্রারম্ভিক মন্তব্য

পায়ের তলায় সর্ষে নিয়েই কেউ কেউ এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। কারণে এবং অকারণে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়াতেই তাঁদের আনন্দ। এই দলে যেমন ভোগী গৃহী আছেন, তেমন ত্যাগী সন্ন্যাসীও রয়েছেন ; কামিনীকাঞ্চনের মায়া-মোহ থেকে মুক্তি পেলেও যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানোর আনন্দ থেকে বৈরাগী সাধকরা আজও কিছুতেই বঞ্চিত হতে রাজী নন।

আমার স্বভাব একটু উল্টো ধরনের—ভ্রমণকুণ্ঠ আমি তাঁদের দলে যাঁরা শুতে পেলে বসতে চান না, বসতে পেলে যাঁরা দাঁড়াতে চান না এবং দাঁড়াতে পেলে যাঁরা হাঁটায় বিশ্বাস করেন না। অন্য অর্থে এঁরাও কিন্তু বিশ্বাসী লোক, এঁরা জানেন পর্বতের কাছে মহম্মদ উপস্থিত না হলে কিছু এসে যায় না, প্রয়োজনে স্বয়ং পর্বতই মহম্মদের কাছে উপস্থিত হবেন।

পায়ের তলায় সর্ষে না থাকলেও, আমার নাকের ডগায় মোটা কাচের চশমা রয়েছে দীর্ঘদিন। পরিব্রাজক হবার সমস্ত সাধ-আহ্লাদ আমি বাড়িতে বসেই মিটিয়ে নিয়েছি রাশি-রাশি পাঠ্য এবং অপাঠ্য ভ্রমণকাহিনী পড়ে, বিভিন্ন রেলপথের টাইমটেবিল বারবার বিশ্লেষণ করে এবং সময়ে-অসময়ে নানা দেশের বহুবর্ণ মানচিত্র ধৈর্যের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করে। বিনা কষ্টে এবং বিনা পয়সায় এইভাবে কত দেশ যে আমি ভ্রমণ করেছি তার হিসেব নেই।

স্থবির জীবনটা এইভাবেই পরম শান্তিতে হয়তো চলে যেতো যদি না সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার আলাপ হতো। সুপ্রিয় কাজ করতো মার্কিন সরকারের ইউ-এস-আই-এস বিভাগে—সে একবার আমার হস্তরেখা পাঠ করে দুম করে বলে দিলো সামনেই দেশত্যাগ যোগ! আমি ভাবলাম নির্বাসন যোগ, তাই বেশ ভয় পেয়ে গেলাম। সুপ্রিয় বললো, কচিখোকাটি নও তুমি, বয়স তেত্রিশ হয়েছে—দুনিয়া দেখার এইটাই তো শ্রেষ্ঠ সময়। কয়েক সপ্তাহ পরেই মার্কিন সরকারের বিদেশ দফতর থেকে নিখরচায় আমেরিকা ভ্রমণের নিমন্ত্রণ এলো।

১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পকেটে পাশপোর্ট নিয়ে সেই যে বেরিয়ে

পড়লাম, তারপর আর পিছন ফিরে তাকানোর অবকাশ পাওয়া যায়নি। রক্তের আস্বাদ পেয়ে আমি বুঝলাম, কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না, ভ্রমণ করতে যতই হাঙ্গামা হোক, ঘরে ফিরে এসে রসিয়ে রসিয়ে ভ্রমণকাহিনী লেখার সুখ অশেষ। সাধে কি আর রবীন্দ্রনাথ থেকে বিবেকানন্দ, অন্নদাশঙ্কর রায় থেকে মুজতবা আলী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত সবাই সুখের গৃহকোণ ছেড়ে কারণে এবং অকারণে টোটো কোম্পানির ম্যানেজার হয়েছিলেন।

সৈয়দ মুজতবা আলী একবার আমাকে বলেছিলেন, "সন্ন্যাসীরা হলেন প্রফেশনাল ট্র্যাভেলার, আর আমরা সংসারীরা হলাম শখের পরিব্রাজক। শঙ্করাচার্য থেকে শ্রীচৈতন্য, স্বামী অখণ্ডানন্দ থেকে আনন্দময়ী মা, এঁরা ঘুরতে পারলে আর কিছুই চাইতেন না।"

সন্ন্যাসীদের ভ্রমণ নিষ্কাম, স্রেফ ভ্রমণের তাগিদেই তাঁদের ভ্রমণ ; আর আমার মতন শব্দব্যবসায়ীর ভ্রমণ স্রেফ ভ্রমণকাহিনী লেখার লোভে! এই ভাবেই কয়েকবার দেশদেশান্তরে ঘুরতে ঘুরতে বেশ কয়েকটা বই লেখা হয়ে গেলো। কালস্রোতে এখন মন শান্ত হয়েছে, দেহও বেশ দুর্বল হয়েছে—নতুন করে ভ্রমণের তেমন আর ব্যাকুলতা নেই।

সেই জন্যেই তো গুটোবার পালা। যেসব লেখা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়, নানা বইতে এবং পড়ার টেবিলে এতদিন ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তা সযত্নে গুছিয়ে অবিলম্বে প্রকাশ করার পরামর্শ দিলেন বন্ধুবান্ধবরা এবং সেই প্রলোভনের ফাঁদে পা দেবার ফলশ্রুতি এই সংগ্রহ, যার নাম দেওয়া গেলো শংকর ভ্রমণ সমগ্র।

সারাজীবনে কত সাগর ও মহাসাগর পেরিয়েছি তার সঠিক হিসেব হাতের গোড়ায় নেই, কিন্তু রূপকথার দৌলতে ছোটছেলেরা পর্যন্ত জানে মানুষের ভ্রমণকল্পনায় সপ্তসাগরের বেশি সাগর নেই। এবং এই পৃথিবীতে রূপকথার সত্যই শেষপর্যন্ত সত্য হয়ে দাঁড়ায়। জীবনের সত্যগুলিও সময়ের স্রোতে ভাসতে ভাসতে রূপকথায় পরিগণিত হয়। 'ভ্রমণ সমগ্র' নামটি যাঁদের পছন্দ নয় তাঁদের জন্য যে-নামটি রেকমেন্ড করা গেল তা হলো 'সপ্তসাগর পারে'।

শংকর

এপার বাংলা ওপার বাংলা

যেদিন সরিয়া যাবো তোমাদের কাছ থেকে—দূর কুয়াশায়
চ'লে যাব, সেদিন মরণ এসে অন্ধকারে আমার শরীর ভিক্ষা
ক'রে লয়ে যাবে ;—সেদিন দু'দণ্ড এই বাংলার তীর—
এই নীল বাংলার তীরে শুয়ে একা একা কি ভাবিব, হায় ;—
সেদিন র'বে না কোনো ক্ষোভ মনে—এই সোঁদা ঘাসের
ধূলায় জীবন যে কাটিয়াছে বাংলায়—

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে ;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়।

আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে
জলান্দীর ঢেউয়ে ভেজা এ সবুজ করুণ ডাঙায়।

জীবনানন্দ দাশ
—রূপসী বাংলা

রচনাকাল
ডিসেম্বর ১৯৬৭-ডিসেম্বর ১৯৬৯।
প্রথম পর্বটি ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮ সালে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

প্রথম বাক্ সাহিত্য সংস্করণ
এপ্রিল ১৯৭০

উৎসর্গ
ওপার বাংলার বুড়ীগঙ্গা নদীতীরের
সেই অকুতোভয় যুবকবৃন্দকে—
যাঁদের প্রেম, নিষ্ঠা ও ত্যাগে
বঙ্গভাষা একটি স্বাধীন দেশে রাষ্ট্রভাষার
মর্যাদা লাভ করেছে।

লেখকের নিবেদন
পৃথিবী দেখবার লোভে একদিন আচমকা দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু ভূ-প্রদক্ষিণ শেষ করে বুঝেছি দূর থেকে স্বদেশ ছাড়া আর কিছুই দেখা হলো না।

আমাদের পারিবারিক ও ব্যক্তি জীবনে সম্প্রতি যেসব জটিলতা সৃষ্টি হতে চলেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে 'এপার বাংলা ওপার বাংলা'র কোনো অভিজ্ঞতা পাঠক-পাঠিকাদের কাজে লাগলে আনন্দিত হবো।

আরও একটি কথা। এপার বাংলা ওপার বাংলা বলতে আমার চোখের সামনে দুটি বাংলা ছাড়াও মহাসাগরের অপর পারে তৃতীয় এক বাংলার ছবি ভেসে ওঠে। ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং এশিয়ার নানা প্রান্তে যেখানেই বাঙালীরা আছেন সেখানেই ছোট্ট এক একটি বাংলা সৃষ্টি হয়েছে। তৃতীয় এই বাংলার স্নেহ-প্রশ্রয় ছাড়া আমার পক্ষে 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' লেখা সম্ভব হতো না।

শংকর

১লা বৈশাখ, ১৩৭৭

এপার বাংলা ওপার বাংলা

কথাটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। লন্ডনে বি-বি-সির বাংলা বিভাগের সুরসিক বন্ধু মনে করিয়ে দিলেন—"বিদেশে বাঙালি মাত্রই সজ্জন, তাই না?"

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে বনগ্রামের বন থেকে একদা রেলে চড়ে শিয়ালদহ স্টেশনে এসেছিলাম এবং সেখান থেকে সেকেন্ড ক্লাশ ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে সেই যে হাওড়ার নতুন বাসায় হাজির হয়েছিলাম তারপর আর নড়াচড়া করিনি। কাসুন্দিয়ার আধা-মফঃস্বল পরিবেশে জীবনের দশ আনা ব্যয় করে হঠাৎ বিদেশে পাড়ি দিয়েছি। স্বদেশের বাইরে প্রথম একশ ঘণ্টার ভ্যাবাচাকা খাওয়া অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছিলাম বি-বি-সির কমলবাবুকে।

কমলবাবু প্রশ্ন করলেন, "এই ক'দিনের সবচেয়ে স্মরণীয় অভিজ্ঞতা কী হলো বলুন?"

বললুম, "বিলেতের ইতিহাস-ভূগোল-অর্থনীতির বড়ো বড়ো ব্যাপারগুলো এখনও মনে ধরছে না। আমার অপরাধ মার্জনা করবেন, আমি 'প্রভিন্সিয়াল' বঙ্গ সন্তান—বার্মিংহামের ঘটনাটাই বুকের মধ্যে গেঁথে রয়েছে।"

যে-শহরে ছোটোবেলা থেকে মানুষ হয়েছি যেখানকার লবণে শ্রীঅঙ্গ তেত্রিশ বছর ধরে পুষ্ট হয়েছে, সেই হাওড়াকে বাংলার বার্মিংহাম বলা হয়। আসল বিলিতি বার্মিংহাম দেখার লোভটা ছোটোবেলা থেকেই প্রবল ছিল। তাই প্যান আমেরিকান বোয়িং ৭০৭ থেকে লন্ডনের মাটিতে পা দিয়েই বার্মিংহামের কথা ভাবতে শুরু করেছিলাম। সুযোগ এসে গেলো এবং দু-একদিনের মধ্যে 'ভারতীয় বার্মিংহামের' রেজিস্টার্ড নাগরিক আমি বিলিতি বার্মিংহামের উদ্দেশে রেল গাড়িতে চড়ে বসলাম। বার্মিংহাম স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে মালপত্তর একটা হোটেলের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম।

বাইরে তখন সন্ধ্যার ধোঁয়াশা নেমেছে—সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ধার-করা ভারি ওভারকোট ফুঁড়ে শিল্পনগরীর শীত সমগ্র দেহে ছুঁচ ফোটাচ্ছে। সে-যন্ত্রণা যদিও বা সহ্য হয়, অসহ্য লাগছিল নিঃসঙ্গতা। এই তো দুদিন আগেও কেমন কলকাতায় পরিচিত প্রিয়জন পরিবেষ্টিত হয়ে মনের সুখে নরকগুলজার করছিলাম। নিজেকে বার্মিংগাঁওয়ের এই স্বেচ্ছানির্বাসনে পাঠাবার দুর্মতি কেন যে আমার মাথায় এলো ভেবে নিজেকে তিরস্কার করতে লাগলাম।

রাস্তায় পথচারীর অভাব নেই। রেস্তোরাঁয়, পাব-এ, নৃত্যকেন্দ্র রসিক নাগরিকরা সামনে পানপাত্র রেখে আসর জমিয়ে বসেছেন। রানী এলিজাবেথের তরুণ প্রজাবৃন্দ রুলেটশপে জুয়ার ভিড় জমিয়েছেন। বার্মিংহাম পৌরসভায় হিসেব অনুযায়ী সামান্য কয়েক বর্গমাইলের মধ্যে বেশ কয়েক লক্ষ লোক গিজ গিজ করছেন—তবু আমি একা বোধ করছি। বাংলার বার্মিংহামের এক বাদামী রঙের সন্তান সম্পর্কে বিলেতের বার্মিংহামে কারও কোনো আগ্রহ নেই। ভাবটা এই রকম : টিকিট কেটে এসেছো, ভাল কথা। ওয়েলকাম টু আওয়ার সিটি। পয়সা ফেলে হোটেলে থাকো, কলকারখানায় নিজের কাজকর্ম থাকলে সেরে ফেলো, ফিরে এসে হোটেলের লাউঞ্জে কিংবা নিজের ঘরে বসে টিভি দেখো, তাতে মন না ভরলে অদূরে মক্কা লিমিটেডের নাইট ক্লাব রয়েছে। এরাই তো ক'দিন আগে তোমাদের ইন্ডিয়ার একটা অর্ডিনারি মেয়েকে বিশ্বসুন্দরী বানিয়ে দিয়েছে। কয়েক শিলিং প্রবেশমূল্য দিয়ে নাইট ক্লাবে ঢুকে নাচ দেখো, গান শোনো, কপাল ঠুকে কোনো বার্মিংললনাকে নৃত্যে নিমন্ত্রণ জানাও, দেবী সম্মতি দিলে 'বার্নিং' হৃদয়ে অবশ্যই শান্তিবারি সিঞ্চিত হবে।

কোথায় যেন একটা দূরত্ব থেকে যাচ্ছে, আন্তরিকতার স্পর্শ যে অনুপস্থিত তা বুঝতে দু'দিন দেশ-ছাড়া মনটার একটুও অসুবিধে হচ্ছে না। ভ্রমণ-বিজ্ঞানীরা হয়তো একেই হোম-সিকনেস বা 'গৃহ-ব্যাধি' বলে থাকেন, মৃদু ভর্ৎসনা জানিয়ে উপদেশ দেন—'সময়ই এই ব্যাধির একমাত্র চিকিৎসা। দু'দিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে, তখন যাতে দেশে না ফিরতে হয় তার জন্যে নিজেই কত চেষ্টা করবে এবং সেইসব চেষ্টা আশানুরূপ ফলবতী না হলে শরীর খারাপ করবে।"

অতশত বুঝেও মন ছটফট করছে, একটা অব্যক্ত মানসিক যন্ত্রণা নিজেকে মোচড় দিচ্ছে, আর ভর্ৎসনা করছে : 'তাঁতি, বেশ তো হাওড়ায় তাঁত বুনে খাচ্ছিলে, এঁড়ে গোরু কিনে নিজের এই হাল করবার কী দরকার ছিল? না হয়, মার্কিন সরকারের রাষ্ট্রদূত তোমাকে তাঁর দেশ দেখবার সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তুমি যে সেই শিবুদা'র মতো হলে, যাঁর সম্পর্কে রেল আপিসের সহকর্মীরা বলতো 'বিনা পয়সায় বিষ পেলেও শিবু ছাড়বে না।'

ফুটপাথের একধারে দাঁড়িয়ে যখন এই সব কথা ভাবছিলাম. ঠিক সেই সময় নির্ভেজাল পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে বাংলা কথা কানে এলো। কয়েক গজ দূরে ফুটপাথের উপরেই বিলিতি টুইডের কম্বিনেশন স্যুটপরা বাদামী রঙের দুই আলোচনারত পুরুষ : "যা কইতেসি শুন্যান! আরও বিশ পাউন্ড স্টক কর্যান, আবার কবে আইব জানি না।"

ইদানীং কালে সরকারি উদ্যোগে কথাটার মানে খারাপ হয়ে গিয়েছে, না হলে বলতাম—আমার মনে হলো আকাশবাণী শুনছি। ভক্তের বিপদে স্থির থাকতে

না পেরে ভগবান স্বয়ং এই ম্লেচ্ছদেশে আমার জন্যে বঙ্গভাষী পাঠিয়ে দিয়েছেন। গল্প, উপন্যাস, কবিতা অনেক পড়েছি, গানও শুনেছি বহু, কিছু কিছু সাহিত্যচর্চা নিজেও করেছি, কিন্তু মোদের গরব মোদের আশা এই বাংলা ভাষায় যে কি যাদু আছে তা জীবনে এই প্রথম হৃদয়ঙ্গম করলাম।

সৌজন্যের ব্যাকরণে অমার্জনীয় ত্রুটি হলেও এই দুই অপরিচিত পথচারীর প্রায় নাকের ডগায় এসে দাঁড়ালাম। বিনা অনুমতিতে তাঁদের প্রাইভেসি ভঙ্গ করে বললাম, "আমার অপরাধ মার্জনা করবেন, আপনারা বাংলায় কথা বলছেন শুনে আর স্থির থাকতে পারলাম না। আমি কলকাতা থেকে সবে বিদেশে এসেছি, বাংলায় কথা বলতে না পেরে হাঁপিয়ে উঠেছি, আর পারছি না।"

ভদ্রলোক দুজন পরম আদরে আমাক আশ্রয় দিলেন। বললেন, "আপনিও বাঙালি, আমরাও বাঙালি। এতো কিন্তু-কিন্তু করছেন কেন? এটা তো আমাদের প্রত্যেক বাঙালির হক।"

অন্য ভদ্রলোকটি বললেন, "খুব খুশী হলাম পরিচয় করে। যদি আপত্তি না থাকে, গরীবের সঙ্গে এক কাপ চা খাবেন?" তারপর একটু কিন্তু-কিন্তু করে বললেন, "একটা কথা অবশ্য আপনাকে বলে রাখা ভাল ; হয়তো আপনি ভেবেছেন আমরা ইন্ডিয়ান—কিন্তু আমরা পাকিস্তানী।"

তাতে যে আমার কিছুই এসে যায় না একথা জানিয়ে দিতে আমার এক মুহূর্তও লাগলো না। ভদ্রলোক দুজন পরম আদরে আমাকে কয়েক গজ দূরের এক রেস্তোরাঁয় এনে ঢোকালেন। এঁদের একজনই যে রেস্তোরাঁর মালিক তা এবার প্রকাশ হলো। চট্টগ্রামের বাসিন্দা, সংসারস্রোতে ভাসতে ভাসতে এই বার্মিংহামে নোঙর ফেলেছেন।

আর একজনের নাম আজিজ। আজিজ সাহেব বললেন, 'আমি মশাই মাছের ব্যবসা করি। ইংলন্ডে যত ইন্ডিয়ান আর পাকিস্তানী রেস্তোরাঁ আছে সেখানে চিংড়িমাছ সাপ্লাই কার।"

"এইটুকু দেশে আর ক'টা দেশি রেস্তোরাঁ আছে।" আমি উত্তর দিই।

আজিজ আমার ভুল ভাঙলেন। "বলেন কী! লন্ডনেই তো আমরা প্রায় দেড়শো রেস্তোরাঁয় মাল সাপ্লাই করি। এই বার্মিংহাম শহরেই তিরিশ-চল্লিশটা ইন্দো পাকিস্তানী দোকান আছে। লন্ডনে ভ্যানের মধ্যে মাছ বোঝাই করে আমি সমস্ত বিলেত দেশটা চষে বেড়াই। আমাদেরই হয়েছে মুশকিল—কোন্‌টা যে ইন্ডিয়ান দোকান আর কোন্‌টা যে পাকিস্তানী তা বোঝা যায় না। তাই আমার পার্টনার নিয়েছি কলকাতার এক ভদ্রলোককে—জেনুইন ইন্ডিয়ান-পাকিস্তানী প্রতিষ্ঠান, কেউ কোন খুঁত বার করতে পারবে না।"

আজিজ সায়েব এবার আমার পরিচয় চাইলেন—কী করি, কিসের ধান্দায়

কালাপানি পার হয়েছি, তিনি কোনো উপকার করতে পারেন কিনা, ইত্যাদি প্রশ্ন।

অগত্যা নিজের পরিচয় দিতে হলো এবং শোনামাত্রই ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠলেন। "এতক্ষণ বলবেন তো স্যার, আপনি বাঙালি রাইটার! আপনার বই তো আমি ঢাকা থেকে কিনে এনেছি, আমার বাড়িতে রয়েছে। আহা, আগে জানলে বইখানা সঙ্গে রেখে দিতাম, আপনাকে দিয়ে সই করিয়ে নেওয়া যেতো।"

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ওপর আজিজ-এর অসীম-শ্রদ্ধা। "আমাদের বাংলা সাহিত্য যে কী দ্রব্য, সে তো এ দেশের লোকগুলো বুঝলো না," আজিজ দুঃখ করতে লাগলেন। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে তিনি বললেন, "আপনাদের বলতে বাধা নেই, ব্যবসা থেকে টু-পাইস কামাচ্ছি। পূর্ব পাকিস্তান থেকে মাছ আনাচ্ছি। আপনাকে একটা উপকার করতে হবে। কোম্পানিটা আমার নিজের মেয়ের মতো। একটা ভাল নাম করে দিতে হবে। সায়েবী নাম-টাম না মশাই—এমন নাম যাতে বোঝা যায়, এতে ইন্ডিয়ান আছে এবং পাকিস্তানীও আছে।"

"নাম দিন গঙ্গা পদ্মা লিমিটেড!" এই বলে হাসতে লাগলাম।

"আপনি হাসছেন বটে, কিন্তু নামটা চমৎকার।" আজিজ অকপটে তাঁর আনন্দ প্রকাশ করলেন। রেস্তোরাঁর মালিক ইতিমধ্যে কিছু খাবার নিয়ে এসেছেন। কাজকর্মের তোয়াক্কা না-করে আমাদের টেবিলে বসে তিনি প্রাণভরে গল্প করতে লাগলেন।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আজিজ প্রশ্ন করলেন, "আপনার তো এখন কোনোও কাজ নেই। চলুন আমাদের গাড়িতে, আরও দু'-একটা রেস্তোরাঁয় পায়ের ধুলো দিন।"

গাড়ি চালিয়ে মাইল খানেক দূরে আর এক দোকানে আমাকে হাজির করলেন আজিজ। ওঁর কথাবার্তা শুনে কে বলবে আমাদের আলাপ মাত্র আধ ঘণ্টার! দোকানে ঢুকেই আজিজ চিৎকার করে উঠলেন, 'ও মিঞা, আজকে শুধু মাছ বিক্রি করতে আসিনি; বড়ো এক বাংলা রাইটার ধরে এনেছি। বই পড়ে মানে বোঝবার কপাল করে তো আসনি, খোদ রাইটারদের দেখে চোখ সার্থক করো।"

আমি আপত্তি করতে গেলাম, কিন্তু কোনো ফলই হলো না—দোকানের সাহেব খদ্দেরদের ফেলে রেখে পূর্ব পাকিস্তানী মালিক আমাদের আদর-যত্ন শুরু করলেন। নিজের হাতে চা নিয়ে এলেন এবং "গরীবের এখানে রাত্রের ডিনার করলে" যে কৃতার্থ হবেন, তা জানালেন।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক লাগিয়ে আজিজ সাহেব আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, "কেবল পাকিস্তানী দেখে-দেখে আপনার মন খারাপ হচ্ছে। চলুন, আপনাকে এক কলকাতার পোলার কাছে নিয়ে যাই।"

প্রায় জোর করেই আজিজ আমাকে আবার গাড়িতে তুললেন। মাইল কয়েক ড্রাইভ করে এবার যে রেস্তোরাঁর সামনে গাড়ি থামালেন সেটি আকারে বৃহৎ। দোকানে তখনই নৈশভোজীদের ভিড় শুরু হয়েছে। সাহেব-মেমসাহেব জোড়ে জোড়ে টেবিল দখল করছেন। আজিজ ফিস ফিস করে বললেন, "এ আর কি দেখছেন। এখন যারা খেতে এসেছে তাদের ডিনারের পরে অন্য কোথাও অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আসল খদ্দেররা আসবে এক ঘণ্টা পরে, তখন এখানে লোক ধরবে না। অর্ধেক টেবিল আগে থেকে রিজার্ভ করা আছে। আমাদের চৌধুরীদা বছর কয়েক আগে নিঃসম্বল অবস্থায় বিলেতে এসেছিলেন। অতি সামান্য অবস্থা থেকে শুরু করেছিলেন—এখন খোদা মুখ তুলে চেয়েছেন। কোন্ দোকান কেমন চলছে তা আমি মাছের অর্ডার থেকে বুঝতে পারি। চৌধুরীদা আমার কাছ থেকে সপ্তাহে আড়াই শ' পাউন্ড চিংড়িমাছ নিচ্ছেন, আমি ছাড়া আরও সাপ্লায়ার আছে।"

আমাকে একটা টেবিলে বসিয়ে আজিজ সাহেব এবারে চৌধুরীর সন্ধানে কিচেনে ঢুকে গেলেন। দেখলাম কাচের তলায় লেখা—'ইলোরা রেস্তোরাঁ—বেস্ট অফ ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানী অ্যান্ড চাইনিজ হসপিটালিটি'। এযুগের ইংরেজ যুবক-যুবতীরা এশীয় খাদ্যে আগ্রহী—কিন্তু রন্ধনকলায় ভারতবর্ষ পাকিস্তান চীন ইত্যাদির পার্থক্য অত দূর থেকে তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না। আমরা এতে বিরক্ত বোধ করতে পারি, কিন্তু ম্লেচ্ছদেশে যাঁরা একটা ছোট্ট দোকান খুলে বসেছেন তাঁদের সমস্যা সমাধান করতেই হবে। তাই লিখতে হয়েছে—ভারতীয়, পাকিস্তানী ও চীনা আতিথেয়তার পরাকাষ্ঠা যদি একত্রে একই খরচে একই সন্ধ্যায় উপভোগ করতে চান তা হলে ইলোরা রেস্তোরাঁয় পদধূলি দিন এবং বন্ধুদের বলুন। বান্ধবীকে যদি হতাশ না করতে চান, তা হলে আগে থেকে টেবিল রিজার্ভ করুন। আমাদের একটি জুয়ার দোকানও আছে—সেখানে ভাগ্যপরীক্ষার আধুনিক সর্বপ্রকার যন্ত্র রয়েছে। আপনার অর্থ দ্বিগুণিত, ত্রিগুণিত, চতুর্গুণিত করুন। ইলোরা-কফি-বারে কফি এবং সান্নিধ্য (কফি অ্যান্ড কম্পানি) দুই-ই মধুর।"

চৌধুরী দ্রুত বেরিয়ে এসে আমার হাতটা জড়িয়ে ধরলেন, যেন কোনো নিকট আত্মীয় বহুদিন পরে বিদেশে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। বললেন, "আসুন আসুন, কি সৌভাগ্য, একজন দেশের লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো!"

আজিজ বললেন, "কত পাউন্ড চিংড়ি দেবো? তিন-শ পাউন্ডের অর্ডার লিখি?"

চৌধুরী বললেন, "ইউনিভারসিটি বন্ধ, ছেলেমেয়েদের ভিড় কম, দু'শ পাউন্ড করুন।"

আমার দিকে তাকিয়ে চৌধুরী বললেন, "আপনাদের আশীর্বাদে সায়েবরা ইন্দো-পাকিস্তান কারির মূল্য বুঝতে আরম্ভ করেছে। আমি যখন প্রথম লন্ডনে এলাম, তখন ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁর প্রধান ভরসা ছিলেন ইন্ডিয়া-ফেরত বুড়ো সাহেবগুলো। তাঁদের ওপর নির্ভর করে থাকলে আমাদের ব্যবসাকেও ওঁদের সঙ্গে গোরস্থানে পাঠতে হতো। কিন্তু ভগবানের দয়ায় ছেলে-ছোকরারা এখন ঝালের মর্ম বুঝেছে। 'ডেটদের সঙ্গে করে ইন্ডিয়ান হোটেলে আসাটা এখন ফ্যাশন। এমনভাবে চললে, আর কিছুদিনের মধ্যে চীনাদের হারিয়ে দেবো আমরা। ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁ বহু রাত পর্যন্ত খোলা থাকে। এখানে খাবার ভাল, দাম ন্যায্য মহারাজা-মহারানীর খাতির।"

আজিজের কাছে শুনলাম, ইলোরা রেস্তোরাঁর এই টেবিল-চেয়ারে বসে বছরে অন্তত শতখানেক যুবক তাদের বালিকা-বান্ধবীর কাছে 'প্রস্তাব' করেন! এখানকার এমনই স্থানমাহাত্ম্য যে বধূ হবার 'প্রপোজাল' সুন্দরীরা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না।

চৌধুরী বললেন, "আজকে দুটি খেয়ে যেতেই হবে।" কোনো ওজর আপত্তি না শুনে চৌধুরী রান্নাঘরে খাবার সম্বন্ধে বিশেষ নির্দেশ দিতে গেলেন। মালিকের সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সাদা শার্কস্কিনের স্যুট ও কালো বো-টাই-পরা দুই ওয়েটার যুবক একসঙ্গে এগিয়ে এলো আমার দিকে এবং অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কলকাতা থেকে আসছেন!"

বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আমার নাম বরুণ সাহা। আমরাও যাদবপুরে বাসা নিসি!"

সঙ্গের সহকর্মীকে দেখিয়ে সাহা বললে, "এর নাম জিয়ায়ুল হক। এদের জন্যেই তো আমাদের যত দুর্গতি। ছিলাম বরিশাল ; চাল-চুলা ছাইড়্যা অ্যাজ এ রিফুজি কলকাতা আইলাম। তারপর ভাই বোন বাবা মা সমেত ন'জন ফেমিলি মেম্বারকে 'সেভ' করার জন্য কালাপানি পার হইলাম।"

হক এতক্ষণ ফিক ফিক করে হাসছিল। শুদ্ধ পশ্চিমবঙ্গীয় উচ্চারণে সে বললে, "আমাদের বাড়ি ছিল হাওড়ার বাঁকুড়া গ্রামে। রিফ্যুজি হয়ে বাবা পাকিস্তানে এলেন। তারপর পেটের দায়ে দেশ থেকে পালিয়ে বার্মিংগাঁওয়ে এসে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ সাহাদার সঙ্গে একদিন রাস্তায় আলাপ হয়ে গেলো। দাদা আমার চাকরি করে দিলেন ; এখন দু'জনে একখানা ঘর ভাড়া করে একসঙ্গে আছি।"

বরুণ সাহা বললো, "ল্যাখাপড়া শিখি নাই, তাই আমাদের ওয়েটার হওয়া ছাড়া গতি কী? কিন্তু আমার কাকা ডবল গ্রাজুয়েট, দিল্লীতে হাই-অফিসার। কাকা লিখেছেন মাসে দশ টাকা সঞ্চয় করতে পারেন না। আপনাদের আশীর্বাদে আমি

মান্থলি বারশ' টাকা 'সেভ' করত্যাসি।"

সুদুর বিদেশে ওয়েটারের কাজে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ঘরের সন্তান বরুণ সাহা তেমন মনোবল পাচ্ছিল না। তাই আমার কাছে ভরসা চাইলো, "বিদেশে আইস্যা ভুল করিনি, কী বলেন।"

"মোটেই না।" আমি উত্তর দিই।

"তবে চিরকাল থাকছি না। কয়েক হাজার টাকা কামাই করে কলকাতায় ফিরে একটা চপ-কাটলেটের দোকান দেবো।"

বরুণ সাহার আরও কিছু বলার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু মালিক ফিরে আসায় আর কথা হলো না।

পাছে আমি বিব্রত হই, তাই চৌধুরী নিজেই আমার সঙ্গে খেতে বসলেন। পরম আদরে নানারকম মধুর অত্যাচারে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে অতিথিসেবাপর্ব শেষ করলেন। দেশ ছাড়বার আগে অনেকের কাছে শুনেছি, বিদেশে 'কারি' পাওয়া যায় না, 'কারি'র নামে সাহেবদের কাছে যা বিক্রি করা হয়, তা কারির 'অ্যাপলজি'! কারির বিরুদ্ধে যাঁরা এই সব গুজব ছড়িয়ে বেড়ান, তাঁদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, একবার বার্মিংহামে চৌধুরীর রেস্তোরাঁয় পদধূলি দেবেন। ভারতবর্ষের উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিম বহু পরিবারে এবং বহু দোকানে কারি খেয়েছি, কিন্তু আমার কারি-অভিজ্ঞতায় প্রথম স্থান দিতে হবে চৌধুরীর দোকানকে।

চৌধুরী সেদিন শুধু আপ্যায়নই করেননি, নিজের জীবনসংগ্রামের কথা, বিধবা মায়ের এবং তাঁর বিদেশিনী স্ত্রীর বিবরণও দিতে দ্বিধা বোধ করেননি। রেস্তোরাঁর কাজকর্মে সাময়িক বিরতি দিয়ে, নিজের গাড়ি বার করে আমাকে বার্মিংহাম স্টেশনের ধারে অ্যালবানি হোটেলে পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং বিদায় নেবার আগে বলেছিলেন, "বার্মিংহামে এই আপনার শেষ হোটেলে থাকা—ফের যখন এখানে আসবেন তখন গরীবের বাড়িতে উঠতেই হবে।"

সেদিন হোটেলে ফিরে টেলিভিশনে ছবি দেখতে দেখতে মনে মনে পূর্বপাকিস্তানী আজিজকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। সাতচল্লিশ সালে দেশ যখন দু'ভাগ হলো তখন আমি ইস্কুলের ছাত্র, নিজের চোখে পূর্ব বাংলা দেখার সৌভাগ্য হয়নি। পাকিস্তানীদের সম্বন্ধে কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও আমার ছিল না। সংবাদ ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে যে-ছবিটা মনের মধ্যে তৈরি হয়েছে সেটা তেমন উৎসাহজনক নয়। এই প্রথম বিদেশের মাটিতে একদা-স্বদেশের এক ভাই-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো এবং প্রথম সাক্ষাতেই যে তাঁকে হৃদয় দিয়ে ফেলেছি তা বুঝতে পারলাম।

লন্ডনে বি-বি-সি বিচিত্রার কর্মকর্তা কমলবাবু এই কাহিনী শুনেই মনে করিয়ে

দিলেন—বিদেশে বাঙালিমাত্রই সজ্জন।

লন্ডনে ফিরে এসে আর এক ভদ্রলোকের মনের কথা বলছিলাম। বিদেশি বাঙালিমাত্রই যে সজ্জন তার আর একটি পরিচয় আমাদের এই এস আর চৌধুরী। অক্সফোর্ড স্ট্রীটের ওপর অফিস নিয়ে তিনি বাংলা চলচ্চিত্রের ব্যবসা করেন, আর দেশের লোক পেলেই পাকড়াও করে বাড়িতে নিয়ে যান মাছের ঝোলভাত খাওয়াতে। লন্ডনে ওয়াকিবহাল মহলে এঁর স্ত্রীর রন্ধন-খ্যাতি আলোচনার বিষয়। শুধু রন্ধন-প্রতিভা থাকলেই বড় রাঁধুনি হওয়া যায় না—স্বগৃহে চৌধুরীমশায়ের মতো একজন সমঝদার স্বামী প্রয়োজন! চৌধুরীমশাই বললেন, "বিলেতে বাংলা সংস্কৃতির প্রধান সাপোর্টার পূর্ব পাকিস্তানের তরুণ-তরুণীরা। বাংলা সিনেমার খবর পেলেই তাঁরা দল বেঁধে আসবেন।" এঁদের বক্তব্য, "আমরা উৎসাহ না দেখালে বাংলার জিনিস আর বিদেশে আসবে না।"

এই প্রসঙ্গে আমার হিন্দির খ্যাতনামা কবি শ্রীরামধারি সিং দিনকরের কথা মনে পড়ে গেলো। পাটনা থেকে কলকাতা আসবার পথে ট্রেনে দিনকরজীর সঙ্গে আলাপ। হিন্দি প্রচারে তাঁর 'মিশনারী উৎসাহ'। দুঃখ করে বললেন, "ব্যাপারটা কি জানেন, উত্তর ভারতের লোকেরা হিন্দির জন্যে রক্তপাত করতে রাজী আছেন, কিন্তু অর্থব্যয় নৈব নৈব চ। কোটি কোটি লোকের ভাষা, কিন্তু হিন্দিতে বই বিক্রী হয় ক'খানা? ক'জন হিন্দিভাষী তাঁদের শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের নাম জানে? ক'জন তাদের লেখার সঙ্গে পরিচিত?"

চৌধুরী উত্তর দিলেন, "ঠিক বলেছেন। পূর্বপাকিস্তানীদের প্রীতি ও উৎসাহ না পেলে আমার পক্ষে বাংলা ছবি দেখানো বোধ হয় অসম্ভব হয়ে পড়তো।"

যাবার আগে চৌধুরী সাহেব একটা দরকারী উপদেশ দিয়েছিলেন। "বিদেশে যখন একবার বেরিয়েছেন, পূর্ববাংলার ছেলেদের সঙ্গে একটু ভাবসাব করবেন। আপনারা বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সেবা করেন, ওদের সব থেকে ভাল করে আপনারাই বুঝতে পারবেন।"

ট্রান্স ওয়ার্লড-এয়ারলাইনস্-এর জেট বিমানে আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করার সময়ে, কেন জানি না চৌধুরীর কথাগুলো মনে পড়ে গেলো। ভাবলাম, হয়তো বিদেশে বহুদিন বাস করে বাংলা কালচার সম্বন্ধে চৌধুরী অতিরিক্ত রোমান্টিক হয়ে উঠেছেন, তাই চিন্তা না করে ভাবালু একটা উপদেশ দিয়ে দিলেন।

কিন্তু সংসারের যুদ্ধে অনেক ধাক্কা-খাওয়া চৌধুরী যে সত্যি কথা বলেছিলেন, তার বহু নিদর্শন মার্কিন মুলুকে অচিরেই পাওয়া গেলো।

মার্কিন দেশ ভ্রমণরত বিদেশিদের অভ্যর্থনার জন্যে ওয়াশিংটনে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আছে। সরকারের কাছে সামান্য অর্থসাহায্য নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক এবং সেবিকারা একটি সেন্টার গড়ে তুলেছেন, সেখানে বিদেশিরা নিজেদের মধ্যে ভাববিনিময় করেন এবং মার্কিনীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন। বিদেশ সম্বন্ধে কৌতূহলী অনেক মার্কিন যুবক-যুবতীও নতুন বন্ধুর সন্ধানে এখানে আসেন। প্রজাপতির ষড়যন্ত্রে অনেক আন্তর্জাতিক বিবাহের ভিত্তিপ্রস্তরও এখানে স্থাপিত হয়েছে।

জলস্রোতের মতো বিদেশের প্রায় সবদেশ থেকে অতিথি প্রতিদিন ওয়াশিংটনে আসেন। পৃথিবীর আর কোনো শহরে সরকারী খাতে এতো যাত্রীর আগমন হয় না। বিমানবন্দরে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের অতিথিসৎকার বিভাগের কোনো কর্মীর সঙ্গে জানাশোনা থাকলে শুনবেন, একই দিনে তিনি যাঁদের স্বাগতম্ জানালেন তাঁদের মধ্যে হয়তো রয়েছেন মাদাগাস্কারের মেয়র, সিয়েরা-লিয়নের আইন বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি, সাইপ্রাসের জেলাশাসক, কোরিয়ার জন্মনিয়ন্ত্রণ সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট, থাইল্যান্ডের নাট্য-উন্নয়ন বোর্ডের সহকারী উপদেষ্টা, ইরানের স্বাস্থ্য দপ্তরের মুখ্যসচিব, ঘানার সেচ বিভাগের সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনীয়র, নাইজেরিয়ার গ্রামোন্নয়ন পরিষদের ম্যানেজার। ভারত ও পাকিস্তান থেকেও নিশ্চয় আধডজন অতিথি থাকবেন। যথা (নামগুলি কাল্পনিক) : আয়কর বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার কে জনার্দনম, সার নির্মাণ কর্পোরেশনের সরকারী বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা এস নাগরাজন, ভারতীয় রেলপথের অটোমেশন সংক্রান্ত বিভাগের অফিসার অন-স্পেশাল ডিউটি সর্দার মোহন সিং, সমাজসেবা বোর্ডের সভানেত্রী শ্রীমতী অনুরাধা খান (প্রাক্‌বিবাহিতা জীবনে যিনি অনুরাধা মিত্র নামে সুপরিচিতা ছিলেন), পাকিস্তান উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য আকসার আলি সি-এস-পি (আমাদের আই এ-এস-এর পাকিস্তান সংস্করণ—সিভিল সার্ভিস অফ পাকিস্তান) এবং কৃষি বীজ সংগ্রহ ও বিতরণ কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার খুরশীদ রহমান।

এই অতিথিদের জন্য সেন্টার প্রায়ই বাসভাড়া করে ওয়াশিংটন দর্শনের ব্যবস্থা করেন। রবিবার সকালে একদিন বাস-এর জন্যে অপেক্ষা করছি। একজন মার্কিন স্বেচ্ছাসেবককে জিজ্ঞাসা করলাম, "আজকের দলে কোনো ইন্ডিয়ান আছেন?" ইন্ডিয়ান নেই, বরং একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, তিনজন পাকিস্তানী আছেন। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের কী সম্পর্ক তা জানতে দুনিয়ার কারুর বাকী নেই। স্বেচ্ছাসেবক তাই বেশ ঘাবড়ে গেলেন ; তাঁর মুখ দেখে মনে হলো আশঙ্কা করছেন গাড়ির মধ্যেই আমরা না আর এক ইন্দো-পাকিস্তানী যুদ্ধ বাধিয়ে বসি।

পাকিস্তানী ভদ্রলোকেরা একটু পরেই হাজির হলেন। বুদ্ধিমান মার্কিন স্বেচ্ছাসেবকটি ইচ্ছে করেই ওঁদের আমার থেকে একটু দূরে বসালেন, যদিও আমার পাশে তিনজনের বসবার মতো জায়গা ছিল।

বাস চলতে শুরু করলো। শুভ্রা স্বেচ্ছাসেবিকা তাঁর সোনালী কণ্ঠস্বরে ওয়াশিংটন মহানগরীর ইতিহাস ও অবস্থান বর্ণনা শুরু করলেন। "ভার্জিনিয়া ও মেরিল্যান্ড রাজ্যের মাঝামাঝি কলাম্বিয়া ডিস্ট্রিকটে পটোম্যাক নদীর ধারের এই জায়গাটি জর্জ ওয়াশিংটন স্বয়ং পছন্দ করেছিলেন। এই শহরের ২২০ মাইল পূর্বে নিউইয়র্ক, ১১১৫ মাইল দক্ষিণে মিয়ামি, আর পশ্চিমপ্রান্তের লস্ অ্যানজেলস ২৭২৫ মাইল। রাজধানীর জমি কেনা হয় ১৭৯১ সালে এবং নগর পরিকল্পনা করেন একজন ফরাসী ইঞ্জিনীয়র মেজর পিয়েল ল' এফ্যান্ট। অত্যন্ত আধুনিক সব পরিকল্পনা দেওয়ার জন্য এঁর চাকরি যায়।"

"বুঝুন দাদা, সাম চাচার কাণ্ডটা! এমন শহর বানাবার পুরস্কার হলো চাকরিটি খাওয়া।" হঠাৎ খাঁটি বাংলায় কানের গোড়ায় মার্কিন ইতিহাসের বিশ্লেষণ শুনে বাইরে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে দেখি পাকিস্তানী ভদ্রলোকদের একজন আমার পাশে বসে পড়েছেন।

"তা দাদার আসা হচ্ছে কোথা থেকে?" ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

"কলকাতা থেকে," উত্তর দিলাম।

"দূর থেকে দেখে ঠিক ধরেছি। নিরীহ গোবেচারা বাঙালি ছাড়া এই বিদেশে বাসের মধ্যে অমন মুখ কাঁচুমাচু করে বসে থাকবে কে?"

এমন আমুদে লোকের সঙ্গে ভাব হয়ে যেতে এক সেকেন্ড লাগে। নাম মকবুল আমেদ। কোটের বুকপকেট দেখিয়ে বললেন, "কর্তারা নাম ঠিকানা বংশ পরিচয় সব এখানে কার্ডে লিখে দিয়েছেন। ওই পরে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আর আমার বন্ধু মহম্মদ আলী ওইখানে বসে রয়েছে পাঠান শের আলির সঙ্গে!"

এঁরা দু'জনে পাকিস্তান অর্থদপ্তরের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। মকবুল বললেন, "আমরা তিনজনেই এ-আই-ডির মাল। এক বছর এখানে থেকে কাজকর্ম শিখে ফিরে গিয়ে দেশোদ্ধার করবো। আমাদের গ্রুপে খান পাঁচেক লম্বা-চওড়া ইন্ডিয়ান আছে, কিন্তু একটাও বঙ্গভাষী নয়।"

আমি গম্ভীরভাবে কোনো উত্তর না দিয়ে, ওঁর কথা শুনে যাচ্ছিলাম। মকবুল বললেন, "কী দাদা? একটা কিছু মতামত ছাড়ুন। না, আপনিও সেই বাসু সায়েবের দলে? নিউইয়র্কে আলাপ হলো ওঁর সঙ্গে। উনিও আমার মতো এ-আই-ডির মাল। বাংলায় কথা বলাটাকে ভদ্রলোক প্রাদেশিকতা মনে করেন। দিল্লিতে হাইপোস্টে চাকরি করে-করে এমন খাঁটি ইন্ডিয়ান হয়েছেন যে, প্রথমে হিন্দি বলবেন, আর দরকার হলে সঙ্গে ইংরেজী তর্জমা দিয়ে দেবেন। তা দাদা,

আমিও ইসলামাবাদে পোস্টেড, শ্বশুরবাড়ির লোকদের ধারণা চাকরিটা নেহাত ছোট করি না, কিন্তু বাংলায় কথা না বললে প্রাণটা আই-ঢাই করে।”

আমি হাসছিলাম। মকবুল বললেন, “আমরা যাকে জাতীয়তা মনে করি এই বিদেশে ইন্ডিয়ার বেঙ্গলিদের কাছে শুনেছি সেটা প্রাদেশিকতা।”

মকবুল বেশ চড়া গলায় কথা বলে যাচ্ছেন। আমি সামান্য বিব্রত বোধ করছিলাম। মকবুল বললেন, “প্রাণের সুখে গলা ফাটিয়ে বাংলায় গল্প করে যান দাদা—এখানে কোনো ব্যাটা বুঝবে না।”

মকবুল এবার আমাকে নিয়ে পড়লেন। “সীতাকে ইসলামাবাদে ফেলে রাম বনবাসে এসেছে। এখানে দু'মাস কেটেছে, আরও ছ'টা মাস। ইতিমধ্যে বিবি তো ওখানে একখানা বিরহের পদ্যর বই ছাপিয়ে ফেলেছেন। বাংলায় এম-এ পাশ করে প্রফেসরী করেন। তা আপনি এদেশে কোন দুঃখে। গভরমেন্টের কোন্ ডিপার্ট আপনার?”

নিজের পরিচয় দিতে হলো এবার। গত বছর মার্কিন রাষ্ট্রদূত চেষ্টার বোলজ হঠাৎ এক চিঠি পাঠিয়ে বসলেন। এতো লোকজন থাকতে বিহারী চক্রবর্তী লেনের আমাকে কেমন করে তিনি খুঁজে বার করলেন জানি না। চিঠিতে বিদেশ ভ্রমণের জন্যে নিমন্ত্রণ—নিজের চোখে মার্কিন দেশ দেখুন, যাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চান বলুন এবং সেই সুযোগে আপনি নিশ্চয় মার্কিন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আপনার দেশ সম্পর্কে আরও ভাল ধারণা গড়ে তুলবার চেষ্টা করবেন। বিমানের টিকিট ও ভ্রমণের খরচ পররাষ্ট্র বিভাগের এক গ্রান্ট থেকে যোগানো হবে। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেও শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত কতকগুলো বাধার ফলে প্রথম বছর যাওয়া হলো না। হস্তরেখাবিদ এক বন্ধু বললেন, হাতে রাজসম্মান ও বিদেশ ভ্রমণের যোগাযোগ রয়েছে, কিন্তু এখনও পেকে ওঠেনি। পরের বছরে বোধ হয় সমুদ্রযাত্রার ফুল ফুটলো, তাই বিদেশে হাজির হয়েছি।

মুহূর্তের মধ্যে একবারে পাল্টে গেলেন মকবুল। আলীকে চিৎকার করে এদিকে আসতে বললেন। আলী আসতেই বললেন, “কি সৌভাগ্য আমাদের। আজ যে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম। আপনার যতগুলো বই পাকিস্তানে পাওয়া যায় আমার স্ত্রী সব কিনেছেন। আপনার ‘কত অজানারে’ বই-এর পাকিস্তান সংস্করণে আপনি যা ভূমিকা লিখেছিলেন তা আমার মনে আছে। “সাহিত্যের নীল আকাশের নিচে কোনো ভৌগোলিক রাজনৈতিক সীমানা নেই—আমরা সবাই সেখানে রাজা, সেখানে আমাদের একমাত্র পরিচয় আমরা মানুষ!”

মহম্মদ আলীকে মকবুল বললেন, “কি লজ্জা, একজন লেখককে আমি বাংলা ভাষা সম্বন্ধে এতোক্ষণ লেকচার দিচ্ছিলাম!”

বললাম, “লেকচার আপনি দেননি, তবে পূর্বপাকিস্তানের বাঙালি হিসেবে

পশ্চিম বাংলার প্রত্যেকটি লোককে লেকচার দেবার অধিকার আপনাদের আছে। মাতৃভাষার জন্য আপনারা রক্ত দিয়েছেন—আমরা তো লোভী ব্রাহ্মণের মতো মায়ের সেবার নাম করে শুধু নিয়েই চলেছি।"

আমি নিজেকে ইমোশনাল মনে করতাম, কিন্তু দেখলাম পূর্ববাংলার মাটিতে আমার থেকে অনেক বেশী ইমোশনাল জন্ম নেয়। মকবুল আমেদ ও মহম্মদ আলী শুধু যে আমার সঙ্গী হলেন তা নয়, আমার হাতের ব্যাগ ও ক্যামেরা পর্যন্ত বইতে লাগলেন।

পাঠান শের আলী এদিকে একলা পড়ে গিয়ে বার বার সঙ্গীদের কাণ্ডকারখানা দেখছেন। কিন্তু এঁদের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। মকবুল তখন বলছেন, "কি জাদু বাংলা গানে, গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে—কেমন করে দুনিয়াকে বোঝান যায় বলুন। এরা কি মেঘনার বুকে বাঙালি মাঝিদের গান শুনেছে?"

আমি অবাক হয়ে এঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। মকবুল শুরু করলেন, "বলুন কলকাতার অবস্থা। শুনছি নাকি মানুষের বড় কষ্ট ওখানে। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, চাকরি নেই, শান্তি নেই। সত্যি কথা নাকি?"

"মোটেই মিথ্যে নয়। মানুষের এতো দুর্গতি আগে কখনো দেখিনি। পশ্চিম বাংলা বলতে এখন প্রায় কলকাতা। একটা ক্ষয়িষ্ণু শহর কেমন করে ভারতবর্ষের পঞ্চাশ কোটি লোকের অবহেলাভরা চোখের সামনে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর মুখে এগিয়ে চলেছে তা ভাবলে মন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে।"

আমার কথা শুনে মকবুল গম্ভীর হয়ে উঠলেন। বললেন, "আমিও ত কলকাতার ছেলে। ছোটবেলাটা মিরজাপুর স্ট্রীটে কাটিয়ে এসেছি। দিলখুসা রেস্তোরাঁর কবিরাজী কাটলেট, পুঁটিরামের দোকানের রাজভোগ, দ্বারিকের দোকানের লুচি আর ছোলার ডাল এখনও মুখে লেগে রয়েছে। স্টার, রঙমহল আর শ্রীরঙ্গমে থিয়েটার এখনও চোখের সামনে দেখতে পাই। যখন শুনি সেই কলকাতা বাকি ভারতবর্ষের সঙ্গে পেরে উঠছে না, তখন বড় কষ্ট হয়।"

"দূর থেকেও বেচারা কলকাতাকে ভালবাসার লোক আছে ভাবতে খুব ভাল লাগছে, মকবুল সায়েব।"

মকবুল বললেন, "এক এক সময় ভাবি কলকাতা যদি মরে যায়, তার জন্যে আমাদের অপরাধ কম হবে না। আমরা যদি ভুল বোঝাবুঝি করে নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি না করতাম তাহলে কলকাতা শুকিয়ে যেতো না।"

মকবুলের মুখের দিকে তাকালাম, ওঁর মধ্যে যেন এক পরম বন্ধুর কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। বাইরে তখন ওয়াশিংটন নয়নাভিরাম দ্রষ্টব্যগুলি একের পর এক এগিয়ে আসছে। কিন্তু সেদিকে আমাদের দৃষ্টি নেই—আমাদের মন তখন পড়ে

রয়েছে দুঃখিনী কলকাতায়।

বললুম, "খাঁটি বাংলা সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় তা একদিন হয়তো কেবল পূর্ব পাকিস্তানেই বেঁচে থাকবে।"

মকবুল শিউরে উঠলেন। "কী যে বলেন! কলকাতাকে বাদ দিয়ে বাংলা কালচারের কথা ভাবা যায় না।"

আমি বললাম, "নীরোধ চৌধুরীর নাম শুনেছেন? ময়মনসিংহের ছেলে। 'একজন অখ্যাত ভারতীয়ের আত্মজীবনী' নামক গ্রন্থের দুর্মুখ লেখক হিসেবে এখন দেশে-বিদেশে সুপরিচিত। মহাপণ্ডিত লোক, বাঙালিদের মতো গোঁয়ার এবং কোনোরকম রেখে-ঢেকে কথা বলেন না। ওঁর ধারণা, আপনারাই নির্ভেজাল বাঙালি সংস্কৃতির শেষ দুর্গ।"

মকবুল বললেন, 'আমাদের একটা সুবিধে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৫৫ ভাগ বাঙালি। আমাদের পছন্দ না হলেও লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দেওয়া যায় না। গোড়ার দিকে আমরা মার খাচ্ছিলাম—কিন্তু এখন একটা হিসেব দিতে হচ্ছে। ইসলামাবাদেও বাংলা সাইন বোর্ড দেখবেন, বাংলা আমাদের বড় প্রিয়, আমাদের আদরের ধন।"

মাঝে মাঝে বাস থামছে। লিংকন্ মেমোরিয়াল, জেফারসন মেমোরিয়াল। আমরা তিনজন একসঙ্গে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে দেখছি, আর মকবুল প্রাণভরে বাংলা বলে যাচ্ছেন। "আমার কি মনে হচ্ছে জানেন? অনেকদিন পরে যেন হারানো ভাইকে খুঁজে পেয়েছি।"

মহম্মদ আলী বললেন, "আমি দাদা কোনোদিন কলকাতায় যাইনি। তবে গল্প শুনেছি অনেক। আমার খুব ইচ্ছে ওখানে গিয়ে থিয়েটার দেখি আর সন্দেশ খাই।"

আমি বললাম, "পূর্ববাংলাও আমার চোখে দেখা নয়। তবে আমারও একটা স্বপ্ন আছে। যদি কেউ আমাকে বলে বিলেত ভ্রমণ আর পূর্ব পাকিস্তান ভ্রমণের মধ্যে একটা বেছে নাও, তাহলে আমি পাকিস্তানে বেড়াতে যাবো। পদ্মার বুকে স্টিমারে চড়ার আশাটা আমার বুকের মধ্যে অনেকদিন লালিত হচ্ছে। আর স্টিমারে ইলিশ মাছ আর ভাত—তার কাছে প্যারির ম্যাক্সিমও লাগে না।"

মকবুল বেশ দুঃখ পেলেন। ক্ষমতা থাকলে তখনই আমাকে ঢাকায় নেমন্তন্ন করে বসতেন। বললেন, "এই স্টিমারে পদ্মা পেরিয়ে কতবার তো ঢাকা গিয়েছি, কিন্তু কই কখনও তো তার মূল্য বুঝিনি।"

"হাতের মধ্যে থাকলে তার মূল্য বোঝা যায় না, ভাই। কলকাতার লোক আমরা মিনার্ভা, রঙমহল, স্টার-এর দাম বুঝি না। শিয়ালদার ব্যারনস হোটেল, কলেজ স্ট্রীটের জ্ঞানবাবুর চায়ের দোকান, হাতিবাগানের রামলাল, সিমলার

চাচা, আর মানিকতলার গাঙ্গুরাম আমাদের মনে আনন্দের শিহরণ জাগায় না। আমরা ধরে নিয়েছি, এরা আমাদের হাতের পাঁচ। যদি কখনও এসব হারাই তখন আবার ভাল লাগবে, হয়তো চোখের জলও পড়বে," আমি বলি।

ইতিমধ্যে যাত্রীদল পটোম্যাক নদীর ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। মকবুল বললেন, "ঠিক বলেছেন দাদা। ছোটবেলায় যখন কলকাতায় ছিলাম তার কোনো মূল্য বুঝিনি। কে হিঁদু, কে মুসলমান, কে খ্রেষ্টান এইসব বিষ কিন্তু তখনই মাথায় ঢুকে গিয়েছিল। এখন ভাবি, সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে ওয়াশিংটনে চলে এলাম, অথচ ইসলামাবাদ থেকে ঢাকা ফেরার পথে কলকাতায় থেমে ছোটবেলার স্মৃতিগুলো দেখবার উপায় নেই।"

মহম্মদ আলী বয়সে তরুণ। যে পাঁকের মধ্যে গড়াগড়ি খেয়ে আমরা নিজের মাকে ভাগ করেছি তার প্রত্যক্ষ স্মৃতি নেই তার। সে জিজ্ঞেস করলো, "কেন এমন হলো বলুন তো?"

মকবুল বললেন, "সে আর ভেবে লাভ নেই। হাঁড়ি আলাদা হয়েছে, ঠিক হ্যায়, এখন অন্তত দু'ভাই-এর মধ্যে সদ্ভাব হোক। এই খাওয়া-খাওয়িতে কে মরছে বুঝছো না? মরছে বাঙালির গান, বাঙালির ভাষা, বাঙালির প্রাণ, বাঙালির আশা।" এবার একটু লজ্জা পেয়ে গেলেন মকবুল। "না, লেখকের সামনে বড় বড় কোটেশন চালিয়ে ফেললাম। আসলে কি জানেন, এসব ভাবলেই বুকটা মুচড়ে ওঠে—কত ভাব মনে আসে, কিন্তু ভাষা খুঁজে পাই না, তেমন করে তো বাংলা শিখিনি।"

পটোম্যাক নদীর ধার থেকে বাসে চড়ে আমরা চললাম বেশ কয়েক মাইল দূরে মাউন্ট ভারননে। এইখানেই জর্জ ওয়াশিংটনের বাড়ি। বিরাট এক পার্ক, আর তারই মধ্যে ওয়াশিংটনের স্মৃতিবিজড়িত ছোট্ট দোতলা বাড়ি. ওয়াশিংটনের ব্যবহৃত জিনিসপত্র পরম যত্নে এখানে রেখে দেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন বহু জনসমাগম হয়।

মহম্মদ আলী বললো, "দিনটা ভালই কাটছে। গোটা কয়েক মানুষের মতো মানুষের পীঠস্থান দেখা গেলো। ওয়াশিংটন, লিংকন, জেফারসন, কেনেডি দর্শন হলো চার ঘণ্টার মধ্যে, আর কি চাই!"

পশ্চিমী সভ্যতার একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ হলো Tips—বকশিস বললে ঠিক সবটা বোঝায় না। কারণ বকশিসের মধ্যে দাতার একটা খুশী হওয়ার ভাব আছে, কিন্তু টিপ্‌স জিনিসটা শুধু আবশ্যিক নয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার থেকেও বেশী। বিদেশিদের পরামর্শ দেবার জন্যে যেসব পুস্তিকা ছাপানো হয় তাতেও টিপ্‌সের শতকরা হার লেখা থাকে। ট্যাক্সির ড্রাইভার, হোটেলের বেলবয়, রেস্তোরাঁর ওয়েটার—এরা সকলেই নির্দিষ্ট হারের কমে টিপ্‌স পেলে সোজাসুজি বিরক্তি

প্রকাশ করবার স্বাধীনতা উপভোগ করে। টিপ্‌স ফিরিয়ে দেওয়ার তিনটি পদ্ধতি আছে : "মহাশয়, আপনি ভ্রমক্রমে আপনার ভাঙানি ফেলে যাচ্ছেন।" কিংবা, "মহাশয়, এই অর্থব্যয় বোধহয় আপনার সাধ্যের অতিরিক্ত, এটি ফেরত নিন।" অথবা সোজাসুজি, "ট্যাক্সিতে তোমায় যে দশ ডলার সেবা করলাম তার জন্যে মাত্র এক ডলার স্বীকৃতি?"

মকবুল বললেন, "দাদা, এ-দেশে পা-ফেলার আগে এই টিপ্‌স সম্বন্ধে যেসব গল্প শুনেছি তাতে গায়ের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়। দু' একজন আমেরিকান ছোকরা টিপ্‌স না দিয়েই ট্যাক্সিতে ম্যানেজ করে। কিন্তু গরীব দেশের লোক আমরা, যা ন্যায্য পাওনা তার থেকেও দু'একটা পয়সা বেশী দেবেন, না হলে মান-ইজ্জত থাকবে না।"

বাসের জনৈক যুবতী ইতিমধ্যে সহযাত্রীদের কাছ থেকে টিপ্‌স সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেছে, বিদায়ের আগে ড্রাইভারকে সামান্য নগদ প্রীতি উপহার দিয়ে যাওয়া নাকি রেওয়াজ। আমরা ব্যাগ বার করছিলাম, মকবুল নিজেই একটা ডলারের নোট বার করে দিয়ে বললেন, "আমাদের এই তিনজনের গ্রুপের জন্যে।'

আমি আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম, মকবুল বললেন, "দু'একটা ডলার বাঁচাতে পারলে দেশে নিয়ে যান—ফরেন এক্সচেঞ্জের জন্যে দেখবেন রোগীর চিকিৎসা হচ্ছে না, ছেলেদের পড়া হচ্ছে না, কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দুনিয়ায় এত খাবার হচ্ছে, অথচ এই ডলার নেই বলে আপনার আমার মা-ভাই-বোন শুকিয়ে রয়েছেন।"

পাকিস্তানী অতিথিদের খোঁজ করতে মার্কিন স্বেচ্ছাসেবক এদিকে এসে আমাদের আড্ডার বহর দেখে অবাক। ছোকরা রসিকতা করে বললো, "ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের মনে করিয়ে দেওয়া কর্তব্য মনে করছি যে, খবরের কাগজ থেকে যা জানা যায় তাতে আপনাদের দুই দেশের মধ্যে প্রবল মনোমালিন্য।"

আমরা তিনজনেই হেসে ফেললাম। মকবুল বললেন, "তাহলেই বুঝতে পারছেন আপনাদের খবরের কাগজে কী রকম সত্যনিষ্ঠ খবর ছাপা হয়!"

বাস থেকে নেমে মকবুল তাঁর পশ্চিম পাকিস্তানী সহকর্মীর কাছে গেলেন। আমি হোটেলের দিকে হাঁটতে শুরু করেছিলাম, কিন্তু ওঁরা এসে পাকড়াও করলেন। "মিঞার সঙ্গে লাঞ্চের কথা ছিল, কৌশল করে নিষ্কৃতি পাওয়া গেছে। এখন চলুন গরীবের বাসায়।"

আমি একটু দ্বিধা করছিলাম, কিন্তু দুজনেই নাছোড়বান্দা। "আমরা দাদা, একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে আছি! আমার তো প্রথমে এখানে এসে না খেয়ে

মরার অবস্থা। লোকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলে, কিন্তু চারদিকে হারামের মাংস। সব গায়ে গায়ে রেখে দিয়েছে। আপনি হিঁদু বাউন, আপনার নিশ্চয় আরও শোচনীয় অবস্থা।"

আমাকে অ্যাপার্টমেন্টে এনে দুজনে যে আতিথেয়তা শুরু করলেন তাতে লজ্জায় মরে যাই। মহম্মদ আলী তাড়াতাড়ি রান্নার যোগাড় আরম্ভ করলে, আর মকবুল ফ্রিজ খুলে তিন গেলাস ফলের রস বার করলেন। ফলের রস খেয়ে গেলাস ধুতে যাচ্ছিলাম, মকবুল হাত চেপে ধরে বললেন, "এর থেকে গলায় ছুরি দিন। নিশ্চয় বইতে পড়েছেন, আমেরিকায় অতিথিকে নিজের কাপ-ডিস ধুয়ে দেবার প্রস্তাব করতে হয়। তা দাদা, এই গরীব পাকিস্তানীর ওপর আপনার মার্কিনী কায়দা ফলাচ্ছেন কেন? না হয় কাশ্মীর নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আমাদের প্রবল ঝগড়াঝাঁটি চলছে।"

মকবুল বললেন, "গরীব দেশের লোক হলে কি হয়, চিরকাল লর্ডের মত মানুষ হয়েছি। আগে মায়ের রান্না খেয়েছি, পরে বিবির রান্না। প্রফেসর হলেও বিবি রান্না ভালই জানে। আমার একটা মেয়ের নাম দিয়েছি অরুন্ধতী। ভাবছেন, মুসলমানের এমন হিঁদু নাম হলো কী করে? হিঁদুরা ইন্ডিয়াতে আসবার অনেক আগে থেকে অরুন্ধতী নক্ষত্র আকাশে শোভা পাচ্ছে। আমাদের ছেলে হলে নাম দেবো ভাস্কর। আজকাল অনেকে হাফ ইংরিজী নাম রাখছে, শুনলে পিত্তি জ্বলে যায়।"

মহম্মদ আলীর কাছ থেকে রান্নার দায়িত্ব নিয়ে মকবুল শুরু করলেন, "আমার মা যদি শোনেন তাঁর ছেলে হাত পুড়িয়ে রান্না করে, তাহলে কেঁদে সারা হবেন। কিন্তু কেমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।"

বললাম, "আমার জন্যে শুধু শুধু কষ্ট করছেন।"

"কি যে বলেন' আমার বিবি থাকলে আপনার জন্যে এতক্ষণ হৈ চৈ লাগিয়ে দিতো। বাংলা বই ওর প্রাণ। হেমন্ত মুখার্জি, দেবব্রত বিশ্বাসের রবীন্দ্রসঙ্গীত, আর বিমল মিত্তিরের উপন্যাস। খানকয়েক বই ভদ্রলোক যা লিখেছেন, অন্য দেশ হলে মাথায় করে রাখতো।"

রান্নার মধ্যে মধ্যে মকবুল সাহিত্য আলোচনা চালিয়ে যেতে লাগলেন। "পাকিস্তানের ছেলেরা চেষ্টা করছে, কিন্তু এখনও সায়েব-বিবি-গোলাম, কড়ি দিয়ে কিনলাম লেখবার মতো কব্জির জোর হয়নি। আমার ওয়াইফ বলে, বিমলবাবুর কিছু লেখার মধ্যে বাঙালি জাতের ইতিহাসটা রয়ে গেলো। যদি কোনদিন দেখা হয় আমার ওয়াইফ ওঁকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে : সেই পলাশীর যুদ্ধ থেকে এই ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলার সব সম্পর্ক ও সংঘাতের কথা লিখলেন তিনি ; কিন্তু হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কটা এড়িয়ে

গেলেন কেন?"

আমি বললাম, "ওঁর সঙ্গে দেখা হলে প্রশ্ন করবো। তবে ওই বিষয়ে লেখা পড়বার যোগ্যতা আমরা বোধ হয় এখনও অর্জন করিনি। হয়তো আরও সময় লাগবে ; হয়তো মহাকাল যখন ঝাঁট দিয়ে আমাদের যুগের সবাইকে ইতিহাসের আবর্জনাস্তূপে ফেলে দেবে, তখনই আমাদের কোনো সহৃদয় প্রপৌত্র প্রপিতামহদের সেই লজ্জাজনক কাহিনীকে কেন্দ্র করে বৃহৎ কোনো সাহিত্য সৃষ্টি করবে।"

মহম্মদ আলী আমার দিকে একবার ফিরে তাকালো। মকবুল বললেন, "আলি লাজুক মানুষ, ও বেশী কথা বলে না, কিন্তু আপনাদের খুব ভক্ত লোক।"

খাবার সাজিয়ে নিয়ে মকবুল বললেন, "যদি কখনও হঠাৎ কলকাতায় যাই, থিয়েটারের টিকিট কিনিয়ে দেবেন, খুব ভিড় হয় নিশ্চয়!"

"কোথায় ভিড়? বাংলার নিজস্ব সব জিনিসগুলোর ওপর শনির দৃষ্টি পড়েছে। মিষ্টির দোকানে মিষ্টি নেই, চিড়ে মুড়ির দোকানে মাছিরাও সময় নষ্ট করে না, কলেজ স্ট্রিটে বাংলা বই-এর দোকানে বিক্রি হু-হু করে কমছে, বাংলা সিনেমা তৈরির খরচ উঠছে না, বাংলা ফিল্ম স্টুডিওর দশা দেখলে চোখে জল আসে, নটো-প'টো বাঙালি থিয়েটার করে, কিন্তু দর্শকদের কাছ থেকে চাল কেনার টাকাও ওঠে না।"

আমার কথা শুনে বিমর্ষভাবে বসে থাকেন মকবুল। "ইন্ডিয়ার রেস-এ বাংলা ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়ছে, তাই না?"

মহম্মদ আলী বললে, "বাংলার 'বাং' পড়েছে পাকিস্তানে, শুধু 'লা' দিয়ে ওঁরা কত দূর কী করবেন?"

মকবুল বললেন, "আপনি আমাকে প্রাদেশিক ভাববেন না। কিন্তু ইন্ডিয়া-পাকিস্তানের লোকেরা অন্য যত বিষয়ে ঝগড়া করুক, বাঙালিরা যে গোলমেলে জাত, সে বিষয়ে সবাই একমত। এর কারণ কী?"

মহম্মদ আলী বলে বসলো, "বাঙালির যে ব্রেন আছে।"

"ওসব আর সত্যি নয়," সঙ্গীকে মৃদু ভর্ৎসনা করলেন মকবুল। "পলাশীর যুদ্ধটা বাংলাদেশে হয়েছিল বলে বাংলা প্রথম পশ্চিমের আলো পেয়েছিল। সে তো কবেকার কথা—তারপর পদ্মা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে—বাঙালি সর্বস্ব হারিয়ে নিজের ভাই-এর গলায় ছুরি লাগিয়েছে। হিঁদু বাঙালি পোঁটলা নিয়ে শেয়ালদা স্টেশনে হাজির হয়েছে, মুসলমান বাঙালি ঢাকার রেফ্যুজিক্যাম্পে নাম লিখিয়েছে। এখনও হিসেব নিয়ে মারামারি হচ্ছে : আমরা ভাল লোক, তোমাদের তেষট্টি জনের বদলে আমরা মাত্র তেতাল্লিশ জনকে মেরেছি!"

কলকাতা সম্বন্ধে এতো উদ্বেগ আর কোথাও দেখিনি। কলকাতা যে পিছিয়ে

যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে, বিনাচিকিৎসায় অকালমৃত্যুর প্রবল সম্ভাবনা যে তার সর্বাঙ্গে দেখা দিচ্ছে, এতে কারুর কোনো চিন্তা নেই। কলকাতা যেন বাঙালিদেরই শহর, এই শহরের দোকান-পাট ব্যবসা-বাণিজ্যের আয়টুকু যেন বাঙালিরাই উপভোগ করছে ; এই শহরের বড় বড় বাড়িগুলোর মালিকানা যেন বাঙালিদের ; পার্ক স্ট্রীট চৌরঙ্গীর বড় হোটেলে, রেস্তোরাঁয়, ক্লাবে জীবনের সব আনন্দ যেন বাঙালিরাই উপভোগ করছে ; শহরে যত মোটর গাড়ী আছে তা সব যেন বাঙালীরাই চড়ে বেড়াচ্ছে ; কলকাতার কোটি কোটি টাকা ব্যাঙ্কের ম্যানেজাররা যেন বাঙালিদের নামে লেজার লিখে রেখেছেন। কিন্তু এই শহরের সব বদনামের দায়িত্ব কেবল তাদেরই, আর কারুর নয়।

কয়েক শ বছর ধরে দুনিয়ার দুরন্ত লোকরা টাকা কামিয়ে বড়লোক হবার নেশায় কলকাতায় এসেছে। পৃথিবীতে যত রকম, ব্যবসায়িক কেলেঙ্কারী আছে তার কালিমা মাখিয়ে দেওয়া হয়েছে কলকাতার মুখে ; আর কলহপ্রিয় অলস বাক্-সর্বস্ব আত্মঘাতী অভিমানী বাঙালি রাজনৈতিক প্রগতির নামে ট্রাম জ্বালিয়ে, রাস্তা বন্ধ করে, কারখানায় তালা লাগিয়ে, বক্তৃতা করে, পোস্টার মেরে বেচারা কলকাতাকে সোনার সিংহাসন থেকে পথের ধুলোয় নামিয়ে আনছে। 'মৃত্তিকার সন্তানদের' সংগঠনী প্রতিভার নিদর্শন কলকাতা কর্পোরেশন ও রাষ্ট্রীয় পরিবহণ ; জ্ঞানতপস্যা ও মনীষার স্তম্ভ আজকের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ; পরিচ্ছন্নতা ও রুচিবোধের প্রমাণ শ্যামবাজার অঞ্চলের পথঘাট এবং শিয়ালদহের মূত্রাগার ; এবং সৌজন্যের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বাস কণ্ডাক্টর ও ড্রাইভার নামক হতভাগ্য জীবদের উদ্দেশে এক শ্রেণীর বঙ্গসন্তানদের মধুভাষণ। এই আড়াইশ বছরের ইতিহাস কলকাতা সম্বন্ধে সামগ্রিকভাবে এবং বৈজ্ঞানিক পন্থায় চিন্তা করবার জন্যে একটি কানাকড়ি কেউ বার করেননি! এ-বিষয়ে যে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছেন, সেটি যে একটি বিদেশি ফাউন্ডেশন তা ভাবতে কলকাতার নুন-খাওয়া বড়লোকদের, কলকাতায় চাকরি-করা প্রত্যেকটি মধ্যবিত্তের এবং প্রত্যেকটি ম্যাট্রিক পাশ করা বাঙালির এবং আমাদের সকলের লজ্জা হওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু এ সব কী অবান্তর প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি? স্বদেশ থেকে বহুদূরে বিদেশি হোটেলের ঘরে বসে বসে এরকম অনেক চিন্তার কথা বহু ভূতপূর্ব কলকাতাবাসীদের কাছে শুনেছি, মন খারাপ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মকবুল আমাকে আশার বাণী শোনালেন : "দেখবেন দাদা, আমাদের চিরকাল এই অবস্থা থাকবে না। পূর্বপাকিস্তানের কথাই ধরুন না। আমাদের তেমন ব্যবসা-বাণিজ্যে মন ছিল না। এখন অনেক বাঙালি ব্যবসায় নামছে, কলকারখানা খুলছে এবং আপনাদের আশীর্বাদে তারা খুব খারাপ করছে না। বাংলা গান, বাংলা গল্প, বাংলা কবিতার মধ্য দিয়ে আপনারা জাতটাকে জাগিয়ে তুলুন, দেখবেন মরা নদীতে আবার

জোয়ার আসবে।”

মকবুল আমেদের সঙ্গে এইভাবেই শেষ কথা হয়েছে! খাওয়া-দাওয়ার পরে মকবুল আমাকে হোটেল পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এসেছিলেন। আমি বলেছিলাম, আমি একলাই চলে যেতে পারবো। কিন্তু মকবুল কথা শোনেননি। ওয়াশিংটনে আর একজন পাকিস্তানী আমার বিপত্তারণের ভূমিকা নিয়েছিলেন। নারীঘটিত ব্যাপার থেকে তিনি কী ভাবে আমাকে রক্ষা করেছিলেন, তা অন্যত্র বলবো।

ওয়াশিংটনে আরও কয়েকজন পূর্বপাকিস্তানী বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। তাঁরা শুধু গল্প করেননি, প্রাণভরে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীত শুনিয়েছেন এবং হাল আমলে পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্যের খবরাখবর দিয়েছেন।

মার্কিন দেশে যেসব গ্রন্থাগারে বাংলা বই রাখা হয় এবং যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাচর্চা করা হয়, তার দু-এক জায়গায় গিয়েছি এবং আলোচনা করে একটা ভুল ভেঙে গিয়েছে। কলকাতায় বসে থেকে যখন শুনতাম, বিদেশের অমুক অমুক জায়গায় বাংলাচর্চা হচ্ছে তখন গর্বের সঙ্গে ভাবতাম, দেখো আমাদের সাহিত্যকে আমরা কতখানি সমৃদ্ধ করেছি, বিদেশের লোকরা এখন বাংলা সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। কিন্তু বাইরে গিয়ে বুঝলাম, বাংলার এই আন্তর্জাতিক মর্যাদার পিছনে পাকিস্তানীদের দান অনেক বেশী। বিদেশে বাংলা চর্চার অন্যতম কারণ বাংলা একটি স্বাধীন দেশের সরকারী ভাষা।

এই সম্বন্ধে একটা ছোট্ট ঘটনা মনে পড়ছে। ঈশ্বর জানেন, ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রচার বিদেশে আমার অন্যতম লক্ষ্য ছিল, নিজের সাধ্যমতো ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অজ্ঞতা পরিচিত মহলে দূর করবার চেষ্টা করেছি। ভারতবর্ষ বাঁচলে যে আমরা সবাই বাঁচবো, এ কথা এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলিনি। কিন্তু আমার মাতৃভাষার সমৃদ্ধিও আমাকে আনন্দ দেয়। কোনো একটি ঘরোয়া বৈঠকে জনৈক মার্কিন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, আর একজন ভারতীয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মার্কিন ভদ্রলোক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ কোনো খবর রাখেন না। আমি লেখক শুনে জিজ্ঞেস করলেন, আমি ইংরিজীতে বই লিখি কি না। ওঁর ধারণা শিক্ষিত ভারতীয়রা ইংরিজীতেই লেখালেখি করেন। বললাম, না, আমি ইংরিজীতে লিখি না। “ও, তুমি তাহলে হিন্দিতে লেখো?” তিনি জানতে চাইলেন। আমি বললাম, আমি বাংলাভাষায় লিখি। বাংলা জিনিসটা কি জানতে চাইলেন। বললাম, এটি ভারতবর্ষের অনেকগুলি সংবিধান-স্বীকৃত ভাষার মধ্যে একটি এবং এটি পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।

আমার ভারতীয় সঙ্গীটি আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেললেন, পাকিস্তানের নয়, পূর্বপাকিস্তানের বাঙালিদের ভাষা।” কাছাকাছি একজন পূর্বপাকিস্তানী তরুণ বসেছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, “মহাশয়,

বাংলা শুধু পূর্বপাকিস্তানের ভাষা নয়, ইসলামাবাদেও বাংলা সাইনবোর্ড দেখতে পাবেন। পাকিস্তানে সরকার স্বীকৃত দুটি ভাষার একটি হলো বাংলা।”

এই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হলো। দেখলাম, বাংলা সাহিত্যের অনেক খবরাখবর রাখেন। বললেন, “আমেরিকার বাঙালিরা একদিকে ভাগ্যবান। স্থানীয় লাইব্রেরিতে দুই বাঙলা থেকেই বই আসে, যে-সুযোগ ঢাকা বা কলকাতার লোকরা একেবারেই পান না। বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক পরিচয় পেতে হলে আপনাদের আমেরিকায় আসতে হবে বুঝলেন স্যার।”

ব্যাপারটা মোটেই মিথ্যে নয়। লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখলাম, পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যের ফসল থাকে থাকে সাজানো রয়েছে। অথচ এমন যে কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি, সেখানে পাকিস্তানের বাংলা বই ক'খানা আছে? বুঝলাম, পঁয়ষট্টি সালের গণ্ডগোলের পর পাকিস্তানের বই সংগ্রহ শক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু তার আগেকার সমস্ত বই কি তাঁদের আছে? ধরে নিচ্ছি, সরকারী প্রতিষ্ঠানের নানা অসুবিধা। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় কি এমন একটি প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় নেই যাঁরা প্রয়োজন হলে লন্ডন বা নিউইয়র্কের কোনো পুস্তক ব্যবসায়ীর মাধ্যমে পূর্বপাকিস্তানে প্রকাশিত সব বাংলা বই একখানা করে কিনে আনেন? ওয়াশিংটনের লাইব্রেরী অফ কংগ্রেসের তালিকাটা দেখলেই তো অর্ধেক কাজ হয়ে যেতে পারে।

এই পাকিস্তানী বন্ধু প্রশ্ন করলেন, “আপনাদের অনেক বই যুদ্ধের আগে পাকিস্তানে প্রকাশিত হতো। শুনেছি আপনারা তার জন্যে কিছুই পান না।”

বললাম, “আমরা বহু ঠকেছি, আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। কিন্তু শুনেছি, পকিস্তান সরকারের ইচ্ছে নয় ইন্ডিয়ার বই ওখানে চলুক, সেই জন্যে তাঁরা দরিদ্র বাঙালি লেখকের সামান্য প্রাপ্যটুকু পাঠাবার অনুমতি কোনোদিন দেননি, যদিও বিলেত আমেরিকার লেখকদের সম্পর্কে তাঁরা দরাজহস্ত। তবে একটা কথা সোজাসুজি বলতে চাই। পাঠকের পড়া এবং আমাদের কিছু প্রাপ্তি একসঙ্গে হলে খুব ভাল, কিন্তু আমরা টাকা পাবো না বলে পাঠকের পড়া বন্ধ হলে সেটা খুব দুঃখের কারণ হবে। আমাদের আনন্দ, কিছু লোক বাংলা বই পড়ছে তো। পাঠক তো লেখকদের ঠকাতে চায় না, ঠকাচ্ছে অন্য কাউকে।

দুই বাংলার সাহিত্যের সমগ্ররূপ সম্বন্ধে আরও জানা গেল শিকাগো শহরে। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাণস্বরূপ ডাক্তার এডওয়ার্ড ডিমক, সাধু প্রকৃতির লোক। এরকম নিরহঙ্কারী, বিনয়ী এবং প্রকৃত বৈষ্ণব বিরল। বাংলাচর্চায় তিনি ও তাঁর বিভাগের ছাত্র ও শিক্ষকদের উৎসাহ না দেখলে বিশ্বাস হয় না। এঁদের একজন ছিলেন বুদ্ধিদীপ্ত কবি ও সাংবাদিক শ্রীজ্যোতির্ময় দত্ত। জ্যোতির্ময় আমার সঙ্গে এক মার্কিন যুবকের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন—নাম

ক্লিন্ট সীলি। সাহিত্যরসিক প্রতিভাবান তরুণ মার্কিন ছাত্রদের গবেষণার বিষয়ের অভাব নেই। কিন্তু ক্লিন্ট কাজ করছেন তাঁর প্রিয় কবি জীবনানন্দ দাশের ওপর। পিস কোরের স্বেচ্ছাসেবক হয়ে পূর্ব-পাকিস্তানের এক ইস্কুলে ক্লিন্ট বছরখানেক মাস্টারি করে এসেছেন, আর বরিশালের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছেন, বরিশালের ছেলে জীবনানন্দ দাশ রূপসী বাংলার যে ছবি এঁকেছেন তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে। ক্লিন্টের সঙ্গে কথা বললে বোঝা যায় পূর্ব বাংলায় যারা যায়নি তারা পুরোপুরিভাবে জীবনানন্দকে বুঝতে পারবে না। আবার জীবনের একটা বড় অংশ জীবনানন্দ কলকাতার আশে-পাশে কাটিয়েছেন। তাই ক্লিন্ট কলকাতায় আসবার পরিকল্পনা করছেন। ধানসিড়ি নদীর তীরে একদা আরেকটি নদীর জন্ম হয়েছিল, বহু পথ অতিক্রম করে সে এসে হারিয়ে গেল কলকাতায় সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর ফুটপাথের হাইড্রান্টে—যেখানে 'কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল'। ক্লিন্ট যা পারবেন, ঢাকা বা কলকাতার কোনো ছেলে তা পারবে না, কারণ, তারা যে যার নিজের কোটে দাঁড়িয়ে আছে, বেরোবার উপায় নেই।

শিকাগোর আগে নিউইয়র্কে বেশ কয়েকজন পূর্বপাকিস্তানীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে, ভাবে ও কাজে তাঁরা আমাদের থেকে অনেক বেশী বাঙালি এবং নিউইয়র্কের মতো জায়গাতেও তাঁরা একটুও বাঙালি ভাব ত্যাগ করেননি। অথচ বাঙালির নিজস্ব অনুষ্ঠান বিজয়া দশমীতে এঁদের আসতে দেওয়া ঠিক হবে কিনা এ নিয়ে দু-একজন সরকারী কর্মচারীকে অন্য একটি প্রখ্যাত শহরে গোপনে দল পাকাতে দেখেছি।

নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন কলকাতার ছেলে ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বল করছেন। তিনি এনথ্রপলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডক্টর মণি নাগ। হঠাৎ ভেসে-আসা দেশের লোকেদের জন্যে মণিবাবু এবং তাঁর স্ত্রী কল্পনা সব সময় তাঁদের বাড়ির দরজা খুলে রেখেছেন। মণিবাবুর ওখানেই একদিন খ্যাতনামা লেখক চাণক্য সেন-এর দেখা পাওয়া গেলো। চাণক্য সেন শুধু গল্প উপন্যাস লেখেন না, তিনি নামকরা সাংবাদিক এবং চীন-বিশেষজ্ঞ। চীন এবং পাকিস্তান সম্পর্কে কি একটা ভজখট ব্যাপারে তিনি জটিল গবেষণা চালাচ্ছেন কলম্বিয়া স্কুল অফ ইনটারন্যাশনাল স্টাডিজে। চাণক্য সেন ছদ্মনামের আড়ালে যে ভবানী সেনগুপ্ত লুকিয়ে আছেন, তিনি একদিন তাঁর অফিসঘরে এক তরুণ পাকিস্তানী লেখকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন—নাম জিয়া হায়দার।

জিয়া হায়দার পূর্বপাকিস্তানের বাংলা আকাদেমীর সঙ্গে সংযুক্ত এবং এক স্কলারশিপে নাটক ও অভিনয় সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্যে ওদেশে গিয়েছেন। ভবানীবাবু বললেন, "জিয়াকেই আমার লোকাল গার্জেন বলতে পারো। আমি যখন কিছুদিন আগে নতুন এলাম তখন হারিয়ে যাবার অবস্থা। কিন্তু

জিয়ার সঙ্গে কয়েকটা দিন একঘরে রাত্রি কাটিয়েছি এবং একজন বয়োজ্যেষ্ঠ অথচ সমব্যবসায়ী লেখকের যা প্রাপ্য তার দশগুণ বেশী আদর যত্ন উপভোগ করছি।"

জিয়া হাসতে হাসতে বললেন, "দাদার 'বাস্তব-ভিত্তিক' উপন্যাসে কী পরিমাণ গাঁজা থাকে এবার আন্দাজ করতে পারছি। আসলে আমার হোস্টেলের ঘরে একটা সীট সাময়িকভাবে খালি ছিল, সেখানেই দাদাকে কয়েকদিন টেনে নিয়ে গিয়েছিলাম. আর ওস্তাদের তামাকটা-পানটা এগিয়ে না দিলে কোন সাকরেদ ভাল কাজ শিখতে পারবে?"

জিয়া বললো, "যখন পড়াশোনা আর ইংরেজি ভাষার চাপে মেজাজটা চেপ্টে যায় তখন আড্ডার রোদে মনের বালিশটা একটু ফুলিয়ে নিতে দাদার কাছে চলে আসি।"

"আমাদের বেশ ভালই জমে," ভবানীবাবু জানান।

জিয়া হাসতে হাসতে বললো, 'আকাশবাণীর দিল্লী কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন 'সমীক্ষা' আর 'পরিক্রমার' নামে পাকিস্তানের উদ্দেশে যত বিষ দাদা এককালে উদ্গার করেছেন এখন সেগুলো একলা আমাকে সহ্য করতে হয়!"

"বেশী ফাজলামি কোরো না, তোমার ইন্ডিয়াবিরোধী বক্তৃতা শুনে শুনে আমার 'ব্রেন ওয়াশিং' প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে চলেছে। বাইরে বোকা-সোকা, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক এবং আন্তর্জাতিক অথচ ভিতরে হিপক্রিট, কম্যুনাল, ইমপিরিয়ালিস্ট এবং সেলফিস ইন্ডিয়া অন্যায়ভাবে কাশ্মীর দখল করে বসে আছে—এটা মাথায় বেশ ভালভাবে ঢুকছে!"

এবার আমরা সবাই হা-হা করে হেসে উঠলাম। জিয়া বললো, "বৃষ্টিতে ভিজে মেজাজ স্যাঁৎসেতে হয়ে গিয়েছে, এখন কফি খাওয়াবেন চলুন।"

কফির পরও আড্ডা হলো। তারপর ভবানীবাবু এক মিটিঙে চলে গেলেন, আর জিয়া আমাকে নিয়ে যেতে চাইলো তার হোস্টেলে। বাইরে সেদিন বৃষ্টি নেমেছে, নিউইয়র্কের ব্যবসায়ী আকাশেও সেদিন উদাসী মেঘের সমারোহ। নিজের রেনকোটটা খুলে আমার গায়ে চড়িয়ে দিলো জিয়া। বললে, "আমরা এখানে কিছুদিন আছি, অনেকটা সহ্য হয়ে গিয়েছে—আপনি নতুন লোক, অসুখ বাধিয়ে বসবেন না।"

হোস্টেলের ঘরে জিয়া আবার কফি তৈরি করলো, খাবার বার করলো আর শুরু করলো বাংলা কবিতার কথা। ছেলেটির বড় কাব্যিক মন। বললো, "কাল রাত্রেও বৃষ্টি পড়ছিল। হঠাৎ দেশের কথা মনে হতে লাগলো। বাবার শরীর খুব খারাপ, আমি বড় ছেলে, মা-ভাই বোনেরা হয়তো আমার মুখ চেয়ে বসে আছে। গ্রামের পথ, বাজার, নদীর ধার, আমাদের সেই ছোট বাড়িটা—সব মনের মধ্যে

এসে হাজির হলো। যখনই এমন হয়, তখনই কাগজকলম নিয়ে কবিতা লিখতে বসি। আর কবিতা লিখলে একটা শ্রোতা চাই, তাই ভবানীদাকে বিরক্ত করি। ওঁর অসীম ধৈর্য, খুব মন দিয়ে শোনেন, উৎসাহ দেন, আবার সমালোচনাও করেন।"

জিয়ার নতুন লেখা কবিতাটা প্রথম শোনার সৌভাগ্য আমারই হলো। শ্যামলী বাংলা থেকে হাজার-হাজার মাইল দূরের ইস্পাত কঠিন শহরে এক প্রবাসী যুবকের ঘরে ফেরার কামনা। কতদিন হলো সে দেশ ছেড়েছে, গ্রামের কত না পরিবর্তন হয়েছে, বাবা হয়তো আরও বৃদ্ধ হয়েছেন, মার চুলে হয়তো পাক ধরেছে, আদরের ছোট বোনটা কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে প্রবেশ করছে। শাড়িপরা মেয়েটার মধ্যে সেই ফ্রকপরা বোনটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে কি, যে আসবার সময় বলেছিল, 'দাদা,, তুমি একটা মেম বিয়ে করে এনো।' কবিতাটি অত্যন্ত আন্তরিক। কবির কল্পনায় জিয়া দেখছে তার ঘরে ফেরার দিন এসে গিয়েছে, সে এইমাত্র তার দেশের বাড়িতে মায়ের কাছে ফিরে এসেছে।

পড়তে পড়তে জিয়ার চোখদুটো সজল হয়ে উঠলো। তারপর লজ্জা পেয়ে বললো, "নিজের মনের ভাবটা আপনার ওপর অন্যায়ভাবে চাপালাম।"

জিয়া সেদিন আমাকে আমার আশ্রয়স্থল মণিবাবুর বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে জিয়া বলেছিল, "আমার কি ইচ্ছে হয় জানেন? সমস্ত বাঙালি জাতটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে কোনো ডাক্তারের চেম্বারে হাজির করি। এই তো এতোদিন বিদেশে আছি, কত লোকের সঙ্গে দেখা হয় কিন্তু ভবানীদার সঙ্গে (এমন কি সামান্য কিছুক্ষণের মধ্যে আপনার সঙ্গেও) কেমন ভাব হয়ে গেলো। অথচ আইনত আপনাদের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া, আমরা সেই সাতচল্লিশ সাল থেকে এই সাতষট্টি সন পর্যন্ত বহুবার খুনোখুনি করেছি। মাথার ডাক্তাররা একমাত্র এর কারণ বলতে পারে, এর জন্যে চিকিৎসাও দরকার।"

জিয়া জিজ্ঞেস করেছিল, "হাওয়াই দ্বীপে যাচ্ছেন নাকি? ওখানে অনিমেষ রায় নামে এক পাকিস্তানী ছোকরা ইস্ট-ওয়েস্ট সেন্টারে পড়ে। ওর সঙ্গে আলাপ করবেন।"

সারা মার্কিন দেশ ঘুরে ঘুরে অবশেষে হাওয়াই দ্বীপে এসে অনিমেষ রায়ের খোঁজ করেছিলাম। কিন্তু যোগাযোগ হয়ে ওঠেনি। তার বদলে আলাপ হয়েছিল ঢাকার ছেলে বেনেডিকট্ গোমেজের সঙ্গে। প্রাণরাসায়নের কৃতি ছাত্র বেনেডিকট্ এবং তাঁর স্ত্রী স্থানীয় সমস্ত বাঙালিদের গার্জেন। বেনেডিকট্ আমাকে একদিন তার বাড়ীতে খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছিলেন। সেদিন বিকেলেই ইস্ট-ওয়েস্ট সেন্টারের জনৈক অধ্যাপকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। জিজ্ঞেস

করলেন সন্ধ্যাবেলায় কী করছি। বললাম, এক পাকিস্তানী ভদ্রলোক মাছের ঝোল-ভাত খাবার নেমন্তন্ন করেছেন। ভেবেছিলাম, এই অস্বাভাবিক ইন্দো-পাকিস্তান পীরিতের সংবাদে তিনি একটু অবাক হবেন।

কিন্তু বিস্ময়ের কোনো লক্ষণই তাঁর মধ্যে দেখা গেলো না। তিনি বললেন, "পৃথিবীর বহু দেশের ছেলেরা এখানে আসে, কিন্তু তাদের রাজনৈতিক গোলমালকে তারা ব্যক্তিগত পর্যায়ে টেনে আনে না। এখানে আমরা একটা আদর্শ-পরিবার স্থাপনের স্বপ্ন দেখি।" তিনি বললেন, 'আপনি তো শুধু নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছেন। তবে শুনুন একটা গল্প।"

"অনেক ইস্কুল-কলেজ থেকে আমার কাছে অনুরোধ আসে, বিদেশের ছাত্র পাঠাতে, তাদের দেশ সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে। এক কলেজের কাছ থেকে চিঠি এলো ইন্দো-পাকিস্তান সমস্যা, বিশেষ করে কাশ্মীর সম্পর্কে বলবার জন্যে দু'দেশ থেকে দু'জন ঝানু বক্তাকে পাঠানো হোক। দু'জন ছাত্রকে আমরা জিজ্ঞেস করলাম, তাঁরা খুব উৎসাহের সঙ্গে রাজী হলেন।"

তর্কের দিনে বেশ বিপদ। দেখা গেল, ভারতীয় ছাত্রটিই শুধু সেই কলেজে হাজির হয়েছে। সে তীব্র ভাষায় আধঘণ্টা ধরে পাকিস্তানকে ছিন্নভিন্ন করে ভারতের বক্তব্য পেশ করলো, হাততালি পড়লো। তারপর একটু থেমে, একগ্লাস জল খেয়ে সে আবার উঠে দাঁড়ালো। "ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণ, আমার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের বক্তব্য পেশ করবার কথা ছিল ঢাকার মিস্টার অমুকের। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং গতকাল রাত্রে তাঁর সঙ্গে আমি হাসপাতালে দেখা করে এ-বিষয়ে আলোচনা করেছি। পাকিস্তানের বক্তব্য তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং কয়েকটি পয়েন্ট লিখে দিয়েছেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে আপনাদের সামনে এবার আমি পাকিস্তানের বক্তব্য পেশ করছি।" আধঘণ্টা ধরে আবার আগুনের মতো বক্তৃতা দিয়েছিল সেই যুবক।

বেনেডিকট্ গোমেজ নাম থেকে মানুষটাকে যেমন কল্পনা করেছিলাম তার সঙ্গে আসল লোকটার মিল হলো না। শুধু দেখতে নয়, হাবে-ভাবে, কথা-বার্তায়, চিন্তায় সম্পূর্ণ বাঙালি কোনো চরিত্রকে যদি কোনোদিন কোনো উপন্যাসে আঁকতে হয় তাহলে আমি বেনেডিকট্ গোমেজকে আর-একবার স্মরণ করে কলম নিয়ে বসবো। বলা বাহুল্য বেনেডিকট্ ক্রীশ্চান। হিন্দু বাঙালি ও মুসলমান বাঙালির ভুল বোঝাবুঝি অনেক কমেছে; কিন্তু বহু যুগ ধরে সঞ্চিত আবর্জনার যতটুকু অবশিষ্ট আছে তাঁর চাঁচর উৎসবে পৌরোহিত্য করতে ডাকবো ক্রীশ্চান বাঙালিকে।

বেনেডিকটের সেই এক কথা, ভায়ে-ভায়ের ঝগড়া আমরা কোর্ট ঘরে এনেছি; উকিলের পয়সা গুনছি। অথচ অর্থাভাবে মায়ের যক্ষ্মারোগের চিকিৎসা

হচ্ছে না। ঘরের দেওয়ালে বেনেডিকট্ বাংলার মাদুরে তৈরি গ্রামের ছবি টাঙিয়ে রেখেছিলেন। লেখাপড়া প্রায় শেষ, শিগগির দেশে ফিরবেন, এবং দেশের ছাত্রদের প্রাণ রসায়ন সম্পর্কে উৎসাহী করে তুলবেন।

বেনেডিকট্ রেকর্ডে নজরুলের গান শোনালেন। বললেন, "স্বার্থপরতাই বলুন, সঙ্কীর্ণতাই বলুন—বাঙালির একটা নিজস্ব কালচার আছে। সেটা অন্যের থেকে উৎকৃষ্ট বলছি না, কিন্তু কিছুটা স্বতন্ত্র। তাকে সম্পূর্ণ পদ্মায় বিসর্জন দিয়ে অন্য কালচার গ্রহণ করা বাঙালির পক্ষে বেশ কঠিন হয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয়, অন্যের কালচারের প্রতি, অন্যের ভাষার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নেই। আমরা আমাদের ভাষাকে ভালবাসি, কিন্তু অন্য ভাষাকে 'হঠাৎ' বলি না, অন্য ভাষার গায়ে আলকাতরাও লেপে দিতে পারি না।"

বেনেডিকট্ বললেন, "অথচ দেখুন, বাংলা সাহিত্যের যা সেরা তা পৃথিবীকে আমরা উপহার দিতে পারছি না। দুনিয়ার যদু-মধু লেখকদের কবিতার বই ইংরিজীতে অনূদিত হয়ে বিদেশের দোকানে শোভা পাচ্ছে—আর আমরা রবীন্দ্রনাথকেও প্রচার করতে পারলাম না। কত বাঘা-বাঘা সাহিত্যের অধ্যাপকদের সঙ্গে এদেশে দেখা হয়। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের নামও শোনেননি। অকৃতজ্ঞ আমরা মাথা ঘামাচ্ছি রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে তাঁর পাসপোর্টের রং কী হতো! আমরা ভুলে যাই পৃথিবীর সব ভাল জিনিসে সব মানুষের সমান অধিকার।"

বেনেডিকট্ বললেন, "বাংলার সাহিত্য, বাংলার গান কখনও নীচতাকে প্রশ্রয় দেয়নি, গৃহবাসীকে বাংলার কবি সর্বদা দ্বার খুলতেই বলেছে, বন্ধ করতে নয়। ছেলেমানুষী হয়তো, কিন্তু আমার কি ইচ্ছে হয় জানেন? দুনিয়ার লোককে ডেকে বলি—আমরা একেবারে ভিখিরী নই, আমাদেরও কিছু দেবার আছে। কিন্তু পারি কই?"

সেদিন আরও কয়েকজন পাকিস্তানী ও ভারতীয় যুবক-যুবতী উপস্থিত ছিলেন। প্রতিটি কথার মধ্য দিয়ে বিচক্ষণ, সংযতভাষী বেনেডিকট্ আমাদের সকলের হৃদয় জয় করেছিলেন। বেনেডিকট্ বলেছিলেন, "অনেকে মনে করেন, দেশবিভাগই আমাদের কাল হলো। দেশবিভাগটা দুঃখের কারণ, কিন্তু তার জন্যে সব কিছু গোল্লায় ঠেলে দেবার প্রয়োজন নেই। হাঁড়ি আলাদা হয়েছে বলে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হবে কেন? পুবের বাগান এবং পশ্চিমের বাগানে সাহিত্যের নতুন ফল ফলুক, হাটে গিয়ে আমরা দু'রকম ফলই মায়ের জন্যে নিয়ে আসবো।"

কথাবার্তার মধ্য দিয়ে রাত্রি যে বেশ এগিয়ে গিয়েছে খেয়াল ছিল না। হঠাৎ ঘড়িতে নজর পড়তেই বললাম, "কাল না আপনার পরীক্ষা?"

আমরা এবার উঠে পড়লাম। বেনেডিকট্ বললেন,, "বাংলার লেখকদের

ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। দুই বাংলায় অগণিত মানুষের মনে আজও আপনাদের অবাধ গতিবিধি। আপনারা মানুষের মনকে উন্নত করুন, তাদের আশা দিন, তাদের বলুন—জয় হবে, জয় হবে।”

বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমরা রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি। বেনেডিকট্ আমাদের গাড়ির মধ্যে তুলে দিলেন। গাড়ি স্টার্ট করতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ থামতে বলে বেনেডিকট্ দ্রুত বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন। একটু পরেই ফিরে এলেন তিনি। হাতে একটা মাদুরের আসন। গাড়ির মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে বেনেডিকট্ বললেন, “আপনাকে দেওয়ার মতো কিছুই নেই। দেশ থেকে আসবার সময় মাদুরের এই আসনটা নিয়ে এসেছিলাম—এর উপরে পূর্ববঙ্গের গ্রামের একটা ছবি আঁকা আছে। এইটাই দেওয়াল থেকে খুলে এনে আপনাকে দিলাম। যখন আপনি দেশে ফিরে যাবেন কলকাতায় নিজের টেবিলে বসে যখন আবার আপনি বাংলায় লিখতে বসবেন তখন এই সামান্য স্মৃতিচিহ্নটুকু যেন সীমান্তের অপর পারে আর-এক রূপসী বাংলার কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সেদেশের বাঙালিরা এখন হয়তো আপনার বই পড়ে না, কিন্তু একদিন তারা পড়বে। আপনার লেখাও যেন সেই সম্ভাবনার পথকে প্রশস্ত করে দেয়।”

আমাদের গাড়ি চলতে আরম্ভ করলো। প্রায়ান্ধকারে সজল চোখে বেনেডিকট্ ও তাঁর বন্ধুরা আমার উদ্দেশে হাত নাড়তে লাগলেন। আর নিরুত্তর আমি মাথা নিচু করে রইলাম।

চ্যাপেল হিল

গ্রে হাউন্ড বাস থেকে চ্যাপেল হিল-এর মাটিতে নেমে প্রথমেই যাঁর কথা মনে পড়ে গেলো তাঁর নাম লুইস কার্নাহান।

মাত্র তিন দিন আগে মার্কিন দেশের রাজধানী ওয়াশিংটনে কার্নাহান সাহেবের ঘরে বসে আলাপ হচ্ছিল। তিনি কাউন্সিল অন লিডারস অ্যান্ড স্পেশালিস্ট-এর প্রোগ্রাম অফিসার। মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগের নিমন্ত্রণে আমরিকায় দু'মাস কাটাবার জন্যে এখানে হাজির হয়েছি। ভার্জিনিয়া অ্যাভিনিউ-এ ওঁদের নিজস্ব দপ্তরে প্রাথমিক অতিথি সৎকারের পর স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধি বললেন, “আপনাকে এবার আমরা আঠারো স্ট্রীটের ৮১৮ নম্বর বাড়িতে পৌঁছে দেব। সেখানে মিস্টার লুইস কার্নাহান আমাদের পক্ষ থেকে আপনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।”

লুইস কার্নাহান বিরাট এক লম্বা-চওড়া পঞ্চাশোত্তর আমেরিকান।

সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপার থেকে লম্বা হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে তিনি আমায় করমর্দন করলেন। মার্কিন দেশে আমাকে যথাবিহিত স্বাগত জানালেন, তারপর পররাষ্ট্র বিভাগের যুবতী অফিসারটিকে দেখিয়ে বললেন, "মিস স্লেটার এখন দায়মুক্ত হলেন, এবার আমাদের কাজ শুরু হলো। একটি ব্যাপার ছাড়া, আর সব বিষয়ে আপনার সুবিধা-অসুবিধার কথা আমাদের কাছে নিবেদন করতে হবে। "মিঃ কার্নাহান ও মিস স্লেটারের মুখে অর্থপূর্ণ হাসি ছড়িয়ে পড়লো।

মফঃস্বল ও কলকাতার আইন-আদালতে একসময়ে অনেক ঘোরাঘুরি করেছি আমি। চাপাহাসি দেখলেই আমার সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাই গম্ভীরভাবে বললাম, "ভদ্রমহোদয়, যে-ব্যাপারটি সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে না, তার ওপর কিছু আলোকপাত করুন।"

লুইস কার্নাহান আমাকে আশ্বস্ত করলেন। ওই বিষয়টি হলো আমি এবং এই কাউন্সিল। আমাদের বিরুদ্ধে যদি আপনার কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি স্টেট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।"

সুরসিকা মিস স্লেটার বললেন, 'হরে রাম'-এর মত দুটি শব্দ আগামী দু'মাস স্মরণ রাখবেন—লুইস কার্নাহান।" হরে রাম শব্দ দুটি হিপিদের কল্যাণে আমেরিকায় বেশ চালু হয়ে গিয়েছে। কোনোদিন না ওয়েবস্টারের অভিধানে জায়গা হয়ে যায়।"

কার্নাহান এবার মিস স্লেটারকে বললেন, "এই প্রশস্তির পর আপনার মনোরঞ্জন না করলে মহাপাতক কৃত হবে।" কার্নাহান তাঁর তরুণী সেক্রেটারীর খবর বললেন এবং মিস আইলীন ঘরে ঢুকতেই তিন কাপ কফির অনুরোধ জানালেন।

একটু পরে স্বয়ং মিস আইলীনই যখন হাসিমুখে তিন কাপ কফি এনে আমাদের সামনে রাখলেন তখন বেশ চিন্তায় পড়ে গেলাম। স্বদেশে অনেক অফিসে যাতায়াত আছে, কিন্তু বেয়ারা ছাড়া আর কাউকে চা আনতে বলার পরিণাম কী হতে পারে তাই কল্পনা করছিলাম।

অভিজ্ঞ কার্নাহান বোধহয় লোকের মনের কথা সহজেই বুঝতে পারেন। আমার দিকে কফির কাপ এগিয়ে দিয়ে বললেন "এইটাই বোধহয় আপনার প্রথম বিদেশ-ভ্রমণ। তাই আপনাদের দেশের সঙ্গে পার্থক্য নজরে পড়বে। আমাদের এখানে টাইপিস্ট বালিকাদের অনেক কাজের মধ্যে একটি কাজ হলো—কর্মকর্তা এবং তাঁর অভ্যাগতদের জন্যে কফি প্রস্তুতকরণ ও বিতরণ!"

ব্যাপারটা আমার ঔৎসুক্য জাগাচ্ছিল। কিন্তু প্রতি সেকেন্ড সময়ের কড়াক্রান্তি হিসেব রেখে চলেন পশ্চিমদেশের লোকেরা। সুতরাং কার্নাহানকে তাঁর প্রসঙ্গ উত্থাপনের সুযোগ দিলাম। এবং তিনি কাজের কথা শুরু করলেন—"কাউন্সিল

অন লিডারস অ্যান্ড স্পেশালিস্ট-এর সঙ্গে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের সম্পর্কটা কী তা আপনাকে বুঝিয়ে বলা উচিত।"

তিরিশ বছরের অভিজ্ঞ অধ্যাপকের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে প্রথম লেকচারের মত কার্নাহান স্বচ্ছন্দে বলতে শুরু করলেন, "আমাদের নাম কাউন্সিল অন লিডারস স্পেশালিস্ট থেকেই বুঝেছেন এটি একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। নিজেদের দেশে বিভিন্ন বিষয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন এমন অনেক বিশিষ্ট পুরুষ ও নারী প্রতিবছর মার্কিন দেশ ভ্রমণে আসছেন। তাঁরা কোথায় যাবেন, কার সঙ্গে দেখা করবেন, কোথায় কতদিন থাকবেন এইসব সময়মত ঠিক করে দেওয়ার কাজে আমরা স্পেশালিস্ট। এই ব্যবসায়ে আমরা লাভের লোভে ভুগি না, রোজগার থেকে খরচ চলে গেলেই আমরা সন্তুষ্ট। মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগও তাঁদের নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আমাদের হাতে তুলে দেন—কিছু ফি-এর পরিবর্তে আমরা তাঁদের দায়িত্ব লাঘব করি।"

স্টেট ডিপার্টমেন্টের অফিসার মিস স্লেটার হাসতে হাসতে বললেন "কাজটা, যতটা সোজা মনে হয়, তার থেকে ঢের শক্ত। এই এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা যাঁদের এখানে পাঠিয়েছি তাঁদের মধ্যে রয়েছেন—আফ্রিকার একটি শহরের মেয়র, ইনি ইংরিজী জানেন না ; দক্ষিণ আমেরিকার মহিলাদের ফ্যাশন সংক্রান্ত তিনটি পত্রিকার সম্পাদিকা; একজন গ্রীক ভাস্কর, যিনি ইংরিজী জানেন না বললেই চলে, সাইপ্রাসের উদীয়মান এক নাট্য বিশারদ ; ভারতবর্ষের খাদ্যগবেষণা বিভাগের জনৈক বৈজ্ঞানিক যিনি নিজে মাছ-মাংস স্পর্শ করেন না ; আর একটি এশীয় রাজ্যের জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের নেত্রী, যিনি শুয়োর খান না!"

কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে লুইস কার্নাহান বললেন, "বুঝতেই পারছেন, লেখক, খাদ্যগবেষক এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ-প্রচারবিদের দ্রষ্টব্যস্থল এক হতে পারে না। আমাদের কাজটা তাই দরজির মত—প্রত্যেকটি লোকের আলাদা-আলাদা মাপ নিয়ে, তাঁদের রুচি ও প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ভ্রমণ-সূচী সেলাই করতে হয়। ভাল দরজির দোকানের মত এখানেও ফাইনাল সেলাই-এর আগে ট্রায়ালের ব্যবস্থা আছে।"

কার্নাহান বলেছিলেন, "সাহিত্যিকদের ভ্রমণ-সূচী রচনা করতে ভাল লাগে—কারণ তাঁদের আগ্রহের পরিধি খুব 'চওড়া'। মাতৃজঠরে জীবনের উৎপত্তি থেকে শুরু করে গোরস্থানে জড়দেহের নিষ্পত্তি পর্যন্ত সর্ববিষয়ে কৌতূহলী হবার লাইসেন্স আপনাদের রয়েছে।"

কার্নাহানের সঙ্গে এর পর কয়েকদিন ধরে সুদীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। কার্নাহানের মতে এই আলোচনা খুবই প্রয়োজনীয়। "মাত্র দু'মাসের জন্যে এই

বিরাট দেশে এসেছেন।—সুতরাং আপনার যা-যা দেখার ইচ্ছে তা যেন বাদ না যায়। মনে রাখবেন, ভ্রমণের ব্যাপারে আপনি সম্পূর্ণ স্বাধীন, আমরা শুধু আপনাকে সাহায্য করবার জন্যে রয়েছি। যদি আপনার ইচ্ছে হয় ওয়াশিংটনের পার্কে বসে দু'মাস আপনি কেবল পাতাঝরা দেখবেন আমাদের তাতে আপত্তি নেই। আবার যদি ভাবেন ষাট দিনে অন্ততঃ ষাটটা জায়গা চষে বেড়াবেন আমরা তার ব্যবস্থাও করে দেবো।"

আমার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে কার্নাহান অভিজ্ঞ ডাক্তারের মত আমার মনের ইচ্ছাগুলো নোট-বইতে টুকতে লাগলেন। বললেন, "বড়ো বড়ো লেখকদের সঙ্গে নিশ্চয় আলাপ করতে চান?"

বললাম, 'আপনারা না-চাইলে আমার তেমন ইচ্ছে নেই। লেখকদের সঙ্গে পরিচিত হবার শ্রেষ্ঠ উপায় তাঁদের লেখা বই পড়া ; সাহিত্যসমালোচক ও জীবনীকাররা তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে কাঁচামাল যোগাড় করতে পারেন, আমার কাছে সাধারণ মানুষ দেখার সুযোগটা আরও মূল্যবান। পণ্ডিতদের গ্রন্থাগারে বসে পাত্রাধারে তৈল না তৈলাধারে পাত্র বিচার করে ষাট দিন নষ্ট করতে চাই না।"

হেসে উঠলেন কার্নাহান। আমাকে নির্দ্বিধায় মনের ভাব প্রকাশ করতে উৎসাহ দিয়ে তিনি জানালেন, এই চেয়ারে বসে এর থেকে অনেক বেশী অবুঝ অতিথির সৎকার করেছেন তিনি।

কার্নাহান বললেন, "যত ইচ্ছে সময় নিয়ে চিন্তা করুন।" হাতের কাছের টেলিফোন দেখিয়ে বললেন, "বেল-টেলিফোন কোম্পানির কল্যাণে এই মুহূর্তে এখানে বসে বসে ডায়াল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি যে-কোনো মার্কিনীর সঙ্গে কথা বলতে পারি! কুড়ি কোটি লোকের জন্যে এই দেশে দশ কোটি টেলিফোন বসানো হয়েছে।"

আমাদের দেশেও টেলিফোন নামক বস্তু রয়েছে এবং এই যন্ত্রের কেরামতি ততখানি সে সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে, তাই মনে মনে হাসছিলাম। কিন্তু কার্নাহানের কাছে ধরা পড়ে গেলাম। তিনি বললেন, "একটা পরীক্ষা করা যাক না। আমেরিকার যে-কোনো জায়গায় কেউ আপনার পরিচিত থাকলে তাঁর নম্বর দিন।"

বললাম, "আমার এক কলেজের সহপাঠি বন্ধু আছেন—তাঁর ঠিকানা জানি, কিন্তু ফোন-নম্বর জানি না।"

"ঠিকানাই বলুন, এখুনি ফোন-নম্বর বার করে নিচ্ছি।"

"আমরা বসে রয়েছি ওয়াশিংটনে, কিন্তু তিনি থাকেন সানফ্রানসিসকোতে।"

কার্নাহান আশ্বাস দিয়ে বললেন, "তাতে কি হয়েছে? মাত্র তিন হাজার

মাইলের তফাত।”

নামের দিকে তাকিয়ে কার্নাহান বললেন, “ইনি কি সেই বিখ্যাত সেতারবাদক নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়?”

বললাম, “আজ্ঞে হ্যাঁ।”

একটা নম্বর ডায়াল করে কার্নাহান নিখিলের ফোন-নম্বর বার করে নিলেন। তারপর আবার ডায়াল করলেন। ফোনটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, “এই নিন আপনার বন্ধুর নম্বর—শুধু মনে রাখবেন, আমাদের এখানে সকাল এগারটা হলেও ওখানে সবে ন'টা বাজলো।”

মুহূর্তের মধ্যে তিনহাজার মাইল দূরের কণ্ঠস্বর শুনে সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম। তবে কপাল খারাপ, নিখিলকে পাওয়া গেলো না। অনেকগুলো প্রোগ্রামের দায়িত্ব নিয়ে সে ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের বাইরে ঘুরছে।

কার্নাহান বললেন, “মন খারাপ করবেন না। আমেরিকার কোথাও না কোথাও আপনাদের দুই বন্ধুর প্রোগ্রাম একসঙ্গে পড়ে যাবে, তখন দুজনে জমিয়ে গল্প করতে পারবেন।”

এবার বিরাট একটা ম্যাপের সামনে এসে দাঁড়ালেন লুইস কার্নাহান। একটু নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন, “এই আমাদের দেশ—এর সর্বত্র আপনার অবাধ গতিবিধি। জলপথে, স্থলপথে, অন্তরীক্ষে যে-ভাবে খুশী কোথায় যাবেন বলুন?”

যে-সব নাম ছোটবেলা থেকে বার বার শুনেছি, সেগুলো এবার হুড়হুড় করে বলে যেতে লাগলাম : নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, পিট্‌সবার্গ, বোস্টন, বাল্টিমোর, শিকাগো, ডেট্রয়েট, মিনিয়াপলিস, ওকলাহামা, ডালাস্, লস্ এঞ্জেলস্, লা ভেগা, সানফ্রানসিসকো, মিয়ামি, হনলুলু।

কার্নাহান ধৈর্যের সঙ্গে আমার লিস্টি শুনলেন ; বললেন, “যতদূর বুঝছি, নাগরিক জীবনেই আপনার আগ্রহ।”

বললাম, “আমার জন্ম শহরে না হলেও আমি শহরে পালিত, শহরে বর্ধিত এবং সব ঠিক মত গেলে শহরে মৃত হব। তাছাড়া আমেরিকা বলতে শুধু আমি নই, আমার পাড়ার বন্ধুবান্ধবদের সকলের চোখের সামনে ভেসে ওঠে নিউইয়র্কের এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং, শিকাগোর ঐশ্বর্য, লস এঞ্জেলসের হলিউড। সুতরাং বুঝতেই পারছেন...”

কার্নাহান দ্বিরুক্তি করলেন না। শুধু বললেন, “আমার কাছে এই নামগুলো সবচেয়ে প্রিয় নয়। সুন্দর আমেরিকা বলতে আমার চোখে অন্য অনেকগুলো জায়গার ছবি ভেসে ওঠে।”

প্রোগ্রাম নিয়ে কার্নাহানের সঙ্গে আমার অনেক দরাদরি হয়েছিল। কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা, বড়ো বড়ো শহরেই আমি চৌদ্দ আনা সময় ব্যয় করতে চাই ;

দরাদরিতে ইন্ডিয়া যে পৃথিবীর সব দেশের ওপর, একথা এক বিরক্ত জাপানী ভদ্রলোকের মুখে শুনেছিলাম। সুযোগ বুঝে কার্নাহানকে তা জানিয়ে দিলাম, যাতে তাঁর নার্ভ দুর্বল হয়ে পড়ে।

অগত্যা আমার ইচ্ছে অনুযায়ী প্রোগ্রাম তৈরি হলো। আসার সময় আটলান্টিক পেরিয়ে নিউ ইয়র্কে মার্কিন মাটি স্পর্শ করেছিলাম। সেখানে কোনো সময় নষ্ট না করে পরের প্লেনে ওয়াশিংটনে হাজির হয়েছিলাম। আবার নিউইয়র্কে ফিরবো। সেখান থেকেই শুরু হবে আমার দেশ-দর্শন এবং আস্তে আস্তে ভাসতে ভাসতে পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্তে চলে যাবো যেখানে প্রশান্ত মহাসাগরের অশান্ত জলরাশি সানফ্রানসিসকোর তীরভূমির ওপর বারংবার আছড়ে পড়ে অনন্তকাল ধরে নিজের বিরক্তি প্রকাশ করছে। সানফ্রানসিসকো থেকে আরও উত্তরে সীয়াটল—যেখানে বোয়িং কোম্পানির বিমান তৈরি হয়। তারপর হাওয়াই। সেখানে মার্কিন দেশ-ভ্রমণের সমাপ্তি।

কার্নাহান এবার বললেন, "নিউইয়র্কে যাচ্ছেন যান, তবে আমার অনুরোধ যাবার পথে ছোট একটা জায়গায় দু'একদিনের জন্যে থামুন।" হাসতে হাসতে কার্নাহান বলেছিলেন, "আমাকে বিশ্বাস করুন, ঠকতে হবে না। চ্যাপেল হিল আপনার যাবার পথেই পড়বে।"

অগত্যা রাজী হয়েছিলাম এবং একদিন বিকেলে ওয়াশিংটনের গ্রে-হাউন্ড বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে চ্যাপেল হিল-এর বাসে চড়ে বসেছিলাম।

॥ ২ ॥

গ্রে-হাউন্ড কোম্পানির চ্যাপেল হিল-গামী বাস বিকেলে ছাড়ে। বাস-স্ট্যান্ডে আমাকে তুলে দিতে এসেছিলেন ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীধীরেন ঘোষ। ঢেকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে, আর আমাদের এক বন্ধুর (সহজবোধ্য কারণে তিনি নাম প্রকাশে রাজী নন) বন্ধু শ্রীধীরেন ঘোষ সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে ওয়াশিংটনে এসেও বঙ্গসেবা ও বন্ধুকৃত্য করছেন। কলকাতার বন্ধুটিও ভরসা পেয়ে দরাজ হাতে স্লিপ কেটে যাচ্ছেন। এঁর জানা-শোনা লোক প্রায়ই ওয়াশিংটনে গিয়ে ধীরেন ঘোষকে ফোন করেন।

ধীরেনবাবুর উৎসাহে এবং শ্রীমতী ঘোষের প্রশ্রয়ে ওয়াশিংটন ডি-সির ঘোষনিবাস একটি বেঙ্গলী ট্রানজিট ক্যাম্পে পরিণত হয়েছে। খাওয়া-দাওয়া আদর-আপ্যায়ন ছাড়াও একটি শোফার-চালিত ফোকসওয়াগন পাওয়া যায়। শোফার স্বয়ং ধীরেন ঘোষ, যিনি শুধু এয়ারপোর্ট বা হোটেল থেকে আপনাকে বাড়িতে নিয়ে আসবেন তা নয়, আবার রাত্রে (সে যদি রাত তিনটেও হয়) স্বস্থানে

ফিরিয়ে দিয়ে যাবেন। তবে অতিথি রাত্রে থেকে গেলে উভয়ে আরও খুশী হন—কারণ মার্কিন দেশের হাড়-ভাঙ্গা খাটুনির পরও গাঁওকা আদমির সঙ্গে গল্প-গুজবে বিনিদ্র রজনী যাপন করতে এঁরা রীতিমত পটু।

ধীরেন ঘোষ তাঁর যথাবিহিত সেবাযত্ন পর্বের শেষ অধ্যায়ে আমাকে 'সী অফ' করার জন্যে (ওঁর ভাষায় অতিথিকে সমুদ্রে ফেলে দিতে) বাস-স্ট্যান্ড পর্যন্ত এসেছিলেন। কলকাতার রেজিস্টার্ড নাগরিকের বাস সম্বন্ধে কী ধারণা তা একদা কলকাতাবাসী ধীরেন ভালভাবেই জানেন—তাই বললেন, "এ-বাস সে বাস নয়।"

"অর্থাৎ?" আমি প্রশ্ন করি।

"একদিকে এরোপ্লেন অন্যদিকে মোটরগাড়ির সঙ্গে লড়ে বাস কোম্পানিকে বেঁচে থাকতে হয়। রেল কোম্পানি তো অনেক আগেই এদের কাছে হেরে গিয়েছে! মার্কিনী বাসব্যবস্থা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ইচ্ছে করলে নিউইয়র্ক থেকে বাসে কয়েক হাজার মাইল পেরিয়ে সানফ্রানসিসকো বা লস এঞ্জেলস্-এ যাওয়া যায়। নিউ ইয়র্ক থেকে সানফ্রানসিসকোর বিমান-দূরত্ব সাড়ে ছ'ঘণ্টা, আর বাস দূরত্ব ৭৮ ঘণ্টা। বাসে রাত্রে ঘুমোতে পারেন। আর অবিশ্বাস্য এদের সময়জ্ঞান। বাস আসার সময় যদি দেখেন বাস আসেনি, তাহলে বুঝতে হবে আপনার ঘড়ির মেরামতের সময় হয়েছে।"

ধীরেন ঘোষের কথায় নিজের ঘড়ির দিকে তাকালাম। বিরাট বাস-অফিস—আমাদের বড়ো রেলওয়ে স্টেশনের মত।

ধীরেন বললেন, "এই ক'শো মাইল পথ আপনাকে কয়েক ঘণ্টায় নিয়ে যাবে। দেখবেন এখানকার পথ-ঘাট। গাড়ির জন্যে পথ তৈরি হয়েছে এদেশে, গাড়িঘোড়ার জন্যে নয়!"

সময় হয়ে আসছিল। টিকিট দেখিয়ে গাড়ির তলপেটে মালপত্র জমা রেখে সীটে এসে বসলাম। ড্রাইভারের মাথার ওপর দেখলাম একটা প্লেট ঢোকানো রয়েছে। লেখা আপনাদের দেখাশোনা করবেন হিউ রবিনসন।" এদেশে এইটাই রীতি—দূরপাল্লার গাড়িতে ড্রাইভারের নাম লেখা থাকে ; এবং তিনি একাধারে ড্রাইভার, কনডাক্টার এবং গ্রে-হাউন্ড কোম্পানির জনসম্পর্ক-অধিকর্তা।

গাড়ি ছাড়বার আগেই যাত্রীদের কাছ থেকে টিকিটের কাউন্টারফয়েল সংগ্রহ করতে লাগলেন হিউ রবিনসন। আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে হিউ জিজ্ঞেস করলেন, 'ইন্ডিয়া?" বললাম, "ঠিক ধরেছেন?" হিউ এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছাড়লেন, 'হিন্দি আর পাকিস্তান?" বুঝলাম, ওঁর ধারণা—হিন্দি আর পাকিস্তান এই দু'দেশ নিয়ে ইন্ডিয়া।

হিউ রবিনসন আমাকে আপ্যায়ন করে ড্রাইভারের ঠিক পিছনের সীটে

জানালার ধারে বসতে দিলেন। বললেন, 'তুমি চিন্তা কোরো না। চ্যাপেল হিল এখনও অনেক দূরে। তোমাকে ঠিক জায়গায় নামিয়ে দেওয়া হবে। তবে আমি অতদূর যাবো না, আমার ডিউটি তার আগেই শেষ হয়ে যাবে।"

গাড়ি চলতে আরম্ভ করলো।

সেপ্টেম্বরের শেষে গাছের পাতায় রঙের আগুন লেগেছে—মার্কিনী নাম 'ফল'। ঝরার আগে গাছের পাতা রং বদলায় নেশায় মেতে ওঠে, সে এক অপরূপ দৃশ্য! বাসের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম, রাস্তার দু'ধারে ঘন অরণ্য রঙের নেশায় মাতাল হয়ে উঠেছে। শরৎকালের প্রকৃতি বসন্তের হোলিখেলায় নেমেছে. নয়নাভিরাম রঙের দেশ ভারতবর্ষ—বেশ কয়েকজন বিদেশী যাত্রীর কাছে শুনেছি, এতো 'কালারফুল' সাধারণ মানুষ পৃথিবীতে কম আছে। কিন্তু মার্কিনী অরণ্যে রঙের রায়ট ভারতবর্ষে প্রতিপালিত আমার চোখ দুটোকেও অবাক করে দিলো।

এখানকার ধনীদের মত এখানকার প্রকৃতিও রঙের কোটিপতি! না হলে কেউ এমন বেহিসেবী রঙের খেলায় নামতে পারে? তবে এই খামখেয়ালী বেহিসেবীপনার মধ্যেও এমন সৌন্দর্য রয়েছে যা অরসিকের হৃদয়েও ঝঙ্কার তোলে, দৃষ্টিতে গঁদের আঠা লাগিয়ে দেয়। ফলে, চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

হাওড়া পৌরসভার রেজিস্টার্ড নাগরিক মনকে একটু বকুনি দিলাম—তুমি গরীব দেশের গরীব লেখক, সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ নিয়ে তোমাকে ব্যস্ত থাকতে হবে—তোমার আবার এই প্রকৃতি-প্রেমের বড়মানুষী কেন?

কিন্তু ফল হলো না। পৃথিবীর বিরাট এক প্রেক্ষাগারে বসবাসের দুর্লভ সুযোগ পেয়েছি আমি—প্রকৃতির নিজস্ব রঙিন চলচ্চিত্র অদৃশ্য এক প্রোজেক্টর থেকে আমার চোখের সামনে প্রতিফলিত হচ্ছে।

হিউ রবিনসন স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে মাইকের সামনে গোঙানির মত শব্দ করে কি যেন বললেন। বুঝলাম, সামনের স্টপেজের নাম। যেমন কলকাতায় আমাদের সর্দারজী কনডাক্টর চিৎকার করেন—হর্সন রোড, হর্সন রোড। যেমন বার্মিংহামে সর্দারজী কনডাক্টরের মুখে শুনেছিলাম, 'ফারপিজ, ফারপিজ'। আন্দাজ করেছিলাম, 'ফারপোজ, ফারপোজ।' এখানে তাহলে বাসেও ফারপোর পাঁউরুটি বিক্রি হয় ভাবছিলাম। তখন সহযাত্রী উদ্ধার করলেন। বললেন—'ভাড়া দাও, ফেয়ার প্লিজ।' দেশে দেশে বাস-ড্রাইভার ও কন্ডাক্টরদের উচ্চারণ নিয়ে ইউনেসকো যদি কোনো প্রামাণিক গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য উদ্‌ঘাটিত হবে।

এক জায়গায় দেখলাম বাসের গতি কমে আসছে। সামনে রাস্তা জুড়ে বিরাট

এক গেট। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম, "এটা কী ব্যাপার?" হিউ রবিনসন বললেন, "এখানে রাস্তা ভাড়া দিতে হবে।"

রাস্তা-ভাড়া! জিনিসটা আমার মাথায় ঢুকছিল না।

হিউ বললেন, "কোনো কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান গাঁটের পয়সা খরচ করে এই রাস্তা তৈরি করেছে—এখন ভাড়া আদায় হচ্ছে। এই নতুন রাস্তায় আমাদের সময় বাঁচছে, পেট্রোল সাশ্রয় হচ্ছে, সুতরাং পয়সা দিতে আপত্তি কি?"

হিউ জানতে চাইলেন, "তোমাদের দেশে বুঝি রাস্তার ভাড়া লাগে না?"

বললাম, "দু-এক জায়গায় পুল পেরোবার জন্যে টিকিট কাটতে হয়, কিন্তু রাস্তা তৈরি করে ভাড়া দেবার বুদ্ধিটা এখনও আমাদের দেশে ব্যবসায়ীদের মাথায় ঢোকেনি!"

হিউ বললেন, মতলবটা এখান থেকে নিয়ে যাও। তোমাদের দেশে ঠিকমত চালু করতে পারলে মিলিয়নেয়ার হয়ে যাবে।"

প্রায় একঘণ্টা চলার পর বাস থামলো। বোতাম টিপে হিউ রবিনসন বাসের অটোমেটিক দরজা খুলে দিলেন। কিছু যাত্রী নামলেন, দু-একজন মাত্র উঠলেন। বাস এখনও প্রায় খালি বললেই চলে। এক কাপ কফি খেয়ে হিউ নিজের সীটে ফিরে এলেন এবং বোতাম টিপে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর গর্জন করে এয়ার-কন্ডিশনড্ বাস আবার যাত্রা শুরু করলো। পথে আবার প্রকৃতির রঙের মেলা শুরু হলো। মাইলের পর মাইল শুধু রঙ আর রঙ—এর যেন শেষ নেই।

পরের স্টপেজে ড্রাইভার বদল হলো। নিজের নেম-প্লেটটা যথাস্থানে ঢুকিয়ে দিয়ে বাসের ভিতরটা তদারক করে নিয়ে নিজের সীটে গিয়ে বসলেন নতুন ড্রাইভার জর্জ রাদারফোর্ড।

জর্জ রাদারফোর্ডের বয়স হয়েছে। ছোটখাট হাসিখুশী মানুষটি। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "মাই ইয়ং ফ্রেন্ড, তোমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো? তুমিই তো ইন্ডিয়া থেকে আসছো—আমার সহকর্মী বলে গেলো তোমার দেখা-শোনা করতে।"

অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, "আমাকে তরুণ বলায় পুলকিত বোধ করছি। কিন্তু উত্তর-তিরিশে খোকা সেজে থাকলে তরুণরা বিরক্ত বোধ করতে পারেন।"

"কাম অন! পঞ্চাশ বছর না হওয়া পর্যন্ত সবাই যুবক। ডোন্ট ফরগেট, তুমি এখন ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকায় রয়েছে।" জর্জ বেশ আমুদে গলায় এবং মাত্র একটি হুকুমে আমার যৌবন ফিরিয়ে দিলেন।

জর্জ যে ধরনের মানুষ তাতে একটু গল্প-গুজব করা চলবে মনে হলো। জিজ্ঞেস করলাম, "রাদারফোর্ড নামে যে বৈজ্ঞানিক বিশ্ববিখ্যাত, তাঁর সঙ্গে তোমাদের কোনো আত্মীয়তা আছে নাকি?"

"মোটেই না। আমার ঠাকুর্দা কোন্ কালে বিলেত থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। লেখাপড়ার সঙ্গে তিনপুরুষ আমাদের সম্পর্ক নেই! ঠাকুর্দা ছিলেন রেলরোডে। বাবা ছিলেন রেল ইঞ্জিন ড্রাইভার, আমি হয়েছি বাস ড্রাইভার, ইউ উইল বি গ্ল্যাড টু নো আমার ছেলে পাইলট। আমার নাতিকে স্কুলমাস্টার করার ইচ্ছে। তা যদি সম্ভব হয়, তাহলে আমার ছেলের নাতি হয়তো কলেজপ্রফেসর হবে। তখন বৈজ্ঞানিক রাদারফোর্ডদের সঙ্গে কোনো একটা সম্পর্ক আবিষ্কার করা যাবে।" হা হা করে হেসে উঠলেন জর্জ।

বেশ দিল-খোলা লোক জর্জ। আমার একটা ভিজিটিং কার্ড দিলাম ওঁকে। জর্জ প্রশ্ন করলেন, 'তোমাকে সবাই কি বলে ডাকে?"

উত্তর পেয়ে বললেন, "তাহলে আমিও তোমাকে শংকর বলে ডাকবো, আর তুমি আমাকে জেরি বলো।"

জানালাম, "মিঃ রাদারফোর্ড একটু মুশকিল আছে। আমরা আমাদের বাবার বয়সী লোককে নাম ধরে ডাকি না।"

বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন রাদারফোর্ড। গাড়ি তখন ৬৫ মাইল বেগে ফ্রিওয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে। নিপুণ হাত দুটো স্টিয়ারিংয়ে রেখে পথের দিকে তাকাতে তাকাতে ড্রাইভার বললেন, "ভারি ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তো। আমার এক ভাই যুদ্ধের সময় ইন্ডিয়াতে ছিল। সে বলেছিল বটে, সিনিয়র লোকেদের ইন্ডিয়াতে যে সম্মান করা হয়, এমন কোথাও করা হয় না।" বললাম, "পৃথিবীতে অন্য জায়গার খবর জানি না, তবে নানা পরিবর্তনের মধ্যেও আমরা এখনো গুরুজনদের প্রাপ্য সম্মান দেবার চেষ্টা করি। যদিও এই সম্মান দেওয়ার নিয়ম-কানুন আগে আরও জোরালো ছিল।"

জর্জ জানতে চাইলেন, "তোমরা তাহলে বয়োজ্যেষ্ঠদের কী বলে ডাকো?"

বললাম, "সামান্য পরিচয়েই আমরা একটা পারিবারিক সম্পর্ক পাতিয়ে নিই। বয়সে বড়ো হলে দাদা দিদি, না হলে কাকা কাকিমা মাসিমা মেসোমশায় এই রকম যা-হয় একটা বলতে হবে। আমার এক দিদি বৌবাজারে থাকেন। সে-পাড়ার গোটা পঞ্চাশেক ছেলেমেয়ে আমাকে পাইকারী হারে 'শংকরমামা' না হয় 'মামা' বলে ডাকে।"

"কি মিষ্টি বলো তো! আমাদের দেশের ছেলেদের ইন্ডিয়াতে ম্যানার শিখতে পাঠানো উচিত। আমি তো শুনলাম তুমি আমাদের সরকারের অতিথি হয়ে এদেশের পণ্ডিতদের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করতে এসেছো! যেখানেই সুযোগ পাবে ছেলে-ছোকরাদের তোমাদের দেশের এই দিকটার কথা বলো। বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করতে এই দেশ একেবারে ভুলে গিয়েছে।...যাই হোক, তুমি বরং আমাকে মিঃ ফোর্ড বলে ডাকো," জানালেন জর্জ রাদারফোর্ড।

রাস্তাটা এক জায়গায় তিন ভাগ হয়ে গিয়েছে, সেখানে একটা বাঁক নিতে নিতে মিঃ ফোর্ড বললেন, "আমার হাতের দিকে কী দেখছো? আটত্রিশ বছর ধরে গাড়ি চালাচ্ছি। প্রথমে চালাতাম ট্রাক। তারপর দেখলাম, আমার স্ত্রীর বেজায় আপত্তি। ট্রাক-ড্রাইভারদের বউদের মনে নাকি শান্তি থাকে না। ইতিমধ্যে যুদ্ধ লেগে গেলো। ওয়ারেও ট্রাক চালিয়েছি—কত দেশে গিয়েছি—কিন্তু ইন্ডিয়ায় যাওয়া হয়নি। ফিরে এসেই বাস কোম্পানিতে ঢুকেছি।"

বাঁ-হাতের সোনার ঘড়িটা এবার আমার দিকে এগিয়ে দিলেন মিঃ ফোর্ড। বললেন, "এটা পেয়েছি কোম্পানি থেকে—বিনা দুর্ঘটনায় দশ লক্ষ মাইল নিরাপদে গাড়ি চালানোর জন্যে।"

গর্বিত মিঃ ফোর্ড এবার ঘড়িটা মণিবন্ধ থেকে খুলে ফেলে আমার হাতে দিলেন—পিছনে ওঁর লেখা নাম ও কোম্পানির প্রশংসাপত্রের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ঘড়িটা সযত্নে ওঁর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, "আমার সৌভাগ্য যে আপনার মত একজন ড্রাইভারের গাড়িতে চড়তে পেয়েছি।"

মিঃ ফোর্ড বললেন, "কাঠ ছোঁও, কাঠ ছোঁও"। সবই তো ঈশ্বরের ইচ্ছা। কখন তাঁর মনে কী খেয়াল চাপবে কে জানে।"

এবার টাই থেকে একটা পিন খুলে ফেলে আমার হাতে দিলেন মিঃ ফোর্ড। আমস্টার্ডামে কাটা আসল একটা হীরা আছে এই টাই-পিনে—তিন বছর আগে পেয়েছি, কুড়ি বছর নিরাপদে গাড়ি চালানোর জন্যে। বিরাট এই কোম্পানিতে ডজন খানেকের বেশী লোক পাবে না যারা এই হীরের টাই-পিন পেয়েছে।"

আমি মিঃ ফোর্ডকে অভিনন্দন জানালাম। মিঃ ফোর্ড বললেন "আমার স্ত্রী বলেন, এমন দামী জিনিস, বাড়িতে রেখে যাও। কিন্তু এটা না পরলে আমি ডিইটি করে শান্তি পাই না। তাছাড়া ছেলে-ছোকরাদের উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন। তারা দেখুক। চেষ্টা করলে, ডিউটিতে আসবার আগে মদ না খেলে, বউ-এর সঙ্গে ঝগড়া করে মাথা গরম না করলে, স্টিয়ারিং ধরে অন্য মেয়েমানুষের কথা না ভাবলে এবং সবার ওপরে ভগবানে বিশ্বাস রাখলে তারাও একদিন এই হীরের টাইপিন পরে ঘুরে বেড়াতে পারবে।"

আমরা দু'জনে মনের সুখে গল্প করে যাচ্ছি। বাসে মাত্র আর একজন মহিলা যাত্রী। তিনি পিছন দিকের সীটে হেলে পড়ে দিবানিদ্রা উপভোগ করছেন। মিঃ ফোর্ড বললেন, "এত খালি বড়ো একটা যায় না। সব বাস বোঝাই গেলে তো গ্রে-হাউন্ড কোম্পানি সোনার বাস চালাতে পারতো। আজকে খালি হয়ে ভালই হয়েছে, তোমার সঙ্গে গল্প জমানো যাচ্ছে।"

আমি সায় দিলাম। মিঃ ফোর্ড বললেন, "বাস ড্রাইভারের জীবনে এই বন্ধুত্বটুকুই লাভ। বাস চালানো একঘেয়ে। এই রাস্তায় কোথায় ক'টা ল্যাম্প-

পোস্ট আছে, কোথায় কী গাছ আছে, তোমায় মুখস্থ বলে যেতে পারি। কিন্তু মানুষগুলো নতুন। অনেক মুখের সঙ্গে অবশ্য বার বার দেখা হয়ে যায়—কিন্তু তাদেরও ভাল লাগে।"

একটু ফিস ফিস করে মিঃ ফোর্ড বললেন, "ওই যে মহিলাযাত্রী দেখছো উনি এ-লাইনে অনেকদিনের যাত্রী। ওঁর কোমরের মাপ যখন ২২ ইঞ্চি ছিল তখন থেকে দেখছি—তারপর বিয়ে হলো, ছেলে হলো। বাড়তে বাড়তে কোমর ৩২ ইঞ্চি পেরিয়ে গেলো। দু'বছর আগে বেচারার ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে। ছেলেও ভিয়েতনামের যুদ্ধে ক'দিন আগে মারা গিয়েছে। এসব আমার জানবার কথা নয়। কিন্তু ছেলে মারা যাবার পরে সেদিন কাগজে ওঁর ছবি বেরিয়েছিল। তার থেকে জানতে পারলাম। প্রতি মঙ্গলবার ওঁকে এই বাসে দেখবে। শনিবার ওয়াশিংটনে যান, কোন্ কাজিনের সঙ্গে উইকএন্ড করতে, ফেরেন সোমবারে।"

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম মিঃ ফোর্ডের কথা। দূর প্রবাসে এই সামান্যক্ষণের মধ্যে এমন আলাপ হয়ে যেতে পারে তা বিশ্বাস হয় না।

নিজের ঘরের অনেক কথা বলতে লাগলেন মিস্টার ফোর্ড। বড়োমেয়ে বিয়ে করেনি। তার ডাইং-ক্লিনিংয়ের দোকান আছে। ভাল রোজগার করে। মেজমেয়ে নার্স, বিয়ে করেছে এক পশু-চিকিৎসককে। থাকে আইওয়া স্টেটে। মেজমেয়ে প্রতি শনিবার দূরপাল্লার ফোন করে বাবা-মার খোঁজ নেয়। সেজমেয়ে এয়ার হোস্টেস ছিল, বিয়ে করেছে এক সুইস এয়ার লাইনের চাকুরে। ছোটমেয়েকে নিয়েই চিন্তা—নিউ ইয়র্কে আই-বি-এম অফিসে লেডি সেক্রেটারি। বিয়ে হবার নাম-গন্ধ নেই।

"এই ছোট মেয়েটার জন্যেই আমি আর আমার স্ত্রী প্রায়ই ভাবি। দু'বছর এক ছোকরার সঙ্গে স্টেডি গেলো।"

"আজ্ঞে এই 'গোয়িং স্টেডি' কথাটা আরও দু'এক জায়গায় শুনলাম, ব্যাপারটা কী?"

"ওহো, তোমাদের ইন্ডিয়াতে তো চাইল্ড ম্যারেজ। টেলিভিশনে দেখেছিলাম— একটা আট বছরের মেয়ের সঙ্গে বারো বছরের ছেলের বিয়ে। 'স্টেডি' মানে, আমার মেয়ে তখন একজন মাত্র ছোকরার সঙ্গে ডেট করছে। তার মানে দুজনেরই দুজনকে মনে ধরেছে, কিন্তু তখনও বাগ্‌দান হয়নি, বা পাকাপাকি মনস্থির হয়নি।"

এরপর নিজের কনিষ্ঠ কন্যার কথা বলে যেতে লাগলেন মিঃ ফোর্ড। "দু'বছর স্টেডি যাবার পরে কী হলো জানি না। সে ছোকরা নাকি এক মাসাজ-বাথের সুইডিস মেসুয়ার সঙ্গে জমে গিয়েছে। সে যাকগে। এককথায় তো বিয়ে হয় না, হওয়া উচিতও নয়। দু'চারটে ঠোক্কর খাওয়া দরকার, তবে তো বিয়ে হত

জীবনের মর্ম বুঝবে। তা আমার মেয়ে দেখতে সুন্দরী, খুব ভাল কথাবার্তা বলতে পারে। অনেক ছোকরাই এমন মেয়ে পেলে বর্তে যাবে। কিন্তু কি যে হল মেয়ের মনে, প্রতি শনিবার আমাদের এখানে এসে হাজির হয়। ভাবো, সমর্থ কুমারী মেয়ে তোমার, যদি উইকএন্ডে ডেট না করে বাড়িতে এসে বসে থাকে, তাহলে বাবা-মার দুশ্চিন্তা হবে না?"

"আমরা তো শেষ পর্যন্ত ফন্দি করে মেয়েকে বললাম, কেটি, সামনের দুটো উইক-এন্ড আমরা একটু বেড়াতে বেরুবো। তুমি আসতে চাইলে ওয়েলকাম, আমরা নেবারের কাছে চাবি রেখে যাবো কিন্তু এতখানি কষ্ট করবে কিনা ভেবে দেখো।"

"এতে ফল হয়েছে বলে মনে হয়। কারণ মেয়ে আমার তার পরের দু'সপ্তাহ আসেনি। শনিবার ওর অ্যাপার্টমেন্টে টেলিফোন করেও আমার স্ত্রী ওকে পায়নি। তার মানে নিশ্চয় ও আবার ডেট করছে। তাছাড়া কিছুদিন আগে মাথায় ভূত চেপেছিল, পীস-কোরে যোগ দিয়ে আফ্রিকায় যাবে। এবারের চিঠিতে মাকে লিখেছে, পীস কোর-এ যোগ দেবার পরিকল্পনা এখন বাতিল।"

এই মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেলেই ঝাড়া-হাত-পা হয়ে যান মিস্টার ফোর্ড। বললেন, "রোজগার তোমাদের দশজনের শুভেচ্ছায় মন্দ করি না। মাইলেজ অ্যালাউন্স নিয়ে তা মাসে হাজার আটেক টাকা হয়। বাড়িতে দু'খানা গাড়িও আছে। থাকি রলে শহরে। স্যার ওয়াল্টার রলের নাম শুনেছ তো? ইংলন্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথ যাঁকে খুব পছন্দ করতেন। তাঁর নামেই আমাদের শহরের নাম। যদি কখনও রলেতে আসো, আমার বাড়িতে ড্রপ কোরো। আর তিন বছর পরে রিটায়ার করবো। গিন্নী ওখানকার এক মুদির দোকানে অ্যাসিস্টেন্ট—হাজার তিনেক টাকা মাস গেলে ঘরে নিয়ে আসেন। তিনিও রিটায়ার করবেন ভাবছেন। তারপর কর্তা-গিন্নী মিলে ইয়োরোপে বেড়াতে যাবো। এশিয়াতে যাবারও ইচ্ছে কিন্তু অনেক খরচ। কতদিন বাঁচতে হবে ঠিক নেই, আর ডলারের দাম যেভাবে কমছে তাতে খরচপত্রর সাবধানে করতেই হবে।"

স্টিয়ারিংয়ের ওপর অভিজ্ঞ হাত দুটো রেখে মিস্টার ফোর্ড বললেন, "দেশভ্রমণের আনন্দটা আমি বাসের বিদেশি যাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করে মিটিয়ে নিই। একবার তোমাদের দেশের এক মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। দল বেঁধে ওরা যাচ্ছিল চ্যাপেল হিল-এ, অতগুলো স্কার্টের মধ্যে একটা শাড়ি-পরা মেয়ে। আহা, যেমন চোখ, তেমন চুল, আর ঠিক তেমন ধীর শান্ত কথাবার্তা। আমার একটা ফটো নিয়েছিল, আমার ঠিকানাও চেয়ে নিয়েছিল। কত লোকই তো ফটো তোলে, ঠিকানা চায়, কিন্তু পরে কোনো উত্তর আসে না। এই মেয়েটার ভারি সুন্দর নাম—শকুন্তলা বসু। সে আমাকে শুধু ছবি পাঠায়নি—সঙ্গে একটা লর্ড

গণেশের মূর্তি পাঠিয়েছিল। ভেরি সুইট গার্ল। দেশে ফিরে গিয়েছে, কিন্তু ক্রিস্টমাসে এখনও কার্ড পাঠায়। আমি তো সেদিন একটা ছোট্ট গিফ্‌ট পাঠালাম ওকে।"

মিঃ ফোর্ডের সঙ্গে কথাবার্তায় বেশ জমে গিয়েছি। এশিয়া আফ্রিকা সম্বন্ধে ভদ্রলোক অনেক কথা বললেন। ইন্ডিয়ার দারিদ্র্য সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। "টেলিভিশনে তোমাদের দেশের দুরবস্থা দেখি। বিহারের কয়েকটা বাচ্চাছেলের কঙ্কালসার ছবি দেখে আমার স্ত্রী তো কেঁদেই ফেললেন! বড়ো নরম ওঁর মনটা। আমাদের এখানে এত রুটি, কত খাবার তো আমরা নষ্টই করি, আর তোমাদের দেশে ছোট ছোট ছেলেরা খেতে পাচ্ছে না।"

বললাম, "আপনার মত মানুষের শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ, মিস্টার ফোর্ড।"

মিঃ ফোর্ড বললেন, "আমরা সামান্য মানুষ। তবু আমার স্ত্রী বলেন, সবারই যথাসাধ্য করা উচিত। আমাদের চার্চ থেকে অনেক গুঁড়ো দুধ পাঠানো হচ্ছে তোমাদের দেশে। আমরা দুজনে ছ'মাস ধরে দশ ডলার করে দিয়ে যাচ্ছি।"

আফ্রিকা সম্বন্ধেও অনেক কথা বললেন মিঃ ফোর্ড। 'আপনি দেখছি অনেক পড়াশোনা করেন', বললাম ওঁকে।

"পড়াশোনা! ওসবের পাট অনেকদিন চুকিয়ে দিয়েছি। তবে টেলিভিশনটা মন দিয়ে দেখি। সারা পৃথিবীর খবর পাওয়া যায়। চোখের সামনে পৃথিবীর পাঁচটা মহাদেশের ছবি দেখতে পাই। আমার যতটুকু বিদ্যে এই টেলিভিশন দেখে। বিশেষ করে এডুকেশন টি-ভিটা আমার ভাল লাগে। আমার স্ত্রীর আবার অন্য চ্যানেল পছন্দ। তাই দুটো টি-ভি সেট রাখতে হয়েছে।"

সাধারণ মানুষের শিক্ষায় টেলিভিশন সত্যি কি বিপ্লব আনতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। সমস্ত পৃথিবীটাকেই প্যাকেটে পুরে প্রতিটি পরিবারের ড্রয়িংরুমে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে প্রতিদিন। খবরের কাগজে খবর পড়া, কিংবা রেডিওতে খবর শোনার সঙ্গে টি-ভিতে খবর দেখার যে কি আকাশ-পাতাল পার্থক্য, তা টি-ভি দেখার আগে কখনও কল্পনাও করতে পারিনি।

চোখের সামনে যা দেখা যায় তাই মনের মধ্যে গেঁথে যায়—অথচ কোনো চেষ্টা করতে হয় না, সুইচটা অন করে টি-ভি সেটের সামনে বসে থাকলেই হলো।

অক্ষরে পড়া বা কানে শোনার সঙ্গে চোখে দেখার তফাৎ কত নিজেই বুঝেছিলাম, যেদিন টি-ভিতে কলকাতার ছাত্র আন্দোলনের দৃশ্য দেখলাম কলকাতার নিজের বাড়িতে বসে এর আগে বহুবার কাগজে রিপোর্ট পড়েছি, দু'তিনবার দূর থেকে হৈ-হুল্লোড়ও দেখেছি, পুলিশ আসছে বুঝে দ্রুতবেগে

পালিয়েছি—কিন্তু আসল রণটা কখনও চোখে দেখিনি। পরের দিন শুধু কাগজে পড়েছি—এতগুলি ট্রাম ভস্মীভূত, পুলিশের এতো রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস ও এতো রাউন্ড গুলি চালনা, এতোজন হতাহত, এতোজন গ্রেপ্তার। কিন্তু লঙ্কাকাণ্ডটা চোখের সামনে দেখলে অন্যরকম উপলব্ধি হয়। যে-দৃশ্য কয়েকজন পুলিশ, কিছু সংখ্যক দাঙ্গাকারী এবং সামান্য কয়েকজন ডাক্তার দেখে থাকেন, আমরা দশহাজার মাইল দূরে হোটেলের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে বসে তা পুরোপুরি দেখলাম।

টি-ভিতে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে মনে হয়েছে, আমরা সবাই যদি চোখের সামনে এই ছবি দেখতাম, তাহলে এর পুনরাবৃত্তি বন্ধ করতে আমরা অনেক বেশী তৎপর হতাম। হয়তো আমার ভুল ধারণা, কিন্তু আমাকে অন্য লোকেরা কীভাবে দেখছে আমরা সে-সম্বন্ধে সচেতন থাকি না, তাই মাঝে-মাঝে আয়নায় নিজের মুখ দেখলে লাভ ছাড়া লোকসান হতে পারে না।

পরবর্তী বাস-স্টপে মিস্টার ফোর্ড আমাকে কফির দোকানে টেনে নিয়ে গেলেন। সেখানে নিজেই কফির দাম দিলেন, আমার ডায়েরিতে নিজের নাম সই করে, ব্রাকেটে লিখলেন 'চ্যাপেল হিল-এর বাস ড্রাইভার'।

প্রশ্ন করলাম, "এটা লিখলেন কেন?"

"বা রে! না লিখলে তোমার মনে থাকবে কেন? মার্কিন মহাদেশে ভ্রমণে এসেছো, কত গুণী জ্ঞানী লোকের সঙ্গে দেখা হবে, কত লোকের ঠিকানা লেখা হবে তোমার খাতায়, তারপর যখন দেশে ফিরে যাবে তখন হয়তো ঠিক করে উঠতে পারবে না—কে কোন্ জন! মুখগুলোর সঙ্গে নামগুলো মিলিয়ে নিতে হবে তো? যখন দেখবে লেখা আছে জর্জ রাদারফোর্ড, বাস-ড্রাইভার, তখনই মনে পড়ে যাবে ওয়াশিংটন থেকে চ্যাপেল হিল-এর পথে এই কয়েক ঘণ্টার পথ।"

এদিকে কথার ফাঁকে-ফাঁকে কখন সূর্যাস্তের সময় হয়েছে। নতুন পৃথিবীর আকাশে সারাদিন ডিউটি দিয়ে বয়োবৃদ্ধ সূর্য কখন পশ্চিমের আকাশে তাঁর ক্লান্ত রশ্মি প্রসারিত করেছেন। আমরা কখন নর্থ ক্যারোলিনা রাজ্যের প্রায় হৃদয়স্থলে হাজির। অরণ্যময় মার্কিন দাক্ষিণাত্যের পাইন ওক পপলার আর ওয়ালনাট গাছগুলোর লম্বা ছায়া মাটির বুকে সেখানে নানা নক্সা সৃষ্টি করেছে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝলাম বিদায় নেবার সময় প্রায় সমাগত। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে চ্যাপেল হিল-এ গাড়ি পৌঁছবে।

ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মিলিয়েই সত্যি বাসটা চ্যাপেল হিল বাস-স্টেশনে ঢুকে পড়লো। আমার ব্যাগদুটো নিজের হাতে বাস থেকে নামিয়ে দিয়ে জর্জ রাদারফোর্ড তাঁর ভারী হাতখানা এগিয়ে দিলেন। দীর্ঘ উষ্ণ করমর্দনের পর রাদারফোর্ড আশীর্বাদ করলেন, "হ্যাভ এ গুড টাইম। মনের আনন্দে আমাদের

দেশ দেখো ; আর খেয়াল রেখো, ভালোর সঙ্গে কিছু কিছু বদ লোকও ঈশ্বর সর্বত্র ছড়িয়ে রেখেছেন।"

॥ ৩ ॥

চ্যাপেল হিল-এর মাটিতে পা দিয়েই মনটা জুড়িয়ে গেলো। বেশ বুঝতে পারলাম, চ্যাপেল হিল আমার ভাল লাগবে।

লুইস কার্নাহানের কথা মনে পড়ে গেলো। ওঁকে বিশ্বাস করে আমায় যে ঠকতে হচ্ছে না তা এই দীর্ঘ বাস-যাত্রায় বুঝে গিয়েছি। আর মনে পড়লো আমার মা-র কথা। যাবার আগে মা বলেছিলেন, যখন যেখানে থাকবি সেখানকার সবকিছু দেখে নেবার বুঝে নেবার চেষ্টা করিস। দেশের কথা ভেবে মন খারাপ করিস না—তাতে বাড়িও পাবি না, বিদেশও দেখা হবে না।

ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা আমেজ রয়েছে, পরিচ্ছন্ন চ্যাপেল হিল-এর নির্মল হাওয়ায়, কিন্তু ওভারকোট চাপাবার মত অবস্থা মোটেই নয়। তবু ওই বস্তুটা গায়ে চড়াতে হলো—কারণ কোটের মালিক (তিনি ওটি আমাকে দীর্ঘ মেয়াদে ধার দিয়েছিলেন) সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় বুদ্ধি দিয়েছিলেন, বিদেশে সহজেই ঠাণ্ডা লেগে যায়।

গলায় ক্যামেরাটা ঝুলিয়ে নিয়ে এবং দু'হাতে দুই ব্যাগ পাকড়াও করে নিজের মনেই ফিক করে হেসে ফেললাম। স্থানভেদে সত্যি একই পাত্র অন্য পাত্রের রূপ নেয়। কলকাতায় এই দু'খানি আধমনি ব্যাগ বইবার কথা আমি ভাবতেও পারতাম না। আমার এই অবস্থার কথা আন্দাজ করে লন্ডনে আমার স্থানীয় গার্জেন শল্যচিকিৎসক শুভব্রত রায়চৌধুরী বলেছিল, "মাল বইতে-বইতে দেশ দেখার আনন্দ বেরিয়ে যাবে।" শুভব্রত সেল-ফ্রিজের দোকান থেকে একটি চাকাওয়ালা বেল্ট কিনে দিয়েছিল। শুভব্রতের রসিকতা : "দেখুন দাদা, কী কল বানিয়েছে সাহেব কোম্পানি ; চাকাতে মাল চলে আপনি-আপনি?"

এই চাকা বিদেশে আমার বিপদভঞ্জন মধুসূদন। ব্যাগের গায়ে চাকা বেঁধে পেঁমালুম কান ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে ব্যাগ দুটো একটা ট্যাক্সির সামনে এনে হাজির করলাম।

চ্যাপেল হিল-এর ট্যাক্সিওলা আমাকে ক'মিনিটেই আমার গন্তব্যস্থল 'ক্যারোলিনা ইন্'-এ পৌঁছে দিল।

মনে আছে, ছোটবেলায় দুলে দুলে মুখস্ত করতাম 'আই ডবল এন ইন্—ইন্ মানে সরাইখানা'। তারপর এই তেত্রিশ বছরের জীবনে সরাইখানার কত গল্প পড়েছি, কত কথা শুনেছি। সরাইখানায় থাকার সুযোগ হবে জেনে তাই বেশ পুলকিত হয়েছিলাম।

গাড়ি থেকে নেমেই বুঝলাম, নামেই ইন্ আসলে হোটেল। হোটেলের খাতায় নাম লিখে, নিজের ঘরে না গিয়ে বাইরের বাগানে বেরিয়ে এলাম। বড়ো ভালো লাগছে জায়গাটা। চ্যাপেল হিল-এর আকাশে বাতাসে অনির্বচনীয় প্রশান্তি ছড়িয়ে রয়েছে। উটের পিঠে চড়ে হাজার হাজার মাইল মরুভূমি পেরিয়ে ক্লান্ত বেদুইন আমি জীবনে এই প্রথম আমার স্বপ্নের শান্তিনিকেতনে এলাম।

দুরন্ত মানবশিশুদের ঘুম পাড়াবার জন্যে স্নেহময়ী পৃথিবী রাত্রির কোমল আঁচলখানি বিছিয়ে দিয়েছেন চ্যাপেল হিল-এর বুকে।

চ্যাপেল হিল-এর প্রথম রাত্রির কথা ভাবলে আজও আমার অবাক লাগে। হঠাৎ পাল্টে গিয়েছিলাম। ইঁট-কাঠ-লোহার তৈরি কলকাতায় জীবন কাটিয়ে যে সুকুমার প্রবৃত্তিগুলো আজন্ম মনের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিল, বিদেশের সঞ্জীবনী সুধায় সেগুলো হঠাৎ চোখ মেলে তাকাতে শুরু করলো।

বিশ্ববিদ্যালয় বলতে এতোদিন কলেজ স্ট্রীটের আশুতোষ ভবনটাই চোখের সামনে ভেসে উঠতো। এবার অন্য ধারণা হলো। প্রকৃতির কোলের মধ্যে ভুবনমনোমোহিনী শান্তিনিকেতনে জ্ঞানের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইউরোপ-আমেরিকায় যন্ত্রসভ্যতার অত্যাচারের কথা ইস্কুলে পড়েছিলাম, মানুষ নাকি সেখানে দুয়োরাণীর মত শ্যামলী প্রকৃতিকে নির্বাসনে পাঠিয়েছে। কিন্তু বিদেশে এসে বুঝলাম, প্রকৃতিকে এরা আমাদের থেকে অনেক বেশী ভালবাসে, অনেক বেশি মূল্য দেয়।

লবলোলি পাইন আর সাইপ্রেস গাছের মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে, টিউবলাইটের স্নিগ্ধ আলোয় চ্যাপেল-হিল-এর নিস্তব্ধ রাজপথে চিরজ্যোৎস্না নেমে এসেছে। আর আমি নির্বাক বিদেশি মুগ্ধনয়নে তাকিয়ে আছি রাতের গাউন-পরা অপরূপা চ্যাপেল-হিল-এর দিকে।

হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে এল একটি প্রশ্নে : "মাপ করবেন। আপনি কী ভারত থেকে এসছেন এইমাত্র? আপনার টেলিফোন।"

টেলিফোন ধরলাম। ওদিক থেকে ভেসে এলো, "আমি প্রফেসর এ সি হাওয়েল কথা বলছি। ওয়েলকাম টু চ্যাপেল হিল। কাল সকালে আপনার কাছে যাবো আমি। ইতিমধ্যে আপনার কোনো অসুবিধে হলে আমার বাড়িতে ফোন করবেন।"

টেলিফোন নামিয়ে, মালপত্র নিয়ে এবার ঘরে গেলাম। সিঁড়ির কাছে দেখলাম হোটেলের ইতিহাস লেখা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আগন্তুক ও অতিথিদের জন্যে বহুদিন আগে এই সরাইখানা তৈরি হয়েছিল। নানা হাত ফিরি হয়ে অবশেষে এর মালিক হলেন এক মার্কিন-দম্পতি। মৃত্যুকালে তাঁরা এই মূল্যবান সম্পত্তিটি বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে গিয়েছেন, এখন বিশ্ববিদ্যালয় নিজেই এটি

পরিচালনা করেন।

ঘরে ঢুকে সবেমাত্র জামা-কাপড় পাল্টে বসেছি, আবার ফোন। এবার খাঁটি বাংলায়, "হ্যালো, শংকরবাবু?"

চ্যাপেল হিল-এ বাংলা কথা শুনে মনে হলো যেন টেলিফোন থেকে খাঁটি মধু ঝরছে। "আমি বাস-স্ট্যান্ড থেকে কথা বলছি। আপনার ওখানে যেতে পারি?"

চলে আসতে বললাম। মিনিট দশেক পরেই ঘরে টোকা পড়ল। তিন জন ভারতীয়কে একসঙ্গে দেখে আমি তো অবাক। এঁদের একজন কেরালার লোক, একজন অন্ধ্র প্রদেশের এবং আরেকজন বঙ্গনন্দন, যিনি ফোন করেছিলেন।

ওঁরা বললেন, "ইন্ডিয়ান নেই মানে? এখানে আমরা ভারতীয় ছাত্র সমিতি পর্যন্ত করেছি। এটা জেনে রাখবেন যে, নয় নয় করেও মার্কিন দেশে ষাটহাজার ভারতীয় আছেন।"

সি পি রাও, যিনি স্থানীয় ভারতীয় অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট, বললেন, "আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে গতে কয়েক বছরে আটষট্টি হাজার ভারতীয় পড়াশোনা করেছেন। এখনও প্রায় আট হাজার ছাত্রছাত্রী পড়ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টিতে কয়েক হাজার ভারতীয় মাস্টারমশায়ও রয়েছেন।"

"যেভাবে আপনি ফিগার দিচ্ছেন তাতে মনে হয় স্ট্যাটিসটিকস-এর চর্চা করেন আপনি," বললাম আমি।

"আমি স্কুল অফ বিজনেস অ্যাডমিনিসট্রেশনের ছাত্র। তবে স্বভাবতই স্ট্যাটিসটিকসে আগ্রহী। স্ট্যাটিসটিকসে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব নাম।"

এবার জানলাম, প্রফেসর হাওয়েলের নির্দেশে ওঁরা আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে বাস-স্ট্যান্ডে গিয়েছিলেন। কিন্তু মোটর বিভ্রাটে পৌঁছতে একটু দেরী হয়ে যায়। ওঁরা ভারতীয় সমিতির পক্ষ থেকে কোনো এক সন্ধ্যায় ছোটখাট আসরে আমার সঙ্গে মিলিত হতে চান। প্রফেসর হাওয়েল আমাকে একটা চিঠিও দিয়েছেন।

অতিথি-আপ্যায়নে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যত্ন ও ধৈর্য অশেষ। প্রফেসর হাওয়েল আমাকে চিঠিতে স্বাগত জানিয়েছেন, চ্যাপেল হিল-এ আসবার জন্য আনন্দ প্রকাশ করেছেন, এবং আমার সঙ্গে কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিতের সাক্ষাৎকারের সময় ঠিক করে রেখেছেন। তাছাড়া প্রতিটি লাঞ্চ ও ডিনার বুকড্। চিঠির সঙ্গে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোট্ট একটি ইতিহাস—আর একটি ম্যাপ যা পকেটে থাকলে হারিয়ে যাবার কোনো ভয় নেই।

ভারতীয়দের সঙ্গে বেশ খানিকক্ষণ আড্ডা দেওয়া গেলো। অমূল্য নস্কর ও তাঁর স্ত্রী দুজনেই এখানে পদার্থ বিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণায় লেগে আছেন।

অমূল্যবাবুর বন্ধু জানালেন, দুজনেই দু'নামের আলাদা আলাদা পাসপোর্ট নিয়ে এদেশে এসেছিলেন। তারপর কি ছিল বিধাতার মনে! এখানেই বিয়ের ফুল ফুটলো।

আর একজন হাসতে হাসতে বললেন, "ভারতীয় মেয়েদের এখানে খুবই দাম।"

"মানে?"

"মানে, দেশে ফিরে গিয়ে কন্যাদায়গ্রস্ত মেয়ের বাবাকে বুদ্ধি দিতে পারেন, কোনো রকমে মেয়েকে এদেশে পাঠিয়ে দিতে। বিনা পণে একেবারে প্রথম শ্রেণীর হীরের টুকরো জামাই যোগাড় হয়ে যাবে।"

'সত্যি নাকি?"

ওঁরা বললেন, "এ সম্বন্ধে আপনাকে আরও তথ্য দেওয়া হবে। কথাবার্তা আর চললো না, কারণ দু'জন ছাত্রের তখন ল্যাবরেটরিতে কাজ ছিল। শুধু অমূল্যবাবু রয়ে গেলেন।

অমূল্যবাবু বললেন, "চ্যাপেল হিল এবং কাছাকাছি অঞ্চলে আপনি নিজের দেশের লোক অনেক পাবেন। শ্যামবাজার, পাইকপাড়া, বৌবাজার, ভবানীপুর, বালিগঞ্জ—যেখানকার লোক চান আলাপ করিয়ে দেবো।"

শুনে একটু ভরসা পাওয়া গেলো। জীবন সংগ্রামের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাঙালিরা যেভাবে পিছিয়ে যাচ্ছে, তাতে বিদেশে তাদের হাসিমুখ দেখবো আশা করিনি। শুনলাম ছাত্রীও আছে—তাদের একজন শ্রীমতী শিপ্রা রক্ষিত, আমাকে ফোন করবে এবং সময়মতো দেখা করবে। "বিদেশে আমরা তো রোজ-রোজ দেশের লোক পাই না। সুতরাং কেউ এলে তাঁর ওপর আমরা একটু অত্যাচার করি, দেশের খবরাখবর তো আমরা কিছুই পাই না।" বললেন অমূল্যবাবু।

অমূল্যবাবু বললেন, "আর একটা কথা বলে রাখি ; প্রফেসর হাওয়েলের কাছে শুনেছি, ইন্-এ মাত্র তিন দিনের জন্য সীট পাওয়া গিয়েছে। ফুটবল খেলার জন্যে হোটেল আগে থেকে রিজার্ভ করা রয়েছে। চতুর্থ দিনের রাত্রিটা আমাদের বাড়িতে কাটাবেন, অন্য কাউকে কথা দেবেন না।"

বিদেশে বাঙালিমাত্রই সজ্জন, কথাটা বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র বহুকাল আগে লিখেছিলেন—কিন্তু বক্তব্যটা যে এখনও সমান সত্য তার প্রমাণ বিদেশে বার-বার পেয়েছি। নাম-ধাম-পরিচয়ের অপেক্ষা না-রেখে কত বাঙালি অপরিচিত পরিবেশে আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন। লন্ডনের শ্যামাপ্রসাদ পালের কথাই ধরুন না। হিথরো বিমান-বন্দরে এঁর সঙ্গে দেখা না হলে কী রকম বিপদেই যে পড়ে যেতাম! সে এক গল্পের মতো। সে-কাহিনী পরে একসময় বলা যাবে।

কোথায় খাওয়া পাওয়া যায়, রাত্রি কোথায় কাটবে, এইসব চিন্তায় অভ্যস্ত বঙ্গসন্তান আমি হঠাৎ উল্টপুরাণের দেশে হাজির হয়েছি। এদেশে ঘন-ঘন টেলিফোন, ঘন-ঘন সাক্ষাৎকারে প্রবাসী বঙ্গসন্তানের বিনীত অনুরোধ—"কোনো ওজর-আপত্তি শুনতে চাই না, আমাদের বাড়িতে দুটো ডাল-ভাত খেতেই হবে। জানি সরকারী অতিথি হয়ে এসেছেন, বড়ো বড়ো হোটেলে থাকার সুবিধে অনেক। কিন্তু যদি গরীবের বাড়িতে ওঠেন তাতে আপনার কষ্ট হবে, কিন্তু আমাদের মুখ চেয়ে রাজী হোন। বুঝতেই তো পারছেন পেটের জ্বালায় দেশ ছেড়ে বিদেশে পড়ে রয়েছি—না হয় একটু আমাদের জন্যে কষ্ট করলেন!"

ছোটবেলায় নবদ্বীপ হালদারের কমিক শুনেছিলাম, "কী অত্যাচার কী অত্যাচার! মশায়, সন্দেশ খাবো না বলছি, তবু জোর করে মুখের মধ্যে গুঁজে দিলো!"

বিদেশে প্রবাসী বাঙালির এই পরমাত্মীয়বোধ আমাকে বিস্মিত করেছে। গভীর কৃতজ্ঞতায় এবং অপার আনন্দে আমার চোখ বার বার অশ্রুসিক্ত হয়েছে।

॥ ৪ ॥

সকাল-সকাল ঘুম ভেঙেছিল। ভাবলাম একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

সোনালী সূর্যের তরুণ কিরণ এসে পড়েছে পথের ওপর। দলে দলে ছাত্র-ছাত্রীরা বই হাতে বেরিয়ে পড়েছে পথে। পৃথিবীর সবচেয়ে বিত্তবান দেশের যুবক যুবতীদের মধ্যে একটু বাবুয়ানিভাব এবং চালবাজী থাকবে এমন একটা ভুল ধারণা মনের মধ্যে ছিল। দেখলাম ঠিক উল্টো।

জামা-কাপড় সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের কোনো লক্ষ্য আছে বলেই মনে হলো না। যার যা-খুশী গায়ে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে। ছেলেদের কেউ পরেছে খালাসী-নীল টাইট ফুলপ্যান্ট, ওপরে শার্ট। কেউ হাফপ্যান্ট, হাফ-হাতা স্পোর্টস গেঞ্জি বেং রবারের স্লিপার পরে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে।

মেয়েরা আরও সহজ ও স্বাভাবিক, যদিও কেউ কেউ হাঁটু পর্যন্ত লম্বা থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট আর ঢলঢলে ব্লাউজ পরেই দোকানে এসেছে কফি কিনতে। মহিলাদের সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য মার্কিন দেশে কোটি কোটি ডলারের প্রসাধন ব্যবসা চলছে—কিন্তু চ্যাপেল হিল-এর ছাত্রীদের দেখে মনেই হলো না তারা রুজ, লিপস্টিক, ক্রিম, মেক-আপ, স্নো ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামায়।

আর স্বাস্থ্য! প্রশস্ত হৃদয়ে ঈশ্বর এদের আশীর্বাদ করেছেন। যেমন দীর্ঘ দেহ, তেমনি সুগঠিত তনু ; প্রতিটি মুখে আত্মবিশ্বাসের ছবি। বেশ কিছু মেয়ে লম্বা চুল রেখেছে। শুনলাম, দক্ষিণ আমেরিকার কিছু মহিলাদের দেখাদেখি লম্বা চুল বিশ্ববিদ্যালয় মহলে এখন জনপ্রিয়। বলা যায় না, হয়তো এরা একদিন আমাদের

দেশের খোঁপার জন্যে পাগল হবে, এবং কেবল খোঁপা-বাঁধা শিখিয়ে আমাদের দেশের কিছু মহিলা প্রচুর অর্থ নিয়ে আসবেন ডলার-ক্ষুধার্ত ভারতবর্ষে।

সামনের একটা দোকানের দিকে যাচ্ছে বেশীর ভাগে ছেলেমেয়েরা। আমিও সেদিকে পা বাড়ালাম। দোকানটার বাইরে একটু বাগানের মতো রয়েছে—এবং সেখানেও কিছু টেবিল ও চেয়ার রয়েছে। দোকানে খাবার ও স্টেশনারী একসঙ্গে বিক্রি হচ্ছে! লাইনে দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়েরা কফি, স্যান্ডউইচ, ডিম, আইসক্রিম, ফলের রস, দুধ যা খুশী কিনছে। যারা বিক্রি করছে তারাও ছাত্রছাত্রী। একঘণ্টা কাজ করলে আড়াই ডলারের মত আয় হয় শুনলাম।

খাবারগুলোর দিকে তাকাচ্ছিলাম। যে-ছেলেটি বিক্রি করছিল, সে বললে, "আপনাকে সাহায্য করতে পারি কী? মনে হচ্ছে, আপনি নিরামিষ কোনো খাবার খুঁজছেন।"

ধন্যবাদ জানিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার এরকম মনে হলো কেন?"

"আপনাদের দেশ সম্বন্ধে কিছু কিছু বই পড়েছি।" ছেলেটি হেসে উত্তর দিলো।

বললাম, "আমি মাছ মাংস খাই—তবে গরু খেতে অনভ্যস্ত।"

ছেলেটি যত্ন করে ডিমের স্যান্ডউইচের একটা প্যাকেট এগিয়ে দিলো।

অন্য একটি মহিলা কাগজের কাপে কফি এগিয়ে দিয়ে বলল, "আপনি এখানে খাবেন না নিয়ে যাবেন?"

হেসে বললাম, "এটা জানতে চাইছো কেন?"

ছাত্রীটি হাসিতে মুখ ভরিয়ে বললে, "আপনি যদি বাইরে নিয়ে যান তাহলে একটা কাগজের ঢাকনা লাগিয়ে দেব কফির গ্লাসের ওপর—ধুলো পড়বে না, কফি বেশীক্ষণ গরম থাকবে।"

কফির টেবিলে দুধ ও চিনির প্যাকেট রয়েছে—কিন্তু দেখলাম প্রায় সব ছেলেমেয়েই ওদিকে হাত বাড়াচ্ছে না। কালো তেতো কফি খাওয়াটা এদের সভ্যতার প্রায় অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কফি ও স্যান্ডউইচ নিয়ে বাইরের টেবিলে বসলাম। প্রায় সব টেবিলই ভরা। আইসক্রিম হাতে করে একটা ছোকরা এসে আমার টেবিলে বসলো। একটু একটু আইসক্রিম কামড়াচ্ছে আবার বইয়ের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে।

হাই! জেরি", দেখলাম বইপত্র হাতে করে একটি মেয়ে আমাদের টেবিলের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

জেরি নামক যুবক উত্তর দিলো, "হাই, লিণ্ডা। তোমার তো দেখা পাওয়াই ভার।"

লিণ্ডা বললো, "পরীক্ষা, পরীক্ষা, পরীক্ষা। পাগল হয়ে গেলাম। কালকে

ভোর তিনটের সময় ঘুমোতে গিয়েছি।”

জেরি কপট সহানুভূতি দেখিয়ে বললো, “পুওর গার্ল! তোমার চোখের কোণে কালো দাগ পড়ে গিয়েছে—ভাগ্যিস কারণটা বললে, না হলে আমি ভাবতাম ডরমিটরি থেকে পালিয়ে বুধবার রাতেও কোথাও ডেট করেছো।”

সুদেহিনী লিণ্ডা ভ্রূধনু ভঙ্গ করলো, “বটে! এর উত্তর দিচ্ছি। আগে কফি নিয়ে আসি।”

“তার আগে,” এই বলে জেরি তার আধ-খাওয়া আইসক্রিম কোনটা লিণ্ডার দিকে এগিয়ে দিলো। লিণ্ডা খিল-খিল করে হেসে বেশ খানিকটা আইসক্রিম চেটে নিলো।

লিণ্ডার দুই সহপাঠিনী ইতিমধ্যে কফির জন্যে লাইন দিয়েছে—লিণ্ডার কার্যকলাপের দিকে তাদের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সম্মান করে, অন্যেক ব্যাপারে নাক গলিয়ে অথবা অযথা কৌতূহল প্রকাশ করে নিজের সময় অপচয় করে না।

দেখলাম বান্ধবী দু'জন কফির গ্লাস হাতে করে গাছের তলায় ঘাসের ওপর বসলো। হাতের খাতা খুলে দু'জনে এবার লেখা পড়ায় মন দিলো। একজন একটু পরে সটান ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে পায়ের চটিটা ফুটবলের মত দূরে ছুঁড়ে দিল।

ওয়াশিংটনের এক বাঙালি ভদ্রলোকের কথা মনে পড়লো। তিনি বলেছিলেন, “আমরা যা, ওরা ঠিক তার উল্টো। আমরা যদি শীতের ভারখয়ানস্ক হই, তাহলে এরা গ্রীষ্মের জেকবাবাদ! আমাদের আগে বিয়ে পরে প্রেম, এদের আগে প্রেম পরে বিয়ে। আমাদের জীবনে চির-বার্ধক্য, সরকারীভাবে সেখানে যৌবনের প্রবেশ নিষেধ, এদের জীবনে যৌবনেরই জয়জয়কার। যৌবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে শিকলে বেঁধে এরা ধরে রাখতে চেষ্টা করে।” ভদ্রলোক বলেছিলেন, “যৌবনকে নিয়ে এই আদেখ্‌লেপনা আমার চোখে মশাই দৃষ্টিকটু ঠেকে, এতো পণ্ডিত হয়েও এরা বোঝে না যৌবন দেরিতে এসে সবার আগে চলে যায়!” কিন্তু তিনিও স্বীকার করেছিলেন, “যৌবন নিয়ে যুক্তিহীন মাতামাতিতে যদি আপনার ক্লান্তি আসে তাহলে কোনো নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাবেন। যৌবনের আদর্শ বিকাশ ওখানে দেখতে পাবেন।

সত্যি ভোরের আলোয় চ্যাপেল হিল-এক ক্যাম্পাসে যুবক-যুবতীদের মধ্যে সংযত অথচ প্রাণবন্ত যৌবনের যথার্থ চিত্র দেখতে পেলাম। এরা সবুজ এবং স্বপ্নে ভরা, অথচ আত্মনির্ভর এবং দায়িত্বশীল।

প্রাচীন যুগে ঋষিদের আশ্রম সম্বন্ধে আমার যা কল্পনা ছিল তারই আধুনিক সংস্করণ যদি কোথাও খুঁজতে হয় সে এইখানে, এইখানে। এমন বিরামহীন জ্ঞানের তপস্যা এখন আর কোথায় হচ্ছে? ভোরবেলায় গ্রন্থাগারের দরজা সেই

যে খুললো, মধ্য রাতের আগে তা আর বন্ধ হয় না। আর বই? গোটা কয়েক ন্যাশনাল লাইব্রেরি ঢুকে যাবে এমন গ্রন্থাগার আমেরিকার বহু বিশ্ববিদ্যালয়েই আছে। বাংলাভাষায় প্রকাশিত সমস্ত বই কেনা হয় এমন মার্কিন গ্রন্থাগারের সংখ্যাই সতেরোটা। সেখানে যা বাংলা বই আসে, কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিও তা সংগ্রহ করতে পারেন না।

এইসব ভাবনার মধ্যে সময়টা বেশ কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ খেয়াল হলো প্রফেসর হাওয়েলের আসার সময় হয়ে গিয়েছে। হোটেলের লবিতে ঢুকতেই দেখলাম এক সৌম্য বৃদ্ধ বসে আছেন আমার জন্যে। নমস্কার জানিয়ে বললেন, "আমিই হাওয়েল। আমি এখানকার বিদেশী ছাত্রদের দেখাশোনা করি।

হোটেল থেকে বেরিয়ে পথ হাঁটতে হাঁটতে হাওয়েল বললেন, "আগে আমি ইংরিজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করতাম। প্রফেসর থাকাকালীন দেশ-বিদেশের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশতাম খুব—এটা আমার একটা নেশার মত। অধ্যাপনা থেকে অবসর নেবার পরও কাজটা চালিয়ে যাচ্ছি। আমার মনে হয় আমাদের প্রত্যেকের স্মরণ রাখা উচিত 'বিশ্ববিদ্যালয়' কথাটার মধ্যে 'বিশ্ব' শব্দটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে।"

আমি মৃদু হাসলাম। অধ্যাপক হাওয়েল বললেন, "গত তিরিশ বছরে কত দেশের ছেলেমেয়ে দেখলাম। দেশে দেশে কত পার্থক্য, আবার সব মানুষ একও বটে। আমি অবাক হয়ে ছাত্রদের লক্ষ্য করি। হঠাৎ যখন নিজের দেশ ছেড়ে বিদেশি পরিবেশে হাজির হয়, তখন কত রকমের প্রতিক্রিয়া হয়। আমরা সাধ্যমত এদের সাহায্যে আসবার চেষ্টা করি ; যাতে ওরা এই পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, অথচ নিজের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে না ফেলে। সেইটাই আমার লক্ষ্য।

বললাম, "ভারতীয় ছাত্রও আছে নিশ্চয় এর মধ্যে?"

হাওয়েল বললেন, "প্রচুর ভারতীয় ছাত্র পেয়েছি আমি।"

"আশা করি তারা আপনার দুশ্চিন্তার বোঝা খুব বাড়ায় না," আমি ওঁকে উদ্দেশ করে বলি।

হেসে ফেললেন হাওয়েল। "দুশ্চিন্তার ধারাবাহিক সরবরাহ না থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে রাখবেন কেন বলুন? তবে, আই মাস্ট সে, ভারতীয় ছাত্রদের এখানে যথেষ্ট সুনাম। তারা পরীক্ষায় খুব ভাল করে, বিশেষ করে অঙ্কে এত খাসা মাথা খুব কম জাতেরই আছে।"

একটু থেমে হাওয়েল বললেন, "আপনার দেশের ছেলেরা এদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে সহজেই খাপ খাইয়ে নেয়। তাদের নিয়ে ইদানিং বরং অন্য ধরনের অসুবিধায় পড়ি। লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে, পরীক্ষায় পাস করার পর তারা দেশে ফিরতে চায় না, বলে এখানেই চাকরির ব্যবস্থা করে দিন।

ব্যক্তিগতভাবে এর মধ্যে আমি কোনো অন্যায় দেখি না, আমাদের পূর্ব-পুরুষরাও তো একদিন অন্যদেশ ছেড়ে এদেশে এসেছিলেন। আর মেধাবী ও প্রতিভাবান ছেলেরা যদি এদেশে থাকতে চায় তাতে আমেরিকার লাভ। কিন্তু মার্কিন সরকার এখন অসুবিধার সৃষ্টি করছেন। তাঁদের বক্তব্য, ভারত সরকার এবং অন্যান্য উন্নতিশীল দেশের কর্তৃপক্ষ এর বিরোধী। এরই নাম নাকি 'ব্রেন ড্রেন'—দেশের ছেলে যদি দেশের কাজে না লাগলো, তাহলে তাকে বিদেশে পাঠিয়ে লাভ কী? আমেরিকার কর্মচারীসমস্যা সমাধানের জন্যে তো অন্য দেশের প্রতিভাবানদের উচ্চশিক্ষা দেওয়া হয়নি।"

অধ্যাপক হাওয়েল জানতে চাইলেন, "এ-বিষয়ে তোমার মতামত কী?"

বললাম, "ঘরের ছেলে পর হয়ে গেলে কার না দুঃখ হয়? তবু এ বিষয়ে আমার মতামত খুবই স্পষ্ট। আমি মানুষের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। নগদ খরচ করবার জন্যে যখন একটিমাত্র জীবন ঈশ্বর মানুষকে দিয়েছেন তখন যার যেখানে সুবিধে, যার যেখানে প্রাণ চায়, সে সেখানে থাকুক। ব্যক্তিগতভাবে আমার স্বপ্ন, আমার যদি কিছু দেবার থাকে সেটা প্রথমেই আমার দুঃখিনী মাকে নিবেদন করবো। কিন্তু সেটা আমার অভিরুচি। নিজের মন থেকে এই ইচ্ছা কারুর মনে না এলে, গায়ের জোরে তাকে জন্মস্থানে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়াটা আমার ন্যায়সঙ্গত মনে হয় না। আমার ছেলে বাড়ি থেকে পালালে আমি তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবো ; কিন্তু অন্য গৃহস্থকে বলবো না তুমি দরজা বন্ধ করো, তবে আমার ছেলে বাড়ি ফিরবে।"

হাওয়েল বললেন, "তাছাড়া শুনি, অনেকে ফিরে গিয়ে কাজের কোনো সুযোগ পায় না, তাদের প্রতিভা ও শিক্ষা দুটোই নষ্ট হয়।"

আমি বললাম, "ব্রেন ড্রেনের" সঙ্গে "ব্রেন স্যাংচুয়ারি" কথাটা স্মরণ রাখবেন। বিশ্বের সেরা প্রতিভাধরদের একটা নিরাপদ আশ্রয়স্থলও তো দরকার! তুলনাটা এই পরিপ্রেক্ষিতে খাটে না, কিন্তু স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে কার্ল মার্কস যদি ইংলন্ডে স্থান না পেতেন, আইনস্টাইনকে যদি হিটলারের জার্মানিতেই থাকতে হতো, তাহলে পৃথিবীর কী পরিমাণ ক্ষতি হতো? কেউ স্বেচ্ছায় স্বদেশে ফিরতে না চাইলে আমার মনে হয় সেখানে আমাদের বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত, তাঁকে রেখে আপনাদের কোনো লাভ হবে কি না। যদি তিনি আপনাদের বোঝা না হন, যদি কাজ খালি থাকে, তাহলে তাঁকে সুযোগ দিতে ক্ষতি কী?"

হাওয়েল বললেন, "এই যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় দেখছো, এটি এদেশের প্রাচীনতম স্টেট ইউনিভার্সিটি। ১৭৯১ সাল থেকে এখানে জ্ঞানচর্চা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যেই চ্যাপেল হিল শহরের সৃষ্টি। ওই যে গাছটা দেখছো, ওর নাম ডেভি জুনিয়র। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে পছন্দ মত জায়গা খুঁজতে খুঁজতে

সেনাপতি ডেভি এইখানে এক গাছের তলায় বিশ্রাম নিয়েছিলেন। সেই গাছটা কিছুদিন আগে যখন মারা গেলো তখন এই গাছটা পোঁতা হয়—আগের গাছটার নাম ছিল ডেভি সিনিয়র।"

বিশ্ববিদ্যালয়টা একটা বিরাট বাড়ি নয়। অনেকগুলো বাড়ি নিয়ে ক্যাম্পাস—প্রতিটি বাড়ির আবার ইতিহাস আছে।

হাওয়েল বললেন, "সরকারী সাহায্য ছাড়াও, বহুলোকের বিশেষ করে প্রাক্তন ছাত্রদের দানে বিশ্ববিদ্যালয় উপকৃত হয়েছে। প্রাক্তন ছাত্রদের সঙ্গে আমাদের মধুর সম্পর্ক। অনেকে এখানে বেড়াতে আসেন, নিজেদের ছাত্রাবস্থার দিনগুলোর কথা স্মরণ করে তাঁরা আনন্দ পান। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে উইলে টাকা রেখে যাওয়াটা এদেশে কোনো খবরই নয়।"

আমি মনে-মনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ভাবছিলাম। ইস্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া শিখে কত মানুষই তো জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু এইসব প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বাচ্ছন্দের জন্যে আমরা কেউ কিছু করি না। আমাদের উইলে ছেলে-মেয়ে-বউয়ের একচ্ছত্র প্রতিপত্তি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাইপো-ভাইঝি নাতি-নাতনীরাও ঢুকে পড়েন—কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। অথচ খবরের কাগজে প্রকাশিত শোকসংবাদে 'দানশীল' অথবা 'দানশীলা' শব্দটি প্রতিদিনই ব্যবহৃত হয়। মৃত্যুর পরে ধনীরা দু'দশ লাখ অথবা দু'দশ হাজার দিচ্ছেন কি না সেইটাই বড়ো প্রশ্ন নয়। জীবিতকালে যাঁরা দু'পাঁচ টাকা দিতে পারেন এমন লোকও কম নেই। বছরে প্রতিটি প্রাক্তন ছাত্র পাঁচটি টাকা দিলে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কত কাজই না করা যেতো!

হাওয়েল বললেন, "আমাদের এক প্রাক্তন ছাত্রের কথা শুনুন ; একসঙ্গে ছাত্রাবস্থায় এখানকার ল্যাবরেটরিতে জন মোটলে মোরহেড সামান্য গবেষণা করেন। সেই গবেষণার সূত্র ধরে বিখ্যাত ইউনিয়ন কারবাইড কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি কিন্তু ভোলেননি। মোরহেড ফাউন্ডেশন থেকে আমরা অনেক টাকা পেয়ে থাকি। এ বছরে ৯৯টি ছাত্র মোরহেড বৃত্তি পাচ্ছেন। প্রতিটি বৃত্তির পরিমাণ বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকারও বেশী। মোরহেড তাঁর কলেজে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে পৃথিবীর সবচেয়ে আধুনিক প্ল্যানেটোরিয়াম তৈরী করে দিয়েছেন। পৃথিবীর আর কোনো কলেজে এমন প্ল্যানেটোরিয়াম নেই। মার্কিন মহাকাশচারীরা নক্ষত্রলোকের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে এখানে ট্রেনিং নিতে আসেন। মোরহেডের যে বন্ধুর কথা বলছিলাম, তিনিও পরে অনেক অর্থ রোজগার করেন। তাঁর টাকাটা এমনভাবে দিয়ে গিয়েছেন যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গুণী জ্ঞানীদের আমরা এখানে ভাল মাইনে দিয়ে

অধ্যাপক হিসাবে আনতে পারি। ওঁর নাম অনুসারে তাঁদের বলা হয় কেনান অধ্যাপক।”

অধ্যাপক হাওয়েল এবার আমাকে অবাক করে দিলেন। জানালেন, “একজন কেনান অধ্যাপক তোমাদের দেশ থেকেই এখানে এসেছেন। স্ট্যাটিসটিকসে তাঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতি, নাম শুনে থাকবে হয়তো, রাজচন্দ্র বসু।”

অপরাধ স্বীকার করে বললাম, “ওঁর সম্বন্ধে কিছু শুনিনি। গোলা লোকদের কাছে ও বিষয়ে আমাদের দেশে একটি মাত্র নামই পরিচিত। তিনি হলে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ।”

প্রফেসর হাওয়েল বললেন, “তোমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। তুমি ইচ্ছে করলে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-কোন ক্লাশে যোগ দিতে পারো। এখানে ভোরবেলা থেকে ক্লাশ আরম্ভ হয়। সন্ধ্যেবেলাতেও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয় না। তুমি তো জানো, আমরা সন্ধ্যা ছটার সময় ডিনার খেয়ে নিই। ডিনারের পর কিছু কিছু ক্লাশ হয়, তাছাড়া নানা ধরনের মিটিং লেগেই আছে। বিভিন্ন হলে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা হয়, ছাত্র ও অধ্যাপক দল বেঁধে সে-সব শুনতে আসেন এবং বক্তৃতার পর কফির সঙ্গে এ-বিষয়ে প্রশ্নোত্তর হয়। শুধু পরীক্ষায় পাস করার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার মানে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে মানুষ আসে তার জ্ঞানের দিগন্ত প্রসারিত করতে। তাই দেখবে সঙ্গীতের বক্তৃতায় পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্ররা ভিড় করছে, সাহিত্যের তেমন বক্তৃতা থাকলে তো তিলধারণের জায়গা থাকে না। আজ সন্ধ্যায় একটা বিশেষ বক্তৃতা করবেন প্রখ্যাত মার্কিন লেখক নরম্যান করউইন। আমাদের সৌভাগ্য, ওঁকে আমরা রাইটার-ইন-রেসিডেন্স হিসেবে পেয়েছি।”

“আবাসিক লেখক,” ব্যাপারটা কি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। অধ্যাপক হাওয়েল বললেন, “এটা ইদানিং আরম্ভ হয়েছে। বড়ো বড়ো বিশ্ববিদ্যালয় খ্যাতনামা প্রতিভাবান লেখকদের নিমন্ত্রণ করছেন, ক্যাম্পাসে এসে কিছুদিন থাকবার জন্যে। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের কিছু সম্মানমূল্য দেন, থাকার সুবিধে ছাড়াও লাইব্রেরি ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যায়। লেখক তাঁর নিজের কাজকর্ম নিয়েই ডুবে থাকেন। তবে মাঝে মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য-বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন এবং কখনও কখনও নিজের পছন্দমত কোনো বিষয়ে সন্ধ্যাবেলায় বক্তৃতা দেন। এইসব বক্তৃতায় অনেক সময় বসবার জায়গা পাওয়া যায় না।”

হাওয়েল বললেন, “এইভাবে বিশিষ্ট শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংযোগ হওয়ার ফলে ছাত্ররা লাভবান হন। কারণ আমরা দেখেছি পেশাদার অধ্যাপক ও সাহিত্য-সমালোচকদের সান্নিধ্যে সাহিত্যের সব

রসটুকু সংগ্রহ করা সম্ভব নয়—যে গাছে ফল ফলে তার সঙ্গে সামান্য পরিচয় থাকলে অনেক সুবিধে। আবাসিক লেখকদের আমরা যথেষ্ট সম্মান দিই। তাঁরা কেউ আসেন ছ'মাসের জন্যে, কেউ এক বছরের জন্যে। ক্যাম্পাসের শান্ত পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁরাও খুশী হন, অনেকে নতুন লেখার বিষয় পেয়ে যান।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশরুমে ছাত্র-শিক্ষকের সহজ সম্পর্কটা যে কোনো নবাগতের নজরে পড়ে যায়। হাওয়েল বললেন, "কে যে অধ্যাপক এবং কে যে ছাত্র তা অনেক সময় বুঝতে পারেবে না। কারণ আমাদের এখানে অনেক বয়সী ছাত্র আছেন। তাঁরা প্রথম জীবনে কাজ কর্ম করে টাকা জমিয়ে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এসেছেন।"

ক্লাশরুমেও পূর্ণ স্বাধীনতা। এক ক্লাশ থেকে আর এক ক্লাশে যাবার আগে এক যুবক তার বান্ধবীকে চুম্বন করলো ; কিন্তু সেদিকে অন্য কারও নজর নেই।

প্রফেসর হাওয়েল আমাকে নিয়ে একটা ক্লাশে ঢুকলেন। একজন ছাত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। "ইনি তোমাদের ক্লাশটা করবেন, তারপর ওঁকে আমার ঘরে পৌঁছে দিও।"

ছাত্রী বললেন, "আমার নাম পলিন। তুমি আমার পাশে বসো।"

পলিন এবার সোজা জিজ্ঞেস করে বসলো, "তোমার বিষয় নিশ্চয় স্ট্যাটিসটিকস?"

বললাম, "মোটেই নয়। অঙ্কে তিরিশের বেশী কখনও পাইনি।"

পলিন বললো, "একটু ভরসা পাচ্ছি—ইন্ডিয়ান অথচ অঙ্কে কাঁচা তাহলে সম্ভব। আমার বয়ফ্রেন্ড স্ট্যাটিসটিকস পড়ে। ভারতীয় দেখলেই সে তো কমপ্লেক্সে ভোগে ; বলে, আমাদের ক্লাশে দু'জন ইন্ডিয়ান রয়েছে, সুতরাং আমি কি রেজাল্ট করবো?"

ক্লাশের ছেলেমেয়েরা যে-যার সীটে বসে পড়েছে। কেউ কেউ কফির কাপ হাতে ক্লাশে ঢুকলো। অধ্যাপক ক্লাশে ঢুকেই বললেন, "আমার সিগারেট ফেলে এসেছি। তোমরা যদি কেউ একটা সিগারেট দাও।" সঙ্গে সঙ্গে দু' তিন জন ছেলে সিগারেট এগিয়ে দিলো।

সিগারেট ধরিয়ে, টেবিলের ওপর ঘোড়ায় চড়ার মতো বসে দুলতে দুলতে পড়ানো শুরু হলো। অধ্যাপক বললেন, "আজকের যে-বিষয়টা আমাদের পড়বার কথা, সে-সম্বন্ধে কয়েকদিন আগে খুব একটা ভাল বই পড়লাম। আমি একটা চ্যাপটার তোমাদের জন্যে টাইপ করে, সাইক্লোস্টাইল করে ফেলেছি। তোমরা কেউ কিছু ইন্টারেস্ট পেলে নাকি?"

অর্থাৎ ক্লাশ লেকচার মানে মোটেই বক্তৃতা নয়। স্রেফ আলোচনা, যাতে

ছাত্রছাত্রীরা পুরোপুরি অংশ নিচ্ছে এবং তাদের মতামত দিচ্ছে। কথা বলবার সময় ছেলেরা সীটে বসে থাকছে।

অধ্যাপক বললেন, "এর পরের দিনের বিষয় সম্বন্ধে আমি একটা বইয়ের লিস্ট টাইপ করে রেখেছি। তোমরা যাবার সময় এই টেবিল থেকে নিয়ে যাবে আর তোমাদের এবারকার মতামতটা আমি লিখিত ভাবে চাই। তোমরা প্রবন্ধ লিখে ৫ই তারিখের মধ্যে আমার বাক্সে ফেলে দেবে।"

একঘণ্টার ক্লাশ কোথা দিয়ে কেটে গেলো। একটা জিনিস সহজেই বোঝা যায়, এখানে মুখস্থ করবার জন্যে কেউ ব্যস্ত নয়। স্বাধীন চিন্তা করবার ক্ষমতা যাতে বিকশিত হয়, তার জন্যেই মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে। প্রফেসর হাওয়েলের কাছে রবার্ট হ্যাচিন-এর একটি চমৎকার উদ্ধৃতি পেয়েছিলাম : "Freedom of inquiry, freedom of discussion, freedom of teaching—without these a university cannot exist. The university exists only to find and to communicate the truth. If it cannot do that it is no longer a university.

ক্লাশের শেষে পলিন আমাকে নিয়ে বেরুলো। প্রফেসর হাওয়েলের অফিসে যাবার পথে সে বললো, "সেশনের শুরুতেই আমাদের টাইপ করা প্রোগ্রাম দিয়ে দেওয়া হয়, কোন্ তারিখের কোন্ ঘণ্টায় কোন্ চ্যাপ্টার পড়ানো হবে। আর ক্লাশটা কিছুই নয়, প্রতি ঘণ্টা ক্লাশের জন্যে আমাদের অন্ততঃ চার-ঘণ্টা লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করতে হয়। এত চাপ যে পাগল হয়ে যেতে হয়।"

হাওয়েলের কাছে শুনলাম, এরই মধ্যে শনি-রবিবারে ডেটিং করতে হয়। কারণ শুধু পড়াশোনায় ভাল হলে কেউ ভাল বলবে না ; পড়ার ফাঁকে ফাঁকে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে ভবিষ্যতের স্বামী অথবা স্ত্রীর সন্ধান করতে হবে। ছেলে মেয়েদের বিয়ের দুশ্চিন্তা মার্কিন বাবা-মায়ের রাত্রের ঘুম নষ্ট করে না। দায়িত্বটা তাঁরা পুরোপুরি যারা বিয়ে করবে তাদের ঘাড়েই চাপিয়ে দিয়েছেন। ফলে, শনি-রবিবারে ছেলে-মেয়েদের মেশামেশি করাটা পরীক্ষায় পাশের মতন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

হাওয়েল বললেন, "আর একটা ব্যাপার তোমার ভাল লাগবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে জানা-শোনা হয়ে অনেকেই বিয়ে করে ফেলে। তখন অনেক মেয়ে পড়াশোনা ছেড়ে চাকরি করে স্বামীর পড়ার খরচ যোগাবার জন্যে। পাশ করে বেরুবার পরে স্বামী চাকরি করবে এবং তখন স্ত্রী আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাডমিশন নেবে। এই সময় পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রী ঠিক করেন কোন্ বছরে তাঁদের প্রথম সন্তান হবে।

হাওয়েল এবার আমাকে অধ্যাপক ডঃ গায় জনসনের কাছে নিয়ে গেলেন। অধ্যাপক জনসন সাদা-কালো সমস্যার একজন খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ। এবিষয়ে

বহু বই লিখেছেন। আমাকে দেখেই বৃদ্ধ ডঃ জনসন বললেন, "আমাকে ক্ষমা করবেন। ঘরখানার কী অবস্থা হয়ে রয়েছে। সত্যি আমি লজ্জাবোধ করছি।"

দেওয়ালে, মেঝেয়, টেবিলে স্তূপীকৃত বই। টেবিলের কোণে একটা ছোট টাইপরাইটার বসানো রয়েছে। তপস্যাশীর্ণ দেহ ডঃ জনসনের। চোখদুটি বুদ্ধিতে উজ্জ্বল। ডঃ জনসন আমাকে এক কাপ কফি এগিয়ে দিয়ে বললেন, "যৌবনে আমার স্ত্রীকে বলতাম, কাজ-কর্ম একটু গুছিয়ে নিই, তারপর দুজনে খুব হৈ-হৈ করবো। কিন্তু কাজকর্ম গুছোতে গুছোতে কখন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি।"

ডঃ জনসন বললেন, "আমার স্ত্রীকে কিছুতেই বোঝাতে পারি না, ক্লাশ নেওয়াটা একজন অধ্যাপকের কাজের একশোভাগের দশভাগ মাত্র। আসল কাজ হল জ্ঞানান্বেষণ! পৃথিবীর সব অধ্যাপকরা যদি ছাত্র পড়িয়ে বাড়ি চলে যেতে আরম্ভ করেন, তাহলে মানুষের অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে যাবে।"

নিগ্রো-সমস্যা সম্পর্কে ডঃ জনসনের সহানুভূতি সর্বজনবিদিত। বললেন, "অনেকদিন থেকেই দেশের মানুষদের চোখ খোলবার চেষ্টা করছি। এমন সময় গিয়েছে যখন এর জন্যে যথেষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। আমার কর্মজীবনের শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা আমাকে চাকরি থেকে তাড়াবারও চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় যাঁরা চালান তাঁরা আমাকে সহ্য করেছেন, বলেছেন—স্বাধীন চিন্তার সুযোগ না থাকলে নূতন ভাবধারার জন্ম হবে কেমন করে।"

ডঃ জনসন বললেন, "সমস্ত পৃথিবী আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, কেমন করে আমরা এই সমস্যা সমাধান করি। সমস্যা থাকাটা কিছু অন্যায় নয়, কিন্তু অপরাধ হল তার সমাধানের চেষ্টা না করা।"

"সাদা-কালো সমস্যাটা কালোর ওপরে সাদার অত্যাচারের মত সহজ হলে ভাল হতো। কিন্তু এর সঙ্গে ইতিহাস, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান জট পাকিয়ে এক বিচিত্র সমস্যায় রূপান্তরিত হয়েছে।" ডঃ জনসন তাঁর মতামত আমাকে জানাচ্ছিলেন।

কথার ফাঁকে-ফাঁকে তিনি অনেকগুলো চিঠি সই করে ফেললেন। বললেন, "পৃথিবীর নানা দেশ থেকে নানা বিষয়ে চিঠি আসে, আমার নিজের কাজের জন্যেও চিঠি লিখতে হয়। ইংরেজদের কাছ থেকে এই বদ অভ্যাসটা আমরাও পেয়েছি—চিঠি পেলে তার উত্তর দিতেই হবে।"

নিগ্রো সমস্যা সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনার মধ্যে ডঃ জনসন নিজের কার্ড ইনডেক্সের কাছে এগিয়ে এক একটি কার্ড বার করে বলতে লাগলেন : "তুমি যা বলতে চাইছো সে বিষয়ে ১৯৬২ সালে ৬ই জুন নিউ ইয়র্ক টাইমস-এ একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। সোসিয়লজি মার্চ সংখ্যাটাও দেখতে পারো।" এ দেশের

সর্বত্র মেথড। স্মৃতিশক্তির ওপর সর্বদা নির্ভর করে এঁরা অযথা শক্তির অপচয় করেন না। কার্ড ইনডেক্সের মাধ্যমে সমস্ত খবরাখবর নখাগ্রে রাখেন মার্কিন অধ্যাপকরা।

ডঃ জনসন এরই মধ্যে আমার কফির কাপটা নিয়ে ধুয়ে ফেললেন। তারপর একটা ঝাড়ন নিয়ে কয়েকটা বই ঝাড়তে লাগলেন। আর বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন, "কিছু বই হাতের গোড়ায় না থাকলে কাজকর্মের অসুবিধে হয়, তাই বাধ্য হয়েই এই অবস্থা। মেঝের বইগুলো পড়া শেষ করে ফেলেছি, ওগুলো এবার ফেরত পাঠিয়ে দোবো"

ডঃ গায় জনসনের ঘর থেকে বেরিয়ে সমাজ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডঃ হ্যালোওয়েল পোপের কাছে আমার যাবার কথা ছিল। দেখলাম, একটা ঘরের বাইরে কার্ডে লেখা 'দি ভ্যাটিকান'।

ডঃ পোপ আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। তরুণ সুপুরুষ অধ্যাপক আমাকে বসতে বললেন। এঁর ঘরেও শুধু বই আর বই।

বললাম, "একটা জিনিস বুঝলাম না, ঘরের বাইরে কেন 'ভ্যাটিকান' লেখা রয়েছে?"

"সে কী?" আকাশ থেকে পড়লেন অধ্যাপক। তারপর দ্রুত বাইরে গিয়ে কার্ডটা দেখে বললেন, "কোনো দুষ্টু ছাত্রের কাজ। যেহেতু আমার নাম পোপ, সেই হেতু আমার ঘর পোপের রাজপ্রাসাদ ভ্যাটিকান।"

পাশের ঘরের অধ্যাপকের দরজায় যে-কার্ডটা রয়েছে সেটা পড়তে বললেন আমাকে। সেখানে লেখা, "এই ঘরের অধিবাসীটির ধারণা পৃথিবীর যত জ্ঞান সব তাঁর মগজেই আছে।"

ডঃ পোপ দেখলাম বিরক্ত হলেন না। "ছেলেরা এই সব মজা করেই থাকে। রাগ করলে পড়ানো যাবে না।"

অত্যন্ত আমুদে ভদ্রলোক এই ডঃ পোপ। বললাম, "তিরিশে পড়বার আগেই অধ্যাপক হয়ে বসেছেন, সারাজীবন করবেন কী?"

হেসে উঠলেন পোপ, "যা বলেছেন। সারা জীবন খেটে মরতে হবে, অথচ উন্নতি হবে না।"

শুনেছিলাম, আজকের যুগের আমেরিকানদের জানবার সবচেয়ে সহজ ও নির্ভরযোগ্য উপায় হলো মার্কিন সমাজ-বিজ্ঞানী ও অ্যানথ্রপলজিস্টদের কয়েকটা বই পড়ে ফেলা। নিজেদের ব্যক্তিগত পারিবারিক এবং সামাজিক এমন কোনো বিষয় নেই যে-বিষয়ে মার্কিন সমাজ--বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান না চালাচ্ছেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হলে মাঝে মাঝে সমাজে বোমা ফেটে পড়ে—চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। যেমন ধরুন কীন্‌সে রিপোর্ট। ইনি মার্কিন দেশের যৌন সম্পর্কের

বিষয়ে যে অনুসন্ধান করেছেন, তা নিয়ে সমস্ত পৃথিবীতে এখন হৈ চৈ।

ডঃ পোপ বললেন, "আমাদের দেশ সম্বন্ধে বাইরে যে এতো কুৎসা রটে তার অন্যতম কারণ আমরা আমাদের জীবনের কোনোদিক গোপন রাখি না। কত জন যৌন-ব্যাধিতে ভুগছেন, কত জন বিবাহের পূর্বেই যৌন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, কতজন বিবাহের পূর্বেই মা হচ্ছে—এসব সংখ্যা আপনি বই খুললেই পেয়ে যাবেন। জাত হিসেবে নিজেদের দুর্বলতা সম্বন্ধে আমরা যতটা জানি, পৃথিবীর খুব কম দেশই বোধহয় নিজেদের সম্বন্ধে তা দাবি করতে পারেন।"

যে সব বিষয়ে ডঃ পোপের খ্যাতি স্বীকৃত, তার মধ্যে একটি হলো মার্কিন সমাজে প্রাক্-বৈবাহিক যৌন-অভিজ্ঞতা। এ-বিষয়ে সম্প্রতি যে অনুসন্ধান চালানো হয়েছে সে সম্বন্ধে ডঃ পোপ আমার সঙ্গে আলোচনা করলেন। কৌমার্য ও কুমারিত্ব সম্বন্ধে সমাজের চিন্তাধারা পাল্টাচ্ছে কিনা সে বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা করছেন ডঃ পোপ।

ডঃ পোপ বললেন, "আপনাদের দেশে মধ্যবিত্তরা সাধারণ ভাবে তাঁদের দেহে পবিত্রতা যেভাবে বজায় রাখেন সেটা এদেশে অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য। ডেটিং-এর মাধ্যমে বিয়ে ঠিক করার ব্যবস্থাটাই এমন যে বিয়ের আগে যৌন-সম্ভোগ প্রায়ই হয়। কিন্তু তা বলে যাঁরা প্রচার করেন, কুমারিত্ব জিনিসটা এদেশ থেকে বিদায় নিয়েছে তাঁরাও ঠিক নন।"

"কিন্তু উদাহরণ দিন," বললাম ডঃ পোপকে।

ডঃ পোপ বললেন "১৯০০ সালের আগে যেসব বিবাহিত মহিলাদের জন্ম, তাঁদের মধ্যে এক সমীক্ষা চালানো হয়। দেখা যায়, তখনই শতকরা ২৭ জন মহিলা বিবাহের পূর্বে যৌন অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। ১৯০০-১৯১০-এর মধ্যে যাঁদের জন্ম তাঁদের শতকরা ৫১ জন বিয়ের পূর্বে অভিজ্ঞ হন, তবে মাত্র শতকরা ৬ জন হবু স্বামী ছাড়া অন্য কারও শয্যাসঙ্গিনী হন। এই হিসেবের ওপর নির্ভর করে জনৈক সমাজবিজ্ঞানী দ্বিতীয় যুদ্ধের কিছু আগে ভবিষ্যৎবাণী করেন যে ১৯৪০ সালের পরে যেসব মেয়ে জন্মাবে তাদের কেউ বিবাহের সময় কুমারী থাকবে না।"

ডঃ পোপ বললেন, "কিন্তু মধ্যবিত্ত সমাজে সেটা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের নানা ব্যবস্থা সত্ত্বেও অবৈধ সন্তানের জন্ম ও আরও নানা ভয়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মহলে বিবাহ-পূর্ব মিলনে যথেষ্ট আপত্তি রয়েছে। ১৯৪০ সালে এরম্যান কিছু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে এক সমীক্ষা চালান। তিনি দেখেন, শতকরা ১৪ জন ছাত্র-ছাত্রী মনে করে যে কুমারী অবস্থায় প্রেমাস্পদের সঙ্গে দেহ-সম্ভোগ অন্যায় নয়। আর দশভাগেরও কম প্রেম না হলেও স্বল্প-পরিচিতের

সঙ্গে মিলতে অরাজী নয়। ১৯৫৯ সালে ভার্জিনিয়ার কলেজে সমীক্ষায় দেখা যায় যে, শতকরা মাত্র চারজন মেয়ে এই মতবাদে বিশ্বাসী। আর ১৯৬৩ সালে জাতীয় স্যামপল সার্ভেতে দেখা যায় যে, দশভাগেরও কম মেয়ে বিবাহের পূর্বে যৌন-সম্ভোগ ন্যায়সঙ্গত মনে করে।"

ডঃ পোপ বললেন, "আমরা যা দেখছি তাতে এমন একটা সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে যে কিছুদিন পরে বিবাহের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নরনারীর মধ্যে দৈহিক মিলন প্রকাশ্যে স্বীকৃত হবে। ডেনমার্কে এইরকম একটা রীতি অনেকদিন ধরে চলে আসছে।"

আমার দিকে তাকিয়ে ডঃ পোপ বললেন, "আমরা সমাজ-বিজ্ঞানী, সমাজের ছবি সমাজের সামনে তুলে ধরছি। কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ সে বিচারের ভার আমাদের ওপর নেই। যেমন ধরুন চার্চের অনেকে অভিযোগ করেন যে, প্রকাশ্যে 'পেটিং' (আলিঙ্গন চুম্বন, ইত্যাদি) করাকে নীতিবাগিশরাও আর অন্যায় মনে করেন না। এককালে 'পেটিং' অসামাজিক ছিল। এখন অত্যন্ত গোঁড়া ঘরের মেয়েরাও এতে আপত্তি করেন না। ফলে যাঁরা বিবাহ পূর্ব মিলনে বিশ্বাস করেন না, তাঁরাও কেবল 'টেকনিক্যাল ভার্জিন' থেকে যান।"

একটু থেমে ডঃ পোপ বললেন, "সমস্যাটা কোথায় জানেন? প্রাক্‌ বৈবাহিক যৌন-মিলন সম্বন্ধে মতামত যাই হোক, অবিবাহিতা মাতার সন্তানকে আমরা সামাজিক স্বীকৃতি দিতে রাজী নই। নানারকম সাবধানতা সত্ত্বেও জারজ সন্তানের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। ওহিয়ো রাজ্যের প্রথম সন্তান জন্মের এক সমীক্ষায় দেখলাম, শতকরা একুশ জন মা বিবাহের পূর্বেই গর্ভবতী হয়েছিল।"

ডঃ পোপ বললেন, "জারজ সন্তান নিয়ে আরও সামাজিক-সমস্যার সৃষ্টি হতো, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বহু আমেরিকান পরিবার দত্তক নেবার জন্যে ব্যাকুল। প্রতিটি বাচ্চার জন্যে দশ জোড়া দম্পতি আবেদন করেন। তবে ইদানীং একটু চিন্তার কারণ দেখা যাচ্ছে। কারণ দত্তক গ্রহণের জন্যে আবেদনের সংখ্যা কমছে।"

ডঃ পোপ এবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার একটা ক্লাশ রয়েছে।"

ওঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম। উনি হাসতে হাসতে বললেন, "শিল্পবিপ্লবের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের পারিবারিক জীবনেও নানা সমস্যা আসবে। তবে আপনারা বহু হাজার বছরের অভিজ্ঞতায় একটা সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন—সুতরাং নতুন ও পুরাতনের সমন্বয়ে যা ন্যায়সঙ্গত তাই গ্রহণ করার সুযোগ পাবেন আপনারা। শুধু এইটা মনে রাখবেন, অনেক সমাজে গোপনে গোপনে কী হচ্ছে তার খোঁজ রাখা হয় না—সেটা মোটেই নিরাপদে নয়।

আপনাদের দেশে সমাজ-বিজ্ঞান ও নৃতত্ত্বের বিরাট সুযোগ পড়ে রয়েছে।"

ডঃ পোপ এবার কাগজপত্র হাতে আমার সঙ্গে বেরিয়ে এলেন। বললেন, "যদি কখনও ভারতবর্ষে যাই যেন দেখা হয়।"

মার্কিন পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে যা বললাম তা নতুন কিছু নয় কিন্তু যে নিষ্ঠার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিকরা তাঁদের দেশকে পর্যবেক্ষণ করেছেন তা আমার মনকে পরম শ্রদ্ধায় ভরিয়ে দিয়েছিল।

দুপুরবেলায় প্রফেসর হাওয়েল আমাকে ক্যান্টিনে নিয়ে গেলেন। সেখানে লাইন দিয়ে অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে আমরাও খাবার নিলাম। যে টেবিলে বসলাম, সেখানে এক তরুণ অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হলো। ইনি ভারতের জনসংখ্যা সমস্যা সম্বন্ধে কাজ করছেন। কিছুদিন দক্ষিণ ভারতের গ্রামে কাটিয়ে এসেছেন, আবার যাবেন ভারতবর্ষে ; মনে হলো, ভারতের বিরাট বিরাট সমস্যা সম্বন্ধে ভারতের বুদ্ধিজীবিরা তেমন সচেতন নন বলে তিনি আশ্চর্য হয়েছেন।

একটু পরে আর একজন এলেন ; অধ্যাপক ও ঔপন্যাসিক ম্যাক্স স্টীল—ইনি সৃষ্টিশীল সাহিত্য বিভাগের প্রধান। বললেন, "আমাদের বিভাগে ছাত্ররা গল্প, কবিতা উপন্যাস লেখে। ট্রেনিং দিয়ে কোনো লেখক তৈরি করা যায় না সত্যি কথা, কিন্তু আমাদের এইটুকু বিশ্বাস, নিজে লেখার চেষ্টা করলে ভাল পাঠক হওয়া যায়। লেখকের জুতোয় একবার পা না গলালে সমালোচকের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ হয় না।"

প্রফেসর হাওয়েল লাঞ্চের পর বিদায় নিলেন। যাবার আগে বললেন, "প্রফেসর স্টীল তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যাবেন সন্ধ্যাবেলায়। ওইখানেই তুমি ডিনার খাবে। তারপর উনিই তোমাকে নরম্যান করউইন-এর বক্তৃতা শোনাতে নিয়ে আসবেন।" একটু থামলেন হাওয়েল, তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, "তোমাকে আমার বাড়িতেই নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমার বাড়ি বড়ো অগোছালো। আমার স্ত্রী কয়েকমাস হল মৃত।" আমি চমকে উঠে বৃদ্ধ সদাপ্রসন্ন হাওয়েলের দিকে তাকালাম। উনি কিছুই খেয়াল করলেন না। বললেন—"আমি চালি, ইথিওপিয়া থেকে দুটি ছাত্র এসেছে। তাদের কম্বল নেই—আমার বাড়ির বাড়তি কম্বল দুটো অফিস থেকে ওদের নিয়ে যেতে বলেছি।"

।। ৫ ।।

"এই দেশে হাওয়েলের মত অনেক মানুষ পাবেন," বলেছিলেন খ্যাতনামা সংখ্যাতত্ত্ববিদ রাজচন্দ্র বসু।

রাজচন্দ্র বসুর সঙ্গে আলাপ হলো ভারতীয় অ্যাসোসিয়েশনে বক্তৃতার পর। ভারতীয় ছাত্রদের বলছিলাম, "বিদেশে আপনারা ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন

দেখে আমার আনন্দের সীমা নেই। নেই-নেই, পারি-না পারি-না, হচ্ছে-না হচ্ছে-না, হতাশার পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে আপনাদের মধ্যে আশার আলো দেখছি।" তারপর দেশের হাল আমলের খবর, দেশের সাহিত্যের সমস্যা সম্পর্কে কিছু কথা বলে যখন বসে পড়লাম তখন খ্যাতনামা অধ্যাপক বসু আমার কাছে এগিয়ে এলেন। বললেন, 'একদিন রাত্রে ডাল-ভাত খেতে আসতেই হবে।"

ডাল-ভাত খেতে গিয়েই গল্প হচ্ছিল। ওঁকে হাওয়েলের কথা শোনাতেই বললেন, "এখানে কত জনের স্নেহ যে পেয়েছি সে আপনাকে কী বলবো!"

"কিন্তু সে কথা থাক, আপনার বক্তৃতা সেদিন আমার খুব ভাল লেগেছিল। আপনি বললেন, জীবনে দুঃখ কষ্ট সমস্যা থাকবে, তার মধ্যেই আনন্দের আয়োজনে ভাগ বসাতে হবে, আমাদের এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে অনাগত উত্তরপুরুষের কাছে আমরা ছোট হয়ে না যাই।"

এবার তুলসীদাসের এক দোঁহা সুর করে গাইতে লাগলেন রাজচন্দ্র বসু। তুলসী বলছেন, "যখন তুমি এই পৃথিবীতে এসেছিলে তখন সবাই হেসেছিল আর তুমি কেঁদেছিলে, তুমি এমন কাজ করো যাতে যখন তুমি চলে যাবে তখন তুমিই কেবল হাসবে, আর সবাই কাঁদবে।"

রাজচন্দ্র বসু ষাট পেরিয়েছেন। সানফ্রান্সিসকো থেকে নিউইয়র্ক পর্যন্ত মার্কিন পণ্ডিত মহলে তাঁর প্রচণ্ড খ্যাতি। স্ট্যাটিসটিকস সংক্রান্ত বইয়ের পরিচ্ছেদে তাঁর নাম এসে যায়। কিন্তু ঘরে রবীন্দ্রনাথের বই ঠাসা। অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি—হুড়হুড় করে কবীর, বিদ্যাপতি, রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস থেকে মুখস্থ বলে যেতে পারেন।

রাজচন্দ্র এখন আমেরিকান নাগরিক, কিন্তু পাসপোর্টের রঙ পাল্টালেও বাংলার সংস্কৃতিকে ভুলতে পারেননি। খাঁটি বাঙালিই রয়ে গেলেন নানা দিক দিয়ে।

বহুদিন পরে জন্মভূমির এক ভ্রাম্যমাণ লেখকের সান্নিধ্য লাভ করে রাজচন্দ্র সেদিন নিজের মন খুলে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন নিজের প্রথম জীবনের কথা। "আসলতঃ আমি স্ট্যাটিসটিকসের লোক নই—কারণ অঙ্ক নিয়ে এম এ পাস করেছিলাম কলকাতা থেকে। তারপর আশুতোষ কলেজে আশি টাকা মাইনের অধ্যাপনা করতাম, আর থাকতাম এক মেসে। পরীক্ষায় খুব ভাল করেছিলাম, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি যোগাড় করতে পারলাম না—প্রতিবারই তদ্বিরের জয় হলো। শেষে রিসার্চ করছিলাম। একদিন ডঃ মেঘনাদ সাহার বাড়িতে গিয়েছিলাম। জিজ্ঞেস করলেন, কী করছো? বললাম, কতকগুলো অঙ্কের জ্যামিতিক সমাধান নিয়ে থিসিস তৈরি করছি।"

"সেইদিন ওই পর্যন্ত কথা হয়েছিল। সেই সময় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ

ভারতীয় স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট খুলছেন। ডঃ সাহার সঙ্গে গল্প করতে এসে প্রশান্তচন্দ্র একদিন বললেন, জ্যামিতি জানা একটা ভাল লোকের সন্ধান করছি। ডঃ সাহা বললেন, একটি ছেলে এসেছিল কিছুদিন আগে। সে বলছিল ঐ বিষয়ে কাজ করছে।

"একদিন প্রশান্তচন্দ্র আমার মেসে হাজির। বললেন, চলো আমার আই-এস-আইতে।" বললাম, আমি স্ট্যাটিসটিকসের কিছুই জানি না। উনি বললেন, কোনো অসুবিধে হবে না, সে আমি শিখিয়ে পড়িয়ে নেব'খন।"

"কয়েক টাকা মাইনে বেশি হলো, আর চলে এলাম আই-এস-আইতে। এখানে কয়েকমাস কাজ করেছি। প্রায়ই প্রশান্তচন্দ্রকে বলি, কই আমাকে স্ট্যাটিসটিকস শেখালেন না। উনি বলেন, হবে হবে, এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন?"

"পুজোর ছুটিতে সেবার সস্ত্রীক দার্জিলিং যাওয়া হলো। প্রশান্তচন্দ্র ইনস্টিটিউটের বড়োবাবুকে বললেন, অমুক অমুক বইগুলো আমাদের সঙ্গে দার্জিলিংয়ে যাবে। দার্জিলিংয়ে উনি বইগুলোর কয়েকটা পরিচ্ছেদ মার্কা করে দিলেন। বললেন, এইগুলো পড়ে ফেলো, তাহলেই তুমি স্ট্যাটিসটিসিয়ান হয়ে যাবে।"

"সুতরাং আইনতঃ আমি একজন হাতুড়ে স্ট্যাটিসটিসিয়ান," হাসতে হাসতে বললেন রাজচন্দ্র বসু।

তারও অনেকদিন পরে একজন আমেরিকান অধ্যাপক ভিজিটিং অধ্যাপক হিসেবে বরানগরে স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে এসেছিলেন। তিনিই দু'জন বাঙালি অধ্যাপককে—সমর রায় ও রাজচন্দ্র বসুকে—মার্কিন দেশে নিয়ে এসেছিলেন।

এরাই নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ট্যাটিসটিকসের গোড়াপত্তন করেন। অধ্যাপক সমর রায় কিছুদিন আগে চ্যাপেল হিল-এ দেহত্যাগ করেছেন। তাঁর স্ত্রী ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ওখানেই রয়ে গিয়েছেন।

"মিসেস রায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে?" জিজ্ঞেস করলেন রাজচন্দ্র।

বললাম, "আলাপ হয়েছে। দু'দিন রাত্রে ওঁদের বাড়িতে গিয়ে প্রাণভরে গল্প করেছি। অতি চমৎকার পরিবার। যে-ছেলেটি ডাক্তারি পড়ে তার সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গিয়েছে।"

"ওঁদের বড়োছেলে রাটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে এর মধ্যে অ্যাসিসস্ট্যান্ট প্রফেসর হয়েছে," বললেন রাজচন্দ্র।

রাজচন্দ্র এবার নিজের কথায় ফিরে এলেন। "ছোটবেলা থেকেই দেশভ্রমণের নেশা—আমার গৃহিণীরও এই রোগ আছে। দুজনে থার্ড ক্লাসে ভারতবর্ষ চষে বেড়িয়েছি, হোটেলের খরচ বাঁচাবার জন্যে সারাদিন ঘুরে রাত্রে ট্রেনে চেপে

এসেছি। দেশ দেখবার লোভেই এখানে এসেছিলাম প্রথমে, তারপর বুঝলাম, এখানে কাজের অনন্ত সুযোগ।"

"গুণের সমাদরে এদের জোড়া নেই, বুঝলে ভাই," বললেন রাজচন্দ্র।"

বিদেশে ক্রমে ক্রমে অনেক উন্নতি করলেন রাজচন্দ্র। কিন্তু অন্য অসুবিধাও দেখা দিলো। দেশরক্ষাসংক্রান্ত গোপনীয় কাজকর্ম মার্কিন নাগরিক ছাড়া অন্য কাউকে দেওয়া হয় না। মার্কিন নাগরিকত্ব পাওয়াও সহজ নয়। শেষ পর্যন্ত আমেরিকান নাগরিক হয়ে গেলেন কলকাতা আশুতোষ কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক রাজচন্দ্র বসু।

রাজচন্দ্র বললেন, "পরিবেশ যে মানুষকে কতখানি পাল্টে দেয় তার প্রমাণ আমি নিজে। কর্মজীবনের প্রথম অর্ধেক ভাগে কলকাতায় বসে যা করেছি, এখানকার বাকি অর্ধেকে তার থেকে পাঁচ ছ'গুণ কাজ করেছি।"

"ভারতবর্ষে প্রথম জীবনে খেটেখুটে কেউ একটা কাজ করে, তারপর সেইটা ভাঙিয়েই বাকি জীবন চলে। এখানে তার উপায় নেই। কবে তুমি কী থিয়োরি আবিষ্কার করেছ বলে এখন বসে বসে সময় নষ্ট করবে, তা চলবে না।"

কাজকে প্রাণাধিক ভালবাসেন রাজচন্দ্র। নিত্য নতুন গবেষণায় এখনও তাঁর [illegible] আগ্রহ।

রাজচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে আপনার কী কী জিনিস চোখে পড়লো?"

বললাম, "এত অল্প সময়ের মধ্যে এতবড়ো দেশকে বোঝবার মত স্পর্ধা নেই। কোনো দেশ সম্বন্ধে একটা ঢালাও মন্তব্য করতেও আমার মন চায় না। তবে এই প্রথম দেশের মাটি ছেড়ে বিদেশে পা দিয়ে বুঝলাম—মানুষের একটা দাম আছে। অভাব অনটন দুর্ভিক্ষ বেকার সমস্যার মধ্যে প্রতিপালিত হয়ে এতদিন ভাবতাম মানুষ আসলে একটা বোঝা, খাতায় কলমে যাই বলি আসলে তার কোনো দাম নেই।"

আমার মুখের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থেকে, আমাকে কথা বলার সুযোগ দিচ্ছেন রাজচন্দ্র বসু। সাহস পেয়ে আমি বললাম, "অন্য মানুষের দাম আছে [illegible] এখানে প্রত্যেক মানুষকে খাটতে হয়। আর এই সভ্যতার আদর্শবাদের [illegible] দেখতে হলে নর্থ ক্যারোলিনার মত বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে হয়।"

রাজচন্দ্র বললেন, 'আমি অঙ্কের মানুষ—অ্যাভারেজ কথাটার ওপর জোর দিয়ে। ছোটবেলায় যে ভারতবর্ষে মানুষ হয়েছি—সেখানে বড়কে নিয়েই সবাই [illegible]। সবচেয়ে বড়ো রাজা, সবচেয়ে বড়ো কবি, সবচেয়ে বড়ো শিল্পী, সবচেয়ে বড়ো জন-নেতা, সবচেয়ে বড়ো অধ্যাপক, সবচেয়ে বড়ো কলেজ, সবচেয়ে বড়ো ছাত্র—এই নিয়েই আমরা মাথা ঘামাতাম। এখন জিনিসটা ভাল লাগে না।

এখন জানতে ইচ্ছে করে সাধারণ স্তরটা কেমন বলো। কিছুদিন আগে শুনলাম, আমার এক শুভানুধ্যায়ী ভারতবর্ষে বলেছেন—'দেশে থাকলে রাজচন্দ্র নিজের প্রফেশনের চূড়ায় উঠতে পারতো।' আমি শুনে বলেছি—আমি যে-দেশে আছি সেখানে পর্বতশৃঙ্গ নেই—কিন্তু একটা উঁচু মালভূমির ওপর অন্য অনেকের সঙ্গে আমিও দাঁড়িয়ে আছি।"

রাজচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলে সেদিন আমার দৃষ্টি উন্মীলিত হতে আরম্ভ করেছিল। সত্যি, চূড়োর দিকেই নজর আমাদের, সেই নিয়েই আমাদের মাতামাতি—সাধারণ গোল্লায় যাক, তাদের সম্বন্ধে ভাববার মত সময় আমাদের নেই।

রাজচন্দ্রকে বললাম, "বিদেশ-ভ্রমণে এসে মার্কিনমুলুক কতখানি আবিষ্কার করছি জানি না, কিন্তু নিজের দেশের ছবিটা ক্রমশঃই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।"

"ঈশ্বর আপনার দৃষ্টিকে আরও স্বচ্ছ করে তুলুন," এই আশীর্বাদ করে আমাকে তিনি বিদায় দিয়েছিলেন।

রাজচন্দ্রের বাসা থেকে বেরিয়ে চাঁদের আলোয় স্নান করা চ্যাপেল হিলকে দেখছিলাম। অধ্যাপক হাওয়েলের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল—"এমন সুন্দর জায়গা পৃথিবীতে খুব কম পাবেন। চ্যাপেল হিল-প্রেমিক এক কবি লিখেছিলেন—জীবনে অন্তত শতরমণীকে ভালবেসেছি আমি, কিন্তু আমার ভালবাসার শহর একটিই—তার নাম চ্যাপেল হিল।"

চ্যাপেল হিলকে আমিও কেমন আমার অজান্তে কখন ভালবাসতে আরম্ভ করেছি। কিন্তু আমার বিদায়-মুহূর্ত আগত। আগামীকাল ভোরেই আমাকে আবার বেরিয়ে পড়তে হবে নিউ ইয়র্কের পথে।

পরের দিন ভোরে চ্যাপেল হিল থেকে বিদায় নেবার আগে, মনে মনে লুইস কার্নাহানকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। ওঁর জবরদস্তিতে চ্যাপেল হিল-এর প্রকৃতি, বিশ্ববিদ্যালয় আর মানুষগুলোকে দেখা হলো। এসব না দেখলে আমার বিদেশ ভ্রমণ এবং আমার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যেতো।

নিউ ইয়র্কের পথে

চ্যাপেল হিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অদূরে সংখ্যাতত্ত্বের উদীয়মান অধ্যাপক শ্রীসেনের গাড়ির এক কোণে বসে পুরনো কথাগুলো ভাবছিলাম। সেনগৃহিণী বললেন, "কী এত ভাবছেন, শংকরবাবু?"

"ভাবছি, বঙ্কিমচন্দ্রের দাদা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বহুদিন আগে যে কথাটা

কোতুকচ্ছলে লিখেছিলেন, তা আজও মিথ্যে হয়নি। বিদেশে বাঙালি মাত্রই সজ্জন। জীবনে এই প্রথম দেশ ছেড়ে বিদেশে এসে কত যে মাতৃভাষীর সঙ্গে আলাপ হলো এবং তাঁরা যেভাবে আমাকে আপন করে নিলেন তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।"

অধ্যাপক সেন সরল সোজা মানুষ। বললেন, "বিদেশে বাঙালির কথাটাও একটু ভাবুন। হয় বিদ্যালাভ অথবা অর্থলাভের জন্যে নিজের দেশ ছেড়ে কোথায় আমরা পড়ে আছি। স্বদেশের মানুষ দেখলে আমাদের একটু আনন্দ হবে না? দেশওয়ালীর সঙ্গে গল্প করে, সময় কাটিয়ে, বাংলায় কথা বলে আমরা কিছুক্ষণের জন্যে বাংলায় চলে যাই যেখানে সশরীরে যেতে গেলে অন্ততঃপক্ষে হাজার বারো টাকার এরোপ্লেন-ভাড়া লাগে।"

বললাম, "আপনারা সংখ্যাতত্ত্বের পণ্ডিত, বেপাড়া থেকে এসে ধুরন্ধর আমেরিকানদের পর্যন্ত হিসেব শেখাচ্ছেন—আপনার সঙ্গে আমি কী করে কথায় পেরে উঠবো?"

অধ্যাপক সেন বললেন, "আমার এক বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম—বিদেশের যে কোনো জায়গায় অপটিমাম বাঙালির সংখ্যা আট। এর বেশী হলেই দুর্গাপুজো এবং থিয়েটার এসে পড়বে। এবং দুটি উৎসবকে কেন্দ্র করে যে-বঙ্গ সন্তান ঝগড়া না-পাকায় তার বাঙালিত্ব ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে দেখা দরকার।"

এবার গাড়ি ছাড়লো। সঙ্গে আরও দু'জন বাঙালি বন্ধু আছেন। এঁরা সবাই আমাকে র‍্যালে বিমান-বন্দরে পৌঁছে দেবেন। কোথায় চ্যাপেল হিল আর কোথায় র‍্যালে! কিন্তু চ্যাপেল হিলবাসীরা শুনলেন না। তাঁরা শুধু আদর যত্ন করলেন তাই নয়—ভোরবেলা অধ্যাপক সেন গাড়ি বার করলেন আমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবার জন্যে।

অধ্যাপক সেনকে বলেছিলাম, "সমস্ত সপ্তাহ ধরে খাটাখাটি করেন—কেন এই ছুটির দিনের সকালটা আমার জন্যে মাটি করবেন?"

কিন্তু কোনো কথাই চলেনি। ওঁর স্ত্রী বললেন, "জানেন তো জামাইয়ের নামে মেরে হাঁস, বংশ সুদ্ধ খায় মাস। আপনার নাম করে আমরা সবাই আউটিং করতে পারছি এবং তার থেকেও বড়ো কথা, মিসেস দে-র সঙ্গে দেখা হওয়ার একটা সুযোগ পাচ্ছি। জানেন, মিসেস দে-র সঙ্গে প্রায়ই টেলিফোনে কথা বলি—কিন্তু মাঝে-মাঝে ওঁকে না দেখলে ভাল লাগে না। ওঁর মধ্যে একটা ব্যাটারী চার্জার আছে—যেন কোনো ঝিমিয়ে পড়া ইন্ডিয়ানকে নিজের স্নেহ ও উৎসাহে আনামাদি আবার চাঙ্গা করে দেন।"

স্টিয়ারিং ঘুরোতে ঘুরোতে মিঃ সেন বললেন, "মিসেস দে না থাকলে

এখানকার বাঙালি গিন্নীদের খুব অসুবিধে হতো। কারণ এঁদের বেশীর ভাগই তো স্বামী গরবে গরবিনী হয়ে বিয়ের পরই পাসপোর্ট হাতে করে এখানে হাজির হন। সংসার ও রান্নাবান্নার কোনো অভিজ্ঞতাই সঙ্গে নিয়ে আসেন না। অথচ বিদেশে কট্টর সায়েব বাঙালিও মাছের ঝোল-ভাত এবং পোস্তচচ্চড়ির জন্য চোখের জল ফেলেন। রসনা পরিতৃপ্তির জন্যেই তো হাজার হাজার মাইল দূর থেকে বউ ইমপোর্ট করা—না হলে সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী স্থানীয় মেমসাহেবরা কী দোষ করলো?"

শ্রীমতী সেন সঙ্গে সঙ্গে স্বামীকে প্রয়োজনীয় ভর্ৎসনা করলেন। কিন্তু বিশেষ ফল হলো না। অধ্যাপক সেন বললেন, "এই সব কাঁচা মেয়ে পিটিয়ে বউ করবার পবিত্র দায়িত্ব মিসেস দে স্বেচ্ছায় নিয়েছেন।"

র‍্যালের কাছে ডারহামে দে পরিবারের বাস। কর্তা স্থানীয়-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ওইখানেই গাড়ি থামলো।

ওঁরা আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। অধ্যাপক দে আমাকে স্বাগত জানিয়ে, সেনকে বললেন, "সেই সকাল থেকে মুখ চেয়ে বসে আছি। ভেবেছিলাম আরও আগে চলে আসবেন। রাস্তায় কোনো অসুবিধে হয়নি তো?"

অধ্যাপক দে ও তাঁর স্ত্রীকে না দেখলে আমার মার্কিন-ভ্রমণ সত্যিই অসমাপ্ত থেকে যেতো। শ্রীমতি দে দু'তিন শ' বর্গ মাইল বিস্তৃত এক ভূখণ্ডের যতো বাঙালি আছেন তাঁদের পরামর্শদাত্রী ও গার্জেন। এমন মিষ্টি স্বভাবের মহিলা আজকাল জীবনে তো দূরের কথা, নাটক-নভেলেও পাওয়া যায় না। শ্রীমতী দে আমাদের নিয়ে হৈ হৈ করতে লাগলেন। একজন ভক্ত রসিকতা করে বললেন, "দুই পুত্রকে লালন এবং দাদাকে পালন করেও বৌদি এতো বাড়তি এনার্জি কোথা থেকে পান?"

বৌদি হাসিমুখে চটপট উত্তরে দিলেন "কেন? দেশে ফিরে গিয়ে হরলিকসের বিজ্ঞাপন লিখবে নাকি?"

শ্রীমতী দে আমাদের খুবই আদর-যত্ন করলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এমন আপন করে নিলেন যে, কে বলবে এখানে কয়েক মিনিট আগে এসেছি। মিসেস দে-র ছেলে দুটি পড়াশোনায় খুব ভাল। স্কুল ও কলেজে যথেষ্ট নাম কিনেছে। কিন্তু মিসেস দে ছেলেদের বলে দিয়েছেন, আমি চাই তোমরা দেশে ফিরে যাবে, সেখানে দেশের যাতে ভাল হয় তার চেষ্টা করবে।"

চা খেতে খেতে মিস্টার দে বললেন, "এখানে বাড়ি করেছি। এত প্রাচুর্যের মধ্যে আছি—কিন্তু দেশের কথা কিছুতেই ভুলতে পারি না। দেশের লোকদের দেখলে দেশের মানুষদের দুঃখের কথাও মনে পড়ে যায়। অনেকে দেখি হতাশ হয়ে পড়েছেন—তাঁদের ধারণা ভারতবর্ষকে দিয়ে আর কিছু হবে না। কথায় না

বড়ো হয়ে, কাজে বড়ো হওয়ার চেষ্টা নাকি তেমন দেখা যাচ্ছে না। আমি কিন্তু হতাশ হইনি। আমার ধারণা, আমরা আবার বড়ো হবো—আমাদের সভ্যতার মধ্যে যে শক্তি ঘুমিয়ে রয়েছে তাকে কোনো রকমে জাগাতে পারলেই অদ্ভুত ঘটনা ঘটবে।"

আরও কয়েকজন স্থানীয় বাঙালি সস্ত্রীক এলেন দে নিবাসে। এদের সঙ্গে একে-একে পরিচয় করিয়ে দিলেন শ্রীমতী দে। কেউ ওঁর দেওর, কেউ ভাই, কেউ ভাগ্নে। দে নিবাসে এসে সবাই আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠে।

আড্ডা বেশ জমে উঠলো। এই ঘরের কথাবার্তা শুনলে কে বলবে আমরা স্বদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে অন্য এক মহাদেশের প্রান্তে বসে আছি।

অধ্যাপক দে বেশী কথা বলেন না, কিন্তু যা বলেন তা যে তাঁর অন্তর থেকে বেরিয়ে আসছে তা বুঝতে একটুও দেরী হয় না।

চাপা গলায় নিজের সংসারের বিবরণ দিতে-দিতে অধ্যাপক দে আমাকে বললেন, "আমার স্ত্রী সবসময় ছেলে দুটোর কথা চিন্তা করেন। ওঁর ইচ্ছে ওরা যেন ভারতবর্ষের উপযুক্ত হয়ে উঠে। আমাদের এই যে স্বাচ্ছল্য—এটা যে সাময়িক, আমাদের যে আবার ভারতবর্ষে ফিরে যেতে হবে এবং প্রয়োজন হলে মফস্বলে পৈতৃক বাড়িতে থাকতে হবে যেখানে সবেমাত্র ইলেকট্রিক এসে পৌঁচেছে, তা আমার স্ত্রী প্রায়ই ছেলেদের মনে করিয়ে দেন।"

শ্রীমতী দে আমাকে চা দিতে-দিতে বললেন, "ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে না? বলুন তো?"

একটু থেমে শ্রীমতী দে বললেন, "ভগবানের দয়ায় ছেলে দুটো পড়াশোনায় বেশ ভাল, ইস্কুলে খুব নাম করেছে। সেদিন ওদের হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গে দেখা হলো। ভদ্রলোক বললেন, মিসেস দে, দুটি সত্যি ভাল ছাত্র আমাদের উপহার দেবার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। আমি সঙ্গে সঙ্গে মাথায় হাত দিয়ে বসলাম। বললাম, মিস্টার রাইট, আপনার ধন্যবাদের জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু একটা কথা আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই—আমার এই ছেলে দুটিকে আপনাদের উপহার দেবার জন্যে আমি লালন করছি না। সময় হলেই এদের আমি ইন্ডিয়াতে নিয়ে যাবো—সেখানে ওদের আরও বেশী দরকার আছে।"

মিসেস দে এবং তাঁর অতিথিদের সঙ্গে সেদিন কতো মজার কথা হলো। মিসেস দে এরই মধ্যে কয়েকবার টেলিফোন ধরলেন। দু একটা কথাবার্তা যা কানে ভেসে এলো তা এই রকম।

'কে, রমেন কথা বলছো? কী ভাই, ঠিকমত পড়াশোনা হচ্ছে তো? দেখো বাবু, মেমসায়েবদের সঙ্গে ডেট-ফেটে জড়িয়ে পড়ো না—কী বললে? শোনো ছোকরা, এই সব মেমসায়েব শো-কেসে সাজিয়ে রাখবার পক্ষে খুব ভাল—কিন্তু

সংসার করলে হাড়ে দুর্বো গজিয়ে দেবে। যা হোক, সামনের শনিবার রাত্রে ডেট না করে এখানে চলে আসবে, মাছের ঝোল ভাত খাওয়ার নেমন্তন্ন। রাত্রে এখানেই থেকে যাবে—হোল-নাইট আড্ডার ব্যবস্থা করা যাবে।"

আর একটা ফোন, "হ্যালো, কে সুধীর নাকি? শোন, তোমার ওভার-কোট চ্যাপেল হিলে কিনো না। এখানকার সেলে এক ডলার সস্তা হবে—আমি কিনে, কারুর হাতে পাঠিয়ে দেবো। মনে রেখো ভাই, ডলারগুলো জলে ফেলবার জন্যে নয়। আর ওই চাকরির ব্যাপারে চিন্তা করো না—ওখানকার টার্ম শেষ হলেই কাছাকাছি কোনো ইউনিভার্সিটিতে যাতে আর কিছু পাও তার জন্যে কর্তাকে রোজ তাগাদা লাগিয়ে যাচ্ছি।"

মিসেস দে-র এই মধুর বৌদি ভাবটা খুব ভাল লাগছিল কানাঘুষায় জানা গেলো বিদেশে বাঙালিদের বিপদে-আপদে সুখে দুঃখে শ্রীমতী দে সব সময় জড়িয়ে আছেন।

আড্ডার ফাঁকে-ফাঁকে কখন যে সময় গড়াতে আরম্ভ করেছে তা বুঝিনি। এরই মধ্যে প্রচুর খাওয়াদাওয়া হয়েছে। শ্রীমতী দে-র রান্নার প্রশংসা করতে-করতে একজন ভদ্রলোক বললেন—"একহাতে খুন্তি অপর হাতে ঝাঁটা, এই হচ্ছে আদর্শ বঙ্গরমণীর মূর্তি।"

অধ্যাপক দে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "এবার উঠতে হয়। শংকরবাবুকে নিশ্চয় তোমরা প্লেন ফেল করাতে চাও না?"

মিসেস দে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন, "তোমার সব কিছুতেই তড়িঘড়ি। এখনও সময় রয়েছে। এ তো আর কলকাতার রাস্তা নয়, ঘণ্টায় পনেরো মাইলের বেশী যেতে পারবো না।"

ওঁদের বড়ছেলে বললো, "কিন্তু মা ভুলো না—আজ আমাদের ফুটবল টীম ফিরছে।"

অধ্যাপক দে আঁতকে উঠলেন। "তাই নাকি! সর্বনাশ! তাহলে আর এক মিনিটও দেরি না।"

এতে আঁতকাবার কি আছে, আমি ভাবছিলাম। অধ্যাপক দে জানালেন, "এই ফুটবলের ব্যাপারে আমেরিকান জাতটা সমস্ত পরিমিতি বোধ হারিয়ে ফেলে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এয়ারপোর্টে আসুক—কিছুই ভিড় হবে না। কিন্তু ফুটবল টীম অন্য জায়গায় জিতে নিজের স্টেটে ফিরছে—সে এক এলাহি ব্যাপার। কোনোরকমে ব্রেকফাস্ট গিলে ছেলে বুড়ো সবাই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়বে—দেড়মাইল-দু'মাইল লম্বা ট্রাফিক জ্যাম হয়ে যাবে।"

আমাদের স্থানীয় বন্ধুরা কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে গেলেন। এক-একটা দল এক-একটা গাড়িতে চড়লেন।

আমাদের গাড়িটা অধ্যাপক দে নিজেই চালাচ্ছেন। রসিকতা করে তিনি বললেন, "স্বদেশ সম্বন্ধে যারা হতাশ হয়ে পড়েছে তাদের আমার ভাল লাগে না। আমার স্ত্রী তো ছেলেদের সব সময় বলছেন—মনে রেখো তোমাদের দেশ খুব গরীব, সেখানেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।"

আমি এবার জিজ্ঞেস করলাম : বিদেশে বসে আপনি ছেলেদের স্বদেশী করবার জন্যে এত চেষ্টা করছেন কেন? আপনার স্বার্থটা কী?"

মিসেস দে হেসে ফেললেন। "ঠিকই আন্দাজ করেছেন। এর পেছনে দেশপ্রেম ছাড়াও নিজের স্বার্থ আছে। এদেশে ছেলেমেয়েরা বুড়ো বাবা-মাকে দেখে না। আমি বাপু বুড়োবয়সে একা থাকতে পারবো না, তাই ছেলেদের নিয়ে ইন্ডিয়াতে চলে যেতে চাই।"

স্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখে অধ্যাপক দে বললেন, "কোথায় যেন শুনেছিলাম, ভাগ্যবানরা জাপানে শৈশব, আমেরিকায় যৌবন এবং ভারতবর্ষে বার্ধক্য অতিবাহিত করেন।"

মিসেস দে পরামর্শ দিলেন, "এদেশে যখন এসেইছেন, তখন বার্ধক্যের সমস্যাটা একটু খুঁটিয়ে দেখবার চেষ্টা করবেন। অনেক গল্পের উপাদান পাবেন।"

এরপর তেমন আর কথাবার্তার সুযোগ হয়নি। যা ভয় করা গিয়েছিল তাই হলো। ছুটির দিনে হাজার হাজার গাড়ি এয়ারপোর্টের রাস্তা প্রায় জমাট করে দিয়েছে—তাঁদের প্রিয় ফুটবল দল দেশে ফিরছে, আর তাঁরা কি হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকতে পারেন?

এয়ারপোর্টের আগেই গাড়ি থেকে নেমে পড়ে পদযাত্রা শুরু করতে হলো। ওরা আমাকে এরোপ্লেন কোম্পানির হাতে জমা দিয়ে একে একে বিদায় নিলেন। অধ্যাপক দে বললেন, "কোনো দরকার হলে চিঠিপত্র লিখবেন।"

বিমানবন্দরের লাউঞ্জে বসেই কেমন নিঃসঙ্গ মনে হতে লাগলো। এই এতোক্ষণ দেশওয়ালী পরিবৃত হয়েছিলাম, আর এখন একা—সত্যিই বিদেশে বাস করছি।

আশেপাশে দু'একজন যাত্রী আমারই মতো প্লেনের অপেক্ষায় রয়েছেন। কিন্তু এঁদের সঙ্গে সেধে আলাপের লোভ সংবরণ করতে হলো। বিদেশযাত্রার আগে জনৈক শুভানুধ্যায়ী হাতে একখানা পুস্তিকা ভিড়িয়ে দিয়েছিলেন—'হোয়াট টু ড অ্যান্ড হোয়াট নট টু ডু ইন আমেরিকা' মার্কিন মুলুকে ভারতীয় মুশাফির কী করতে পারেন এবং কী করতে পারেন না সে সম্বন্ধে নানা গোপন উপদেশে এই বইটি বোঝাই। যেমন, 'থ্যাংক ইউ, শব্দদ্বয়ের ঢালাও বিতরণ যে অবশ্যকর্তব্য তা বার বার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোনো মার্কিন গৃহে ডিনারে নিমন্ত্রিত হলে নিজের এঁটো থালা-বাটি মেজে দেবার প্রস্তাব অতিথির

সৌজন্যবোধের অঙ্গ। কোনো গৃহে পরিবারে অতিথি হলে—সবচেয়ে অসভ্যতা বাথরুম ভিজে রেখে চলে আসা। আমার বন্ধু জগাকে এটি বলায় সে কিছুই বুঝতে পারলো না। পিঁয়াজি রাখো—কথাটার কোনো মানেই হয় না।'—বাথরুম যে ভিজে ছাড়া আর কিছু হয় তা খাঁটি বাঙালি জগার কল্পনাতীত।

আরও দুটি প্রয়োজনীয় উপদেশের কথা মনে পড়লো। কখনও গায়ে পড়ে আলাপ করাটা সুশোভন নয়। দীর্ঘ বাস অথবা প্লেন যাত্রায় তোমার পাশের সীটের যুবতী মহিলা তোমার সঙ্গে মিষ্টি বাক্যালাপ করতে পারেন—কিন্তু মনে রেখো, তার মানেই তিনি তোমার প্রেমে পড়ে গিয়েছেন তা নয়। সাধারণ সৌজন্যকে হৃদয়দানের সবুজ নিশানা বলে ভুল করলে পস্তাবে।

বিনা ইনট্রোডাকশনে সায়েবরা যে পরিচিত হতে চান না, তার এক গল্প গিলবার্ট ও সালিভানের ছড়ার বই ব্যাব ব্যালাডস্-এ পড়েছিলাম। দু'জন সায়েব জাহাজডুবি হয়ে এক নির্জন দ্বীপে উঠেছেন। দু'জনেই সমুদ্রের ধারে বসে আপন মনে নিজের আত্মীয় বন্ধুদের স্মৃতিচারণ করছেন, বিড় বিড় করে বকছেন—কিন্তু অন্য জনের সঙ্গে কথা বলতে পারছেন না। কী ক'রে ওঁরা কথা বলবেন? ওঁদের যে ইনট্রোডিউস করে দেওয়া হয়নি!

লোকমুখে শোনা গিয়েছিল এই গোমড়া সামাজিকতা ইংরেজদের বৈশিষ্ট্য মার্কিন মুলুকের মানুষরা অনেক সহজ এবং সরল। তবু সাহস হচ্ছিল না, নিজে থেকে কোনো সহযাত্রীর সঙ্গে আলাপ করার। মনের মধ্যে তখন দুটো ভাগ হয়ে গিয়েছে। একপক্ষ বলছে, "এত লজ্জা কেন? সামান্য ক'দিনের জন্যে এসেছো এখানে। সুতরাং দেশ ও মানুষকে জানবার সুযোগ হারিও না। এমন লাজুক মুখচোরা হয়ে থাকলে চলবে কেন? যাও, এগিয়ে গিয়ে কথা বলো।"

অপর পক্ষ বলছে, "কখনও না। এখনও কি ছেলেমানুষীর বয়স আছে? এখন তুমি একজন প্রৌঢ় ভারতীয়—সেধে আলাপ করতে গিয়ে কেউ যদি প্রত্যাখ্যান করে তাহলে শুধু তোমার নয়, পঞ্চাশ কোটি ইন্ডিয়ানের অপমান—ইন ফ্যাক্ট, ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশন ও কালচারের অপমান।"

মনকে বোঝালাম হঠাৎ আলাপ থেকে অনেক সময় ভাগ্যের মোড় ফিরে যায়। হঠাৎ আলাপের ফলেই অনেক স্মরণীয় ঘটনা পৃথিবীতে সম্ভব হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের কথাই ধরা যাক। বিদেশ-বিভূঁইয়ে অপরিচিত স্বামীজীর সঙ্গে ট্রেনে যদি হঠাৎ হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইটের পরিচয় না হতো তাহলে তিনি হয়তো শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে বক্তৃতা দেবার সুযোগই পেতেন না। তার পরবর্তী ঘটনাগুলো সাজিয়ে নেওয়া যাক। সায়েবরা স্বামীজীকে ভাল না বললে, আমরা নিশ্চয়ই তাঁকে আদর করতাম না। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ থেকে আরম্ভ করে হাল আমলের সত্যজিৎ রায় ও রবিশঙ্কর পর্যন্ত

সকলকেই আগে সায়েবদের সার্টিফিকেট নিতে হয়েছে, তবে দেশের লোকেরা তাঁদের গলায় বড়ো বড়ো মালা পরাবার ভরসা পেয়েছেন।

মনের এই অবস্থার মধ্যে হঠাৎ গেটের দিকে নজর পড়ে গেলো। দেখলাম এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ট্যাক্সি থেকে নেমে অনেকগুলো মালের চাপে নড়বড় করছেন! কুলি বস্তুটি এদেশে বিরল—নিজে যা বইতে পারবে না তা নিয়ে পথে বেরিও না, এই হলো পথের বিধি। বিমান-বন্দরে অবশ্য সুদৃশ্য ঠেলাগাড়ি থাকে। তাতে মাল চাপিয়ে ঠেলে নিয়ে যাওয়া অনেক সহজ। হাতের কাছে সেটাও দেখা যাচ্ছে না। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের ডান হাতটা একটু দুর্বল মনে হলো। হাতটা মালের চাপে সামান্য কাঁপছে। মাল বওয়া আমার কোনোদিনই অভ্যাস ছিল না—কিন্তু কয়েক সপ্তাহ ফরেন ট্রেনিংয়ে এখন মুটে হওয়ার ভয় কেটে গিয়েছে। সুতরাং দ্রুতবেগে একটা ঠেলা যোগাড় করে ওঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'আপনাকে সাহায্য করতে পারি কি?"

সায়েব চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য পরনির্ভরশীলতায় আন্তরিক অনিচ্ছা। আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে সায়েব বললেন, "না না, আমি এই ক'টা মাল নিয়ে যাবার মত শক্তি রাখি। শুধু হঠাৎ ডান হাতটা একটু দুর্বল হয়ে পড়েছিল।"

আমি বললাম, "আমার মালপত্তর আমার বন্ধুরা এইমাত্র তুলে দিয়ে গেলেন। এখন আপনাকে সাহায্য করবার সুযোগ দিন।"

মালগুলো আমার হাতে তুলে দিতে পেরে ওঁর সত্যিই কষ্টর লাঘব হলো। এয়ার লাইনস কাউন্টারে ভারমুক্ত হয়ে তিনি এসে আমার পাশে বসলেন। নিজের চশমাটা মুছতে মুছতে বললেন, "এই জন্যেই বলে, আমরা সময়ের দাস। কেউ কি বিশ্বাস করবে যে যৌবনে আমি একজন চ্যাম্পিয়ান ওয়েটলিফটার ছিলাম—অনেক প্রাইজ পেয়েছি।"

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। ভদ্রলোক আমাকে এমনভাবে ধন্যবাদ দিলেন যেন মানবসেবার বিরাট এক রেকর্ড স্থাপন করেছি।

বললাম, "আপনারা যে-বয়সে ভারি মাল নিয়ে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, যে-বয়সে আমাদের দাদু-দিদিমারা বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না। আপনাদের শক্তি ও সামর্থ্যের আমি একজন ভক্ত।"

ভদ্রলোক এবার প্রসঙ্গে পরিবর্তন করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "গোয়িং ফার? অনেক দূরে যাওয়া হচ্ছে নাকি?"

গল্প করার সুযোগ পেয়ে আনন্দের সঙ্গে জানালাম, "এমন কিছু দূরে নয়—নিউ ইয়র্ক যাচ্ছি।"

ভদ্রলোক বললেন, "আমিও নিউ ইয়র্ক যাচ্ছি। সুতরাং তোমার কোনো

অসুবিধা হলে আমাকে বলতে দ্বিধা করো না।"

হাতে যেন আকাশের চাঁদ পেলাম। প্যারিস থেকে ওয়াশিংটন আসবার পথে নিউ ইয়র্কের জন এফ কেনেডি এয়ারপোর্টে প্লেন পালটিয়েছি। কিন্তু নিউ ইয়র্কের ভেতরে ঢোকা হয়নি। এই প্রথম নিউ ইয়র্কে যাচ্ছি। ওখানকার যে-সব গোলমেলে ব্যাপার শুনেছি, তাতে পথে জানাশোনা লোক থাকা খুব ভাল।

"তুমি কি ইন্ডিয়া থেকে আসছো?" ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

"আজ্ঞে।"

ভদ্রলোক এবার আশ্বস্ত হলেন। "যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। ইন্ডিয়ানদের ম্যানারস-এ স্বাভাবিক ডিগনিটি আছে।"

ওঁর কথায় বেশ অবাক হলুম। বললাম, "আপনি কখনও ইন্ডিয়াতে ছিলেন?"

"কখনো তোমাদের দেশে যাবার সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু আমি জানি, তোমরা এখনও কীভাবে বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করো। কয়েকজন ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। সত্যি, তারা অন্য রকম—বৃদ্ধ মানুষদের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় তারা জানে।"

ইতিমধ্যে প্লেন চড়ার ডাক এলো। বোয়িং বিমানের মধ্যে গিয়ে দু'খানা পাশাপাশি সীট আমরা দখল করলাম।

ভদ্রলোক বললেন, "তোমার নাম জানতে পারি কি? আমার নাম ডেভিড ফারপো।"

নিজের নামটা জানালাম। কিন্তু ওঁর নাম শুনেই আমার মুখের ভাব পরিবর্তন দেখে উনি কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। "এই নামের কারুর সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে নাকি?"

বললাম, "কলকাতার লোকদের কাছে ফারপো নামটি অতি পরিচিত। আমাদের সবচেয়ে অভিজাত রেস্তোরাঁর ওই নাম। সেখানে অবশ্য ক'জন আর যেতে পারেন? কিন্তু ওই কোম্পানী আবার পাঁউরুটি তৈরি করেন। গরীব বড়লোক অনেকেই এই ফারপো রুটির ওপর নির্ভরশীল।"

ভদ্রলোক হেসে বললেন, "তোমাদের ফারপো নিশ্চয় আমারই মতো ইটালিয়ান?"

আমি সত্যিকথা নিবেদন করলাম। "ছোটবেলা থেকেই সব বিদেশিকেই আমরা 'সায়েব' বলে জানি। সায়েবদের রং ফর্সা, চুল কটা, স্বাস্থ্য ভাল এবং তাঁরা ইংরিজী বলেন, এই আমাদের ধারণা। সায়েবদের মধ্যে যে আবার নানা জাত আছে এবং অনেকেই যে ইংরিজী জানেন না, এই খবরটা আমাদের হাওড়ার গলিতে অনেকদিন পরে এসেছিল। তখন খবরাখবর নিয়ে জেনেছিলাম ফারপো রুটির ফারপো সায়েব ইটালিয়ান।

মিস্টার ফারপো আমার কথা শুনে প্রাণ খুলে হাসলেন। তারপর বললেন, "আমাকে তুমি একজন ইটালিয়ান-আমেরিকান বলতে পারো। জানো তো এই দেশকে মেলটিং পট বলা হয়। কয়েক-শ বছর ধরে বহু দেশের মানুষ ভাগ্যের সন্ধানে তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে এখানে হাজির হয়েছে—তারপর এই কড়াইয়ে সব ধাতু গলে মিলেমিশে নতুন এক সভ্যতা সৃষ্টি করেছে—তার নাম মার্কিনী সভ্যতা।"

মেলটিং পট কথাটা মন্দ লাগলো না। রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়ে গেল। মিঃ ফারপোকে বললাম, "আমাদের কবি বিভিন্ন মানুষের একীকরণ সম্পর্কে আর একটি সুন্দর উপমা দিয়েছেন।"

"তাই নাকি?"

"রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভারততীর্থ কবিতায় এক একটি জাতিকে নদীর সঙ্গে তুলনা করেছেন—নানা পথ বেয়ে তারা ভারতবর্ষের মহামানব-সমুদ্রে লীন হয়ে গিয়েছে—কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা, দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে সমুদ্রে হল হারা।"

মিঃ ফারপো বললেন, "আমাদের কল-কারখানার দেশ—তাই কামারশালার উপমাটাই লোকের মাথায় এসেছে। ভারতবর্ষের কবির মতো দৃষ্টি আমরা কোথায় পাবো?"

আমি বললাম, "আপনার কথার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হতে পারছি না—প্রকৃতির এমন বিচিত্র ঐশ্বর্য আর কোনো দেশে আছে কি? আর আপনাদের সাধারণ মানুষ পর্যন্ত প্রকৃতিকে কতখানি ভালবাসে এবং কতখানি আপন করে নিয়েছে সে তো নিজের চোখেই দেখছি।"

ইতিমধ্যে এক কাপ কফি পাওয়া গেলো ; মিঃ ফারপো বললেন, "আশ্চর্য ঘটনা! আমেরিকান ঘরোয়া বিমান সার্ভিসগুলোতে যাত্রীসেবার কোনো চেষ্টাই নেই—সাধে কি আর এক জাপানী ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'সার্ভিস' বা সেবা কথাটা ডিকসনারি ছাড়া আমেরিকার আর কোথাও খুঁজে পেলাম না। সামান্য কিছুক্ষণের ফ্লাইটে এই যে এক কাপ কফি পাওয়া গেলো এটা অপ্রত্যাশিত।"

ডোমেস্টিক মার্কিন বিমানে তেমন আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা নেই এটা সত্য কথা। তবে এর একটি কারণ, মার্কিনীরা বিমানকে বাস-এর মতন ব্যবহার করেন। হাজার-হাজার লাখ-লাখ লোক সব সময় বিমান-বন্দরের দিকে ছুটছেন, মিনিটে-মিনিটে প্লেন ছাড়ছে এবং সব সময়ই কয়েক লক্ষ লোক আকাশচারী হয়ে রয়েছেন। সবার নজর ঘড়ির দিকে, দুশো পাঁচশো মাইল দূরের কাজটা ঝট করে সেরে ফেলে কী করে লাঞ্চের আগেই অফিসে ফেরা যায় তার চেষ্টা করছেন সবাই।

সোজা হয়ে দাঁড়ালে মিস্টার ফারপো বোধহয় সাড়ে ছ'ফুট হবেন, যদিও বয়সের ভারে এখন একটু কুঁজো হয়ে পড়েছেন। আমাকে বললেন, "ইয়ং ইন্ডিয়ান, তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব আনন্দ বোধ করছি। তা তুমি এদেশে কী করছো? কতদিনই বা এখানে থাকবে?"

বললুম, "এদেশে আমি কিছুই করছি না—বিনা ধান্দায়, নিজের খেয়ালে ঘুরে বেড়াচ্ছি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে সরকারী এবং বেসরকারী নিমন্ত্রণে যে কয়েক হাজার লোক প্রতি বৎসর আপনাদের দেশ দেখতে আসেন, আমি সেই ভাগ্যবানদের একজন। সামান্য কয়েক সপ্তাহে এই বিরাট সভ্যতাকে বুঝে ফেলবো এমন স্পর্ধা আমার নেই। তাই ছাত্রের মতো এসেছি আপনাদের দেখতে এবং আপনাদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে। একমাত্র আনন্দের কথা, ছাত্র হলেও মাথার ওপর পরীক্ষার আড়াইমণি বোঝাটা নেই। যা দেখছি, তার সব কিছু মনে রাখার দায়িত্বও নেই।"

মিস্টার ফারপো আমার মুখের দিকে গভীর আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে রইলেন। আমি লিখি শুনে ওঁর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললেন, "আমি এক সময় ইনসিওর কোম্পানিতে চাকরী করতাম—'পলিসি' বিক্রি করে আরও কমিশন রোজগার করা ছাড়া আর কোনো পলিসি আমার কর্ম জীবনে ছিল না। এখন রিটায়ার করেছি—এবার যদি লেখাপড়া একটু হয়। তবে লেখাপড়া করি না বলে লেখার কদর বুঝি না, এমন নয়।"

আমি ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ কথা শুনে যাচ্ছিলাম। মিঃ ফারপো বললেন, "আমার এক বন্ধুর মতে, একমাত্র গল্প কবিতা উপন্যাসের সমাজের সত্যি খবর পাওয়া যায়। সত্যি খবর সংগ্রহ করা আজকাল সমস্ত পৃথিবীতেই শক্ত হয়ে উঠেছে।"

একটু থামলেন মিস্টার ফারপো। তারপর বললেন, 'ইয়ংম্যান, তুমি পৃথিবীর এক প্রাচীন দেশ থেকে এসেছো—আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক সম্বন্ধে একটু খোঁজখবর করে যেও। আমরা নিজেদের অজ্ঞাতে এবং হয়তো অনেকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনপুরুষের মধ্যে যে-সম্পর্কে গড়ে তুলছি তা কতখানি আধুনিক তা দেখে যেতে ভুলো না।"

বললাম "আপনি কি নাতি, বাবা এবং ঠাকুর্দা এই তিন ভূমিকার কথা বলছেন?"

হেসে ফেললেন মিস্টার ফারপো। "আজ্ঞে, ঠিকই ধরেছো। আজকাল সর্বত্র জেনারেশন গ্যাপ (এক বয়সের লোকের সঙ্গে অন্য বয়সের লোকদের দূরত্ব) কথাটা শুনতে পাবে। আমরা ক্রমশঃ পরস্পর থেকে সরে যাচ্ছি এবং সরে যাবার পরে নিজের চারিদিকে পাঁচিল তুলে নিজেকে আলাদা করে ফেলছি; তার ফলে

নানা মানবিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।”

মিস্টার ফারপো বললেন, “না, আমি বড়ো বক বক করছি! বুড়ো বয়সের এইটাই রোগ। এই জন্যে ইয়ং আমেরিকানরা আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চায় না।”

“আপনি কথা বলে যান, মিঃ ফারপো। আপনার সঙ্গে আলোচনার সুযোগ তো রোজ পাবো না।”

মিস্টার ফারপো বেশ খুশী হলেন। বললেন, “ইটালিয়ান-আমেরিকান, জার্মান-আমেরিকান, ইংরেজ-আমেরিকান, আইরিশ-আমেরিকান এদের সবারই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবে। তাছাড়া আছে ইহুদি আমেরিকান, প্রোটেস্টান্ট আমেরিকান, ক্যাথলিক আমেরিকান। আর সাদা আমেরিকান ও কালো আমেরিকানের সমস্যাটা তো পৃথিবীর সমস্ত লোকদের জানা।”

নিজের কথা শুরু করলেন মিঃ ফারপো। তিনি ইটালিয়ান-আমেরিকান। ১৮৯৩ সালে তাঁর বাবা ইটালিতে সংসার চালাতে না পেরে ভাগ্য সন্ধানে মার্কিন মুলুকে চলে আসেন। সঙ্গে করে এনেছিলেন বুড়ো বাবা ও মাকে। ইটালি থেকে বহু চাষী পরিবার এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমেরিকায় হাজির হন। এঁরা অনেকটা আমাদের মতো। যৌথ পরিবারের প্রতি আকর্ষণ ছিল, বৃদ্ধ বাবা ও মা সংসারে অনেক ক্ষমতা রাখতেন।

মিস্টার ফারপো বললেন, “নামের শেষে 'i' 'o' 'u' থাকলেই বুঝবে ইটালিয়ান হবার সম্ভাবনা। আমাদের নিজেদের মধ্যে টান এখনও কিছুটা আছে। এমন কি কাগজে দেখে থাকবে, আমাদের একটা সঙ্ঘ আছে—যারা প্রায়ই আর্থিক সাহায্যের জন্যে বিজ্ঞাপন দেয়। সঙ্ঘ এখন চেষ্টা করছে যাতে এই দেশে কেউ ইটালিয়ান আমেরিকানদের হেয় করতে না পারে। নাটক-নভেলে, থিয়েটারে টেলিভিশনে গুণ্ডার পার্ট থাকলেই তার ইটালিয়ান নাম দেওয়া হয়। স্বীকার করছি, শিকাগোর সেই বিখ্যাত ব্যানডিটদের বেশ কয়েকজন ইটালিয়ান ছিল। কিন্তু তাই বলে, গুণ্ডা ডাকাত মাত্রই ইটালিয়ান হবে এ কেমন কথা।

সাহিত্যিক, নাট্যকার এবং টেলিভিশন কোম্পানির এই ষড়যন্ত্র বন্ধ করার জন্যে সঙ্ঘ এবার উঠে পড়ে লেগেছে। অনেককে তারা সাবধান করে দিয়েছে যে ইটালিয়ানদের যাঁরা হেয় করবেন, তাঁদের বয়কট করা হবে। সমস্ত মার্কিন দেশে ইটালিয়ানদের ক্রয়ক্ষমতা নেহাৎ কম নয়—প্রতি মাসে তাঁরা কোটি কোটি ডলার খরচা করেন ; সঙ্ঘ শুধু সভ্যদের জানিয়ে দেবে, অমুক কোম্পানির মাল কিনো না, অমুক টেলিভিশনে তোমাদের কোম্পানীর বিজ্ঞাপন দিও না।

এতে ফল পাওয়া যাচ্ছে। চোর-জোচ্চোরদের ইটালিয়ান নাম দেওয়ার আগে লেখক এবং প্রযোজকরা ভেবে দেখছেন। কিছুদিন আগে এক টেলিভিশন

কোম্পানি প্রচার করলেন, অমুক দিনে শিকাগোর গুণ্ডা সর্দারদের জীবনকে কেন্দ্র তৈরি এক আকর্ষণীয় ছবি দেখানো হবে! সঙ্ঘ আগাম খবর পেলো, এবারও ভিলেন একজন ইটালিয়ান। সঙ্গে সঙ্গে তারা কর্তাদের জানিয়ে দিলো, এই ছবি দেখানো হলে আর্থিক বয়কটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এদিকে শিরে সংক্রান্তি—এখন আর নাটক ঢেলে সাজাবার সময় নেই। শেষ পর্যন্ত গোপনে রফা হলো, তাঁরা গল্পের নায়ক ডিটেকটিভকেও একজন ইটালিয়ান করে দিচ্ছেন। আগে এঁর একটা স্কচ নাম ছিল। ডিটেকটিভ মিস্টার এঙ্গাস এখন চাপে পড়ে হয়ে গেলেন ইটালিয়ান মিস্টার স্কালিঙ্গি। এতে ইটালিয়ানদের রাগ একটু কম হলো—হাজার হোক একজন ইটালিয়ান বোম্বেটেকে একজন সৎ ইটালিয়ান প্রাণসংশয় করে ধরে দিয়েছেন।

গল্প শুনে আমার মুখে বোধহয় একটু চাপা হাসি ফুটে উঠেছিল। মিস্টার ফারপো তা লক্ষ্য করে কারণ জানতে চাইলেন। বললাম, "আমাদের দেশেও এই সমস্যা আছে। দুষ্ট, অসৎ ব্যবসাদার চরিত্রে পেটমোটা মাড়ওয়ারী দেখানো হয়ে থাকে প্রায়ই...এটা যে ন্যায়সঙ্গত নয় তা আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে।

মিঃ ফারপো বললেন, "তোমাকে বলছি, ইটালিয়ানদের জনসমক্ষে হেয় করার চেষ্টা এবার বেশ কমে যাবে—কারণ পয়সার টানটা বড়ো টান। নাটক-নভেলে এক সময় ইহুদিদের ছোট করা হতো—এখন এদেশে কারও সাধ্য নেই ইহুদিদের পিছনে লাগে। তার কারণ ইহুদিদের পকেটে ডলার আছে, দেশের অনেক বড়ো বড়ো দৈনিক ও সাপ্তাহিকের মালিক তারা এবং নিজেদের ইমেজ সম্পর্কে প্রত্যেক ইহুদি সচেতন। তাই কেউ তাদের ঘাঁটাতে সাহস করে না। উল্টোদিকে কোনো লেখকের ইহুদি নাম থাকলে, তাঁর জাতের লোকেরা গাঁটের কড়ি খরচ করে বই কিনে তাঁকে সাপোর্ট করেন। বিশ্ববিদ্যালয় মহলে একটা চাপা রসিকতা আছে 'জুইশ বেস্টসেলার'। ইহুদি লেখকের বইয়ের বেস্টসেলার হবার সম্ভাবনা অন্য নামের লেখকদের থেকে বেশী।"

মনে মনে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলাম—ভারতবর্ষে লেখক হিসেবে জন্ম নিয়েছি। আমরা অশিক্ষিত ও দরিদ্র, প্রদেশিকতা, ভাষা, বর্ণ ও ধর্মসংক্রান্ত নানা সংকীর্ণতা সত্ত্বেও আমাদের সাহিত্য এখনও কলুষিত হয়নি। বই কেনবার সময় কেউ বলেন না মুসলমান লেখকের বই দেবেন না, বা মাহিষ্য লেখকের বই দেখান। প্রাদেশিকতার নানা লক্ষণ সত্ত্বেও বাঙালি বিমল মিত্রের লেখা মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ, আমেদাবাদ, গৌহাটি সর্বত্র সমাদৃত হয়। সব পাঠকই ভাল লেখা পেলে লেখককে নিয়ে মাতামাতি করেন, একবারও জিজ্ঞেস করেন না তিনি মাদ্রাজী না গুজরাতী, বাঙালি না পাঞ্জাবী। সত্যজিৎ রায়ের ছবি দেখতে তাই সর্বপ্রান্তের শিক্ষিত ভারতীয় ভিড় করেন এবং বাঙালি প্রযোজিত, পরিচালিত এবং অভিনীত

বোম্বাই ছবির তীব্র সমালোচনা করতে কট্টর বাঙালিও দ্বিধা করে না।

মিস্টার ফারপো বললেন, "নিউ ইয়র্কের লা-গার্ডিয়া বিমান-বন্দরে নামতে আমাদের বেশী দেরী নেই। তোমার কাছে অনুরোধ, এদেশের কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্যের দিকে নজর রাখবে, আপনজনদের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্ক কী রকম নতুন রূপ নিচ্ছে লক্ষ্য করবে। কারণ আমার ধারণা, কয়েকটি বিষয়ে তোমাদের দেশ আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে আছে। আমাদের অবস্থা দেখে এ-বিষয়ে সময় থাকতে সাবধান হতে হবে।

লা-গার্ডিয়া এয়ারপোর্টে নেমে আমরা আবার করমর্দন করেছিলাম। বৃদ্ধ ফারপো বললেন—"আমার স্ত্রী ও আমি এখান থেকে মাইল চল্লিশ দূরে এক শহরতলীতে থাকি। আমার ছেলে থাকে সানফ্রানসিসকোয়, মেয়ে বোস্টনে। আমার বড়ো নাতিটি এখন জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। জন হপকিন্স তুমি নিশ্চয় জানো। আমাদের রাজধানী ওয়াশিংটন ডি-সির খুব কাছে বাল্টিমোর মেরিল্যান্ড স্টেটে। আমরা এখানে বেশীদিন নেই। নিউ ইয়র্ক রিটায়ার্ড লোকদের জায়গা নয়। আমরা এই বাড়ি বিক্রি করে শীঘ্রই ফ্লোরিডা চলে যাবো। তুমি যদি একদিন চলে আসো, খুব খুশী হবো।"

নাম ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর দেওয়া কার্ডটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ মিস্টার ফারপো এগিয়ে চললেন।

নিউ ইয়র্কে আমার ঘাঁটি অধ্যাপক মণি নাগের বাড়ি। পাণ্ডিত্য ও রসবোধের রাসায়নিক সংমিশ্রণ হলে যে বিরল জিনিসটি পাওয়া যায় তারই একটি নমুনা আমাদের ডক্টর নাগ।

মণিবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় কলকাতায়—তিনি তখন অ্যানথ্রপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে চাকরি করছেন। আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নৃতত্ত্বে ডক্টরেট নিয়ে মণিবাবু স্বদেশে ফিরেছিলেন। কিছুদিন পরে গেঁয়ো যোগী বিদেশে আবার বিরাট সম্মান পেলেন—কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব-বিভাগের সহকারী অধ্যাপকের পদে আমন্ত্রণ জানানো হল তাঁকে। অ্যানথ্রপলজি বিষয়টি আমাদের দেশে এখনও তেমন কল্কে পায়নি। সাধারণ লোকের ধারণা, এঁরা কেবল কোল, ভীল, ওঁরাও ইত্যাদি আদিবাসীদের নিয়ে মাথা ঘামান এবং মাঝে মাঝে ঢাউস সাইজের অবোধ্য এবং অপাঠ্য রিপোর্ট প্রকাশ করেন। দেশের অগণিত সাধারণ মানুষ সম্পর্কে তাঁদের কোনো আগ্রহ নেই। ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। পশ্চিমের নানা দেশে এখন নৃতত্ত্বের প্রচণ্ড সমাদর। ইস্কুলে প্রত্যেক ছাত্রকে নৃতত্ত্ব পড়তে হচ্ছে। সরকারী বেসরকারী যে কোনো পরিকল্পনায় অ্যানথ্রপলজিস্টকে ডাকা হয় মন্ত্রণার জন্যে। সামাজিক জীব হিসাবে মানুষকে তাঁরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করেন এবং রিপোর্ট লেখেন।

মণিবাবু বললেন. "এখন যে-জিনিসটার ওপর খুব নজর, সেটা হলো সোস্যাল অ্যানথ্রপলজি।" মানব-সম্পর্কের এমন কোনো দিক নেই যে বিষয়ে না তাঁরা সমীক্ষা করছেন। 'ফ্লোরিডার ভূমিহীন কৃষিকর্মী পরিবারে শিশুদের লজ্জাবোধের বিকাশ' থেকে আরম্ভ করে, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে প্রণয়পদ্ধতি' অথবা 'হারলেম অঞ্চলে দরিদ্র নিগ্রো পরিবারে দিদিমার প্রভাব' প্রভৃতি নানা বিচিত্র বিষয়ে নিরন্তর কাজ চলছে। মণিবাবুর সুপারিশক্রমে কয়েকটা রিপোর্ট পড়ে বিশেষ উপকৃত হয়েছি—যেমন 'উত্তর ভারতে গ্রাম্য জীবন,' 'পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি গ্রামে বধূদের প্রজনন সম্পর্কে ধারণা।"

মণিবাবু বললেন, "অনেকের ধারণা, আজকের আমেরিকাকে ভালভাবে জানবার সহজতম উপায় হলো, অ্যানথ্রপলজিস্টদের লেখা বই ও রিপোর্ট পড়া। এঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন সমস্যা বা সম্পর্ক সম্বন্ধে সমীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তার বিবরণ পণ্ডিত সমাজে পেশ করছেন। এঁরা কোনো 'value judgement' দেন না, শুধু যা দেখতে পান বা খবর পান তাই লিখে যান। মনে করুন, এঁরা স্কুলে-পড়া ছেলে-মেয়েদের যৌনবোধ সম্পর্কে সমীক্ষা করছেন—ওঁদের সামনে যে-সব খবর আসছে তার ভাল-মন্দ, ন্যায় অন্যায় বিচার নৃতত্ত্ববিদরা করেন না, শুধু ছবি এঁকে যান। তাই এক একটা রিপোর্ট প্রকাশিত হলে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। নানা বাক্-বিতণ্ডা হয়, কংগ্রেস ও সেনেট প্রশ্ন ওঠে, এবং শেষ পর্যন্ত আইন পাল্টানোর দাবিও তোলা হয়।

মণিবাবু বললেন, "আন্দাজ আর গুলের ওপর আজকের কোনো প্রগতিশীল সমাজ নির্ভর করতে পারে না। তাই এখানে হিসাবের এবং উদাহরণের এত আদর।"

আর একজন ভারতীয় বিশেষজ্ঞ আমাকে বললেন, "কলকাতার এরকম কতো সমীক্ষা করা উচিত বলুন তো? তাতে আমাদের চোখ খুলে যাবে—আমরা জানতে পারবো সমাজ কোন্ দিকে যাচ্ছে, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ কী চিন্তা করছে। বিভিন্ন পাড়ার রকবাজ ছেলেদের কথা ধরুন না কেন। এদের নিয়ে সমীক্ষা হলে কত কথা জানতে পারা যায় এবং সেই অভিজ্ঞতার আলোকে সমস্যা-সমাধানের একটা চেষ্টা চলতে পারে। অথবা যারা সামান্য সুযোগ পেলেই লুট করে, দাঙ্গা বাধায়, ট্রামে-বাসে আগুন দেয়—এরা কারা? প্রায়ই শোনা যায় এই লুটের বা খুনোখুনির মধ্যে মানসিক বিকারগ্রস্ত কিছু লোক থাকে। রাজনৈতিক দল বা নেতা সরল মনে মিছিল করছেন বা প্রতিবাদ তুলছেন—কিন্তু এই মানসিক রোগীরা তাঁদের অসুস্থ কামনা চরিতার্থ করবার জন্যে গোলমালের সুযোগ খুঁজছেন। যেখানে সমস্যাটা এতো গোলমেলে নয়, সেখানেও আমাদের জানবার উপায় নেই কেন এতো জিনিস থাকতে বাস ট্রামের ওপর উন্মত্ত জনতার রাগ।"

ভদ্রলোক বললেন, "আমাদের দেশে সব বিষয়েই আমরা গভরমেন্টের মুখ চেয়ে বসে আছি। নিজেদের সংগঠন বা সামর্থ্যের ওপর আমাদের একটুও বিশ্বাস নেই—সব কিছুই গভরমেন্ট করুক এই পরনির্ভরতাবোধ আমাদের পঙ্গু করে তুলছে। একেও এক ধরনের মানসিক পরাধীনতা বলতে পারেন। আর আমাদের ধারণা, হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ছাড়া আর কারুরই তদন্তের অধিকার নেই। পৃথিবীর সর্বত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা হাইকোর্ট জজের মতই নিরপেক্ষতার জন্য সম্মানিত। তাঁরা সমাজের নানা সমস্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন—যার ফলাফল থেকে সকলেই উপকৃত হচ্ছেন। এ বিষয়ে আমরা কোথায় পড়ে রয়েছি? স্বাধীনতার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বছরের পর বছর বেড়ে চলছে। ছেলে-মেয়েদের পরীক্ষা নেওয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশন থেকে আরও টাকা আদায়ের চেষ্টা ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কিছু করবার আছে—তা খবরের কাগজের রিপোর্ট পড়লে মনে হয় না।"

ভদ্রলোক বললেন, "আমাদের দেশে ইদানিং কতো বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। গ্রামের চাষীর সামনে নতুন পৃথিবীর দরজা খুলছে। মেয়েরা নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হতে শুরু করেছে—অথচ নবীন ও প্রাচীনের এক অপরূপ সমন্বয়ের চেষ্টা করছে তারা। যৌথপরিবার ভেঙে পড়ছে—নতুন পরিবেশে গ্রামের মানুষ শিল্প-বিপ্লবের তপ্ত ফার্নেসের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। এসবের বিস্তারিত নির্ভরযোগ্য বিবরণ কোথায়? বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান জ্ঞান-তপস্বীরা এবং তরুণ গবেষকরা কী করছেন? রাজনৈতিক দলগুলির ইতিহাসও তাঁরা লেখবার চেষ্টা করছেন না—এ বিষয়ে যে ক'টা ভাল বই বেরিয়েছে তা বিদেশীদের লেখা। একজন অধ্যাপক হিসেবে এর জন্যে আমি লজ্জাবোধ করি—কারণ আমি জানি আমাদের দেশে কাজ করবার লোক আছে, কিন্তু পরিবেশ নেই।

ভদ্রলোকের কথায় মনটা খারাপ হয়ে গেল। সত্যি, আমাদের উচ্চশিক্ষিত সমাজ দেশের মঙ্গলের জন্য তাঁদের যতখানি করা উচিত তা করতেন কিনা তা ভেবে দেখবার সময় এসেছে। উচ্চবিত্ত হওয়াটা আজকে ভারতবর্ষে যেমন একটা প্রিভিলেজ, উচ্চশিক্ষিত হওয়াটা এক অর্থে তার থেকেও বড়ো প্রিভিলেজ। কিন্তু উচ্চশিক্ষিতরা কী করছেন? পূর্বে স্বাধীনতা যুগে দেশের ডাকে অনেক সুখ বিসর্জন দিয়ে কারাবরণ করেছেন। এ যুগের তরুণ ডাক্তার, ব্যারিস্টার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক এ-সবে জড়িয়ে পড়তে চান না। তাঁদের একটু আধটু ইচ্ছে থাকলেও তাঁদের স্ত্রী এবং শ্বশুরমহাশয়ের প্রবল আপত্তি। এঁদের একদল, ফরেনে গেলে কত আদর পেতেন এবং কত ডলার মাইনে পেতেন এবং তাকে সাড়ে সাত দিয়ে গুণ করলে কত টাকা হতো তাই

ভেবে ভেবে শরীর খারাপ করছেন। আর একদল যুবক 'কনভেন্টশিক্ষিতা প্রকৃত সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী, উচ্চপদস্থ পিতার একমাত্র কন্যার স্বামী হবার যোগ্যতা অর্জনের জন্য বিলিতি সওদাগরী অফিসের 'ম্যানেজমেন্ট কেরানী' হচ্ছেন। আর একদল দেশের সব অধঃপতনের দায়িত্ব হয় টাটা বিড়লা না হয় জ্যোতি বোস-অতুল্য ঘোষের ওপর চাপিয়ে নিশ্চিন্তে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গবেষণা করছেন।

মণিবাবু বললেন, "অত উত্তেজিত হবেন না। দেশের মানুষদের বিচার করবার অনেক সময় দেশে গিয়ে পাবেন। সামান্য কয়েক দিনের জন্য বিদেশে এসেছেন, সায়েবদের জীবনযাত্রা দেখে যান।"

কথায় কথায় ফারপো সায়েবদের নাম উঠলো। মণিবাবু বললেন, আমেরিকান ইটালিয়ান পরিবারের ওপর সম্প্রতি কিছু ভাল সমীক্ষা হয়েছে। কী করে তাঁরা তাঁদের ইটালিয়ান বৈশিষ্ট্য হারিয়ে পুরোপুরি আমেরিকান হয়ে যাচ্ছেন, তার ছবি পাওয়া যাচ্ছে।"

এ-বিষয়ে জানবার লোভ সংবরণ করা গেল না। বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্থানীয় দু'একটা লাইব্রেরি ঘুরে যা খবরাখবর পেলাম, তাতে আমার চোখ খুলে গেলো। ইটালিয়ান-আমেরিকানদের সঙ্গে আমাদের মধ্যবিত্ত সংসারের অদ্ভুত মিল রয়েছে।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার বাইরে আমাদের সংসারের ছবিটা কী রকম? আশাপূর্ণা দেবীর গল্প-উপন্যাসে এর চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়। বড়োদের অভিযোগ—আজকালকার ছেলেরা বাবা-মাকে তেমন ভক্তি করে না, মান্য করে না। পরিবারের মান-সম্মানটা এককালে খুব বড়ো কথা ছিল। এমন কিছু করা যায় না যাতে দর্জিপাড়ার মিত্তির-বংশের, অথবা পাঁজিয়ার বোসদের বা পাতিহালের রায়দের মাথা নীচু হয়। আর এখন যে যার প্রাণ সামলাতে ব্যস্ত! সবাই নিজের স্বার্থ গুছোচ্ছে।

মায়েদের অভিযোগ : "আমরা শাশুড়িদের ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকতাম, যা বলতেন তাই মানতাম। এখানকার বৌদের লাজলজ্জা নেই—ঘোমটা দেয় না, আধগজী ছিটের ব্লাউজ পরে গুরুজনদের চোখের সামনে ধড়াস করে শোবার ঘরে খিল বন্ধ করে দেয়, বিয়ে হবার দশদিনের মধ্যে আলাদা হবার ফন্দি আঁটে। বিয়ে-থা'র ব্যাপারে বাবা-মা'রা এখন নিমিত্ত মাত্র—ছেলে হয় নিজেই মেয়ে পছন্দ করছে, না হয় ইয়ার-বন্ধু নিয়ে পাত্রী দেখতে যাচ্ছে। স্ত্রী-নির্বাচনে বাবা মা-র মত থেকে বন্ধুর পরামর্শ অনেক বেশী মূল্যবান। অথচ 'ওঁরা' যখন বিয়ে করেছেন, তখন কোনো ছেলের সাধ্যি ছিল বলে, মেয়ে দেখবো। শ্বশুরমশায় যা কথা দিয়ে এলেন তাই হলো—শুভদৃষ্টি একেবারে সেই ছাঁদনাতলায়। তা

বাপু, তাতে সুখ কী কম পেয়েছি? কি বাপু, ডায়াবিটিস না ডাইভোর্স কী বলো ওসব তো আমাদের সময় ছিল না। এখন তো সোহাগের ছড়াছড়ি, তারপর ছাড়াছাড়ি।"

এই পরিবর্তন কী শেষ হয়েছে? না আজকের বৌমা—যিনি শাশুড়ির সামনে ঘোমটা দেন না, হট-হট করে একলা বাপের বাড়ি চলে যান, ছুটির দিনে স্বামীর সঙ্গে দুপুরবেলায় ঘুমোতে লজ্জা পান না—তিনি যখন ছেলের বিয়ে দিয়ে বধূ আনবেন তখন দিন-কাল আরও পাল্টে যাবে। ইটালিয়ান পরিবারের তিন পুরুষের এক সমীক্ষার কথা বলবো—তাতে হয়তো আমাদের সংসারের একটা ছবি পাওয়া যাবে। সাধারণ বাঙালি গৃহস্থ পরিবারের অনেকেই এখনও দ্বিতীয় পুরুষে রয়েছেন।

পল ক্যামপিসির তৈরি তিন পুরুষের ইটালিয়ান পরিবারের বিবর্তনের এই বিবরণ পড়ে আমার চোখ খুলে গেলো।

পরিবারের এক একটা দিক ধরে বিচার করা যাক। প্রথম পর্বের ইটালিয়ানদের পরিবার-পরিকল্পনা নেই, আট-দশটা ছেলেমেয়ে খুবই স্বাভাবিক। দ্বিতীয় পুরুষে চারটি পাঁচটি সন্তান। আর তৃতীয় পর্বে একেবারে ছোট্ট সংসার। প্রথম পর্বে, বাবা বাড়ির দোর্দণ্ডপ্রতাপ কর্তা। দ্বিতীয় পুরুষে খাতায়-কলমে বাবা সর্বশক্তিমান হলেও, তাঁর ক্ষমতা অনেক কমে গিয়েছে! তারপরের পুরুষে কর্তা, গিন্নি, ছেলেমেয়ে কেউই কম যান না—সবারই 'হাই স্ট্যাটাস্'।

প্রথম পর্বে, বাড়ির বড়োছেলের স্পেশাল খাতির, স্থাবর সম্পত্তি সে-ই পাবে। দ্বিতীয় পর্বে, বড়ো হলেই বেশী সম্মান এমন কোনো আইন নেই ; যে লেখাপড়ায় ভাল, চাকরি বা ব্যবসায়ে কেষ্টবিষ্টু হয়েছে তার বেশী খাতির। নতুন অধ্যায়ে সবাই সমান। তুমি বড়ো বলে মাথা কিনে নাওনি।

প্রথম দিকে ইটালিয়ানরা ঘরসংসার, নড়াচড়া পছন্দ করতেন না। যেখানে বাড়ি করা হলো বা ভাড়া নেওয়া হলো সেখানেই সারাজীবন কাটিয়ে দিতেন। দ্বিতীয় পুরুষে অস্থিরতা দেখা গেলো ; এই শহরেই বাবা ছিলেন বলে আমাকেও এখানে জীবন কাটাতে হবে তার মানে নেই। আর তৃতীয় পর্বে, অন্য আমেরিকানদের মত ভয়ঙ্কর অস্থিরতা। নিউইয়র্কে জন্ম, আইওয়াতে লেখাপড়া, তিনহাজার মাইল দূরে লস্ এঞ্জেলস্-এ চাকরি-জীবন কাটিয়ে মহাসমুদ্রের অপর পারে হাওয়াইতে অবসর জীবন-যাপন করাটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়!

প্রথম পর্বে, সন্তানদের কাছে মা-বাবা দেবতুল্য, তাঁদের সুখী করার জন্যেই সন্তানদের জীবনধারণ। দ্বিতীয় পর্বে, বাবা-মা মুখে সম্মান পান কিন্তু ছেলে-মেয়েরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। তৃতীয় পর্বে, চাকা সম্পূর্ণ ঘুরে গিয়েছে। এখন ছেলেমেয়েদের সেবা-যত্ন ও সুখের জন্যেই বাবা-মা জীবনধারণ করছেন।

আমেরিকান পারিবারিক সংস্কৃতির এইটাই নিয়ম এখন—যা আমাদের তথাকথিত কনভেন্ট-শিক্ষিত হাই সোসাইটিতে বেশ চালু হয়ে যাচ্ছে এবং যার লক্ষণ সমাজের অভ্যন্তরেও ফুটে উঠতে দেখে বিদগ্ধজনরা শঙ্কিত হচ্ছেন। নতুন পরিস্থিতিতে পিতৃমাতৃভক্তির কোনো দাম থাকবে না। বিদ্যাসাগর বা বিবেকানন্দের মাতৃভক্তির গল্প শুনে ছেলেমেয়েরা মুখ টিপে হাসবে, ভাববে সেকেল লোকগুলো কত বোকা এবং সেন্টিমেন্টাল ছিল।

প্রথম পর্বের ইটালিয়ান ভাবতেন, যত ছেলে হয় ততই ভাল। বলদ ও লাঙলের মতই ছেলে-পুলে লক্ষ্মী, যত হয় চাষের কাজের তত সুবিধে। দ্বিতীয় পর্বে কর্তা বুঝলেন— ছেলে ততদিনই সম্পদ যতদিন না বিয়ে-থা করছে। বিয়ের আগে যে ক'বছর লাভ পাওয়া যায়—তারপরই লোকসানের অঙ্ক। আর আধুনিক অধ্যায়ে, ছেলে-পুলে মানেই খরচের ধাক্কা—তাকে খাওয়াও, জামাকাপড় পরাও, ইস্কুলে দাও, মানুষ করো—সম্পর্ক শুধু দেবার, পাবার কিছুই নেই।

প্রথম পর্বে ইতালীয় পরিবারে উৎসব লেগেই থাকতো—আমাদের বারো মাসে তেরো পার্বণের মত। দ্বিতীয় পর্বে আমাদের মত বিয়ে-থা, পুজো-পার্বণ, কিন্তু সংখ্যা কমতির দিকে। আর এখন উৎসবগুলো আর পরিবার কেন্দ্রিক নেই—একমাত্র বড়দিন ছাড়া, যেদিন বাবা-মা ছেলেপুলে নাতি-নাতনিকে একত্রে লাঞ্চ খেতে দেখা যায়।

সংসারের দৈনন্দিন জীবনে ঢোকা যাক এবার। প্রথম পর্বে সংসার বলতে মা। তিনি রান্নাবান্না, কাচাকাচি নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকবেন, তাঁর চাকরীর কথা চিন্তা করাও অশোভন। দ্বিতীয় পর্বে তিনি সংসারের কেন্দ্রমণি, কিন্তু প্রয়োজন হলে চাকরি করতে পারেন, অবসর বিনোদনের জন্যে এক-আধটা ক্লাবের মেম্বার হতে পারেন। বর্তমান পর্বে, মা সংসারের দায়িত্ব অস্বীকার করেন না ; কিন্তু তাই বলে সংসারের জন্যে নিজের ব্যক্তিগত সুখ বিসর্জন দিতে রাজী নন। ঝটপট বাড়ির কাজ গুছিয়ে তিনি অফিসেও যাবেন, নিজের সামাজিক সম্পর্কও রাখবেন।

প্রথম পর্বে, বাড়ির কর্তা রাগী মানুষ, ছেলেকে দরকার হলে উত্তম-মধ্যম দিতে তিনি কসুর করেন না। পরের পুরুষে, কর্তা মনে মনে খেয়াল রেখেছেন আমেরিকান আইনে নিজের ছেলেকেও ঠেঙিয়ে শাসন করা যায় না। আর এযুগের কর্তা বুঝে নিয়েছেন, আইন ছাড়াও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে ছেলে ঠেঙিয়ে লাভ নেই, বরং ছেলে আরও বিগড়ে যেতে পারে।

মেয়েদের সম্বন্ধে প্রথম পুরুষের ধারণা ছিল—ইস্কুল-কলেজ মেয়েদের জন্যে নয়। তারা গৃহস্থালির কাজ শিখুক যাতে বিয়ের পরে সুগৃহিণী হতে পারে। দ্বিতীয় পুরুষে ধারণা—একটু আধটু লেখাপড়া শিখুক, তবে বিয়েটাই উদ্দেশ্য,

সুতরাং রান্নাবান্নার দিকেই যেন প্রধান নজরটা থাকে। আর এ যুগে লেখাপড়ার আসল উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিত্বের বিকাশ। (পাঠককে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের পরিচিত মহলে সম্প্রতি যেসব ভাবনা চলেছে তা মনে করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।)

বিয়ের পর কী হতো? বধূকে স্বামীর বাবার সংসারে শাশুড়ির আদেশ মেনে চলতে হতো। দ্বিতীয় পর্বে দেখা যায় শাশুড়ি-বৌয়ের সংঘাত পেকে উঠছে। বৌমা এখন আর সবকথা মাথা নিচু করে হজম করতে রাজী নন। শাশুড়ির দুঃখ, ছেলে তার কনট্রোলে নেই—বৌয়ের কথায় উঠছে-বসছে। আর এখন তো বৌমার স্বাধীনতা পর্ব। তিনিই এখন নিজর সংসারের সর্বেসর্বা, শাশুড়ি সেখানে ন'মাসে ছ'মাসে কয়েক ঘণ্টার জন্যে অতিথি হয়ে আসেন এবং বড়জোর বড়দিনের লাঞ্চ ও ডিনারটা খেয়ে যান।

ছেলের কাছে বাপ-মায়ের প্রত্যাশার পরিবর্তন লক্ষ্য করুন। প্রথম পুরুষে বাবা আশা করেন, ছেলে খুব খাটবে এবং রোজগারের ডলার বাবা-মায়ের হাতে তুলে দেবে। দ্বিতীয় পর্বে খাতায় কলমে ঐ একই প্রত্যাশা আছে, কিন্তু বাবা-মা মনে মনে বুঝছেন, কম ছেলেই পুরো রোজগারটা সংসারের কাজে তুলে দেয়। আর আধুনিক পর্বে, বাবা-মা শুধু আশা করেন, ছেলে কৃতী হোক, অনেক টাকা রোজগার করুক, কিন্তু কেউ ভুলেও আশা করেন না যে ছেলে তাঁদের হাতে কিছু টাকা দেবে।

এইসব ব্যাপার আরও জানবার জন্যে একদিন মিস্টার ফারপোর বাড়িতে হাজির হয়েছিলাম। বৃদ্ধ ফারপো-দম্পতি আমাকে খুব আদর-যত্ন করলেন—বাড়িতে তৈরি ইটালিয়ান পিস্তা খাওয়ালেন। বৃদ্ধ হাসতে হাসতে বললেন, "শেষ পর্যন্ত এদেশে ইটালিয়ান কালচারের কিছুই থাকবে না—একমাত্র পিস্তা ছাড়া এই খাবারটা প্রায় মার্কিন কালচারের অঙ্গ হয়ে গিয়েছে।"

বৃদ্ধা মিসেস ফারপো বললেন, "তুমি তো শুনেছো, আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি। ফ্লোরিডাতে সংসার-খরচ কম, আবহাওয়া এতো চরম নয়—এখানকার শীতটা বুড়োদের পক্ষে মোটেই প্রীতিপ্রদ নয়। ভেবেছিলাম, আমার ছেলে এই বাংলোটা রাখবে। কিন্তু নিউ ইয়র্ক স্টেট তার ভাল লাগে না—সে সাউত ক্যারলিনা পছন্দ করে।"

মিসেস ফারপো বললেন, "যুগ কীভাবে পাল্টাচ্ছে প্রথমদিকে যৌথ সংসারে নতুন-বিয়ে-হওয়া স্বামী স্ত্রীর খুব মুশকিল ছিল। প্রকাশ্যে কোনোরকম প্রেম দেখাবার উপায় ছিল না—শাশুড়ী তাহলে হৈ চৈ বাধাতেন। তার পরের জেনারেশনে শ্বশুর-শাশুড়ী একটু উদার হলেন, নিজের যৌবনে কীভাবে ভুগেছেন তা ভুলতে পারেননি, তাই ছেলে-বৌ প্রেম প্রকাশে একটু বেশরম

হলেও তাঁরা ক্ষমা করতেন।"

মিসেস ফারপো বললেন, "বুঝলে ইয়ংম্যান, এই চাপা প্রেমটাই ছিল মধুর। আর আজকের জেনারেশনের স্ত্রী-পুরুষের প্রেমকার্য নিজের চোখেই দেখছো। ড্রইংরুম, রাস্তা, স্টেশন, বিমান-বন্দর, ফুটপাথ যেখানে খুশী আলিঙ্গন, চুম্বন ও নানাবিধ আদর চলেছে। দেহমিলনের যে একটা রহস্যময় মাধুর্য ছিল—তা আজকের যুগের ছেলেমেয়েরা জানতে পারলো না। তাই সেক্সটা এতো তাড়াতাড়ি তাদের কাছে একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে ; নিত্যনতুন উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করতে হচ্ছে ; তারপর কেউ ছুটছে মনের ডাক্তারের কাছে, কেউ ডাইভোর্স আদালতে।"

মিস্টার ফারপো স্ত্রীর কথা শুনতে শুনতে হাসছিলেন। বললেন, "শুনেছি, আমার বাবার বিয়ে হয়েছিল সম্বন্ধ করে। ঠাকুর্দা ও ঠাকুমা মেয়ে পছন্দ করেছিলেন। আমার মা যে দেখতে খুব ভাল ছিলেন তা নয়—কিন্তু মায়ের বাবা এবং আমার ঠাকুর্দা ছিলেন ইটালির এক গাঁয়ের লোক, সেটা মস্ত কথা। বিয়েতে কিছু পণও পেয়েছিলেন বাবা—সেইটাই ছিল যুগের নিয়ম।"

"বলেন কী?" আমার অবাক হবার পালা। "এদেশেও পণপ্রথা ছিল?"

"নিশ্চয়," হাসলেন মিস্টার ফারপো। "তারপর আমাদের বিয়ের গল্প বলতে পারি—যদি না আমার গৃহিণীর কোনো আপত্তি থাকে।"

গৃহিণী সলজ্জভাবে বললেন, "যদি কোনো দুষ্টুমি না করে সোজাসুজি বলো তাহলে আপত্তি নেই। ডেভিড, তোমাকে আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে, বিবাহের স্বর্ণ-জয়ন্তীর পরও ডাইভোর্সের ঘটনা গত সপ্তাহে কাগজে বেরিয়েছে ; এবং আমাদের মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বিয়ে হয়েছে।"

মিস্টার ফারপো বললেন, "হে বিদেশি কবি, তুমি দেখে যাও এই দেশে আমরা কী ভাবে স্ত্রী দ্বারা নিগৃহীত হয়ে থাকি।"

"আমি বিদেশি কবি নই," ওঁদের মনে করিয়ে দিলাম।

মিস্টার ফারপো বললেন, "কবির মন ছাড়া কে সাহিত্যিক হতে পারে? আমরা তোমাকে কবি বলবোই।"

মিসেস ফারপো বললেন, "ডেভিড, আমার মা তোমাকে দেখে ঠিকই বলেছিলেন, এ ছেলে আমার মেয়েকে ভোগাবে।"

"তাই নাকি প্রিয়া? তাহলে ওঁরা কেন আমার সঙ্গে তোমার বিয়ের অনুমতি দিলেন?" মিস্টার ফারপো জিজ্ঞেস করলেন।

তারপর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "তোমাকে বলে রাখি, আমরা যৌবনে অন্য আমেরিকানদের মত অতটা আধুনিক হয়ে উঠতে পারিনি। বাবা-মার কথার মূল্য দিতাম আমরা। আমাদের সময় প্রেম-টেম আরম্ভ হয়েছে—কিন্তু

বাবা-মার মত ছাড়া আমরা বিয়ে করতাম না। এই সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে আমার প্রণয় একটু দানা বাঁধতেই দু'পক্ষের বাপ মাকে খবর দেওয়া হয়েছিল। ওর বাড়িতে নির্বাচনী পরীক্ষা দিতে গিয়েছি ; ওকেও দেখেছেন আমার বাবা এবং মা। বাবা-মা বলেছিলেন, "দেখো দিনকাল পাল্টাচ্ছে. তুমি আমাদের মত না নিয়েও বিয়ে করতে পারো জানি কিন্তু বউ পছন্দের সময় দোহাই দেখো—সে যেন ক্যাথলিক হয় এবং ইটালিয়ান হয়। আর যদি আমার গাঁয়ের কোনো মেয়ে বিয়ে করো, তাহলে আমরা তো হাতে চাঁদ পাবো।"

মিসেস ফারপো বললেন, 'তুমি পোয়েট, তোমাকে সব কথা বলা উচিত। আমার বাবা আমাকে বললেন, 'এই ছেলেকে যখন মনে ধরেছে আমাদের আপত্তি নেই।' মা বললেন, আমিও মত দিচ্ছি—হাজার হোক ছেলে লম্বা-চওড়া সুন্দর। তবে বলে রাখলুম, জামাই একটু জেদি হবে। মেয়েকে আমার কড়া শাসনে রাখবে।' বাবা বললেন, সে তো ভাল কথা। মেয়েদের আদর করতে হয়, কিন্তু মাথায় তুলতে নেই।"

মিস্টার ফারপো বললেন, অবশেষে আমাদের বিয়ে হয়ে গেলো। কিন্তু, বিয়ের আগে দেহের পবিত্রতায় আমাদের বিশ্বাস ছিল। বিয়ের আগে এক-আধ ডজন নিষ্পাপ চুম্বন ও আলিঙ্গন ছাড়া আমরা আর কোন স্বাধীনতা নিইনি।"

'আর আজকালকার মেয়েরা ভাবে আমরা বোকা ছিলুম—কুমারিত্ব রক্ষে করতে গিয়ে কি জিনিস হারিয়েছি তা জানি না।" বললেন মিসেস ফারপো।

"যদি কোন আপত্তি না থাকে, আপনার ছেলেমেয়েদের বিয়ের কথা বলুন," আমি অনুরোধ জানাই।

"তারা যুগের সঙ্গে তাল ফেলে চলেছে। পনেরো বছর থেকে ডেট করেছে। আমার ছেলে কোরিয়ার যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে বিয়ে করল এক প্রোটেস্টান্টকে। বৌমার বাবা স্পানিশ-আমেরিকান, মা আইরিশ। বিয়ের ব্যাপারে আমাদের কোনো পরামর্শ চাওয়া হয়নি। তোমাকে না বলাটা অন্যায় হবে, বিয়ের ছ'মাস পরেই আমাদের একটি নাতি হয়।"

মিসেস ফারপোর সরলতায় মুগ্ধ হয়েছিলাম। তিনি বললেন, "মেয়ের সম্বন্ধেও আমার ঐরকম ভয় ছিল। রচেস্টারে কোডাক কোম্পানিতে সেক্রেটারির কাজ করতো—একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকতো। তা ভগবানের দয়ায় একটি ভাল ছেলেকে বিয়ে করেছে, ওখানকার স্কুলে মাস্টারি করতো ওদের ছ'টি ছেলেমেয়ে—ওরা বড়ো ফ্যামিলি চায়—জন্ম নিয়ন্ত্রণ ওরা বিশ্বাস করে না। ছেলে হবার কিছুদিন আগে আমি একবার করে যাই। প্রসবের পরও মাসখানেক থাকতে হয়। শুনছি ওদের আবার ছেলেপুলে হবে।"

ফারপো সায়েব বললেন, "তার মানে আমাকে আবার একটি সোনার মেডেল করাতে হবে।"

"বেবি হলে, আপনারা মেয়েকে মেডেল দেন নাকি?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"না না," হেসে বললেন ফারপো-গৃহিণী। "নাতি-নাতনী হলেই আমার খুব আনন্দ হয়। এই দেখো না আমার হাতের বালাটা। এই বালা থেকে ছোট ছোট মেডেল ঝুলছে। এক একটি নাতি-নাতনি হয়েছে আর আমার একটি মেডেল বেড়েছে। প্রত্যেক মেডেলে নতুন নাতি বা নাতনির নাম লেখা। মোট দশটা মেডেল হয়েছে।"

আমার মনের অবস্থা কর্তা বোধহয় আন্দাজ করলেন। বললেন, "এ আর কি! আমাদের প্রতিবেশিনী মিসেস ফ্রাপলির সাতচল্লিশটা মেডেল আছে। ওঁর নাতনির আবার মেয়ে হয়েছে।"

একটা পাইপ জ্বালিয়ে মনের সুখে ধোঁয়া ছাড়লেন মিস্টার ফারপো। তারপর বললেন, "তুমি হয়তো তোমার দেশের জনসমস্যার কথা ভাবছো। আমাদের এখানে পরিস্থিতি অন্যরকম। মেয়েরা স্বাধীন—কি করে সন্তানের জন্ম নিরোধ করা যায় সবাই জানে। কিন্তু খুব ছোট্ট সংসারের মধ্যে একটু স্বার্থপরতা জড়িয়ে আছে। বেশি সন্তান মানেই কম সুখ, বেশি খাটুনি। তা সত্ত্বেও অনেকে জেনে-শুনে বড়ো সংসার করছে। এই বিরাট দেশে এখনও কুড়ি কোটি লোক হয়নি! লোকের অভাবে কত কাজ হয় না, কত গ্রাম নষ্ট হয়, সুতরাং লোক বাড়লে ক্ষতি নেই। বেশি ছেলেপুলে হওয়াটা একটা হাই ফ্যাশন—যা খুব কম স্বামী-স্ত্রীই অ্যাফোর্ড করতে পারেন।"

মিসেস ফারপো বললেন, "আমার মা, ঠাকুমা ভূত-টুতে বিশ্বাস করতেন। পোয়াতি মেয়ে সম্বন্ধে ওঁদের কত রকমের সংস্কার ছিল। বাড়ির একটা অন্ধকার ঘরে আঁতুড়ের ব্যবস্থা হতো—সাহায্য করত দাই। আমার প্রথম ছেলে বাড়িতেই হয়েছিল, তবে দাইয়ের বদলে ডাক্তার এসেছিল। পরের মেয়ে হয়েছিল হাসপাতালে। আর এখন তো হাসপাতাল ছাড়া কথাই নেই। আমি তিনবছর পর্যন্ত মায়ের দুধ খেয়েছি। আমার ছেলে মেয়েও মায়ের দুধ খেয়েছে। এখন বোতলের যুগ—যত তাড়াতাড়ি পার বোতল ধরাও। স্তন্যপায়ী কথাটাই হয়তো কিছুদিন পরে এদেশের লোকদের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যাবে না!"

ফারপো দম্পতির সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। ওদের আন্তরিকতা ও সত্যনিষ্ঠা আমায় স্পর্শ করেছিল। সাধারণ মার্কিন নাগরিক চরিত্রের এই দিকটা সত্যই সুন্দর। ম্যানেজারের ভড়ং ইংরেজদের তুলনায় অনেক কম, নিজের কোনো সাফল্য থাকলে গর্ব করে বলে ফেলেন—যাকে অনেক সময় ঔদ্ধত্য বলে ভুল হতে পারে। নিজের সুখ-দুঃখের কথা বিদেশির

কাছেও বলতে কোনো দ্বিধা নেই। সামান্য কিছু লোকের মধ্যে যেমন মার্কিন ডলারে আন্তর্জাতিক ঔদ্ধত্য আছে, তেমনি অনেকেই অতি বিনয়ী এবং ভদ্র। কিছু লোক যেমন ধরে বসে আছেন—আমেরিকা ছাড়া পৃথিবীর পাপী-তাপী দেশগুলোর মুক্তি নেই, তেমনি অনেকে অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করেন তাঁদের পার্থিব ভোগলিপ্সার সঙ্গে আত্মিক উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। প্রাচ্যের প্রাচীন সভ্যতার দিকে একশ্রেণীর মার্কিন তাই গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকিয়ে আছেন।

ফারপো-দম্পতি আমাকে বাস-স্ট্যান্ড পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিলেন। বাসে চড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, যদি আবার কখন এদেশে আসি তা হলে ফ্লোরিডায় যেন একবার খোঁজ করি। দেখা নিশ্চয় হবে, কারণ ওঁদের এখন অনেকদিন বাঁচবার ইচ্ছে। চাকরি-বাকরির যন্ত্রণা এবং সন্তান লালন পালনের ঝামেলা চুকিয়ে এতদিনে ওঁরা স্বাধীন হয়েছেন। এই স্বাধীনতাই তো বুড়োবুড়ি উপভোগ করতে চান—যার মধ্যে যৌবনের লালসা বা জ্বালা নেই—আছে ছোটবেলার অপার আনন্দ, গুরুজনদের শাসনটুকু ছাড়া।

বাস চলতে শুরু করার সঙ্গে-সঙ্গে ওঁরা হাত নাড়তে লাগলেন। কত অল্প সময়ের মধ্যে কত আপন হয়ে পড়েছিলাম ভেবে আমার চোখ ছলছল করতে লাগলো।

নিউইয়র্কে ফিরতেই মণিবাবুর স্ত্রী কল্পনা বললেন, "অ্যান রবিনস্ বলে একটি যুবতী মহিলা ফোনে বেশ কয়েকবার লেখকের খোঁজ নিয়েছে।"

কল্পনা বৌদির মুখে চাপা হাসি। বললেন, "একটু বুঝে-সুঝে! হাজার হোক বিদেশ।"

বললাম, "অ্যান রবিনস্ সশরীরে ফ্ল্যাটে হাজির হননি, আর নিউ ইয়র্কে এখনও টেলিভিশন টেলিফোন চালু হয়নি যে ডায়াল তুললে অন্যদিকের লোকটির ছবি দেখতে পাবেন। এমতাবস্থায় কি করে বুঝলেন অ্যান রবিনস্ যুবতী?"

সোস্যাল অ্যানথ্রপলজিস্টের গৃহিণী, তায় শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপিকা—তাঁর সঙ্গে তর্কে পেরে ওঠা আমার মতো হাওড়ার নাগরিকের পক্ষে সম্ভব নয়। বৌদি বললেন, "বৃদ্ধাদের গলা শুনলেই বোঝা যায়।"

এমতাবস্থায় পরাজয় স্বীকার করতে হলো—তাছাড়া রণকৌশলের দিক থেকেও বৌদিদের কাছে দেবরদের সারেন্ডার করা লাভজনক, তাতে আদর-যত্ন ও খাওয়া-দাওয়া ভাল হয়। কে না জানে স্নেহ নিম্নমুখী? পরাজিত ও পতিতের প্রতি কোন্ নারী না দয়া বর্ষণ করেন?

বৌদি বললেন, "ওঁরা তোমাকে ডিনারে আহ্বান করেছেন আজ সন্ধ্যায়।"

অ্যান রবিনস্ একবার সামান্য কিছুদিনের জন্য ভারতবর্ষে এসেছিল—তখনও সে অবিবাহিতা। সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক কি একটা বিষয়ে গবেষণা চালাচ্ছিল। সেই সূত্রে দু'একদিন দেখা হয়েছিল—কারণ আমি ছিলাম তার অন্যতম গিনিপিগ। ফিরে এসে বিয়ে করেছে রবিনস্ সাহেবকে। ওয়াশিংটন থেকেই খবর পাঠিয়েছিলাম—যদি একবার দেখার সুযোগ হয়।

অ্যান ও জন আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। স্বামীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পরই অ্যান আমার লেগ্‌পুল (সোজা বাংলায় ল্যাজ টানতে!) শুরু করলো। "তরুণ লেখকদের নিয়ে নানা সমস্যা।"

"ভদ্রে, আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, একদা তরুণ বয়সে সাহিত্যযাত্রা করেছিলাম—কিন্তু এখন আর কোনো প্রকারেই আমাকে তরুণ বলা যায় না।"

অ্যান বললে "মাস্ট বি হ্যাভিং এ গ্লোরিয়াস টাইম—ফোন করে কিছুতেই পাওয়া যায় না। লেখকদের এই সুবিধে—যা-ইচ্ছে-তাই করার স্বাধীনতা।"

বললুম, "এখান থেকে সত্তর মাইল দূরে এক নির্জন শহরতলীতে সমস্ত দুপুরটা কাটিয়ে এলাম। এক বৃদ্ধদম্পতি—বয়স ৬৭-র ওপর।"

জন আঁতকে উঠলো। "বলেন কি! এই দেশে সামান্য কয়েক-দিনের জন্যে এসে আপনি বুড়োদের সঙ্গে সময় নষ্ট করেছেন!"

জন বয়সে তরুণ—ওর কথাতেই মনে হলো বুড়োদের সম্বন্ধে ওর ভক্তিশ্রদ্ধা নেই।

জন বললো, 'আপনি কিছু মনে করবেন না। আমাদের দেশ যে এতোখানি এগিয়ে গিয়েছে, তার কারণ কী জানেন? আমরা উৎপাদন দিয়ে মানুষের বিচার করি—যাদের কাজের ক্ষমতা কমে গিয়েছে এবং কথার ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছে তাদের ওপর নির্ভর করলে আমরা আমাদের জীবন-যাত্রার মান ঠিক রাখতে পারবো না।"

আমি বললাম, "যদি অনুমতি করো তাহলে বলি, যে-জিনিসটা আমাকে বেশ চিন্তায় ফেলেছে তা হল তোমাদের সমাজে বৃদ্ধরা অবহেলিত। এদেশে বৃদ্ধ কথাটাই যেন অশ্লীল।"

অ্যান বললো, "ঠিকই ধরেছেন, এখানে কেউ স্বীকার করতে চায় না সে বৃদ্ধ হচ্ছে।"

আমি বললাম, "মিস্টার রবিনস্, আমি এমন এক দেশ থেকে এসেছি যেখানে গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের জীবনযাত্রার অঙ্গ। তাই যখন দেখি শ্রদ্ধা তো দূরের কথা, সম্মান ও সৌজন্যও পাচ্ছেন না বৃদ্ধরা তখন অস্বস্তি বোধ করি।"

জন বললো, "আপনি বোধহয় একটু সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়েছেন। এসব শুনতে ভাল—কিন্তু এতে কলকারখানায় উৎপাদন বাড়ে না। মনে রাখবেন,

যৌবনের পেশীশক্তিতেই আমাদের সমাজ এগিয়ে চলেছে।”

জন বুঝলো, ‘আমি কথাগুলো তেমন বরদাস্ত করতে পারছি না। সে এবার বললো, “আপনি একজন পর্যবেক্ষক। আমেরিকার যৌবনকে সমালোচনা করার আগে আপনি দু’পক্ষের ছবি নিজের মনে এঁকে রাখুন।”

অ্যান এবার আমার হয়ে বললো, “কিন্তু জন, ভারতবর্ষে না গেলে তুমি বুঝবে না সেখানে বয়োজ্যেষ্ঠদের আজও কি সম্মান দেওয়া হয়।”

জন বললো, “এক সময় ভেবে দেখবেন এই বৃদ্ধনির্ভরতা আপনাদের দেশের অনগ্রগতির কারণ কি না। রাজনীতি, ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি সর্বত্র আপনারা বৃদ্ধদের এগিয়ে রেখেছেন—যারা দৌড়তে পারে না, যারা নিজেদের স্বার্থের জালে জড়িয়ে আছে, যাদের চোখ সবসময় পিছনদিকে তাকিয়ে আছে তারাই আপনাদের ভাগ্যবিধাতা।”

অ্যান বললো, “জন তুমি নিষ্ঠুর হয়ো না।”

“ডার্লিং, নিষ্ঠুরতা নয়। ঈশ্বর এইভাবেই মানুষ সৃষ্টি করেছেন—জোরটা যৌবনের ওপর। মধ্যগগনের সূর্যই বেশি উত্তাপ দেয়। তুমিই বলেছিলে না—ইন্ডিয়ান ঋষিরা পঞ্চাশ বছরের ঊর্ধ্বে বনে যাবার উপদেশ দিয়েছেন!”

আমি বললাম, “যতোই যুক্তি দেখাও ভারতবর্ষের লোকেরা আজও ভাবতে পারে না তারা গুরুজনদের অবহেলা করবে।”

জন বললো, “এবার একটা নিষ্ঠুর সত্য কথা বলছি। আপনাদের দেশে ক’টা লোক ষাটের বেশি বাঁচে। আর আমাদের দেশের দিকে তাকিয়ে দেখুন—প্রতি বছরে মানুষের আয়ু বাড়ছে। ৬৫ বছরের কমবয়সী লোকদের আমরা বুড়ো বলি না—এদের সংখ্যা দু’কোটির ওপর, অর্থাৎ প্রতি একশো জনে দশ জন। তার ওপর প্রতি তিন বছরে দশ লক্ষ বুড়োবুড়ি বাড়ছে।”

বললাম, “এটা তো সৌভাগ্যের কথা—আমাদের বাবা-মা-রা যদি দীর্ঘায়ু হন।”

“কিন্তু জানেন তো আমরা প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের বিকাশে বিশ্বাস করি। আমার দাদু এবং দিদিমার ব্যক্তিত্ব ৮৫ বছরেও ঠিক আছে—তিনি নিজের ইচ্ছামত জীবনযাপন করতে চান।”

রবিনস্ দম্পতির সঙ্গে ডিনারের শেষে এ-বিষয়ে অনেক আলোচনা হয়েছিল। পশ্চিমী সভ্যতার গোড়ার কথাই হল ইনডিভিজুয়াল বা ব্যক্তি। পরিবারটা যেন একটা ফ্যাক্টরি—যেখানে শিশুকে যুবকে পরিণত করা হয়। যৌবনেই রাজেশ্বর। যৌবনসমাগমে ছেলেমেয়েরা বিবাহিত না হলেও বাবার সংসার ছেড়ে চলে যায়—অ্যাপার্টমেন্টে তার নিজের রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী থাকে। তারপর বিয়ে হয়। সংসারের কেন্দ্রবিন্দু হলো স্বামী-স্ত্রী—যথাসময়ে

সাময়িকভাবে সন্তানরা হাজির হয় ; সাময়িকভাবে এইজন্যে যে ছেলে-মেয়েরা বড়ো হয়ে বিয়ে করে সংসার ছেড়ে চলে যাবে—সংসারে পড়ে থাকবে স্বামী-স্ত্রী।

মার্কিন বিশেষজ্ঞদের মতে যৌথ পরিবারের পক্ষে শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে তাল রেখে চলা অসম্ভব। আগে যে ছেলেরা বাবার ওপর বেশি নির্ভর করতো তার কারণ বাবার জমিতে বা কারখানায় ছেলে কাজ করতো। অন্য কোথাও চাকরি যোগাড়ের জন্যেও বাবার ওপর নির্ভর করতে হতো। এখন বাজারে চাকরি অনেক, তার জন্যে বাবার সাহায্য দরকার হয় না।

বিশেষজ্ঞদের আর একটি ধারণা, দরিদ্র সমাজে বুড়োদের সম্মান বেশি। দরিদ্র দেশে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি দ্রুত নয় বলে বুড়োরা কাজকর্মের ক্ষেত্রে রাতারাতি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে! কিন্তু ইয়োরোপ আমেরিকায় বিজ্ঞান ও শিল্পের এতো দ্রুত উন্নতি হচ্ছে যে তার সঙ্গে তাল রেখে চলা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে কারখানায় নতুন নতুন যন্ত্র আসছে—যাতে লোক কম লাগে। বুড়োবয়সে আবার এই মেশিন চালানো শেখা বেশ কষ্টকর। শুধু কারখানার কর্মী নয়—বিজ্ঞানী এবং এঞ্জিনীয়রদের একই অবস্থা। সারা জীবন ধরে তাঁরা যা শিখেছেন তা হয়তো একবছরের নতুন আবিষ্কারে পুরনো হয়ে গেলো। নতুন বিষয়ে একজন আঠাশ বছরের ছেলে হয়তো পঞ্চান্ন বছরের ম্যানেজারের থেকে অনেক বেশি জানে। প্রতিযোগিতার এই দৌড়ে বৃদ্ধকে পথ ছেড়ে দিতে হয়।

জন বললো, "অগ্রগতিটা দেখুন না—মাত্র পঁচাত্তর বছরে গোরুর গাড়ি থেকে মহাকাশচারী-রকেট। আমার ঠাকুর্দা ছোটবেলায় গোরুর গাড়ি চড়ে ইস্কুলে গিয়েছেন। তাছাড়া আর একটা ব্যাপার কী জানেন, নতুন যুগের ছেলেদের বুড়োদের সম্বন্ধে কোনো শ্রদ্ধা নেই। কারণ বুড়োরা তাদের যুগের অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারেনি, বরং সমস্যাগুলো আরও জগাখিচুড়ি পাকিয়ে আমাদের ঘাড়ে ঋণস্বরূপ চাপিয়ে দিয়ে এখন হাওয়াই বা ফ্লোরিডায় ঝিমোচ্ছেন।

বললাম, "আমাদের দেশে বলে, সব ভাল যার শেষ ভাল। আমার বাবা আমার ঘাড়ে অনেক দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে মারা যান—ভারতবর্ষে বহুক্ষেত্রেই তা ঘটে—কিন্তু তা বলে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা তো কমেনি। পিতৃঋণের বোঝা শোধ করা সন্তানের অন্যতম কাজ। এই ঋণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আছে—তারপর সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি, নাহি ভ্রষ্টে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি।"

জন বললো, "আমি কোনো মতামত দিতে চাই না। তবে এইটুকু বলতে

পারি—আমাদের এই শিল্পসভ্যতায় এগিয়ে যাবার রেস এত কঠিন যে, অন্যের বোঝা নিজের মাথায় চাপালে জীবনে আনন্দ বলে কিছু থাকবে না। আপনারা পরজন্মে বিশ্বাস করেন—তাই কুড়ি বছরের স্বাধীনতায় দেশের একটু উন্নতি না হলেও আপনারা তেমন উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন না। আমরা জানি আমাদের একটাই জীবন আছে—তার মধ্যেই আমি ফল পেতে চাই। আমাদের চরিত্রের এই অশান্ত ভাবটা ভাল কি মন্দ জানি না, তবে এটা সত্যি, আমেরিকা বলতে যে ঐশ্বর্যময় দেশ দেখছেন, তা কয়েকজন ঘরপালানো অশান্ত লোকের পরিশ্রমের ফল।"

বললাম, "শুনেছি, আপনাদের দেশে বৃদ্ধরা ক্রমশঃই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। এর কারণ কী?"

"কারণ সহজ। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে আনন্দ নেই। তাঁরা যেন গত সপ্তাহের খবরের কাগজ—পুরনো দিনের স্মৃতি নিয়ে পড়ে আছেন। এঁদের প্রধান কাজ আজকের ছেলেছোকরাদের দোষ দেখা।"

দেশের কথা মনে পড়ে গেলো। আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠরা মাঝে-মাঝে দুঃখ করেন, নতুন যুগের ছেলেরা ঠিক আর তাঁদের মতো নেই। তারা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তাদের উচ্চ আদর্শ নেই, গুরুজনে ভক্তি নেই ; নিষ্ঠা নেই।—আছে অনেক বেশি পরিমাণে ভোগলিপ্সা এবং বউকে খুশী করবার তৎপরতা। কিন্তু তার মানে এই নয়—দুই প্রজন্মের যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছে। এই পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য প্রীতিবন্ধন রয়েছে যার মূল্য বিদেশে না এলে বোঝা যায় না।

রবিনস্-দম্পতির সঙ্গে কথাবার্তায় মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেলো। কারণ ওঁরা বললেন, "এই অনিবার্য পরিণতি নাকি পৃথিবীর সব সমাজের ভাগ্যেই লেখা আছে।" জন বললো, 'টেকনোলজির উন্নতির সঙ্গে এই সমস্যা আসবেই। জাপানের দিকে তাকিয়ে দেখুন এই সামান্য ক'বছরের মধ্যে কিভাবে যৌথ পরিবার ভেঙে পড়লো। মেয়েরা কেমন স্বাধীন হয়ে উঠলো। কেমন করে পরিবার বলতে স্বামী-স্ত্রীকেই বোঝাতে শুরু করছে—এই দুই পুরুষ কেমনভাবে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, যদিও এখনও পুরনো দিনের মধুর স্মৃতি সম্পূর্ণ মন থেকে মুছে যায়নি।

ডিনার খেয়ে বাড়ি ফিরে এসে গম্ভীর হয়ে বসেছিলাম। গৃহস্বামী মণিবাবু বললেন, "ভাল-মন্দ মতামত দেবার এক্তিয়ার নেই আমাদের সায়েন্সে।"

মণিবাবু বলেছিলেন, "শুধু দেখে যান—কোনো কিছুতে অভিভূত হয়ে পড়বেন না। এখন খাওয়া-দাওয়া করুন, নিউইয়র্কের নাচ-গান থিয়েটার উপভোগ করুন—তারপর সুযোগ বুঝে ভ্রমণের মধ্যে কোথাও একটা বৃদ্ধনিবাস দেখে আসবেন, তীর্থদর্শনের কাজ হবে।"

মণিবাবুর পরামর্শটা ভুলিনি। নিউইয়র্ক থেকে বেরিয়ে সপ্তাহখানেক পরে মাঝ-আমেরিকায় দু'একটা ওল্ড এজ দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল।

হোমের ম্যানেজার আমাকে সৌজন্যের সঙ্গে স্বাগতম জানালেন। হোমের পঞ্চাশ জন বাসিন্দা। "আসলে একটা বিশেষ ধরনের হোটেল বলতে পারেন। কেউ সিঙ্গেলরুমে থাকেন—কেউ বা দু'জনে একটা ঘরে থাকেন। মাথাপিছু খরচ মাসে অন্ততঃ ২২৫০ টাকা।" ম্যানেজার বললেন, "আমরা খুব কম খরচেই রাখি, বুঝতেই পারছেন।"

বললাম, "একটু ঘুরে দেখতে পারি?"

ভদ্রলোক রাজী হলেন, কিন্তু মনের মধ্যে একটু কিন্তু-কিন্তু ভাব লক্ষ্য করলাম।

বললাম, "আপনার মনে কোনো দ্বিধা আছে নাকি?"

"না। তবে কি জানেন, বার্ধক্য তো মানুষের সেরা সময় নয়। সুতরাং আপনি হতাশ হতে পারেন—এমনকি আমাদের দেশ সম্বন্ধে ভুল ধারণা করতে পারেন।"

"ভদ্রমহোদয়, আপনার কাছে আমার নিবেদন—মানুষ বৃদ্ধ না হলে সুন্দর হয় না। আর আপনাকে আরও জানাতে চাই, আমি দোষ-সন্ধানী সংবাদ-লেখক নই। মাত্র আট সপ্তাহে আপনাদের এই বিরাট দেশের সব খবর সংগ্রহ করে স্বদেশে ফাঁস করবার রুচি বা আগ্রহ কোনোটাই আমার নেই। আমি সমস্ত জীবন ধরে মানব-জীবনের আলো-আঁধারিকে মনের ক্যামেরায় ধরতে চাইছি—এবং কখনও কখনও তার এক-আধটা আমার পাঠকদের কাছে নিবেদন করি। আপনি বিশ্বাস করুন, মানুষকে হেয় করবার জন্যে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সন্ধানে এখানে আসিনি।"

মিস্টার ল্যারি বেশ লজ্জা পেলেন। আমিও কথাগুলো হুড়-হুড় করে বলে ফেলে লজ্জাবোধ করলাম। এতই স্পর্শকাতর হওয়া আমার পক্ষে উচিত নয়।

মিস্টার ল্যারি বললেন, "এখন চায়ের সময়। ওঁদের অনেককে বাইরে দেখতে পাওয়া যাবে।"

ঘর থেকে বেরিয়ে হোমের বারান্দায় দেখলাম জনাপনেরো পুরুষ ও মহিলা অতিবৃদ্ধ পাখির মতো জড়সড় হয়ে বসে আছেন। সকলের দৃষ্টি গেটের দিকে। দু'একজন মোটা চশমার আড়াল থেকে খবরের কাগজ পড়ছেন।

একজন বৃদ্ধের সঙ্গে মিস্টার ল্যারি আলাপ করিয়ে দিলেন। "মিস্টার জান্‌টম্যান, আপনার সঙ্গে একজন ভারতীয় সাহিত্যিক বন্ধুর আলাপ করিয়ে দিতে চাই। সরকারের আমন্ত্রণে ইনি আমাদের দেশ দেখে বেড়াচ্ছেন।"

মিস্টার জান্টম্যান কথাটা তেমন কানে নিলেন না। বললেন, "মিঃ ল্যারি, তোমার কি মনে হয় আমার ছেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে?"

"উনি তো পনেরো দিন আগেও একবার এসেছিলেন। আপনি নিজেই তো তাঁকে বললেন, ঘন-ঘন এখানে আমাকে দেখতে এসে তোমার উইকএন্ডগুলো নষ্ট করো না।"

বৃদ্ধ জান্টম্যান বিরক্ত হলেন। আমার কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, "সেটা তো আর মন থেকে বলিনি। ওর স্ত্রীর গোমড়ামুখ দেখে বলেছিলাম।"

মিঃ ল্যারি আমাকে বললেন, মিঃ জান্টম্যান অত্যন্ত পণ্ডিত লোক—আমাদের স্থানীয় কাগজ মিডওয়েস্ট ট্রিবিউনের সহযোগী-সম্পাদক ছিলেন।"

"সে সব অনেক আগেকার কথা। সম্পাদনার সঙ্গে কুড়ি বছর আমার কোনো সম্পর্ক নেই। এক সময় হুড়মুড় করে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতাম—আর বিশ্বাস করবেন, এখন নিজের নামটাও ভাল করে লিখতে পারি না। হাত কাঁপে। Such is god's will!'

"না না, আপনার চেকগুলো তো সুন্দরভাবে সই করেন, একটাও তো ফিরে আসে না," ল্যারি ওঁকে আশ্বাস দিলেন।

জান্টম্যান বললেন, "আগে বই পড়তাম। তিনমাস হলো তাও পারছি না। চোখের দৃষ্টি কমে আসছে।"

"আপনি ইন্ডিয়া থেকে এসেছেন? নেহরুর মেয়ে কেমন কাজ করছে? গ্যান্ডীকে আপনারা মনে রেখেছেন? জানেন, মিডওয়েস্ট ট্রিবিউনে আমার শেষ সম্পাদকীয় কার ওপর ছিল? সেদিন আমার চাকরির শেষ দিন, ভেবেছিলাম চুপচাপ বসে স্মৃতি-চারণ করে কাটিয়ে দেবো। এমন সময় টেলিপ্রিন্টারে খবর এল গ্যান্ডি নেই—তাঁকে খুন করা হয়েছে। আমি আর পারলাম না—আবার লিখতে শুরু করলাম। সেদিন সম্পাদকীয়ের নাম দিয়েছিলাম—যীশুর পদচিহ্ন। ক্রাইস্টের পদচিহ্ন ধরেই তো তিনি এসেছিলেন। পৃথিবীর মানুষ আমরা তাঁকে আবার হত্যা করলাম।"

মিঃ ল্যারি অধৈর্য হয়ে উঠলেন। বললেন, "মিঃ জান্টম্যান, আমাদের আরও কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করতে হবে।"

আমি বললাম, "যাবার সময় আবার ঘুরে যাবো।"

"আচ্ছা, আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করব।"

আমরা একটু এগিয়ে গিয়ে আবার থামলাম। সেখানে এক ভদ্রলোক তাসের মতো সাজিয়ে অনেকগুলো ফটো দেখছেন। "আপনার নাতি-নাতনীরা কেমন আছে, মিঃ সিডেনহাম?"

"গ্রেট। বড়ো নাতনী এই উইক-এন্ডে ডেটিং শুরু করছে। আমি আশা করছি

কালকেই ফোন পাবো। বাই-দি-বাই, আমার স্ত্রীর কোনো খবর পেলেন?"

"এখনও পাইনি। এলেই জানাবো।" মিস্টার ল্যারি এবার আমার কানে ফিস ফিস করে বললেন, "ওর স্ত্রীর ক্যানসার। যে কোনোদিন শেষ খবর আসবে।"

মিসেস ড্যাভেনপোর্ট একটা চেয়ারে বসে রুমালে ফুল তুলছেন। পরিচয়ের চেষ্টা করতেই বললেন, "আই অ্যাম স্যরি জেন্টলম্যান, তোমার সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলতে পারবো না—আমাকে এই সপ্তাহের মধ্যে আটখানা রুমাল শেষ করতেই হবে—অ্যাডভ্যান্স দাম নিয়ে নিয়েছি। আমি কাজ করি, তুমি ততক্ষণ বরং আমার ছেলে যে 'ভালো হয়ে ওঠো' কার্ড পাঠিয়েছে দেখো। কী সুন্দর কার্ডখানা। হীরের টুকরো ছেলে, তাই না? একদিন আমার একটু শরীর খারাপ হয়েছে অমনি 'গেট ওয়েল কার্ড' পোস্ট করেছে।"

"মহাশয়, সময় হলে এদিকেও একটু আসবেন।"

গলার আওয়াজ শুনে সেদিকেই গেলাম। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বয়সের চাপে কুঁজো হয়ে গিয়েছেন। চোখদুটো ধক ধক করে জ্বলছে। মিঃ ল্যারি জানালেন, ওঁর স্ত্রী দু'মাস হল দেহ রেখেছেন।

"হাউ ডু ইউ ডু।" দু'জনের করমর্দন হলো।

মিস্টার ক্রসবি বললেন, "লেখক? আমার সময় আপনারা ক্রেডিটওয়ার্দি ছিলেন না। ব্যাঙ্কে এসে একবার একজন বললেন, আমি লেখক, আমার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি জমা রেখে কিছু টাকা ধার দাও। আমি দিতে পারিনি।"

মিঃ ল্যারি জানালেন, "উনি আমাদের ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিলেন।"

—"ওসব বলে এখন লাভ কি?" ভদ্রলোক বিরক্ত হলেন।

"অবসর আপনার কেমন লাগছে?" জিজ্ঞেস করলাম।

"বিনাশ্রমে কারাদণ্ডের মতো।"

"আপনার কী খারাপ লাগছে? আপনি তো যা-খুশী তাই করতে পারেন।"

হেসে ফেললেন মিঃ ক্রসবি। "আমাকে আর স্তোক বাক্য দেবেন না, ইয়ংম্যান. শুধু এইটুকু জেনে রাখুন, একদিন আমার মতো আপনারও সময়ের কোনো দাম থাকবে না। একজন আমেরিকানের পক্ষে এর থেকে দুঃখের কী হতে পারে—যেদিন সে বলে ওঠে, অ্যালস্! মাই টাইম হ্যাজ নো ভ্যালু।"

মিঃ ল্যারি কানে কানে উপদেশ দিলেন, "এঁদের সঙ্গে বেশি কথা বললেন না। এঁরা তাহলে আপনাকে ছাড়বেন না। বৃদ্ধরা বাইরের বিশ্বের লোকের আশায় এখানে প্রতিদিন অপেক্ষা করে থাকেন। ওঁরা আমাদের সভ্যতা থেকে যেন অনেক দূরে নির্বাসিত হয়ে আছেন। এঁদের কেউ-কেউ ভাগ্যবান—ছেলেমেয়েরা নিয়মিত দেখে যায় বা ফোন করে। কেউ কেউ মাসের পর মাস একলা বসে থাকেন। বড়দিনের সময় আমরা চেষ্টা করি যাতে সবাই কোন না কোন পরিবারে

দেখতে পান।"

"এঁরা এখানে তাহলে কী করেন?" আমি প্রশ্ন করি।

মিঃ ল্যারি বললেন, "এঁরা সবাই মৃত্যুর ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করছেন।"

আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। জানতে চাইলাম, "এরা দুঃখ পান না?"

"কেন কষ্ট পাবেন? জীবন যে এইভাবে শেষ হবে তা তো আমরা প্রত্যেকেই জানি। এঁদের বাবা-মা তো এইভাবেই বিদায় নিয়েছেন, যৌবনে এঁরাও তাঁদের বাবা-মাকে এমনিভাবেই দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। এই তো প্রকৃতির নিয়ম।"

মনে মনে বললাম, তাই বুঝি! একেই বলে সভ্যতা!

আমার মন এত খারাপ হয়ে গেলো যে আর তাকাতে পারছিলাম না। বললাম, "যথেষ্ট হয়েছে মিঃ ল্যারি—এবার ফিরে চলুন।"

মিঃ ল্যারি বললেন, "এঁদের ব্যস্ত রাখবার জন্যে আমরা নানা প্রোগ্রাম করেছি—আমাদের রিপোর্টে তার বিবরণ পাবেন।"

বললাম, "বাঃ চমৎকার!"

মিঃ ল্যারির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরোবার পরে দেখলাম, গেটের কাছে একটা ডেক-চেয়ারে মিডওয়েস্ট ট্রিবিউনের একটা দুর্দান্ত সহযোগীসম্পাদক মিঃ জান্টম্যান আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। বললেন, "আপনার জন্যে একটা পুরনো কাগজের কাটিং ফাইল থেকে নিয়ে এলাম। গ্যাণ্ডি সম্পর্কে আমার শেষ এডিটোরিয়াল। আমার এই সব জিনিসপত্তর কবে নষ্ট হয়ে যাবে। এটা আপনি রেখে দিন। স্বদেশে গিয়ে আপনার মনে পড়ে যাবে আপনাদের মতো আমরাও তাঁকে বোঝবার চেষ্টা করেছিলাম।"

১৯৪৮ সালের সেই বিবর্ণ খবরের কাগজের টুকরোটা পকেটে পুরে আমি হাঁটতে লাগলাম। আর মনে পড়ে গেলো, আমার এক দরদী মার্কিন বন্ধু আমাকে একটা লেখার উদ্ধৃতি পাঠিয়েছিলেন। **"The United States is too wealthy a nation, too prosperous as individuals to need the old person." He can do little for us that we cannot do ourselves** কথাগুলো আমার কানে বাজতে লাগলো: "দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র এতই শক্তিশালী এবং ব্যক্তি হিসেবে সংসারে এমন কোনো কাজ নেই যা বৃদ্ধরা পারে, অথচ আমরা পারি না।" সুতরাং কে তাদের মনে রাখবে!

নিউ ইয়র্কের দুধ

মিসেস সুষমা চক্রবর্তীর সঙ্গে নিউ ইয়র্কেই দেখা হয়ে গেলো। এবং বিদেশে বাঙালিদের যা বদভ্যাস, জোর করে বাড়িতে ধরে নিয়ে গেলেন। বললেন, "জানি বড়ো হোটেলে অনেক আমেরিকান কেষ্টবিষ্টু তোমাকে লাঞ্চ ডিনার খাওয়াবে! কিন্তু মাঝে-মাঝে দেশের লোকদের জন্যে একটু কষ্ট স্বীকার করতে হয়। আজকের রাতের খাওয়াটা আমাদের ওখানেই সারতে হবে।"

আমি তখনও গাঁই-গুঁই করছিলুম। মিসেস চক্রবর্তী বললেন, "এটা মনে রেখো, সম্পর্কে আমি তোমার মাসিমা হই। বিদেশে তোমার গতিবিধির ওপর নজর রাখার নৈতিক দায়িত্ব আমার রয়েছে! এখানে উড়ে বেড়াচ্ছো কিনা সেটা জেরা করে বার করে নিতে হবে ; আর যদি না যাও তাহলে আমার যেরকম ইচ্ছে সেরকম একটা রিপোর্ট দিদির কাছে পাঠাতে হবে।"

অগত্যা রাজী হয়ে যেতে হলো। এই যুগে ব্ল্যাকমেলে কে না ভয় পায় বলুন? ঠাকুর রামকৃষ্ণের নামেও কিছু রটলে তা বিশ্বাস করবার জন্যে বেশ কিছু লোক উঁচিয়ে আছে। আর আত্মীয়স্বজন? তাঁরা তো এক একটি বারুদের ঢিবি। একটি গুজবের স্ফুলিঙ্গ পেলেই হলো।

সম্পর্কে মাসিমা হলেও সুষমা চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার মধুর সম্পর্ক। দেশে যখন দেখা হতো তখন অনেক রসের কথা বলতেন। এই ধরনের রসিক মহিলা বাংলাদেশ থেকে ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন। সংসার এঁদের অভাবে এখন আরও নিরানন্দ হয়ে উঠছে। সৃষ্টির মূল কথা যেমন আনন্দ, তেমনি বেঁচে থাকার গোড়ার কথাই হলো মজা। জীবনে যদি মজাই না রইলো, তাহলে বেঁচে সুখ কী? বাংলার নবযুগের তরুণ-তরুণীরা, সংসারের চাপে পড়ে এই সার সত্যটি ভুলবেন না।

মিসেস চক্রবর্তী আমাকে ওঁদের ফ্ল্যাটে নিয়ে গেলেন! বললাম, "বাঃ, বেশ ভাল ফ্ল্যাটখানা যোগাড় করেছেন তো!"

"তোমার কিছু হবে না," ধমক লাগালেন মিসেস চক্রবর্তী। "ফ্ল্যাট নয় অ্যাপার্টমেন্ট। বিলেতের তাঁবেদারিতে দুশো বছর থেকে তোমরা খাঁটি ইংরেজ হয়ে গেছো।"

আমাকে মিসেস চক্রবর্তী মনে করিয়ে দিলেন, মার্কিন দেশে ফ্ল্যাটের ইংরিজি হলো অ্যাপার্টমেন্ট, পেট্রল হলো গ্যাস, সেডিউল হলো স্কেডিউল। আর গেরস্থ বাঙালিদের খুব সুবিধে। "ফাস্ট ফ্লোর বলতে যে দোতলা বোঝায় তা না জানার জন্যে বাবার কাছে বকুনি খেয়েছি। এখানে বিলিত ভড়ং নেই, সেকেন্ড ফ্লোর মানে দোতলা, তিনতলা নয়।"

আমি মনে মনে মিসেস চক্রবর্তীর পুরনো দিনের কথা ভাবছিলাম। মিসেস চক্রবর্তী বুঝলেন, আমার মনের মধ্যে কিছু একটা তোলপাড়া খাচ্ছে। বললেন, "কি ভাবছো? শিল্পী মানুষদের নিয়ে এই এক বিপদ! দেখো বাপু, এখানকার রাস্তাঘাটে, যা গাড়ি, অন্যমনস্ক হয়ে বিপদ বাধিয়ে বোসো না।"

বললাম, 'সুষমা মাসি, আপনার কথাই ভাবছি। মনে আছে, আপনি একা রাস্তায় বেরোতে সাহস করতেন না। হাওড়া থেকে আপনার বৌবাজারে বাপের বাড়ি যাবার দরকার হলে আমাকে এসকর্ট রাখতেন। কতবার আপনাকে বৌবাজারে পৌঁছে দিয়ে এসেছি এবং সিনেমা হাউসের দরজা থেকে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে এসেছি।"

মিষ্টি হাসলেন সুষমা মাসি। বললেন, "দেখো বাপু দেশে গিয়ে যেন বদনাম ছড়িও না। এখন একা একা নিউ ইয়র্ক শহর চষে বেড়াচ্ছি। মনের সুখে চড়বড় করে ইংরেজি চালিয়ে যাচ্ছি। কার সাধ্যি ভুল ধরে? অথচ একবার তোমার মেসোকে পাবলিক ফোন থেকে কলকাতার অফিসে কল করতে গিয়ে ঘেমে উঠেছিলাম। ওদিক থেকে টেলিফোন অপারেটার মেমসায়েব যখন উত্তর দিলে, আমার মুখ থেকে একটা কথাও বেরোল না!"

মিসেস চক্রবর্তী একটু থেমে বললেন, "এখানে বাপু শুধু শখের বাজার করতে যাই না, দরকার হলে ময়লার ড্রাম পর্যন্ত কাঁধে চড়িয়ে কর্পোরেশনের গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি। আগে হাওড়ার বাড়িতে দুটো ঝি ছিল। একদিন মোক্ষদা না এলে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসতো। অথচ এখন কেউ নেই। একাই একশ হয়ে উঠেছি—আমিই মোক্ষদা, আমিই বাউনদিদি, আমিই কালুয়া জমাদার, আমিই তোমার মেসোর সেক্রেটারি, গার্ল ফ্রেন্ড, ওয়াইফ সবকিছু।"

মিসেস চক্রবর্তীর কথা আমি মন দিয়ে শুনে যাচ্ছি। সত্যি এই সামান্য কিছুদিনে সুষমা মাসি দশভূজা হয়ে উঠেছেন। রুচিও অনেক উন্নত হয়েছে। সুষমা মাসির বাড়িতে আমি তো কতবার গিয়েছি—চারদিকে ধুলো থাকতো, দড়িতে আধময়লা গামছা, শাড়ি, ফ্রক, লুঙ্গি ঝুলতো চাতালে, এঁটো বাসনে মাছি ভনভন করতো। এখন কেমন ঝকঝকে তকতকে সংসার পরিচালনা করছেন সুষমা মাসি।

সুষমা মাসি বললেন, "এ-জি অফিসের কর্মচারীর বউ হয়ে যে কোনোদিন আমেরিকায় আসতে পারবো তা তো কল্পনা করিনি। যখন আমার বিয়ে হলো তখন তো উনি লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক। মিঠু হওয়ার সময় আপার ডিভিশন হলেন। তারপর আমার খোঁচা-খোঁচিতে তিতবিরক্ত হয়ে এস এ এস পরীক্ষায় বসলেন। ও ছাই আবার এমন পরীক্ষা যে একেবারে পাশ করে কার সাধ্যি? প্রথমবারে না পেরে উনি তো হাল ছেড়ে দিচ্ছিলেন। আমার চাপে পড়ে আবার

দিয়ে কয়েকটা পার্ট পাশ করলেন। এবং শেষে সুপারিনটেনডেণ্ট হলেন। আমরা তো জানতাম না, এইসব লোকও বিদেশে পোস্টেড হতে পারে। এগুলো দিল্লীর স্টাফরাই এতোদিন ম্যানেজ করতো—ধরাধরি করে নিজেরাই চলে যেতো বিদেশে। এখন অন্য অন্য সরকারী অফিসেও মাঝে মাঝে খোঁজ খবর নিচ্ছে। আমি ওঁকে অ্যাপ্লাই করতে বললাম—ওঁর রেকর্ড ভাল। তাছাড়া ছোটবেলায় এক গণৎকার আমার হাত দেখে বলেছিল, তোমার সমুদ্রযাত্রা আছে।"

সুরসিকা সুষমা মাসি বললেন, "দেখো, ফললো তো?"

বললুম, "দিন না গণৎকারের ঠিকানাটা। আমিও ফিরে গিয়ে হাতটা দেখাবো।"

"তখন কি আর অত চালাক ছিলাম, তাহলে নিজেই টুকে রাখতাম। একবার মিঠুর হাতটাও দেখিয়ে নিতাম।"

"মিঠু কোথায়?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"মিঠু আর মিঠু নেই। এখন মিস লীনা চক্রবর্তী—এখানকার এক অপিসে চাকরি করছে। জানো, মাইনে কত আমাদের মিস লীনা চক্রবর্তীর? আমার নিজেরই বিশ্বাস হয়নি। ভেবেছিলুম—ছ-সাত শো কিছু একটা পেলে বর্তে যাবো—দেশে তো উনিও অত টাকার মুখ দেখেননি। কিন্তু লীনাকেই দিচ্ছে ওরা ২২০০ টাকা। বারো দিয়ে গুণ করলে বছরে ২৬,৪০০ টাকা।

আমি বললাম, অত গুণটুন করবেন না, আমার মাথা ঘুরছে। আমাদের মিঠু ওই টাকা পাচ্ছে, আপনি না বললে আমি বিশ্বাস করতাম না।"

মিসেস চক্রবর্তী বললেন, "এখানে প্রথমে এসে হাঘরের অবস্থা। আঙ্গুর, আপেল আর মুরগী খেয়ে খেয়ে ঘেন্না ধরে গেলো! জানো, এমন আজব দেশ যে মাছের মুড়ো কুকুরে খাবে বললে ফ্রি পাওয়া যায়। আপেলের থেকে অনেক বেশি দাম টমাটোর। মুরগী হলো গরীবের খাদ্য। যারা নিজেদের দারিদ্র্য বোঝাতে চায়, তারা বলে জানো, আমার এমন অবস্থা যে শুধু মুরগী খেয়ে পেট ভরাতে হয়েছে। আর দুধ তো ভেসে যাচ্ছে। একেবারে খাঁটি দুধ আমার বাড়িতে, সব সময় রসগোল্লা সন্দেশ তৈরি করে ফ্রিজে রাখি। ওই যে ফ্রিজ দেখছো, ভেবো না গাঁটের পয়সা খরচা করে কিনেছি। বাড়ি ভাড়ার সঙ্গেই ওভেন, ফ্রিজ এসব পাওয়া যায়। আর বাইরে যত শীতই হোক, গায়ে কম্বল চাপাবার দরকার নেই—ফাউ সেন্ট্রাল হিটিং রয়েছে। রেগুলেটার ঘুরিয়ে নিজের ইচ্ছে মতো গরম করে নাও। কল টিপলেই গরম জল। ঠাণ্ডা জলও রয়েছে। প্রত্যেক বাড়িতেই টেলিফোন। আমরা টেলিভিশনও নিয়েছি। ওঁর গাড়ি হয়েছে একটা—যে গাড়ি দেশে রাজা মহারাজা এবং ফিল্মস্টাররা চড়ে। সুতরাং সুখের শেষ নেই।"

বললাম, 'কুষ্ঠিতে ছিল, ভোগ করছেন। মেসোকে বলুন যাতে বেশিদিন থাকা

যায় তার চেষ্টা করতে।"

"আমাদের দু'বছর হলো, এই টার্মে আর এক বছর। কিন্তু রক্ষে করো বাপু, আর একটি বছর নমোনমো করে কাটিয়ে ঘরে ফিরলে বাঁচি।"

সুষমা মাসিকে মৃদু বকুনি লাগালাম। "এটা কি অকৃতজ্ঞতা হলো না। এই সোনার দেশ, এখানে এতো সুখ পাচ্ছেন। তবু আপনারা সন্তুষ্ট নন!"

সুষমা মাসি বললেন, "দেশে খাবার নেই, জিনিসের দাম বাড়ছে। রেশন কার্ড হাতে করে প্রত্যেক সপ্তাহে লাইনে দাঁড়াতে হবে, দুধে ভেজাল—সব সত্যি। কিন্তু আমি ফিরতে পারলে বাঁচি।"

বললাম, "মাসি, ইস্কুলে পড়েছিলাম—স্বদেশের প্রেম যত, সেই মাত্র অবগত, বিদেশেতে অধিবাস যার।"

সুষমা মাসি বললেন, "আমি বাপু দেশপ্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি না। দেশের জন্য দেশে ফিরতে চাই না। নিজের ঘরসংসারের কথা ভেবেই আমাকে দেশে ফিরতে হবে।

মদকে সুষমা মাসির খুব ভয় জানতাম। বললাম, "কেন? মেসো এই দারুণ শীতে একটু মদিরা পান করছেন নাকি?"

দেখলুম, মাসিমা এই দু'বছরেই অনেক উদার মতাবলম্বিনী হয়েছেন! বললেন, "ড্রিংকস তো আমরা বাড়িতে রেখেছি। যদিও উনি খান না—তবে বন্ধুবান্ধব এলে অফার করতে হয়। মদ খাওয়াটা এমন কিছু খারাপ নয় খারাপ মাতাল হওয়াটা!

"যেমন কাটলেট। খাওয়াটা খারাপ নয়, কিন্তু তা বলে বেশি খেয়ে পেট খারাপ করা ঠিক নয়," আমি মন্তব্য করলাম।

মাসি বললেন, "তোমরা তো আর্টিস্ট মানুষ! তোমাদের লাইনে তো ওসব চলে। যদি খেতে চাও একটু নিতে পারো।"

বললাম, "মদ খেতে অতি বিশ্রী লাগে, তাই খাই না। আমি শিবরাম চক্রবর্তীর দলে। উনি বলেছিলেন, নেশা যদি করতেই হয় রাবড়ির নেশা করো।"

হেসে ফেললেন মাসিমা। "সত্যি, শিবরাম চক্রবর্তীর লেখা আমার খুব ভাল লাগে। মিঠুও ওঁর খুব ভক্ত।"

শিবরাম চক্রবর্তীর খবরাখবর দিলাম মাসিমাকে। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার এদেশে কেন অরুচি হলো?"

একটু চিন্তা করলেন মাসিমা। তারপর বললেন, "হাজার হোক তুমি গল্প-টল্প লেখো, সুতরাং তোমাকে আর ছোট ভাবা ঠিক নয়। তোমাকে সব বলা যায়। আমার একটা ঘটনার কথা বলি, তার থেকেই ভয় পেয়ে গিয়েছি।"

মাসিমা আরম্ভ করলেন—

এখানে একা থেকে-থেকে হাঁপিয়ে উঠেছি। টেলিফোনে দু'একজন বাঙ্গালির সঙ্গে গল্প-টল্প করি, ন'মাসে ছ'মাসে দেখাও হয়। কিন্তু তাতে দিন চলে না। তাই এই বাড়ির আমেরিকান গিন্নীদের সঙ্গে আলাপ জমাতে হয়েছে।

লক্ষ্মী পুজোর দিনে আমাদের বাড়িতে কিছু রান্না করেছিলাম। সেগুলো নিয়ে পাশের ফ্ল্যাটে মিসেস ডসন-এর ওখানে হাজির হলাম। মিসেস ডসনকে বললাম, "আমাদের দেশে এই রীতি। পুজোর প্রসাদ প্রতিবেশীকে দিতে হয়।" উনি আনন্দ করে নিলেন। বললেন, "খুব খুশী হলাম।" সেই থেকে ভাব হয়ে গেলো। উনি সময় পেলে আমাদের এখানে আসেন। আমার কাছ থেকে ইন্ডিয়ান কারি আর পরোটা করা শিখেছেন।

মিস্টার ডসন মোটামুটি ভাল কাজকর্ম করেন। দু'খানা গাড়ি আছে। তবু ছেলেটা সকালে খবরের কাগজ বিক্রি করে। বয়স এগারো বার বছর। এই দারুণ শীতেও ভোরবেলায় উঠে সে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। আর আমেরিকার কাগজ দেখেছো তো—রবিবারে দুশো আড়াইশো পাতা থাকে। এখানে যদি পুরনো খবরের কাগজ বিক্রি হতো তাহলে বড়লোক হয়ে যেতাম। এই গন্ধমাদন পর্বত বাড়ি-বাড়ি দিয়ে আসা সোজা কাজ নয়। একদিন ছেলেটার অসুখ হলো, মিস্টার ডসন নিজেই দেখলাম ছেলের কাগজ বিক্রি করতে চলে গেলেন। একটুও লজ্জা নেই। শুনলাম প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার নাকি ছেলেবেলায় এমন কাগজের হকার ছিলেন। ভগবান জানেন!

ওদের মেয়ের নাম এলিজাবেথ। লিজা বলে ডাকে। বয়েস চৌদ্দ পনের। মেয়েটা দেখতে শুনতে বেশ। এরা ছোট বেলা থেকে খায় দায় ভাল—তাই কাঠামোটা খুব মজবুত। হুড় হুড় করে বেড়ে ওঠে। সমস্ত জাতটাই নাকি ক্রমশঃ লম্বা হচ্ছে।

লিজা প্রায়ই খুকুর কাছে আসে। বাড়িতে তার অবাধ স্বাধীনতা। স্বাধীন দেশ, তাই ছেলেমেয়েরাও সংসারে অনেক স্বাধীন। তবে স্বাবলম্বীও বটে। আমাদের বাড়ির ছেলেরা যেমন এক গ্লাস জল গড়িয়ে খায় না, তাদের জামাকাপড়ের খোঁজও মাকে রাখতে হয়, এখানে তা নয়। সবারই নিজের নিজর রুচি। ছোট ছেলেমেয়েদের মায়েরা বলে, ইট ইজ ইয়োর ডল। সুতরাং পুতুলকে ঠিকভাবে রাখার দায়িত্ব তোমার। যত তাড়াতাড়ি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারো তার চেষ্টা করো, এই হচ্ছে বক্তব্য।

লিজা একলা স্কুলে যায়। হৈ চৈ করে, সাইকেল চালিয়ে বেড়াতে বেরোয়। একেবারে স্বাধীন বলতে যা বোঝায়।

মিসেস চক্রবর্তীর গল্পে এবার বাধা পড়লো। বাইরে বেল বেজে উঠলো। দরজা খুলে দিতেই মিঠুর প্রবেশ। মিঠুকে অনেকদিন আগে দেখেছিলাম। এখন

অনেক পাল্টে গিয়েছে। মাসি বললেন, "এই হচ্ছে আমাদের কুমারী লীনা চক্রবর্তী।" মিঠুকে বললেন, "তোর শংকরদাকে মনে পড়ে? যখন হাওড়ার বাসায় থাকতিস তখন প্রায়ই আসতেন। তোকে শুঁটকী বলে রাগাতো।"

লীনা হেসে ফেললো। বললো, "সব মনে আছে। আমাকে যারা যারা ভুগিয়েছে তাদের ওপর প্রতিশোধ নেবো!"

বললুম, "দেখো বাবা, টেকো বলে এখন বদলা নিও না।"

"তোমার এমন কিছু টাক পড়েনি।" সান্ত্বনা দিলেন মাসি।

"আর তা ছাড়া লেখকের টাক হলে কদর বাড়বে। লোকে বলবে প্রবীণ অভিজ্ঞ লেখক।" লীনা মন্তব্য করলো।

বললুম, "মাসি, আপনার মেয়ে আপনার মতই সুরসিকা হচ্ছে। কথাবার্তায় আপনাকে একদিন হারিয়ে দেবে।"

"অনেক ব্যাপারেই হারিয়ে দিচ্ছে। এর মধ্যে মোটর চালাবার লাইসেন্স নিয়েছে। আমার তো যা ভয় লাগে! আমি বলে দিয়েছি, লাইসেন্স করেছো করেছো, কিন্তু তা বলে গাড়ি চালাতে দিচ্ছি না।"

লীনা দেখলাম নাইলনের শাড়ি পরেছে? লম্বায় ও মাকে ছড়িয়ে গিয়েছে। বেশ লাবণ্যময়ী। যদিও রংটা মায়ের তুলনায় সামান্য চাপা। কিন্তু টানা-টানা চোখে রূপসী বাংলার শ্যামশ্রী ছড়িয়ে রয়েছে। মার্কিন প্রাচুর্যের পরিবেশে শরীরটাও বেশ সুন্দর হয়েছে।

"কেমন লাগছে অফিসের চাকরি?" জিজ্ঞেস করি লীনাকে।

"বড্ড খাটিয়ে নেয়, কিন্তু মাসে ২২০০ টাকা ভাবলেই আর খারাপ লাগে না।"

"আজকে এলি কী করে?" মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন।

"টিউবেই চলে এলাম।"

"অফিসের সেই আমেরিকান ছেলেটা আবার লিফট দেবার কথা বলেনি তো?" মায়ের ব্যাকুল প্রশ্ন।

"বললেই শুনছে কে?" উত্তর দিল লীনা। লীনা বললো, "আজকে আপনার কাছে অনেক গল্প শুনবো, শংকরদা। পালাবেন না যেন। আমি স্নান সেরে আসি।"

লীনা চলে যেতে মাসি বললেন, "মেয়ের আমার সব ভাল, শুধু, যদি আর একটু ফর্সা হতো। তোমরা তো অনেককে চেনো—একটু ভাল ছেলেটেলের খোঁজ দিও।"

"পাত্রী আমেরিকায় চাকরি করছে শুনলে আই-সি-এস, কভেনেন্টেড অফিসার, চাটার্ড অ্যাকাউন্টেট সবাই সুড়সুড় করে এসে জড়ো হবে।" আমি আশ্বাস দিই।

"তুমি তো জানো আমাদের আশ্রয় বলে কিছু ছিল না। এখানে এসে লীনা যা জমাচ্ছে তাতেই বিয়েটা হয়ে যাবে। কী বলো?"

"আলবৎ," আমি বলি।

আমার চাকরি-বাকরি করতে দেবার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। যা কাঁচাখেগো ছোঁড়াদের দেশ। কিন্তু বাড়িতে বসে থেকেই বা করবে কী। এখানে সব মেয়েই তো বয় ফ্রেন্ডদের সঙ্গে ডেট করছে।"

মাসিমা জানালেন, "আমার মেয়েকে অন্যভাবে মানুষ করেছি। মায়ের কাছে সব কথা খুলে বলতে পারে। আর ওর শাড়িই হয়েছে কাল। যেখানে যায় নজরে পড়ে যায়। শাড়ির জন্য এখানকার লোকরা পাগল!"

নতুন জামা কাপড় হাতে আমাদের সামনে দিয়েই লীনা বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো।

মাসিমা বললেন, "মিঠু বেরোবার আগে তোমাকে মিসেস ডসনের ব্যাপারটা যা বলেছিলাম শেষ করে ফেলি। ওঁর মেয়ের চুল সোনালী। চোখগুলে কটা। ইস্কুল থেকে ফিরেই হৈ হুল্লোড় করছে। ওর নিজের একটা ঘর আছে। সেখানে বসে ছবি আঁকে।"

সেদিন বিকেলে ওদের ঘরে বসেই গল্প করছিলাম। মিস্টার ডসন ট্যুরে গিয়েছেন। গিন্নী হাফ প্যান্ট পরে ঘরদোর পরিষ্কার করলেন। তারপর আমাকে টেবিলে বসিয়ে দু'কাপ কফি তৈরি করলেন। মেয়ে এদিকে ঘরের মধ্যে ড্রেস করছিল।

বললাম, "আজ লিজা যে ড্রেসে অনেক সময় নিচ্ছে?"

মিসেস ডসন বললেন, "আজ ওদের পার্টি আছে। ওদের এক বন্ধুর জন্মদিন। তাই অনেক রাত ধরে নাচগান হবে।" মিসেস ডসন আরও জানালেন, মেয়ে তাঁর নৃত্যপটিয়সী! খুব ভাল কথাও বলে। তাই ওর ডেট পাবার জন্য ছেলেদের মধ্যে হুড়োহুড়ি।

আমি বললাম, "আমার মেয়েটাকে নিয়ে চিন্তা।" মিসেস ডসন আমার কথার উল্টো মানে বুঝলেন। বললেন, "চিন্তারই কথা। এতো বয়স হলো এখনও তোমার মেয়ের বয়ফ্রেন্ড হলো না। ডেট নেই।" আমি বললাম, "আমাদের দেশে ডেটিং নেই। বিয়ে দেওয়াটা বাবা-মায়ের দায়িত্ব।" মিসেস ডসন ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন, বললেন, "আমার মেয়ে কাকে বিয়ে করবে তার মধ্যে আমি নাক গলাতে যাবো কেন?"

লিজা এবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ওর মুখের মেকআপটা ঠিক হয়েছে কিনা সেটা মাকে দেখিয়ে নেবার জন্যে। মা আলোর কাছে নিয়ে গিয়ে অভিজ্ঞ জহুরীর মতো অনেকক্ষণ মেয়ের মুখ দেখলেন। তারপর বললেন, এয়ার ব্রাশটা

একবার হাল্কাভাবে ঘুরিয়ে নেবার জন্যে।

এরপর আঁটসাট জামা পরে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত বেশবাস করে কিশোরী কন্যা যখন বেরিয়ে এলো নিজের ঘর থেকে, তখন মায়ের বুক গর্বে ভরে উঠলো। বললেন, "তোমাকে ঠিক পরীর মতো দেখোচ্ছে সোনা।"

কন্যার গণ্ড একটু ব্লাস করলো। মেয়েকে এবার খাবার টেবিলে বসিয়ে বললেন, "যদি কিছু মনে না করো, আজকে কোন্ ছেলেটিকে ডেট দিয়েছো তুমি?"

"ডেভিটকে। খুব ভাল ছেলে। আমার থেকে একবছরের ছোট। খুব ভাল ফুটবল খেলে। সামনের বছর নিশ্চয় স্কুলটীমের ক্যাপ্টেন হবে।"

মা বললেন, "তাই নাকি? তাহলে খুবই গর্বের কথা। ওর বাবা মা তো মুদিখানার দোকানটা চালান। তাই না?"

"ঠিক ধরেছো মা। ডেভিড তো এখনই আসবে, দেখো কী রকম হ্যান্ডসাম। শুধু ওর সামনের দাঁত ক'টা এবড়ো-খেবড়ো দাঁত আমার বিশ্রী লাগে। ডেভিড ওর মাকে বলেছে। সামনের সপ্তাহে ডেনটিস্টের কাছে যাবে। আজকাল ডেনটিস্টরা তো যে কোন দাঁতকে সোজা করে দিচ্ছে।

মেয়ের জন্যে সামান্য খাবার নিয়ে এলেন মিসেস ডসন। মেয়ে খেতে আরম্ভ করলে আলতোভাবে। মা বললেন, "এখনও সময় রয়েছে। খাওয়া শেষ করে চোখের চুলগুলো পাল্টে ফেলো। ঠিক ম্যাচ করছে না। ঠোঁটে আর একুট লিপস্টিক দিয়ে নাও।" মিসেস ডসন আমাকে বললেন, "এক মিনিট।"

ভিতরে গিয়ে দু' একমিনিট কী খুটখাট করলেন। তারপর এক গেলাস দুধ নিয়ে ফিরলেন। গেলাসটি টেবিলে নামিয়ে দিয়ে বললেন, "বাছা, এইটা এবার খেয়ে নাও।"

"দুধ?" মেয়ে যেন আঁতকে উঠলো।

"তুমি পাগল হয়েছো মা, এখন আমি দুধ খাবো?" মেয়ে বেশ রেগে উঠলো।

"সোনা মেয়ে, সকালে আজ দুধ খেতে ভুলে গিয়েছো, এখন খাও।"

মেয়ে বেজায় খাপ্পা হয়ে উঠলো। "সকালে দুধ খাইনি বলে এখন খেতে হবে তেমন কোনো আইন নেই।"

'না বাছা, দুধ তোমাদের বয়সে খাওয়া উচিত।" মা বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

মেয়ে বললে, "মা তুমি কি চাও তোমার মেয়ে একটা কুমড়াপটাস হয়? আমি এই মাত্র ওজন নিলাম। আমার একপাউন্ড ওজন বেড়ে গেছে।"

"সে তো ভাল কথা, বাছা।"

"নিজে তো কেমন ছিপছিপে সুন্দরীটি রয়েছো। আমার জামাকাপড় সব এত টাইট হয়ে গিয়েছে যে বলবার নয়।"

মা আবার বোঝাবার চেষ্টা করলেন, "দুধ খাও বাছা। তোমাদের তো এখন বাড়বারই বয়স। শরীর এখন ক্রমশঃ নারীত্বের সৌন্দর্যকে ডেকে আনবে।"

"ওসব বাজে কথায় আমাকে ভোলাতে পারবে না। এই বাড়তি একপাউন্ডটা আমার হিপে জমা হয়েছে। এটা মোটেই ভাল নয়।"

মা বললেন, "বাছা, এই দুধে ক্যালরি তেমন নেই। তুমি লক্ষ্মী মেয়ের মতো খেয়ে নাও।" মেয়ের সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। মা তখন বললেন, "ক্যালরির জন্যে যদি এতো চিন্তা, তাহলে পেস্ট্রি থাক, তার বদলে দুধ খাও।"

মেয়ে পেস্ট্রিটা মুখে পুড়ে দিয়ে বললে, "দুধ আর পেস্ট্রি এক জিনিস না মা। পেস্ট্রি আমি খাবোই।"

মিসেস ডসন যে দুধ খাওয়াবার জন্যে কেন এতো ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন ভগবান জানেন। আর তেমনি হয়েছে মেয়েটা। মাকে পাত্তাই দিলো না।

ইতিমধ্যে ডেভিড নামক বালক স্যুট পরে হাজির হলো। মাথার চুলগুলো ছোট-ছোট করে ছাঁটা। এইটুকু ছেলে এই মেয়ের সঙ্গে ডেটিং-এ বেরোচ্ছে ভাবতে আমর হাসি লাগছিল। কিন্তু তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে মিসেস ডসন জিজ্ঞেস করলেন, সে কিছু খাবে নাকি। ডেভিড রাজী হলো না।

লিজা এবার টেবিল থেকে উঠে ঘরে ছুটে গেলো আই ল্যাশ পাল্টাতে। যাবার আগে বললে, "ডেভিড, আমি এক মিনিটের বেশি সময় নেবো না।"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই লিজা বেরিয়ে এলো। মিসেস ডসনের মাথায় তখন যেন ভূত চেপেছে। দরজা পর্যন্ত দুধটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বললেন, "লিজা, আমার কথা শুনে দুধটা খেয়ে নাও।"

মেয়ে রাজী হলো না। তখন হতাশ হয়ে মা তাঁর আনুষ্ঠানিক কর্তব্য করলেন। বললেন, "হ্যাভ এ গুড টাইম। সব কিছু এনজয় করো। আর যদি পারো রাত বারোটার মধ্যে বাড়ি ফিরে এসো। তুমি না আসা পর্যন্ত আমার ঘুম আসবে না।"

"তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। আমার কাছে তো ফ্ল্যাটের চাবি রইলো।" এই কথা বলে লিজা বালক-বন্ধু ডেভিডের হাত ধরে বেরিয়ে গেলো।

বিরস বদনে মিসেস ডসন তখন দুধের গেলাসের দিকে তাকিয়ে রইলেন. আমি আর ওঁর দুধ নিয়ে এত বাড়াবাড়ি সহ্য করতে পারছিলাম না।

বললাম, "সামান্য ব্যাপার নিয়ে এতো বিব্রত হচ্ছেন কেন?"

"সামান্য মোটেই নয়।" একটা সিগারেট ধরালেন মিসেস ডসন। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে তিনি বললেন, "আপনাকে বলতে লজ্জা নেই, আপনার গ্রোন আপ মেয়ে রয়েছে। আজকাল ডেটিং-এ কি হয় কিছুই ঠিক নেই। ওদের এখনও বিচার-বুদ্ধি হয়নি। তাই প্রতিদিন লুকিয়ে দুধের সঙ্গে একটা বার্থ কন্টোল পিল গুঁড়ো করে মিশিয়ে দিই। এই সব পিল জানেন তো নিয়মিত না খেলে কোনো

কাজেই লাগে না। এই বয়সে একটা কেলেঙ্কারী হলে কী ফ্যাসাদ বলুন তো? জানাশোনা তিনটে মেয়ে পনেরো বছরের মধ্যে প্রেগনেন্ট হয়েছে। তাদের বাপ-মায়ের অবস্থা ভাবুন।"

সুষমা মাসিমা এইবার থামলেন। আমাকে বললেন, "মিসেস ডসনের কথা শুনে আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে গিয়েছে। রক্ষে করো বাপু। মাথায় থাকুন ডলার। আমি মেয়েটাকে নিয়ে দেশে ফিরতে পারলে বাঁচি।"

লীনা এবার বাথরুম থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বললে, "শংকরদা আর পাঁচ মিনিট।"

মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, "তা হলে তোর দুধ গরম করি?"

মেয়ে বললে, "করো।"

লীনা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তে মাসিমা বললেন, "মেয়ে আমার খুবই ভাল এখনও। দেশে গিয়ে জল মেশানো ভেজাল দুধই খাবে। মাথায় থাকুক পিল মেশানো খাঁটি দুধের দেশ।"

বাংলার ছবি

রবিশঙ্কর সম্পর্কে কথাগুলো এখানেই বলে রাখি।

রাজধানীর সর্বশক্তিমান রাজনীতিকগণ এবং বোম্বাই-এর সুদর্শন তারকাবৃন্দ যতই অস্বস্তিবোধ করুন, যদি প্রশ্ন করা হয় বিশ্বসভায় এখন সবচেয়ে খ্যাতনামা ভারতীয়র নাম কী? তাহলে সকলকে একবাক্যে উত্তর দিতে হবে : রবিশঙ্কর।

এমন একদিন ছিল যেদিন ভারতের বিখ্যাত নেতারা বিদেশেও সম্মান ও শ্রদ্ধা পেতেন। আমাদের অর্থনৈতিক অ্যানিমিয়া ও নৈতিক অধঃপতন সেই স্বর্ণযুগের অবসান ঘটিয়েছে। ফলে স্বদেশে যেসব পরম শক্তিমানের স্তুতিতে আকাশবাণী মুখরিত হয়ে ওঠে, গড়ে তোপধ্বনি হয় এবং সরকারী শঙ্খঘণ্টা বাজে, বিদেশে তাঁরা কণামাত্র কৌতূহল উদ্রেক করতে পারেন না। বিদেশী সংবাদপত্রে ও টেলিভিশনে তাঁদের অবহেলা ভি-আই পিদের মর্মবেদনার কারণ হয়, এবং 'মম অপমান ভারতের অপমান' বিড়বিড় করতে করতে তারা স্বদেশে ফিরে আসেন। বিদেশী প্রেস লর্ড, রক্ষণশীল রাজনীতিবিদ এবং চীনা ও পাকিস্তানী কূটনীতিকদের যতই ষড়যন্ত্র থাকুক, ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখলে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না—অগ্রসর ও অনগ্রসর সমস্ত দেশের সাধারণ মানুষের হৃদয়ে আসন পাতবার মতো তেমন কোনো কাজ সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশের রাজনীতিক, সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী, চিত্রতারকা কেউ করে উঠতে

পারছেন না। এই আপাত নৈরাশ্যের মধ্যে শিবরাত্রের সলতের মতো একটি মাত্র প্রদীপ পশ্চিমদেশের আকাশে জ্বলজ্বল করছে। তাঁর নাম আবার ঘোষণা করছি—রবিশঙ্কর।

এই যে রবিশঙ্কর কাহিনী নিবেদন করতে বসেছি তার কারণ তিনটি। প্রথম—আমার স্থির বিশ্বাস, সাম্প্রতিককালে ভারতের সম্মানবৃদ্ধিতে রবিশঙ্কর এককভাবে যা করেছেন সে সম্পর্কে সরকার যথাযোগ্য স্বীকৃতি দেননি। বাৎসরিক খেতাব তালিকার নির্বাচকমণ্ডলী এতই দৃষ্টিকৃপণ যে, কয়েক ডজন যদু-মধুর সঙ্গে এই বিশ্ববিজয়ীকে একই লাইনে দাঁড় করিয়ে একটি দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শ্রেণীর সম্মান-প্রসাদ বিতরণ করতেই তাঁরা সন্তুষ্ট।

আমার এক বন্ধু সন্দেহ করেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকলে 'ভারত রত্ন' বিবেচিত হতেন কিনা। বন্ধুর ধারণা মৃতদের সম্পর্কে দিল্লীর আমলাদের উৎসাহ জীবিতদের থেকে বেশি—কারণ মৃতরা নিরাপদ।

আমার লিখতে বসার দ্বিতীয় কারণ : শুধু সরকার নয়, দেশের জনগণ, যাঁরা কখনও দেশবাসীর কৃতিত্বে আনন্দপ্রদর্শনে কার্পণ্য করেন না, তাঁরাও রবিশঙ্করের অভাবনীয় সাফল্য সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত নন। বিশ্ববিজয় করে বিবেকানন্দ যখন শিয়ালদহ স্টেশনে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তখন উৎসাহী যুবকেরা তাঁর গাড়ি নিজেরা টেনেছিল। আজ শিয়ালদহ আছে, ঘোড়ার গাড়িও আছে কিন্তু যুবশক্তির মনে সব বিষয়ে ঠিক সেই উৎসাহ নেই। তৃতীয় কারণ : কবি সত্যেন্দ্রনাথ আজ জীবিত নেই। কবি বেঁচে থাকলে তাঁর "আমরা" কবিতায় আরও দুটি লাইন জুড়ে দিয়ে বাঙালি রবির বিশ্ববিজয়কে অভিনন্দিত করতেন। আমাদের যুগে কবি, সাহিত্যিকরা নানা কাজে ব্যস্ত—কোথায় কোন বাঙালি সেতারের সুরে নতুন এক দেশের হৃদয় জয় করলেন বলে কবিতা লিখতে বসতে হবে, এ কেমন কথা? আগের যুগের লেখক শিল্পীরা অনেক বোকা ছিলেন, তাই অন্যের সাফল্যে উৎফুল্ল হয়ে লিখে বসতেন :

> জগৎ কবি সভায় মোরা তোমার করি গর্ব
> বাঙালি আজ গানের রাজা বাঙালী নহে খর্ব।

দেশের রাজশক্তিকে কর্তব্যকর্মে উদ্বুদ্ধ করার মতো শক্তি আমার নেই। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাজও আমার পক্ষে অসম্ভব—কারণ আমি গান বা কবিতা লিখি না। বাংলার সাহিত্যিকদের একজন হিসেবে আমি শুধু আমার আনন্দ প্রকাশ করছি।

রবিশঙ্করই প্রথম ভারতীয় যাঁর সঙ্গে আমেরিকায় আমার দেখা হয়। প্যারিসের অরলি বিমানবন্দর ত্যাগ করে, সাড়ে-সাতঘণ্টা একটানা আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে ট্রান্সওয়ার্লড এয়ার লাইনস্-এর বোয়িং বিমান

আমাদের নিউ ইয়র্কের কেনেডি বিমানবন্দরে নামিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বিমানবন্দরের অনেক সাহেব তাঁর দিকে আড়চোখে কৌতূহলী দৃষ্টিপাত করে চলে যাচ্ছেন। এদেশের বিখ্যাত কাউকে দেখে ভিড় করে দাঁড়িয়ে পড়াটা বিশেষ শোভন নয়—কারণ গুণগ্রাহীরা এমন কিছু করতে চান না যাতে তাঁদের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির প্রাইভেসী নষ্ট হয়, বা তাঁর কোনো অসুবিধা হয়। যে-দোকান থেকে কফি কিনছিলাম, সেখানকার মহিলাটি আমার রং ও মুখ চোখের গড়ন দেখেই বুঝতে পারলেন—আমি হয় ভারতীয় না হয় পাকিস্তানী। ভদ্রমহিলা আমার দিকে কফি এগিয়ে দিয়ে বললেন, "যদি কিছু মনে না করেন, ওই সুদর্শন ভদ্রলোকই কি আপনাদের উপমহাদেশের গর্ব রবিশঙ্কর?"

রবিশঙ্কর ছাড়া উনি আর কে হতে পারেন? কখনও পরিচয় না হলেও দূর থেকে গানের আসরে এক আধবার দেখেছি ওঁকে। মহিলাকে বললাম, "হ্যাঁ, উনিই রবিশঙ্কর।" কফি তৈরী বন্ধ করে ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ রবির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বিদেশে বঙ্গসন্তান দেখলে আলাপ করার লোভ সামলানো শক্ত ব্যাপার। বিশেষ করে প্যারিসের অভিজ্ঞতাটা তেমন জমেনি। এগিয়ে গিয়ে তাই রবিশঙ্করের সঙ্গে কথা বললাম। রবিশঙ্কর যে আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে বেশ ওয়াকিবহাল তা জানতাম না। দেখলাম আমার লেখার সঙ্গে ওঁর পরিচয় আছে।

অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে রবি দেশের খবরাখবর নিলেন। পাশেই শাড়িপরা এক মহিলা দাঁড়িয়েছিলেন। রবিশঙ্কর ইংরেজীতে ওঁকে ডাকলেন, "কমলা, তোমার সঙ্গে একজন লেখকের আলাপ করিয়ে দিই।" আমাকে বললেন, "ইনিই কমলা চক্রবর্তী, আমার দলে আছেন। কমলা হাতজোড় করে নমস্কার জানালেন, তারপর ভাঙাভাঙা মিষ্টি বাংলায় কথা বলতে আরম্ভ করলেন। শ্রীমতী চক্রবর্তী দক্ষিণ ভারতের মেয়ে, পরে বিয়ে করেন বোম্বাই-এর এককালের বিখ্যাত চিত্রপরিচালক স্বর্গীয় অমিয় চক্রবর্তীকে।

রবিশঙ্কর বললেন, 'আমি এখন নিউইয়র্কে মাস্টারি করছি। চারদিন এখানে থাকি, তারপর উইক এন্ডে বেরিয়ে পড়ি—নানা জায়গায় বাজাবার প্রোগ্রাম থাকে।"

কমলা জানালেন, "এখন আমরা চলেছি মন্টিয়লে।"

"মন্টিয়ল? সে তো কানাডায়!"

"আজ্ঞে। তবে কানাডা আর কতদূর? প্লেনে বেশি সময় লাগে না। আমরা সোমবার ভোরেই ফিরে আসবো। ফিরে এসেই রবি নিউ ইয়র্ক সিটি কলেজে ক্লাশ করতে যাবেন।"

রবি দেখলাম বেশ গল্পবাজ লোক। (যে-বাঙালি আড্ডা দিতে ভালবাসে না

তাকে আমি সন্দেহের চোখে দেখি!)

রবি আমার ভ্রমণসূচীর খবরাখবর নিলেন। বললাম, "এখনও পর্যন্ত কিছুই জানি না। সব ঠিক হবে ওয়াশিংটনে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করার পর। তবে এইটুকু জানি, দু'মাস এই দেশে থাকছি।"

রবি আমার ঠিকানা-বইতে ওঁর বাড়ির নম্বর ও টেলিফোন নম্বর লিখে দিয়ে বললেন, "যেখানেই থাকুন, নিউইয়র্কে নিশ্চয় আসবেন। তখন দেখা করার ইচ্ছে রইলো। শুধু যদি টেলিফোনে আপনার প্রোগ্রামটা একটু আগে জানিয়ে দেন। কারণ কোথায় কখন যে আছি নিজেই জানি না।"

রবিশঙ্করের প্লেন ছাড়বার সময় হলো। নিজেদের লাগেজ সামলাবার জন্যে আমরাও স্বস্থানে ফিরে এলাম।

ওয়াশিংটনের মাটিতে পা ফেলেই রবিশঙ্করের জনপ্রিয়তার নজির পেলাম। পররাষ্ট্র দপ্তরের যে ভদ্রলোক আমাকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা করতে গিয়েছিলেন, তিনি আমাকে হোটেলে পৌঁছে দেবার পথে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলেন, রাভিশঙ্কর আমার কেউ হয় কিনা। আমাকে বলতে হলো, আমার নামের সঙ্গে একটি শংকর থাকলেও বিখ্যাত শিল্পীর সঙ্গে আমার কোনো আত্মীয়তা নেই।

এরপর একদিন ঘুরতে ঘুরতে গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকানে গিয়েছিলাম। এখানকার রেকর্ডের দোকানে খরিদ্দারদের অবাধ স্বাধীনতা।

একের পর এক শেলফ রয়েছে, সেখানে আপনার পছন্দমতো রেকর্ড নিজেই বার করে নিন। তারপর যে কোনো রেকর্ড-প্লেয়ার লাগিয়ে রেকর্ড শুনে পছন্দ করুন। অনেক জায়গায় আবার হেডফোনের ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ এই যন্ত্রে কান লাগিয়ে যত ইচ্ছে গান শুনুন—গান একমাত্র আপনিই শুনতে পাবেন, অন্য কারও অসুবিধে হবে না। এরোপ্লেনে এই কায়দায় সবাক চলচ্চিত্র দেখানো হয়—যাঁদের ছবি দেখার ইচ্ছে নেই, এতে তাঁদের বিরক্তি উদ্রেক হয় না। রেকর্ডের দোকানে নানা জনপ্রিয় শিল্পীর ছবি সাজানো, তার মধ্যে রবিশঙ্করের উপস্থিতি দেখে খুব আনন্দ হলো। আরও গর্ব হলো যখন দেখলাম একটা শেলফ আলাদা রয়েছে যেখানে কেবল তাঁর রেকর্ড। রবিশঙ্কর-শেলফ থেকে মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে অন্ততঃ দুজন লোককে রেকর্ড টেনে বার করতে দেখলাম।

ওয়াশিংটনের এক পার্কে হিপিদের ভিড় হয়। সেখানে রবিশঙ্কর তো আধা-দেবতা। বীরপূজা বা ব্যক্তিপূজা কোনোটাই মার্কিনদেশে প্রচলিত নয়। কিন্তু এদেশের একশ্রেণীর যুবক-যুবতীর কাছে রবিশঙ্কর পরম পূজনীয়—তাই তাঁর ছবির পোস্টার এদের ঘরে ঘরে শোভা পায়, ওঁর ছবিওয়ালা স্পেশাল বোতাম এরা বুকে এঁটে বেড়ায়। পকেটেও রবিশংকরের ছবি। আর মনের ইচ্ছা, হাজার খানেক টাকা জমিয়ে একটা সেতার কিনবে।

হিপিদের রবিপ্রীতি দেখেও আমি সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি, যতক্ষণ না চ্যাপেল হিলে নর্থ-ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজির হয়েছি। এইখানেই এক চায়ের দোকানে পনেরো বছরের ইহুদি ছোকরা ডেভিড ফ্রিডম্যানের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেলো।

ইউনিভারসিটির চায়ের দোকানে মাথার ওপর কোনো ছাদ নেই ; কফি সংগ্রহ করে আমি গাছের তলায় একটা টেবিলের সামনে বসেছিলাম। সেই সময় আর এক কাপ কফি হাতে ডেভিড ফ্রিডম্যান এসে আমার অনুমতি চাইলো চেয়ারে বসবার। একটু পরেই আলাপ জমে উঠলো। ডেভিড ফ্রিডম্যান নিউ ইয়র্ক থেকে মাইল পনেরো দূরে শহরতলীতে থাকে। বাবা কোনো ব্যাংকের কর্তাব্যক্তি। দাদা চ্যাপেল হিলে পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র। মা ও সে মাঝে মাঝে চ্যাপেল হিলে চলে আসে। উঠেছে হোটেলে। ভারী বুদ্ধিমান ছেলেটি।

আমার নাম শুনেই ডেভিড ফ্রিডম্যান প্রচণ্ড উৎসাহী হয়ে উঠলো।

"শংকর! আমার কতবড় সৌভাগ্য, আপনি নিশ্চয় ইন্ডিয়ার গ্রেট রাফি-শঙ্করের কেউ হন!"

আমি জানালাম, "তিনি আমার কেউ হন না।"

ডেভিড ছোকরা কথাটা ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারলো না। বললো, "আমরা আরও কয়েকজন ইন্ডিয়ানকে চিনি। কিন্তু শংকর টাইটেল তো বেশি দেখিনি!"

আমি বললাম, "হিন্দুদের তিনজন প্রধান দেবতার একজন শংকর। তিনি ধ্বংসের দেবতা, আবার নটরাজও বটে। তাই উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম ভারতের সর্বত্র শংকর নামটি খুব সাধারণ, যদিও উপাধি হিসাবে এটি মোটেই সাধারণ নয়।"

বয়সে বালক হলে কী হয়, ডেভিড প্রখর বুদ্ধিমান। ওর টানা টানা চোখ দুটো বড় বড় করে বললো, "মানে?"

বললুম, "যতদূর জানি, শংকর ওঁদের পারিবারিক উপাধি নয়। তার পরে একটা চৌধুরী ছিল, যেটা ওঁর পূর্বপুরুষ ত্যাগ করেন।"

ডেভিড ফ্রিডম্যানকে আশ্বস্ত করার জন্যে বললাম, "রবিশঙ্কর আমার আত্মীয় না হলেও আমি তাঁকে চিনি। এই তো কয়েকদিন আগে নিউইয়র্কে ওঁর সঙ্গে দেখা হলো। উনি নিজের হাতে ওঁর ঠিকানা আমার ডাইরিতে লিখে দিলেন।"

ডেভিড বিশ্বাসই করতে পারছে না। বললো, "উনি নিজের হাতে লিখে দিলেন!"

বললাম, 'হ্যাঁ। এতে আর আশ্চর্য কী!"

"তোমার কত বড় সৌভাগ্য! আচ্ছা, তুমি ওর সঙ্গে ফোনে কথা বলতে পারো?"

"কেন পারবো না? তিনি নিজেই তো ফোন নম্বর দিয়ে খবর করতে বললেন।" আমি ডেভিডকে বোঝাবার চেষ্টা করি।

ডেভিড বললো, "ওঁর সঙ্গে একবার ফোনে কথা বলতে খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু এতোবড়ো ব্যস্ত শিল্পী উনি কেন আমার মতো একজন সাধারণ ছেলের সঙ্গে কথা বলবেন? আর ফোন নম্বরটাও তো গোপন। না হলে, লোকে যে ওঁকে সব সময় জ্বালাতন করবে।"

রবিশঙ্করের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, এতেই আমার দাম বেশ বেড়ে গেলো। ডেভিড বললো, "আপনি যদি খুব ব্যস্ত না থাকেন তাহলে আসুন দু'জনে একটু ঘুরে বেড়াই। আপনার কাছে আমার কত কি শেখবার আছে।"

সঙ্গীতে আমার বিদ্যা যে গোড়ার পাতা পর্যন্ত এগোয়নি, একথা ডেভিডকে বলতে সাহস হচ্ছিল না। ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে ওর মনে এক বিচিত্র রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ডেভিড পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললো, "ভারতীয় সঙ্গীতের রেকর্ড পেলেই আমি কিনে ফেলি। জানেন, আপনাদের সঙ্গীত আমাদের সামনে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে।"

আমি গুঁইগাঁই করি। কারণ যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকলেও সঙ্গীতের গভীরে প্রবেশ করে রস গ্রহণের শক্তি অর্জন করিনি। যখন এসব শেখার সময় তখন নিদারুণ দারিদ্র্যে কষ্ট পেয়েছি। অন্নসংস্থানের জন্য প্রতিমুহূর্ত ব্যয় করেছি—শখের অবসর তখন ছিল না। আর এখন মনে হয়, বড়ো দেরি হয়ে গিয়েছে।

ডেভিডকে অবশ্য এসব কথা বলিনি। কিন্তু ডেভিডের কথায় আমি অবাক হয়ে গেলাম। ডেভিডের প্রশ্ন "বোম্বাইতে রবির বাড়ি দেখেছেন আপনি? উনি তো বাড়ির নাম দিয়েছেন পাভলোভা।"

আমি জানতাম না। তাই ওর মুখের দিকে তাকালাম। ডেভিড বললো, "বিখ্যাত নর্তকী আনা পাভলোভা, যিনি ওর বড়ো ভাই উদয়শঙ্করকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।"

আমার আবার অবাক হবার পালা। বললুম, "এসব জানলে কী করে?"

বেচারা ডেভিড লজ্জা পেলো। বললো, "আমি আর কতটুকু জানি? তবে ওঁর জীবন সম্বন্ধে আমার এবং আমার বোনের খুব আগ্রহ, আমরা সংবাদপত্র থেকে ওর সম্বন্ধে খবর কেটে রেখে দিই। একটা সেতার কেনবার ইচ্ছেও আছে।"

"তোমার দেশের গান তোমার ভাল লাগে না?" আমি ডেভিডকে জিজ্ঞেস করি।

"নিশ্চয়ই। আমি সারাদিন বসে বসে পপ মিউজিক শুনতে পারি এবং

আপনাদের দেশের সঙ্গীত আমাদের পপমিউজিকে নতুন প্রাণের স্পর্শ আনবে।”

এইটুকু ছেলের সঙ্গীত সম্পর্কে আগ্রহ আমাকে বিস্মিত করে তোলে। সেতার সম্পর্কে সে অনেক খবরাখবর রেখেছে। “দুদিকে দুটো লাউ-এর খোলা থাকে। আর মধ্যিখানে আছে ঊনিশটা তার, যার চারটেয় সুর এবং দুটোয় তাল—বাকি তেরোটায় কেবল ঝঙ্কার ওঠে।” একটু থেমে ডেভিজ বললে, “আমার দিদি ওদের কলেজের কমপিউটরে হিসেব করে দেখেছে আপনাদের শাহভেরটা স্কেলে মোট ৬৪,৮৪৮ রাগ সম্ভব।”

রাগ-রাগিণীর অঙ্ক কষতে কমপিউটরের প্রয়োগ পশ্চিমী বুদ্ধিতেই সম্ভব ৬৪,৮৪৮ রাগের কথা শুনে তাই তাজ্জব বনে গেলাম। এরা আমাদের সঙ্গীতে আগ্রহী হয়ে উঠলে নিজেদের নিষ্ঠায় একদিন আমদের পিছিয়ে ফেলে এগিয়ে যেতে পারে।

ডেভিডকে বললাম, “তোমায় যখন এত সেতার সম্পর্কে আগ্রহ, তখন সেতার শিখছো না কেন?”

ডেভিড এবার বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। “আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমার সেতারে ওস্তাদ হওয়ার খুব লোভ ছিল। কিন্তু একদিন টেলিভিশনে রবিশঙ্করকে দেখে আশা ছেড়ে দিয়েছি। রবি বললেন, ১৮ থেকে ২৫, এই সাত বছর গুরুর বাড়িতে তিনি প্রতিদিন বারো থেকে চোদ্দ ঘণ্টা সেতার অভ্যাস করেছেন। গানটা ওঁদের কাছে শখ নয়, জীবনের ধর্ম। এতেও আমি আশা ছাড়িনি। কিন্তু রবির আঙুলটা টিভিতে ক্লোজ আপে দেখানো হলো। আমি দেখলাম, অভ্যাস করে-করে ওঁর ডান হাতের আঙুলে বিরাট কড়া পড়েছে। কত বছর তারের সঙ্গে ঘর্ষণ হলে এটা সম্ভব হয়! বাঁ হাতের আঙুলে মাংসগুলো ক্ষতবিক্ষত—শুনলাম প্রায় সব সময় আয়োডিন লাগিয়ে রাখতে হয়। এরপর ওস্তাদ হবার আশা ছেড়ে দিয়েছি।”

বিদেশের রাস্তায় একটা পনেরো বছরের ছেলে আমাকে স্বদেশের সঙ্গীত সম্পর্কে যে শিক্ষা দিলো তাতে মনে মনে লজ্জা অনুভব করছিলাম। কিন্তু ডেভিডের উৎসাহে ভাঁটা পড়বার লক্ষণ নেই। সে বললো “আমরা তো একই হোটেলে আছি ; যদি আপনি অসন্তুষ্ট না হন, ডিনারের পরে আপনার ঘরে গিয়ে দেখা করবো।”

আমি রাজি হয়েছিলাম। কারণ এই বয়সের আমেরিকান ছেলেদের সম্পর্কে আমার আরও জানবার আগ্রহ ছিল। আর এরা যে এমন সঙ্গীত পাগল তাও জানা ছিল না।

সন্ধ্যা সাতটার মধ্যেই ডেভিড আমার ঘরে এসে হাজির। সঙ্গে তার দিদিকেও এনেছে। দিদি নমস্কার জানিয়ে বললো, ‘ডেভিডের কাছে শুনলাম, আপনি

রাভিকে ব্যক্তিগতভাবে জানেন, তাই আলাপ করতে এলাম।”

আমি ওদের বসতে বললাম। দিদির নাম রোজ? রোজ বললো, “রবিশঙ্করের কনসার্ট আমি সাতবার শুনেছি। ওঁর কনসার্টে গেলে মনে হয় যেন কোনো স্বর্গীয় পরিবেশে এসেছি। সবচেয়ে ভাল লাগে আপনাদের দেশের ধূপের গন্ধ। গান শুরু হবার আগে, শাড়ি পরে একটি মহিলা স্টেজের ওপর এসে ধূপ জ্বেলে দেন। কি সুন্দর দেখতে এই মহিলাকে, আর ভারি মিষ্টি নামটি—কমলা। আচ্ছা কমলা মানে কি? একজন ইন্ডিয়ান বললে, নরম। ওই নরম soft চেহারা বলেই ওঁর নাম কমলা। আর একজন বললেন, অরেঞ্জ রং।”

আমি বললাম, “কমলা হচ্ছেন আমাদের দেবী লক্ষ্মী।”

“সত্যিই ওঁকে স্টেজে দেবীর মতো দেখায়। তাই না? ডেভিড এবার বলে উঠলো।

আমি বললাম, “কেবল তোমরাই রবিশঙ্করের সঙ্গীত ভালবাসো, না তোমাদের বাবা-মায়েরও এতে আগ্রহ আছে?”

রোজ হেসে ফেললো। ‘বাবার একটুও আগ্রহ ছিল না। প্রথমবার যখন ওঁদের জোর করে রবির বাজনা শুনতে নিয়ে গিয়েছিলাম, বাবা বললেন, এ কি বাজনা! ঘণ্টাখানেক ধরে একটি বিড়াল মিউমিউ করে গেল। আর তাছাড়া, এরা বড়ো সময় নষ্ট করে। রবিশঙ্কর সেতার রেডি করতেই স্টেজের ওপর অনেক সময় নিলেন। সেতার তৈরি করেই স্টেজে এলে হয়, তা হলে শ্রোতাদের যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় না।”

ডেভিড বললো, “বুঝুন! আমার বাবা এবং মায়ের ইন্ডিয়ান মিউজিক সম্বন্ধে কী রকম জ্ঞান ছিল। এখন কিন্তু আমার এবং দিদির পাল্লায় পড়ে ওঁদের কান তৈরি হয়েছে। হাজার হোক সাতশো বছর যে-যন্ত্রটা আপনাদের দেশে ব্যবহার হচ্ছে, এবং যার পিছনে আরও তেরশো বছরের সঙ্গীত ঐতিহ্য রয়েছে, আমরা তাকে কেমন করে রাতারাতি আয়ত্ত করে ফেলবো?”

রোজ এবার মুখ খুললো। “আপনার সঙ্গে দেখা করবার একটা উদ্দেশ্য আছে। আমার ভাই আপনাকে বলতে সঙ্কোচ করছে। রবিশঙ্করের একটা সই সংগ্রহ করার ইচ্ছে বহুদিনের। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আপার ডাইরেতে রবিশঙ্করের যে হাতের লেখা রয়েছে ওটা কেটে দিলে আপনার কাছে ডেভিড বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকবে।

ডেভিড ও তার দিদির আগ্রহ দেখে গর্বে আমার বুক ফুলে উঠেছিল। বললাম, “মোটেই আপত্তি নেই। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সইটা তোমাদের দিচ্ছি।”

সইটা কেটে ডেভিডের হাতে দিতেই আনন্দে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

এবার ওর দিদি যা করে বসলো, তার জন্যে আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। রোজ বললো, "শংকর, আপনি আমাদের যে ভালবাসা দেখালেন তার জন্যে আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আমাদের ভালবাসার সামান্য নিদর্শন হিসেবে, আপনার জন্যে একখানা লংপ্লেয়িং রেকর্ড এনেছি—ইহুদি মেনহুইন এবং রবিশঙ্করের **East Meets the West**—পূর্ব ও পশ্চিমের সাক্ষাৎ।"

আমি বেশ বিব্রত হয়ে পড়লাম, "আমাদের দেশে একটা নিয়ম আছে—বড়োরা ছোটদের দেয়, প্রতিদানে কিছু নেয় না। ছোটরা কিছু দিতে গেলে বড়োরা রেগে যায়। আমিও তোমাদের ওপর রেগে যাচ্ছি। তোমাদের রেকর্ডটা আমি নিচ্ছি না। তবে আমি রেকর্ডটা একবার শুনতে চাই।"

রোজ লজ্জা পেয়ে গেলো, কিছু বললো না। ডেভিড তড়াক করে বেরিয়ে গেলো। যাবার আগে বলে গেলো, "আমার পোর্টেবল রেকর্ড-প্লেয়ারটা এখনই নিয়ে আসছি।"

রোজ বললো, "আমার ভাই এতোই গানপাগল যে সঙ্গে রেকর্ড-প্লেয়ার রাখে। লেক বা বনের মধ্যে গিয়ে মাঝে মাঝে গান শোনে।"

"মেনহুইন রবিকে খুব শ্রদ্ধা করেন," রোজ বললো। "জানেন, এই রেকর্ড তৈরি করবার আগে মেনহুইন দু'দিন রবির কাছে তালিম নিয়েছিলেন, আমি নিজে টাইম ম্যাগাজিনে পড়েছি।"

বললাম, "মেনহুইনের কাছে আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। ভারতীয় সঙ্গীতকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেবার পিছনে এই বিশ্ববিদিত বেহালাবাদকের যে-দান রয়েছে তা আমরা কোনোদিন ভুলতে পারবো না।"

রোজ সঙ্গীতের ইতিহাস পড়ছে। ওকে বললাম, "ইদানিং কালের ভারতবর্ষে একটা আশ্চর্য জিনিস ঘটেছে। সাহিত্য, শিল্প, দর্শনের বাণী নিয়ে আমাদের কোনো মনীষী যখনই পশ্চিমের দ্বারপ্রান্তে এসেছেন তখনই তিনি একজন পশ্চিমী বন্ধু লাভ করেছেন এবং তিনি নিঃস্বার্থভাবে তার হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। পশ্চিমী সভ্যতার এই উদারতা আমাকে মুগ্ধ করে। ধরুন, আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর গুণগ্রাহী শিল্পী রোদেনস্টাইনের কথা। স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর শিষ্যা মিস মার্গারেট নোবলের কথা, পরে যিনি ভগিনী নিবেদিতা নামে আমাদের হৃদয় জয় করেছিলেন। এবং এই কিছুদিন আগের উদয়শঙ্কর ও নর্তকী পাভলোবার কথা।"

রোজ আমার থেকে অনেক বেশি খবরাখবর রাখে। সে বললো, "রবির দাদা উদয় সম্পর্কে কয়েকদিন আগেই একটা প্রবন্ধ পড়লাম। অনেকেই জানেন না, উদয়শঙ্কর চিত্রশিল্পী হিসেবে জীবন শুরু করেছিলেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি লন্ডনের রয়াল কলেজ অফ আর্টসের পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন। ১৯২৩

সালে তিনি যখন বৃটিশ মিউজিয়মে পড়াশোনা করছেন সেই সময় একদিন পাভলোবার নাচ দেখলেন। দুই শিল্পীর সেই সাক্ষাৎ দু'জনের গভীর পরিবর্তন নিয়ে এলো।"

রোজ বললো, "রবিশঙ্করের জীবন সম্পর্কে তাঁর পশ্চিমী ভক্তদের গভীর আগ্রহ। তাই আজকাল কাগজে নানা খবরাখবর বেরোয়। যেমন সেদিন পড়লাম, রবিশঙ্কর জীবন শুরু করেছিলেন নাচিয়ে হিসেবে। ১৮২০ সালে ওঁর জন্ম। দশবছর বয়স থেকে দাদার সঙ্গে নাচের দলে ইউরোপে ভ্রমণ করছেন। প্যারিসে রবিশঙ্কর ফরাসি ভাষা শেখেন। রবিশঙ্কর তখন বেজায় শৌখিন বাবু। একেবারে চোস্ত সায়েবদের মতো স্যুট পরেন, গলার এক একটা টাইয়ের দাম, পাঁচ ডলার।"

বললুম, "বিশ্বাস করো রোজ, শঙ্কর পরিবার সম্পর্কে তুমি আমার থেকে অনেক বেশি জানো।"

হেসে ফেললে রোজ। "আমার বিদ্যে ম্যাগাজিন পর্যন্ত। তবে পত্রপত্রিকা পড়ে জ্ঞান আহরণ করা যায় না যারা বলে আমি তাদের দলে নই। এই ম্যাগাজিনেই পড়লাম, ১৯৩৬ সালে উদয়শঙ্কর তাঁর দলে আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবকে আমন্ত্রণ জানালেন—পশ্চিমে প্রাচ্য সঙ্গীতের পরিচয় দেবার জন্যে। ইউরোপে খাঁ সাহেবের এক সঙ্গীতের আসরেই হঠাৎ রবিশঙ্করের বোধোদয় হলো। তিনি ঠিক করলেন, নৃত্য নয়, সঙ্গীতের মধ্যেই তিনি জীবনের সত্যকে খুঁজে বার করবেন। বারাণসী ফিরে এলেন রবি, প্যারিতে তৈরি স্যুট ছেড়ে খাদি ধরলেন, মাথার অমন মনোমোহন চুল কামিয়ে ফেলে মুণ্ডিতমস্তক হলেন এবং গুরুর আশ্রম মাইহারে চললেন সাতবছরের একাগ্র সাধনায় মগ্ন হতে?"

ডেভিড ইতিমধ্যে মেনহুইন ও রবিশঙ্করের দ্বৈত সঙ্গীত শোনাবার জন্যে তার পোর্টেবল রেকর্ড-প্লেয়ার নিয়ে এসেছে। রোজ বললো, "মেনহুইনের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ—ভারতীয় সঙ্গীতের রত্নশালার সংবাদ তিনি পশ্চিমের কাছে নিয়ে এলেন। ভাগ্যে তিনি ১৯৫২ সালে ভারতবর্ষে বাজাতে গিয়েছিলেন এবং রবিশঙ্করের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। মেনহুইনের চেষ্টায় রবি বাথ ফেস্টিভ্যালে আমন্ত্রিত হন এবং সেখানেই দু'জনে পূর্ব পশ্চিমের মধ্যে সঙ্গীতের সেতুবন্ধনের প্রথম চেষ্টা করলেন। সেই চেষ্টার অভাবনীয় ফল তো দেখতেই পাচ্ছেন।"

ডেভিডের প্লেয়ার এবার বেজে উঠলো। পূর্ব পশ্চিমের দুই দিক্‌পাল তাঁদের সেতার ও ভায়োলিনের মিলন-গীতি শুরু করলেন। রোজ ফিস ফিস করে বললো, "আপনাদের কাছে এর কোনো দাম আছে কিনা জানি না, কিন্তু আমাদের কাছে এঁরা সুরজগতের কলম্বাস, নতুন দিগন্তের সন্ধানে বেরিয়েছেন এঁরা।"

নিউ ইয়র্কে ফিরে এসে পরিচিত ভারতীয়দের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা সবাই একমত, সাম্প্রতিক কালে রবিশঙ্কর ভারতবর্ষের জন্যে যা করেছেন, তার কোনো তুলনা নেই! রবিশঙ্করের নামে চাঞ্চল্য পড়ে যায়। যেখানেই তিনি বাজান কয়েকঘণ্টার মধ্যে সমস্ত টিকিট বিক্রি হয়ে যায়। কখনও কখনও এমন অবস্থা হয়, স্টেজের ওপর অনেককে বসতে হয়। তাঁর শ্রোতাদের মধ্যে শুধু হিপিরাই থাকেন না—অনেক কেষ্ট-বিষ্টুকেও দেখা যায়। যেখানে রবি সেখানেই টিভি ক্যামেরা ও ফটো-গ্রাফারের হুড়োহুড়ি। আর বাইরে ঝড় বৃষ্টি বরফ উপেক্ষা করে হাজারখানেক যুবক দাঁড়িয়ে থাকে যারা ভিতরে যাবার টিকিট সংগ্রহ করতে পারেনি। তাদের অনেকে ফুল ছোড়ে, ঘণ্টা বাজায় এবং রব তোলে হরে কৃষ্ণ। হিপিদের গালাগালি করাটা শিক্ষিত ভারতীয় সমাজে একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমার নিবেদন, এই উল্টোপুরাণের সবটাই পাগলামি নয়। এর পিছনে অনেক ভাববার আছে। পশ্চিমের এই যুবক-যুবতীদের প্রতি আমার যথেষ্ট স্নেহ ও সহানুভূতি আছে।

রবিবারের এক ভোরবেলায় রবিশঙ্করের নিউ ইয়র্কের অ্যাপার্টমেন্টে বসে গল্প হচ্ছিল। ঘরে ছিলেন রবি, কমলা চক্রবর্তী, ওঁদের হাউসকিপার এক বর্ষিয়সী মার্কিন মহিলা এবং রবির সেক্রেটারি। আমার সঙ্গে ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবতত্ত্বের খ্যাতনামা ভারতীয় অধ্যাপক ডক্টর জ্যোতির্ময় মিত্র। তার আগের দিনে জ্যোতির্ময়বাবুর অ্যাপার্টমেন্টে গল্প করতে-করতে কখন আমরা সারারাত কাটিয়ে দিয়েছি। ভাগ্যে জ্যোতির্ময়বাবু তখনও বিয়ে করেননি। না হলে দাম্পত্য কলহের সৃষ্টি হতো।

রবিশঙ্করের মধ্যে যে জিনিসটা লক্ষ্য করা যায় সেটা হলো বিশ্বব্যাপী সাফল্য ওঁর মাথা ঘুরিয়ে দেয়নি। আর নিউইয়র্কের বিশাল বৈভবের মধ্যে বসে থেকেও তিনি স্বদেশকে ভুলে যাননি। অথচ দেশে কত লোকের ধারণা, ডলার ও পাউন্ডের লোভেই তিনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের জাত নষ্ট করছেন।

বললাম, "এসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। জানেন তো কালাপানি পেরোবার জন্যে রামমোহন রায়কে কত নিগ্রহ সহ্য করতে হয়েছিল। ভারতের সঙ্গীত সরস্বতীকে আপনিই তো সপ্তসমুদ্রের এপারে নিয়ে এলেন।"

রবিশঙ্কর মৃদু হাসলেন। না, কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই তাঁর। বললেন, "আমার একটা গোঁ ছিল। এখনও বোধ হয় সেই গোঁ-এর জোরে এগিয়ে চলেছি।"

রবির তখন বছর পঁচিশ বয়স, ইউরোপ-প্রবাসী রবি তখনই শপথ নিয়েছিলেন পশ্চিমের কাছে প্রাচ্যের সঙ্গীতকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তরুণ বয়সে পশ্চিমের অনেক দিকপাল সঙ্গীতজ্ঞ—তোসচানিনি, সেগোভিয়া,

ক্যাসেলস্—এবং আরও অনেকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে। সবার অভিযোগ ভারতীয় সঙ্গীত বড্ড একঘেয়ে, শুধুই পুনরাবৃত্তি।

'আমি বুঝতাম ওঁদের কথা, আমাদের সঙ্গীতে key চেঞ্জ হয় না, পশ্চিমী সঙ্গীতের মতো আমাদের সঙ্গীতে স্টাকাটো নোট নেই—তবু মনে দুঃখ হতো, ভাবতাম কেমন করে আমাদের অপার সঙ্গীত ঐশ্বর্য ওদের বোধগম্য করা যায়?"

রবি বললেন, "পশ্চিমীদের মনোরঞ্জনের জন্যে ভারতীয় সঙ্গীতকে আমরা অবশ্যই অধঃপতনে নিয়ে যাবো না, কিন্তু ওঁদের সুবিধের জন্যে সিঁড়ি দিতে দোষ কী?"

"মেনহুইন প্রথম সুযোগ করে দিলেন। তারপর বহুদিন ধরে পশ্চিমের দরজা খুলবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছি। এগারো বছর ধরে সুযোগ পেলেই ছুটে এসেছি ইউরোপ-আমেরিকায়। তখন ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে কারও আগ্রহ ছিল না, বাজনা শোনাবার সুযোগও পাওয়া যেত না। ইস্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে বছরের পর বছর বাজিয়ে অবশেযে লোকের উৎসাহ সৃষ্টি করেছি। কিন্তু তখনও অনেকের ধারণা, সেতারের সুর ও অসুস্থ বেড়ালের মিউ মিউ-এর মধ্যে তফাৎ নেই।"

"তারপর একদিন অসম্ভব সম্ভব হলো। পশ্চিমের যৌবন একদিন পূর্বদেশের সঙ্গীতের জন্যে তাদের দ্বার খুলে দিলো। এই আশ্চর্য ঘটনা সম্ভব হলো পপ মিউজিকের রাজকুমার বিট্‌লদের জর্জ হ্যারিসনের জন্যে। জর্জ হ্যারিসনের কোটি কোটি ভক্ত। যেখানে তিনি যান সেখানে জনসমুদ্র ভেঙে পড়ে। সেই বিট্‌ল হ্যারিসন, পৃথিবীতে এতো জিনিস থাকতে আকৃষ্ট হলেন ভারতীয় সেতারে। সেতার শেখার আগ্রহে তিনি রবিশঙ্করকে গুরু মনোনীত করলেন। প্রথমে ভেবেছিলাম সবটাই একটা স্টান্ট। ওকে সেতার শেখানো সম্পর্কে আমার তেমন উৎসাহ ছিল না। কিন্তু পরিচয় করে দেখলাম হ্যারিসনের নিষ্ঠায় কোনো ফাঁকি নেই। তখন ওকে শেখাতে আরম্ভ করলাম।" রবি বললেন।

যা করতে হয়তো একশ বছর লাগতো তা রাতারাতি সম্ভব হলো। পপ সঙ্গ ীতের ভক্ত ইংলন্ড আমেরিকার তরুণ সমাজ গ্রহণ করলেন রবিশঙ্করকে। ভারতের রবি অকস্মাৎ বিশ্বের রাভি হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁকে মাথায় তুলে নিলেন হিপির দল।

"এরা সবাই যে আমাদের সঙ্গীত বোঝে, তা মোটেই নয়—এদের অনেক ঘাটতি আছে—কিন্তু দরজা যখন খুলেছে, তখন ঢুকে পড়াটাই যুক্তিযুক্ত মনে হলো। এর থেকেই একদিন আমরা আরো অনেক বড়ো সুযোগ পাবো।"

"নিশ্চয়ই।" আমি রবিশঙ্করের কথায় সায় দিই।

"হিপিরা যে আমাকে হঠাৎ গুরু করে তুললো তার পিছনে আমার কোনো

হাত নেই। আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই ব্যাপারটা ঘটেছে। ফলে এ-দেশে অনেকে ভুল বুঝতে আরম্ভ করলেন। অনেকের ধারণা, গাঁজা এবং এল-এস-ডির সাইকেডেলিক আনন্দের সঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীতের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।"

রবিশঙ্কর কফির কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, "এই জন্যেই আরও কিছু দিন এদেশে আমার থাকার প্রয়োজন। আমাদের সঙ্গীত সম্পর্কে বিদগ্ধ ইংরেজ ও আমেরিকানদের কৌতূহল বাড়াতে হবে—সেই উদ্দেশ্যেই লস এঞ্জেল্‌সে কিন্নর স্কুল খুলেছি। সেই উদ্দেশ্যেই নিউ ইয়র্ক সিটি কলেজে ভিজিটিং অধ্যাপক হিসেবে এসেছি। এখানে আমার চল্লিশজন ছাত্র, কিন্তু আরও শ'দুয়েক ছেলেমেয়ে, যারা অন্য বিষয়ে পড়াশুনা করে, তারাও ক্লাশ শুনতে আসে। এদের নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা যদি দেখেন! আমি ওদের ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের কথা বলি, ভারত ও সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীতের ওতপ্রোত সম্পর্কের কথা শোনাই। আমার সঙ্গে ওরাও ক্লাশ শুরু হবার আগে গুরু বন্দনা করে।"

রবিশঙ্কর বললেন, "হিপিদের নিয়েই আমার বিপদ। আমার বাজনার আসরে ওরা দলে দলে আসে। ওদের আমি ভালবাসি, আবার ওদের বিপথগামিতার জন্যে দুঃখও হয়। যখনই সুযোগ পাই, আমি প্রকাশ্যে জানিয়ে দিই, ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে মদ ভাঙ গাঁজা আফিমের সম্পর্ক নেই। শুদ্ধ দেহ ও মনে আমরা বীণাসরস্বতীর আরাধনা করি এবং সুরের পবিত্র স্রোতে অবগাহন করে আমরা যে আনন্দ পাই তার সঙ্গে রাসায়নিক সাইকেডেলিক আনন্দের অনেক তফাৎ। আমি বার বার ঘোষণা করি, আপনারা যেমন কোনো মাতালকে সিমফনি অর্কেস্ট্রায় স্বাগত জানান না, আমার সঙ্গীতের আসরেও তেমনি ম্যারিজুয়ানা বা এল এস-ডি প্রেমিকের অভিপ্রেত নয়।"

রবির বড়ো বড়ো চোখ দুটো এবার গভীর বিশ্বাসে জ্বলে উঠলো। "আমি জানি, আমার পক্ষেই এসব অপ্রিয় কাজ করা সম্ভব। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত যে পপ

সঙ্গীত নয় একথা আমি যদি না বোঝাই তাহলে ভারতীয় সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ বলে এদেশের কিছু থাকবে না। একটা সাময়িক উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে, তা আবার উধাও হয়ে যাবে।"

কথাবার্তায় বোঝা গেলো, এই ভুল বোঝাবুঝি দূর করবার জন্যে আমাদের দূতাবাসের কেষ্টবিষ্টু সাংস্কৃতিক এটাসিরা কিছুই করেন না। রবিশঙ্কর মস্কো ও লেনিনগ্রাদে বাজাতে গেলেন। সেখানে সঙ্গীতের আগে ঘোষণা করা হলো : ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াগণ—ভারতের প্রখ্যাত লোকসঙ্গীতজ্ঞ রবিশঙ্করের সঙ্গে পরিচিত হোন। অনিল বিশ্বাস এবং শংকর জয়কিষনের মতো ইনিও ভারতীয় জনগণের হৃদয় জয় করেছেন...

বোম্বাই-এর ফিল্মী সুরসম্রাটের সঙ্গে একাসনে বসানোর জন্যে অভিযোগ নয়—দুঃখ, আমাদের দূতরা ভারতীয় ক্লাসিকাল সঙ্গীত সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের অবহিত করতে পারেন না। ফলে রবিকে বাজনা শুরু করবার আগে বলতে হলো, তিনি লোক-সঙ্গীতজ্ঞ নন, তিনি ক্লাসিকাল সঙ্গীতের সাধক। এই সঙ্গীতের ধারা আমাদের দেশে প্রায় দু'হাজার বছর ধরে চলে আসছে।

বহুজনের মুখে রবির সঙ্গীত সম্পর্কে ভূমিকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছি। উপস্থাপনের এই প্রতিভা তিনি সম্ভবত তাঁর দাদা উদয়শঙ্করের কাছে পেয়েছিলেন। বাজনা শুরু করবার আগে তিনি প্রায়ই বক্তৃতা দেন, বুঝিয়ে দেন, ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য কি, পশ্চিমী সঙ্গীতের সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায়, কেমন করে এর রসগ্রহণ করতে হবে।

রবি বললেন, "স্বীকার করি, আমাদের সঙ্গীতের রসগ্রহণ করতে হলে কিছুটা সঙ্গীত শিক্ষা প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলে দরজা বন্ধ করে বসে থাকাটাও আমার ভাল লাগে না। শ্রোতাদের সঙ্গে যতখানি সম্ভব ভাবের আদান-প্রদান প্রয়োজন।"

রবির কাছে শুনলাম, এই উদ্দেশ্যে তিনি একখানি বই লিখেছেন, নাম "My Music My Life"—আমার সঙ্গীত আমার জীবন। রবির আত্মজীবনী ছাড়াও এতে ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে অনেক কথা রয়েছে যা অভারতীয়দের সাহায্য করবে।

বললাম, "অভারতীয় কেন, আমার মতো অনেক ভারতীয় এ-বিষয়ে জানতে আগ্রহী। অহেতুক পণ্ডিত সেজে থেকে নিজের অজ্ঞতাকে চেপে রাখার প্রয়োজন কী?"

কোথা থেকে সময় কেটে গেলল বুঝতে পারলাম না। রবি ও আমি নানা বিষয়ে কথা বলে চলেছি। শ্রীমতী কমলা চক্রবর্তী শান্ত ভাবে শুনে যাচ্ছেন—আমাদের বাংলা উনি বেশ বুঝতে পারছেন মনে হলো।

রবি বললেন, "আমার বড়ো আনন্দ যে পশ্চিমের বন্ধ দরজা খুলতে পেরেছি। এবার আমাদের দেশের সঙ্গীত-সাধকদের কাজ হবে আমাদের যা শ্রেষ্ঠ তা এঁদের কাছে হাজির করা। কয়েকজন গুণী সেই কাজ করছেন, আবার কিছু বাজে লোকও এই সুযোগে ঢুকে পড়ছেন। এইটাই দুশ্চিন্তার কারণ। ভেজালে ঠকলে এরা আমাদের সম্পর্কে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলবে।"

তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় জিজ্ঞেস করলাম, আপনি ভারতবর্ষের মস্ত বড়ো কাজ করছেন—যে কাজ একদিন রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ করবার চেষ্টা করেছিলেন। দু'চারজন পরশ্রীকাতর লোক যা-ই গুজব রটাক, দেশের সাধারণ মানুষের শুভেচ্ছা রয়েছে আপনার পিছনে। আপনি জয়যুক্ত হয়ে বিজয়রথে দেশে ফিরুন।"

রবি আবার স্নিগ্ধ হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেললেন।

আমি বললাম, "দেশের লোকদের কাছে আপনি কিছু জানাতে চান।

রবি বেশ গম্ভীর হয়ে উঠলেন। বললেন, "বিদেশে বসে প্রায় রোজই দেশের কথা ভাবি। একটা কথা আমাকে বড়ো বেদনা দেয়, আপনি তো বিদেশ দেখছেন, আপনাকেও দেবে। আমি যা বলছি আপনারও যদি তাই মনে হয়, তাহলে দেশের মানুষদের বলবেন, যে-ভারতবর্ষকে এখন পৃথিবীর মানুষেরা শ্রদ্ধার চোখে দেখে, সে অতীতের ভারতবর্ষ। আমাদের যুগে আমরা যে ভারতবর্ষ সৃষ্টি করেছি সে সম্বন্ধে পৃথিবীর মানুষের কোনো উৎসাহ নেই। বিশ্ববাসীর সম্মান পেতে হলে আমাদের অনেক পরিশ্রম করতে হবে।"

অনেক দূর

দার্শনিকের ওপর সব ব্যাপারে আমি যে তেমন সুপ্রসন্ন নই তার অন্যতম কারণ জনৈক চীনা দার্শনিকের ঐতিহাসিক উক্তি—নার্ভাস লোকদের জন্যে ঈশ্বর রাস্তা সৃষ্টি করেননি—তাদের জন্যে রয়েছে দোলনা ও বিছানা।

প্রাচীন যুগের চৈনিক ঋষিরা অতি সামান্য কথায় নির্ভেজাল সত্যকে জনগণের কাছে উপস্থিত করতে পারতেন এ-কথা জেনেও, চীনা কথামৃতের এই অংশ আমার বিশেষ মনকষ্টের কারণ হয়েছে। কারণ আমি নার্ভাস লোক এবং পুঁটলি-পোঁটলা নিয়ে পথে বেরুবার কথা উঠলেই আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। কিন্তু তা বলে আমাদের মতো পুরুষদের পক্ষে দোলনা ও বিছানাই প্রশস্ত স্থান, এটা মুখের ওপর শুনিয়ে দেওয়াটা খুবই হৃদয়হীনতার পরিচায়ক নয় কি?

সত্যি কথা বলতে কি, পথ চলতে অন্য সবার মত আমারও ভাল লাগে। ঘুরে ঘুরে নানা দেশ দেখতে, নানা মানুষের সঙ্গে পরিচিত হতে এবং বিশেষ করে নানা জাতীয় রন্ধনশিল্পীর সৃষ্টির সঙ্গে রসনার মাধ্যমে যোগসম্পর্ক স্থাপনের আগ্রহে আমি হিউ এন সন, ফা-হিয়েন, ইবনবতুতা থেকে কম যাই না। কিন্তু আমার অভিযোগ—মানুষকে যন্ত্রণা দেবার জন্যে ঈশ্বর যতরকম ক্লেশের সৃষ্টি করেছেন তার সবগুলোই পরে দু'ধারে অপেক্ষা করে আছে নিরীহ পথিকের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। ঠাণ্ডা মাথায় পথক্লেশের কথা চিন্তা করলে দোলনা এবং বিছানার পক্ষেই সমস্ত ভোট পড়তো।

মানুষের রক্তের মধ্যে লোভ নামক এক সর্বনাশা জীবাণু সর্বদা খেলা করছে। এই লোভের বশবর্তী হয়েই মানুষ পথে বেরিয়ে পড়ে ; যেমন এই মুহূর্তে আমি উড়ন্ত অবস্থায় রয়েছি। প্রায় একঘণ্টা আকাশ বিহারের পর আমার প্লেনটা এখন

পশ্চিম আমেরিকার এক বিমান বন্দরের মাথায় পাক খাচ্ছে। সহযাত্রীদের কেউ কেউ প্রাণ ভরে জানালা দিয়ে প্রকৃতির শোভা দেখছেন, দু' একজন জাপানী ফটাফট ক্যামেরায় ছবি তুলছেন। (কিংবা কে জানে, কায়দা করে জাপানী ক্যামেরার বিজ্ঞাপন প্রচার করছেন—ওঁদের ব্যবসাবুদ্ধির ক্ষুরে নমস্কার।) কেউ কেউ অসমাপ্ত চিঠির শেষ ক'টা লাইন হুড় হুড় করে লিখে ফেলছেন। অথচ আমি ওসব কিছু না করে কেবল আমার লাগেজের কথাই ভাবছি। সপ্তাহখানেক ধরে ট্যুরিস্ট বেশে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। কোষ্ঠিটা বিচার করলে রাহুর প্রাবল্য দেখা যাবে নিশ্চয়। রাহুই তো শুনেছি মানুষকে বন বন করে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়, এবং রাহুর খপ্পরেই ম্লেচ্ছ সংসর্গ হয়। এই কয়েক সপ্তাহে সাহেব দর্শন কম হয়নি—উপায় কী? সাহেবদেরই তো দেশ, কালাপানি যখন পেরিয়েছি তখন ম্লেচ্ছ সান্নিধ্যে ভোজন এবং ম্লেচ্ছ সংসর্গ এড়াবো কী করে?

রাহুর কাছে আমার করুণ আবেদন জানাচ্ছিলাম : শুনেছি, আমার জন্মপত্র অনুযায়ী আপনি আমার মঙ্গলকারক গ্রহ, আপনার হাতে আমার মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল কিছুই হবে না—এমন কি ম্লেচ্ছরাও আমার প্রতি বিরূপ হবেন না। সে ক্ষেত্রে আমাকে বিদেশের দু' একটি জায়গাতেই কয়েক সপ্তাহ রেখে স্বদেশে ফেরত পাঠালেই তো ভাল হতো। দু' একদিন ছাড়া-ছাড়া বালিশ-বিছানো গোটানো করিয়ে আমাকে আবার আকাশে তোলা কেন?

মার্কিন দেশে ইতিমধ্যে আমি ছ'সাতবার জায়গা পাল্টেছি—এবং এতোবার বিমান বন্দর থেকে লাইমুজিন চড়ে শহরে এসে, ট্যাক্সি যোগাড় করে হোটেল খুঁজে বার করে, নিজের বাক্সপত্তর খুলে সংসার পেতে ফেলে আবার সেসব গুছিয়ে ট্যাক্সি কিংবা বাসে চড়ে এয়ারপোর্টে পৌঁছে প্লেনের জন্যে ছোটাছুটি করেও আমি ঠিক ভ্রমণশিল্পে অভ্যস্ত হতে পারিনি। এই জিমন্যাস্টিকে এখনও পর্যন্ত আমি এগারোটা জিনিস হারিয়েছি। এবং তিনটে জিনিস লাভ করেছি। লাভের মধ্যে দুটি হোটেলের চাবি—যা মনের ভুলে জমা না দিয়েই পকেটে নিয়ে চলে এসেছি। আর তৃতীয় বস্তুটি তো বুঝতেই পারছেন : অভিজ্ঞতা।

আমেরিকান হোটেলের চাবি নিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আবিষ্কার করলাম—চাবির রিঙে খোদাই করা রয়েছে, 'যদি এই চাবি আপনি লইয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্বক নিকটস্থ ডাকবাক্সে ফেলুন। মার্কিন ডাক বিভাগের সহিত বিশেষ ব্যবস্থা অনুযায়ী চাবির ডাক-খরচ আমাদের কাছেই সংগ্রহ করা হইবে।' মার্কিন হোটেল ইনডাসট্রিকে মনে মনে নমস্কার জানিয়েছি—কারণ ওই আধসেরী চাবি নিজ খরচে বিমান ডাকযোগে হোটেলে ফেরত পাঠাতে হলে আমাকে দেউলিয়া অফিসে খোঁজখবর নিতে হতো!

দেশ দেখানোর নাম করে মার্কিন ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব লীডারস

অ্যান্ড স্পেশালিস্টস্ সংস্থার প্রোগ্রাম অফিসার কার্নহান সাহেব ইতিপূর্বে আমাকে আধডজন অজানা জায়গায় পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এবারের লক্ষ্যস্থান নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার।

দেশ ছাড়বার আগে তাজুদি আমাকে মাথার দিব্য দিয়েছিলেন—বল, তুই একবার যে করেই হোক খুকুর ওখানে যাবি। শুধু কি দিব্য! রাত দুটোর সময় যখন দমদম ছাড়ছি তখনও তাজুদি কানে কানে বলেছিলেন,—খুকুমণির কথাটা ভুলিস না।" ওয়াশিংটনে পৌঁছে দেখলাম স্টেট ডিপার্টমেন্টের ঠিকানায় তাজুদির চিঠি আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমাকে দমদম তুলে দেবার আগেই তাজুদি বুদ্ধি খাটিয়ে বিমান ডাকে চিঠি ছেড়েছেন, "ভাই শংকর, তোকে খুকুর কথাটা মনে করিয়ে দিচ্ছি—দরকার হলে সাহিত্যিকদের সঙ্গে কম দেখা করবি, তুই না করলেও দেশোদ্ধার হবে। কিন্তু আমার মেয়েরা কথা তোকে ভাবতেই হবে।"

তাজুদি সম্পর্কে আরও কথা পরে বলা যাবে. এখন এয়ারপোর্টে নামার ব্যবস্থা করা যাক। জেট প্লেনের যা প্রচণ্ড গতি, তাতে না আঁচানো পর্যন্ত বিশ্বাস নেই। এক একটি ল্যান্ডিং মানেই এক একটি ফাঁড়া।

প্লেন নিরাপদেই ভূমি স্পর্শ করলো। বিমান থেকে নেমে এয়ারপোর্ট লাউঞ্জে প্রবেশ করতেই, এক ঝলক ছেলে-মানুষী মাখা কণ্ঠস্বর কানে এলো : "শংকর মামা!"

হ্যাঁ, আমার ভাগিনেয়ী তাজুদিকন্যা কুমারী সুচরিতা চ্যাটার্জি মামাকে ডেলিভারী নেবার জন্যে সশরীরে বিমানবন্দরে হাজির হয়েছে।

সুচরিতার মুখের দিকে যে একটু তাকাবো তার উপায় নেই—ছোটবেলায় যা করতো তেমনিভাবেই আমার কাঁধে হাত দিয়ে একটু লাফিয়ে নিলো। তারপর ওই পাবলিক প্লেসে মেঝেতে বসে পড়ে টিপ করে প্রণাম করলো। ওকে টেনে তুলে বললাম, "খুকুমণি, তুই সেই ছেলেমানুষই রয়ে গেছিস।"

নিজের চুলগুলো সামলে নিয়ে সুচরিতা বললো, "এসব কী বলছো মামা? না-হয় তুমি গল্প-উপন্যাস লেখা, না-হয় তোমার নবেল সিনেমা হচ্ছে ; তা বলে মেয়েমানুষকে ছেলেমানুষ বলছো?"

বললাম, "শিবরাম চক্রবর্তী তোর কথাটা শুনলে আনন্দ পেতেন। তোর চান্স আছে আমাদের লাইনে।"

সুচরিতার মুখের দিকে তাকালাম। হ্যাঁ, ওর চেহারায় বেশ লাবণ্য এসেছে। ওর চুলগুলো যেন আরও ঘন কালো হয়েছে, ওর চোখ দুটো আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, মুখ নাক গ্রীবা নতুন-বাড়া পেন্সিলের মতো ধারালো মনে হচ্ছে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে জানালাম, "তোদের বাড়ির সব খবর ভাল।"

"মার দুটো দাঁত পড়ে গেছে শুনলাম।"

"দাঁতের আর দোষ কি বল? র‍্যাশনের চালে যা কাঁকর। তা তুই চিন্তা করিস না। ভাস্কর ডেনটিস্টের কাছে দু দিন নিয়ে যাওয়া হয়েছে—নকল দাঁত এ সপ্তাহে পাবার কথা।"

মায়ের দাঁতের খবর পেয়ে সুচরিতা একটু আশ্বস্ত হলো। আমি ওর আপাদমস্তক একটা অনুসন্ধানী নজর দিয়ে ফেললাম। সুচরিতা বললো, "অত খুঁটিয়ে কী দেখছো মামা?"

"দেখছি খুঁটিয়ে এই জন্যে যে তাজুদিকে পুরো রিপোর্ট পাঠাতে হবে। তাছাড়া দু'সপ্তাহ পরে যখন সশরীরে কলকাতায় ফিরবো তখন তোর মায়ের জেরায় আমার জীবন ওষ্ঠাগত হবে। মনে নেই তোর, সেই যেবার তোর দাদার জন্যে মেয়ে দেখতে গেলাম। তাজুদি হুকুম করলেন, এখনই দু'পাতার একটা ডেসক্রিপসন লিখে ফেলো—খোকার কাছে পাঠাবো। আমি বললাম, মেয়েমানুষের ওই রকম ডেসক্রিপসন কালিদাস দিতে পারতেন, আমার মতো চুনোপুঁটি লেখকের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া আমরা আধুনিক সাহিত্যিক, মানুষের বাইরেটা নিয়ে অত মাথা ঘামাই না—আমরা ভিতরটা খুঁড়ি।"

সুচরিতা হেসে ফেললো। "শেষ পর্যন্ত মা তো ফটো পাঠাতে রাজী হয়েছিল, তাই না—তার সঙ্গে তোমার দশ লাইন বর্ণনা।"

"তাজুদির মতো দিদির পাল্লায় তো তোদের পড়তে হলো না," বলে আমি হাসতে আরম্ভ করলাম। হাসিতে সুচরিতাকে একটু ভিজিয়ে বললাম, "হ্যাঁরে খুকু, তোর হাইট এখন কত?"

"তুমি কি পাগল মামা? জেট প্লেনে অনেকক্ষণ উড়লে মাথার বুদ্ধি গোলমাল হয়ে যায়—এ সম্বন্ধে আমাদের মেডিক্যাল সেন্টারে গবেষণা চলছে।"

"মানে, তুই আমাকে বিদেশ বিভূঁই-এ পাগল বলছিস!"

"না না, পাগল বলবো কেন? বলতে চাইছি, আমার হাইট আর তোমার হাইট একই—পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি। তোমার ভাগ্নী তো? বেঁটে হতেই হবে। নারীনাম্ মাতুলক্রমঃ!"

"তুই বিদেশে এসে বেশ দুষ্টু হয়ে গিয়েছিস—শাসন করবার কেউ তো নেই। তা তোর উচ্চতা সেন্টিমিটারে বল—ইন্ডিয়াতে এখন সব দশমিক হয়েছে—ইঞ্চিতে মাপজোক লিখলে পুলিশে ধরবে।"

সুচরিতা ওখানে দাঁড়িয়েই আরও কথা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে লাগেজ আসতে আরম্ভ করেছে। আমি ওই দিকে ছুটে গেলাম। আগে বাবা লাগেজ তার পরে ভাগ্নে-ভাগ্নী!

টিকিট দেখিয়ে লাগেজ জড়ো করে গুণতে গিয়ে আমার মাথা ঘুরে গেলো।

"মামা, এই শীতে ঘামছো কেন?" সুচরিতা জানতে চাইলো।

"দাঁড়া বাপু, আমার হিসেবে মিলছে না—মাল কম হচ্ছে।"

সুচরিতা এবার আমার স্থানীয় গার্জেনের দায়িত্ব নিলো। একটু মৃদু বকুনি দিয়ে বললো, "হারানো স্বভাব তোমার এখনও গেলো না। আমি দেখছি। বলো, ক'টা আইটেম হবে।"

বললুম, "রাস্তায় হারানো বন্ধ করার অব্যর্থ ওষুধ তাজুদি নিজে শিখিয়ে দিয়েছেন—ক'দফা মাল আছে সেটা বাড়ি থেকে বেরোবার আগে ছোট্ট টুকরো কাগজে লিখে নিবি, তারপর যেখানে স্থান পরিবর্তন সেখানেই একবার দফা মিলিয়ে নিবি। এখন মেলাতে পারছি না।"

সুচরিতা আমার হাত থেকে কাগজের টুকরোটা কেড়ে নিলো, "দেখি ক'দফা ছিল তোমার।"

আমার উত্তর : "ছ'দফা, তার মধ্যে আমি নিজে এক দফা।"

'পারো বটে তুমি, মামা। দেখছি দুটো সুটকেশ, একটা ক্যামেরা, আরও একটা হাওয়াই কোম্পানির দেওয়া কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ—মোট তোমাকে নিয়ে পাঁচ দফা। একটা কম পড়ছে—কী ছিল।"

বিদেশ কোনো কিছু হারালে নার্ভাস হয়ে যাই। কপালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলাম ষষ্ঠ দফার কথা। "না পেলে কী হবে বল দিকিনি?" খুকুর কাছে করুণভাবে আবেদন করলাম।

"কী আর হবে। এরোপ্লেন কোম্পানিকে একখানা চিঠি দিয়ে যাবো—ওরা মাল পেলে আমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু তার আগে জিনিসটা কী বলো?"

এবার মনে পড়েছে, "ষষ্ঠ দফা হল ওভারকোট। পরের জিনিস ধার করে এনেছি শীতের ভয়ে। কলকাতায় গিয়ে সুপ্রিয়র মার কাছে কী করে মুখ দেখাবো, খুকু?"

সুচরিতা এক মুহূর্ত গম্ভীর হয়ে গেলো। তারপর ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। "ওঃ পারোও বটে তুমি মামা—ওভারকোট তোমার গায়ে।"

আমি লজ্জায় মরে যাই। নিজের পক্ষে সওয়াল করলাম, "বেরোবার সময় ওটা হাতে নিয়ে বেরিয়েছিলাম—তাই দফা বেড়ে গিয়েছিল। এখানে প্লেন থেকে নামবার সময় কখন পড়ে ফেলেছি। দোষটা ঠিক আমার নয়। এয়ারপোর্টে একটা ইয়া লম্বা-চওড়া সাহেব ওভারকোট হাতে করে আমাকে হাঁপাতে দেখে বলল—ওভারকোট বইবার সবচেয়ে সোজা উপায় ওটা পরে ফেলা।"

সুচরিতা মুচকি হাসতে লাগলো। "মামা, তুমি এখনও খুব মজা করতে পারো।"

মনে মনে একটু হাসলাম। সারাক্ষণই গম্ভীর হয়ে থাকি। মনের মধ্যে একজন উদাসী সারাক্ষণ বসে আছে, যে আমার সাহিত্যকে করুণ বসে ভরিয়ে দেয়। ভাগ্নে-ভাগ্নীদের কাছে আমি কিন্তু হাল্কা হবার চেষ্টা করি।

সুচরিতার ছোটবেলা থেকেই ওদের শিবরাম চক্রবর্তীর লেখা গল্প শুনিয়েছি, হাসিয়েছি, এবং সেই সঙ্গে নিজেও হেসেছি।

ঘোড়া দেখলে যে মানুষ খোঁড়া হয় তা আর একবার প্রমাণিত হলো। লাগেজের তদারকি খুকুর হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। সে কোথা থেকে একটা মিনি ঠেলা যোগাড় করে নিয়ে এলো। সমস্ত মালপত্র ওই যন্ত্রের ওপর তুলে ফোন-বুথে গিয়ে কাকে ফোন করলো। জিজ্ঞেস করলাম, "হ্যাঁরে, এখন আবার কাকে ফোন করতে গেলি?"

"পার্কিং কোম্পানিকে ফোন করে দিলাম—গাড়িটার জন্যে।"

"শুনেছিলাম গাড়ি কিনেছিস। তা ড্রাইভার রেখেছিল বুঝি? খুব ভাল।" ভাগ্নীর কৃতিত্বে আমি আনন্দ প্রকাশ করি।

"তুমি কি পাগল হলে মামা। এটা তোমার ইন্ডিয়া নয়—খোদ প্রেসিডেন্ট ছাড়া এদেশে আর কারও ড্রাইভার আছে বলে শুনিনি। এটা আরেকজনের গাড়ি—এখানে কতক্ষণ দাঁড়াতে হবে তার ঠিক নেই, তাই গাড়ির মালিক পার্কিং সেন্টারে আমার ফোনের জন্যে বসেছিল।"

বিদেশে সবাইকে প্রাণ খুলে প্রশ্ন করা যায় না—তাই সব সন্দেহ নিরসন হয় না। অনেক ব্যাপারে খটকা লেগে থাকে। নিজের ভাগ্নীর কাছে সৌজন্যের চিন্তা নেই। তাই সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলাম, "যারা ড্রাইভিং জানে না—তাহলে তাদের গাড়ি চড়ার উপায়?"

খুকু এবার হাসলো এবং তারপর যা উত্তর ছাড়লো তার জন্যে আমি মোটেই তৈরি ছিলাম না। খুকু বললো, "উপায় একটা আছে—সেটা হলো কোনো ড্রাইভারকে বিয়ে করা!"

খুকুর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার পুরোনো কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল বললুম, "হ্যাঁরে, মনে পড়ে যখন তোর বিদেশে আসার কথা হলো, তুই ও তোর মা দু'জনেই কী রকম নার্ভাস হয়ে পড়েছিলি!"

"খুব মনে আছে মামা। তুমিই তো তখন আমাকে ভরসা দিলে—বললে, আজকাল ফরেন যাওয়াটা কিছু নয়। অন্ধরা পর্যন্ত বুক ফুলিয়ে দেশেবিদেশ ঘুরে আসছে। তুমি কী করে বিদেশ ভ্রমণ করতে হবে সে সম্বন্ধে কত উপদেশ দিলে। তারপর বিলেত যাবার পথে তুমিই তো আমাকে বোম্বাইতে ব্যালার্ড পীয়ারে তুলে দিয়ে গেলে—সেবার তোমার কী কাজ ছিল বোম্বাইতে।"

খুকু তাহলে কিছুই ভোলেনি। চাপ হাসিতে মুখ ভরিয়ে সে বললে, "মামা,

তুমি কাউকে বলোনি তো ব্যালার্ড পীয়ারে আমার কান্নার কথা? বলেছিলাম দরকার নেই মামা, ফিরে চলো।"

"পাগল হয়েছিস, সে সব গোপন কথা কাউকে ফাঁস করা চলে। তাছাড়া তাজুদি তোর কান্নার কথা শুনলে আবার শয্যা নিতেন। একে একটু মোটা মানুষ—ব্লাডপ্রেসার ছাদে ওঠার জন্যে উঁচিয়ে আছে।

সেই দিনের সুচরিতা আর আজকের সুচরিতার কত তফাৎ ভাবছিলাম। কান্নায় চোখ লাল-করা সেদিনের সেই ভীরু মেয়েটা বিলেত থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে আমেরিকায় এসেছে : পরম আত্মনির্ভরতায় বিমান বন্দরে একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর বই-পড়া বিদ্যে থেকে বিদেশ ভ্রমণ সম্বন্ধে যে বড়ো-বড়ো লেকচার দিয়েছিল সে-ই এখন শিষ্যাকে গার্জেনের দায়িত্ব দিতে পথ পাচ্ছে না।

তাজুদির কথা মনে পড়ছে। মেয়েদের একা-একা ঘোরা দিদি মোটেই পছন্দ করতেন না। সব সময় ভয়, কী হয়। কী হয়। কলকাতায় থাকবার সময় সুচরিতা একবার গানের অডিশনের জন্যে একলা অল ইন্ডিয়া রেডিও অফিসে গিয়েছিল বলে কী কাণ্ডটাই তাজুদি বাধিয়েছিলেন। মেয়ে যতক্ষণ না নিরাপদে বাড়ি ফেরে ততক্ষণ অন্নজল বন্ধ। সেই তাজুদিও শেষ পর্যন্ত আইবুড়ো মেয়েকে একা-একা আমেরিকায় পাঠালেন।

আমার লাগেজের ঠেলাগাড়িটা সুচরিতাই রাস্তার ধারে নিয়ে এলো। বিরাট একটা ফোর্ড গাড়ি এবার আমাদের সামনে দাঁড়ালো। গাড়ির চালক ছোকরা আমেরিকানটি পোলো কলারের শার্ট পরেছে। বয়স খুকুর মতই হবে—বড়ো জোর এক বছরের বড়ো।

খুকু বললো, "বিল, মিট মাই শংকর মামা, যাঁর সম্বন্ধে তুমি অনেক কথা শুনেছো।" আর আমাকে বললো, "মামা, মিট উইলিয়ম কলিনস—আমার বন্ধু ও সহপাঠী।"

উইলিয়ম একসঙ্গে গাড়ির দুটো দরজাই খুলে দিয়েছে। নতুন যুগের ছেলেমেয়েদের নিয়মকানুন এখনও রপ্ত হয়নি—তাই কোনো রকম ঝুঁকি না নিয়ে পিছনের সীটে বসলাম। খুকু বললো, "তুমি পিছনে বসলে কেন?" কিন্তু প্রতিবাদটা নিতান্তই মৃদু মনে হলো। এবার সে কলিনস-এর পাশে গিয়ে বসলো।

গাড়ি সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিল। উইলিয়ম ছোকরার দিকে এবার আড় চোখে তাকালাম। হাজার হোক দিদিকে সমস্ত রিপোর্ট তো দিতে হবে।

উইলিয়ম নিজেই বললো, "মামা—এর মানে কী?"

"মানে মায়ের ভাই," সুচরিতা ওকে বোঝালো।

"আপনাকে আমিও তাহলে মামা বলে ডাকবো—ভেরি সুইট নেম।"

সর্বনাশ! বিলের কথা শুনে আমার গা ঠাণ্ডা হবার অবস্থা। মামাশ্বশুরকেও মামা বলে ডাকাটা আজকাল কলকাতায় ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিল একটু পরে আমাকে সিগারেট অফার করলো। আমি সিগারেট খাই না, তাই প্রত্যাখান করলাম। কিন্তু খুকুর কাণ্ডটা বুঝুন, সে নিজে লাইটার জ্বেলে বিলের মুখাগ্নি করলো।

ছবির মতো রাস্তা ধরে আমাদের গাড়ি রাজহংসের মতো ভেসে চলেছে। বাইরে দুধারে শ্যামল বনশ্রী। চোখ জুড়িয়ে যায়। বিরাট অঞ্চল ধরে তেমন কোন লোকবসতি নেই। তবু কি পরিষ্কার—কে যেন সমস্ত দেহটাকে নিজের লনের মতো পরিচ্ছন্ন করে রেখেছে।

উইলিয়ম প্রশ্ন করলো, 'মামা, আপনার আমেরিকা কেমন লাগছে?"

"তোমাদের দেশকে ঈশ্বর অকৃপণভাবে ঐশ্বর্যে মুড়ে দিয়েছেন—আর তোমরা তার পরিপূর্ণ সুযোগ নেবার জন্যে পরিশ্রমের কার্পণ্য করো না। পরশ্রীকাতর ছাড়া সবাই বলবে, খুব সুন্দর দেশ। কিন্তু দেখো, তোমাদের দেশ যে বৃহৎ শক্তিমান, ঐশ্বর্যশালী ও সুন্দর—একথা তো আমার মতো একজন ট্যুরিস্টের বলার অপেক্ষা রাখে না। আমি নিজেও দাঁড়িপাল্লা, গজ-ফিতে নিয়ে মাপজোক করতে ব্যস্ত নই—আমি মানুষ দেখে বেড়াচ্ছি, ওই কাজটাই আমার কাছে লোভনীয়। যখন হাতে একটু সময় থাকে, তখন স্বদেশের চিন্তা এসে যায়—মাথায় নানা মতলব ঘুরতে থাকে, কী করে নিজের জাতভাইদের একটু উন্নতি, মঙ্গল হতে পারে তাই ভাবি।"

খুকু দেখলো ব্যাপারটা একটু গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। সে বললো, "বিল, তুমি কি কিছু মনে করবে যদি মামাকে আমার ফ্যামিলির খবর জিজ্ঞেস করি?"

"মোটেই নয়। সেইটাই তো স্বাভাবিক।"

আমি বললাম, "খুকু, তোর বাবার শরীর এখন ভাল। মাঝখানে সর্দিজ্বরে একটু ভুগেছিলেন। তোর দাদা বৌদি ভালই আছেন। ওদের বড়ো ছেলেটা খুব দুষ্টু হয়েছে—আমার লেখা দু'খানা বই ইতিমধ্যেই চিবিয়ে খেয়েছে। তোদের ঝি জ্ঞানদা আমাকে বার বার বলে দিয়েছে, তুই যখন ফিরবি তখন ওর জন্যে একখানা ভাল মাছ কাটার বঁটি নিয়ে যাবি। ওর ধারণা, এখানে ভাল শিল-নোড়া আর বঁটি পাওয়া যায়।"

"খুকু" কথাটা বিলের কানে গিয়েছে। সে বললো, "মামা, তুমি চ্যারিটাকে কি 'কোক' বলে ডাকছো? বেশ সুন্দর নাম দিয়েছো তো।"

কোক ওরফে খুকুমণির কান লাল হয়ে ওঠার অবস্থা! বেশ রেগে-মেগে বাংলায় সে আমাকে বললো, "তুমি ওই নামে আমাকে কেন ডাকলে? এখানে আমাকে সবাই চ্যারিটা বলে।" বিলের দিকে তাকিয়ে সে বললো, "তুমি কিছুই

বোঝোনি। মামা কোন্ দুঃখে আমাকে কোকাকোলার অপভ্রংশ নামে ডাকতে যাবে। কথাটা খুকু, হুইচ মিনস, ছোট্ট মেয়ে। ইনফ্যাক্ট প্রত্যেকটি ছোট্ট মেয়েই খুকুমণি। আত্মীয়-স্বজনদের পুরনো অভ্যাস থেকে যায়—মেয়ে বড়ো হলেও তারা ওই নাম ধরে ডেকে চলে, যদিও তা ঠিক নিয়ম অনুযায়ী অচল।"

বিল বললো, "তুমি কিন্তু অ্যাপ্রিসিয়েট করবে, একজন অ্যাভারেজ আমেরিকানের পক্ষে 'চ্যারিটা' থেকে কোক উচ্চারণ করা অনেক সহজ!"

"তোমরা তো দুটো জিনিস চেনো—হয় কোক না হয় হুইস্কি। এই দুটো বাদ দিলে, অ্যাভারেজ অ্যামেরিকানের আর কী থাকে!" খুকুর উত্তরে বেশ ঝাল আছে।

আমরা অন্তত চল্লিশ মাইল পেরিয়ে এসেছি—কিন্তু চল্লিশ মিনিট সময় বোধ হয় লাগেনি। মোটর গাড়ির গতিই সমস্ত জাতটাকে গতিশীল করে তুলেছে।

আমরা এবার গন্তব্যস্থানের কাছে এসে গিয়েছি। ডাউন টাউনে গাড়ির গতি কমে এলো। দু'ধারে বিরাট বিরাট দোকান—রাস্তায় সুবেশ নরনারীর ভিড়। সবার হাতেই প্রায় একটা দুটো করে প্যাকেট।

ডাউন টাউন ছাড়িয়ে গাড়ি এবার দক্ষিণে মোড় নিল। ছোট্ট একটা ব্রীজ পেরিয়ে আমরা শহরের আর এক প্রান্তে এসে পড়লাম। উইলিয়মের গাড়িটা এবার একটা ইন-এর সামনে এসে দাঁড়ালো। সুচরিতা বললো, "এই সরাইখানায় তোমার থাকবার ব্যবস্থা করেছি মামা। আমাদের ইউনিভার্সিটির বিশিষ্ট অতিথিরা এখানে ওঠেন। শুনেছি স্বামী বিবেকানন্দও এখানে দু'দিন ছিলেন।"

আমাকে ঘরে তুলে দিয়ে সুচরিতা ঘড়ির দিকে তাকালো। বললো, "আমাকে মামা এক ঘণ্টা সময় দাও। ততক্ষণে তুমি স্নানটান সেরে নাও—আমি একবার হোস্টেল থেকে আসছি।"

"কি করে যাবি?"

"বিল নিচে দাঁড়িয়ে আছে।"

আমি বললাম, "বিলকে আমার ধন্যবাদ দিস। বেচারা আমার জন্যে অনেক খেটেছে।"

স্নান সেরে নিজের বিছানায় এসে চুপচাপ বসলাম। বিছানায় শুয়ে শুয়ে এই সময় এক কাপ চা খেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু মার্কিন দেশে এটা বিরাট বাবুগিরি। খুব কম হোটেলেই রুম সার্ভিসের ব্যবস্থা আছে, এবং থাকলেও এক কাপ চায়ের দাম পনেরো টাকা পড়ে যেতে পারে। বেড-টি জিনিসটাই লোকাভাবে অচল। আমাদের দেশের হোটেল বেয়ারা এখানে এলে হৈ হৈ ফেলে দিতো। লন্ডন, প্যারিস, নিউইয়র্ক যাই বলুন, আমাদের কলকাতার কিছু হোটেল-বেয়ারা ওদের গুরুগিরি করতে পারে।

লোকের অভাব এ-দেশে যন্ত্র দিয়ে মেটানোর চেষ্টা চলছে। যা যন্ত্র দিয়ে হয় তাই সস্তা। যেখানে মানুষ লাগে সেখানেই চর্তুগুণ দাম—সে চুল ছাঁটা বা চা দেওয়া যাই হোক। প্রত্যেকটি মানুষও তাই যথাসম্ভব নিজের ওপর নির্ভরশীল—নিজে গাড়ি চালায়, নিজে ঘর পরিষ্কার করে, নিজে কাপড় কাচে, নিজে চা বানায়। নিজের হাত দু'টো খাটিয়ে যত পার সুখ ভোগ কর, অপরের হাত অপরের জন্য। আমাদের দেশের কিছু মানুষ চিরনাবালক থেকে যান—প্রথম জীবনে মা, পরে স্ত্রী এবং বার্ধক্যে বৌমার ঘাড়েই সব দায়িত্ব চাপিয়ে এবং ঝি চাকর ঠাকুরের ওপর হুকুম চালিয়ে সমস্ত জীবনটা পরম সুখে কাটিয়ে যান। আমাদের দেশে যদি কখনও মানুষের দাম হয়, কলকারখানায়, ক্ষেতে খামারে সব মানুষ যদি কাজকর্ম যোগাড় করতে পারে, তাহলে মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে।

বাথরুমে দেখলাম 'সৌজন্য কফির' ব্যবস্থা রয়েছে। সৌজন্য কফি আর কিছু নয়—একটা হিটারের ওপর একটা কাঁচের পাত্র রয়েছে। কাঁচের পাত্র জলে পূর্ণ করলেই হিটার আপনা আপনি জ্বলে উঠবে। পাশে রয়েছে কাগজের ছোট ছোট প্যাকেটে কফি, চিনি, গুঁড়ো দুধ এবং টী ব্যাগ! টী ব্যাগ কাগজের ছোট্ট একটা প্যাকেট তার থেকে একটা লম্বা সুতো ঝোলানো আছে। এই প্যাকেটটা গরম জলের কাপে সামান্যক্ষণ ডুবিয়ে রাখলেই চা হয়ে গেলো। নিজের ইচ্ছেমতো পাতলা বা কড়া করা যায়—তারপর ব্যাগটা তুলে ফেললেই হলো।

'নিমেষ চা' বানিয়ে বিছানার পাশে রেখে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। প্রকৃতির প্রাঙ্গণে ঝরাপাতার বিচিত্র খেলার প্রস্তুতি চলেছে। গাছের পাতা নানা রঙে রঙিন হয়ে ওঠে এই সময়। ওরা বলে "fall"—আমাদের শরৎকালের মতো! যাবার আগে ওরা পৃথিবীকে রাঙিয়ে দিয়ে যায়—এ এক অপূর্ব দৃশ্য। না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

এই পাতা ঝরার সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জীবন-বসন্তের আবির্ভাব হয়। দীর্ঘ ছুটির শেষে নতুন ক্লাশ আরম্ভ হয়। ক্যামপাসে অপরিচিত মুখের আবির্ভাব হয়—নতুন বছরের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের জীবন শুরু করে, সঙ্গে নিয়ে আসে নতুন প্রাণের স্পন্দন।

মার্কিন দেশে বিশ্ববিদ্যালয় না দেখলে কিছুই দেখা হলো না। এ দেশের যা কিছু সেরা, যা কিছু আদর্শ তাকে দৈনন্দিন সংকীর্ণতার কলুষ থেকে মুক্ত রাখার জন্যেই যেন এক একটা ক্যামপাসের সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় এক একটি শহরের মতো—হাজার হাজার একর জমি—পথ ঘাট, বিদ্যুৎ, দোকানপাট, হোটেল সব কিছুই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অধীন। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর লেখাপড়ার প্রাকৃতিক পরিবেশ শুনেছি—ইথাকার কর্ণেল

বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মোহিত হয়েছিলেন এবং কয়েকটি স্মরণীয় কবিতা এই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যামপাসে বসেই রচনা করেছিলেন।

মার্কিন মুলুকে ঘুরতে এসে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমে পড়ে গিয়েছি—ক্যামপাস ঘুরে দেখবার সুযোগ পেলে আর কিছুই ভাল লাগে না।

এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকাল নানা রকমের আন্দোলন হয়—ক্যামপাসের শান্তি নানা সমস্যায় বিঘ্নিত। তবু অ্যাসফল্ট ও কংক্রিটের জঙ্গল থেকে দূরে, প্রকৃতির শান্তিনিকেতনে জ্ঞানের যে বিচিত্র সাধনা এদেশে নীরবে চলেছে—তা দেখলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। এর পেছনে বহু মানুষের ত্যাগ রয়েছে। কিছু বিশ্ববিদ্যালয় যেমন সরকারী অর্থে চলে—তেমন বহু প্রতিষ্ঠান বেসরকারী সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। বহু প্রাক্তন ছাত্র নিয়মিতভাবে তাঁদের 'আলমা মেচার'কে অর্থ সাহায্য করেন। অনেকে তাঁদের উইলে সম্পত্তির এক অংশ বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে যান।

মনে পড়লো, একবার প্লেনে আমার পাশে এক বৃদ্ধার সীট পড়েছিল! বৃদ্ধা অল্প সময়ের মধ্যে আমাকে আপন করে নিয়েছিলেন। তিনি বললেন, "দু'বছর বিধবা হয়েছি। কিছুই ভাল লাগে না। নিজের ইচ্ছামত এখানে ওখানে ঘুলে বেড়াই—আর ছ'মাস অন্তর একবার করে স্বামীর প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয় স্ট্যানফোর্ডে ঘুরে আসি।"

বৃদ্ধা বললেন, "আমার হাতের এই নিকেলের আংটিটা দেখছেন—এর একটা বিশেষ মূল্য আছে। আমার স্বামীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এটি দেওয়া হয়। তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বিশেষ ব্যবস্থা করে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে তুলে দিয়েছেন। আমি বিধবা হিসেবে পাঁচশ ডলার মাসোহারা পাই। তেমন যদি আটকে যায় তাহলে বাড়তি কিছু টাকা পাওয়া যেতে পারে—আমার মৃত্যুর পরে সবটাই বিশ্ববিদ্যালয়ের।"

"আপনি বা আপনার ছেলেরা এতে আপত্তি করেননি?" আমি জানতে চেয়েছিলাম।

স্নিগ্ধ হাসিতে মুখ ভরিয়ে বৃদ্ধা বললে, "আমার দুই ছেলে কৃতী, আমার মেয়েদের ভাল বিয়ে হয়েছে। তাদের আরও টাকা দিয়ে কী হবে? আর আমার দিনও তো শেষ হয়ে এলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতেই সব যাওয়া ভাল নয়? মানুষের উপকার হবে।"

ভদ্রমহিলা আমাকে বলেছিলেন, 'ট্রামে-বাসে একাট পোস্টার পড়েছে—দেখেননি? "বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের নেতাদের তৈরি করে, আপনি অর্থ সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে তৈরি করুন।" আমরা তো সামান্য মানুষ—কত লোক আরও

কত কি দিয়ে যান। ভারতবর্ষেও নিশ্চয় আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়কে যথাসম্ভব দেন।”

আমরা কাকে যে কি দিই, সে তো ঈশ্বরই জানেন। এককালে ধর্মের নামে কিছু দান হতো। এখন তাও কমে আসছে। বিদ্যামন্দিরের জন্য আমরা কানাকড়ি খরচ করতে রাজী নই। যে কথা আগেও উল্লেখ করেছি, আবার বলছি,—হাজার-হাজার লাখ-লাখ টাকা দেবার সামর্থ্য হয়তো অনেকের নেই, কিন্তু এই দেশের লক্ষ গ্র্যাজুয়েটদের ক'জন তাঁদের ইস্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে পাঁচ টাকা রেখে যাবার কথা চিন্তা করেন?

বড়ো বড়ো কোম্পানীর শেয়ারের মোটা অংশের মালিক—আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। নানা পরিকল্পনার জন্যে নানা জন টাকা রেখে যান। কেউ চান তাঁর টাকায় ক্যানসারের গবেষণা হোক, কেউ চান তাঁর টাকায় কোনো বিশিষ্ট অধ্যাপককে বই লেখবার জন্যে ছুটি দেওয়া হোক, কেউ চান তাঁর টাকায় বিখ্যাত কোনো বক্তাকে সামান্য কয়েক দিনের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আনা হোক, কেউ চান তাঁর টাকায় মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া হোক।

আর শুনেছিলাম, “মনে রাখবেন, বিদ্যালয়ের সঙ্গে 'বিশ্ব' কথাটাও যুক্ত আছে—সমগ্র বিশ্বের দিকে নজর রাখতে হবে। তাই নানা দেশের গুণী-জ্ঞানীদের মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অধ্যাপক হিসেবে দেখা যায়। এঁদের কেউ কেউ যে ভারতবর্ষ থেকেও আসেন তা সবাই জানে। আর আসে ছাত্ররা দেশ বিদেশে থেকে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ভারতীয় ছাত্র এবং অধ্যাপকদের খুব সম্মান।”

খুকুর কথা মনে পড়ে গেলো। খুকু পড়াশোনায় খুব ভাল—বি-এ এবং এম-এ দুটোতেই ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছিল। তারপর চিঠিপত্তর লিখে নিজেই ক্যামপাসে ব্যবস্থা করে নিয়েছে। গবেষণা করছে—এখান থেকে পি-এইচ ডি নিয়ে যাবে। পয়সা কড়ি লাগে না। বরং পড়িয়ে বেশ কিছু রোজগার করে।

সুচরিতা আমার ভাগ্নী বলে বলছি না—ওর প্রতিভা সম্পর্কে আমার অনেকদিন ধরে বিশ্বাস ছিল। ওর স্মরণশক্তি খাসা, বেশি তালগোল না পাকিয়ে সহজেই যে কোন জিনিস বুঝে ফেলে, নিজের মধ্যে দোনোমোনো ভাব নেই—নিজের লক্ষ্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা আছে। অথচ এই পুরুষালী গুণের সঙ্গে ওর স্নেহপ্রবণ মেয়েলী মন চমৎকার মিশে গিয়েছে। খুকু একটু আদুরে, বাবা-মার চিঠি প্রতি সপ্তাহে না পেলে ভেবে আকুল হয়। আর আগে যা ছিল—এখন কী হয়েছে জানিনা—একটুতে অভিমান হয়, চোখ ছলছল করে ওঠে! সুচরিতা বেশি কথা বলে না, রসিকতা বোঝে—এবং পাণ্ডিত্য অর্জন করলেই যে ছেলেমানুষী বিসর্জন দিতে হবে তা বিশ্বাস করে না।

ঘরে টোকা পড়তেই বললাম, “ভিতরে আসুন।”

সুচরিতা হৈ-হৈ করে ঘরে ঢুকে পড়লো। বিরাট একটা ওভারকোট চাপিয়েছে সে। বললাম, "এ-রকম ভাল্লুক সাজে?"

"বাইরে যা ঠাণ্ডা! আর তুমি তো জানো আমার টনসিলটার কোনো গতি করা গেলো না। সারাজীবন আইসক্রীম থেকে দূরে থাকতে হলো—আইসক্রিম খেলেই গলায় ব্যথা, জ্বর।"

বললাম, "আয়, এখানে বোস।"

আনন্দে উচ্ছল হয়ে সুচরিতা বললো, "দেশ বিদেশ ঘুরেও তুমি আধুনিক হলে না।"

"বলিস কী? আমি সেকেল? তোর ছোট ভাই মন্টু পর্যন্ত আমার সামনে সিগারেট খাবার পারমিশন পেয়েছে।"

"মামা, কোনো লেডি ঘরে ঢুকলেই—সে তোমার নাতনীর বয়সী হলেও তোমার প্রথম কাজ তাঁকে ওভারকোট মুক্ত করা। সুচরিতা আমাকে শুনিয়ে দিলো।

"এই বললি খুব ঠাণ্ডা পড়েছে," আমি নিজেকে সামলাই।

"ঠাণ্ডার সঙ্গে বাড়ির কি সম্পর্ক? তুমি তো জানো, এ-দেশে ইন্টারন্যাল হিটিং ছাড়া, বাড়ির প্ল্যান পাশ হয় না। বাইরে বরফ পড়ছে—আর ভিতরে গেঞ্জি গায়ে দিয়ে বসে তুমি আইসক্রিম খেতে পারো।"

খুকুকে বললাম, "দাঁড়া আমার কাজগুলো সেরে নিই। তোর সঙ্গে কী কী করতে হবে তা নোট করে রেখেছি।"

ব্যাগ খুলে, অতি সাবধানে এক কোণ থেকে গোটা তিনেক পুরিয়া বার করলাম।

"এক নম্বর—এটা হলো কালীঘাটের প্রসাদী ফুল। মাথায় ঠেকিয়ে ব্যাগে রেখে দে, তাজুদির নির্দেশ। দু'নম্বর—এই নে, জগন্নাথের প্রসাদ। মুখে একটু ঠেকা। তিন নম্বর, এইটি সম্বন্ধে তাজুদি হাতে ধরে বলেছেন—এই সোনার মাদুলি লকেট করে গলার হার থেকে ঝোলাতে হবে।

"তুমিও কি পাগল হলে, মামা?"

আমার উত্তর, "এক নম্বর দু'নম্বর সম্বন্ধে তোর প্রাণ যা চায় তাই করতে পারিস—কিন্তু তিন নম্বর সম্বন্ধে কোনো উপায় নেই। পুরো একদিন উপবাসী থেকে তাজুদি ওটি তারকেশ্বর থেকে আনিয়েছেন। এর বিশেষ একটি উদ্দেশ্য আছে—সেটি যথাসময়ে জানতে পারবি। এখন জানবার চেষ্টা করিস না, খুবই কনফিডেনসিয়াল।"

এবার ব্যাগের গভীরে হাত ঢোকালাম। তাজুদির এই অনুরোধটি রক্ষে করতে গিয়ে আমাকে মার্কিন কাস্টমসের খপ্পরে পড়তে হচ্ছিল। তোর জন্যে

যত্ন করে আচারের শিশিটি দিলেন—তুই তো টক খেতে ভালবাসতিস? আর এখানে যেমনি কাস্টমসে ঢুকলাম অমনি জিজ্ঞেস করে বসলো—আমার কাছে গাঁজা ইত্যাদি কোনো 'ড্রাগ' কোনো ফল বা খাদ্যদ্রব্য আছে কিনা। কী করে জানবো বিদেশের ফলফুলুরি সম্বন্ধে এদেশে এতো হুঁশিয়ারি—পাছে কোনো পোকা ঢুকে পড়ে। তা শেষ পর্যন্ত অশ্বত্থামা হত ইতি গজ করতে হলো। বললাম, গাঁজা, আফিম ইত্যাদি নেই, খাদ্যদ্রব্যও নেই। মিথ্যে বলিনি, কারণ লেবুর আচারটা আমি অখাদ্য বলেই মনে করি।"

সুচরিতা আচারের শিশিটা হাতে নিয়ে খুশী হয়ে বললো, "মামা, প্রত্যেক বছর তুমি ওয়ার্লড ট্যুর করো—আর আমার জন্যে আচার নিয়ে এসো!"

"তৃতীয় অধ্যায়, তোর বেশবাস সম্পর্কে। দু'খানা শাড়ি আর তেরোখানা ব্লাউজ!"

"ব্লাউজগুলোর কথা আমি ভাবছিলাম," সুচরিতা জানালো।

বললাম, "বাছা, এ-দেশে কি দর্জি নেই?"

"দর্জি থাকবে না কেন মামা? কিন্তু নিজের মাপ দিয়ে আলাদাভাবে জামাকাপড় করানো স্বপ্নের ব্যাপার—খুব বড়োলোক ছাড়া কেউ পেরে ওঠে না। সবাই তাই দোকানে তৈরী ফ্রক কিংবা সুট কিনতে ছোটে। কলকাতায় আমরা যে সমস্ত ব্লাউজ নিজের মাপ দিয়ে দর্জিকে বাড়িতে ডেকে এনে করাই, তা শুনে আমার বান্ধবীরা ভেবেছে আমি নিশ্চয় কোনো রাজকুমারী বা মিঃ বিড়লার আত্মীয়া।"

খুকু বললো, "মামা, আজকে ডরমিটরিতে নো-মিল করে এসেছি। তোমার সঙ্গে খাবো।"

বললাম, "খুব ভাল করেছিস। তা এখানকার খাওয়া-দাওয়া তো এতো ভালো শুনি—কিন্তু তুই তো মোটা হলি না।"

'রক্ষে কর। তুমি আমাকে ধুমসি হতে বলো নাকি? এতেই কাজ করতে গেলে হাঁপিয়ে উঠি।"

বললাম, 'দেখ পূর্ব ও পশ্চিমের সৌন্দর্যবোধের তফাৎ আছে। এদেশে যাদের স্লিম বলে—অর্থাৎ গাঁজার ছিলিমের মতো রোগা লম্বা—তাদের আমরা তারিফ করি না। নারীসৌন্দর্যের সঙ্গে আমাদের দেশে স্নেহের সম্পর্ক রয়েছে—স্নেহজাত পদার্থ দেহে থাকলে তাই ভাল হয়।"

"তোমাদের সব সেকেলে ধারণা। আমার বান্ধবীরা তোমার সঙ্গে আলাপ করতে আসছে—এদেশের মেয়েদের দেখবে কীরকম রোগা থাকবার চেষ্টা করছে। পরীক্ষা পাশ থেকে ওটা কম দুশ্চিন্তার কারণ নয়।"

আমি বললাম, "তা এদেশের খাবার-দাবারের অন্য গুণও রয়েছে—তোর

তো চোখে চশমা ছিল, এখন দেখছি চোখ ভাল হয়ে গিয়েছে।"

"না মামা, চোখ ভাল হয়নি মোটেই। এখানে এখন বেশির ভাগ মেয়ে কনট্যাক্ট লেন্স পরছে।—চোখের মণির সঙ্গে কাঁচ আটকে দেয়—আর ফ্রেম লাগে না। চশমার দাগ পড়ে না নাকের ওপর। এখানে কারও দাঁত এবড়োখেবড়ো দেখবে না—সব মেয়েরই মুক্তোর মত দাঁত। কারণ ছেলেবেলায় ডেন্টিস্টদের কাছে গেলেই তাঁরা এবড়োখেবড়ো দাঁত সোজা করে দেন।"

খুকু আমাকে ইউনিভারসিটি কাফেতে নিয়ে গেলো। থালা হাতে লাইনে দাঁড়াতে হয় সবাইকে। বিরাট জায়গা—অধ্যাপক ছাত্রছাত্রী সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে ডিনার কিনে এক-একটা টেবিলে বসছেন এবং খাওয়া শেষ করে এঁটো থালাটা কনভয়ের বেল্টের ওপর চাপিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

কতকগুলো ছেলেমেয়ে মাঝে মাঝে টেবিলগুলো মুছে দিচ্ছে। খাবার নিয়ে আমরাও একটা ছোট্ট টেবিলে এসে বসলাম। একটি মেয়ে আমাদের টেবিল মুছছিল। খুকুকে দেখে সে বললো, "হাই চ্যারিটা।" খুকু বললে, "মামা, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, আমাদের সহপাঠিনী অনিতা গ্রান।"

বান্ধবী বিদায় নিলে খুকু বললো, "অনিতা এখানে ঝিয়ের কাজ করে—কিন্তু ওর বাবা একটা বড়ো কোম্পানির ম্যানেজার। নিজেদের তিনখানা গাড়ি। তবু সে কাজ করে নিজের খরচা অনেকখানি তুলে ফেলে। এইটাই এদেশের নিয়ম। ছেলেমেয়েরাও বাপমায়ের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করতে চায় না। যে যার নিজের চেষ্টায় রোজগার করতে এবং নিজের খুশী মতো জীবন উপভোগ করতে চায়। যতক্ষণ আমি কারও কাছে হাত পাতছি না ততক্ষণ আমার ব্যাপারে নাক গলাবার অধিকার নেই কারও।"

"তাহলে বোঝা যাচ্ছে, ব্যক্তিস্বাধীনতা জিনিসটা শুধু খাতায় লেখা থাকে না। দৈনন্দিন জীবনেও এর মূল্য রয়েছে।"

"যথেষ্ট। সেইটাই এই সভ্যতার শক্তি। আবার সেইটাই এদের যত কষ্টের কারণ বলতে পারো।"

সুচরিতার মুখের দিকে তাকালাম। বয়সে আমার থেকে অনেক ছোট হলেও সমাজতত্ত্বে সে পণ্ডিত। খুকু নৃতত্ত্বে রিসার্চ করছে এবং দুদিন পরে নামের আগে ডক্টরেট জুড়বে, ওর কথা আমাকে মন দিয়ে শুনতেই হবে। সুচরিতা বললো, "মামা, লেখকরা তো মানুষের মন নিয়ে নাড়াচাড়া করে। তোমাকে অনেক জিনিস এখানে কয়েকদিনের মধ্যে দেখিয়ে দেবো। আমাদের তো পরীক্ষা-পাশের স্বার্থ রয়েছে—তোমার ওসব চিন্তা নেই—তুমি এদের আরও ভাল করে বুঝতে পারবে।"

আমি বললাম, "সভ্যতাটা ভাল কি মন্দ সেটা বড় কথা নয়—কিন্তু আমাদের

থেকে যে পৃথক তাতে সন্দেহ নেই। সাধে স্বামী বিবেকানন্দ এদের কর্মনিষ্ঠাকে শ্রদ্ধা করতেন! কে কী কাজ করে তা দিয়ে এরা মানুষের বিচার করে না—যা খুশী করবার স্বাধীনতা প্রত্যেক মানুষের রয়েছে। কোনো কাজই এখানে ছোট নয়।"

"বরং ছোট কাজগুলোই ক্রমশঃ বড়ে হয়ে উঠছে! নাপিত, ধোপা, রাস্তার ঝাড়ুদার এখন ছোকরা অধ্যাপকদের থেকে বেশি রোজগার করছে। রাজমিস্ত্রীরা তো রীতিমত বড়ো লোক—ঘণ্টায় পঁচাত্তর টাকা রোজগার করে।" খুকুর কথা শুনে আমি তো তাজ্জব।

হঠাৎ মাথায় প্রশ্ন এলো "হ্যাঁরে, এরা কি করে এতো এগিয়ে যাচ্ছে? অথচ আমরা ক্রমশঃ পিছু হটে যাচ্ছি। খাতায়-কলমে প্রমাণ করা না গেলেও আমাদের দেশের সব লোকের ধারণা দিনকাল ক্রমশ খারাপ হচ্ছে।"

খুকু বললো, "আমার একটা থিওরি আছে। তুমি যে উইলিয়মকে দেখলে তারও একটা থিওরি আছে। আমার ধারণা, এরা যে বড়ো হচ্ছে তার কারণ সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টার মধ্যে এরা ডিনারের পাট চুকিয়ে ফেলে। নারীজাতির মুক্তির পথে এটাই প্রথম পদক্ষেপ! আমাদের বাড়িতে মনে আছে—রাত সাড়ে-আটটা পর্যন্ত দফে-দফে চায়ের পাট চলেছে। মা, বৌদি, খুকু, দুটো চাকর ও একটা রাঁধুনি চা সাপ্লাই করতে হিমসিম খাচ্ছে। তারপর খাওয়ার পালা। ন'টা থেকে আরম্ভ করে সাড়ে-এগারোটা পর্যন্ত বিভিন্ন লোক বিভিন্ন সময়ে ডিনার করছে। যে-জাতের বারো আনা জীবনীশক্তি বাজার করা, তরকারি কোটা, আঁচ দেওয়া, রান্না করা, পরিবেশন করা এবং বাসনমাজায় বেরিয়ে যাচ্ছে, সে-জাতের উন্নতি কী করে হবে মামা? ভোর সাড়ে-পাঁচটা থেকে রাত সাড়ে-এগারোটা পর্যন্ত বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত পরিবারে যে ভোজনকেন্দ্রিক নাটক চলেছে তার সংস্কার না হলে আমরা পৃথিবীর অন্য লোকদের সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠবো না।"

"মন্দ বলিসনি, খুকু! এ-বিষয়ে কেউ ডক্টরেট করলে আরও অনেক কিছু জানা যেতো।"

খুকু বললো, "মামা, এখানে সাতটার মধ্যে সবাই ঝাড়া-হাত-পা হয়ে গেলো, তারপর অজস্র কাজ করবার সুযোগ। যে যার পছন্দমতো কিছু না কিছু নিয়ে মেতে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তো কথাই নেই—কেউ লাইব্রেরিতে যাচ্ছে রেকর্ড শুনতে বা বই পড়তে, কেউ গবেষণা করছে ল্যাবরেটরিতে গিয়ে, আবার বিরাট একদল টি-ভি'র সামনে বসে নাটক দেখছে এবং বিজ্ঞাপন কোম্পানির অত্যাচার সহ্য করছে।"

উইলিয়ামের মতামতটা জানতে চাইলাম। খুকু বললো, "বিলের ধারণা আমাদের অনগ্রসরতার পিছনে রয়েছে প্রোটিনের অভাব। বহু প্রজন্মে ধরে

প্রোটিনের অভাবে গরীবদেশের মানুষেরা পরিশ্রমের শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। সুতরাং সস্তায় কৃত্রিম প্রোটিন আবিষ্কার করা বিশেষ প্রয়োজন। তারপর নাকি পৃথিবীর রূপ পাল্টে যাবে।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে খুকু বললো, "মামা, এবার ওঠা যাক। হাতে বেশি সময় নেই, তোমাকে সব দেখিয়ে দিতে হবে।"

"এখন চলো আমাদের ডর্মে। মেয়েরা কীভাবে থাকে তা তোমার দেখা দরকার।"

'মেয়ে হোস্টেলের ভিতর! সর্বনাশ! সেখানে তুই আমাকে নিয়ে গিয়ে বিপদে ফেলবি নাকি?"

"আঃ মামা, কী করে তুমি এদেশের প্রাণের কথা লিখবে যদি মেয়েদের না দেখো? কলকাতার মেয়ে হোস্টেল আর এখানকার হোস্টেলের অনেক তফাৎ। আমার দু' একজন বান্ধবীকে তোমার কথা বলে রেখেছি।"

ওদের ডর্মটা বিশাল এক সাততলা বাড়ি। বললাম, "হ্যাঁরে, মেয়েদের হোস্টেলে দারোয়ান কই?"

"আমরা নিজেরাই এক-একটি দারোয়ান।"

"তাহলে ছেলেরা ভিতরে ঢুকে পড়তে পারে।"

"একটু-আধটু বিধিনিষেধ আছে—কিন্তু সেটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। আজ ওপেন হাউস—রাত এগারোটা পর্যন্ত সবার জন্যে দরজা খোলা।"

মধ্যরাতে স্বাধীনতার এই খবরটা পেলে তাজুদির মুখের অবস্থা কীরকম হবে ভাবছিলাম।

সুচরিতা বললে, "বাইরের শাসনে এরা তেমন বিশ্বাস করে না। এরা মনে করে, বাইরে প্রলোভন থাকবেই—চব্বিশ ঘণ্টা কে তোমার গার্জেনি করবে? তুমি নিজেকে সামলাতে শেখো। সেই শিক্ষাই সারাজীবন কাজে লাগবে।"

মেয়ে হোস্টেলের দরজার সামনে থমকে দাঁড়ালাম। সুচরিতা ঘাড় ফিরিয়ে বললো, "কি হলো মামা?"

"মানে, লেডি সুপারিনটেন্ডেন্ট-এর পারমিশন নিয়েছিস তো?" আমি আমতা-আমতা করি।

"তোমায় বললুম না, রাত্তির দশটা পর্যন্ত কোনো অনুমতি দরকার হয় না ; তারপর কোনো কোনো দিন গেট বন্ধ হয়ে যায়।"

একতলায় ঢুকেই ডানদিকে বিরাট হল ঘর। "এইটা আমাদের কমনরুম বলতে পারো," সুচরিতা জানালো।

কমনরুমে কয়েকটি ছোকরা সিগারেট ফুঁকছে। খুকুর টীকা—"এরা বোধ হয় কোনো বান্ধবীর জন্যে অপেক্ষা করছে কিংবা মেয়েরা হয়তো ওদের বসিয়ে

রেখে গিয়েছে—সবাইকে তো আর নিজের ঘরে নিয়ে যাওয়া যায় না।”

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলাম। দু'চারজন ছাত্রী বেশ খুশী মেজাজে গুণ গুণ করতে করতে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে। এদের দু'জন খুকুকে দেখে “হাই, হাই” করলো।

খুকু বললো, “জানো মামা, এই কথাটা প্রথম-প্রথম কেমন কানে লাগতো।” এখন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে—আমি নিজেও দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার হাই বলছি।”

“যষ্মিন দেশে যদাচার,” আমি সমর্থন জানাই।

“এদের সমস্ত ব্যাপারে যদাচার করা অবশ্য বাঙালি মেয়েদের পক্ষে অসম্ভব,” খুকু উত্তর দেয়।

আমরা এবার তিনতলায় উঠে এসেছি। খুকুর রুম নম্বর ৩১৪ অর্থাৎ তিনতলায় চৌদ্দ নম্বর ঘর। এই একটা ব্যাপারে ইংরেজদের থেকে আমেরিকানরা বুদ্ধিমান। থার্ড ফ্লোর মানে এখানে তিন তলা, চার তলা নয়। গ্রাউন্ড ফ্লোর বাদ দিয়ে গুনবার দুর্বুদ্ধি ইংলন্ডেশ্বরীর মাথায় কী করে এসেছিল তা ভগবানও জানেন না।

ল্যান্ডিং থেকে ডানদিকে মোড় ফিরতেই দুটো জিনিস নজরে পড়লো—টেলিফোন ও বেশবাস।

লম্বা করিডরে সারি সারি টেলিফোন বুথ—অন্ততঃ পঁচিশ-তিরিশটা হবে। প্রতি ফোনের সামনেই একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। টেলিফোন ধরে বিচিত্রভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে এক-একজন। আর্টিস্ট ও ভাস্কররা এখানে এলে মানবদেহের লীলা সম্পর্কে নতুন আইডিয়া পেতেন। কেউ সোজাসুজি দাঁড়িয়ে ঘাড়টা ঈষৎ বেঁকিয়ে টেলিফোনটা কানের কাছে চেপে রেখেছে—হাতটা মুক্ত। কথার ফাঁকে ফাঁকে হাতের নোখগুলো খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। কেউ ঘুরে দাঁড়িয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে। কোমরটা একটু খেলিয়ে একটা পা দেওয়ালে তুলে দিয়েছে। নারীদেহের আরও কত ভঙ্গী ও ছন্দ—যার কয়েকটা নমুনা যেন অজন্তা এবং খাজুরাহের সুন্দরীদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

সবাই কিন্তু সাধনামগ্ন! কোনোদিকে দৃকপাত না করে ফোনমাধ্যমে ভাবের আদানপ্রদান করছে।

সুচরিতা দ্রুত এগিয়ে যেতে যেতে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, “কিছু বলবে নাকি?”

আমি বললাম, “এতো টেলিফোন!” সুচরিতা বললো, “এ আর ক'টা। এ ছাড়াও প্রত্যেক ঘরে ফোন আছে। কিন্তু সন্ধ্যেবেলায় দু'জন রুমমেটের একটা ফোনে চলে না, তাই বারান্দায় বাড়তি ফোনের ব্যবস্থা।”

বললাম, "কলকাতার শেয়ারবাজার লায়নস রেঞ্জ ছাড়া আর কোথাও এতো লোককে এক সঙ্গে ফোন করতে দেখিনি। আর নিষ্ঠা দু' জায়গাতেই সমান।"

সুচরিতা হেসে ফেললো। "নিষ্ঠা এখানে আরও বেশি। ওখানকার বেচু-কিনুতে লাভ লোকসান, এখানকার বেচু-কিনুতে জীবনমরণ।"

নিজের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাগ থেকে চাবি বার করে খুকু বললো, "আমার রুমমেট এখনও ফেরেনি মনে হচ্ছে।"

ঘর খুলে ফেললো সুচরিতা। "দাঁড়াও, একটা ধূপ জ্বালিয়ে দিই।"

ধূপ জ্বালিয়ে সুচরিতা বললো, "দু'খানা বিছানায় আমরা দুজনে থাকি। মার্থা এখনও ডিনার সেরে ফেরেনি।"

আমাকে ও পড়ার টেবিলের সামনে চেয়ারে বসতে দিলো। বেশ বড়ো ঘরখানা। ছবির মতো সাজানো। বললাম, "ছেলেদের হোস্টেল থেকে মেয়েদের হোস্টেল অনেক পরিষ্কার হয়। তোর দাদার বি-ই কলেজ হোস্টেল একবার গিয়েছিলাম। সবকিছু অগোছালো—একটু আগেই যেন ভূতের নৃত্য হয়ে গিয়েছে। তোদের এখানে বিছানার চাদর এমনভাবে মোড়া যেন হিলটন হোটেলের রুম সুইট।"

দু'দিকে দু'খানা পড়ার টেবিল। সেখানে গাদাগাদা বই ও খাতা। এককোণে দুটো টাইপরাইটার।

"তুই কি আজকাল টাইপ করিস?" আমি জিজ্ঞাসা করি।

সুচরিতা বললো, "মামা, আধুনিক সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলো—টেলিফোন, টাইপরাইটার ও ট্রান্সপোর্ট। এই তিনটে ছাড়া জীবনের কথা এরা ভাবতে পারে না। বস্তিতে পর্যন্ত টেলিফোন দেখতে পাবে! কুড়ি কোটি লোকের জন্যে এদেশে দশ কোটি ফোন চালু রয়েছে। আর ইস্কুল কলেজ সর্বত্র টাইপরাইটার। হাতে লেখা কোনো খাতা অধ্যাপকরাও দেখতে চান না। সব কিছু টাইপ করে দিতে হবে। অধ্যাপকরাও ক্লাশে ডিকটেশন দিয়ে সময় নষ্ট করেন না। তেমনি কিছু প্রয়োজনীয় বুঝলে তাঁরা নিজেরাই স্টেনসিল কাগজে টাইপ করে ফেলেন এবং ছেলেদের জন্যে কপি নিয়ে আসেন।"

"বলিস কী।" আমার চোখ কপালে বেরিয়ে আসবার মতো অবস্থা।

"হ্যাঁ মামা। তুমি তো জানো, আমি জুনিয়র ক্লাশ দু'একটা নিই। সেখানে সকলের টাইপরাইটার আছে—যেমন আমাদের দেশে মাষ্টারমশায়রা আশা করেন প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী লেখবার জন্যে পেন্সিল নিয়ে আসবে।"

"তা হলে ক্লাশে কী হয়? আমাদের সময় কলেজে অনেক মাষ্টার মশায় তো সারাক্ষণই পুরনো খাতা থেকে নোট দিতেন। নোটবই আনতে ভুলে গেলে ক্লাশ বন্ধ থাকতো।"

সুচরিতা বললো, "এখানে সবারই সময় দামী। যে-লোকের সময়ের দাম নেই সমাজেও তার কোনো দাম নেই। অথচ গরীব বড়োলাক শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই প্রতিদিন মাত্র চব্বিশঘণ্টা সময় পায়, সুতরাং রেশনের জিনিস সবাই বুঝেসুঝে খরচ করে। ক্লাশেও নোট দিয়ে সময় নষ্ট হয় না। মাষ্টারমশায়রা ছেলেদের ঝিনুকে করে দুধ খাওয়ানোতে বিশ্বাস করেন না। ওঁরা বলেন, আজকের ক্লাশে যা পড়ানো হবে সে সম্পর্কে কি কি ভাল বই আছে তার নাম ও চ্যাপ্টার আগেই লিখে জানিয়ে দিয়েছি। ছাত্রছাত্রীরা এগুলো পড়ে ক্লাসে আসবে—তারপর আলোচনা শুরু হবে।"

"মানে, মাষ্টারমশায়রা একঘণ্টা ধরে একতরফা লেকচার দিয়ে যাবেন, আর ছাত্র হাঁ করে শুনবে বা ঘাড় গুঁজে ডিক্‌টেশন নেবে তা কেউ চায় না। এখানে ভাবের আদান-প্রদান হবে। এবং ছাত্ররা সীটে বসে বসে বিড়ি-সিগারেট খেতে-খেতেই আলোচনায় যোগ দেবে।"

বললুম, "বুঝেছি বাপু। এসব বড্ড বাড়াবাড়ি—আমাদের দেশে ছাত্র বা মাষ্টারমশায় কারুরই সহ্য হবে না।"

খুকুর ঘরের সঙ্গে লাগোয়া ছোট্ট বক্সরুমে রেফ্রিজারেটর রয়েছে, আর একদিকে ড্রেসিং-টেবিল। বৈদ্যুতিক হিটার আমার নজর এড়িয়ে গিয়েছিল। খুকু বললো, "মামা, কফির ব্যবস্থা করি?"

"এখন আবার কফি আনাবার হাঙ্গামা করবি কেন?"

"আনাতে হবে না, এখানেই তৈরি করবো। রান্নার ব্যবস্থা নেই—কিন্তু ছোট্ট হিটার আর ফ্রিজের দয়ায় অনশনে না-মরার ব্যবস্থা আছে। একটা ফ্রিজের দুটো তাকে আমাদের দু'জনের জিনিসপত্তর থাকে। সকালের জলখাবার, রাতের সাপার, এমনকি মাঝে মাঝে ডিনারের ব্যবস্থা। ওই সব খাবার থেকেই হয়ে যায়।"

"মানে, তুই ঠিকমতো খাস না—দিদিকে বলতে হবে।"

"সপ্তাহে একদিন মুদির দোকান থেকে খাবার, ফলের রস, ডিম কিনে আনি। এখানকার মুদির দোকান একবার নিজের চোখে দেখো মামা! মুদির দোকান ভিজিট না করলে আমেরিকা দেখা হলো না। দোকান আছে—অথচ দোকানি অনুপস্থিত। দোকান থেকে বেরুবার পথে একজন ক্যাশিয়ার পয়সা নিচ্ছেন। সমস্ত দোকানেই তোমার অবাধ গতিবিধি। একটা ছোট্ট ঠেলা নিয়ে নিজের পছন্দমতো মাল সংগ্রহ করো। আলু থেকে মাংস, মদ থেকে মিঠাই সব পাবে। সব জিনিসই ছোট ছোট প্যাকেটে রয়েছে—প্যাকেটের গায়ে ওজন এবং দাম লেখা আছে।"

"আলুও প্যাকেটে কিনতে হবে? কলকাতার লোকদের তাহলে মন খারাপ

হয়ে যাবে। আধঘণ্টা ধরে টিপে টিপে নিজের পছন্দমতো যদি আলু না কেনা হলো এবং আলুওয়ালা যদি দাঁড়ি ঝুলিয়ে তার থেকে দু' একটা টপাটপ না ফেলে দিলো তা হলে বেঁচে থেকে লাভ কী?" আমি জানতে চাই।

"আলু কি বলছো মামা—বরফ পর্যন্ত এখানে প্যাকেটে বিক্রি হয়। এখানে বাজার করাটা কলকাতার তুলনায় নিতান্ত অহিংস ব্যাপার—দরাদরি নেই, কথা কাটাকাটি নেই, চিৎকার করে লোক জড়ো করা নেই। আছে শুধু রঙিন প্যাকেট—যা সেলফ্ থেকে তোমার অনুগ্রহ পাবার জন্যে হাতছানি দিচ্ছে, আর আছে পোস্টার। এক ডলারের মাল যে এই সপ্তাহে পঁচাশি সেন্টে দেওয়া হচ্ছে তার সগর্ব ঘোষণা। এখানে বাজার করার মুস্কিল কি জানো—এতোরকম জিনিস পাওয়া যায় যে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাবার অবস্থা। বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের। যাদের হাতে কাঁচা-পয়সা নেই অথচ যথেষ্টে রুচি আছে। তারা বাজারে গেলেই মনোকষ্ট পায়।"

দরজায় এবার টোকা পড়লো। খুকু বললে, "মার্থা বোধহয় এসে পড়েছে।"

বলতে-বলতেই মার্থার প্রবেশ। বয়স একুশ বাইশ। লম্বায় খুকুর থেকে বেশ খানিকটা উঁচু ; একমাথা-কোঁকড়া চুল। খুকু কানে কানে বললো, "একেই বলে হনি ব্লন্ড।" কত রকমের যে ব্লন্ড আছে ভগবান জানেন।

মার্থার বেশবাসটি অদ্ভুত। হাফ শার্টের মতো ঢিলা ব্লাউজ পরেছে—আর তলায় টাইট হাফপ্যান্টের মতো, যা হাঁটু থেকে তিন ইঞ্চি ওপরে আটকে আছে। পায়ে কোনো হোস বা মোজার বালাই নেই।

একটা রঙিন স্লিপার পরেছে। বান্ধবীকে খুকু বললো, "মামাকে আজই হোস্টেলে ধরে আনলাম।"

মার্থা বললো, "খুবই ভাল করেছো চ্যারিটা।"

আমার দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে মার্থা জানালো, "আমরা ক'দিন ধরেই আপনার অ্যারাইভালের জন্যে অপেক্ষা করছি। চ্যারিটার ভয়ানক আনন্দ।"

আমি বললাম, "আমার ভাগ্নী আশা করি আপনাদের কোনো দুশ্চিন্তায় কারণ হয় না।"

"দুশ্চিন্তা!" মার্থা চিৎকার করে উঠলো। "আপনার ভাগ্নীকে আমরা একটা ছোটখাট পরী মনে করি। যদিও, সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের একটু হিংসেও আছে।"

"কারণ?" আমি জানতে চাই।

"কারণ, ওই অদ্ভুত সুন্দর শাড়ি। শংকর (আপনাকে নাম ধরে ডাকছি, আপনি আমাকে মার্থা বলবেন) আপনি জানেন না—রোপট্রিকের পরে এই শাড়িই আমাদের দেশের ছেলেদের মাথা ঘোরাচ্ছে—শাড়ি একটা মধুর বিস্ময়, যার

রহস্য ভেদ করতে সব ছোকরার সমান আগ্রহ।”

আমি হেসে ফেললাম। “আপনারা তাহলে শাড়ি পরতে আরম্ভ করুন।”

‘আশ্চর্য হবেন না, সত্যিই যদি আমরা ফ্রক ছেড়ে শাড়ির দিকে নজর দিই।”

মার্থার জন্যে খুকু এবার কফি আনতে গেলো। মার্থা আমাকে বললো, “চ্যারিটা হচ্ছে একরাশ মেয়ের মধ্যে একটি মুক্তো। কত ছেলে যে ওর সঙ্গে ডেট করবার জন্যে পাগল।”

এসব কথা আমার তেমন ভাল লাগে না, তাজুদির কথা ভেবে। মার্থা বললো, “আমার বয়-ফ্রেন্ডকে একদিন বকুনি দিয়েছি। ফের যদি চ্যারিটার কথা জিজ্ঞেস করো তা হলে ভাল হবে না।”

মার্থা ইংরিজী সাহিত্য পড়ে। ওর বাবা থাকেন নিউইয়র্কে, মা শিকাগোতে। বিয়ে ভেঙে বাবা এবং মা আবার বিয়ে করেছেন। দু'দিক থেকে সৎ ভাই এবং সৎ বোন হয়েছে মার্থার। মার্থা বললো, “এবার গরমের ছুটিতে বাবার কাছে ছিলাম এক সপ্তাহ, মায়ের কাছেও এক সপ্তাহ। তারপর আমার বয়ফ্রেন্ডের কাছে চলে গিয়েছিলাম। ও সামার প্রোগ্রামে সিয়াটল-এ এক রেস্তোরাঁয় ওয়েটারের কাজ করছিল। তা দু'জনে মিলে বেশ রোজগার করা গেলো। মাইনে তেমন বেশি নয়, কিন্তু সিয়াটল-এর লোকরা খুব দিলদরিয়া। ভাল বকশিস দেয়। প্রথম মাসে আমরা প্রত্যেকে তিন'শ ডলার টিপ্‌স থেকে পেয়েছি।”

মার্থা বললো, “টাকাটা আমরা নষ্ট করছি না।”

খুকু কফির কাপ নামিয়ে দিয়ে বললো, “টাকা তোমাদের খরচ করলে কেমন করে চলবে? তোমরা বিয়ে করে সংসার পাতলে টাকাটার দরকার হবে।”

মার্থা এবার ঘড়ির দিকে তাকালো। খুকু বললো, ‘মার্থা, তুমি সময় নষ্ট কোরো না। বব তোমার ফোনের জন্য অপেক্ষা করবে। তোমার সাফল্য কামনা করি।”

মার্থা কোনোরকম লজ্জা না করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো ফোনে বয় ফ্রেণ্ডের সঙ্গে সান্ধ্যকালীন প্রেমালাপের জন্যে।

খুকু বললো, “কারা যে ভাল আছে—আমাদের দেশের মেয়েরা, না এরা, বুঝি না।”

“কেন?” আমি প্রশ্ন করি।

“এই যে ‘নিজের বর নিজে খোঁজ’ পশ্চিমী পদ্ধতি এতে মেয়েদের ওপর বড়ো ধকল হয়!”

“বলিস কী? আমার ধারণা ছিল, গণ-ভোট নিলে আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা এখন বিবাহ ব্যাপারে স্বাবলম্বী হবার পক্ষেই মত দেবে।”

জিনিসটার অনেক দিক ভেবে দেখবার আছে। এই বেচারা মার্থার অবস্থা

দেখো না। কোথায় পরীক্ষার পড়া তৈরি করবে, তা নয় চললো ফোনে বয়ফ্রেন্ডের মনোরঞ্জন করতে। প্রেমের একটা বিচিত্র অঘোষিত যুদ্ধ ক্যামপাসে সর্বদা চলেছে।”

“যুদ্ধ? বলিস কি।”

“যুদ্ধ ছাড়া আর কী বলবে মামা? জীবনমরণ প্রশ্ন। তুমি নিজে ভাল করে দেখো—তোমার মজা লাগবে। তাছাড়া যারা পুরোপুরি প্রেম করে বিয়ের পক্ষে তারা কিছু ভাববার খোরাক পাবে তোমার লেখা থেকে।”

মার্থা ইতিমধ্যে ফোন সেরে ফিরে এলো। খুকু বললো, “এত তাড়াতাড়ি?”

মার্থা বেশ গম্ভীর। কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে এরা আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের মতো চাপা নয়। মার্থা বললো, “চ্যারিটা, ববের কথায় মনে হলো সে একটু অধৈর্য হয়ে রয়েছে। কোথায় যেন বেরুতে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় ফোন এসেছে। আমি বুঝিয়ে দিলুম, তার যদি লম্বা ফোন করবার ইচ্ছে না থাকে আমারও তেমন মাথাব্যথা নেই।”

মার্থার মুখ-চোখ দেখে মনে হলো সে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছে। খাতার পুরনো পাতা থেকে সে কী যেন খুঁজতে লাগলো।

খুকু জিজ্ঞেস করলো, “কী খুঁজছো? ওই ডাচ ছোকরা লুসিংকের নম্বর?”

মার্থা বললো, “বেচারা সেদিনও আমাকে ডেটিং-এর প্রস্তাব দিয়েছিল, আমি বলেছিলাম পরে জানাবো। আমি ভেবেছিলাম বব ছাড়া আর কারও ডেট নেবো না।”

মার্থা আমার দিকে তাকিয়ে বললো, “আশা করি তোমাকে বিব্রত করছি না। আমার বান্ধবীর কাছে শুনেছি—এই ব্যাপারে গুরুজনের সামনে আলোচনা করা তোমাদের দেশে শোভন নয়।”

আমি বললাম, “আমি মোটেই বিব্রত নই। বরং আপনার ঘরে বসে আপনার গোপনীয়তা ডিসটার্ব করার জন্যে লজ্জিত।”

মার্থা নতুন টেলিফোন নম্বর নিয়ে আবার বেরিয়ে গেলো।

খুকু বললো, “ডেভিড লুসিংক হল্যান্ড থেকে পড়তে এসেছে এখানে। মার্থার ওপর তার নজর রয়েছে—মার্থা এতোদিন পাত্তা দেয়নি। আজ ওর টেলিফোন পেয়ে অবাক হয়ে যাবে।”

খুকু আমাকে বসতে বলে এক মিনিটের জন্যে বেরিয়ে গেলো। ফিরে এলো একটি ঝলমলে সোনালী চুলের মেয়েকে নিয়ে। এদেশের যেটা স্বাভাবিক সেই স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য খুকুর এই বান্ধবীর মধ্যেও রয়েছে। খুকু বললো, “আমার এই বান্ধবীর নাম হেলেন মিড।”

হেলেনের চোখে চশমা দেখে অবাক হলাম—সবাই তাহলে কনট্যাক্ট

লেন্সের দলে এখনও যায়নি। হেলেনের চোখ দুটো দেখলেই বোঝা যায় মেয়েটি একটু ভাবুক প্রকৃতির।

হেলেন বললো, "আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য আপনার ভাগ্নীকে অনুরোধ করেছিলাম। ভারতবর্ষের মানুষের সঙ্গে আলাপের সুযোগ পেলে আমার খুব আনন্দ হয়।"

হেলেন সাধারণ এক রঙা ফ্রক পরেছে। চুলটা আলগোছাভাবে খোঁপা করা, অনেকটা আমাদের দিশি কায়দায়।

'আপনার সঙ্গে আলাপ করার একটা উদ্দেশ্য আছে আমার। কিন্তু সেটা পরে বলবো। তার আগে আপনি বলুন, এদেশের পুরুষ ও নারী সম্বন্ধে আপনার কীরকম অভিজ্ঞতা হচ্ছে?"

হেলেনের প্রশ্নের ধরনটাই আলাদা। প্রশ্নের মধ্যেই ওর ব্যক্তিত্ব মেশানো আছে। বললাম, "এক কথায় যে আপনার প্রশ্নের জবাব হয় না তা বুঝতেই পারছেন। এদেশে প্রতি মুহূর্তের অভিজ্ঞতা যে ইন্টারেস্টিং তা বলাই বাহুল্য, কিন্তু এতো সহজে সব বলা যায় না। আপনাদের দেশের কিছু পুরুষ আমি স্বদেশে দেখেছি। ব্যবসায়, বাণিজ্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানে আপনাদের দেশ মানব জাতির প্রথম সারিতে রয়েছে, তার থেকে প্রমাণিত যে আপনাদের পুরুষরা এই বিষয়গুলো ভাল বোঝেন। আপনি তো জানেন, আজকের যুগে সব দেশকে বিচার করা হয় তার উৎপাদন এবং মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ দিয়ে। এদেশে পুরুষদের জীবনের দেখছি দুটো ভাগ—কীর্তি ও আদর্শ। কর্মক্ষেত্রে তুমি কতখানি কাজের লোক তাই দিয়ে তোমার বিচার হবে—সেখানে আদর্শের কোনো স্থান নেই। কাজেই সেই মানুষটি সংসারে ফিরে এসে তার আদর্শের পরিচয় দিতে পারে—স্নেহ, মায়া মমতা, এসব ছেলেপুলে, স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজনের জন্যে। এ ব্যাপারে কিছু বলবার মতো মতামত এখনও আমার তৈরি হয়নি। তবে মেয়েদের সম্বন্ধে কিছু বলতে পারি।"

হেলেন উৎসাহিত বোধ করলো। 'বলুন, মেয়েদের সম্বন্ধেই তো জানতে চাই।"

আমি বললাম, "অনেকদিন আগে নতুন ভারতবর্ষের অন্যতম স্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ আপনাদের দেশে এসেছিলেন। যিনি সন্ন্যাসী হয়েও এদেশে নারী জাতীয় স্বাধীনতা দেখে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়েছিলেন এবং দেশে গিয়ে বার বার নারীমঙ্গলের কথা বলেছেন। দেখতে ভাল লাগে, মেয়েরা এখানে কত স্বাধীন। ছেলেদের সঙ্গে তারা সব বিষয়ে সমান তালে পা ফেলে চলতে পারে।"

হেলেন এবার ফিক করে হেসে ফেললো। জিজ্ঞেস করলাম, "হাসছেন কেন?"

হেলেন বললো, 'আপনাদের সঙ্গে এ-বিষয়ে অনেক কথা বলার দরকার। চ্যারিটার কাছে আপনাদের সংসারের কথা শুনেছি এবং আপনাকে বলেই ফেলি, আমার ইচ্ছে ভারতবর্ষে যাওয়ার। কারণ, ভারতবর্ষ যে কত বড়ো, প্রায়ই দেখি আপনাদের দেশের লোকেরাই তা জানে না।"

আমি হেলেনের কথা শুনে অবাক। ওইটুকু মেয়ে যে আবার হঠাৎ এমন গম্ভীর হয়ে উঠবে আশা করিনি।

হেলেন বললো, "বন্ধ ঘরের মধ্যে কেন? চলুন, ডর্ম থেকে বেরিয়ে নদীর ধারে গিয়ে কোথাও বসা যাক।"

"বাইরে ঠাণ্ডা লাগবে না তো?" সুচরিতার প্রশ্ন।

জানালার বাইরে রাখা থার্মোমিটারের দিকে তাকিয়ে হেলেন জানালো, "বাইরের অবস্থা গ্লোরিয়াস।"

হেলেন, খুকু ও আমি ওভারকোর্ট হাতে ডরমিটরি থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

গাছে ঢাকা রাস্তাগুলো কর্মক্লান্ত দিনের শেষে হাত পা ছড়িয়ে চোখ বুজে পড়ে আছে। মাঝে-মাঝে হুস করে মোটরগাড়ি চলে যাচ্ছে। অদূরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট লাইব্রেরী বাড়িতে সমস্ত আলোগুলো জ্বলছে। পাশাপাশি আরও অনেকগুলো বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

হেলেন বললো, "ল্যাবরেটরিতে কাজ চলছে। ওখানে ছুটি নেই।"

খুকু বললো, "জানো মামা, হেলেনের একটা কবি মন আছে।"

"তাই নাকি? আমি আগ্রহ প্রকাশ করি। কবিতা লেখে কিনা খোঁজ করি।

"লিখি না—কারণ এদেশের মেয়েরা তো স্বাধীন নয়। আর আপনি তো জানেন, স্বাধীনতা কবির প্রাণবায়ুর মতো।"

আমি একটু অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালাম। হেলেন বোধহয় অমার মুখ দেখে কিছু আন্দাজ করলো। রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে বললো, "শংকর, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো? ঠিক উত্তর দেবেন?"

"সাধ্যমতো চেষ্টা করবো, হেলেন।"

"এই মুহূর্তে আপনি কী ভাবছেন বলুন তো?"

"তোমাকে মিথ্যে বলবো না, তোমাদের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে আনন্দ হচ্ছে। আর ভাবছি, সাধারণ আমেরিকানদের বয়সের তুলনায় একটু অগভীর বলে মনে হতো, সে ধারণা তোমাকে দেখে পাল্টে যাচ্ছে।"

হেলেন বললো, "আপনার মুখে মধু পড়ুক। আমার যে প্রশংসা করলেন তার জন্য সহস্র আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনি যা ভাবছেন তার অর্ধেকও যেন সত্যি হয়।"

খুকু বললো, "হেলেনের পাল্লায় পড়ে আমরা মাঝে মাঝে নৈশ ভ্রমণে বার হই।"

আমি বললাম, "খুব বেশি রাত পর্যন্ত একা একা ঘুরিস না।"

হেলেন হেসে ফেললো। "শংকর আপনার ভাগ্নীর নিরাপত্তা সম্বন্ধে চিন্তিত হবার কারণ নেই। এটা ইউনিভার্সিটি শহর—নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন বা শিকাগো নয়।"

খুকু বললো, "মামা, ওয়াশিংটনে তোমার নিজের কী হয়েছিল? একটা নারী গুণ্ডা তোমাকে তাড়া করেছিল?"

বললাম, "তোকে তো লিখেছিলুম, দিন দুপুরে শনিবারের অপরাহ্নে নিগ্রো অঞ্চল দিয়ে আপন মনে হেঁটে যাচ্ছিলাম—এমন সময় নারী কুস্তিগীর হামিদাবানুর মতো চেহারার একটি গুরুনিতম্বিনী মধ্যবয়সিনী সম্পূর্ণ মত্ত অবস্থায় আমাকে তাড়া করলো।"

খুকু রসিকতা করলো, "তোমাকে দেখে বোধ হয় খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছিল!"

"লক্ষ্য আমার হৃদয় হলে অবশ্যই আনন্দের কারণ ছিল।—কিন্তু শ্রীমতীর লক্ষ্য যে আমার মানিব্যাগ তা বুঝেই প্রাণপণ ছুটতে আরম্ভ করলাম। উল্টোপথে সৌভাগ্যক্রমে এক ঢাকাই ছোকরা আসছিল। আমার অবস্থা দেখে সে তেড়ে আসতে মহিলা বিদায় নিলো—বুঝলো দুই পুরুষের সঙ্গে লড়ে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব হবে না।"

খুকু বললো, "তা দিন-দুপুরে তুমি কী বলে ছুটতে আরম্ভ করলে—মহিলার মনোবাসনা ঠিকমতো না জেনে?"

"ইন্দো পাকিস্তানী ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা চুক্তির সুফল উপভোগ করে যখন মনে ভরসা এলো, তখন ভালো করে মহিলার দিকে তাকালাম; ওই রকম ফোলা বেলুনের মতো চেহারা সচিত্র রামায়ণের তাড়কাবধ পর্ব ছাড়া কোথাও দেখিনি।"

"ছুটেছি বলে তুই হাসছিস। কিন্তু আমার বিপদের বন্ধু সামসুদ্দিন ভাই সাহেব একটুও হাসেননি। কারণ এ তো আর কলকাতার রাস্তা নয় যে আত্মরক্ষার্থে একটা কিছু ছুঁড়ে মারবো। যা চকচকে রাস্তা—কোথাও একটুকরো ইঁট পর্যন্ত পড়ে নেই।"

হেলেন ও খুকু তখন খুব হাসছে। "সামসুদ্দিন সাহেব আমাকে বিপন্মুক্ত করে যেমনি শুনলেন আমি বঙ্গসন্তান তেমনি ওঁর ভালবাসা ঝরে পড়তে লাগল। কিছুতেই ছাড়লেন না, জোর করে নিরাপদ অঞ্চলের এক ড্রাগ স্টোরে নিয়ে গিয়ে তুললেন।"

"কেন, তোমার গা-হাত পা ছড়ে গিয়েছিল নাকি? সে কথা তো লেখোনি।" খুকু জানতে চায়।

বললাম, "আমি যেভাবে হাঁপাচ্ছিলাম তা দেখলে তোরা হয়তো কোরামাইন কিনতিস। কিন্তু ভাগ্যে এখানকার ড্রাগ স্টোরে ওষুধটা নিমিত্তমাত্র—বই থেকে

বড়া সব কিছুই পাওয়া যায়। সামসুদ্দিন ভায়া আমাকে কফি খাওয়ালেন।"

হেলেন বললো, "এদের সঙ্গেই না আপনাদের বিরাট যুদ্ধ হয়ে গেলো?"

"যুদ্ধ হয়ে গেলো বলে ভাই-এর বিপদে ভাই দেখবে না? আমার বাবা মফঃস্বল কোর্টের উকিল ছিলেন। সেখানে দেখেছি—দু'ভায়ে মামলা হলো। কিন্তু টিফিনের সময় বড়ো ভাই মিষ্টির দোকানে জলখাবার খেতে যাবার আগে ছোট ভাইকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে!"

"তোমার যত বানানো গল্প।" সুচরিতা সংশয় প্রকাশ করলো।

'বানানো নয় রে, দাদু বাবা বেঁচে থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারতিস। আমি তখন তো বাবার সঙ্গে রোজ হাওড়া কোর্টে যেতাম—নিজের চোখে দেখেছি।"

সামসুদ্দিন সেদিন কিছুতেই শুনলো না। আমার কফির দাম দিয়ে দিলো। বললো, "দাদা, আমরা ব্যাংগলি—আমাদের ব্যাংগলির মতো থাকতে দিন। আমেরিকান মিঞাদের পয়সা অনেক, তবু বাপের কাজ করে দিলেও ওরা পয়সা আদায় করে।

হেলেন বললে, "ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। আপনি বলে যান।"

আমি বললাম, "সামসুদ্দিন ঢাকায় কোন ফ্যাক্টরির লেবার অফিসার। একেবারে কট্টর বাঙালি। মার্কিনীদের ওপর তেমন প্রসন্ন নয়। তিনি বললেন, "দাদা, আপনাকে কী বলবো—অদ্ভুত দেশ, এখানে সাবধানে থাকবেন। আপনাকে প্যাঁচে ফেলবার জন্য চারদিকে ফাঁদ পেতে রেখেছে।"

"মানে?" আমি প্রশ্ন করেছিলাম।

"পয়সা আর সেক্স দিয়ে সর্বদা সুড়সুড়ি দিচ্ছে। কাগজের পাতা খুলুন, আধা ল্যাংটা মেয়েরা আপনার দিকে তাকিয়ে আছে। দোকানের শো-রুমে, সিনেমায়, থিয়েটারে, নভেলে, রাস্তাঘাটে সর্বত্র সেক্স। কিন্তু এই সুড়সুড়ি সহ্য করে নিজের কাজ করে যেতে হবে। কোনো লোক যদি সরল মনে উত্তেজিত হয়ে উঠলো—তাহলে হৈ হৈ পড়ে যাবে, কেলেংকারি ছড়িয়ে পড়বে। আপনি বলুন দাদা, এটা কেমন ধরনের সভ্যতা?"

আমি বলেছিলাম, "দিল্লীতেও এই রকম একটা খবর কানে গিয়েছিল। আফ্রিকা থেকে পড়তে আসা এক ছাত্র হঠাৎ পাগল হয়ে গেল। পাগল হবার কারণ আর কিছু নয়—বেচারা সরল সভ্যতা থেকে এসেছে, সেখানে মুখে এক এবং পেটে এক জিনিস নেই। অথচ এই নতুন দেশে সে দেখলো, মেয়েরা নিজেদের আকর্ষণীয় করে তুলবার জন্যে আইন বাঁচিয়ে যতখানি সম্ভব নির্লজ্জভাবে সাজসজ্জা করছে—দেহের ভঙ্গী ও চোখের চাহনিতে সেক্স আকর্ষণ বাড়াচ্ছে। অথচ বেচারা যখন আকর্ষণ বোধ করে কারুর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে যায় তখন মেয়েরা আঁতকে ওঠে। লোকে তাকে অসভ্য জানোয়ার ভাবে।

বেচারা এইসব হিপক্রিসির জন্যে তৈরি ছিল না। মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি চাপবার চেষ্টা করতে গিয়ে বেচারা শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গেলো।"

সামসুদ্দিন বললেন, "তাহলে ভাবুন দাদা, এসব তো আমাদের মধ্যে ছিল না। বাঙালি মেয়েরা কোনোকালে এক গজ কাপড়ে তিনখানা ব্লাউজ বানিয়েছে? এসব শিক্ষা বিলেত-আমেরিকা থেকে রপ্তানি হচ্ছে যাতে আমাদের সংস্কৃতি নষ্ট হয়ে যায়।"

সামসুদ্দিন আরও যা বলেছিলেন তা শুনতে হেলেন আগ্রহ প্রকাশ করলো। বললাম, "কফি খেতে খেতে সামসুদ্দিন বলেছিলেন, আমি হয়তো বোকা বাঙাল, তাই বুঝি না। কিন্তু দাদা, যতই গরীব হোক, আমাদের দেশে যদি কেউ বলে, আসুন দোকানে একটু চা খাওয়া যাক—তার মানে, যে-আমাকে দোকানে যেতে বলছে সে-ই আমার চায়ের দাম দেবে। কিন্তু দাদা, এখানে তো আমি তাজ্জব! একজন আমেরিকান সহকর্মী আমাকে খাওয়াতে নিয়ে গিয়ে দেখি শুধু নিজের খাবারের দামটা বার করে দিলো। আমার তো কান লাল হয়ে ভয়ঙ্কর অবস্থা। এরকম অপমান দাদা জীবনে কখনও হইনি। রাতে ঘুম আসে না। শেষে আমাদের হোস্টেলেই চ্যাটার্জিবাবু ছিলেন। উনি সব শুনে বললেন, 'সামসুদ্দিন, এখানে ইংরেজী কথাগুলো মন দিয়ে শুনবে। জানো তো ইংরেজী ভাষাটা ডেনজারাস—দু'মুখো সাপের মতো—একই কথার দশটা মানে হতে পারে। মনের ভাব চেপে রাখবার জন্যই এই ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল। তোমাকে ছোকরা কি বলেছিল?—'আমার সঙ্গে লাঞ্চে চলুন' না 'আপনাকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করছি।' আমি বলেছিলুম, হয়তো প্রথমটাই বলেছিল। কিন্তু তাহলেই কি সব দোষ মাপ হয়ে গেলো?"

সামসুদ্দিনকে আমি বোঝাবার চেষ্টা করছিলাম, প্রত্যেক দেশে সৌজন্য ও ভদ্রতার কতকগুলো বৈশিষ্ট্য থাকে, সেই অনুযায়ী মার্কিনীরা হয়তো পরের বোঝা হতে চায় না। মার্কিনীরা অত্যন্ত সদাশয় বন্ধু হতে পারেন—তাঁরা যখন বাড়িতে নিয়ে গিয়ে অতিথি সৎকার করেন তার তুলনা নেই, আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি।

সামসুদ্দিন ভাই সাহেব কিন্তু আমার উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন না। বললেন, "দাদা, এদের গোড়ার কথাই হলো, হিজ-হিজ হুজ হুজ—যে যার সামলাও। ফেলো কড়ি মাখো তেল, তুমি কি আমার পর?"

সামসুদ্দিন সেদিন আর একটি মূল্যবান বুদ্ধি দিয়েছিলেন। আমি বলছিলাম, "আজ যা ফাঁড়া গেলো—তাতে পকেটে পাশপোর্ট বা টাকাকড়ি নিয়ে বেরনো নিরাপদ হবে না। এবার থেকে এগুলো হোটেলে রেখে রাস্তায় বেরুতে হবে!"

সামসুদ্দিন আমার কথা মন দিয়ে শুনে বললেন, "পাশপোর্টটা কাছে রাখবেন

না—কিন্তু দোহাই পকেটে পাঁচটা ডলার অন্তত রাখবেন। কোনো গুণ্ডা, সে পুরুষই হোক আর মেয়েই হোক, যদি আপনাকে কব্জা করে দেখে পকেটে পাঁচটা ডলারও নেই, তাহলে রাগের মাথায় খুন করে বসতে পারে। জানেন তো, এদেশে সময়ের দাম কত। গুণ্ডার সময় নষ্ট করলেও আপনাকে খেশারত দিতে হবে!"

হেলেন জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কি সামসুদ্দিনের উপদেশ মেনে চলেছেন?"

স্বীকার করতে হলো, "নিউ ইয়র্ক এবং শিকাগোতে বেশি রাত্রে ঘুরে বেড়ানোটা খুব নিরাপদ মনে হতো না—এবং বন্ধু-বান্ধব সবাই সান্ধ্য ভ্রমণের বিরুদ্ধেই মত দিতেন।"

'ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন। আপনি পৃথিবীর সমস্ত শক্তির কেন্দ্র ওয়াশিংটনে এসেছেন ; সমস্ত সম্পদের মক্কা নিউ ইয়র্কে আছেন—অথচ আপনার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সম্বন্ধে আপনি সুনিশ্চিত নন। অথচ আমরা আমাদের সভ্যতার গর্ব করি।" হেলেন বেশ দুঃখের সঙ্গেই বলে উঠলো।

আমি বললাম, "এতে কর্তৃপক্ষের কোনো হাত নেই—তাঁরা তো চেষ্টার ত্রুটি করেন না।"

"স্বীকার করছি চেষ্টা হয়—কিন্তু কে না জানে এই দেশে আমরা চেষ্টা দিয়ে মানুষের বিচার করি না, ফল দিয়ে করি।"

খুকু বলল, "মামা, আমরা অহেতুক সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছি।"

আমি বললাম, "খুকু, তোমার সঙ্গে আমি একমত। গুণ্ডা ছাড়াও আরও অনেক কিছু আলোচনার বিষয় রয়েছে। হেলেন আপনাকে একটা কথা বলে রাখি—আপনাদের অনেক দোষ থাকতে পারে, কিন্তু যতদূর জানি পৃথিবীর কোনো জাতই নিজেদের দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে এতটা ওয়াকিবহাল নয়। কোন দেশেই নিজেদের দোষ সম্বন্ধে এমন নির্দয় বিশ্লেষণ হয় না।"

খুকু বললো, "রাজনৈতিক দিক থেকে ভারতবর্ষ এ-বিষয়ে কম যায় না—তবে সামাজিক ও পারিবারিক ব্যাপারে আমরা এখনও নিজেদের সমালোচনা করতে তেমন অভ্যস্ত হইনি।"

হাঁটতে হাঁটতে আমরা নদীর ধারে এসে পড়েছি। সিঁড়ি ভেঙ্গে জলের কাছে নেমে এসে আমরা ঘাসের ওপর বসে পড়লাম। অদূরে কয়েক ডজন যুবক-যুবতী জোড়ে জোড়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে আছে। কেউ ফিস ফিস করে কথা বলছে, কেউ গুন গুন করে গান গাইছে—কেউবা আকাশের দিকে মুখ করে পাশাপাশি শুয়ে আছে।

হেলেন বললো, "আমি মাঝে মাঝে এইখানে এসে লেখাপড়া করি।

দুপুরবেলায় নদীর ধারে বসে বই পড়তে আমার খুব ভাল লাগে।”

হেলেন বললো, “আপনি একটু আগে বলেছিলেন এই দেশে মেয়েরা স্বাধীনতা উপভোগ করে—কথাটা যদি সত্যি হতো, তাহলে খুব ভাল হতো।”

আমি বললাম, “আপনারা কেমন স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ান। আপনাদের হাতেই শুনেছি দেশের বেশির ভাগ টাকাকড়ি রয়েছে—ছেলেরা তাই আপনাদের খাতির না করে পারে না। আপনারা দেখি একা-একা ফ্ল্যাট নিয়ে আছেন—আপনাদের রক্ষে করবার জন্যে মায়েরা সব সময় উৎকণ্ঠিতা নন। আপনাদের বিয়েতে পাত্রপক্ষকে যৌতুক দিতে হয় না—স্বামীর বাবা-মা আপনাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন না।”

হেলেন বললো, “লিষ্টি আর বাড়াবেন না। আপনি যত ফিরিস্তিই দিন, আপনার ভাগ্নীকে দেখে মনে হয় আপনাদের দেশে নতুন নতুন যুগের মেয়েরা আমাদের থেকে স্বাধীন।”

“এ আপনি কি বলছেন! আমি অবাক হয়ে যাই।”

হেলেন বললো, “আপনি দেশে গিয়ে বললেন, একজন আমেরিকান ছাত্রী নিজে আপনাকে বলেছে—মার্কিন দেশে মেয়েরা এখনও পুরুষের মুখ চেয়ে আছে। এখনও পুরুষরাই সর্বক্ষেত্রে জিতছে।”

খুকু বললো, “এ-সম্বন্ধে হেলেনের চিন্তা বেশ স্বাধীন।”

হেলেন বললো, “আপনাদের কাছে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, আপনার ভাগ্নী একটি ছোটখাট জিনিয়াস। পড়াশোনায় আপনাদের দেশে শুধু নয়, এখানেও সে প্রচুর নাম কিনেছে। ওর বুদ্ধির দীপ্তি, ওর মেধা কি আপনার বা আপনার বোনের দুশ্চিন্তায় কারণ?”

“দুশ্চিন্তার কারণ হবে কেন? বরং আমরা সবাই গর্বিত। খুকু যখন বিদেশে আসবার ব্যবস্থা করলো তখন ওর মা-বাবার কত আনন্দ। আমরাও সাধ্যমত ওকে উৎসাহ দিয়েছি। শুধু আমরা কেন, আমাদের আত্মীয়স্বজন, খুকুর সহপাঠী ও সহপাঠিনী এবং অধ্যাপকরা গর্ব বোধ করেছেন। আপনাকে বলতে লজ্জা নেই, খুকু আজকের ভারতবর্ষে খুব একটা দুষ্প্রাপ্য নিদর্শন নয়—মেয়েরা নতুন স্বাধীনতার উৎসাহে অথবা নিজেদের নিষ্ঠায় এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেদের মুখে চুনকালি দিচ্ছে। তারা বহু বিষয়ে প্রথম হচ্ছে—ফাস্ট ক্লাশের তালিকায় ছেলেরা এখন মেয়েদের সঙ্গে পেরে উঠছে না। এবং এতে আমরা আশ্চর্য হচ্ছি না। বরং আমাদের মেয়ে, ভাগ্নী বা বোনদের এই কৃতিত্বে খুশী হচ্ছি। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন লেডি ডাক্তার দর্শনীয় বস্তু ছিলো—এখন এমন অবস্থা হচ্ছে যে মেডিক্যাল কলেজে খুব শিগগিরি পুরুষ ছাত্রই দর্শনীয় বস্তু হয়ে উঠবে। শুধু হাসপাতাল কেন? আদালতেও মেয়েরা ঢুকে পড়েছে। মার্চেন্ট অফ ভেনিসের

পোর্সিয়া আর গল্প নয়—আমার এক দিদি হাইকোর্টে বেশ ভাল পসার করেছেন। দিদির কাছেই আধ ডজন মেয়ে উকিল শিক্ষানবিশী করছে—তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, তারা মেয়েদের পেশায় বিশ্বাস করে। পেশায় নজর দিলে বিবাহিত জীবন যে বেনো জলে ভেসে যাবে তা মোটেই মনে করে না।”

হেলেন বললো, “আপনাকে উদাহরণ দিতে হবে না। আপনাদের সেরা উদাহরণ, এতো বড়ো দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে একজন মেয়েকে স্বাভাবিকভাবে বসাতে পেরেছেন, অথচ তা নিয়ে কেউ নাচানাচি করে না। আপনারা যে জাপানীদের মত ‘ইকনমিক অ্যানিমাল’ বা অর্থনৈতিক জন্তু নন ; ব্যবসায়িক বুদ্ধি প্রবল হলে আপনারা এই নারী স্বাধীনতার ফলাও বিজ্ঞাপন করে পর্যটকদের কাছে থেকে কোটি কোটি ডলার তুলতে পারতেন। এর জন্যে আমি অবশ্য একটুও উদ্বিগ্ন নই—কারণ বৈদেশিক বাণিজ্যে কে কত মুদ্রা আহরণ করলে তা দিয়ে যাঁরা জাতের বিচার করেন আমি তাঁদের খুব বিচক্ষণ লোক মনে করি না। জাপানীদের থেকে আপনারা যে অনেক বড়ো জাত তা আমার বলার অপেক্ষা রাখে না।”

“হেলেন, তুমি একটু হাসো। তোমার মোহিনী মায়াজাল মামার ওপর একটু বিস্তার করো।” সুচরিতা এবার ফোড়ন দিলো।

“তোমার চোখের সামনে তোমার মামার ওপর মায়াজাল বিস্তার করলে তোমার মামীমার হয়ে তুমি আমার মাথায় লাঠি মারবে। ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে স্বাধীনভাবে কথা বলে আমি আনন্দ পাই। এদেশে কোনো ছেলের সঙ্গে স্বাধীনভাবে কথা বলা যায় না—কারণ স্ত্রী-জাতির কাছে এদেশের যুবসমাজ মস্তিষ্ক আশা করে না। যে মেয়ের মাথায় ঘিলু আছে এদেশে তার সমূহ দুর্গতি।”

হেলেন প্রশ্ন করল, “স্টেটসে মেয়েদের স্বাধীনতা নেই কথাটা আপনার মনঃপুত হচ্ছে না বুঝি।”

“শুনে যে একটু অবাক হচ্ছি, তা অস্বীকার করি কী করে?”

হেলেন হাসলো। ওর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে বললো, “আমাদের এই ইউনিভার্সিটি টাউনে যে কয়েক হাজার মেয়ে দেখছেন এরা এখানে কেন এসেছে বলুন তো?”

“লেখাপড়া শেখার জন্যে, ডিগ্রি পাবার জন্যে।” আমি উত্তর দিই।

হেলেন এবার দুঃখের সঙ্গে বললো, “কথাটা যদি সত্যি হতো তাহলে আমার কিছু বলার থাকতো না। আমার কাছে জেনে যান, ডিগ্রী পাবার থেকেও একটা বড়ো উদ্দেশ্যে রয়েছে—সেটি হলো একটি মনের মতন স্বামী যোগাড় করা।”

আমি হেলেনের মুখের দিকে তাকালাম। হেলেন একটুও বিচলিত না হয়ে বললো, “আপনার ভাগ্নী তো অ্যানথ্রপলজিস্ট—মানবসমাজ নিয়ে ওর কাজ-

কারবার—ওকে জিজ্ঞেস করুন।”

সুচরিতা বললো, “কথাটা বোধ হয় মিথ্যে নয়, মামা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বৃহদায়তন প্রজাপতি-অফিস। ভাল জামাই পাবার লোভে মেয়ের বাবারা কষ্ট করেও অনেক সময় মেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান।”

হেলেন বললো, “আপনারা নিশ্চয় চ্যারিটাকে যখন কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে পাঠিয়েছিলেন তখন বলে দেননি, একটি মনের মতো পুরুষমানুষ পাকড়াও করা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার অন্যতম কাজ হবে।”

আমি হেসে সুচরিতাকে জিজ্ঞেস করি, “সে রকম কোনো গোপন নির্দেশ তোকে দেওয়া হয়েছিল? আমি তো জানি, তাজুদির মোটেই ইচ্ছে ছিল না যে, ব্যাটাছেলেদের সঙ্গে তুই পড়িস। তোকে তো তাজুদি বলেছিল, মনে রেখো কলেজটা পড়বার জায়গা। যদি কোনোরকম বদনাম কানে আসে তাহলে আমাকে গলায় দড়ি দিতে হবে।”

হেলেন বললো, “এখানে মেয়েদের মধ্যে গোপন ভোট নিন—ভাল বর চাই না ডিগ্রী চাই? দেখুন কী ফল হয়।”

সুচরিতা বললো, “মামা, তোমার মনে আছে, রাঙা মাসিমা আমাদের বলতেন, মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছো—তখন বি-এ হও এম-এ হও বেথুনবিউটি হও আর নূরজাহান হও অল ইকোয়াল-টু বর।”

হেলেন উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। “আমেরিকান মেয়েদের মনের কথাই তোমার মাসিমা চমৎকারভাবে বলেছেন। তুমি যাই হও, সব নির্ভর করছে বর কী রকম তার ওপর। তোমাদের সঙ্গে তফাৎ, বর খোঁজার দায়দায়িত্ব বাবা মায়ের—এখানে বাবা-মা তোমাকে একটু আধটু উপদেশ দিতে পারেন, সুযোগ থাকলে যে-সব জায়গায় ভাল বর পাবার সম্ভাবনা আছে সে রকম কোনো কলেজে পাঠাতে পারেন। কিন্তু তোমার মাছ তোমাকেই ছিপে তুলতে হবে—এবং এই গুরুতর দায়িত্ব পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে পালন করতে হবে। যে-রাঁধে তাকেই চুল বাঁধতে হবে—পড়তে হবে এবং স্বামীও খুঁজতে হবে।”

বললাম, “কথাটা ছেলেদের সম্বন্ধেও খাটে। আমাদের দেশের ছেলেরা জানে—পড়াশোনা করে যে ভাল বউ পায় সে।”

হেলেন আমার ছড়াটা পছন্দ করলো। গালে হাত দিয়ে সে বললো, “আপনার বক্তব্যের উত্তর দিচ্ছি—কিন্তু তার আগে আপনাকে ছড়াটার জন্যে ধন্যবাদ জানাই।”

“ধন্যবাদ যখন জানালেন, তখন একটা ছোট্ট ঘটনা বলি। জানিস, খুকু, কলকাতার এক নামকরা মেয়ে-কলেজের ছাত্রীরা একবার বোটানিক্যাল গার্ডেনে চড়ুইভাতি করতে গিয়েছিল। মেয়েরা দল বেঁধে খেলাধুলো করছে। কিছুক্ষণের

মধ্যেই কিছু ছোকরা জুটে গেলো। কোনো ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে তারা পিকনিক করতে এসেছিল। ছোকরাদের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে মেয়েরা ওদের লিডার এক বয়স্থা অধ্যাপিকার কাছে অভিযোগ জানালো। অধ্যাপিকা ছোকরাদের বেশ কিছু কথা শুনিয়ে দিলেন। তাঁর খবরদারিতে ছেলেদের রণে ভঙ্গ দিতে হলো। মেয়েরা তখন মিটমিট করে হাসছে। একজন ছোকরা তখন সেই দিকে তাকিয়ে বললো, 'ঠিক হ্যায়, যাচ্ছি! সামনের বছরে ফাইনাল পরীক্ষায় পাশ করি—তখন তোমাদেরই বাবারা গিয়ে আমাদের জন্যে পায়ে ধরবে।"

হাসিতে ফেটে পড়ে সুচরিতা জিজ্ঞেস করলো, "হেলেন, তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছো?"

"খুব পারছি। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশকরা ছেলেদের তোমাদের দেশে কত দাম তা বোঝা যাচ্ছে!"

হেলেন এবার ব্যাগ থেকে চকোলেট বার করে আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, "চ্যারিটা, নির্ভয়ে খাও—লো-ক্যালরি স্পেশ্যাল চকোলেট, এতে ওজন বাড়বে না।"

চকোলেট চুষতে চুষতে সে বললো, "শংকর, আপনি যে কথা আগে বলেছিলেন তার উত্তর দিই। ছেলেদের ভাবী বউ নির্বাচনের চেষ্টা করতে হয় সত্যি কথা। কিন্তু ছেলেরা জানে—যতদিন খেলানো যায়, যতদিন বিয়ে নামক বস্তুটি পিছিয়ে রাখা যায়, ততদিনই মজা। আর মেয়েরা বিয়ের জন্যেই প্রেম করতে চায়—তাদের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। ছেলেদের অনেক সুবিধে।"

আমি বললাম "ম্যাক্সমূলর সম্বন্ধে এক গল্প শুনেছিলাম। যৌবনে এই জার্মান পণ্ডিত বহুদিন ধৈর্য্য ধরে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এক ইংরেজ সুন্দরীর কৃপাদৃষ্টি লাভ করেছিলেন। পরে পরিণত বয়সে তিনি তাঁর ছেলেকে পত্নী সন্ধান সম্পর্কে লিখেছেন, এবার তুমি একটি বধূর জন্যে উঠে পড়ে লাগো... মনে রেখো, পরীক্ষায় ভালো ফলের জন্যে তুমি যেমন পরিশ্রম করছো, সুন্দরীদের নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্যেও তোমাকে সেই নিষ্ঠা দেখাতে হবে।"

হেলেন বললো, "যুগটা বোধহয় ঊনবিংশ শতাব্দী এবং দেশটা নিশ্চয় আমেরিকা নয়। এখানকার পুরুষমানুষরা আজকাল বেশ হুঁশিয়ার, নিজের বাজার দর সম্পর্কে তারা বেশ খবরাখবর রাখে!"

খুকু বললো, "মেয়েরা সত্যিই এখানে খুব উচ্চাভিলাষী নয়। কেউই মাদাম কুরী বা ইন্দিরা গান্ধী হতে চায় না। তারা বলে, রক্ষে কর। প্রতিভাময়ী মেয়ে হলে কেউ আমাকে বিয়ে করতে চাইবে না। আমাকে বেচারা আন্টি সুশানের মতো চিরকুমারী থাকতে হবে! সবাই আমার মাথার প্রশংসা করবে কিন্তু কেউ

প্রেম করতে চাইবে না। তার থেকে আমি বরং সেক্রেটারী হবো—হার্ভার্ডের গ্রাজুয়েট কার্তিকের মতো ছেলের সঙ্গে আংটি বদল করবো, বিয়ের পর তার আদরযত্ন করবো—দুই ছেলে ও এক মেয়ের মা হবো এবং ওদের নিয়েই ব্যস্ত থাকবো। রক্ষে করো, আন্টি সুশানের মতো আইবুড়ো রয়ে গেলে—একলা অ্যাপার্টমেন্টে থাকতে হবে, লোকে আড়ালে হাসাহাসি করবে।"

হেলেন জানালে "চ্যারিটা যা বলছে তা মোটেই বাড়ানো নয়। ব্রেন থাকলেই মেয়েদের মুস্কিল—সেই রকম মেয়ের সঙ্গে ছেলেরা ডেট করতে চায় না। অনেক মেয়ে সেই জন্যে অঙ্ক নেয় না। অঙ্কে ভাল মেয়েদের কাছে ছেলেরা ইনফিরিয়ারিটি কমপ্লেক্সে ভোগে। আমার এক বান্ধবী ইংরিজী কমপোজিসন পড়ে। বেচারা জানতো না, ডেটিং-এর দিনে সরল মনে ছেলে-বন্ধুকে নিজের সাবজেক্ট বলে বসেছে। তারপর থেকে ছেলেটার খবর নেই। চিঠি দেবে বলেছিল, কিন্তু চিঠি আসে না। খবর নিয়ে জানলো—ইংরিজী সাহিত্য পড়লেও বা কথা ছিল, ইংরেজী কমপোজিসন পড়া মেয়েকে প্রেমপত্র লেখা নিরাপদ নয়—হয়তো ডজনখানেক বানান ভুল, ব্যাকরণ ভুল এবং প্রয়োগ ভুল বার করে মনে-মনে হাসবে। কোনো পুরুষমানুষই মেয়েদের কাছে ছোট হতে চায় না।"

"তারপর?" আমি প্রশ্ন করি।

"বান্ধবী ঠেকে শিখলো। তারপর ডেটিং-এ ছেলে-বন্ধুকে বলে, ইংরিজী সাহিত্য পড়ি। প্রেম একটু জমে উঠতেই আর এক বান্ধবীর পরামর্শ মতো মোক্ষম চাল দিলো। প্রেমপত্র লিখলো একখানা, যার মধ্যে ইচ্ছে করে তিনটে-চারটে বানান ভুল হলো। পরের ডেটিং-এ বয় ফ্রেন্ড বললো, হনি তোমার চিঠি পেলাম। চিঠিটা বুকে করে রেখেছি। কিন্তু তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হিসেবে বলছি, তোমাকে বানান সম্বন্ধে সাবধান হতে হবে, হাজার হোক ইংরিজী সাহিত্য পড়ছো তুমি। বান্ধবী অভিনয় করলো—লজ্জায় যেন তার কান লাল হয়ে উঠলো। বয়-ফ্রেন্ড তারপর চিঠিটা বার করলো। দেখা গেলো চারটে ভুলের মধ্যে মাত্র দুটো ধরতে পেরেছে সে। তারপর ছোকরা খুব উপদেশ দিয়ে বান্ধবীকে লম্বা চিঠি লিখেছিল। সে চিঠি আমি দেখেছি—যেমন বিশ্রী হাতের লেখা, তেমনি অজস্র বানান ভুল। বান্ধবী সব বুঝছে, কিন্তু ছেলেটি পাত্র হিসাবে খারাপ নয়—এমন বর হাতছাড়া করা যায় না। ওরা বিয়ে করে ফেলেছে। সামনের উইন্টারে ওরা প্রথম সন্তান আশা করছে।"

আমি বললাম, "আমাদের দেশে বিয়ের বাজারে পয়সা এবং পাত্রের রোজগার প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণী পাওয়া মেয়ের স্বামী নির্বাচনে অধ্যাপক থেকে বার্মিংহাম ফেরৎ কারিগরের কদর বেশি। পাত্রের চার অঙ্কের মাইনে হলে, সুন্দরীর মধ্যবিত্ত পিতামাতা সর্বপ্রকার শিক্ষাগত দোষ ক্ষমা

করতে রাজী আছেন!"

হেলেন বললেন, "সম্বন্ধ-করা এসব চলতে পারে—কিন্তু আমরা ভাবি, একমাত্র অসভ্য বন্যরা পরস্পরকে না জেনে বিয়ে করে। আপনি ভুলে যাবেন না, মিস মেয়ো যিনি মাদার ইন্ডিয়া বইতে আপনাদের দেশ সম্বন্ধে কুৎসা রটিয়েছেন তিনি আমেরিকান ছিলেন।"

খুকু বললো, "মামা, তুমি হেলেনের কথাগুলো মন দিয়ে শোনো—তোমার কাজে লাগবে।"

হেলেন বললো, "আমি যা বলছি সে সম্বন্ধে এনথ্রপলজিস্টরা কিছু কিছু রিপোর্ট তৈরি করেছেন—সেখানেও একই কথা পাবেন। আমার কথাই ধরুন। যখন হাই ইস্কুলে পড়ি তখন বাবা মা দাদা সবাই চায় আমি যেন পরীক্ষায় ভাল করি, না হলে নামকরা কলেজে ভর্তি হতে পারবো না। এদিকে বলছে পড়ো পড়ো। আর একদিকে আমাদের পাড়ার একটি রাঙা পলাশ ফুলের প্রশংসায় তাঁরা পঞ্চমুখ : জেন কী সুন্দরভাবে সাজে! জামা কাপড়ে কী রুচি। ছেলেমহলে জেনের কী জনপ্রিয়তা! আমি কি নিজের সৌন্দর্য সম্বন্ধে আর একটু সাবধানী হতে পারি না? অর্থাৎ ওঁরা চান, আমি একই সঙ্গে ইভ কুড়ি এবং এলিজাবেথ টেলর হই।"

"এটা বেশ ভালই বলেছেন হেলেন।"

হেলেন বললো, "এই তো শুরু। আরও আছে। মাদাম কুরি ও লিজ টেলরের টাগ-অফ-ওয়ার এখনও চলছে। কাকা সাধারণতঃ রবিবারের সকালে লং ডিসটেল ফোনে কথা বলেন। কাকা এখান থেকে হাজার মাইল দূরে থাকেন। টেলিফোনে কাকার প্রথম প্রশ্ন, শনিবার রাত্রে কোনো ছেলের সঙ্গে বেরিয়েছিলাম তো? আমার উত্তর শুনে কাকার কী রাগ। 'ছোট্ট সোনা, তুমি আর খুকুটি নেই, তোমার যৌবন এসেছে। তুমি এ কি বোকামি করছো—কলেজের দুটো প্রশ্নের উত্তর লেখবার জন্যে শনিবার ডরমিটরিতে পড়ে থাকলে। না সোনা, আর যেন কখনও এমন না শুনি।"

হেলেন বললো, "তারপরেই বাবার ফোন। বাবা আমাকে পড়াশোনায় খুব উৎসাহ দেন। "খুকু, প্রত্যেক পেপারে 'এ' পেতে হবে। কলেজ আর ক'দিন? ছেলেদের সঙ্গে পার্টিতে যাবার সময় তো সারা জীবনই পাবে।"

মার হাতে ফোন দিয়ে বাবা দাড়ি কামাতে চলে যান। মা বলেন, "খুকু, তোমার বাবা সংসারের কিছু বোঝে না। মেয়েদের সমস্যা কোনো ছেলেরই মাথায় ঢোকে না। পড়াশোনায় তুমি ফেল করো তা আমি চাই না। কিন্তু এমনভাবে ডুবে থেকো না যাতে মনের মতো ছেলের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর সময় পাওয়া যায় না। তোমার কাছে কিছুই চেপে রাখি না, সুতরাং

শোনো—পড়াশোনায় অতি ভাল হলে তখন মনে হবে কোনো ছেলেই তোমার যোগ্য নয়। প্রত্যেক মেয়ে চায় স্বামী তার থেকে গুণে একটু বড়ো হোক। এখনও সময় আছে. ছেলেদের কাছে নিজেকে ইন্টারেস্টিং করে তোলো। ছেলেদের সঙ্গে যখন মিশবে তখন খুব আমুদে ভাব দেখাবে, মুখে যেন সব সময় হাসি ফুটে থাকে।"

হেলেন বলে চললো, "আমার মাসিমা চান আমি নিজের বিষয়ে নামকরা পণ্ডিত হই। রবিবারের দুপুরে লাঞ্চের আগে ওঁকে ফোন করতে হয়। মাসিমা বলেন, হেলেন তোমাকে ফোন করে আমি বিরক্ত করতে চাই না। তোমার যখন সময় হবে, তুমি আমাকে কলেক্ট কল করবে।"

সুচরিতা বললো, "কলেক্ট কল জানো তো মামা? এদেশে তুমি ট্রাংক-ফোন করতে পারো, যার টাকা তোমাকে দিতে হবে না। যাকে ফোন করছো, সে দেবে। ফোন তুলে নিজের নাম জানাতে হয় এবং বলতে হয়, অমুককে আমি কলেক্ট কল করতে চাই। অপারেটর সঙ্গে সঙ্গে অপরপক্ষকে জিজ্ঞেস করবে, অমুক জায়গায় অমুক আপনাকে কলেক্ট কলে ফোন করতে চান। তিনি যদি রাজী থাকেন, তাহলে কথা শুরু হয়।"

হেলেন বললো, "মাসিমা চান না ওঁকে ফোন করতে গিয়ে আমার পয়সা খরচ হয়, তাই এই ব্যবস্থা। মাসিমা আমার ফোন পেলেই বলেন, বাছা মেয়েদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার সময় এসেছে। ডবল-বেড-এর মোহে নিজের ব্যক্তিত্ব নষ্ট কোরো না। নিজের পায়ে দাঁড়াও, তারপর ইচ্ছে হলে বিয়ে করে বাচ্চাদের ডায়াপার পরিষ্কার কোরো।"

"এর মধ্যে পথ খুঁজে বার করা সত্যি শক্ত," হেলেনের সমস্যা আমি আন্দাজ করতে পারি।

হেলেনের উত্তর : "যে-সব মেয়ে একেবারে সাধারণ—জোড়া-বিছানাই যাদের লক্ষ্য তাদের তেমন অসুবিধে হয় না। কিন্তু মুস্কিল হয় তাদেরই যাদের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে, চিন্তা করবার ক্ষমতা আছে।"

"মুস্কিলটা কিসের?" আমি প্রশ্ন করি।

"প্রথম মুস্কিল, তারা আকৃষ্ট হয় এমন ছেলের দিকে যারা বিদ্যাবুদ্ধিতে তাদের থেকেও ভাল। কিন্তু এই ধরনের ছেলেরা বিছানায় শুয়ে ইনটেলেকচুয়াল আলোচনা করতে ভয় পায় তাই তাদের নজর সেক্রেটারিদের দিকে। আর সাধারণ ছেলেরা ডেটিং-এর সময় মোরগের মতো মাথা উঁচু রাখতে চায়—পুরুষদের ওইটাই নাকি অধিকার। তাই মেয়েদের বর পেতে হলে বোকা সাজতে হয়। ইউনিভার্সিটির মেয়েদের মধ্যে চ্যারিটার অধ্যাপক কিছুদিন আগে এক গোপন সমীক্ষা করেছিলেন। দেখা গেলো, শতকরা চল্লিশজন মেয়ে স্বীকার

করেছে, বয় ফ্রেন্ডের মন জয় করবার জন্যে তারা কোনো-না কোনো সময়ে বোকা সেজেছে। পরীক্ষায় খুব ভাল নম্বর পেয়েও জানাতে সাহস করেনি ; কোনো সময় কিছু জেনেও বলেছে—জন, এটা একটু বুঝিয়ে দাও না ; কিংবা তর্কের সময় ইচ্ছে করে হার মেনেছে। তর্কে জিতলে আসল জায়গায় হার হতে পারে এই ভয়।"

রাত্রের অন্ধকারে নদীর নির্জন তীরে বসে মার্কিন-নন্দিনী হেলেন সেদিন নিজের দুঃখের কথা বলেছিল। হেলেন প্রথমে নিজের স্বকীয়তা ছাড়তে চায়নি। নিজের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে, ছেলেদের তর্কে হারিয়ে দিয়েছে, পরীক্ষায় একের পর এক 'এ' পেয়েছে। মেয়েরা তাকে মাথায় করে নেচেছে, তাকে খাতির করেছে। ছেলেরা কিন্তু তাকে দূর থেকে দেখেছে—ডেটিং-এ বেচারা হেলেনের দাম কমে গিয়েছে। দেখতে অসুন্দরী না হলেও ছেলেরা তার জন্য মাথা ঘামায়নি। "কারণ আমি চিয়ারলিডার নই, 'গুপ্ত' চোখে পুরুষমানুষের দিকে তাকিয়ে 'বেবি টক' করতে পারি না।" ছেলেরা একেবারে সাধারণ মেয়েদের প্রেম গ্রহণ করেছে, বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে। দেখতে দেখতে হেলেনের বেশির ভাগ সহপাঠিনীরই একটা হিল্লে হয়ে গিয়েছে।

মার্কিন ক্যামপাসে যে-মেয়ের কোনো স্টেডি বয় ফ্রেন্ড হচ্ছে না—তার অবস্থা শোচনীয়। মেয়ের বাবা-মা, বান্ধবী, দাদা, কাকা সবাই তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রশ্ন একটাই—গত শনিবার কী হলো? শনিবারটাই যেন জীবনের একমাত্র দিন—মিষ্টি সন্ধ্যাটার একমাত্র রাত্রি। এই শনিবার রাত্রেই কত জীবনের ওপর ভাগ্যের দেবতা আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। মেয়েরা উন্মুখ হয়ে থাকে, কখন ডিনার এবং নাচের শেষে একান্তে নিয়ে গিয়ে ছেলেবন্ধু বলবে, "হনি, তোমার সঙ্গে কথা ছিল।" হাতদুটি ধরে খেলা করতে করতে পুরুষ মানুষটি সেই আশ্চর্য মিষ্টি কথাগুলো বলবে—যার জন্যে এতো উদ্বেগ এতো উৎকণ্ঠা—যার নাম "প্রপোজাল"। যুগ-যুগান্ত ধরে এই "প্রস্তাব" করবার অধিকার পুরুষরা উপভোগ করেছে—মেয়েরা শুধু গ্রহণ করতে পারে, বড়জোর প্রত্যাখ্যান করতে পারে, কিন্তু মুখ খুলে কিছু বলবার স্বাধীনতা নেই, বড়জোর ভাবে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিতে পারে, সে কাউকে চায়।

হেলেন বললো, "জানেন, প্রথম কিছুদিন তবু সহ্য করা যায়। তখন সবাই সবার সঙ্গে ডেট করতে ব্যস্ত—সবাই ঘুরে-ঘুরে মধুপান করছে প্রজাপতির মতো। তখন কিছুটা স্বাধীনতা থাকে। তারপর একে একে ছেলেরা কারুর সঙ্গে স্টেডি হতে শুরু করে—প্রিয়বান্ধবী তখন জাল গুটোবার জন্যে বলে 'হনি' আমি সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি আর কারুর সঙ্গে ডেট করবো না। তুমিও তাই তো?' মেয়েরা ছেলেদের সরিয়ে নিতে তায়—হারাবার ঝুঁকি নিতে চায় না। কোনো

মেয়ে যখন দেখে একে-একে সব বান্ধবীই প্রাণেশ্বর যোগাড় করে ফেলেছে, তখন নিঃসঙ্গতায় তার মন ভরে ওঠে। শনিবারটা ভয়ের কারণ হয়ে ওঠে—কত জনকে আর মিথ্যে বলা যায়, কেন শনিবার সে বেরোচ্ছে না।"

ছেলেদেরও এমন অবস্থা হতে পারে। প্রেমের প্রতিযোগিতায় কেউ কেউ হেরে যায়। কিন্তু তাদের তবু আশা থাকে। তারা অপেক্ষা করতে পারে নতুন সেসনের জন্যে। গ্রীষ্মের শেষে ক্যামপাসে প্রাণের বসন্ত ফিরে আসে। নতুন বছরের ছেলেমেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে হাজির হয়। সিনিয়র ছেলেদের অধিকার আছে, জুনিয়র মেয়েদের সঙ্গে ডেটিং করার। যারা এখনও "মুক্ত" আছে, তার নতুন মেয়েদের মধ্যে ভাবী স্ত্রী খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু সিনিয়র মেয়েদের সেই স্বাধীনতা নেই। জুনিয়র ছেলেদের সঙ্গে ডেট করা এক ধরনের অশ্লীলতা। কেউ তা বরদাস্ত করবে না। নিজের বান্ধবীরা পর্যন্ত লুকিয়ে হাসবে—'অমুকের হলো কি! শেষ পর্যন্ত একটা 'গ্রীন কিড'-এর সঙ্গে ডেটে বেরুচ্ছে! দেখেছ ওই ছোকরাকে? ওর সঙ্গে একলা থাকলে আমার তো বাৎসল্য রস এসে পড়বে।"

এমনি করেই প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নীরবে করুণ নাটকের অভিনয় হয়—পরাজয়ের অভিশাপ নেমে আসে পাঁচটি ছ'টি যুবতী ছাত্রীর ওপর যারা তাদের অনাগত নিঃসঙ্গ দিনগুলোর কথা ভেবে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। পরীক্ষায় খুব ভাল করেও তারা হেরে যায়। তাদের কোনো দাম থাকে না—বন্ধুমহলে নয়, পরিবারে নয়, এমনকি, নিজের কাছেও নয়।

আর বছরের শুরু থেকেই এই অনাগত পরাজয়ের আশঙ্কা জেগে থাকে প্রতিটি অনূঢ়া ছাত্রীর মনে—সবাই ভাবে, আমার ভাগ্যে এই অবস্থা হবে না তো?

এই আশঙ্কায় সব ছাত্রীই স্বামী নির্বাচনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন শুরু হয় বুদ্ধি ও প্রেমের প্রতিযোগিতা। ভাবা স্বামী চাইছে দেরী করতে আর পাত্রী চাইছে ঝঞ্ঝাট চুকিয়ে ফেলতে। জীবনে কে না নিরাপত্তা চায় বলুন?

খুকু বললো, "মামা, এর ফলে বিচিত্র অবস্থার সৃষ্টি হয়। সব বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক ছাত্রী লেখাপড়া শেষ করতে পারে না। বাবা-মায়ের কাছে সাহায্য নিতে তারা বিবাহিত জীবন-যাপন করতে চায় না। তাই সাধারণ কাজকর্ম জুটিয়ে মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দেয় এবং বিয়ে করে। স্বামী তখনও তো ছাত্র থেকে যায়। মেয়েরা চাকরি করে সংসারের খরচ চালায়, স্বামীকে রোজ কলেজে পাঠায় এবং অপেক্ষা করে করে স্বামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে বাইরের পৃথিবীতে বেরিয়ে তাকে দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেবে।"

হেলেন বললো, "মার্কিনী-পুরুষরা অন্যদিকে যতই তেজী হোক স্ত্রীর খরচে পড়াশোনা করতে তারা লজ্জা পায় না। এমনও জানি, যে স্বামীর ভবিষ্যতের

জন্যে স্ত্রী নিজের লেখাপড়া বিসর্জন দিয়েছে, তিন বছর খরচ চালিয়েছে, তিন বছর পরে তিনিই তালাক দিয়ে নতুন গৃহিণী নির্বাচন করেছেন।”

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে খুকু বললো, “আমরা অনেকক্ষণ বসে আছি—এবার ফেরা যাক।”

হেলেন বললো, “আপনার সঙ্গে গল্প করে বেশ আনন্দ পাওয়া গেলো। আপনি বুঝতে পারছেন, সভ্যতা হিসেবে আমরা যতখানি এগিয়ে আছি বলে ড্রাম বাজাই ততখানি আমরা এগোতে পারিনি। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা কি জানেন, সাধারণ ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে এ-বিষয়ে কথা বলতে তারা মোটেই আশ্চর্য হয় না—তারা ভাবে এইটাই স্বাভাবিক।”

সুচরিতা বললো, ‘হেলেন, তুমি বাজে কথা ছাড়ো। তোমার হাত দেখেছি আমি, এই বছরেই বিয়ের ফুল ফুটবে। ছাত্রদের টপকে কোনো ছোকরা অধ্যাপকই তোমার চরণে হৃদয় নিবেদন করবার জন্যে ছটফট করবে।”

“ডোন্ট বি কিডিং—কেন রসিকতা করছো চ্যারিটা? আমেরিকান পুরুষমানুষদের কাছে আকর্ষণীয় হবার পক্ষে আমি একটু বেশি ইনটেলেকচুয়াল। আমি ‘বেবি-টক’ করতে পারি না।”

হেলেনের কণ্ঠে কেমন রোদনের সুর বেজে উঠলো। পরমুহূর্তে আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠে সে বললো, “তোমার মামাকে অনেক জ্বালাতন করেছি আমরা—তাঁকে এবার একটু শান্তি দেওয়া যাক্।”

“হেলেন তোমার কাছে আজ অনেক নতুন কথা শুনলাম। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আচ্ছা বলো তো, প্রেমের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোন্ গুণগুলোর বেশি দাম? আমাদের দেশে তো মেয়েদের গায়ের রং এবং রূপ, ছেলেদের রোজগার এবং মেয়ের বাবার টাকা, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে বংশ পরিচয়।”

হেলেন বললো, “আমরা বলে বেড়াই, প্রজাপতি প্রতিযোগিতায় যুবক যুবতীর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বটাই সবচেয়ে বড়ো। কথাটা মোটেই সত্যি নয়। ছেলেদের কাছে রূপটাই এক নম্বর—সুন্দরী মেয়েদের বেজায় কদর। মেয়ের বাবার টাকা খুব বড়ো কথা নয়, যদি না তিনি মিলিয়নেয়ার হন। আর মেয়েদের প্রথম নজর খেলোয়াড়দের দিকে। ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেনকে বিয়ে করবার জন্যে সবাই পাগল। তারপর ভাবী-স্বামীর ভবিষ্যৎ কেমন রোজগার করবে মনে হয়? ছাত্র কেমন? বাড়ির অবস্থা কেমন?”

আমি কোনো কথা বললাম না। হেলেন বললো, “এদেশের বিবাহিত জীবন কিসের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে তা আপনার জানা দরকার। প্রথম স্বামী এবং স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা। দ্বিতীয়, পরস্পরের সান্নিধ্য উপভোগের কামনা। যেটা আপনাদের দেশে সবে শুরু হয়েছে, শুনলাম। স্বামী এবং স্ত্রী একত্রে বেড়াতে

যান, সিনেমায় যান, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করেন, এবং জীবনের সমস্ত আনন্দ একত্রই উপভোগ করেন। তিন নম্বর অবশ্যই যৌন সুখ—এর গুরুত্ব ছোট করা যায় না। তারপর স্বামীর রোজগার। আয় বেশি হলে বিবাহ বিচ্ছেদের সম্ভাবনা কম। নিজস্ব বাড়ি থাকলে বিবাহ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। ভাড়াটিয়ারা বেশি বিবাহ-বিচ্ছেদ করে। এবং স্বামীর শিক্ষা—স্বামী অপেক্ষাকৃত বেশি শিক্ষিত হলে বিচ্ছেদ কম ; স্ত্রী বেশি শিক্ষিতা হলে ডাইভোর্স বেশি।"

হেলেন ও খুকু এবার একসঙ্গে হেসে উঠলো! নির্জন রাস্তায় দুটো মেয়ের হাসি অনেক দূর ছড়িয়ে পড়লো। আমরা জোর কদমে এগিয়ে চললাম। এমন সময় পিছনে একটা গাড়ি এসে থামলো।

"হাই! কোক্"—এয়ারপোর্ট যাওয়া বিল-এর গলা। বিল আমাদের সবাইকে গাড়িতে তুলে নিলো।

"কোনো রাত্রের অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়েছিলে নাকি?" সুচরিতা জিজ্ঞেস করলো।

"মোটেই না। ল্যাবের কাজকর্ম সেরে ভাবলাম মামাকে একটু জ্বালাতন করা যাক। ওমা, টেলিফোনে শুনলাম নো পাত্তা। ভাবলাম, সাহিত্যিক মামার এই সন্দেহজনক অনুপস্থিতির সংবাদটা কোককে দেওয়া যাক্। হা ঈশ্বর, ভাগ্নীও অনুপস্থিত ; গোপন সংবাদ পাওয়া গেলো, হেলেনও সঙ্গে বেরিয়েছে। তখন আন্দাজ করলাম, মামাকে এরা একলা ঘরে খেতে দেবে না। নিশ্চয় নদীর ধারে বসে ওরা মামাকে নৈশ প্রকৃতি উপভোগ করতে বাধ্য করাচ্ছে। তাই এদিকে খোঁজ করতে আসছিলাম। পথেই তোমরা ধরা পড়ে গেলে।"

খুকু কি আমার সামনে একটু অস্বস্তি বোধ করছে? বুঝতে পারছি না।

বিল কলিনসের গাড়ি আমার হোটেলের সামনে এসে পড়েছে। আমি নেমে পড়লাম। হাত দুটো বাড়িয়ে হেলেন আমার সঙ্গে করমর্দন করলো। "সামনের বছর আমি নিশ্চয় ইন্ডিয়াতে যাচ্ছি। তখন চিনতে পারবেন তো? ওর উষ্ণ স্পর্শে বুঝলাম, হেলেন আমাদের সান্নিধ্যে আনন্দিত হয়েছে।

আমি বললাম, "আমরা তোমাকে আমাদের দেশে আশা করবো হেলেন।"

গাড়ির মধ্য থেকে মুখ বাড়িয়ে ছোকরা বললো, "তাহলে মামা, গুড নাইট ফ্রম বিল এন্ড কোক।"

।। ২ ।।

এই বিল ছোকরার মতিগতি আমার তেমন সুবিধেজনক মনে হচ্ছে না। এর সম্বন্ধে ডায়রিতে কি লেখা যায় তাই সকালে বসে ভাবছিলাম। দুটো ভয়—এই ডায়রি তাজুদির হাতে পড়তে পারে ; দ্বিতীয় ভয় আমার মৃত্যুর পরে। বিল

সম্বন্ধে যদি কিছু তীব্র মন্তব্য করি—এবং পারিবারিক মতামতের বিরুদ্ধে স্নেহের ভাগ্নীটি যদি শেষ পর্যন্ত মিসেস কলিন্‌স হয়—তখন মামার এই ডায়েরি তার হাতে পড়লে আমার ওপর খুকুর কোনো শ্রদ্ধা থাকবে না—হাজার হোক স্বামী ইজ্‌ স্বামী।

এমন সময় ঘরের বেল বেজে উঠলো। দরজা খুলতেই খুকু ঘরে ঢুকলো, এই ভোরবেলাতেই সে ফিটফাট—স্নান সেরে নিয়েছে।

আমি তাড়াতাড়ি ডায়রিটা বন্ধ করে ফেললাম। খুকু বললো, "মামা, তুমি এখনও রেডি নয়?

"মানে দাড়ি কামিয়ে ফেলেছি। স্নানের ব্যাপারে সাহেবদের কায়দা ধরেছি—বাড়িতে ফিরে বিকেল বেলায় বেদিং।"

খুকু বললো, "এখানে সবাই ত্যাগ করে। কিন্তু আমার পুরনো অভ্যাস রয়ে গিয়েছে—বেরুবার আগে স্নান, ফিরবার পরে নয়।"

আমি বললাম, "কালকে ফিরে গিয়ে তুই একটা টেলিফোন করলি না। আমার ভয় হলো, অত রাত্রে হোস্টেলে ঢুকতে পেলি কি না।"

খুকু বললো, "আমাদের কাছে চাবি থাকে মামা। আমি ভাবলাম, সারাদিন ঘুরে ঘুরে তুমি নিশ্চয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছো—কলকাতায় কত তাড়াতাড়ি তুমি ঘুমিয়ে পড়ো তা তো জানি!"

আমি বললাম, "সকাল সকাল উঠে পড়ছি এখানে। ভোরবেলায় বেড়াতে বেড়িয়েছিলাম। বড়ো ভাল লাগলো। এত সুন্দর জায়গায় মানুষের এমনিই পড়তে ইচ্ছে করবে—একেই তো বলে তপোবন!"

"মামা, আজকে ছুটির দিন, তাই লম্বা প্রোগ্রাম। এখনই বেরিয়ে পড়বো আমরা। প্রথমে যাবো আমার লোকাল গার্জেনের বাড়ি। ওখানে তোমার ও আমার লাঞ্চে নেমন্তন্ন। তারপর বিকেলে চা, চিঁড়ে বৌদির বাড়ি। ওঁরা ডিনারে তোমাকে ডাকতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি রাজী হইনি, কারণ আমাদের অন্য জায়গায় যেতে হবে। সেখানেও তোমার ভাল লাগবে। তোমার হোটেলের ঘরটা যাবার সময় ছেড়ে দিয়ে যাবো।"

খুকু নিজেই একটা ছোট্ট গাড়ি কিনেছে। পুরনো ফোক্সওয়াগেন। যেমন জার্মান জাত, তেমনি এই ফোক্সওয়াগেন গাড়ি—ভীষণ নিষ্ঠাপরায়ণ, কিছুতেই খারাপ হয় না। আমেরিকান মোটরসম্রাটদের ঘুম কেড়ে নেবার ব্যবস্থা করেছে এই ক্ষুদে ফোক্সওয়াগেন।

খুকু অবলীলাক্রমে গাড়িতে স্টার্ট দিলো। বললাম, "তোর এই রকম একটা ছবি নেওয়া দরকার। ফটো না দেখলে তাজুদি বিশ্বাস করবেন না, তুই এইরকম পাকা ড্রাইভার হয়েছিস।"

খুকু বললো, "পাকে পড়ে ড্রাইভার হয়েছি। রিসার্চের কাজে কত জায়গায় ঘুরতে হয়, রাত-বিরেতে ফিরতে হয়—গাড়ি ছাড়া চলে না।"

"তোর এ-দেশে ক'বছর হলো?" হিসেব করতে বসি।

"দু' বছরে ডিগ্রি নিয়েছি। দেড় বছর ডক্টরেটের থীসিস এর কাজ চলছে।"

"কতদিন লাগবে তোর ডক্টরেট হতে? তাজুদি তোর বিয়ের কথা ভেবে-ভেবে রোগা হয়ে যাচ্ছেন।"

সুচরিতা হেসে ফেললো। হেলেন গত রাত্রে যে ইন্ডিয়ার নতুন সমাজকে এতো প্রশংসা করলো তা সব বৃথা!"

"বিয়ে না হয় না-ই করলি। দেশে ফিরবি কবে বল?"

"ফিরলেই তো আর একখানা রেশন কার্ড বাড়বে—ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টকে আর একটা লোক খাওয়াবার দায়িত্ব নিতে হবে।"

"রসিকতা পরে করিস খুকু," আমি আবেদন করি।

"আসলে মামা, কবে যে ডক্টরেট পাবো তা কেউ বলতে পারে না—দুই থেকে দুশো বছর পর্যন্ত লাগতে পারে। আর যে-লোকের আন্ডারে কাজ করি—অদ্ভুত মহিলা। ডক্টর মিস শিপেন। এঁর কথা পরে তোমকে বলবো।"

আমাদের গাড়ি হাই ওয়ে ধরে হু হু করে এগিয়ে চলেছে। ভোরের মিষ্টি রোদ্দুর এসে পড়েছে গাড়ির ওপর। দু'পাশে ভুট্টার ক্ষেত—যত দূর দৃষ্টি যায় সোনা হয়ে রয়েছে।

খুকু এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে ছোট্ট একটা কফির দোকানে ঢুকে পড়লো। আমাকে কফি খেতে বললো খুকু!

"তোর কফি।" আমি জিজ্ঞেস করি।

"এখন নয় মামা। সকাল থেকেই উপোস চলছে। আজ আমার দুটো লোকাল ভাইকে ফোঁটা দেবো।"

খুকু দোকান থেকে কিছু মিষ্টি কিনলো। তারপর আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম।

খুকু ড্রাইভ করতে করতে বললো, "আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানীয় গার্জেন সিস্টেমটা আমার খুব ভাল লাগে।"

'ব্যাপারটা কি?' আমি জিজ্ঞেস করি।

"প্রত্যেক বিদেশি ছাত্রকে এরা একটা স্থানীয় পরিবারের সঙ্গে যোগ করে দেয়। এই সব পরিবার যেন এক-একটি ছেলে-মেয়েকে দত্তক নিয়েছে। উদ্দেশ্য, এত দূরে কেউ যেন নিঃসঙ্গ বোধ না করে। সবাই যেন নিজের বাবা-মা ভাই-বোনের কাছে থেকে দূরে থেকেও আত্মীয় সান্নিধ্যের সুফল পায়।

"জানো মামা, আমার প্রথম রবিবারের কথা মনে পড়ছে। মিস্টার অ্যান্ড

মিসেস ফিশার আমাকে হোস্টেল থেকে নিতে এলেন। আমাকে ওঁরা আগে টেলিফোন করে দিয়েছিলেন—আমি নিচে দাঁড়িয়েছিলাম। তখন নতুন এসেছি—বিদেশে মন তেমন বসেনি। মিসেস ফিশারের বয়স চল্লিশের মতো হবে। আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, আদর করে চুমু খেলেন। তারপর বললেন, চলো তোমার বাড়ি দেখবে চলো।"

"তোর বাড়ি।"

"হ্যাঁ, ওঁরা চান আমি যেন ওঁদের বাড়িকে আমার নিজের বাড়ি মনে করি।"

"এর জন্যে ওঁরা কি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে টাকা-কড়ি পান?"

'মোটেই না। এঁরা মনে করেন প্রত্যেক মানুষের কিছু সামাজিক কর্তব্য আছে—তাই ওঁরা স্বেচ্ছায় এই সব দায়িত্ব নেন। এই ধরনের লোকের কখনও অভাব হয় না এই আজব দেশে। কত লোক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং গভরমেন্টকে চিঠি লেখে—আমাদের একটি বিদেশী ছাত্র বা ছাত্রী দেওয়া হোক। তাদের সঙ্গে মিলেমিশেই এঁদের আনন্দ। আমাদের কলকাতায় তো কত বাইরের ছেলে আছে—শুনেছো কোনো দিন কাউকে আমার ভাল বেসে বাড়িতে নিয়ে এসেছি!"

খুকু বললো, 'তুমি বিশ্বাস করবে মামা? আমাকে বাড়িতে আনবেন বলে ওঁরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে দু'খানা বই কিনে ফেলেছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং ভারতবর্ষের সমাজ সম্বন্ধে জানবার জন্যে মিসেস ফিশার লাইব্রেরি থেকেই বই আনিয়েছেন। ওঁদের চারটি ছেলেমেয়ে—সংসারে কেউ সাহায্য করবার নেই। মিসেস ফিশারকেই বিরাট সংসার সামলাতে হয়। ওঁর স্বামী এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে এক ইলেকট্রনিক কোম্পানিতে পদস্থ ইঞ্জিনীয়ার।"

"আমি এঁদের সঙ্গে ছুটির দিনটা কাটাই। খুব ভালো লাগে। ওঁরা কখনও বাইরে গেলে আমাকে নিয়ে যান। প্রত্যেক সপ্তাহে টেলিফোনে খোঁজ-খবর নেন এবং আমার অসুখ-বিসুখ হলে ওঁরা যে কি রকম উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন তা না দেখলে বিশ্বাস করবে না। বিদেশে এরকম মানুষ পাওয়া খুবই ভাগ্যের কথা মামা। আমেরিকার সাধারণ মানুষদের স্নেহ প্রীতির এই দিকটা দেখলে জাতটাকে তুমি না ভালবেসে পারবে না।"

আমাদের গাড়িটা এবার বড়ো রাস্তা ছেড়ে একটা সরু রাস্তা ধরে চলেছে। দু'ধারে গাছে ঢাকা, ছবির মতো ছোট ছোট বাড়ি। কোথাও কোনো শব্দ নেই—মাঝে মাঝে দু'কেটা নাম-না জানা পাখির ডাক কানে আসছে। একটা বাড়ির লনে গৃহস্বামী আপন মনে মেসিন দিয়ে ঘাস কাটছেন। ছুটির দিনের সোনালী ঢেলেমি প্রকৃতির ওপরেও প্রভাব বিস্তার করছে। বিশ্ব প্রকৃতির এই অপূর্ব সৌন্দর্য দেখে মনে হচ্ছে, আমাকে নিমন্ত্রণ না করে, অনেকদিন আগে

এখানে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আনা উচিত ছিল। আমরা আর একখানা আরণ্যক উপহার পেতাম।

আমরা এবার কাঁচা পথ ধরে চলেছি। গাড়ির চাকায় শুকনো পাতার ঘর্ষণে মিষ্টি মুচমুচে আওয়াজ হচ্ছে। খুকুর গাড়ি এবার একটা কাঠের বাড়ির সামনে থেমে গেলো। গাড়ি থেকে নেমে আমরা দরজা পর্যন্ত আসতেই—মজার একটা ব্যাপার হলো।

খুকু শুধু কলিং বেল টিপেছে—অমনি ভিতর থেকে কোকিলের ডাক শুরু হলো—কু-উ-উ কুউউ। ভিতরে গোটা কয়েক কোকিল যেন আমাদের অভ্যর্থনার জন্যেই বসন্তের পঞ্চম ধরেছে। দুটি তিনটি পুরুষ ও নারী কণ্ঠও যেন তার সঙ্গে গলা মেলাচ্ছে মনে হলো।

আমি একটু অবাক হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু খুকুর মুখে হাসি। "দুষ্টু ছেলেদের কীর্তি, মজা দেখাচ্ছি।"

এবার দরজা খুলে গেলো। একটি বাচ্চা ছেলে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তখনও বলছে—কু-উ-উ, কুউউ।

খুকু ছেলেটাকে আদর করে বললো, "খুব দুষ্টু হয়েছো তোমরা।"

ছেলেটির কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই—শুধু বলছে, কুউউ কুউউ।

খুকু বললো মিস্টার ও মিসেস ফিশারকে আমি কাকা ও কাকিমা বলি। ওঁরা আমাকে কুকু বলেন—খুকু উচ্চারণ করতে পারেন না। তাই আমার আমেরিকান ভাইবোনেরা কোকিল ডেকে মজা করে ; আমাকে কখনও বলে কুকু বা কোকিল কখনও বলে ডিডি, দিদি কথাটা আসে না।

দিদি এবার গম্ভীরভাবে বললো, "এখনই একটা বিরাট বেড়াল ডেকে আনছি—কোকিল ডাক বেরিয়ে যাবে!"

এবার আরও একটি বালক এবং বালিকার আবির্ভাব। ছেলেটির বয়স বার তেরো, মেয়েটির পনেরোর মতো। তারা সবাই খিলখিল করে হেসে উঠলো। কিন্তু কোনো অদৃশ্য স্থান থেকে তখনও কয়েকটা কোকিল একসঙ্গে ডেকে চলেছে।

খুকু জিজ্ঞেস করলো, "বাবা-মা কোথায়?"

ছোট ছেলেটি মিলিটারি কায়দায় হুকুম করলো, "অ্যাটেনশন!" তারপর মার্চ করতে-করতে বললো, "আমাকে ফলো করো।" অন্য ছেলেমেয়েরাও মার্চ করে এগিয়ে যেতে লাগলো। অপারগ হয়ে আমরাও মার্চে যোগ দিলাম।

সেনাপতির আদেশ মতো হলঘর পেরিয়ে আমরা বাঁয়ে ঘুরলাম, তারপর থামবার হুকুম হলো। বালকটি এবার আলিবাবা কায়দায় চিৎকার করলো, "চিচিং ফাঁক।" অমনি দরজা খুলে গেলো।

আবার হাসির হুল্লোড়। ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন শাড়িপরা এক মার্কিন মহিলা—উনিই যে মিসেস ফিসার তা বুঝতে আমার একটুও কষ্ট হলো না। পাশেই মিস্টার ফিশার, পাঞ্জাবি আর ধুতি পরে জবুথবু হয়ে পড়েছেন।

তাঁরাও এবার ছেলেদের সঙ্গে হাসিতে যোগ দিলেন। হাসি সামলে কর্তা গিন্নী এবার ভারতীয় প্রথায় হাত জোড় করে আমাকে স্বাগত জানালেন।

মিস্টার ফিসার বললেন, "ছেলেরা তোমাকে কোকিল-অভ্যর্থনা জানাবার জন্য এক সপ্তাহ ধরে ষড়যন্ত্র করছে। ন্যাচারাল হিস্ট্রী মিউজিয়ম থেকে ওরা কোকিলের স্বর টেপ করে এনেছে, বাড়িতে সাতদিন ধরে কোকিল ডাকের রিহার্সাল চলেছে, আমাকেও মহড়ায় অংশ নিতে হয়েছে।"

"কান ঝালাপালা, আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত," মিসেস ফিসার অভিযোগ করলেন।

"তোমরা যেমনি এসে পৌঁছলে, অমনি টেপ রেকর্ডার চালু হয়ে গেলো, আর সঙ্গে তিনটি মানুষ কোকিলের কণ্ঠ।"

এই সরল সদানন্দ পরিবারের ছেলেমানুষিটা সংক্রামক। আমিও হঠাৎ ছেলেমানুষ হয়ে পড়লাম।

মিসেস ফিশার বললেন, "শুধু কি তাই, আমরা আজ ভারতীয় জামা কাপড়ে তোমাদের অভ্যর্থনা জানাবো ভেবেছিলাম। কিন্তু ছেলেরা আমাদের বন্দী করে ঘরে ঢুকিয়ে রেখে গেলো। ডিডিকে ওরা আগে রিসিভ করবে, তারপর আমরা।"

খুকু জানালো, "প্রত্যেকবার আমার জন্যে এরা নতুন কিছু মতলব ফাঁদবে। এদের মাথায় এত বুদ্ধি কি করে আসে ভগবান জানেন।"

মিস্টার ফিশার বললেন, "আপনি আশা করি আমাদের এই ছেলেমানুষিতে কিছু মনে করছেন না। আমার ছেলে-মেয়েরা বাড়িতে সব সময় হৈ হৈ করে, আমি কখনও আপত্তি করি না এই জন্যে যে, বড়ো হয়ে এরা হয়তো হাসাহাসির সময় পাবে না।"

মিসেস ফিশার এবার পরম স্নেহের সঙ্গে আমাদের সকলকে ওঁদের বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে ছোট ছোট ফ্রেমে সাতটা ছবি সাজানো রয়েছে। কর্তা গিন্নী দু'জন, দুই ছেলে এবং দুই মেয়ে। এবং শেষে আমাদের খুকুও রয়েছে।

মিসেস ফিশার বললেন, 'খুকুই তো আমাদের বড়ো মেয়ে। তাই ওর ছবিটা ওখানে রেখেছি। শুধু বড়ো মেয়ে নয়, আমাদের লক্ষ্মী মেয়ে, সোনা মেয়ে।"

ছোট ছেলেটা বললো, "ডিডি, এবার আমাদের ঘরে চলো।"

আমাদের সবাইকে ওদের অনুসরণ করতে হলো। সেখানেও মজা। দেওয়ালে বিরাট একটা কাগজে তাজমহলের ছবি আঁকা। আর পাশে মাথায়

পাগড়ি পরা মহারাজবেশে ছোকরার নিজের ছবি।

মিসেস ফিশার বললেন, "কালকে দুইভাই মিলে এঁকেছে—তোমাকে দেখাবে বলে।"

বড়ো ছেলে গর্ডন জিজ্ঞেস করলো, "কেমন হয়েছে?"

দিদি বললো, "আমাদের আসল তাজমহল থেকেও ভাল হয়েছে।"

মিসেস ফিশার ছেলেদের কাণ্ডকারখানা দেখে বেশ আমোদ পাচ্ছেন। লিভিংরুমে ফিরে গিয়েই তিনি বললেন, "এবার তোমরা খাবে চলো।"

খুকু বলল, "দাঁড়ান ভাইফোঁটা সেরে নিই। তার আগে পর্যন্ত আমার উপোস। এইসব দুষ্টু ভাইদের জন্যে আমাকে ভোরবেলায় স্নান করতে হয়েছে।"

চন্দন আর কোথায় পাওয়া যাবে? খুকু ট্যালকাম পাউডারের গুঁড়ো জলে মিসিয়ে একটুখানি মণ্ড তৈরি করে ফেললো এবং গর্ডন ও ফিলিপকে হাত মুখ ধুয়ে মেঝেতে বসতে বললো।

'কি হবে ডিডি? কেন আমরা মেঝেতে 'স্কোয়াট' করবো?" গর্ডন ও ফিলিপ দু'জনই চিৎকার করে উঠলো।

মিসেস ফিশার উত্তর দিলেন "তোমরা অপেক্ষা করে দেখো। আজ কত মজা হবে। আজ যে ব্রাদারস্ ডে ভাইফোঁটা। মনে নেই গত বছর ডিডি এই দিনে তোমাদের নিয়ে কত আনন্দ করেছিল?"

"কী মজা।" ছেলেরা এবার চিৎকার করে উঠলো। "আমরা যদি আজ খুব দুষ্টুমি করি তাহলেও ডিডি আমাদের বকতে পারবে না।"

খুকু এবার ওদের হাঁটু-মুড়ে বসাবার চেষ্টা করতে লাগলো! "ফোঁটা নেবার সময় ওই রকম পা ছড়িয়ে বসলে চলবে না। প্রার্থনার সময়, লর্ড বুড্ঢা যেভাবে বসে থাকতেন সেইভাবে তোমাদের পদ্মাসন হতে হবে।" খুকু ওদের পা দুটো মুড়ে দিল।

আমেরিকান ছেলেদের পা মুড়ে বসানো নিতান্ত সোজা কাজ নয়। ফিলিপ বলে উঠলো, "ডিডি এইভাবে কতক্ষণ থাকতে হবে? আমার পা অবশ হয়ে যাচ্ছে, ভিতরে জ্বালা করছে।"

বড়ো ছেলে গর্ডন বললো, "আমার হাঁটুটু দড়ি দিয়ে বাঁধো নইলে এখনই পা সোজা হয়ে যাবে।"

খুকু তাড়াতাড়ি পরম স্নেহে ওর বিদেশি দুই ভাই-এর কপালে ফোঁটা এঁকে দিল। ভাইফোঁটার মন্ত্র পড়লো—ভাই-এর কপালে দিলাম ফোঁটা, যম দুয়ারে পড়লো কাঁটা...।

মিস্টার ফিশার ছেলেমেয়েদের বললেন, "তোমরা শোনো, বছরের এই বিশেষ দিনে ভারতবর্ষের বোনরা তাদের ভাইদের কপালে পবিত্র ফোঁটা পরিয়ে

তাদের দীর্ঘজীবন কামনা করে। শত শত বছর ধরে এই সুন্দর ঐতিহ্য চলে আসছে।"

ফিলিপ বললো, "বাবা, একটা জিনিস বুঝতে পারছি না। বছরে মাত্র একদিন কেন? প্রতি সপ্তাহে ব্রাদার-ডটিং করলেই হয়।"

ফিলিপের কথায় আমরা সবাই হেসে উঠি। ফিলিপ এবার দিদি পামেলার দিকে তাকিয়ে বললো "তুমি দাঁড়িয়ে দেখছো কি? আমাদের কপালে পেন্টিং করো, গোপন কবিতা মুখস্থ বলো। আর মনে থাকে যেন, আজকে ভাইদের ওই বিশ্রী দাঁতগুলো বার বার দেখাতে নেই। ভাই ফিলিপ ভুল করলেও তার চুল টানতে নেই।"

ফিলিপ ছেলেটির কথায় বেশ বাঁধুনি। পামেলা এবার বসে পড়ে ডিডির কায়দায় বাইয়ের কপালে ফোঁটা দিলো। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "ফিলিপ, আজ তোমার চুলে হাত দেবো না, কিন্তু তোমাকে মনে করিয়ে নিতে চাই যে আমার স্থির বিশ্বাস, তুমি একটি ওরাং ওটাং।"

তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলো ফিলিপ। "তবে রে। আমাকে ওরাং ওটাং বলা।" ফিলিপের লক্ষ্য পামেলার পশমের মতো নরম চুলগুলো।

মিসেস ফিশার ছেলেকে সামনে নিলেন। "মনে থাকে যেন ফিলিপ আমরা আজ ভারতীয় মতে চলেছি। ভারতবর্ষে কেউ বয়োজ্যেষ্ঠদের গায়ে হাত তোলে না। ওটা বেআইনী।"

ফিলিপ বেচারা একটু হতাশ হয়ে পড়লো। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললো, "বড়ো বলে কি মাথা কিনে নিয়েছে? ইন্ডিয়াতে কি বড়োরা ছোটদের ওরাং ওটাং বলে?"

খুকু হেসে ওদের মিষ্টি দিতে দিতে বললো, "বড়োরা রেগে গেলে মোটেই ওরাং ওটাং বলে না। বাঁদর বলে!"

এবার আবার হৈ-হৈ পড়ে গেলো। প্যামেলা লাফাতে লাফাতে বলল, "বেশ, তোমাদের এবার থেকে আমি তাহলে বাঁদরই বলবো।"

আমাদের লিভিং রুমে বসিয়ে রেখে খুকু হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলো। ওর সঙ্গে ছেলেমেয়েরাও উধাও।

ফিশার দম্পতিকে বললাম, "এই দূর বিদেশে সুচরিতাকে আপনারা যে স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেছেন তার জন্যে আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। আপনাদের কথা বলতে গিয়ে খুকুর চোখে জল এসে যায়।"

মিস্টার ফিশার উত্তর দিলেন, "সুচরিতার মতো মেয়ের সান্নিধ্যে এসে আমরা ধন্য। আমাদের সংসারে সে আনন্দের বসন্ত নিয়ে আসে।"

মিসেস ফিশার বললেন, "আপনার ভাগ্নী একটি হীরের টুকরো। দশলক্ষে

এমনি মেয়ে একটি হয় না। পড়াশোনায় এতো ভাল, সহপাঠীদের মধ্যে এমন ব্যক্তিত্ব অথচ একেবারে কচি মন। আপনাকে সত্যি কথা বলছি আমার স্বপ্ন, আমার ছেলেমেয়েরা যেন ওদের ডিডির মতোই হয়ে উঠতে পারে।"

কম কথার মানুষ মিস্টার ফিশার। উনি জানালেন, "সুচরিতা ম্যাচিওর অথচ ছেলেমানুষ—সোনালী অথচ সবুজ। আমার কী মনে হয় জানেন, মেয়েদের এমনি হওয়াই উচিত, ওদের যে মা হতে হবে।"

শ্রীমতী ফিশার বললেন, "আপনার মতো একজন লেখককে আমাদের বাড়িতে পেয়ে আমরা আনন্দিত। আমরা অতি সাধারণ একটি পরিবার—এখানে আপনি আমেরিকার তেমন কিছু পরিচয় পাবেন না।"

মুখে কিছু উত্তর দিলাম না, মনে মনে বললাম, সাধারণ সংসারে মানুষকে দেখা না হলে দেশ দেখা হয় না।

শ্রীমতী ফিশার বললেন, "খুকু আপনাকে আমাদের সম্বন্ধে কিছু বলেছে কি না জানি না। আমরা দু'জনেই দক্ষিণী—টেকসাসেস লোক। বিয়ে হয়েছে কুড়ি বছর। আমি হাই ইস্কুল পর্যন্ত পড়েছিলাম। আমার স্বামী বছর দশেক বেল টেলিফোনে কাজ করেছিলেন, তারপর এখানে চলে আসেন। আমি বিয়ের পর বছর দুয়েক কাজ করেছিলাম—তারপর আমার বড়ো মেয়ে হয়। সেই থেকেই সংসার নিয়ে মেতে আছি। এদেশে চাকর-নকর পাওয়া যায় না—চারটি সন্তান মানুষ করা সারাক্ষণের কাজ।"

মিস্টার ফিশার বললেন, "আমি ওকে ফ্যাক্টরি ম্যানেজার বলি। সংসারও তো এক ধরনের কারখানা। কাঁচামাল হলো বাচ্চা ছেলেমেয়ে। তা থেকে নাগরিক তৈরি করা হয় এই সংসার-কারখানায়।"

"টেমপোরারি ফ্যাক্টরি। কাঁচামাল ফুরিয়ে গেলেই কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের ছেলেমেয়েরাও মানুষ হয়ে এলো। তারপর আমাদের কোনো কাজ থাকবে না।" মিসেস ফিশার আমার দিকে আঙ্গুরের প্লেট এগিয়ে দিতে দিতে বললেন।

মিস্টার ফিশার জানালেন "আমার স্ত্রীর খুব ইচ্ছে, আমাদের ছেলে-মেয়েরা পৃথিবী সম্বন্ধে অবহিত হোক। শুনেছেন বোধ হয়, জাহাজের ওপর এক ধরনের নতুন ইস্কুল তৈরী হচ্ছে। জাহাজটাই ইস্কুল। সেখানেই ক্লাশ হয়। এক এক বন্দরে জাহাজ থামে। ছেলেমেয়েরা সেখানে নেমে সে দেশের ইতিহাস, ভূগোল অর্থনীতির সঙ্গে পরিচিত হয়—তারপর আবার জাহাজ ছেড়ে দেয়। মধ্য-সমুদ্রে জাহাজ এগিয়ে চলে, ছেলেদের পড়া-শোনাও হতে থাকে। দশ মাস পরে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে ছেলেদের ভাসমান ইস্কুল আবার স্বদেশের বন্দরে ফিরে আসে। এই ধরনের ইস্কুলে ছেলেদের পাঠাতে পারলে খুব ভাল হতো। কিন্তু বড্ড খরচ,

আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বড়ো মেয়ে কলেজে, আর তিনটি ইস্কুলে। অতি সাধারণ ইস্কুলে পড়ে, তাতেই মাসে মাথাপিছু মাইনে পনেরোশ টাকা। তা যা বলছিলাম আপনাকে, বিদেশে না যেতে পারলে বিদেশীদের সঙ্গে পরিচিত হওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।"

মিসেস ফিশার বললেন, "সেই জন্যেই বিশ্ববিদ্যালয়কে লিখেছিলাম আমরা একজন বিদেশী ছাত্রের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই। কিন্তু আমাদের কি সৌভাগ্য ওঁরা সুচরিতাকে পাঠালেন।"

মিস্টার ফিশার বললেন, "আসা থেকেই সুচরিতা আমাদের পরিবারের ওপর তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছড়িয়ে দিয়েছে। ভারতবর্ষের আমেরিকা বিজয় বলতে পারেন।"

"সুচরিতা কেমন মেয়ে জানেন? আমার ছেলেরা যে এতো দুষ্টু, তারাও ডিডির কাছে বশ! ডিডিকে ওরা ভালোবাসে এবং ভয় করে। আমাদের ছোটখাট যে-সব পারিবারিক গোলমাল বাধে তার বিচারের ভারও ডিডির ওপর। ওর বুকটা সোনা দিয়ে তৈরি। ছুটির দিনে এখানে এসেই আমাকে সংসারের কাজে সাহায্য করে।"

"ওর রান্না ইণ্ডিয়ান কারি!" মিস্টার ফিশার খুকুর রান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। আমার মত, খুকু ওর দু-একটা রান্নার পেটেন্ট নিয়ে নিক। পাঁচ বছরের মধ্যে মিলিয়নেয়ার হয়ে যাবে।"

মিসেস ফিশার বললেন, "আজও খুকু রান্নাঘরে ঢুকেছে। ছেলেরা তাই এতো উত্তেজিত। "ওরা সবাই রান্নঘরে দাঁড়িয়ে ডিডির রান্না দেখছে।"

মিসেস ফিশার আরও বললেন, "সেবার আমার শরীর খারাপ হলো। কয়েকদিন বিছানায় বন্দী। ফোন করে জানতে গিয়ে কুকু শুনলে আমার অসুখ। দেড় ঘণ্টার মধ্যে মেয়ে এখানে হাজির। তারপর এক সপ্তাহ ধরে ওইটুকু মেয়ে আমাদের জন্য যা করলে তা পরীরাও করে না। নিজে ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করেছে, রান্না করেছে, ঘরবাড়ি পরিষ্কার রেখেছে, বাসন মেজেছে, ওঁকে অফিসে পাঠিয়েছে। আমার স্বামী তো তাজ্জব, আমরা কখন এরকম ব্যাপার শুনিনি। জানেন তো, এদেশে বাচ্চাদের আধ ঘণ্টা দেখলে আপনার প্রতিবেশীও টাকা আদায় করে।"

খুকু একটু পরেই রান্না সামলে ঘরে ঢুকলো। মিসেস ফিশার বললেন, "বোসো বাছা, তোমার মুখ ঘেমে গিয়েছে। তোমার মায়ের যা মেয়েভাগ্য, বহুলোকের হিংসে হবে।"

খুকু হেসে বললো, "আমাদের দেশে সমস্ত মেয়েই রান্নাবান্না শেখে—আমিই বরং তেমন কিছু জানি না বলে মা ভয় পান, শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে বদনাম কুড়বো।"

"যে-বাড়িতে তুমি যাবে, তারা তোমার মাকে সোনার মেডেল দেবে এই রকম মেয়ে তৈরির জন্যে!" শ্রীমতী ফিশার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন।

মিস্টার ফিশার স্ত্রীকে বললেন, "লক্ষ্য করেছো, কুকুর মা বলেন, ফাদার ইন-ল এর বাড়ি যাবে। শ্বশুর বাড়ি—স্বামীর বাড়ি নয়।"

মিসেস ফিশার বললেন, "শ্বশুর বাড়ি কিংবা স্বামীর বাড়ি যেখানেই যাক মেয়েদের মন পড়ে থাকে বাপের বাড়ির দিকে। বাপ-মায়ের জন্যে মেয়েরাই কিছু করে।"

মিস্টার ফিশার প্রশ্ন করলেন, "আপনাদের দেশে বাপ-মা বৃদ্ধ বয়সে ছেলের ওপর নির্ভর করেন, তাই না?"

খুকু উত্তর দিলো, "কন্যাদায় বলে একটা কথা আছে। কন্যা মানেই খরচ, অথচ ছেলেরা একটা ইনসিওরেন্স পলিসি, "প্রথমে খরচ করলে পরে সুদে আসলে উঠে আসবে।"

মিস্টার ফিশার বললেন, "কুকু নৃতত্ত্বের ছাত্রী, ও ভাল করতে পারবে। তবে আমার মনে হয়, আমাদের দেশে মেয়েদের ওপর নির্ভরতা বাড়ছে।

ভারতবর্ষের খবর জানতে চাইলেন ওঁরা। বললাম, "অন্য ব্যাপার জানি না, তবে যেখানেই যাই মায়েরা আজকাল অভিযোগ করেন, বিয়ের সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেরা নাকি পর হয়ে যাচ্ছে। ঝোঁকটা নাকি তাদের শ্বশুর-বাড়ির দিকেই বাড়ছে।"

খুকু আমার কথায় হেসে ফেললো। আমি বললাম, "অনেকে দুঃখ করছেন, ঘোর কলিতে মায়ের থেকে শাশুড়ীর দাম বেড়ে যায়।"

মিসেস ফিশার বললেন, "শাশুড়ীর সঙ্গে এখন কোনো বউ এদেশে ঘর করে না, সুতরাং শাশুড়ীর বউ-এর মতান্তরের সুযোগ কমে গিয়েছে।"

খুকু বললো, "আমাদের অধ্যাপক মিড্ বলেন যে শিল্পবিপ্লবের ফলে ছেলেরা ক্রমশই শ্বশুরবাড়ির দিকে ঝুঁকবে। অমন যে অমন জাপানে, ঘর-জামাইদের জন্য কী ব্যবস্থা—তাকে স্ত্রীর উপাধি নিতে হয়! আমাদের জানাশোনা এক ভদ্রলোকের সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, জাপানে মেয়েরা ক্রমশই বাপের বাড়ির খোঁজখবর বেশী নিচ্ছে।"

মিস্টার ফিশার বললেন, "কোথায় যেন পড়েছিলাম, মেয়েরা আজকাল বাপের বাড়ির কাছাকাছি বাসা খোঁজে।"

"ঠিকই পড়েছেন। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, কমবয়সী দম্পতিরা স্ত্রীর পৈতৃক বাড়ির কাছাকাছি থাকছে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, ছেলের শ্বশুরবাড়ি-প্রীতি বাড়ছে। এ সম্বন্ধে অনেকগুলো কারণ দেখানো হচ্ছে। প্রথম, অবিবাহিত মেয়েরা অবিবাহিত পুরুষদের মতো কাজের সন্ধানে বাবা-মার বাড়ি থেকে খুব দূরে চলে যায় না। সুতরাং তাদের বিয়ে হয় এমন পুরুষদের সঙ্গে যারা এ অঞ্চলে

ঘোরাঘুরি করে। ফলে বিয়ের পর তারা মেয়ের বাপের বাড়ির কাছাকাছি অ্যাপার্টমেন্ট নেয়। আর একটা কারণ দেখানো হচ্ছে যে মেয়ে সাধারণত বয়সে ছোট, সুতরাং তার বাবা-মায়ের বয়স ছেলের বাবা-মার বয়স থেকে কম হবে, এইটা আশা করা যায়। সুতরাং তাঁদের শারীরিক ক্ষমতা বেশী থাকে এবং মেয়ে-জামাই-এর তদারকি করতে পারেন। তবে এই যুক্তিটা ধোপে টেকে না।"

"আপনাদের দেশে কী হচ্ছে?" মিস্টার ফিশার জিজ্ঞেস করেন।

"আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারে শ্বশুরবাড়ির প্রতি বেশী অনুরক্ত হওয়াটা ছেলেদের পক্ষে শোভন বিবেচিত হয় না। এঁদের স্ত্রৈণ বলে বদনাম দেওয়া হয়। কিন্তু ক্রমশঃ যা দেখছি—মেয়ের সংসার সম্পর্কে বাবা মা ক্রমশঃই অনেক বেশী আগ্রহ নিচ্ছেন। মেয়ে জামাই আলাদা থাকলে দৈনন্দিন সাংসারিক খুঁটিনাটি সম্পর্কে মেয়ের মায়ের উপদেশ বেশী নেওয়া হচ্ছে।"

খুকু বললো, "আমাদের প্রফেসরদের ধারণা, এইটাই ক্রমশঃ স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। অর্থাৎ কাঁটাটা অলক্ষ্যে ম্যাট্রিয়ার্কাল সোসাইটির দিকে ঝুঁকছে। পুরুষ-প্রধান সমাজ থেকে প্রমীলা-প্রধান সামাজের দিকে যাচ্ছি আমরা।"

"বলিস কি! এই করতে-করতে শেষ পর্যন্ত আমরা আবার না প্রমীলা রাজত্বে ফিরে যাই!" আমি আশঙ্কা প্রকাশ করি!

খুকু হেসে বললো, "খুব সাবধান তোমরা। ভারতবর্ষে আমরা ঘর-সংসার চালিয়েও এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফার্স্ট হচ্ছি, পার্লামেন্টের মেম্বার হচ্ছি, রাজনীতি করছি, লাটসায়েব হচ্ছি, এমন কি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছি। অফিসেও আমরা ঢুকে পড়েছি। কারখানা আর মিলিটারি এই দুটো মেয়েদের হাতের মধ্যে আনতে পারলেই পুরুষ যুগের অবসান হবে!"

"তখন কী হবে?" আমি কাতরভাবে প্রশ্ন করি।

"প্রমীলা রাজত্বে যা হয় তাই হবে। বিয়ের পরে তোমাদের নাম পাল্টে যাবে, চাদরের খুঁটে চোখের জল মুছতে স্ত্রীর বাড়ি চলে আসবে। রান্না-বান্না এবং শিশুপালন পদ্ধতি ভাল করে শিখবে। এবং শ্বশুরের বকুনি খেয়ে লুকিয়ে-লুকিয়ে চোখের জল ফেলবে।"

"খুব খারাপ হয় না, তাহলে।" শ্রীমতী ফিশার মেয়েদের পক্ষেই প্রবল উৎসাহে ভোট দিলেন।

আমি ও মিস্টার ফিশার বোকার মতো পরস্পরের খুব চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম।

মিস্টার ফিশার এবার গম্ভীরভাবে জানালেন, "ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ফাটকা খেলাটা ভাল নয়। আমাদের আলোচনা বর্তমানে সীমাবদ্ধ থাকাই যুক্তিযুক্ত নয় কি?"

দু'জন মেয়ে আমাদের হারিয়ে খুশী হয়ে বললো, "ঠিক আছে, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবিয়ে তোমার মনোকষ্টের কারণ হতে চাই না।"

খুকু বললে, "হিসেব করে দেখা করে গেছে, এবং আমাদের বইতে লেখা আছে, আমেরিকায় স্ত্রীর আত্মীয়স্বজনরাই বেশী বিনা নোটিশে বেড়াতে আসেন। বহুক্ষেত্রে ফ্ল্যাটের বাড়তি চাবিটা স্ত্রীর বাপের বাড়িতেই থাকে। স্বামীরা যদিও নিজেদের আত্মীয়স্বজনদের বেশী ফোন করেন, চিঠি লেখা বেশী হয় স্ত্রীর বাবা-মায়ের কাছে। বাড়িতে যত খানাপিনা হয় তাতে স্ত্রীর বাবা মা বোন বেশী আমন্ত্রিত হন স্বামীর আত্মীয়স্বজন থেকে।"

"বুঝুন তাহলে আমরা কোন্‌দিকে যাচ্ছি!" মিস্টার ফিশার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

ফিশার গৃহিণী বললেন, "কথা বাড়িয়ে তো লাভ নেই, তেমনি সংসারের ধকল সামলাবার জন্যে সব সময় স্ত্রীর মার কাছে টেলিফোন করা হয়। স্ত্রীর বাচ্চা হবার সময় কে আসেন? স্বামীর মা না স্ত্রীর মা?"

সুচরিতা বললো, "আমরা বইতে পড়েছি, নতুন সংসার পাতার সময় স্বামীর বাবা-মা টাকা দেন ধার হিসেবে। আর স্ত্রীর বাবা-মা যা দেন তা প্রায়ই উপহার হিসেবে। আমরা বলি নন-রেসিপ্রোকেটেড গিফ্‌ট অর্থাৎ যে উপহারের প্রতিদানে আবার উপহার দিতে হয় না।"

ফিশার পরিবারের ছেলেমেয়েরা মার্চ করে ঘরে ঢুকে পড়লো। ওরা এতোক্ষণ বাড়ির অন্য কোথাও দুষ্টুমিতে ব্যস্ত ছিল।

শ্রীমতী ফিশার বললেন, "আর কথা নয়! সবাই খাবে চলো।"

একটা টেবিলে আমরা সকলে একসঙ্গে খেতে বসলাম। ইণ্ডিয়ান ও আমেরিকান দু'রকম রান্না হয়েছে। শ্রীমতী ফিশার বললেন, "আমার মুস্কিল হয়েছে, ছেলেমেয়েরা ইন্ডিয়ান রান্না পেলে আর কিছুই চায় না। প্রত্যেকটি ছেলে ঝাল খেতে ওস্তাদ হয়েছে!"

এখন পরিতৃপ্তির সঙ্গে অনেকদিন খাইনি। শ্রীমতী ফিশার মায়ের মতো আদর যত্ন করলেন। বললেন, "এটা নাও, ওটা নাও।"

খুকু বললো, "খুব সাবধান মামা, আমেরিকায় না বোলো না। নেওয়ার ইচ্ছে থাকলে একবার অনুরোধেই নিয়ে নেবে। এখানে কেউ দুবার সাধে না। আমি তো প্রথম দিকে বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম। প্রথমবার অভ্যাসমতে না বলেছি, তারপর কেউ কিছু বললে না। পেটে ক্ষিদে নিয়ে উঠতে হলো।"

মিসেস ফিশার বললেন, "কুকুর কাছে আমরা শিখে নিয়েছি, ইণ্ডিয়ানদের বার-বার অনুরোধ করতে হয়। প্রথমবারে কেউ হ্যাঁ বলে না। অন্তত তিনবার 'না'-এর জন্যে অপেক্ষা করতে হবে!"

খাবার পর খুকু কফির ব্যবস্থা করলো। ও-যে এ বাড়িরই মেয়ে হয়ে গিয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়।

কফি পানের পর বড়ো ছেলে গর্ডন বললো, "বাবা, আমার খবরের কাগজের হিসেব মেলাতে পারছি না।"

বাবা বললেন, "চলো, আমি তোমার ঘরে যাচ্ছি।"

মিস্টার ফিশার আমাকে বললেন, "আমার বড়ো ছেলে ভোরবেলায় খবরের কাগজ বিক্রি করে। আজকে গত সপ্তাহের হিসাব মেলাবার দিন।"

যাদের বাড়িতে দু'খানা ইমপালা মোটর গাড়ি, যার বাবা নামকরা কোম্পানীর পদস্থ অফিসার, সেই ছেলে সকালবেলায় খবরের কাগজ ফেরি করে।

খুকু বললো, "এদেশে এইটাই দেখবার এবং শেখবার।"

শ্রীমতী ফিশার বললেন, "গর্ডন আগে একটু, ঘুমকাতুরে ছিল। এখন ওর অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, খুব ভোরবেলায় উঠে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সাইকেলে স্পেশাল কেরিয়ার লাগিয়ে নিয়েছে—আমাদের দেশের খবরের কাগজ দেখেছেন তো—প্রায় দুপাউণ্ড ওজন।"

"মুস্কিল হয় ওর বাবার, তাই না?" খুকু জিজ্ঞেস করে!

"ঠিক বলেছো। গত সপ্তাহে গর্ডনের গলা ব্যথা হয়ে জ্বর হলো—তখন ওঁকে বেরুতে হলো ছেলের কাগজ বিলি করতে। উনি ছেলের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সব বাড়ি চিনে রেখেছেন।"

মনে মনে বললাম, "এইরকম ব্যাপার আমেরিকায় দ্বিতীয়বার দেখছি।

খুকু বললো, "ভাবতে পারো, কলকাতা, বোম্বাই বা দিল্লীর কোনো নামকরা কোম্পানীর ম্যানেজার সকালবেলায় ছেলের বদলি হিসেবে খবরের কাগজ বিলি করছেন! এবং তার জন্য কোনো সংকোচ বোধ করছেন না।"

আমাদের ছেলেরা এইগুলো বিদেশে শিখেছে তো? আমার জানবার কৌতূহল হয়। পশ্চিমের প্রাচুর্যের খবরটাই আমাদের কানে আসে—পশ্চিমের কর্মযোগটা আমাদের সামনে তুলে ধরা হয় না।

শ্রীমতী ফিশার ইতিমধ্যে পারিবারিক বিশ্বকোষের একটা খণ্ড হাতে নিয়ে মন দিয়ে পড়তে আরম্ভ করেছেন।

"ডেটিং-এর পরিচ্ছেদ আর একবার ঝালিয়ে দিচ্ছি, কুকু। আজ পামেলার ডেটিং রয়েছে। দু'-তিনদিন ধরে ওকে শেখাচ্ছি—ডেটিং-এ কী করতে হয় এবং কী করতে নেই।"

"আপনার নিজের অভিজ্ঞতাটা খাটালেই চলে যায়", খুকু প্রস্তাব করে। "না বাছা, দিনকাল দ্রুত পালটাচ্ছে। এখন ডেটিং-এর ধারা প্রতি বছরে পরিবর্তন হচ্ছে—সুতরাং নতুন বই বা ম্যাগাজিন পড়া ছাড়া উপায় নেই। তোমাদের

দেশের মায়েরা বেশ ভালই আছেন। ওঁদের এইসব ঝামেলা নেই।" শ্রীমতী ফিশার হেসে আবার বই-এর মধ্যে ডুবে গেলেন।

শ্রীমতী ফিশার ডেটিং-এ জামাকাপড়ের ফ্যাশন সম্পর্কে খবর খুঁজছেন। বইপড়া শেষ করে তিনি বললেন, "ডেটিং মানেই চিন্তা—মেয়ে বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত আমার ভয় কাটে না। ডেটিং এখন আমাদের সভ্যতার অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

খুকু বললো, "ডেটিং এখন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র চলেছে। কলকাতার হাই সোসাইটিতে ব্যাপারটা রীতিমত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।"

"পার্ক স্ট্রিট থেকে লোয়ার সারকুলার রোড পর্যন্ত কলকাতাখণ্ড তো বিলেতে-আমেরিকারই অংশ।" আমি উত্তর দিই।

"মানব-মানবী সম্পর্কে এই শতাব্দীর ঐতিহাসিক আবিষ্কার এই ডেটিং। পৃথিবীতে মার্কিন সভ্যতার বিশিষ্ট দান। জিনিসটা চালু হয়েছে প্রথম যুদ্ধের পরে, এই ১৯২০-২১ সালে", খুকু আমাদের বললো।

"তার আগেই তো পছন্দ করে বিয়ে করা—যাকে আমরা লভ্ ম্যারেজ বলি, তা এখানে চালু হয়ে গিয়েছে। তখন তাহলে কী ভাবে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন হতো?" আমি প্রশ্ন করি।

শ্রীমতী ফিশার বললেন, "আগে রবিবারের সকালে চার্চে সবাই জড়ো হতো। মায়েরা সেখানেই মেয়েদের সাজগোজ করিয়ে নিয়ে যেতেন এবং যোগ্য পাত্রের দিকে নজর রাখতেন। তারপর যখন মেয়ে কোনও যোগ্য ব্যাচেলরের চোখে ধরলো তখন পাত্রকে মেয়ের বাবার কাছে চিঠি লিখে আবেদন করতে হতো। আবেদনে নিজের বংশ পরিচয় এবং গুণাবলীর সুবিস্তৃত বিবরণ দিতে হতো। পাত্রীকে পাবার জন্যে এই তরুণ যুবক যে কতখানি আগ্রহী তা কায়দা করে চিঠির ভাষায় জানাতে হয়। কর্তা ব্রেকফাস্ট টেবিলে বেকন ও ওমলেট খেতে খেতে সেই সব সুদীর্ঘ পত্র পাঠ করবেন। চিঠির ভাষা থেকে আন্দাজ করবেন ছোকরাটি জামাই হিসেবে কেমন হবে। যদি পাত্র পছন্দ হয়, যদি তার পারিবারিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা মনের মতো হয়, তাহলে তিনি গিন্নীর সঙ্গে পরামর্শ করবেন—এবং পাত্রকে বাড়িতে নেমতন্ন করবেন। মেয়ের সঙ্গে পাত্রের যা ভাবের আদান-প্রদান তা ড্রইং-রুমে বসে বাবা-মায়ের সামনে করতে হবে।"

খুকু বললো, "আমেরিকান যৌবন যে স্বাধীন হতে চাইছিল তার প্রমাণ এই ডেটিং। নিজেদের বিয়ের ব্যাপারে বড়োদের খবরদারি তার সহ্য করতে রাজী নয়। তারা স্বাধীনভাবে মেলা-মেশা করতে চায় পার্টিতে। ফোনে ডেট ঠিক করে নিজেদের গাড়িতে জোড়ে বেরিয়ে যেতে চায়। তারা একসঙ্গে সিনেমায় যায়, একসঙ্গে জুকবক্সে পয়সা ফেলে পপ গান শোনে এবং নাচে।"

শ্রীমতী ফিশার বললেন, "ভাল-মন্দ বুঝি না, তবে ডেটিং নিয়ে আমেরিকান জাতের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে বিদেশে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন।"

"অনেকেই এর মধ্যে বেলেল্লাপনা ছাড়া কিছুই দেখতে পান না", খুকু স্বীকার করলো। "কিন্তু জিনিসটা অত সহজ নয়। ডেটিং ব্যবস্থা যে এদেশের জীবনধারাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছে তা মানতেই হবে।"

"ব্যাপারটা একটু খুলে বলো না। আমি দু'দিনের জন্যে এদেশে এসে একটা ভুল ধারণা নিয়ে যাবো, সেটা ঠিক নয়।"

খুকু হেসে বললে "উইনডো শপিং কথাটা শুনেছো নিশ্চয়। লোকে ঘুরে ঘুরে বিরাট বিরাট দোকানের শো-কেসে যে হরেক রকম জিনিস সাজানো থাকে তাই দেখে, অথচ কিছুই কেনে না। 'উইনডো শপিং', কথাটা প্রথমে ছিল ব্যঙ্গ, এখন সবাই বলছেন এর দরকার রয়েছে। ঘুরে ফিরে সব দেখে, শেষে মাথা ঠাণ্ডা করে মানুষ জিনিস কিনবে। কেউ কেউ ডেটিংকে বিবাহের উইনডো শপিং বলছেন।"

"তা ঠিক। একদিন ডেট করেই কেউ বিয়ে করছে না। সবাই ঘুরে ঘুরে দেখছে একটু আধটু কথা হচ্ছে, হাসি-ঠাট্টা, নাচ-গান, হৈ-হুল্লোড় চলছে, তারপর আবার অন্য কারুর সঙ্গে ডেটিং!" শ্রীমতী ফিশার তাঁর মতামত দিলেন।

খুকু বললো, "বার বছর বয়স থেকেই অনেক পরিবারের ছেলেমেয়ে ডেটিং শুরু করে।"

"না বাপু! অত কম বয়সে জিনিসটা ভাল নয়", মিসেস ফিশার তাঁর মতামত জানালেন।

"হিসেবে দেখা যাচ্ছে, শতকরা ২০ ভাগ ছেলে এবং ১৫ ভাগ মেয়ে তেরো বছর বয়সে তাদের প্রথম ডেটিং করে। তবে পনেরো বছর বয়সের মধ্যে প্রায় সব ছেলেমেয়ে ডেট-ক্রীড়ায় রপ্ত হয়ে যায়।"

"ওই পনেরো বছর বয়সটাই ভাল। তবে কি জানো, আজকাল ছেলেমেয়েদের ওপর বাবা-মায়ের সেরকম প্রভাব থাকে না। ইস্কুলে এবং পাড়ায় ছোটরা যা দেখছে তা থেকে ওদের দূরে সরিয়ে রাখা বেশ শক্ত কাজ", দুঃখ প্রকাশ করলেন মিসেস ফিশার।

খুকু বললো, "ডেটিং এর ওপর আমি স্পেশাল পেপার লিখেছি। ১৬ বছর বয়সে যে ছেলে মেয়ে ডেটিং গেমে নামলো না তার সম্বন্ধে মায়েরা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েন। বেশীর ভাগ মা ছোটেন মানসিক রোগের চিকিৎসকদের কাছে। চোখ ছলছল করে বলেন, ডাক্তার, আমার এই মেয়েটির কী হবে বলুন তো? একটিও ছেলে বন্ধু নেই। অথচ আমার মেয়েটির তো দৈহিক আকর্ষণ কম নয়। দেখতে সুন্দরী, দাঁত এবড়োখেবড়ো নয়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, অহেতুক ঘামে না, মুখে গন্ধ নেই। কথাবার্তাও খারাপ বলে না। আমি কত বলি, কিন্তু

মেয়ে শুধু মেয়ে বান্ধবীদের সঙ্গে ফোনে কথা বলছে, চিঠি লিখছে, গল্প করছে।”

“সর্বত্রই তা হলে প্রতিযোগিতা?” আমি জিজ্ঞেস করি।’

“এবং সে-প্রতিযোগিতায় নিজেকে লড়তে হবে—আমাদের দেশের মতো বাবা-মাকে এগিয়ে দিলে কাজ হবে না।”

মিসেস ফিশার বললেন, “কিন্তু ডেটিং-এর অর্থ শুধু পাত্র-পাত্রী নির্বাচন নয়।”

খুকু ওঁর সঙ্গে একমত হলো। বললো, “ওটাই নাটকের শেষ অঙ্ক। তার আগেও অনেক আছে।”

মিসেস ফিশার বললেন, “কুকু তুমি তো ডেটিং করো না অথচ কেমন শিখে গিয়েছো। আমি জোর করে বলতে পারি, যে সব আমেরিকান মেয়ে ডেট ছাড়া আর কিছুই করছে না, তারাও তোমার মতো খবরাখবর রাখে না।”

“আমার যে পরীক্ষার পড়া কাকীমা। এসব না জানলে ‘এ’ পেতাম না পরীক্ষায়।” খুকু উত্তর দিলো।

তারপর আমার দিকে তাগিয়ে খুকু বললো, “আমেরিকার যৌবন এই ডেটিংকে কেন্দ্র করেই ঘুরপাক খাচ্ছে। যা কিছু ডেটিং-এর পক্ষে বাধাস্বরূপ তা এদেশে টিকবে না। ছেলেমেয়েদের আলাদা কলেজের কথা ধরো। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। কারণ ছেলেরা বা মেয়েরা কাদের সঙ্গে মিশবে? কাদের ডেটে নিমন্ত্রণ জানাবে? বহু কলেজ তাই বাধ্য হয়ে সহশিক্ষার ব্যবস্থা করেছে।”

খুকু বললো, “ডেটিং এখন বালক-বালিকা এবং অবিবাহিত যুবক যুবতীদের অবসর বিনোদনের প্রধান পদ্ধতি। পাত্র পাত্রী সন্ধান ছাড়াও এর অন্য মূল্য রয়েছে। এদেশের ধারণা, ডেটিং-এ ছেলে এবং মেয়ের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়। পুরুষ পুরুষোচিত ব্যবহার করতে শেখে, এবং মেয়েদের মেয়েলি গুণগুলো ফুলের মতো ফুটে উঠে। তাছাড়া নিজের ফ্যামিলির বাইরে পৃথিবী সম্বন্ধে ধারণা জন্মায়। মেয়েরা পুরুষ জাত সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে এবং ছেলেরাও মেয়ে বলতে কী বোঝায় তা শিখে নেয়। ফলে দু’পক্ষই নিজেদের ব্যবহার এবং ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। এই ট্রেনিং পরবর্তীকালে বধূ এবং স্বামী দু’জনেরই উপকারে লাগে।”

“আমি তোমার সাথে সম্পূর্ণ একমত কুকু,” বললেন শ্রীমতী ফিশার। “ডেটিং-এর সবচেয়ে বড়ো লাভ অপোজিট সেক্স সম্পর্কে রহস্য কেটে যায়। আজকের যুগে এটা বিশেষ দরকার। এখন এতো ছোট ছোট সংসার যে অনেক মেয়ের সমবয়সী ভাই নেই, অনেক ছেলের বোন নেই। ফলে তারা অন্য সেক্স সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারে না। আমার কথাই ধরো না। বাবা মায়ের এক সন্তান

আমি। এটা মোটেই ভাল নয়। ভাই বা বোন হওয়ার অভিজ্ঞতাও জীবনে মূল্যবান। সংসারে যারা এক সন্তান এবং একলা বড়ো হয় জীবনে তাদের খাপ খাইয়ে নিতে বেশী মেহনত করতে হয়। আমি আবার মেয়ে স্কুলে পড়তাম! ফলে ডেটিং ছাড়া আর কোথাও ছেলেদের সঙ্গে পরিচয় হতো না। ওরা যে আমাদের থেকে আলাদা তা ডেটিং-এ গিয়েই প্রথম বুঝতে পারলাম।"

খুকু বললো, "ডেটিং এর পক্ষে সবচেয়ে বড়ো যুক্তি এতে ছেলেমেয়েরা নিজের ব্যক্তিত্ব অপরের উপর বিস্তারের সুযোগ পায়—মানব চরিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হয় এবং নিজের ব্যক্তিত্বের ত্রুটি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হয়, ফলে নিজেকে শোধরানোর একটা সুযোগ পাওয়া যায়।"

শ্রীমতী ফিশার বললেন, "প্রেমের এই প্রতিযোগিতায় অনেকে বেশ রপ্ত হয়ে ওঠো, অনেকে একেবারে ভেঙে পড়ে। অনেক মেয়ের ছেলেমহলে ভয়ানক খাতির, ফলে তারা যা-খুশী করে বেড়ায়। একটু মাথা বিগড়ে যায়। অনেকের আবার উল্টো। ডেটিং-এর ব্যর্থতা তাদের পড়াশোনা খারাপ করে দেয়।"

খুকু বললো, "যেখানে এই ধরনের সমস্যা হয় না, সেখানেও নার্ভের ওপর চাপ পড়ে। দু'পক্ষই এমন মায়াজাল বিছাবার চেষ্টা যাতে অপরপক্ষ খুব তাড়াতাড়ি প্রেমে হাবুডুবু খায়! সে প্রেম যে গ্রহণ করা হবে তার কোনো কথা নেই। কিন্তু এতে বন্ধু মহলে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ডেটিং-এ বাজার দাম বাড়ে। মেয়েরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, অমুক যে-সে ছোকরা নয়, চারটে মেয়ে ওর প্রেমে পাগল।"

"এটা কি খুব ভাল অবস্থা? বিশেষ করে যখন সবাইকে পরীক্ষার পড়া করতে হচ্ছে?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"ভাল-মন্দ জানি না, এইটাই পরিস্থিতি" খুকু উত্তর দেয়।

"আমিও ভাল-মন্দ জানি না, তবে ছেলেদের সম্পর্কে মেয়েদের এবং মেয়ে জাত সম্পর্কে পুরুষদের অভিজ্ঞতা অর্জনের একমাত্র ন্যায়সঙ্গত উপায় হলো ডেটিং। কারণ, বিয়ের পরে স্বামী-স্ত্রীকে সব সময় জোড়ে ঘুরে বেড়াতে হবে, তখন আলাদা ঘোরবার স্বাধীনতা নেই," বললেন শ্রীমতী ফিশার।

"কেউ কেউ বলছে ডেটিং-এর শেষ অধ্যায়টা বিবাহিত জীবনের রিহার্সাল। কে কতখানি নিজেকে মানিয়ে নিতে প্রস্তুত আছে তা এই সময় বোঝা যায়।"

শ্রীমতী ফিশার বললেন, "সবাই তো শুনলাম, কিন্তু পামেলার জন্যে আমার চিন্তার শেষ নেই। ওই তো এক ফোঁটা মেয়ে—সবে ওর ডেটিং-এর শুরু। যতদিন না বিয়ে হচ্ছে ততদিন ফাঁড়া কাটবে না। ডেটিং-এর বিরুদ্ধে কোনো চার্চের ফাদার একবার বলেছিলেন—যৌনগন্ধে ভরপুর সস্তা মজা ছাড়া এতে আর কিছুই নেই। আমাদের ছেলে-মেয়েদের অবসর বিনোদনের জন্যে আমরা

কি এর থেকে ভাল কিছু ভাবতে পারি না?"

আমি বললাম, "ঈশ্বর-প্রেমিকদের কথায় চিন্তিত হবেন না। আমাদের দেশে শংকরাচার্য নামে এক সত্যদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনিও দুঃখ করেছেন—

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ।
তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ ॥
বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ।
পরমব্রহ্মনি কোহপি ন লগ্নঃ ॥

অর্থাৎ বালকরা খেলাধুলোয় মগ্ন, যুবকরা সমর্থ তরুণীদের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যস্ত, বৃদ্ধরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত—হায়, ঈশ্বর সম্বন্ধে কারও আগ্রহ নেই।"

শ্রীমতী ফিশার হাসতে লাগলেন। এবং মন্তব্য করলেন, "যাই বলুন, চার্চের ফাদার ডেটিং সম্পর্কে যা বলেছেন তা ভেবে দেখা দরকার।

ভাববার আর সময় পাওয়া গেলো না। বড়ো ছেলে গর্ডনকে সঙ্গে নিয়ে মিস্টার ফিশারের প্রবেশ এবং ঘোষণা "খবরের কাগজের হিসেব মিলে গিয়েছে। সামনের সপ্তাহ থেকে গর্ডন আরও দশখানা কাগজ বেশী বিক্রি করবে, ফলে রোজগার আরও বাড়বে।"

বাবাকে গর্ডন মনে করিয়ে দিলো, "বাবা ভুলো না যেন তুমি বলেছো আমি নিজে যত রোজগার করতে পারবো, তুমি তার ডবল আমাকে বোনাস হিসেবে দেবে।"

মিস্টার ফিশার আশ্বাস দিলেন, সেকথা তিনি মোটেই ভোলেননি।

শ্রীমতী ফিশার এবার মেয়ে পামেলাকে কাছে বসালেন। জিজ্ঞেস করলেন, "ডেট তোমাকে কখন নিতে আসবে?"

সন্ধ্যা ছটায় তো বলেছে। জিম কী লম্বা মা! আর তেমনি খেলোয়াড়, এবার ফুটবল টিমের ক্যাপটেন হতে পারে। বলো, এটা গ্রেট-অনার কিনা, ও আমাকে ডেকে বলেছে। অন্য মেয়েরা তো হিংসেয় লাল!"

মেয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হলেন বেচারা মিসেস ফিশার। তারপর ফিসফিস করে মেয়েকে বললেন, "তোমাকে গতকাল যা বলেছিলাম, সভ্য মেয়েরা ডেটিং-এ কতকগুলো আইন মেনে চলে। যারা ওসব নিয়ম মানে না তারা পরে দুঃখ পায়। মনে রেখো, ছেলেরা অধৈর্য হয়ে অনেক কিছু চায়, কিন্তু চাইলেই দিতে নেই। পেলে ওরা শান্ত হয় না, আরও চায়। চাওয়া মাত্রই দিলে ছেলেমহলে মেয়েদের কোনো দাম থাকে না। ওরা মনে মনে সেই মেয়েকে সস্তা ভাবে, তার সম্বন্ধে আগ্রহ নষ্ট হয়ে যায়।"

পামেলা গম্ভীরভাবে মার কথা শুনে যাচ্ছে। শ্রীমতী ফিশার বললেন, "মনে

থাকে যেন, কোনো বদ রেস্তোরাঁয় মেয়েদের যেতে নেই। আবার বন্ধুর মানিব্যাগের কথাও বিবেচনা করতে হয়—বেশী খরচ করিয়ে দেওয়া ঠিক নয়।"

"কেন মা?" পামেলা জিজ্ঞেস করে।

"বেশী খরচ হয়ে গেলে বেচারা তোমাকে ঘন ঘন ডেট করবে কী করে?"

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে শ্রীমতী ফিশার জিজ্ঞেস করেন, "জিম যদি নাচ থেকে ফেরবার পথে তোমার হাত চেপে ধরে তাহলে তোমাকে কী করতে হবে মনে আছে?"

পামেলার উত্তর ঃ "হুঁ। আমাকে আইসক্রিমের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যেতে হবে। হাতটা কাঠের মতো শক্ত করে আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিতে হবে।"

"বাঃ এই তো লক্ষ্মী সোনা, বেশ মনে আছে।"

শ্রীমতী ফিশার এবার মেয়েকে সময় সম্পর্কে সাবধান করে দিলেন। "বেশী রাত কিছুতেই করবে না।"

"কত রাতকে বেশী রাত বলো?" মেয়ে জানতে চায়।

"সাড়ে এগারো, বড় জোর বারো। তোমাকে পৌঁছে দিতে এসে ডেট যদি কিছুক্ষণ বাড়িতে থাকতে চায় তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু মনে রাখবে, ঘরের আলো নেভানো চলবে না। এবং আধঘণ্টার মধ্যে ডেট-এর চলে যাওয়া উচিত।"

"জিম যদি না যায় আমি কী করে তাকে যেতে বলবো?" পামেলার প্রশ্ন।

"যদি দেখো বন্ধু উঠছে না, তা হলে মাঝে-মাঝে নিজের ঘড়ির দিকে তাকাবে, বলবে অনেক রাত হয়ে গেছে। তাতেও যদি ফল না হয়, মিষ্টি হেসে ওকে সন্ধ্যার অভিজ্ঞতার জন্য ধন্যবাদ জানাবে, তারপর আস্তে-আস্তে দরজার দিকে এগিয়ে যাবে।"

মিসেস ফিশার বললেন, "তোমার যদি তেমন ইচ্ছে হয়, তোমার বন্ধুকে একদিন বাড়িতে ডেট করতে বলতে পারো।"

মেয়ে মুখ টিপে হাসলো। শ্রীমতী ফিশার বললেন, "আরও অনেকগুলো কথা আছে—তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে গিয়ে এখন বলবো। যারা খুব ভাল মেয়ে তারা এইসব নিয়ম মেনে চলে এবং শেষ পর্যন্ত হীরের টুকরো স্বামী পায়।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে খুকু বললো, "এবার আমাদের উঠতে হবে। মামার হাতে তো মাত্র পাঁচটা দিন। তার মধ্যে দুটো দিন শেষ হতে চললো।"

ডিডি এখনই চলে যাচ্ছে শুনে ছেলে-মেয়েদের মন খারাপ হয়ে গেল। "সে কি ডিডি? আমরা যে ঠিক করে রেখেছিলাম, গাড়ি করে লেকের ধারে বেড়াতে যাবো। সেখানে তুমি আমাদের ইণ্ডিয়ান 'কিৎকিৎ' খেলা শেখাবে।"

"পরের সপ্তাহে জোর খেলা হবে। তোমাদের যদি ভোট পাই, তাহলে ওখানে চড়ুইভাতি হবে।" খুকু ওদের শান্ত করবার জন্য বললো।

ছেলেমেয়েরা এক কথায় রাজী।

ফিশার দম্পতি সামান্যক্ষণের মধ্যে আমাকে কেমন আপন করে নিয়েছিলেন। কে বলবে, ওঁরা সায়েব আমরা ভারতীয় ; ওঁরা খ্রীস্টান আমরা হিন্দু ; ওঁদের এবং আমাদের মধ্যে অনেক দূরত্ব!

মিস্টার ফিশার আমাকে বললেন, "কুকু-র মা-বাবাকে আমাদের শুভেচ্ছা দেবেন। বলবেন, তাঁদের মেয়ের জন্যে কোনো চিন্তা নেই। তাঁদের যদি কোনো দরকার হয় আমাদের লিখতে পারেন। এমন কি তাঁরা যদি বেড়াতে আসেন আমাদের এখানে থাকতে পারেন।"

মিসেস ফিশার বললেন, "আমাদের দুঃখ, আপনি এখানে দু'একদিন থাকলেন না। আমরা সাধারণ গৃহস্থেরা ছেলেপুলে নিয়ে কেমনভাবে দিন কাটাই তা আপনাকে দেখাতে পারলাম না। তবে আবার আসবেন।"

আমরা গাড়িতে উঠে, জানলার কাঁচ নামিয়ে দিয়ে হাত নাড়লাম। খুকু গাড়িতে স্টার্ট দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে কানে এলো কোকিলের ডাক। তিনটে ছেলেমেয়ে মুখে হাত দিয়ে শব্দ করছে কু-উউ—কু-উউ। আর আমরা দেখলাম, তাদের বাবা-মা পরম স্নেহভরে আমাদের গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছেন।

॥ [illegible] ॥

খুকুর ওপর আমার ভরসা অনেক বেড়ে গিয়েছে। নিরন্তর গার্জেনির বন্ধন সরিয়ে এনে বিদেশী পরিবেশে কাউকে স্বাধীনভাবে বিকশিত হতে দিলে কী ফল হয়, খুকু তার জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ। আমাদের কলকাতার সেই ভীরু লাজুক মেয়েটা এই সামান্য ক'বছরে কী আশ্চর্য পাল্টে গিয়েছে। তাজুদির ভাল লাগবে কিনা জানি না। মেয়েদের আত্মবিশ্বাস সম্বন্ধে ওঁর অন্যরকম ধারণা। তাজুদির একটা কথা নাটক নভেলে চালাবার মতো। "লাউগাছ মাচা ছেড়ে শক্ত হয়ে দাঁড়ালে বাঁশ গাছও হয় না, লাউ গাছও থাকে না।" কিন্তু এই স্বাধীনতা আমার ভাল লাগে। এই স্বাধীনতার সূর্যোদয় হলে আমাদের মা বোন স্ত্রী ও মেয়েরা জীবনকে আরও উপভোগ করতে পারবে, সংসার সুন্দর হয়ে উঠবে এবং নতুন যুগের সন্তানরা স্বাধীন দেশের উপযোগী হয়ে উঠবে।

খুকুর প্রশ্ন "মামা, কি ভাবছো?"

"ভাবছি সেদিনকার ছোট্ট মেয়েটা কেমন সুন্দর আমার গার্জেন হয়ে গেছিস, আমিও কেমন বিদেশে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রয়েছি।"

"মামা, তোমাদের বাৎসল্য রস ছাড়ো। স্নেহে অন্ধ হয়ে ভাবছো ভাগনী তোমাদের কেষ্টবিষ্টু হয়েছে, কিন্তু তা নয়। এ-দেশে এই সব আমেকিরান

ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরীক্ষায় একটু ভাল ফল দেখাতে হলে শক্তি এসে যায়।”

“খুকু, আমরা এখন কোথায় চলেছি?”

“তোমার মালপত্র তো গাড়িতেই রয়েছে। আমরা চিঁড়ে বউদির বাড়িতে চা খেয়েই গোল্ডেন হোমে গিয়ে উঠবো।”

খুকু আমাকে এবার সাবধান করে দিলো, “দেখো, তুমি যেন ওঁকে চিঁড়ে বউদি বলে ফেলো না, তাহলে কেলেংকারি হবে। ওটা ওঁর গোপন নাম, যে নামে ওঁকে আড়ালে সবাই ডেকে থাকে।”

আমি এবার একটু উৎসাহিত বোধ করি। খুকুকে জেরা শুরু করলাম।

চিঁড়ে বউদি আসলে মিসেস জয়শ্রী গোস্বামী। ওঁর স্বামী ডঃ রতন গোস্বামী এখানে বছর আষ্টেক আছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টারে। শ্রীমতী গোস্বামী আকারে বিপুল। সেই তুলনায় ডঃ গোস্বামী নিতান্তই স্লিম। চিঁড়ে বউদি নামটার উৎপত্তি গভীর রহস্যজনক। বহু বছর আগে শ্যামবাজার থেকে আসা এক ফ্রেশম্যান গোস্বামী দম্পতিকে দেখে ভয় পেয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে, “ওরে বাপ, গিন্নী ঘাড়ে পড়লে কর্তা চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে।” সেই থেকেই চিঁড়ে বৌদি নামটা চালু হয়ে গিয়েছে।

চিঁড়ে বউদির স্বামী এখানকার ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। খুকু বললো, “ইন্ডিয়ান বেশী নেই, তবু একটা সমিতি রাখা হয়েছে, মাঝে মাঝে দেখাশোনা মেলামেশা হয়।”

খুকুর ফোকসওয়াগেন হু-হু করে আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দিলো। ডঃ গোস্বামীর বাড়ির বেল টিপতেই যিনি দরজা খুললেন তিনিই যে চিঁড়ে বউদি তা বুঝতে আমার মোটিই কষ্ট হলো না। চিঁড়ে বউদির মুখে পান। ঠোঁট লাল হয়ে উঠেছে।

মুখের পান সামলাতে সামলাতে চিঁড়ে বউদি সুচরিতার হাত-দু’খানা জড়িয়ে ধরলেন। “এসো ভাই, এসো। রায়বাঘিনী ননদিনীর যে আজকাল দেখাই নেই! আইবুড়ো মেয়ে হঠাৎ খবরাখবর নেওয়া বন্ধ করলে আমার ভয় হয়, হয়তো কোথাও মন দেওয়া-নেওয়া আরম্ভ হলো।”

“আঃ বউদি কি আরাম! হাত দু’টো আর একটু টিপুন। ভগবান আপনাকে ন্যাচারাল ডানলোপিলো দিয়েছেন,” খুকু রসিকতা করে।

আমি ভাবি, এরা তো বিদেশে বেশ জমিয়ে বসে আছে! ঠিক খোঁজখবর নিয়ে কোথায় কোন্ দেশোয়ালী আছে যোগাড় করে বিদেশে স্বদেশের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

চিঁড়ে বউদি বললেন, “সরো সুচরিতা। তোমরা তো চোদ্দ আনা আমেরিকান

হয়ে গিয়েছো! আমি দেশের লোক শংকরবাবুকে একটু আদর আপ্যায়ন করি।"

চিঁড়ে বউদি আমার দিকে এগিয়ে এসে নমস্কার করলেন এবং ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। বললেন, "কর্তা সুযোগ পেয়ে দিবানিদ্রা নিচ্ছেন। ওঁকে ডেকে তুলি।"

কর্তাকে তুলে দিয়ে বউদি আবার ঘরে এসে বসলেন। ডঃ রতন গোস্বামীও পিছন-পিছন হাজির হলেন। ভদ্রলোকের মাথায় মাঝারি আকারের টাক পড়েছে, কিন্তু বেশ ধারালো চেহারা। গলায় পৈতে উঁকি মারছে।

সুচরিতা বললো, "এ তো অষ্টম আশ্চর্য। বউদি, পান কোথা থেকে যোগাড় করলেন?"

"হুঁ হুঁ। বুদ্ধি এবং উদ্যম থাকলে সব হয়", বউদি হুঙ্কার ছাড়লেন?

"না বউদি, তার সঙ্গে গোস্বামীদার মতো একটি শিবতুল্য স্বামী দরকার।"

বউদি পান সামলাতে সামলাতে বললেন, "লণ্ডনে আজকাল পান আসছে, আমার মাসতুতো বোনের চিঠিতে জানলাম। লণ্ডন থেকে আমাদের এই জায়গা আর কত দূর বলো?"

কর্তা ব্যঙ্গ করে বললেন, "না, এমন কিছু নয়—মধ্যিখানে আটলান্টিক মহাসাগরটা আর হাজার দেড়েক মাইলের স্থলভাগ!"

"দু'দিন আগে এক ভদ্রলোক লণ্ডন থেকে এসেছেন, তাঁর সঙ্গেই গোপনে পানগুলো এসেছে—এখন খেয়ে বাঁচছি। আহা, পানের মতন জিনিস আছে?"

"গত দুদিন ধরে তোমাদের বউদি শুধু পানের পরিচর্যা করেছেন—কি করে ওদের দীর্ঘায়ু করা যায় তার গবেষণায় লেগে রয়েছেন।"

রতনবাবু আমাকে বললেন, "আমরা দশ বছর দেশছাড়া। যাবো যাবো করি, কিন্তু খরচের অঙ্কটা ভাবলেই মন খারাপ হয়ে যায়। ইচ্ছে, ফিরবো যখন একেবারেই ফিরবো। দেশের লোক দেখলে যে কী আনন্দ হয় কী বলবো। বিশেষ করে আমার স্ত্রীর। একেবারে কলকাতার মেয়ে—বিদেশে দশ বছর থেকেও মানসিকভাবে এখানকার পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারলেন না।"

"রক্ষে করো বাপু। আমি মরে গেলেও মেমসায়েব হতে পারবো না। জানেন শংকরবাবু, আজকাল অনেক দেশী বউ এখানে এসে শাড়ি ছেড়ে ফ্রক পরছে—বাড়িতে হাফ প্যান্ট পরে কাজকর্ম করছে।"

সুচরিতা বললেন, "বউদি, আপনার গলায় যেন আর একটু মাদুলি বেড়েছে?"

"উঃ। তোমার নজরও বলিহারি। কোথায় কি একটু বেড়েছে, তাও চোখ এড়ালো না", বউদি সস্নেহে বকুনি দেন।

"ওই এসেছে কামাক্ষ্যা থেকে বাই এয়ার মেল। নাম সতীসাবিত্রী কবচ।

সতীসাবিত্রী নারী এই কবচ ধারণ করলে স্বামীর উপর দুষ্টনারীর নজর পড়ে না।"

ডঃ গোস্বামীর কথায় সুচরিতা মুখ টিপে হাসতে লাগলো।

বউদি নিজের মাদুলিটা একটু নেড়ে বললেন, "হেসো না বাছা! নিজের স্বামীটি হোক—তখন বুঝবে কত দুশ্চিন্তা। আমার দিদিমা বলতেন—স্বামী না কাঁচের বাসন! নিজের হাতে সাবধানে ধুয়ে মুছে সব সময় আলমারিতে তুলে রাখবে।"

ওরা দু'জনে আবার হাসতে যাচ্ছিল, কিন্তু শ্রীমতী জয়শ্রী গোস্বামী এবার আমাকে সালিশী মানলেন। "আপনি তো সাহিত্যিক—মানুষের মনের খবর রাখেন, বলুন তো পুরুষমানুষদের বিশ্বাস করা উচিত?"

ডঃ গোস্বামী বললেন, "গল্পের পুরুষমানুষদের কখনও বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু জীবনের পুরুষমানুষ এবং গল্পের পুরুষমানুষ এক নয়।"

"বাজে-বাজে বোকা না", মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলেন শ্রীমতী জয়শ্রী গোস্বামী।

কর্তা জানালেন, "ওঁর মেজাজটা ঠিক নেই। ওই খবরটা পড়া পর্যন্ত।"

"কী খবর বউদি?" সুচরিতা জিজ্ঞেস করে।

কর্তাই উত্তর দিলেন, "মোটা স্ত্রীদের স্বামীদের নাকি ডাইভোর্স করবার সম্ভাবনা রোগা স্ত্রীদের স্বামী অপেক্ষা শতকরা ৮৩·৪ ভাগ বেশী। তারপরেই তো তোমাদের বউদি খাওয়া কমাতে আরম্ভ করেছেন। সকালে মৃদু একসারসাইজ করছেন এবং শাশুড়ীকে চিঠি লিখে এক্সপ্রেস মেলে সতীসাবিত্রী কবচ আনালেন।"

চিড়ে বউদি বললেন, "খুব হয়েছে, এখন স্ত্রীনিন্দা ছেড়ে একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসো।"

চিড়ে বউদি এবার আমাদের খাবার ঘরে নিয়ে গেলেন। সমস্ত টেবিলটা ছোট বড়ো তিরিশ চল্লিশখানা বাটিতে বোঝাই! তার কোনোটাতে মাছ, কোনটাতে মুরগী, কোনোটাতে সন্দেশ, কোনোটায় রসগোল্লা, কোনোটায় পায়েস, কোনোটায় পুডিং।

"একি করেছেন বউদি! এর নাম চা।" খুকু আর্তনাদ করে উঠলো।

"তুমি বাজে বাজে বোকো না! দেশে ফিরে গেলে খেতে পাবে না। এমন দুধ এমন মাংস কোথায় পাবে?"

আমাকে বললেন, "সবে নিজে তৈরি করেছি। এখানে রান্নার এত জিনিস। কিন্তু খাওয়াবার লোক নেই। সবাই ওজন-ওজন করে উপবাসি হচ্ছি।"

ডঃ গোস্বামী বললেন, "ভাববেন না, আমরা বেশী খরচ করেছি। মুরগীটা এখানে সবচেয়ে সস্তা মাংস—গরীবের খাদ্য। যদি কাউকে বোঝাতে হয়, তার দিনকাল ভাল যাচ্ছে না সে বলে, পয়সাকড়ির এমন অভাব যে শুধু মুরগীর ওপর আছি!"

ওই খাবারের ওপর যথাসাধ্য সুবিচার করে, আমরা আবার বসবার ঘরে ফিরে এলাম। চিঁড়ে বউদি বললেন, "ভগবানের কাছে রোজ প্রার্থনা করছি, কবে দেশে ফিরে যাবো!"

"বেশ তো আছেন বউদি, ফেরবার জন্যে এত তড়িঘড়ি কেন? জানেন তো দেশের অবস্থা—বার মাসে তেরো সমস্যা লেগে আছে। এখানে খাওয়া দাওয়া থাকা-পরার কোনো চিন্তা নেই। দাদাও নিজের মেজাজে কাজকর্ম করছেন।" সুচরিতা বউদিকে রাগাবার জন্যেই বোধ হয় কথাগুলো বলে ফেললে।

"রক্ষে করো ভাই। খাওয়া-পরা মাথায় থাকুক—ভবানীপুরে যেখানে ছিলুম সেখানেই আমাকে ফিরিয়ে দাও।" বউদি এমনভাবে কথাগুলো বললেন, যেন সুরচিতাই ওঁদের ফিরিয়ে দেবার কর্তা।

ডঃ গোস্বামী বললেন, "ওঁর দুটি ভয়—স্বামী এবং ছেলে।"

"ঠিকই তো। স্বামী আর সন্তান ছাড়া মেয়েমানুষের আর কী আছে?" বউদি চ্যালেঞ্জ করেন।

"খোকার তেরো বছর বয়স হয়ে গেলো। সেদিন এসে বলে কি না, মা, আমি ডেট করবো। আমাদের ক্লাশের ছেলেরা সবাই ডেট করছে। আমি অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে মত পালটিয়েছি, কিন্তু কতদিন পারবো? আর ওঁকেও আমি বিশ্বাস করি না। ওঁর যত সব বন্ধু কেউ দু'বার ডাইভোর্স করেছে, কেউ তিনবার। এখানে কথায়-কথায় বিয়ে ভাঙে। গাড়ির টায়ার পাল্টাবার মতো এরা বউ পাল্টায়। আর বলিহারি যাই আদালত, তারা কিছুই বলে না।"

জানা গেলো শ্রীমতী গোস্বামী ইন্দোমার্কিন বিবাহের বিশেষ বিরোধী। বললেন, যখন শুনি "ইন্ডিয়ান ছেলেরা, শনিবার রাত্রে মেমসায়েবের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন আমার মাথায় রক্ত উঠে যায়।"

"ইন্ডিয়ান মেয়ে যদি সায়েব ছোকরার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় তাতে তোমার আপত্তি নেই তো?" ডঃ গোস্বামী সমস্যাকে আরও পাকিয়ে তুললেন।

এরপর যা শুরু হলো তা মিশ্রবিবাহ সম্পর্কে একটি বিতর্কসভা। বৈজ্ঞানিকের মন দিয়ে ডঃ গোস্বামী বললেন,—"তিন রকম বিবাহ হতে পারে। দেশী ছেলের সঙ্গে দেশী মেয়ের, কিংবা পাত্র দেশী, পাত্রী মেম-সায়েব, অথবা সায়েব পাত্র, দেশী পাত্রী।"

"ছি ছি, আমাদের দেশের ছেলে মেমসায়েব বিয়ে করবে তা তুমি ভাবতে পারছো?" চিঁড়ে বউদি এবার স্বামীর দিকে তেড়ে গেলেন।

"ভাবার প্রশ্ন নয়, যা হচ্ছে তাই বলছি," ডঃ গোস্বামী নিজের পক্ষে সওয়াল করেন। "কিন্তু তুমি রেগে যাবার আগে আমার বক্তব্যটা শোনা। কোনো মেমসায়েবকে বধূ করা মানে—ভারত সংস্কৃতির প্রচারবৃদ্ধি হলো। জিনিসটা

ভাবতে তোমার ভাল লাগছে না? কোনো আমেরিকান নাগরিক পুরোপুরি একজন বঙ্গসন্তানের শাসনের অধীন—তাকে ইচ্ছে করলেই শ্যামবাজার বা শিয়ালদহের বাড়িতে তোলা যায়। আর তুমি তো জানো, যত রকম জয় আছে তার মধ্যে সংস্কৃতিক বিজয়ই সবচেয়ে বড়ো। সাধে কি আর সম্রাট অশোক যুদ্ধবিজয় ছেড়ে ধর্মবিজয়ে উৎসাহিত হয়েছিলেন? অশোককে যারা নিতান্ত বোকাসোকা ভালমানুষটি ভাবে আমি তাদের দলে নই।"

চিঁড়ে বউদির চোখ ছলছল করে উঠলো। তিনি বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, "কেন তোমরা আমাকে জ্বালাতন করছো? বিদেশে এসে এই সব হীরের টুকরো ইন্ডিয়ান ছেলে এক একটি বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী নিয়ে ঘরে ফিরবে, এ আমি সহ্য করবো না। বিয়ে জিনিসটা ছেলেখেলা নয়।"

সুচরিতা বললো, "সমাজে অনেক সময় মৌখিক ভালবাসা থাকে—কিন্তু বিয়ের কথা উঠলেই স্বরূপ বেরিয়ে পড়ে। অনেকের ধারণা, সামাজিক প্রীতির সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ সেই সমাজের কাউকে বধূ করতে বা জামাই করতে রাজী আছে কিনা।"

"স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি। জামাই করতে রাজী আছে কিনা, এইটাই বড়ো পরীক্ষা," ডঃ গোস্বামী তাঁর মতামত জানালেন।

চিঁড়ে বউদি খানিকটা কোণঠাসা হয়ে সুচরিতার সঙ্গে চাপাগলায় কী সব শলাপরামর্শ করলেন। তারপর বললেন, "দেশের ছেলেদের মেমসায়েব বিয়ে করতে তো নেহাত কম দেখলাম না। সাংস্কৃতিক বিজয় তো দূরের কথা তারাই সব বউ-এর কথায় উঠছে বসছে। জামাই আর ঘরজামাই এক জিনিস নয়।"

সুচরিতা এবার চিঁড়ে বউদির কথায় সায় দিয়ে বললে, "মেয়েরা যেখানেই যায় সেখানেই তাদের সাংস্কৃতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং কেউ যদি বলে, এক একটি মেমসায়েব বউ মানে এক একটি সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ, তাহলে খুব ভুল হবে না।"

"অ্যাঁ? তার মানে কোনো জাতকে কব্জা করতে হলে তাদের ছেলেদের জামাই করো। রণকৌশল হিসেবে এটা যাচাই করে দেখা দরকার!" ডঃ গোস্বামী মন্তব্য করলেন।

খুকু বললো, "মেয়েরা শুধু নিজের স্বামীকে নিজের কালচারের দিকে টানবে তাই নয়, সন্তানের মধ্য দিয়ে নিজের কালচারকে পাকাপোক্ত করবে।"

খুকুর এই বক্তব্যের মধ্যে হয়তো কিছু যুক্তি আছে। কিন্তু কথাটা আমার তেমন ভাল লাগল না। এয়ারপোর্টের সেই আমেরিকান ছোকরার মুখটা ভেসে উঠলো। স্বীকার করছি, খুকুর মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে কিন্তু তাই বলে সাহেব বিয়ে করার পক্ষে। কোনো ছেলে মেম বিয়ে করলে তেমন গায়ে লাগে

না, হাজার হোক কিছু এলো ; কিন্তু মেয়ে দেওয়া মানেই তো কিছু হারানো এবং চিরদিনের জন্যে।

খুকু বললো, "বউদি, আপনার সঙ্গে মামার এইটাই শেষ সাক্ষাৎ নয়। মামা এখানে আরও কয়েকদিন থাকছেন, সুতরাং দেখা হবে নিশ্চয়।"

আমার প্রোগ্রাম সম্বন্ধে এঁরা খবরাখবর রাখেন দেখছি। ডঃ গোস্বামী বললেন, "বুদ্ধিটা ভালই করেছো—বৃদ্ধনিবাসের মধ্যেই ওঁর থাকবার ব্যবস্থা করেছো। তবে যখন ইচ্ছে এখানে চলে আসবেন—পায়ে হেঁটে দশ মিনিট।"

চিঁড়ে বউদি বললেন, "ওই বৃদ্ধদের সঙ্গে ওঁর থাকা কেন? আমাদের এখানেই থাকতে পারতেন।"

ডঃ গোস্বামী বললেন, "সুচরিতার মাথায় অনেক ফন্দি আছে, তাই আমি আপত্তি করিনি।"

॥ ৪ ॥

ইস্পাতের ফলক পথ নির্দেশ করছে—গোল্ডেন হোম এই দিকে। খুকুর গাড়িটা সেই দিকে মোড় নিলো।

"সোনালীভবন—নামটা বেশ তো" আমি বলি।

খুকু হাসলো। "ওটা একটা ধামাচাপা দেবার চেষ্টা! যৌবন যদি সবুজ হয় বার্ধক্য তাহলে সোনালী। কিন্তু সোনার আর এক নাম মৃত্যু—ফসল যখন সোনালী হয় তখন তো ফসল কাটার সময়।"

যা বুঝলাম, গোল্ডেন হোম একটি বৃদ্ধনিবাস। খুকু বললো, "মামা তুমি কোনো বৃদ্ধ-নিবাসে সময় কাটিয়েছ?"

বললাম. "সামান্য কিছুক্ষণ এক নিবাসে গিয়েছিলাম।"

"তাহলে তোমার গোল্ডেন হোম ভাল লাগবে। পশ্চিমে তো যৌবনের জয়—তাই বৃদ্ধনিবাস না দেখলে, তোমার ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।"

"তুই এখানকার খবর পেলি কি করে?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"এখানেই তো আজকাল বেশীদিন থাকি আমি। আমার থীসিস তো বৃদ্ধদের জীবন নিয়ে।"

"তাহলে বৃদ্ধরাই তোর গিনিপিগ?"

"তা ঠিক নয়, তবে জীবনের শেষ অধ্যায়টা কেমন তা দেখছি আমি। তোমরাই তো বলো, সব ভালো যার শেষ ভালো।"

খুকুর কাছে জানলাম, এখানকার মেডিক্যাল সেন্টারে বার্ধক্য সম্পর্কে গবেষণা চলছে। জেরন্টোলজি বিভাগের প্রধান ডক্টর এলিজাবেথ শিপেন। ডঃ

শিপেন কাছাকাছি কয়েকটি বৃদ্ধনিবাসের সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন। সেখানে তাঁর ছাত্র এবং সহযোগীরা 'এজিং প্রসেস' সম্পর্কে কাজ করেন এবং সংবাদ সংগ্রহ করেন।

এই গবেষক দলে আছেন মনস্তাত্ত্বিক হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ফিজিওলজিস্ট এবং আরও অনেকে। সমাজজীবন সম্পর্কে কোনো অনুসন্ধানই আজকাল নাকি নৃতত্ত্ববিদ ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না। খুকু হাসতে হাসতে বললো, "মামা, ভারতবর্ষেই তোমরা অ্যানথ্রপলজিস্টদের দাম দাও না। পৃথিবীর সর্বত্র এখন মানুষকে বোঝবার জন্যে সামাজিক নৃতত্ত্ববিদদের ডাক পড়ছে। এই যে ডঃ শিপেন, ওঁর গবেষণা ডাক্তারিসংক্রান্ত, কিন্তু আমাদের বিভাগের সাহায্য সর্বদা নিচ্ছেন। আমরা সবাই একসঙ্গে কাজ করছি। মানুষ তো "সামাজিক জন্তু"—তাকে আলাদা করে চিকিৎসা করা যায় না। মানুষকে পুরোপুরি জানতে গেলে তার পরিবেশও জানতে হয়।"

"তা তুই এখানে কী করিস?" আমি জানতে চাই।

"আমি তো তিনমাসের ওপর এখানে আসা-যাওয়া করছি। এবার কিছুদিন পাকাপাকিভাবে থেকে যাবো। আমার একটা ডিজিগনেশন আছে—শুধু গবেষক বললে এখানকার লোকরা বিরক্ত হতে পারে। আমাকে এখানে 'সোস্যাল অ্যাসিসটেন্ট' বা সামাজিক সহকারী বলা হয়।"

"সে আবার কী জিনিস?"

"আমার কাজকর্ম অনেক মামা। তোমার শাহাজান হোটেলের স্যাটা বোসের চাইতে আমি নেহাত কম যাই না। নিজের চোখেই দেখবে। স্যাটা বোসও একজন আছে। তার অ্যাপার্টমেন্টেই তুমি থাকবে। আমি থাকবো আমার রুমে।"

"গোল্ডেন হোমকে আসলে একটা হোটেল বলতে পারো, মামা। একটু আলাদা ধরনের হোটেল এই যা। এখানে থাকতে হলে অন্ততঃ ৬৫ বছর বয়স হওয়া চাই। তার কমবয়সীদের এই দেশে বৃদ্ধ বলা হয় না," হোমের মধ্যে গাড়ি ঢোকাতে ঢোকাতে সুচরিতা খবরটা দিলো।

গাড়ির আওয়াজে কয়েকটা মাথা নড়ে উঠলো—তারপর তাদের দৃষ্টির ফোকাস নিবদ্ধ হলো আমাদের গাড়ির দিকে। এঁরা সবাই টুপি পরে, লাঠি হাতে গোটা কয়েক বেঞ্চিতে গাছের তলায় বসে আছেন।

এক মুহূর্ত তাকিয়ে প্রায় সব কটা মাথা আবার স্বস্থানে ঘুরে গেলো। খুকু বললো, "ছুটির দিনে এঁরা এমনি করেই গাড়ির আওয়াজের জন্যে অপেক্ষা করে থাকেন। আমার গাড়ির জন্যে নয়, নিজেদের আত্মীয় স্বজনদের প্রতীক্ষায়। কিন্তু ভয়ানক আত্মসম্মান জ্ঞান, কিছুতেই নিজেদের উৎকণ্ঠা অপরের কাছে প্রকাশ করবেন না।"

একটা মাথা তখনও আমাদের দিকে ঘোরানো রয়েছে। খুকু বললো, "নিশ্চয় মিস্টার রাইট। উনি আমার জন্যেই অপেক্ষা করে আছেন।"

খুকু গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে মিষ্টি হেসে বললো, "শুভ অপরাহ্ন টম কাকা। আপনাকে আজ চার্মিং দেখাচ্ছে!"

মিস্টার রাইট হাতের টুপিটা নাড়িয়ে অভিবাদন জানালেন। বললেন, "তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। সময় পেলে একবার এসো।"

"নিশ্চয়", খুকুর উত্তর থেকেই বুঝলাম সে এই বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে বেশ পরিচিত। হোমের ম্যানেজার মিসেস টমলিনকে দেখা গেলো না। ভদ্রমহিলা পাশকরা নার্স। খুকু জানালো, "উইক-এণ্ডে মিসেস টমলিনকে পাওয়া যায় না। ওঁর বয় ফ্রেন্ড-এর সঙ্গে শিকাগোতে বেড়াতে যান।"

"কত বয়স ভদ্রমহিলার?"

"বালিকা নয়, পঞ্চাশের একটু ওপরেই হবেন। ইদানীং যার সঙ্গে তিনি ভাবের আদান-প্রদান করছেন তিনি একজন লরি ড্রাইভার। হয়তো বিয়ে-সাদি লেগে যেতে পারে, যদি ড্রাইভার ভদ্রলোক তাঁর বর্তমান বউকে ছাঁটাই করতে পারেন। ভদ্রলোক একটু সুযোগের অপেক্ষায় আছেন, কারণ স্বামীর অনুপস্থিতিতে তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী নাকি অন্য কারুর সঙ্গে প্রণয় করেন। হাতে-নাতে ধরতে চান স্ত্রীকে, তা হলে ডাইভোর্সের খরচ কম লাগে। না হলে, নিজে ধরা পড়লে—অনেক টাকার ব্যাপার এবং স্ত্রীকে মাস-মাস খোরপোষ দিতে হবে, যাতে মোটেই আগ্রহ নেই ভদ্রলোকের।"

"তুই তো অনেক খবর রাখিস", আমি বিস্ময় প্রকাশ করি।

'মিসেস টমলিন যে আমাকে সব বলেন। ওঁর প্রথম স্বামী ছিলেন মিলিটারি ট্রাক ড্রাইভার—হনলুলুতে পথ দুর্ঘটনায় মারা যান। মাইনে ছাড়া মিসেস টমলিন স্বামীর জন্যে বৈধব্যভাতা পান। বিয়ে হয়ে গেলে মোটা টাকা পেনসন কমে যাবে, সেই এক চিন্তা। শনিবারে ট্রাক সমেত মিসেস টমলিনের ছেলে-বন্ধু এখানে হাজির হন—বান্ধবীকে ট্রাকে তুলে নেন। শিকাগোতে ট্রাক খালি করে দু'জনে একটু আনন্দ করেন, তারপর রবিবার গভীর রাত্রে কিংবা সোমবার ভোরে মিসেস টমলিনকে ফেরার পথে নামিয়ে দিয়ে ট্রাক আবার চলে যায়।"

গোল্ডেন হোমের বাড়িটা তিনতলা—গোটা পঞ্চাশের ঘর। ওদিকে আর একটা বাড়ি সামান্য একটু ছোট। লিফটে তিনতলায় উঠে খুকু নিজের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো—ব্যাগ থেকে চাবি বার করলো। বললো, "এই অংশটায় কর্মীরা থাকে অর্থাৎ সেইসব কর্মী যাঁদের সংসারের টান নেই। সংসারী লোককে কেউ এখানে আলাদা মেসে রাখতে পারবে না। সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত কাজ করে বিকেলের ট্রেনে বাড়ি ফেরা কলকাতাতেই সম্ভব—এখানে লক্ষ টাকা

দিলেও কেউ রাজী হবে না।"

"আমাদের দেশে ঘরসংসারটা হাতের পাঁচ—টাকা যোগাড় করা ছাড়া আর কোনো চিন্তা নেই। এখানে সংসারটা অত সহজ নয় দেখছি", আমি বলি।

"মোটেই সহজ নয়। কারণ এখানে মেয়েরা ভাত-কাপড়ের জন্যে বিয়ে করে না। রোজগার স্বামীও করবে, স্ত্রীও করবে। সেক্স? সে তো বিয়ে না করলেও পাওয়া যায়—সুতরাং ভাত-কাপড় ও সেক্সের জন্যে এদেশে কেউ বিয়ে করে না। বিয়েটা সিরিয়াস ব্যাপার—বিয়ে হয় কমপ্যানিয়ন-শিপের লোভে, সান্নিধ্যের জন্যে। যে লোক সান্নিধ্য দিতে পারে না, বিয়ের বাজারে তার দাম নেই ; বিবাহিত হলেও সে বিয়ে রাখতে পারবে না।"

ঘরের মধ্যে মালপত্র নামিয়ে দিয়ে আমরা দু'জনে আবার বেরিয়ে পড়লাম। খুকু বললো, "এই যে হোমের পঞ্চাশখানা ঘর দেখছো এর অর্থ অন্ততঃ পঞ্চাশখানা নাটক সবসময় অভিনীত হচ্ছে। ঈশ্বর এই জাতকে দীর্ঘায়ু করেছেন, মানুষ আরও বেশীদিন বাঁচছে, কিন্তু সবসময় সেটা সুখের নয়।"

"সুখের নয় কী রে! বাবা-মা বেঁচে থাকাটা সন্তানের পক্ষে মস্ত আশীর্বাদ!"

"ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়ে গেলে বাবা-মায়ের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক থাকে না এখানে। ছেলেরা তখন নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।"

"বাবা-মা সংসার থাকলে কি মহাভারতের অশুদ্ধি হয়?" আমি জানতে চাই।

"পশ্চিমী সভ্যতায় এই ব্যবস্থা এখন অচল। পরিবার বলতে শুধু স্বামী-স্ত্রী এবং ছেলেপুলে—এছাড়া আর কেউ সংসারে পাকাপোক্ত থাকবার অধিকারী নয়। থাকলে সেটা আশ্চর্য ব্যাপার।"

আমি সুচরিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। সে বললো, "ব্যাপারটা ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরছে। ছেলে বড়ো হলেই আলাদা ঘর ভাড়া নেবে। তারপর বিয়ে করে। আলাদা সংসার হয়। মাঝে-মাঝে বাপ-মায়ের সঙ্গে দেখা হয়—ফোনে কথা চলে। তারপর সেই সময়টুকুও থাকে না। বাবা মা শেষ পর্যন্ত নিজের সংসার তুলে দিয়ে বৃদ্ধনিবাসে ওঠেন এবং মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করেন। এদের ছেলেরাও বড়ো হয় এবং শেষ পর্যন্ত তারাও একদিন সংসার ছেড়ে চলে যায়, বিয়ে করে, নতুন সংসার পাতে। বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়—এইভাবেই চলেছে। ভালমন্দ জানি না, আজকের সভ্যতায় সমস্ত দেশে ক্রমশঃ এই অবস্থা নাকি হতে বাধ্য। আমাদের হাইসোসাইটিতে নাকি আজকাল বাবা মা'রা ছেলেদের কাছে থাকছেন না।"

"হাই-সোসাইটি মাথায় থাকুন", আমি বলি।

করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে খুকু বললো, "মানুষের সংস্কৃতি যখন মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতির বিরুদ্ধে যায়, তখন যে কি সব সমস্যা সৃষ্টি হয় তাই আমার

গবেষণার কিছুটা দেখাবো। মানুষের সংস্কৃতি বৃদ্ধকে সংসারের কেন্দ্র থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, তাকে নিঃসঙ্গ করে তুলছে ; অথচ এই সময় তার সবচেয়ে বেশী সাহায্যের প্রয়োজন। বার্ধক্যকে তো তোমরা দ্বিতীয় শৈশব বলো।"

আমি খুকুর মুখের দিকে তাকালাম। খুকু বললো, "এখানে যে সব বৃদ্ধ দেখবে তাঁরা তো ভাগ্যবান। বহু স্বামী-স্ত্রীর কোনো রোজগার নেই, সময় ফুরিয়ে আসছে। রাষ্ট্রের করুণার ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে হয়। অথচ ওঁদের ছেলেপুলে আছে—তারা মনের সুখে রোজগার করছে এবং নিজের পরিবারের জন্যে খরচা করছে।"

বললুম, "আমার পাকিস্তানী বন্ধু সামসুদ্দিনের কথা মনে পড়ছে। ও বলেছিল, দাদা, এ এক আজব জায়গা। গুরুজনদের কোনো সম্মান নেই। এরা মাগকে মা বলে। যে বাড়িতেই যাই, শুনি কর্তা বউকে মাম' বলে ডাকছে!"

আমাদের কথায় বাধা পড়লো। করিডরে একজন পরিচারিকার সঙ্গে দেখা হলো। এদেশের ভাষায় জেনিটর। সে বললো, "মিস্ চ্যাটার্জি, আপনি একবার ২১০ নম্বর ঘরে যাবেন? ওখানে মিসেস ডিক বড্ড জ্বালাতন করছে, আমাকে ঘর পরিষ্কার করতে দিলো না।"

সুচরিতা হেসে বললে, সে যাচ্ছে। পরিচারিকা সামান্য শিক্ষিতা গ্রাম্য মহিলা। মাথা চাপড়ে বললো, "ও মিস্, কেন যে তোমরা এই বুড়িগুলোকে হোমে নাও! বুড়োগুলো অনেক শান্ত ও ভদ্র, কিন্তু এই বুড়ীগুলো আমাদের জীবন দুর্বিসহ করে ছাড়ে। তোমায় বলছি মিস্ চ্যাটার্জি—ওয়ান বুড়ী ইজ ইকোয়ালটু তিনটে বুড়ো। এক একটি থাণ্ডারিং নুইসেন্স।"

দুশো দশ নম্বর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ফিস-ফিস করে খুকু বললো, "তুমি এখানে অপেক্ষা করো।"

দরজায় বেল পড়তেই, ভিতর থেকে খ্যান-খ্যান গলায় উত্তর এলো, "যদি ঘর পরিষ্কারের ব্যাপার হয় তাহলে আমি তো বলে দিয়েছি আমি ইন্টারেস্টেড নই।"

সুচরিতা বললো, "না, আমি মিস্ চ্যাটার্জি। এসেছি আপনার সঙ্গে দেখা করতে।"

গলার স্বরে সঙ্গে-সঙ্গে পরিবর্তন। 'আঃ, তুমি? বলবে তো। ভিতরে এসো।"

সুচরিতা দরজা সামান্য খোলা রেখে ভিতরে ঢুকে গেলো। বিছানার ওপর ওঠে বসে মিসেস ডিক বললেন, "আমার একটা চিঠি পাওয়া যাচ্ছে না—আমার নাতনী লিখেছিল। নিশ্চয় ওরা ফেলে দিয়েছে। খুবই জরুরী চিঠি।"

সুচরিতা মিসেস ডিককে শান্ত করবার চেষ্টা করলো। "আপনার চিঠি আমি একটু খুঁজে দেখবো?"

"দেখো। কিন্তু কোথায় পাবে?" ছেলেমানুষের মতো মিসেস ডিক মন্তব্য করলেন।

খুকুর বোধ হয় ম্যাজিক জানা আছে। বিছানার গদির তলায় হাত দিয়েই একখানা চিঠি বার করে ফেললো। "এই চিঠিটার কথা বলছেন?"

"ও ডিয়ার ডিয়ার। দেখো তো, কোথায় চিঠিটা রেখেছিলাম।" মিসেস ডিক এবার বেশ নরম হয়ে গেলেন। বললেন, "জানো, আজকাল চোখে তেমন দেখতে পাই না। তুমি সময় পেলে একটু এসো, আমার নাতনীকে একটা চিঠি লিখে দেবে—আমি বলে যাবো।

খুকু বললো, "নিশ্চয়" এবার খুকু আমার কথা তুললো। মিসেস ডিক বলে উঠলেন, "তোমার মামা? আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। এখনই নিয়ে এসো।"

আমি ঘরে ঢুকে ওঁকে নমস্কার করলাম। বৃদ্ধা মিসেস ডিকের শরীর শীর্ণ। শরীরের চামড়া ঝুলে পড়েছে—মাথায় সমস্ত চুল শাদা হয়ে গিয়েছে। চোখে মোটা পাওয়ারের চশমা—তবু ভাল দেখতে পান না।

মিসেস ডিক বললেন, "ইন্ডিয়া? ক্যালকাটা? যেখানে রায়ট হয় তো?"

"হ্যাঁ, কয়েকবার রায়ট হয়েছে কলকাতায়—তবে রায়ট ছাড়াও অনেক কিছু হয়, আমি বোঝাবার চেষ্টা করি। বিদেশের সাধারণ মানুষের কলকাতা সম্পর্কে ধারণার কথা ভাবলে আমার কাঁদতে ইচ্ছে করে।

"দেখ তো, আমি তাই ভাবি—একটা শহরে শুধু রায়ট হয় কী করে? ট্রাভেল এজেন্ট আমাদের ঠকিয়েছে। আমার স্বামী ও আমি ক'বছর আগে বিশ্বভ্রমণ বেরিয়েছিলাম। আমাদের সারাজীবনের স্বপ্ন ছিল, ওয়ার্লড ট্যুর করা। সেই জন্যেই টাকা জমাচ্ছিলাম। ব্যাংককের পর আমাদের কলকাতায় নামবার কথা ছিল। কিন্তু এজেন্ট ব্যাংককে খবর দিল কলকাতায় দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছে। আমাদের যাওয়া হলো না—রেমণ্ড ভয় পেয়ে ইণ্ডিয়াতে গেল না—আমরা সোজা করাচি হাজির হলাম।"

মিসেস ডিক দুঃখ করতে লাগলেন, "রেমণ্ড বেঁচে থাকলে আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশী হতো।"

স্বামীর কথা বলতে গিয়ে মিসেস ডিকের চোখ সজল হয়ে উঠলো। নিজের হাতব্যাগ খুলে একখানা ছবি বার করে ফেললেন। "আমাদের বিয়ের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলে তোলা। আমাদের পাশে যিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, উনি আমাদের টাইনের মেয়র। এমন একজন নামকরা লোক নিজে এসেছিলেন আমাদের শুভেচ্ছা জানাতে।"

মিসেস ডিক উত্তেজনায় চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন। তারপর বললেন,

"আমাদের বিয়ে এই তো সেদিনের কথা! তোমাকে ফটো দেখাচ্ছি।"

মিসেস ডিকের হাতটা কাঁপছে—সে অবস্থায় হাতব্যাগটা আবার খুললেন। ওঁর সমস্ত মূল্যবান সম্পদ ওই ব্যাগের মধ্যেই রেখে দিয়েছেন। ব্যাগ থেকে ছবিটা বেরুলো ; ছবিটা অস্পষ্ট হয়ে উঠলেও ডিক দম্পতিকে চিনতে অসুবিধা হচ্ছে না। বয়সকালে সত্যি সুন্দরী ছিলেন ভদ্রমহিলা।

শ্রীমতী ডিক বললেন, "গোল্ডেন জুবিলির দিনে ঘরের মধ্যে একলা আমরা দু'জনে অনেকক্ষণ ধরে এই ছবিটা দেখেছিলাম। ছবিটাকে প্রশ্ন করেছিলাম, এখন আমরা পরস্পর সম্বন্ধে যা জানি, তা যদি পঞ্চাশ বছর আগে তোমরা এই ছবি তোলার দিনে জানতে, তাহলে তোমরা কী করতে? বিশ্বাস করবেন না, মিসেস চ্যাটার্জি—ছবিটা যেন নড়ে উঠলো। বললো, আমরা যা করেছি ঠিক তাই করতাম, বিয়ে করতাম!"

শ্রীমতী ডিকের গলা এবার কাশিতে ডুবে গেলো। কাশির ধাক্কা সামলে সামলে মুখ মুছে আমাদের কাছে ক্ষমা চাইলেন। তারপর বললেন, "আমার স্বামী বলতেন, বুড়োবয়সে শুধু শুনতে হয় একদম কথা বলতে নেই। যে-বুড়ো কথা বলে তাকে লোকে সহ্য করতে পারে না। আমি শুধুই বকে যাচ্ছি।"

"মোটেই না। আপনার কাছে শোনবার জন্যেই তো আমরা এসেছি।"

মিসেস ডিক বললেন, "রেমণ্ড ছাড়া আমাকে যে বেঁচে থাকতে হবে তা কোনোদিন কল্পনা করিনি। যে লোক আমাকে ছাড়া এক সপ্তাহ থাকতে পারতো না সে কেমন চলে গেলো। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, বেচারা বেশীদিন ভোগেনি। প্রথমে খুব কষ্ট হয়েছিল। আমার ছেলের কোলে মুখ রেখে কেঁদেছিলাম। তারপর কেমন সাহস বেড়ে গেলো। এখন ভাবি, রেমণ্ড আগে না গেলে মুস্কিল হতো। বেচারা কখনও সংসার সামলে একলা থাকতে পারতো না।"

ছবি দুটো ব্যাগের মধ্যে পুরে মিসেস ডিক বললেন, "আপনাদের দেশে বাপ-মা'রা তো ছেলের সংসারেই থেকে যান, তাই না?"

"আজ্ঞে, হাজার হাজার বছর ধরে লক্ষ লক্ষ পরিবারে তাই তো হচ্ছে। শৈশবটা যেমন বাবা-মায়ের দায়িত্ব বার্ধক্য তেমন সন্তানের দায়িত্ব। কোটি কোটি লোক এখনও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে বাবা-মা'র ঋণ কখনও শোধ করা যায় না।"

মিসেস ডিক হাসবার চেষ্টা করলেন। ওঁর মুখটা বেশ করুণ হয়ে উঠলো। "আমাদের দেশে সে তো আর সম্ভব নয়। আমরা সবাই যে স্বাধীনতা ভালবাসি। তবু এক এক সময় মনে হয় আপনারাই বুদ্ধিমানের কাজ করছেন। নিঃসঙ্গতাই বৃদ্ধ বয়সে সবচেয়ে কষ্ট দেয়।"

আমি ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। শ্রীমতী ডিক বললেন, "আমাদের বাড়িটা ছবির মতো সাজানো ছিল। সেই হোম ছেড়ে এই 'হোম'-এ আসবার

কথা এক বছর আগেও আমি ভাবতে পারতাম না। নিজের সংসার নিজে গুছোতে গুছোতে সমস্ত দিন কেটে যেতো। ঈশ্বরের আশীর্বাদে সামান্য যা টাকাকড়ি আছে, তাতে বাকি ক'টা দিন কোনোরকমে চলে যেতো। কিন্তু বিশ্রী বাত রোগে ধরলো। বাইরে বেশ সুস্থ আছি, কিন্তু এক একদিন এমন হয়, হাত-পা নাড়াতে পারি না। কে বাড়ি পরিষ্কার করবে? কে দোকানে যাবে? কে রাঁধবে? তার থেকেও বড়ো কথা, যদি শরীর খারাপ করে, বা কিছু হয়, কে বাইরের জগৎকে খবর দেবে? আমার পাশের বাড়ির মিসেস শিলারকে দেখে আমার ভয় হলো, একা থাকবার সাহস নষ্ট হয়ে গেলো। মিসেস শিলার তিন দিন মরে পড়েছিলেন। তিন দিনের দিন কোনো খবর না পেয়ে আমি ফোন করলাম—ফোনে কোনো উত্তর না পেয়ে পুলিশকে জানালাম। ওরা এসে দরজা ভেঙে ওঁর দেহ উদ্ধার করলো। হঠাৎ কখন হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল কেউ জানতে পারেনি। একলা থাকাটা যে এতো চিন্তার তা আগে কখনও খেয়াল হয়নি। মিসেস শিলার খুব সৌখিন মহিলা ছিলেন, আর তাঁর সমস্ত মুখে কিনা পিঁপড়ে থকথক করছিল।"

কল্পনায় নিঃসঙ্গ বেচারা মিসেস শিলারের জরাজীর্ণ দেহটা ভাববার চেষ্টা করছিলাম। মিসেস ডিক বললেন, 'কিন্তু আমাকে স্বীকার করতেই হবে ওঁর ছেলেরা যে ফিউনারালের ব্যবস্থা করেছিল তা রাজকীয়। কোনোরকম কার্পণ্য করেনি। ছয় ছেলেই খবর পেয়ে এসেছিল মায়ের কফিন গোরস্থানে নিয়ে যাবার জন্যে।"

একটু থেমে মিসেস ডিক বললেন, "আমার বেশ সাহস আছে ; কিন্তু গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলেই ভয় হতো—যদিও হাতের কাছেই টেলিফোনটা রাখতাম যাতে প্রয়োজন হলে বিছানায় শুয়ে-শুয়েই টেলিফোন করতে পারি। অবশ্য এটা স্বীকার করতেই হবে যে এখন আর মৃত অবস্থায় তিন দিন ঘরে পড়ে থাকবার কোনো দরকার নেই। এখানে সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান হয়েছে একটা—ওখানে নাম রেজিস্ট্রি করালে তারা প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে ফোন করবে এবং কোনো খবরাখবর না পেলে বাড়িতে চলে আসবে। কিন্তু তা হলেও তো চব্বিশ ঘণ্টা—মরা অবস্থায় অতক্ষণ পড়ে থাকতে আমার ভাল লাগবে না বলেই তো এই গোল্ডেন হোমে চলে এলাম।"

"এখানে তো বেশ ভালই আছেন।" আমি সান্ত্বনা দিই।

হাসলেন মিসেস ডিক। "হোটেলে থাকা আর নিজের বাড়িতে থাকা তো এক জিনিস নয়। এখানে এরা এমনভাবে ঘর পরিষ্কার করে আমার পছন্দ হয় না, এদের রান্না আমার ভাল লাগে না। এত লোকের ভিড়ও আমার পছন্দ হয় না। বিশেষ করে এক সঙ্গে এতগুলো বুড়োকে দেখলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়—কোথাও যেন একটু সবুজ নেই! আমাদের বাগানে অনেক

গাছ—শরৎকালে এইসব গাছের ঝরাপাতা ঝাঁট দিয়ে আমার স্বামী এককোণে জড়ো করতেন—এখানে অনেক শুকনো পাতা জড়ো হয়ে রয়েছে। কুৎসিত দৃশ্য” মুখবিকৃত করলেন, শ্রীমতী ডিক।

ইতিমধ্যে ঘড়ির এলার্ম বাজতে শুরু করলো। শ্রীমতী ডিক বললেন, “এর মানে আমার ট্যাবলেট খাবার সময় হয়ে গিয়েছে। এতোবার ওষুধ খেতে হয় যে খেয়াল থাকে না, তাই ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখি। ট্যাবলেট না খেলেই বাতের ব্যথা বেড়ে ওঠে, বড্ড জ্বালায়।”

মিসেস ডিক এবার চিঠির কথা তুললেন। নাতনী মাঝে মাঝে দিদিমাকে চিঠি লিখে থাকে। ভারী সুন্দরী নাতনী। মিসেস ডিক তাঁর চিঠিটা খুকুকে বলে গেলেন—খুকু আস্তে আস্তে লিখে গেলো এবং পড়ে শোনালো। মিসেস ডিক লিখলেন, গোল্ডেন হোমে খুব আনন্দে আছেন। এখানকার প্রতি মুহূর্ত তিনি উপভোগ করছেন। এই আনন্দ অনেকটা ছোটবেলার আনন্দের মতো—যার মধ্যে কোনো হিসেব নেই, উদ্দেশ্য নেই। গতকাল ছিল তাঁদের বিবাহ বাৎসরিক—বাহান্ন বছর আগে, এই দিনে তিনি বধূ হয়েছিলেন। নাতনী যেন বিবাহিত জীবনে তাঁরই মতো সুখী হয়!”

মিসেস ডিকের ঘর থেকে বেরিয়ে খুকুকে জিজ্ঞেস করলাম, “নাতনীকে নিজের কাছে রেখে পড়াশোনা করালেই পারতেন। ওঁর ছেলের তো আরও ছেলেমেয়ে আছে।”

খুকু বললো, “মিসেস ডিকের নিজের তাই ইচ্ছে ছিল কিন্তু ছেলে স্ত্রীর তা পছন্দ নয়। আজকালকার বাবা-মারা পছন্দ করেন না তাঁদের ছেলেপুলে বুড়োদের সঙ্গে বেশী মিশুক। তাতে নাকি তারা বুড়োটে মেরে যায়—ব্যক্তিত্বের বিকাশ বাধা পায়। অনেক মায়ের চিন্তা, ঠাকুর্দা ঠাকুমাকে আঘাত না দিয়ে কেমন করে বাচ্চাকে তাঁদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা যায়।”

খুকু বললো, “এইবার আমার কাজ আরম্ভ করে দেবো। যতদূর পারি সবার খবরাখবর নেবো। কারুর কোনো ছোটোখাট সমস্যা থাকলে সাহায্য করবো।”

বারান্দার শেষপ্রান্তে এক বৃদ্ধাকে বসে থাকতে দেখা গেলো। গম্ভীর হয়ে তিনি অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছেন, মাঝে মাঝে লাঠিটা একটু বাড়াচ্ছেন। এই গম্ভীর বিষণ্নমূর্তি কোনো ভাস্কর দেখলে খুশী হতেন—রোঁদার থিংকারের মতো বার্ধক্যের একটা চমৎকার রূপ সৃষ্টি করতে পারতেন। আমি ফিসফিস করে খুকুকে বললাম, “আহা বেচারি! বোধ হয় কোনো আত্মীয় বা বন্ধুর অপেক্ষার সময় কাটাচ্ছিলেন। ভেবেছিলেন কেউ আসবে।”

খুকু বললো, “ভদ্রলোকের অতোটা নিঃসঙ্গবোধ করার কারণ নেই। এখানে সস্ত্রীক বসবাস করেন।”

"গুড ইভনিং, মিস্টার ডুগান। প্রকৃতির শোভা উপভোগ করছেন কেমন? খুকু ওঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে।

"ইয়ং লেডি, শুভ সন্ধ্যা। আমি কিন্তু মোটেই প্রকৃতিকে উপভোগ করছি না। আমি স্ত্রীর ব্যবহারে তিতিবিরক্ত হয়ে এখানে বসে আমি।

খুকু দুঃখ প্রকাশ করলো। জানালো, এই হোমে তাঁরা আদর্শ দম্পতি বলে পরিচিত, সুতরাং তাঁদের মধ্যে কোনোপ্রকার বাকবিতণ্ডা অভিপ্রেত নয়।

"আমাকে আজ থেকে আলাদা একটা ঘর দাও, বুড়ীর সঙ্গে আমি থাকবো না। আমাকে বাচ্চা ছেলে পেয়েছে—বিকেলবেলায় আমি গায়ে সোয়েটার রাখবো কিনা তা উনি ঠিক করবেন। খাবার সময় খিটখিট করবেন। আমার কোনো স্বাধীনতা নেই—পেরেমবুলেটরের বেবির সঙ্গে আমার কোনো পার্থক্য নেই। এনাফ ইজ এনাফ—অনেক হয়েছে, আর নয়। তুমি আমাকে তোমার ঘরে নিয়ে যাও—ওখান থেকে গোপনে আমার উকিলের সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

"আমার ঘর থেকে যত খুশী ফোন করুন—কিন্তু এতোলোক থাকতে উকিলের সঙ্গে কথা বলবেন কেন?"

"ইয়ং লেডি, তোমাকে সমস্ত ব্যাপারটা বলতেই হচ্ছে—আমার ওয়াইফ নামক স্ত্রীলোকটি আজ আমাকে মেরেছে। আমার যদি সমস্ত দেহে বাতের যন্ত্রণা না থাকতো তা হলে আজ তোমাদের হোটেলে রক্তারক্তি হয়ে যেতো। একথাও তোমাকে বলে দিই, পঁচিশ বছর আগেও আমি একবার ডাইভোর্সের চিন্তা করেছি।"

খুকু দেখলো, বৃদ্ধ মিস্টার ডুগানের রাগ কিছুতেই কমছে না। এঁকে একলা রেখেই আমরা এগিয়ে চললাম। বৃদ্ধ হলে অনেকে সত্যিই শিশু হয়ে যায়।

শ্রীমতী ডুগানের দরজার সামনে এবার বেল পড়লো। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। খুকু এক মুখ হেসে শ্রীমতীকে নমস্কার জানিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লো। জিজ্ঞেস করলো স্বামী কোথায়? শ্রীমতী তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন, "ওই বুড়োটার কথা আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না। আদালতের জজ ছিল, কিন্তু এখন ওঁকে কয়েদিদের ইস্কুলে পাঠানো দরকার—সেখানে ওকে চড়চাপড় মারা প্রয়োজন।"

খুকু অপ্রস্তুত। শ্রীমতী ডুগান বললেন, "আপনাদেরও বলিহারি। হোমের অভিজাত্যের দিকে একটুকুও নজর নেই, যে-কেউ পয়সা দিলেন তাকে হোমে ঢোকাচ্ছেন। আমি প্রেসিডেন্টকে লিখবো। আমার ছেলেকে ফোন করছি—এখানে যদি ওই মিসেস সিম্পসন থাকেন, তাহলে আমাকে চলে যেতে হবে—।"

"মিসেস সিম্পসন!" খুকু বুঝবার চেষ্টা করে।

"হ্যাঁ, ওই যে মহিলা, এখনও উনিশ বছরের ছুঁড়ির মতো ন্যাকা-ন্যাকা ব্যবহার করেন। বৃথাই ওঁর স্বামী দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। আপনি দেখেছেন, স্ত্রীলোকটির জামা-কাপড়, চাল-চলন, মেক-আপ? মনে হবে প্রথম হনিমুনে বেরোচ্ছেন! দেখে কে বলবে, ছ'মাস আগে বিধবা হয়েছেন।"

খুকু চুপ করে কথা শুনে যায়।

মিসেস ডুগান বললেন, "তো তোমার ভীমরতি ধরেছে, তুমি যা খুশী করো গে যাও! যতক্ষণ ধরে মনে চায় মেক-আপ করো। কিন্তু তা বলে অন্যের ঘর ভাঙতে দিচ্ছি না।"

"ব্যাপারটা কী?" খুকু জানতে চায়।

"তোমাকে বলতে লজ্জা নেই—আমার স্বামীটির মতিগতি ভাল যায় না—অনেক শাসনে রেখে ঠিক হয়ে গিয়েছিল। ওমা! কাল লাঞ্চের পর বিশ্রাম নিচ্ছি—একটু চোখ বুঁজেছি, হঠাৎ দেখি উনি নেই। বেরিয়ে দেখি, উনি বাগানে মিসেস সিম্পসনের সঙ্গে পায়চারি করছেন! আমি কিছু বলিনি। শুধু রাতে ডিনারের সময় মনে করিয়ে দিয়েছিলাম—তুমি অনেক জজিয়তী করেছো কিন্তু মানুষের মন সম্বন্ধে কিছু জানো না। বেচারা মিসেস সিম্পসন! ওঁকে একলা থাকতে দাও, সবে ছ'মাস হলো বিধবা হয়েছেন। কর্তা কথাগুলো শুনলেন কিন্তু উত্তর করলেন না। ভাবলাম লজ্জা পেয়েছেন। ওমা! আজ দেখি লজ্জার নামগন্ধ নেই—বুড়ো অপেক্ষা করছিল, কখন আমি ঘুমিয়ে পড়ি। যেমন আমি চোখের পাতা বন্ধ করেছি, অমনি বাগানে মিসেস সিম্পসনের ওখানে গিয়ে হাজির হয়েছে। আজ কোনো কথা নয়, খপ করে ওঁর হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে এনেছি। মেয়ে মানুষটার দিকে তাকাইনি পর্যন্ত।"

খুকু বললো "বৃদ্ধ মানুষ, অভিমান হয়েছে—ওখানে একলা বসে রয়েছেন।"

"যেখানে খুশী ও যেতে পারে—নিজে অসভ্যতা করবে, আবার রাগও দেখাবে, তা চলে না," মিসেস ডুগান সোজা জানিয়ে দিলেন।

এবারের মতো ওঁকে একটা সুযোগ দিন। অভিমান যখন হয়েছে তখন নিজে গিয়ে ডেকে আনুন।" সুচরিতা পরামর্শ দেন।

"ওই মেয়েমানুষটাও আছে নাকি? তাহলে কিন্তু স্বামী আজ মারধোর খাবে, তা তোমায় বলে রাখছি। খুব সামান্য শাসন করে ছেড়ে দিয়েছি আজ।"

"না না, কেউ না। আপনার স্বামী একা বসে আছেন।" সুচরিতা জানায়।

আমি কিছুতেই যেতাম না—শুধু তোমাদের অনুরোধে বুড়ো খোকাকে আনতে যাচ্ছি। তবে তোমরা বলে দিও মিসেস সিম্পসনকে, যেন আমার স্বামীর দিকে নজর না দেন।" মিসেস ডুগান এবার পায়ে জুতো গলিয়ে নিয়ে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের সৌন্দর্য বৃদ্ধির চেষ্টা করলেন। চুলটা সামান্য আঁচড়ে,

ঠোঁটে একটু লিপষ্টিক ঘষে নিলেন। তারপর বার হলেন, অবসরপ্রাপ্ত বিচারক স্বামীকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে।

খুকু বেরিয়ে এসে বললো, "এবার মিসেস সিম্পসন।"

দোতলার এক কোণে তাঁর ঘর। ঘরটা নিজের রুচি অনুযায়ী তিনি সাজিয়েছেন। দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলো সারাক্ষণ মনে করিয়ে দেয় যে যৌবনে শ্রীমতী সিম্পসন অসামান্য সুন্দরী ছিলেন।

টেলিভিশন সেট খুলে দিয়ে শ্রীমতী সিম্পসন কেশ পরিচর্যা করছিলেন। মাথায় টোপরের মতো কী একটা লাগিয়েছেন! তারই ভিতরে চুলগুলো নাকি শাসিত হচ্ছে।

সুচরিতাকে দেখে মিসেস সিম্পসন বসতে বললেন। "ছোট্ট মেয়ে, বৃদ্ধদের এই নির্বাসনকেন্দ্র তোমার কেমন লাগছে?"

"বেশ ভালই।"

মিসেস সিম্পসন হাসলেন। বললেন, "আমি একটা ফরাসী গল্প পড়েছিলাম। একজন সহিসকে বৃদ্ধ ঘোড়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। অন্য সব কর্মচারীরা তেজী জওয়ান ঘোড়ার পরিচর্যা করে, আর এই ছেলেটির ভাগ্যে বৃদ্ধা ঘোড়া। প্রতিদিন ঘোড়াকে সে বেড়াতে নিয়ে যেতো, আর মনে মনে ভাবতো কবে এই বেতো ঘোড়া মরবে এবং সে মুক্তি পাবে।"

খুকু মিষ্টি হেসে বললে, 'ঘোড়া আর মানুষ এক নয়, মিসেস সিম্পসন।"

খুকুর পিঠে হাত দিয়ে মিসেস সিম্পসন বললেন, "মানুষকে ঘোড়া থেকেও নিকৃষ্ট বলতে চাও?"

খুকু হাসলো। মিসেস সিম্পসন বললেন, "আজকে কয়েক ঘণ্টা আগেই ওইরকম একটি প্রাণী দেখলাম, তোমাদের হোমে।"

"আমাদের এখানে?"

"হ্যাঁ, আমি মিসের ডুগানের কথা বলছি। বেচারা মিঃ ডুগান কেমন চমৎকার লোক—সভ্য ভব্য বিচারকের খাসা ব্রেনখানি। এখনও চকচকে ছুরির মতো বুদ্ধি রয়েছে। একজন দার্শনিকের বিছানায় বহু বছর শুয়েছি—সুতরাং আমি জানি কাকে মস্তিষ্ক বলে। পুওর মিঃ ডুগানের সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছিল। আমি দুপুরের ঘুমে বিশ্বাস করি না—ওতে ওজন বেড়ে যায়, ফিগার নষ্ট হয়। দুপুরে কখনও ঘুমিও না বাছা। ফিগার বাদ দিলে মেয়েমানুষের কী থাকে বলো? তা যা বলছিলাম, লাঞ্চের পরে তাই আমি বাগানে গিয়ে বসি, কখনও ঘুরে ঘুরে ফুল দেখি। মিঃ ডুগান বেচারা সেদিন জিজ্ঞেস করলেন, উনি মাঝে মাঝে ঘুম তাড়াবার জন্যে আমার দলে যোগ দিতে পারেন কি না। আমি বলেছিলাম—অবশ্যই, কারণ, আমি মেয়েদের সান্নিধ্যে ইনটেলেকচুয়াল আনন্দ

পাই না। সমস্ত জীবন পৃথিবীর সেরা দার্শনিকদের সঙ্গে গল্প করে আমার এই অবস্থা হয়েছে। পুওর মিস্টার ডুগান আমার সঙ্গে গল্প করে খুব আনন্দ পাচ্ছিলেন—বলছিলেন সমস্ত জীবন স্ত্রীর শাসনে থেকে তাঁর ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়নি। ঠিক সেই সময়, সাক্ষাৎ ডাইনীর মতো মিসেস ডুগান হাজির হলেন। কোনোরকম ভদ্রতা নেই, সৌজন্য নেই—চিৎকার করে উঠলো, ডগলাস, এখনই চলে এসো। তোমাকে বলেছি মিস চ্যাটার্জি, লোকে কুকুরকেও ওইভাবে ডাকে না। বেচারাকে হিড় হিড় করে টানতে লাগলো আর পুওর মিঃ ডুগান বাতের যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগলেন।”

“আপনার সঙ্গে কোনো কথা বলেননি?” খুকু জানতে চায়।

“কথা! আমার দিকে এমনভবে তাকালো যেন আমি একটি ডাইনী, মন্ত্রবলে ওর স্বামীটিকে নিজের অধীনে এনেছি। ফুঃ! জানে না, আমার এমনই ব্যক্তিত্ব যে, পুরুষমানুষ দুটো কথা বলতে পারলে ধন্য হয়ে যায়! এখানের এই হোমে কে না আমার সঙ্গে ভাব করতে চায়? আমি কিন্তু যার তার সঙ্গে কথা বলতে পারি না।”

খুকু বললো, “বেচারা মিস্টার ডুগানের খারাপ সময় চলছে।”

“কেন?” মিসেস সিম্পসন উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন।

“উনি এতোক্ষণ বাইরে চুপচাপ বসেছিলেন,” সুচরিতা জানায়।

“এ্যাঁ! মেয়েমানুষটা ওঁকে বার করে দিয়েছে? না উনিই রাগ করে বেরিয়ে গিয়েছেন?” মিসেস সিম্পসন জানতে চান।

“উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই। মিসেস ডুগানকে বোঝানো হয়েছে, উনি স্বামীকে আবার ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিলেন। এখনকার মতো মিটমাট”, খুকু জানায়।

“পুওর ডগলাস। মিটমাট ছাড়া ওঁর উপায় নেই, নিজের সমস্ত টাকাকড়ি বৌ-এর নামে। মেয়েমানুষটা কায়দা করে সব হাতের মধ্যে রেখেছে—ইচ্ছা থাকলেও ডাইভোর্স করতে পারবেন না।”

খুকু আমার সঙ্গে মিসেস সিম্পসনের আলাপ করিয়ে দিলো। মিসেস সিম্পসন বললেন, “আমার স্বামীর সঙ্গে আপনাদের দেশের অনেক দার্শনিকের পত্রালাপ ছিল। রাধাকৃষ্ণণ আমার স্বামীকে প্রায়ই চিঠি লিখতেন।”

দর্শনের কথাবার্তার পর পারিবারিক খবর পেলাম। ওঁর দুটি ছেলে নিজেদের ঘর সংসার নিয়ে ব্যস্ত। মাঝে মাঝে তারা ফোন করে, কখনও বা দেখতে আসে। যেদিন দেখতে আসে সেদিন মিসেস সিম্পসনের কি আনন্দ! ছেলে, ছেলের-বৌ নাতিকে নিয়ে কী করবেন বুঝে উঠতে পারেন না। পাশের অনেক ঘর থেকে উকি ঝুঁকি শুরু হয়ে যায়। সবাই তো সমান ভাগ্যবান নয়।

পাশের ঘরে মিসেস সাইমন আছেন। তিন মুখ চুন করে বাইরে বসে থাকেন।

আর বন্ধুদের মিথ্যে কথা বলেন, তাঁর ছেলে নাকি প্রায়ই তাঁকে ফোন করে, খবরাখবর নেয়, চিঠি লেখে।

মিসেস সিম্পসন বললেন, "সব মিথ্যে কথা। তিন মাসে বুড়ীর একটা টেলিফোন বা চিঠি আসে কিনা সন্দেহ, অথচ এমন ভাব করে যেন একদিন ছাড়াই ছেলেরা খবরাখবর নিচ্ছে।"

• ঘর থেকে বেরিয়ে খুকু বললো, "মামা, এইটাই এদেশে স্বাভাবিক! 'জেনারেশন গ্যাপ' কথাটা শুনেছো নিশ্চয়—এখানে একবয়সী লোকের সঙ্গে অন্য বয়সী লোকদের অনেক দূরত্ব। সবাই এক একটি দ্বীপের মতো। দূরত্ব আমাদের দেশেও আছে, কিন্তু এমন নয়। এখানে-ছেলে-ছোকরারা বুড়োদের সঙ্গে মিশতে চায় না। তাতে নাকি সময় নষ্ট হয়। বুড়োদের সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ নেই!"

"অথচ বৃদ্ধরাই তো এই দেশ গড়ে তরুণদের হাতে তুলে দিয়েছেন," আমি বলি।

"সে কথা কে মনে রাখে? বৃদ্ধের সংখ্যা বাড়ছে—প্রতি একশ জনের মধ্যে দশ জনের বয়স পঁয়ষট্টির বেশী সুতরাং দু'কোটির মতো বৃদ্ধ এইভাবে আরও বৃদ্ধ হচ্ছেন, আর মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

খুকু বললো, "এই বয়সে স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পরের ওপর খুব বেশী নির্ভর করেন। কারণ ভাবের আদান প্রদানের জন্যে আর কেউ তেমন থাকে না—পরিচিত বন্ধুরা দেহ রাখেন বা দূরে চলে যান, অফিসের লোকরা খবরাখবর নেয় না, ছোট নাতি-নাতনী ছাড়া আর কেউ খুব কাছে আসে না। সব থেকেও কিছু থাকে না! আমাদের এখানেই এক জনের কাছে যাবো। মিস্টার পার্কার! ভদ্রলোকের সব থেকেও কিছু নেই। আমাকে বলেছিলেন, আমার বাড়ি আছে কিন্তু পরিষ্কার করতে পারি না ; আমার গাড়ি আছে, কিন্তু চালাতে সাহস করি না—চোখে কম দেখি। এমন কি দোকানে যেতে গেলেও কারও শরণাপন্ন হতে হয়—এক সঙ্গে বেশী জিনিস আনতে পারি না।"

খুকু বললো, "এ-দেশে বুড়ো বয়সে যে অনেকে আবার বিয়ে করে তার প্রধান কারণ বন্ধুত্বের প্রয়োজন। মিস্টার পার্কার এখানে একা একা থাকতেন। পাশের ঘরেই ছিলেন—মিসেস নোড। এখানেই প্রেম, তারপর কয়েকদিন আগে বিয়ে হয়েছে। আমাদের দেশ হলে হাসাহাসি পড়ে যেতো, কিন্তু এখানে লোকে বলবে, ভালই হয়েছে। এই বয়সে কে ওঁদের দেখবে?"

পার্কার দম্পতির সঙ্গে ওঁদের ঘরের দরজার মুখেই দেখা হয়ে গেল। খুকু ওঁদের অভিবাদন জানালো। নববিবাহিতার সলজ্জ হাসিটুকু মুখে ছড়িয়ে নতুন শ্রীমতী পার্কার স্বামীর হাত ধরেছেন। স্বামীকেও বেশ চকচকে দেখাচ্ছে—বিয়ে

উপলক্ষে এঁরা নতুন জামা-কাপড় করিয়েছেন। খুকু জিজ্ঞেস করলো, "হনিমুন থেকে কবে ফিরলেন?"

মিঃ পার্কারের উত্তর থেকে জানা গেল গতকালই ফিরেছেন মধুযামিনী শেষ করে। হনিমুন করতে ওঁরা গিয়েছিলেন ওহামার কাছে ছোট্ট গ্রাম্য হোটেলে। "ও, অদ্ভুত স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে সময় কেটে যাচ্ছিল," শ্রীমতী জানালেন।

মিস্টার পার্কার বললেন, "আরও আনন্দের হতো যদি না শেষের দিকে আমার হাঁপানিটা চাগিয়ে উঠতো। আমার পুওর ডার্লিংকে বড়ো কষ্ট পেতে হলো! এখন নার্সিং হোমে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে দেখাবার জন্য।"

মিসেস পার্কার বললেন, "পরে এসো, তোমাকে আমাদের বিয়ের ছবি দেখাবো। আর দেখাবো নাতি-নাতনীদের চিঠি। আমাদের বিয়ে উপলক্ষে কি মিষ্টি চিঠি লিখেছে ওরা।"

ওঁরা চলে যেতে খুকু বললো, "এদেশের নার্সিং হোম আর আমাদের দেশের নার্সিং হোম এক নয়। আমাদের দেশে নার্সিং হোম মানে প্রাইভেট হাসপাতাল। এখানে হাসপাতালে চিকিৎসার পর, স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে নার্সিং হোমে পাঠানো হয়। এখানে নার্স থাকেন, ডাক্তারও আসেন—তবে নার্সিংটা বড়ো কথা। আমাদের এই হোমের সঙ্গে নার্সিং হোম রয়েছে। এতে গবেষণার সুবিধে হয়—এবং যাঁরা থাকেন তাঁদেরও সুবিধে। কারণ শরীর সুস্থ না থাকলে কোনো লোককে ওল্ড হোমে রাখা হয় না, সোজা হাসপাতালে বা নার্সিং হোমে চালান করে দেওয়া হয়। বুড়ো বয়সে শরীর সবসময় সুস্থ থাকবে এ কথা কে বলতে পারে?"

খুকু বললো, "বুড়ো বয়সের বিয়ে আমার বেশ মজা লাগে। বর বউ-এর জন্যে মায়া হয়। আর ভাবি এদেশের চরিত্রের কথা। এদেশের মানুষ ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ থেকে অনেক শক্ত—মনটা সহজে ভেঙে যায় না। বুড়ো বয়স বলে চোখের জল ফেলে না, নিজের সুযোগ অনুযায়ী জীবনের আনন্দ আহরণ করে নেয়।"

"না বাপু, তাজ্‌দি বুড়ো বয়সে বিয়ে পছন্দ করেন না, সেই জন্যেই তো তোমার বিয়ের জন্যে ওঁর ঘুম হচ্ছে না। আমাকে বার বার বলেছেন একটা হেস্তনেস্ত করবার জন্যে।"

আমার উত্তরে খুকুর মুখে হাসি খেলে যায়। "ওমা, তুমি আমাকে বুড়ী বানিয়ে দিচ্ছো—সবে না তেইশ শেষ করেছি। তোমার এবং মার বিরুদ্ধে মামলা করা যায়।"

"তোমার মায়ের একটি ছড়া শুনলেই জজ মামলা ডিসমিস করে দিয়ে তোমাকে মায়ের হুকুম মানতে বাধ্য করবেন। জানো তো মেয়েরা কুড়ি

পেরোলেই বুড়ী!"

"উঃ মামা, তুমি উকিল হলে না কেন? তোমার সঙ্গে তর্ক করে কোনো ফল হবে না। শোনো, হাতে সময় নেই! এখনই পার্টিতে যেতে হবে। তুমি আমার ঘরে গিয়ে তৈরি হয়ে নাও। আমি ততক্ষণ আরও দু'একটা কাজ সেরে নিই। তারপর আমি তৈরি হয়ে নেবো। এই নাও চাবি—চটপট মামা।"

খুকুর ঘরের সামনে বঙ্গসন্তানের মূর্তি দেখে আমার চমকে ওঠার অবস্থা। সুপুরুষ সুদর্শন বুদ্ধিদীপ্ত যুবক, চোখে মোটা প্রেমের চশমা। চুলগুলো ঢেউ-খেলানো।

ছোকরা কিন্তু আমাকে দেখে মোটেই অবাক হলো না। কর জোড়ে নমস্কার জানিয়ে বললো, "আপনিই শংকরবাবু? সুচরিতাকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি—আপনার তো আমার সঙ্গে থাকবার কথা।"

মনে পড়ে গেলো, খুকু বলেছিল, আমার থাকবার ব্যবস্থা কাছাকাছি কোথায় করেছে। এখানে কি এরা বেঙ্গলি কলোনি করে ঠিক করেছে?

ছোকরা মিষ্টি হেসে বললো, "আপনি আমার ওখানে স্নান সারবেন চলুন। আপনার জিনিসগুলো নিয়ে নিচ্ছি।"

আমি একটু কিন্তু কিন্তু করলাম। ছোকরা হেসে বললো, "আপনি চিন্তা করবেন না, জিনিসপত্তরের হিসেব ঠিক থাকবে। এয়ারপোর্টে আপনার মাল নিয়ে যা গোলমাল হয়েছিল তা আর হবে না।"

বুঝুন অবস্থাটা! আমার দুর্বলতার ব্যাপারটা খুকু তাহলে সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে। ছোকরা বোধহয় মনের ডাক্তার, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, "শিল্পী এবং লেখকরা একটু ভুলো হয়ে থাকেন। সুচরিতাকে নিয়ে আমারই এয়ারপোর্টে যাবার কথা ছিল...কিন্তু ওই দিন ডঃ শিপেন অপারেশনের ডেট ফেললেন, যাওয়া হলো না।"

"না, না, রোগী আগে" আমি বলি। "আশা করি আপনার রোগী ভাল আছেন।"

ছোকরা আমার মালপত্র তুলে নিয়ে বললো, "রোগী আজ থেকে ছোলা খাচ্ছে।"

"অ্যাঁঃ, অপারেশনের পরের দিন থেকে এদেশে ছোলা খেতে দেওয়া হয় নাকি? তাহলে তো হাসপাতালে যাওয়া চলবে না—ছোলা আমার সহ্য হয় না।"

ছোকরা হেসে বললো, "আমাদের রোগী একটি বাঁদর—নাম সুগ্রীব। সুগ্রীব বুড়ো হয়ে গিয়েছিল, অস্ত্রোপচার করে ডঃ মিস এলিজাবেথ শিপেন তাকে যুবক

বানাবার চেষ্টা করছেন।”

ছোকরার পরিচয় পাওয়া গেলো। তপন গাঙ্গুলী লণ্ডন থেকে এফ আর সি এস পাশ করে, এখানে এসেছে ডঃ শিপেনের গবেষণায় অংশ নিতে। উদ্দেশ্য খুবই মহৎ—বুড়োদের এরা যৌবন ফিরিয়ে দিতে চায়।

ডঃ তপন গাঙ্গুলীর কোয়ার্টার বাড়ির বাইরে নয়—ওপর তলার এক কোণে। বেশ বড়ো অ্যাপার্টমেন্ট—একখানা বাড়তি শোবার ঘর আছে। ফ্ল্যাটটা ছবির মত সাজানো।

ডঃ গাঙ্গুলী আমার মালপত্র ঘরের মধ্যে তুলে দিয়ে বাথরুম দেখিয়ে দিলো। বাড়তি চাবি আমার হাতে দিয়ে বললো, “আমি না থাকলেও এই চাবি দিয়ে আপনি ফ্ল্যাটে ঢুকতে পারবেন। কোনো অসুবিধা হবে না। শুধু আপনার সঙ্গে পেটোর পরিচয় হওয়া দরকার।”

“পেটো! কী অদ্ভুত নাম—সে আবার কে?”

ডঃ তপন গাঙ্গুলী একটু লজ্জায় পড়ে গেলো। বললো, “পেটো আমাদের মতই একজন ভারতীয়।”

“এদেশের কিছু-কিছু লোকের ধারণা, প্রত্যেকটি ভারতীয়ই পেটো—পেটসর্বস্ব। দুনিয়ার সমস্ত গম খেয়ে হজম করে ফেলেছে, তবু খিদে মিটছে না।” আমি উত্তর দিই।

“আমাদের পেটো একটু বেশী খায়, তাই পেটো বলে ডাকি,” তপন জবাব দেয়।

“তা আপনি দেশ থেকে চাকর আনিয়ে ভালই করছেন।”

আমার কথা শুনে তপনের লজ্জা ভাব আরও বেড়ে গেলো। এই জিনিসটা আমার মোটেই ভাল লাগে না। বললাম, ‘চাকর রেখেছেন তো কী হয়েছে? আমরা ইণ্ডিয়ান, ইণ্ডিয়ানের মতো থাকবো। রাজনৈতিক উগ্রপন্থীরাও আমাদের দেশে চাকর রেখে থাকে এবং মা কালীর গলায় জবাফুলের মালা দিতে ভোলে না। রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, থিয়েটার, ফুটবল এবং ঝি-চাকর আমাদের কালচারের গসাগু—হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টর সবার মধ্যে পাবেন।

তপন গাঙ্গুলী এবার বেল টিপলো এবং যা ঘটলো তার জন্যে সত্যিই আমি প্রস্তুত ছিলাম না। হাফ প্যান্ট পরে একটি প্রমাণ আকারের বাঁদর যে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবে তা আমার কল্পনার অতীত।

তপন বললো, “পেটো, ইনিই শংকরবাবু—আমাদের মিস সুচরিতা চ্যাটার্জির মামা।”

পেটো আমার দিকে বেশ সন্দিগ্ধভাবে তাকালো। তপন বললো, “পেটোর দেশ ভারতবর্ষ। দু’বছর আগে আমাদের ল্যাবরেটরিতে আসে। আপনি

জানেন—ভারতীয় বাঁদরদের সব চেয়ে বড়ো ক্রেতা হচ্ছে আমেরিকা। ইণ্ডিয়ান বাঁদর না পেলে এখানকার বহু গবেষণা বন্ধ হয়ে যেতো।

বললুম, "শিকাগোতে শুনলাম, নরকঙ্কালের সবচেয়ে বড়ো সাপ্লায়ারও নাকি ভারতবর্ষ। কলকাতার একটা কোম্পানি আমেরিকার বেশীর ভাগ কঙ্কাল জোগায়।"

তপন বললো, "পেটোর শরীর খারাপ হলে আমিই চিকিৎসা করেছিলুম—তারপর কেমন মায়া পড়ে যায়। ওর রকমসকম স্টাডি করবার জন্যে বাড়িতে নিয়ে আসি। সেই থেকেই রয়ে গিয়েছে। আমাদের হোমের বাসিন্দা মিসেস সিম্পসন এক সমিতির সভ্যা যার উদ্দেশ্য হলো গৃহপালিত জন্তুদের লজ্জা নিবারণ করা। উনি নিজের হাতে কয়েকটা হাফপ্যান্ট করে দিয়েছেন পেটোর জন্যে।"

পেটো এবার তড়াং করে লাফ দিয়ে অদৃশ্য হলো। তারপর তাজ্জব ব্যাপার, একটি ট্রে দু'হাতে ধরে সে ঘরের মধ্যে ঢুকলো—তাতে দুটো গেলাস রয়েছে।

তপন বললো, পেটো আমার ফাইফরমাশ খাটে। আমার সঙ্গে নার্সিংহোমে যায়। আপনাকে দেখে খুব খুশী হয়েছে, তাই গেলাস নিয়ে এলো। এখন কিছু খাবেন নাকি? কোকোকোলা আছে।"

পেটোর কাণ্ডকারখানা দেখে আমার মাথা ঘুরছে। বললাম, "কামড় দেয় না তো?"

"না না। খুবই বন্ধুভাবাপন্ন বাঁদর। তাছাড়া বেচারা বুড়ো হয়ে এসেছে—এখন আর কারুর পিছনে লাগে না।"

"সুগ্রীব বলে যে বাঁদরের ওপর আমরা অস্ত্রোপচার করছি, তা যদি সফল হয়, তা হলে ভাবছি পেটোকেও আবার যৌবন ফিরিয়ে দেবে।"

তপন বললো, "এই বাবুকে একটু দেখাশোনা করিস পেটো।" পেটো আমার দিকে তাকিয়ে নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারেই ঘাড় নেড়ে তার সম্মতি প্রকাশ করলো।

আমি আর সময় নষ্ট না করে স্নানের ঘরে ঢুকে গেলাম।

স্নান থেকে বেরিয়ে শুনলাম, সুচরিতা আমার খোঁজে এসেছিল। চাবি নিয়ে সে নিজের ঘরে গিয়েছে, এখনই ফিরবে। তপনও তৈরি হয়ে নিয়েছে। তপনের দেশ যশোরে। তবে তপনরা অনেকদিন পাইকপাড়ায় বাড়ি করেছে।

"কোথায় পাইকপাড়া আর কোথায় আমেরিকা—দেখুন না ঘুরতে ঘুরতে কোথায় হাজির হয়েছি।"

"লণ্ডন থেকেই দেশে ফিরবো ভেবেছিলাম। কিন্তু প্যারিসের এক কনফারেন্সে ডঃ এলিজাবেথ শিপেনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। অদ্ভুত মহিলা—শুকনো প্যাটকাঠির মতো চেহারা, কিন্তু কর্ম ক্ষমতার একটি ফার্নেশ

বলতে পারেন। বিয়ে করবার সময় পাননি—রিসার্চ নিয়েই ব্যস্ত আছেন। তা ছাড়া ওঁর মাকে নিয়ে সমস্যা! বিয়ে করলে অসুস্থ বিধবা মাকে কে দেখবে সেই চিন্তায় চিরকুমারী থেকে গেলেন। ভারতবর্ষের লোকদের সম্বন্ধে ভদ্রমহিলার খুব বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস ভাঙিয়েই অনেক ভারতীয় এই প্রোজেক্টে কাজ করছেন।

ইতিমধ্যে খুকু ফিরে এলো। পার্টির জন্য খুকু একটা লাল সিল্কের শাড়ি পরেছে—ওকে মিষ্টি দেখাচ্ছে।

তপন বললো, "আপনার মামাকে বলছি, ডঃ শিপেন ইণ্ডিয়ান ছাত্র এবং বৈজ্ঞানিকদের পছন্দ করেন।"

সত্যি কথা বলতে কি আমেরিকায় সমস্ত ক্যাম্পাসে ভারতীয়দের সম্মান ছাত্র হিসেবে ভারতীয়দের বেশ সুনাম। মাস্টার হিসেবেও তাদের খাতির। ইংলণ্ডে যেমন ইণ্ডিয়ান বলতে একটু নাক সিঁটকায়, এখানে ঠিক তার উল্টো, সুচরিতা বললো।

"যতই এখানে তোমাদের আদর হোক, তোমাদের দেশে ফিরে যেতে হবে", আমি সুচরিতাকে স্বদেশের কথা মনে করিয়ে দিই।

তপন বললো, "দেশে ফিরবার কথাই ভাবছিলাম, কিন্তু ডাক্তার শিপেন নেমতন্ন করলেন, আমাদের মেডিকেল সেন্টারে চলুন। মানুষের মঙ্গলের জন্যে আমরা একটা বড়ো কাজ করবার চেষ্টা করছি। বার্ধক্যের রহস্যভেদের জন্যে একজন বৃদ্ধ শিল্পপতি তাঁর সমস্ত জীবনের সঞ্চয় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে গিয়েছেন। এই যে গোল্ডেন হোম দেখছেন, এখানেই জীবনের শেষ কয়েকটা বছর কাটিয়ে গিয়েছেন তিনি। আমরা খুব উৎসাহের সঙ্গে কাজ করছি। এই দেশে বৃদ্ধদের দিকে আমি তাকাতে পারি না। সব কিছু থেকেও কোনো কিছু নেই তাদের। আমাদের অজ্ঞাতে আমরা এমন এক সভ্যতা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি, যেখানে শুধু যৌবনের জয়ধ্বনি, বৃদ্ধদের কোনো স্থান নেই। সবাই ভুলে গিয়েছে যে প্রতিটি যুবক যুবতী একদিন বৃদ্ধ হবে। যাঁরা একদিন আমাদের মানুষ করেছেন, যাঁরা আমাদের এই আশ্চর্য দেশ ও তার সম্পদ উপহার দিয়েছেন, তাঁদের অন্তিম দিনগুলোর জন্যে আমরা কিছু বার্ধক্য-নিবাস তৈরি করে সন্তুষ্ট থাকতে চাই। মার্কিনীরা চায়, তাদের বাবা-মায়ের জন্যে যা-কিছু করার তা গভরমেন্ট করুক। তিনি প্রথমে বালিকা বান্ধবী এবং পরে স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে জীবন উপভোগ করতে ব্যস্ত!"

খুকু ও আমি দু'জনেই ডঃ শিপেনের কথা শুনছিলাম। তপন বললো, "ডঃ শিপেন মৃত্যুকে বিলম্বিত করে মানুষকে দীর্ঘজীবী করতে চান না। ওঁর ধারণা জরাকে জয় করে বিজ্ঞান এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে যেখানে সুস্থ শরীরেই

মানুষ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে।"

তপন বললো, "ডঃ শিপেনের গবেষণা কেন্দ্রে না এলে আমার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যেতো। আমি কিছুদিন গোল্ডেন নার্সিংহোমের চার্জে রয়েছি—একজন বিদেশী ডাক্তারের পক্ষে এই দায়িত্ব পাওয়া কম সম্মানের নয়। আমরা বার্ধক্যের প্রতিটি দিক পরীক্ষা করে দেখছি এবং মেডিক্যাল সেন্টারে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছি। দেশে ফিরে গিয়ে কয়েক বছর পরে যদি দেখেন এলিজাবেথ শিপেন নামে এক মহিলা বিজ্ঞানে নোবেলে পুরস্কার পেয়েছেন তাহলে আশ্চর্য হবেন না। আমার মনে হয় ইতিমধ্যেই তিনি যা কাজ করেছেন তাতেই ওঁকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া যায়।"

"বার্ধক্যের প্রক্রিয়া সম্পর্কে কাজ করে আমরা ইতিমধ্যে বয়স সম্পর্কে নানা ভুল ধারণা ভাঙতে সক্ষম হয়েছি। যেমন—বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন শেখাবার ক্ষমতা থাকে না। আমরা দেখছি ক্ষমতা কমে যায়, কিন্তু পুরোপুরি নষ্ট হয় না—যদি না তার পিছনে বে-ইজ্জত হবার ভয় থাকে। দুশ্চিন্তাবিহীন হয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কিছু শিখলে বৃদ্ধরা অনেক কাজ আমাদের থেকে ভালভাবে করতে পারেন।"

তপন বললো, "মানুষের দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি চল্লিশ বছর থেকেই কমতে আরম্ভ করে। বার্ধক্যের সঙ্গে-সঙ্গে দৃষ্টি এমন ক্ষীণ হয়, যা চশমা নিয়েও ঠিক করা যায় না। বিশেষ অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ গেলে তাদের দৃষ্টি সংহত করতে সময় লাগে। ফলে হঠাৎ অন্ধকার সিনেমা কিংবা থিয়েটার হলে ঢুকলে বৃদ্ধদের ধাক্কা খাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। বৃদ্ধদের ঘরে সেইজন্যে একটা নাইটল্যাম্প সারারাত জ্বালিয়ে রাখা ভাল।"

তপনের কথাগুলো আমার খুব ভাল লাগছিল। সে হাসতে-হাসতে বললো, "আমাদের দেশে মেয়েদের সম্বন্ধে বলে কুড়ি পেরোলেই বুড়ী। কুড়ি না হোক, পঁচিশ বছর বয়সেই পরিপূর্ণ বিকাশের পর প্রত্যেক মানুষের দেহ সেই বার্ধক্যের পথে যাত্রা শুরু করে। দেহ ক্রমশ ছোট হয়, শরীরে জীবকোষের সংখ্যা কমতে থাকে। বয়সের সঙ্গে পেশীর ক্ষয় হয়, নার্ভ সেলের সংখ্যাও কমতে থাকে। আমাদের ব্রেনের আকার এবং ওজনও ক্রমশ কমে যায়। পঁচাত্তর বছর বয়সে অরিজিন্যাল ব্রেনের ওজন শতকরা ৫৬ ভাগ অবশিষ্ট থাকে।"

"বলেন কী? আমি নিজের মাথায় হাত দিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করি। তপন বললো, "মানুষ দু'ভাবে বৃদ্ধ হয়। প্রাইমারি এজিং (বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে যে বার্ধক্য আসে) এবং সেকেণ্ডারি এজিং (অসুখ-বিসুখের ফলে যে-বার্ধক্য ত্বরান্বিত হয়)। বার্ধক্যকে তিনভাগে ভাগ করেছি আমরা—মানসিক বার্ধক্য, সামাজিক বার্ধক্য, এবং বায়োলজিক্যাল বার্ধক্য।

খুকু মনে করিয়ে দিলো, "পার্টিতে যাবার সময় হয়েছে। হলটা আজ আমরা যেভাবে সাজিয়েছি, ওঁরা দেখলে অবাক হয়ে যাবেন।"

তপন হাসলো। "এই এক ভণ্ডামি, যার কিছু আমি বুঝি না। বৃদ্ধদের বার্ধক্য সহনীয় করে তোলবার জন্যে যা প্রয়োজন তা হলো আপনজনদের নিত্য সান্নিধ্য। তা নয়, নির্বাসনে পাঠিয়ে সেখানে ওদের ফূর্তিতে রাখো। কীভাবে ফূর্তি দাও? না, গাড়ি করে রবিবারে চার্চে নিয়ে যাও, আর প্রত্যেকের জন্মবার্ষিকী পালন করো।"

আমি তপনের মুখের দিকে তাকাই। সে বললো, "পশ্চিমী সভ্যতার এই ভণ্ডামীর অংশটা আমার অসহ্য লাগে। এখানে প্রকাশ্যে চোখের জল ফেলাটা অসভ্যতা। এখানে কেউ মুখ ফুটে বলতে পারবে না সে দুঃখে রয়েছে। তাকে বলতে হবে সব কিছুই চমৎকার চলেছে—ফাইন, গ্রেট, গ্লোরিয়াস কথাগুলো মুদ্রাদোষের মতো হয়ে গিয়েছে।"

"কিন্তু আপনি কি বলতে চান, এখানকার সব বুড়োই দুঃখী এবং আমাদের দেশের সব বুড়োই সুখে রয়েছে?" খুকু প্রশ্ন তোলে।

মোটেই না। আমি নিজে জানি, বহু বৃদ্ধ কিছুতেই ছেলে বা মেয়ের বাড়িতে থাকবেন না। তবে চাপা দুঃখ আছে। বার্ধক্যের জন্যে এরা কোনোদিনই তৈরী থাকে না। বার্ধক্যকে এরা ভয় পায়, তাই তার দিকে চোখ বন্ধ করে থাকে। এখানে কেউ বুড়ো হতে চায় না—প্রসাধন কোম্পানিরা তাই এতো টাকা করছে। কিন্তু হঠাৎ একদিন সময়ের ঝড়ে দরজা খুলে যায়—আবিষ্কার করে সে বুড়ো হয়েছে। বুড়ো হওয়াটা যেন অপরাধ, যেন পরাজয়। আর পাশ্চাত্যের ঔদ্ধত্য জানো তো—কেউ হারতে চায় না। যে হারলো, তাকে চোখের সামনে থেকে সবাই সরিয়ে দিতে ব্যস্ত। তাই বুড়োদের প্যাক করে সমুদ্রের ধারে কিংবা নির্জন গ্রামে পাঠিয়ে দাও। টেলিফোন কোম্পানি ছাড়া আর কারুর তাদের সম্বন্ধে চিন্তা নেই। তারাই শুধু এই সুযোগে দুটো ডলার রোজগারের জন্যে টি-ভিতে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে : আপনার বাবা-মাকে লংডিসটান্স ফোনে ডাকুন, তাঁরা আপনার কণ্ঠস্বর শুনলে খুশী হবেন। গো-হোম ভায়া দি লংডিসটান্স—টেলিফোনের মাধ্যমে বাড়ি যান।"

"মার্কিনীরা আপনার কথা শুনলে বিরক্ত হবেন।" খুকু বললো।

"আমি জানি সত্যিই তাঁরা বিরক্ত হবেন। কারণ বৃদ্ধদের সঙ্গে তাঁরা কীভাবে ব্যবহার করেন তা অনেক সময় নিজেরাই জানেন না। যেমন ব্রাহ্মণরা বিরক্ত হয়, যদি বলা হয় তাঁরা বহুদিন ধরে নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং গরীব মুসলমানদের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করেছেন। তার মানে এই বলছি না, এদেশে কোনো ছেলে বাবা-মাকে ভালবাসে না, বা বাবা-মার জন্যে অনুভব করে না। কিন্তু সেইটাই তো

আমার এবং ডঃ শিপেনের দুঃখ। যে দেশে এতো দয়া এবং দাক্ষিণ্য, যে দেশে ঈশ্বরের অনুগ্রহ এমন অকৃপণভাবে বর্ষিত হচ্ছে, সেখানে বৃদ্ধরা সমাজের মূল প্রবাহ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন মনে করবেন কেন?

খুকু বললো "মামা, এ বিষয়ে তুমি নিউইয়র্কে কিছু কথাবার্তা বলেছিল না।"

"নিউইয়র্কে মিস্টার ও মিসেস ফারপো নামে এক বৃদ্ধ ইতালীয়ান দম্পতির সঙ্গে কিছু কথা হয়েছিলো। ইতালীয়ান আমেরিকানরা এখনও ইহুদীদের মতো ছেলেমেয়েদের কাছাকাছি থাকতে ভালবাসেন। আর আলাপ হয়েছিল আমার এক তরুণী বান্ধবীর সদ্যবিবাহিত স্বামীর সঙ্গে। স্বামীটি অর্থনীতিতে পণ্ডিত। তিনি একদিন ডিনারে আমাকে যা বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, তার সারমর্ম হলো পাশ্চাত্ত্য যে এতোখানি এগিয়ে গিয়েছে তার কারণ উৎপাদন দিয়ে তাঁরা মানুষের বিচার করেন। যাদের কাজের ক্ষমতা কমে গিয়েছে অথচ কথা বলার ইচ্ছে বেড়ে গিয়েছে, তাদের ওপর নির্ভর করলে দেশের অগ্রগতি রুদ্ধ হবে। যৌবনের উদ্ভাবনী শক্তি ও পেশী শক্তিতেই সমাজ এগিয়ে চলে। বৃদ্ধ-নির্ভরতাই ভারতবর্ষের অনগ্রগতির অন্যতম কারণ। কথাটা নিষ্ঠুর হলেও নাকি সত্যি। ঈশ্বরই যৌবনের ওপর জোর দিয়েছেন—মধ্যগগনের সূর্যই বেশী উত্তাপ দেয়।

"কথাগুলো ইন্টারেস্টিং", তপন মন্তব্য করলো।

"আর কিছু শুনেছিলে?" খুকু জিজ্ঞেস করে।

"শুনলাম, দরিদ্র দেশের বৃদ্ধদের সম্মান বেশী। ওসব দেশে শিল্পের প্রগতি তেমন দ্রুত নয় বলে বুড়োরা কাজকর্মের ক্ষেত্রে রাতারাতি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে না। অথচ পশ্চিমে বিজ্ঞানের এমন দ্রুত উন্নতি হচ্ছে যে তার সঙ্গে তাল রেখে চলা বয়োজ্যেষ্ঠদের পক্ষে বেশ কষ্টকর ব্যাপার। প্রতিযোগিতার দৌড়ে বৃদ্ধ বিজ্ঞানী, বৃদ্ধ ইঞ্জিনীয়র, বৃদ্ধ কারিগর সবাইকে ছেড়ে দিতে হয় নতুনকে। তার ফলেই একজন মানুষের জীবনকালে গোরুর গাড়ি থেকে মহাকাশচারী রকেটের বিবর্তন দেখা যাচ্ছে। শিল্প-সভ্যতায় এগিয়ে যাবার প্রতিযোগিতা এতো কঠিন যে অন্যের দিকে তাকাবার সময় থাকে না। নিজের স্ত্রী এবং ছেলেপুলে সামলানোই যথেষ্ট শক্ত কাজ। তার ওপর বাবা মা স্কন্ধে চাপলে জীবনে আনন্দ বলে কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। সুতরাং যে যার ঘর সামলাও ; তবেই প্রগতির রথ এগিয়ে চলবে। টেকনলজির উন্নতির সঙ্গে এই অবস্থা সব দেশেই নাকি অনিবার্য। আধুনিক জাপানে জনকজননী এখন আর স্বর্গদপি গরীয়সী নন, আমাদের দেশেও তাই হতে বাধ্য।"

তপন গম্ভীরভাবে বললেন, "ঈশ্বর ভারতবর্ষকে রক্ষা করুন।"

খুকু বললো, "আমি সামাজিক নৃতত্ত্ব চর্চা করি। আমরা ভালমন্দ বিচার করি

না—শুধু ছবিটা চোখের সামনে তুলে ধরি। সুতরাং কোনো মন্তব্য করবো না। শুধু এখন বলতে চাই, একতলার নিচে মিস্টার রাইটের পার্টি এতোক্ষণে আরম্ভ হয়ে গেলো।"

হোমের প্রধান শ্রীমতী টমলিন হলের দরজার সামনে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। উইক এণ্ডের অভিসার অসমাপ্ত রেখেই তিনি ফিরে এসেছেন। কারণ জন্মদিবসের পার্টিতে না থাকাটা তিনি কল্পনা করতে পারেন না।

মিসেস টমলিন বললেন, "আমাদের হোমের নতুন পলিসি, প্রতিটি সিনিয়র সিটিজানের জন্মদিন আমরা পালন করবো।"

খুকু বললো, "এখানে কেউ বুড়ো কথাটা ব্যবহার করে না। বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিক বলা হয় সবাইকে।"

মিসেস টমলিন বললেন, "এইটাই এখানকার নিয়ম। আমরা কাউকে জানতে দিই না যে তিনি বুড়ো হয়েছেন। বুঝতেই তো পারছেন, বুড়ো হলে জীবনের আর কী রইলো।"

ঘরের মধ্যে বেলুন এবং রঙীন কাগজ দিয়ে সাজানো হয়েছে। একটু পরেই বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকরা তাঁদের সবচেয়ে সুন্দর স্যুট পরে হলঘরে ঢুকতে আরম্ভ করলেন। অনেকে আবার ইভনিং স্যুট চাপিয়েছেন—কালো রঙের কোট থেকে একটুকরো সাদা রুমাল উকি মারছে। অনেকে ঠিক দেখতে পাচ্ছেন না—তাঁরা লাঠির ওপর ভর করে কোনোরকমে হাজির হয়েছেন।

তপন বললো, "এঁরা কেউ মিলিটারিতে কর্ণেল ছিলেন, কেউ ইনসিওর কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন, কেউ রেডিও কোম্পানির স্টেশন ডিরেক্টর ছিলেন। মায় ওই যে কোণে রোগামতো ভদ্রলোককে দেখছেন উনি সাহিত্যিক ছিলেন।"

তপন আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো। ভদ্রলোক বললেন, "হ্যাঁ' এক সময় লিখতাম। নতুন যুগের মানুষেরা আমার লেখায় কিছু পায় না—আমি ওদের মনের খবর জানি না। আমি বাতিল হয়ে গেছি। কোনো প্রকাশক আমার লেখা ছাপবার ঝুঁকি নিতে চায় না। বুঝলেন মিঃ শংকর, আমাদের এখানে সব কিছুই দ্রুত পাল্টে যায়—তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আপনি যদি ছুটতে না পারেন তাহলে আমার অবস্থা হবে। কেউ খোঁজ রাখবে না। জায়গা নেই বলে অনেক লাইব্রেরি আমাদের বই ফেলে দিচ্ছে। নতুনদের জায়গা দিতে হবে তো।"

মিসেস টমলিন বললেন, "ওই যে বৃদ্ধ ভদ্রলোককে দেখছেন, খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসছেন, উনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের খ্যাতনামা বীর। এয়ারফোর্সের

নামকরা পাইলট ছিলেন।”

এয়ারফোর্স কমাণ্ডার হ্যারি হপকার্ক আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন—ওঁর হাতটা কাঁপছিল। আমার প্রশস্তি শুনে বললেন, “আমরা পুরনো হয়ে গিয়েছি। আজকালকার নতুন সুপারসোনিক প্লেন দেখলে কিছুই বুঝতে পারবো না। যেসব প্লেনে আমরা মানব সভ্যতাকে জার্মানদের হাত থেকে রক্ষা করেছি তা দেখলে আজকালকার ছেলেরা খেলনা ভাববে। মিউজিয়াম ছাড়া আর কোথাও তাদের দেখতে পাবেন না। আমাদের কোন দাম নেই।” হপকার্কের কণ্ঠ বিষণ্ণ হয়ে উঠলো।

খুকু বললো, “ওই যে টাকমাথা ছুঁচলো নাকের ভদ্রলোককে দেখছো—উনি সে যুগের বিখ্যাত গাইয়ে। এখন ওঁর গান চলে না। যখন ওঁর দিন ছিল, তখন হাজার হাজার লোক ওঁকে ঘিরে থাকতো। বিয়েও করেছিলেন ব্রডওয়ের নামকরা অভিনেত্রীকে। যেদিন নাম চলে গেলো সেদিন অভিনেত্রীও বিদায় নিলেন। ভদ্রলোক নিউয়র্কের ড্রাগস্টোরে ডিস ধুতেন, এখন এখানে এসে উঠেছেন। ওঁকে অর্ধেক খরচে রাখা হয়েছে, ওঁর বিশেষ কিছু নেই।”

মিসেস টমলিন ফিসফিস করে বললেন, “বহু কষ্ট করে ওঁর গানের রেকর্ড যোগাড় করেছি। এদেশে পুরনো আবর্জনা কেউ রাখে না। আজ ওঁকে একটু আনন্দ দেবো। ভদ্রলোকের শরীর ভাল যাচ্ছে না।”

যাঁকে নিয়ে আজ রাত্রের উৎসব তাঁকে এবার দেখা গেলো। মিস্টার টম রাইট বিজয়গর্বে সুসজ্জিত হয়ে হলঘরে প্রবেশ করলেন। মিসেস টমলিন এগিয়ে গিয়ে ওঁর কোটের কোণে একটি ফুল এঁটে দিলেন। দর্শনের অধ্যাপকের বিধবা শ্রীমতী সিম্পসন প্রজাপতির মতো সেজেছেন। তিনি ছুটে এসে মিস্টার রাইটের হাত ধরে মাথায় রঙীন কাগজের টুপি পরিয়ে দিলেন।

খুকু বললো, “ভদ্রলোকের অবস্থা ভাবো। স্ত্রী বিবাহবিচ্ছেদ করেছে। তিন ছেলের কেউ ভুলেও খোঁজখবর নেয় না। শুধু বড়দিনের সময় কার্ড পাঠায়, আর নাতিনাতনীর জন্ম হলে খবর দেয়। এক মেয়ে মাঝে মাঝে খবরাখবর নিতো—এখন স্বামীর সঙ্গে ফিলিপাইনস-এ চলে গিয়েছে। ভদ্রলোকের টাকাকড়িও কমে এসেছে। এদেশেও ডলারের দাম কমছে, জিনিসপত্রের দাম আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গিয়েছে। শরীর ভাল নয়। চোখে তেমন দেখতে পান না।”

মহিলারা এবার মিস্টার রাইটকে ঘিরে ধরলো। বললো, “এইদিন বার বার ফিরে আসুক। আপনাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে কি বলবো?”

সৌন্দর্যের প্রশস্তিতে মিস্টার রাইট বেশ গর্ববোধ করলেন, গলার টাইটা একটু টেনে টাইট করে নিলেন।

মিসেস টমলিন বললেন, 'ও মিস্টার রাইট, আপনি ওইভাবে তাকাবেন না। অমন সিডাকটিভ' দৃষ্টি যে-কোনো রমণী হৃদয়ের বরফ গলিয়ে দেবে।"

মিস্টার রাইট মনে হলো কথাটা বিশ্বাস করলেন।

অবসরপ্রাপ্ত বিচারক মিস্টার ডুগান সস্ত্রীক হলঘরে ঢুকলেন। ওঁদের দেখলে কে বলবে কিছুক্ষণ আগেই অমন দাম্পত্য সঙ্কট গিয়েছে। মিসেস ডুগান এবার মিস্টার রাইটকে অভিনন্দন জানালেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন বুঝছেন?"

"ওঃ চমৎকার! মনে হচ্ছে পৃথিবীর মাথায় দাঁড়িয়ে আছি", মিস্টার রাইট উত্তর দিলেন। "এবং আপনাদের কী হৃদয়, আমার জন্মদিনে আপনারা এমন উৎসব করছেন। আমার ছেলেরা শুনলে খুব খুশী হবে।"

"বেচারা!" খুকু ফিস ফিস করে বললো। "কেউ ওঁর খবর নেয় না। কয়েকদিন আগে আমি নিজে ওঁর এক ছেলেকে ফোন করি—বলি হাজার হোক আপনার বাবা, মাঝে মাঝে ওঁকে একটু সান্নিধ্য দেবেন। ভদ্রলোক বললেন, আমি জানি আপনাদের ওখানে উনি নিরাপদে আছেন। আমি ওঁকে বোঝালাম, নিরাপত্তাটাই জীবনের সব নয়, এই বয়সে মানুষ একাকীত্বকে ভয় পায়। ভদ্রলোক খুব খুশী হলেন না। উনি সেদিন আবার সপরিবারে হাওয়াইতে ছুটি কাটাতে যাচ্ছিলেন। ছুটিতে যাবার সময় এই সব অপ্রিয় কথা ভাল লাগে না।"

তপন বললো, "এ তো তবু ভাল। আমার জানাশোনা এক ভদ্রলোকের কি রাগ—ছুটিতে যাবার সময় খবর এল বাবার শেষ অবস্থা। অসময়ে মারা গিয়ে বাবা নাকি ছুটিটা নষ্ট করে দিলেন। বুড়োদের সত্যি কোনো বিবেচনা বোধ থাকে না, আমি নিজে শুনেছি।"

ম্যানেজার মিসেস টমলিন বললেন, "আপনি শুনে সুখী হবেন, এই পার্টির জন্যে আমরা এক পয়সা চার্জ করছি না। গভরমেন্ট তাদের বিশেষ গ্রান্ট থেকে আমাদের এই জন্মোৎসবের খরচ দেবে। তাছাড়া স্থানীয় মেয়র এবং চার্চও খুব দরদী। ওঁদের আগে থেকে জানালে ওঁরা টেলিগ্রাম পাঠান, মেয়র নিজে ফুল উপহার দেন। বলুন এটা সুন্দর কিনা। স্বয়ং মেয়র আপনার জন্মদিনের খবর রাখছেন, আর আপনি কী চাইতে পারেন?"

হলের মধ্যে এবার বাজনা বেজে উঠলো! রেকর্ডে বাজনার ব্যবস্থা ছিল ; তারপর জন্মদিনের গান শুরু হলো—হি ইজ এ জলি গুড ফেলো, হ্যাপি বার্থ-ডে, হ্যাপি বার্থ-ডে।

এবার মিসেস টমলিন ঘোষণা করলেন, "মিস্টার টম রাইটের বন্ধু ও বান্ধবীগণ, আসুন আমরা এই অতীব আকর্ষণীয় পুরুষটির শতায়ু কামনা করি। তাঁর জীবন যেন এখনকার মতই আনন্দে ভরপুর থাকে। শুধু আমরা নয় স্বয়ং মেয়র মিস্টার রাইটের দীর্ঘজীবন কামনা করেছেন এবং আমাদের বিশেষ অতিথি

ভাতববর্ষের একজন নামকরা লেখকও এসেছেন এই আশী বছরের তরুণকে অভিনন্দন জানাতে।”

এবার হাততালি পড়লো। মিসেস টমলিন এবার মিস্টার রাইটকে বার্থ-ডে কেকের কাছে নিয়ে গেলেন—সেখানে আশিটি মোমবাতি জ্বলছিল। সেগুলো ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেওয়া বৃদ্ধের পক্ষে সম্ভব নয়—মিসেস টমলিনই ওঁর হাত ধরে কাজটি সমাধা করলেন।

তারপর নৃত্যের সংগীত শুরু হলো। ওঁদের কয়েকজন মদের গেলাশ ধরে নাচবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু প্রায় প্রত্যেকের কোমরেই বাত, সুতরাং নাচ জমলো না। নাচবার ইচ্ছে আছে, শক্তি নেই।

এবার সকলে বুফে ডিনার টেবিলের দিকে অগ্রসর হলেন। এবং রেকর্ডে একটি গান শুরু হলো। তার আগে মিসেস টমলিন বললেন, “আমাদের পরম সৌভাগ্য বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ টনি সুইনি আমাদের হোমেই থাকেন। তাঁর এই গানটি অনেকের অনুরোধে বাজানো হচ্ছে।

মিস্টার সুইনি আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। পুরনো দিনের হারিয়ে যাওয়া আপন কণ্ঠস্বর শুনে সুইনি কিছুক্ষণের জন্যে অভিভূত হয়ে পড়লেন। কিন্তু তারপরই ওঁর অভিমানী মনটা বিরক্ত হয়ে উঠলো। মনে হলো ওঁর মুখে কেউ অপমানের কালি ছড়িয়ে দিয়েছে। টনি সুইনি অস্থির হয়ে উঠলেন। খুকুকে বললেন, “মিসেস টমলিন কোথায়?”

খুকু ওঁকে হলের আর এক কোণ থেকে টেনে নিয়ে এলো। এক গাল হেসে মিসেস টমলিন বললেন, “ও, মিস্টার সুইনি—আপনাকে হিংসে হচ্ছে। কি আপনার গান—দেখুন সকলে কেমন উপভোগ করছেন।”

ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে আর এইভাবে অপমান করবেন না। আমি জানি—আমার গানের কত কদর। অবহেলা তবু সহ্য হয় মিসেস টমলিন কিন্তু অভিনয় সহ্য হয় না এই বয়সে। প্লিজ, আমাকে ভুল বুঝবেন না।”

আমাদের চোখের সামনে সেকালের জনপ্রিয় গায়ক টনি সুইনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, তখনও তাঁর কণ্ঠস্বর রেকর্ডপ্লেয়ারে বাজছে।

মিসেস টমলিন দক্ষ অভিনেত্রীর মতো অন্য বৃদ্ধদের দৃষ্টি যাতে এদিকে না পড়ে তার ব্যবস্থা করলেন। বললেন, “আহা কী সুকণ্ঠ! জাত শিল্পী আমাদের টনি—নিজের কণ্ঠস্বর শুনে অভিভূত হয়ে পড়েছেন।”

ডিনারের শেষে কোয়ার্টারে ফিরে এসে তপন বললো, শংকরবাবু, হাজার কথার এক কথা বলে গেলো বেচারা সুইনি। দোহাই তোমরা অবহেলা করো, কিন্তু অভিনয় করো না। বয়োবৃদ্ধদের নিয়ে সমস্ত দেশে অভিনয় চলেছে। ছোট ছেলেদের যেমনভাবে ভোলানো হয়, তেমনভাবে অভিনয় করে বৃদ্ধদের

ভোলানোর চেষ্টা চলেছে এই বিরাট মহাদেশে।”

বললাম, “একটু কফি হলে মন্দ হতো না। তোমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ আড্ডা জমাতে ইচ্ছে করছে।”

তপন গাঙ্গুলী নিজেই কফির যোগাড় করতে যাচ্ছিল। খুকু বললো, “আমিই করি।”

তপন গাঙ্গুলী বললো, “মিস চ্যাটার্জি, বাড়িটা আমার আর আপনারা অতিথি।”

“অতিথিরা কফি তৈরি করবে না, এমন কোনো নিয়ম আছে কি?” সুচরিতা জিজ্ঞেস করে।

আমি সুচরিতার পক্ষ সমর্থন করে বলি, “এই তো আমার ভাগ্নীর যোগ্য উত্তর। তাছাড়া তপনবাবু আপনিই বলুন আর আপনার সহকারী পেটোই বলুন, চা-কফি জিনিসটা মেয়েদের হাতে আরও মিষ্টি হয়। ওর মাকে গিয়ে কী বলব আমি? যে মেয়ে আগে সব রকম রান্না করতো সে এখন চা পর্যন্ত তৈরি করে না।”

“বুঝুন ডঃ গাঙ্গুলী—মামাকে এত আদর যত্ন করে এই ফল হলো যে, কলকাতায় গিয়ে আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট দেবেন।”

খুকু কফি তৈরি করে নিয়ে এলো। খবর পেয়ে পেটো কোথা থেকে হাজির। তাকে বেশ উদ্বিগ্ন মনে হলো। সে একবার চেয়ারে উঠছে আবার নামছে।

খুকু বললো, “মামা, তোমার ভয় লাগছে না?”

“আমার বাঁদরের ভয় নেই, হাজার হোক পূর্বপুরুষ। তুই তো জানিস আমার ভয় আরশোলা আর কুকুরের।”

খুকু বললো, “ডঃ গাঙ্গুলী, শেষ পর্যন্ত একটা বাঁদর পুষলেন, পৃথিবীতে এতো জিনিস থাকতে!”

তপন হেসে বললো, “বাঁদর কিন্তু বাঁদরামি করে না। একটু কফি খাবার ইচ্ছে হয়েছে এই যা। আমি যতবার কফি খাই ওকেও ততবার আধ কাপ দিতে হয়।”

আমাদের কথাবার্তা শুনে পেটো নিজের কাপ ডিস নিয়ে এলো। খুকু তাতে কফি ঢেলে দিলো। ঘরের এক কোণে সরে গিয়ে পেটো গরম কফিতে ফুঁ দেবার চেষ্টা করতে লাগলো।

আমাদের কথাবার্তা বেশ জমে উঠেছে। তপন বললো, “আমাদের দেশে বৃদ্ধরা কনিষ্ঠদের সম্বন্ধে আজকাল তেমন সন্তুষ্ট নন। শাশুড়ীর নানা অভিযোগ পুত্রবধূ সম্পর্কে। ছোটখাট ঝগড়াও লেগে আছে। কিন্তু তবু ভারতবর্ষের মানুষ এখনও এতোটা হৃদয়হীন হয়নি। যতই শিল্পবিপ্লব আসুক এ-বিষয়ে কোনোদিন সাহেব হয়ে উঠবো না।

"ভয়েরই কথা" আমি বলি! "কারণ আজকাল সমাজের উচ্চস্তরে নানা সাহেবিয়ানা জেঁকে বসেছে।"

তপন বললে, "প্রাচ্যের লোকেরা এই অবস্থা দেখে বিচলিত হয়। কোনো একজন আমেরিকান লেখকের লেখায় যেন পড়েছিলাম—বৃদ্ধদের কাছে ভালবাসা কথাটাই মিথ্যা ; কারণ বুড়োকে কে ভালবাসতে পারে? সে একটি 'নুইসেন্স' কোথাও তার স্থান নেই। তার চারদিকে শঠতা—কারণ করুণাবশত তাকে সবাই ঠকাচ্ছে, কেউ তাকে সত্যি কথা বলে না। তাকে ছোটছেলের থেকেও অধম মনে করে।"

খুকুর হাই উঠছে। বেচারা সারাদিন অনেক ঘুরেছে। ওকে আমরা ছুটি দিয়ে দিলাম।

আমাদের গল্প কিন্তু বন্ধ হলো না। দেখলাম তপনের চোখে স্বপ্ন। সে বললো, "সব দোষ স্খালন হয়ে যায় এদের কর্মপ্রচেষ্টা দেখলে। কর্মের আগুনে সব অপরাধ এরা শুদ্ধ করে নিচ্ছে। আমাদের গবেষণাগারে যা কাজ হচ্ছে তা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। আপনাকে জোর করে বলতে পারি, ডঃ শিপেন এখন ল্যাবের বাঁদরগুলোকে পরীক্ষা করে দেখেছেন। সুগ্রীবের খবরাখবর নিচ্ছেন।"

"পশ্চিমের এই কর্মী মূর্তিই তো বিবেকানন্দকে মুগ্ধ করেছিল। এদের কাছে এইটাই বড়ো শেখার জিনিস।" আমার অভিমত জানাই।

"ভাবলে দুঃখ হয়। আগের যুগের মানুষরা এমনিভাবেই পরিশ্রম করেছিলো বলেই তো আমরা আজ সভ্যতার এই সীমায় পৌঁছেছি। অথচ তাঁদের মনে রাখা হবে না এটা কেমন কথা?"

আমি বললাম, "আপনাদের গবেষণা যদি সফল হয় তাহলে মানব সমাজের রূপ পাল্টে যাবে। শৈশব, কৈশোর, যৌবনের পর বার্ধক্যের দেখা মিলবে না, তখন আমৃত্যু যৌবন।"

তপন বললো, "আপনি আমাকে তুমি বলবেন এবং নাম ধরে ডাকবেন।"

ভোরবেলায় যখন ঘুম ভাঙলো তখনও তপনের দেখা নেই। আমাকে বিছানায় উঠে বসতে দেখে পেটো একটা কাগজের টুকরো নিয়ে এলো। তপন লিখছে, "আমি ল্যাবরেটরীতে কয়েকটা কাজ সারতে যাচ্ছি। ব্রেকফাস্টের সময় ফিরবো। কফির জল গরমের জায়গা পেটো আপনাকে দেখিয়ে দেবে।"

পেটোকে কোনোক্রমেই বাঁদর বলা চলে না। তপন যে কীভাবে ওকে শিক্ষা দিয়েছে ভগবান জানেন। সে আমাকে কিচেনে নিয়ে গেলো। সেখানে জল গরম চাপিয়ে দিলাম। অধৈর্য পেটো এবার নিজের কাপ ডিস হাজির করলো। এই একটি লোভ বেচারা এখনও দমন করতে পারেনি।

গরম জলের কেটলি নামাবার আগেই টেলিফোন বাজলো। তপন কথা

বলছে। "শংকরবাবু, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো? ব্যাচেলরের ডেরায় যখন উঠেছেন তখন একটু কষ্ট পেতে হবে। নিজের টুথ ব্রাশ খুঁজে পেয়েছেন তো? না হলে বাথরুমের আয়নার পিছনে নতুন ব্রাশ পাবেন। আকস্মিক অতিথিদের জন্যে আমি ব্রাশ কিনে রাখি।"

বললাম, "ব্রাশ আমার প্রায়ই হারায় এ কথা সত্য। কিন্তু আজকে সমস্ত খুঁজে পেয়েছি।"

কফির ব্যাপারে তপন বললো, "পেটো আপনাকে সব দেখিয়ে দেবে।"

শুনলাম সুচরিতাও সেই ভোরবেলায় হাসপাতালে বেরিয়েছে। দু'জনে এক সঙ্গে ফিরবো একটু পরে। সুচরিতাও মামার নিরাপত্তার জন্য বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে পেটোর সৌজন্য সম্পর্কে তার মনে গভীর সন্দেহ। আমি আশ্বাস দিলাম পেটোর কাছে পূর্ণ সহযোগিতা পাচ্ছি। সুতরাং তারা যতক্ষণ ইচ্ছে কাজ করতে পারে।

পেটো ও আমি পূর্বদিকের বারান্দায় এসে বসেছি। দূরে গোল্ডেন হোমের দেখা যাচ্ছে। গিনি সোনার মতো ভোরের রৌদ্র সমস্ত প্রাঙ্গণে এসে পড়েছে। কয়েকটা নাম না-জানা পাখি গাছের ওপর কিচিরমিচির করছে। দূরে গোল্ডেন হোমের গেটের কাছে ঘোড়ার পিঠ থেকে একটি ছেলে নামলো। ছেলেটি কাগজ বিক্রি করে। ঘোড়ায় চড়ে খবরের কাগজ বিলি করবার বুদ্ধিটা বেশ অভিনব। এ-দেশে মোটরের অত্যধিক প্রতিপত্তির জন্যেই আবার ঘোড়ার আদর বেড়েছে। শুনছি, সাইকেলও জনপ্রিয় হচ্ছে।

কেমন একটা কুড়েমি ভোরবেলায় কুয়াশার মতো আমার ওপর ভর করেছে। আমি অনুভব করছি, ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা রয়েছে, কেবল যদি ওই হতাশার কুয়াশাটুকু কেটে যায় আস্তে আস্তে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছি—আর ভাবছি এই আশ্চর্য দেশের সঙ্গে আমাদের ভারতবর্ষের পার্থক্যের কথা। ভারতবর্ষকে এখন অনেক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, অশিক্ষার আবরণ ভেদ করে জননী ভারতবর্ষের এই রূপ স্বদেশে কোনোদিন অনুভব করতে পারিনি। এমনভাবে দেশের কথা স্বদেশে কোনোদিন তো মনে আসেনি। কাছের জিনিসকে অনেক সময় কাছ থেকে দেখতে পায় না—তার জন্যে যেতে হয় দূরে, অনেক দূরে। সংসারে ক'জন আছেন যিনি স্বামী বিবেকানন্দের মতো কন্যাকুমারিকার শেষ ভারতীয় শিলাখণ্ডের ওপর বসে ভারতের প্রাণশক্তিকে আবিষ্কার করবেন।

হয়তো এও এক ধরনের হ্যাংলামো—সবসময় যা দেখেছি তার সঙ্গে নিজের দেশের তুলনা করা এক প্রকারের কমপ্লেক্স। দেশ ছাড়বার আগে মা বলেছিলেন, যখন যেখানে থাকবি, সেখানের সঙ্গে মিশে যাবি ; দেশ দেখবি, মানুষ দেখবি,

ঘরের কথা ভেবে মন খারাপ করবি না। কিন্তু পারি কই? দেশের জন্যে অন্তরে যে এত ভালবাসা আছে তাও তো কখনও অনুভব করিনি। আমরা যে অনগ্রসর, অশিক্ষিত ও ক্ষুধার্ত—আমাদের দেশের বড়লোক ও শিক্ষিত লোকরা যে দেশের জন্যে তেমন কিছু করেন না এসব জানতাম। কিন্তু ভারতবর্ষের অনেক কিছু যে এখনও ভাল রয়েছে, অনেক কিছু যে পশ্চিমী বেনো জল থেকে রক্ষে করবার আছে, তা কখনও বুঝিনি।

কফির কাপ প্রায় শেষ, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। "কে, শংকরবাবু নাকি?" ওদিকে চিঁড়ে বৌদির গলা। "কখন ঘুম থেকে উঠলেন?"

"সবেমাত্র উঠে কফি সেবন করছি পেটোর সঙ্গে।"

চিঁড়ে বৌদি খুব দুঃখ পেলেন। "কেন যে আপনি আইবুড়োর বাড়িতে উঠতে গেলেন! আমি তখনই জানতাম, ওই পেটোর হাতে পড়তে হবে আপনাকে। খুব সাবধান, পেটো সাংঘাতিক লোভী, আপনার কফি এঁটো করে দিতে পারে। তপনবাবু ওকে শিক্ষা দিচ্ছে, কিন্তু হাজার হোক বাঁদর তো।"

বললাম, "জন্তু জগতের সঙ্গে আমার তেমন সদ্ভাব ছিল না। পুনাতে ঔপন্যাসিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বাড়িতে চিড়িকদাস নামে এক পোষা কাঠবিড়ালির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—আর তারপরেই এক পেটো।"

চিঁড়ে বৌদি বললেন, "কাঠবেড়ালি? আহা কি মিষ্টি? আর কি মিষ্টি নাম, সাহিত্যিক না হলে এমন নাম দিতে পারেন? আমার নিজের কাঠ-বেড়ালি পুষবার শখ। তা চিড়িকদাস কেমন আছে?"

"গতবারে পুনায় গিয়ে জানলাম চিড়িকদাস বিবাগী হয়ে সংসার ত্যাগ করেছে। কানাঘুষোয় শুনলাম বিবাহঘটিত ব্যাপারে অভিভাবকদের সঙ্গে গুরুতর মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল।"

চিঁড়ে বৌদি টেলিফোন ধরে হাসিতে ফেটে পড়লেন। "যা বলেছেন। আজকাল কারও বিয়ের ব্যাপারে মাথা গলাতে নেই। কিন্তু আমি তো এখানে দিব্যি ঘটকালি করে যাচ্ছি। আমার নিজের কোনো স্বার্থ নেই, শুধু দেখি আমার দেশের ছেলেগুলো যেন মেম-সাহেবের হাতে না পড়ে। শংকরবাবু, এ-বছরে আমি চারটের বিয়ে পাকা করেছি। গত মাসে বিয়ে দিলাম হন্‌সকুমার খান্না আর সুমতি মেহতার। আমি যতদূর পারি দেশাচার মেনে ঘটকালি করি। এ ক্ষেত্রে পাত্রী গুজরাতী আর পাত্র পাঞ্জাবী! পাত্র বেজায় হ্যাংলা—বিয়ের জন্য আমাকে পাগল করে মারছিল। পাত্রীর ইচ্ছে নেই তা নয়। কিন্তু একেবারে ভেজিটারিয়ান। মাছ মাংস খাওয়া স্বামীর গায়ে নাকি দুর্গন্ধ বেরুবে। তা সুমতিকে পাবার জন্যে খান্না নিরামিষাশী হয়ে গেল। সেই খবর সুমতির কানে যেতে বেচারা মত দিল। বিয়ে হয়ে গেলো! কিন্তু শংকরবাবু এই জন্যেই বলে ইন্ডিয়ান ওয়াইফ। এখন

সুমতি নিজেই স্বামীকে ডিম সেদ্ধ এবং চিকেন খাওয়াচ্ছে। কেমেস্ট্রির ছাত্রী তো, ভয় হচ্ছে এতদিন হাইপ্রোটিন খাবার খেয়ে হঠাৎ বন্ধ করে দিলে শরীরের মেটাবলিজিম যদি পাল্টে যায়?"

চিঁড়ে বৌদির কথা শুনে আমি হেসে ফেলি।

"হাসবেন না শংকরবাবু, হাতের নোয়া এবং সিঁথির সিঁন্দুর অক্ষয় রাখবার জন্যে আমাদের দেশের মেয়েরা পারে না এমন কোনো কাজ নেই। সেই জন্যেই তো আমি প্রত্যেকটি ইন্ডিয়ান ছেলেকে বলি, ওই ভুলটি কারো না। মুড়ি মিছরি স্কার্ট শাড়ি একদর কোরো না!"

আমি হেসে বলি, "আমার শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক মুজতবা আলী সাহেব কথাটা শুনলে খুশী হতেন।"

চিঁড়ে বৌদি বললেন, যাক, কাজের কথাটা শেষ করি। আপনাকে আলাদা পাওয়া তো অসম্ভব ব্যাপার প্রায়। তপন গাঙ্গুলীকে কেমন লাগছে?"

"চমৎকার ছেলে ; যেমন দেখতে, তেমন ব্যবহার, তেমনি রসবোধ", আমি অন্তর থেকেই উত্তর দিই।

"ওই বাঁদরামিটুকু ছাড়া সত্যি সবই ভাল," চিঁড়ে বৌদি উত্তর দেন।

"পেটো-প্রীতির কথা বলছেন? আহা পেটোর উপর আমার এখন আর রাগ নেই। তাছাড়া, দেখুন বিদেশে একজন ইন্ডিয়ান যদি আর একজন ইণ্ডিয়ানকে না দেখে, আর তপন পাইকপাড়া থেকে—এখানে প্রদেশিকতার কথা উঠতেই পারে না।"

চিঁড়ে বৌদি বললেন, "আমার স্বামী তো তপন গাঙ্গুলির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ওঁদের হেড, ডাক্তার এলিজাবেথ শিপেনের চোখের মণি নাকি ওই তপনকুমার। কোথায় এক কনফারেন্সে ভদ্রমহিলা পেপার দিয়েছেন, তার সঙ্গে তপনেরও নাম জুড়ে দিয়েছেন। জানেন তো, এটা কত বড়ো সম্মান। এঁরা খুব নাচানাচি করছেন। কিন্তু আমার মোটেই ভাল লাগে না। হাজার হোক আইবুড়ো মেমসাহেব। এখনকার ফ্যাশন বুড়োদের কচি মেয়ে বিয়ে করা। কিছু-কিছু বুড়ীও তাই প্রতিশোধ নিতে আরম্ভ করেছে!"

"সেইটাই তো স্বাভাবিক, আমি উত্তর দিই।"

"যাক, আমি ওসব কিছু শুনতে চাই না। সময় করে আমাদের এখানে একটু পায়ের ধুলো দিয়ে যাবেন। বিশেষ দরকার আছে। আর আপনি তপনের ঘরে তো ঢুকেছেন। বিছানার কাছে কোনো মেমসাহেবের ছবি দেখেছেন নাকি খুব সুন্দর দেখতে, কম বয়সী মেয়ে রেড হেড।"

"রেড হেড জিনিসটা কী?"

"উঃ শংকরবাবু, একরকমের চুল। এখানকার প্রত্যেকটি মেয়ের

মুখস্থ—ব্লণ্ডদের মাথায় এক লক্ষ তিরিশ হাজারের বেশী চুল থাকে, ব্রুনেটদের চুলের সংখ্যা এক লক্ষ দশ হাজারের ওপর হয়, আর রেড হেডদের সাধারণত নব্বই হাজার।"

বললাম, "তপনবাবুর শোবার ঘরে মাথার কাছে এক প্রৌঢ়া মহিলার ছবি রয়েছে, ডাঃ শিপেনের ছবি।"

চিঁড়ে বৌদি টেলিফোন নামিয়ে দিলেন। আমিও কুড়েমি কাটিয়ে, দাড়ি কামিয়ে, স্নান সেরে তৈরি হয়ে নিলাম।

একটু পরেই তপন ফিরে এলো। সঙ্গে সুচরিতাও আছে। শুনলাম সুচরিতা ব্রেকফাস্টে আসতে চাইছিল না। মামার কথা ভেবে শেষ পর্যন্ত তপনের অনুরোধ রেখেছে।

আমাদের দুজনকে চটপট টেবিলে বসিয়ে দিয়ে তপন সুগৃহিণীর মতো খাবারদাবার জড়ো করে ফেললো। খুকুকে কিছুই করতে দিলো না। খুকু বললো, "বেশ, আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকছি। কিছু ভুল হলে কিন্তু সমালোচনা করবো। আমার মামা যে কিরকম দুর্মুখ তা তো জানেন না।"

ফলের রস ঢালতে-ঢালতে তপন বললো, "এ দেশে কোন্ ছেলে না ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে জানে? সংসারের কাজকর্ম একটু না জানলে আজ-কাল বিবাহ-বিচ্ছেদ হতে পারে। আমেরিকানদের অধঃপতনের ইতিহাস সম্পর্কে যেদিন অনুসন্ধান হবে, মার্কিন মেয়েদের হেঁসেল বিমুখতা সম্পর্কে সেদিন অনেক কথা লিখতে হবে!"

কথাগুলো আমার ভাল লাগলো না। ছোকড়া কি তাহলে আমেরিকান কোনো সম্পর্ক গড়ে তুলছে? চিঁড়ে বৌদি ইণ্ডিয়ান ছেলেদের মন ভোলাবার সময় প্রায় এদিকটার ওপর জোর দেন। "সত্যি কথা বলছি ভাই, তোমরা আমেরিকান বউ বিয়ে করলেও রাখতে পারবে না। আমাদের দেশের সব ছেলেই এক একটি নবাববাহাদুর। যারা জীবনে এক গেলাস জল গড়িয়ে খায় না, হেঁসেলের ভেতরে যারা কখনও ঢোকে না, মেমসায়েব বে করলে তাদের কপালে অনন্ত দুর্গতি। একবার যদি বিয়ে ভাঙে, কোনো ইণ্ডিয়ান মেয়ে তোমাদের বিয়ে করবে না, এটা বলে রাখছি।"

ব্রেকফাস্টের পর তপনের সঙ্গে নার্সিং হোমে হাজির হলাম। ইনভ্যালিড চেয়ারে তিন-চারজন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ভোরবেলায় রৌদ্রে উপভোগ করেছেন। এঁদের মধ্যে দুজন এতই শীর্ণ যে চেয়ারের সঙ্গে মিশে যাচ্ছেন। তপন বললো, "এঁদের বয়স নব্বই। দুজনে হরিহর আত্মা ছিলেন। একই ইস্কুলে পড়েছেন, একই জায়গায় বাড়ি করেছিলেন, একই সঙ্গে বেড়াতে বেরোতেন। এখানেও এসেছিলেন এক সঙ্গে। এখন ঝগড়া হয়ে গিয়েছে। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলেন

না। দুজনেই আমাদের কাছে দুজনের নামে অভিযোগ করেন। দুজনেই ভয় দেখান, হোম ছেড়ে চলে যাবেন।"

এবার আমরা একটা ছোট হলঘরে ঢুকে পড়লাম। ফিজিওথেরাপি বিভাগটি যেন ছোটখাট একটি কারখানা। একজন ভদ্রলোক কাঠের থাম ধরে আস্তে আস্তে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন কিন্তু ব্যর্থ হয়ে পড়ে যাচ্ছেন। ভদ্রলোক আবার কম্পিত দেহে অতিসন্তর্পণে নিজের পায়ে দাঁড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। তপন ওঁর কাছে গিয়ে সুপ্রভাত জানালো। জিজ্ঞেস করলে, "ক'বার চেষ্টা করলেন?"

ভদ্রলোক বললেন, "দশ বার হলো ডাক্তার।"

"তাহলে আজকের মত বিশ্রাম নিন।"

"আমি আরও কয়েকবার চেষ্টা করতে পারি কি? আমি যথেষ্ট উৎসাহিত বোধ করছি। তোমার কি মনে হয়, আমি হাঁটতে পারবো?"

তপন ওঁকে আশ্বাস দেয়, "আমরা তাই তো আশা করি, বড়দিনের সময় আপনি পায়ে হেঁটে আমাদের পার্টিতে আসতে পারবেন।" ভদ্রলোকের ম্লান মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, খুঁটি ধরে আবার দাঁড়াবার চেষ্টা আরম্ভ করলেন।

তপন আমাকে বললো, "ঈশ্বরের কি খেয়াল! এই ভদ্রলোক যৌবনে চ্যাম্পিয়ান দৌড়বীর ছিলেন, অলিম্পিক থেকে দৌড়ের মেডেল এনেছেন।"

আর এক ভদ্রলোক চেয়ারে বসে-বসে চোখ বুঁজে চরকার মতো চাকা ঘুরিয়ে চলেছেন। কোনোদিকে তাঁর খেয়াল নেই—তপন বললো, 'ইনি একসময় সেনেটের প্রখ্যাত সদস্য ছিলেন, এখন একেবারে নিঃসঙ্গ! তার ওপর কানে শুনতে পান না।"

আমাদের দেখেই সেনেটর পকেট থেকে নোটবুক বার করে ফেললেন। তাতে কি একটা লিখে তপনের হাতে দিলেন। "সুপ্রভাত। ডাক্তার আজ বেশ সুস্থ বোধ করছি।"

ডাক্তার লিখলো, "ক্রমশঃ আরও সুস্থ বোধ করবেন। জীবনে কত কি দেখবার রয়েছে আপনার।"

সেনেটর লেখা পড়ে হাসলেন। আবার একটু লিখে খাতাটা আমার হাতে দিলেন। "মানুষকে শাস্তি দেবার জন্যে ঈশ্বর বার্ধক্যের সৃষ্টি করেছিলেন। এই হলটা নরকের কামারশালার মতন দেখাচ্ছে না কি?"

ওঁর লেখাটা পড়ে মন খারাপ হয়ে গেলো। আমি ওঁর খাতায় লিখলাম, "একদিন আমরা সবাই বৃদ্ধ হবো।"

সেনেটর আমার লেখাটা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়লেন। ওঁর মুখে অবিশ্বাসের ছাপ ফুটে উঠলো। তিনি লিখলেন, "সব যুবকই সৌজন্যের খাতিরে ওই কথা বলে, কিন্তু কেউ বিশ্বাস করে না সে বুড়ো হবে।" সেনেটর আর আমাদের দিকে

তাকালেন না, নিজের মনে চাকা ঘোরাতে লাগলেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে তপন বললো, "বৃদ্ধদের না দেখলে জীবনের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ হয় না। এঁরা সবাই জরার সঙ্গে যুদ্ধ করছেন এবং ক্রমশঃ পিছিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু বাঁচবার আগ্রহ প্রবল। সুচরিতা একটা কবিতা বলে, আমার খুব ভাল লাগে—I do not Pity the dead I Pity the dying...Dying is the best of all the arts that men learn in a dead place."

অন্য একটা ঘরে ঢোকা গেলো। কালো চশমা পরে দুই কুব্জ বৃদ্ধ আপন মনে কথা বলে চলেছেন। প্রথম বৃদ্ধ : "ছেলে কালকেও ফোন করেছিল। অনেকক্ষণ কথা হলো। সামনের রবিবার আসতে চাচ্ছিল। আমি বললাম, তুমি এলে আমি বিরক্ত হবো। একটা মাত্র ছুটির দিন, তুমি নিজে আনন্দ করো, শুধু আমার জন্যে কষ্ট করো না।"

দ্বিতীয় বৃদ্ধ : "আমার ছেলেও কালকে ফোন করেছিল। বৌমা নিজেও সব খবরাখবর নিলেন। আমাকেও ওরা একদিন বাড়িতে নিয়ে যেতে চায়। আমি বললাম, এখন নয়। বড়দিনের সময় চেষ্টা করবো। তাতে ছেলে খুব রাগ করলো।"

"রেগে যাবারই তো কথা," প্রথম বৃদ্ধ সায় দিলেন। তপন ও আমি পা টিপে বেরিয়ে এলাম। তপন বললো, "এঁরা দুজনেই প্রায় অন্ধ। এঁদের ছেলেরা কেউ খোঁজ খবর নেয় না। মিসেস টমলিন ছেলেদের কাছে ফোনে প্রায়ই অনুরোধ করেন। এঁরা কিন্তু দুজনেই দুজনের কাছে অভিনয় করে যাচ্ছেন। বুড়ো বয়সে আত্মসম্মান বোধ তীব্র হয়ে ওঠে।"

তপন এবার ঘড়ির দিকে তাকালো। কিছুক্ষণের জন্যে তাকে মেডিক্যাল সেন্টারে যেতে হবে। ডঃ শিপেনের মিটিং আছে—সুগ্রীবকে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখা হবে—অপারেশনে কোনো লাভ হয়েছে কিনা আজ বোঝা যাবে।

ওকে হাসপাতালে রওনা করে দিয়ে আমি গোল্ডেন হোমে ফিরছি। পথে খুকুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। "তোমার খোঁজেই যাচ্ছিলাম। মিস্টার রাইটের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। উনি আমার সঙ্গে একটু বেরোতে চান। ভাবলাম তোমাকে নিয়ে যাওয়া যাক।"

"মিস্টার রাইটের আপত্তি নেই তো?" আমি জানতে চাই।

"মোটেই না," খুকু আমাকে আশ্বাস দিলো।

হাতে একটা ম্যাপ নিয়ে মিস্টার রাইট হোমের দরজার কাছেই অপেক্ষা করছিলেন। ওঁকে নিয়ে আমরা খুকুর গাড়িতে এসে বসলাম।

খুকুর গাড়ি ছেড়ে দিলো। মিস্টার রাইট বললেন, "আমার মৃত্যুর জন্যে আমি চিন্তা করি না—কারণ মৃত্যুটা ইনসিওর করা আছে।"

"মানে আপনার মৃত্যুর পর আপনার আত্মীয়স্বজন টাকা পাবেন?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"না না, মৃত্যুসংক্রান্ত খরচের কথা বলছি। এদেশে অনেক লোকের মরবার মতো আর্থিক সামর্থ্য থাকে না। মৃত্যুর খরচটা এখানে খুবই বেশী," মিস্টার রাইট জানালেন।

আমি অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। মিস্টার রাইট বললেন, "আমি আপনার সঙ্গে রসিকতা করছি না। মৃত্যুর পর এদেশে কেউ মৃতদেহ নিজের বাড়িতে রাখে না। মৃত্যুর কথা ভেবে তো এখনকার বসতবাড়ি তৈরি হয় না—তাই জীবিত লোকের সংসারে মৃতদেহ অচল। মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে ফিউনারাল হোমের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এদেশে বেশ একটি ভাল ব্যবসা। এঁদের আলাদা বাড়ি আছে—মরা মানুষদের জন্যে বিশেষভাবে তৈরি। খবর পেলেই এঁরা মৃতদেহ সরিয়ে নিয়ে যাবেন। আত্মীয়স্বজনদের খবর দেবেন তাঁরা ; কাগজে পরের দিনই যাতে মৃত্যুসংবাদের বিজ্ঞাপন বেরোয় তার ব্যবস্থা করবেন। কোথায় ফুল পাঠাতে হবে তাও তাঁরা জানিয়ে দেন সবাইকে। মৃতদেহের 'এমবার্মিং-এর ব্যবস্থা করেন তাঁরা। এমবার্মিং কাজটি নিতান্ত সোজা নয়—শরীর থেকে ইঞ্জেকশনের ছুঁচ দিয়ে রক্ত বার করে নিতে হয় এবং তার বদলে শিরায় কিছু ওষুধ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে মৃতদেহ অনেকক্ষণ তাজা থাকে। সৎকার কোম্পানি কফিনের ব্যবস্থা করেন—তারপর পার্টির সামর্থ্য অনুযায়ী শোকযাত্রার ব্যবস্থা হয়।"

খুকু বললো, "কবর খোঁড়া, পুরোহিতের বাইবেল পাঠ, সব কিছুর জন্যেই টাকা লাগে। এমনকি কবরের জায়গাও আগাম কিনতে হয়।"

মিস্টার রাইট বললেন, "মৃত্যু ক্রমশই ব্যয়সাধ্য হয়ে উঠছে। তাই অনেকে বীমা নিচ্ছেন। মাস মাস প্রিমিয়ামের বদলে বীমা কোম্পানি মৃত্যু সংক্রান্ত খরচ বহন করবেন। আমাকে একটু বেশী প্রিমিয়াম দিতে হয়, কারণ আমি স্পেশ্যাল কফিন পছন্দ করেছি। ভিতরে ফোম রবারের গদি ও সিল্কের নরম চাদর থাকবে—কফিনটি দেখতেও খুব সুন্দর।"

আমাদের গাড়ি এবার গোরস্থানের কাছে এসে থামলো। দূরে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। মিস্টার রাইট বললেন, "ভদ্রলোক আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছেন। উনি এ অঞ্চলের নামকরা সেলসম্যান, কবরের জমির দালালি করেন।"

প্রায় সাত ফুট লম্বা দানবের মতো চেহারা ভদ্রলোকের। নাম কাজিমির। ওঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ হলো। মিস্টার রাইট বললেন, মিস্টার কাজিমির কিছুদিন ধরে আমাকে কবরের জমি কেনবার মতলব দিচ্ছেন।"

কাজিমির ঘোঁত ঘোঁত করে উঠলেন। ভাল ভাল পোজিশন সব বিক্রি হয়ে

যাচ্ছে, মিস্টার রাইট। আপনি শেষে একটা মনোমত জায়গা না পেলে আমার দুঃখের শেষ থাকবে না।"

নক্সা খুলে দুটো জায়গার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন মিস্টার কাজিমির। ধীরভাবে চারদিকে তাকিয়ে বেচারা মিস্টার রাইট বললেন, "১১৮ নম্বর প্লটটা আমার ভাল লাগছে।"

গভীর দুঃখ প্রকাশ করে কাজিমির জানালেন, ওই জমিটা স্থানীয় ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মিস্টার হুবার্ট অনেক আগেই কিনে ফেলেছেন। তাছাড়া ওটা ডবল-প্লট, ওঁর স্ত্রীকেও পাশে কবর দেবার জায়গা হয়েছে!

১১১ নম্বর প্লটও বেশ ভাল জায়গা, কাজিমির জানালেন এটাও পাওয়া যেত না, মিস্টার বিল বল কিনে রেখেছিলেন তাঁর স্ত্রীর জন্যে। কিন্তু হঠাৎ বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ায় ১১০ নম্বর নিজের জন্যে রেখে, মিস্টার বল ১১১ নম্বর ছেড়ে দিচ্ছেন। জায়গাটা খুঁটিয়ে দেখলেন মিস্টার রাইট। খুকুকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কেমন মনে হয়?"

"খারাপ কি?" খুকু উত্তর দেয়।

"চমৎকার জায়গা" কাজিমির চিৎকার করে ওঠেন। "তবে আপনাকে সত্যি কথা বলছি, ন্যাড়া জায়গা, রোদটা বড্ড বেশী লাগবে। যদি একশ ডলার বেশী দিতে রাজী থাকেন, তাহলে গাছের ছায়ায় একটা চমৎকার প্লট দেখাতে পারি। শান্ত, শীতল পরিবেশ, বসন্তকালে গাছে প্রচুর ফুল হয়, ফুলগুলো জমির ওপর এসে পড়বে।

নতুন জমিটাও দেখলেন মিস্টার রাইট। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, "মিঃ কাজিমির, রোদ আমার মোটেই সহ্য হয় না, আমি গাছের তলার জমিটাই নেবো।"

"চমৎকার। আপনি উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাছাড়া পড়ছি ভাল পাবেন—মিস্টার ডিকিনসন ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন। মিস্টার বল, আপনি তো জানেন, কসাইখানার ম্যানেজার। বাই-দি-বাই মিস্টার ডিকিনসনের সমাধি প্রস্তরও আমরা তৈরি করছি। চমৎকার হয়েছে, চোখ জুড়িয়ে যায়। আমরা সমাধি আগাম অর্ডার পাচ্ছি অনেক। আপনি যদি অনুমতি করেন, আপনাকে একদিন ক্যাটালগ দেখিয়ে আসবো। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আপনি শতায়ু হোন, কিন্তু জানেনই তো পৃথিবীতে সবই অনিশ্চিত, কখনও কি ঘটে কেউ বলতে পারে না। দূরদর্শী লোকেরা তাই সব ব্যবস্থাই আগে থেকে করে রাখেন, যাতে মরবার পরও কারুর উপরে না নির্ভর করতে হয়।"

কাজিমির আরও বললেন, "আপনার বুদ্ধির তারিফ করছি। মিস্টার রাইট। আপনি দেখবেন, দু-তিন বছরের মধ্যে এই প্লটের দাম চড়চড় করে উঠে যাবে।"

"আপনাদের দেশে গোরস্থানের জমির দাম কী রকম পড়ে? মিস্টার রাইট প্রশ্ন করলেন।

বললাম, "আমরা হিন্দুরা দেহ পুড়িয়ে ফেলি।"

কাজিমির ঘোঁত ঘোঁত করে উঠলেন, "আহা বেচারা! ভালই করেন আপনারা। যা গরীব দেশ আপনাদের, জমি কিনে কবর দেবার সামর্থ্য কোথায়?"

খুকু প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল। আমি ওকে বাধা দিলাম। যার যা খুশী বলুক না!

গাড়িতে উঠে মিস্টার রাইট বললেন, "জমিটা বেশ মনের মতো পাওয়া গিয়েছে, কী বলো?"

"ভারী সুন্দর জায়গা," আমি বললাম।

মিস্টার রাইট বললেন—"আমার বাবা যখন মারা যান, তখন টাকা-কড়ি ছিল না। ফলে তাঁকে মিউনিসিপ্যালিটির খরচে কবরস্থ করা হয়। এর থেকে দুঃখের কিছু হয় না। মিউনিসিপ্যাল ফিউনারালের কথা ভাবলেই এখানকার মানুষ আঁতকে ওঠে।"

॥ ৫ ॥

তিনটে দিন কোথা দিয়ে কেটে গেলো। তপন ও সুচরিতার চেষ্টায় এবং গোল্ডেন হোমের মানুষদের অনুগ্রহে জীবনের একটা নতুন দিক আমার সামনে খুলে গেলো। তপন ছেলেটিকে আমার বেশ ভাল লাগে। ওর একটা সাবালক মন আছে, যা সব কিছু বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে। আর আমাদের খুকুও এই সামান্য ক'বছরে কেমন মধুর ব্যক্তিত্বশালিনী হয়ে উঠেছে।

এখন বাড়িতে কেউ নেই। পেটো একবার জল খাইয়ে গিয়েছে। ডাইরী লিখতে বসে বিচিত্র এক অনুভূতিতে মন ভরে উঠেছিল। গোরস্থানে মিস্টার রাইটের মুখটা কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। পৃথিবীর সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালী দেশে এসে আমি এক নতুন দিগন্ত আবিষ্কার করছি! এ-দেশে আমার আসা ঈশ্বরের অভিপ্রেত ছিল নিশ্চয়। বিদেশের আয়নায় প্রতিফলিত আমার দুঃখিনী জন্মভূমি পরম প্রিয় হয়ে উঠেছেন। আমি প্রতি মুহূর্তে আরও ভারতীয় হয়ে উঠছি।

সমালোচকের ঔদ্ধত্য নিয়ে এই নবীন ঐশ্বর্যশালী সভ্যতার সামনে আমি এসে দাঁড়াইনি। তীর্থযাত্রীর মতো নতমস্তকে শিখতে এবং শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি। আর এসেছি মানুষকে আবিষ্কার করতে মানবতার এই নতুন তীর্থে। মানুষের কত রূপ, দেশে দেশে মানুষের মধ্যে কত পার্থক্য। আবার মানুষ কত এক। মানুষকে প্রণাম জানাই, আর কৃতজ্ঞতা জানাই ঈশ্বরকে মানুষকে দেখার এই আশ্চর্য

সুযোগ দেবার জন্যে। মানুষকে ভালবেসেই যেন ধন্য হতে পারি।

টেলিফোনের বাজনায় সংবিৎ ফিরে এলো। চিঁড়ে বৌদির গলা। "কী শংকরবাবু, কোনো খবর নেই। তপন কোথায়?"

"এখনও ফেরেনি। সুচরিতাও নিজের কাজে বেরিয়েছে।" আমি জবাব দিই।

"আজ না আপনার যাবার দিন?" চিঁড়ে বৌদি প্রশ্ন করেন।

"আজ্ঞে আপনার ঠিকই মনে আছে।"

"দেখুন এদের কাণ্ডকারখানা। আপনার থেকে কাজ বড়ো হলো। আরে বাপু, কাজ-পাগলা দেশে এসেছো, কাজ তো সবসময়ে থাকবে। তা বলে মামা একলা বসে থাকবে।" চিঁড়ে বৌদি বললেন, তিনি কিছুই শুনতে চান না, এখনই ওঁর বাড়িতে যেতে হবে।"

"ওরা এসে খুঁজবে।"

"খুঁজবে না, পেটোর হাতে চিঠি দিয়ে আসুন। পেটো যদিও একবার আমার চিঠি খেয়ে ফেলেছিল।"

চিঁড়ে বৌদির হুকুম অমান্য করা গেলো না। জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে পেটোর হাতে চিঠি দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

চিঁড়ে বৌদি আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। ডঃ রতন গোস্বামী লাঞ্চ সেরে ল্যাবরেটরিতে ফিরে গিয়েছেন। আজ সবাই কাজে ব্যস্ত।

"ব্যস্ততার মাথামুণ্ড জানি না—এখানে সবাই ব্যস্তভাব দেখায়।"

"ব্যস্ত না থাকলে চাকরি থাকবে না।" চিঁড়ে বৌদি অভিযোগ করলেন।

চিঁড়ে বৌদি জিজ্ঞেস করলেন, "একলা কী করছিলেন?"

"ভাবছিলাম—এই বিচিত্র দেশের বিচিত্র মানুষের কথা। সামান্য কয়েকদিন যা দেখলাম তাই স্মরণীয় হয়ে থাকেবে।"

চিঁড়ে বৌদি সন্তুষ্ট হলেন। আপনি তো দেখছি অফিসের কথা ভাবছেন। এই সব ভাবাই তো আপনার কাজকর্ম।"

"আরও কিছু ভাববার আছে। তাজুদি যে জন্য আমাকে মেয়ের কাছে পাঠালেন তার কিছুই হলো না। মেয়ের যা ব্যক্তিত্ব হয়েছে তাতে তো আর সেই ছোট্ট ভাগ্নীটির মতো ব্যবহার করতে পারি না। অথচ তাজুদি তিনদিন উপোস করে থেকে অমন জাগ্রত তারকেশ্বরের কবচ পাঠিয়ে দিলেন। শুনেছি হাতে হাতে ফল পাওয়া যায় ওই কবচে।"

চিঁড়ে বৌদি প্রচণ্ড উৎসাহে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, "আপনার সঙ্গে আমার যে অনেক কথা আছে। কত ফন্দি রয়েছে। তপন ছেলেটিকে আপনার কেমন লাগলো? আমার তো মনে হয় হীরের টুকরো। বিলেতে এফ-আর-সি-এস পড়বার সময় নার্সদের সঙ্গে কী করেছে জানি না, কিন্তু এখানে কোনো

মেয়ের দিকে তাকায় না। কিন্তু ওই বুড়ী ডাক্তার শিপেন সম্বন্ধে আমার ভয় আছে। কিন্তু এও বলে রাখছি, আমি এখানে থাকতে ওসব হতে দিচ্ছি না।"

"আপনি ওর মনের খবর নিয়েছেন?" আমি জানতে চাই।

"নিইনি আবার! আমি কি আর নিজের কাজ করে যাচ্ছি না? খাইয়ে খাইয়ে পেটের কথা বার করে ফেলি। আপনিই না লিখেছেন, খাওয়ার টেবিলে এবং শোয়ার বিছানায় পুরুষ-মানুষের ওয়াটার্লু রচিত হয়।"

আমি চুপচাপ থাকি।

চিঁড়ে বৌদি বললেন, "ছোকরা বড্ড চাপা—কিছুতেই স্বীকার করবে না। আমার জেরার চোটে সুচরিতা সম্পর্কে মনোভাবটা শেষপর্যন্ত বেরিয়ে পড়লো!"

"প্রেম নাকি?" আমি জিজ্ঞাসা করি।

"ওই মেয়ে-ছাড়া বিয়ে করবো না ভাব! তা সুচরিতাকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে গেলাম, বেচারার মুখ লাল হয়ে উঠলো। বললো, আগামীকাল মামা আসছেন, এখন অন্য কিছু ভাববার সময় নেই। মামা এই সব জানলে, ভাববে বিদেশে লেখাপড়া ছেড়ে ওই সবই করছি।"

"তপনের মনের অবস্থাটা খুকু জানে?" আমি প্রশ্ন করি।

"ওটা গোপন আছে, তপনের দিব্যি রয়েছে আমার ওপর। সারা জীবন ফাস্ট হয়ে-হয়ে অভ্যাস খারাপ করে ফেলেছে, কোনো পরীক্ষায় ফেল হতে চায় না।"

"খুকুর মনের অবস্থাও জানা দরকার। এয়ারপোর্টে একটা দশাসই ইয়াংকি বয় ফ্রেণ্ডকে নিয়ে এসেছিল। তাজুদি আমাদের একটু সেকেলে ধরনের অমন ছেলেকে মেয়ে হার্ট দিয়েছে শুনলে ওঁর নিজের হার্ট ফেল হয়ে যাবে।"

চিঁড়ে বৌদি বললেন, "আপনি কি ধরনের মামা? বিদেশে দু'দিনের জন্যে এসে ভাগ্নীর মঙ্গলের কথা ভাবছেন না, শুধু নিজের গল্পের প্লট যোগাড় করে বেড়াচ্ছেন? ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তো এয়ারপোর্টে চলে যাবেন। একটা কিছু ব্যবস্থা করুন।

চিঁড়ে বৌদি সত্যি করিৎকর্মা। সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন মাধ্যমে ষড়যন্ত্র শুরু করে দিলেন। বললেন, "এই ঠিক হলো, আপনি সুচরিতার গাড়িতে এয়ারপোর্টে যাবেন। সেই গাড়িতে কেউ থাকবে না। আমি তপনের ঘাড়ে চাপছি। অফিসিয়াল কারণ, আমার গাড়ি খারাপ করে গিয়েছে।"

আমি বললাম, "আমার একটু দুশ্চিন্তা থেকে যাচ্ছে। তপনের হৃদয়ে To Let বোর্ড এখনও ঝুলছে তো? ডঃ শিপেনের যেসব কথা বললেন।"

চিঁড়ে বৌদি বললেন, "গাড়িতে আমি কাজ সেরে রাখবো।"

খুকুর গাড়ি দ্রুতবেগে এয়ারপোর্টের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পিছনে পড়ে

রইলো গোল্ডেন হোম এবং তার অধিবাসীরা। খুকুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিক্যাল সেন্টার শেষবারের মতো দেখে নিলাম। মনটা খারাপ লাগছে। এই ক'দিনেই এখানকার সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলাম। এঁরা আমার মানসচক্ষু খুলে দিয়েছেন—এতদিন শুধু নীতিকথায় পড়েছি, এই প্রথম বুঝতে পারলাম, পয়সা থাকলেই জীবনে সব থাকলো না।

খুকুর এখন বাড়ির কথা মনে পড়ছে। ঘরের লোককে দেখলে ঘরে ফেরার আকর্ষণ বেড়ে যায়। খুকু বললো, "মার ব্লাড প্রেসারটা নিয়মিত চেক করতে বোলো। দাদার ছেলে পল্টুর জন্যে যে বেবি ড্রেসটা দিলাম তা গায়ে হলো কিনা জানিও।"

আমরা প্রায় এয়ারপোর্টে এসে পড়েছি। এবার কথা না তুললে নয়। বললাম, "সবই হলো, কিন্তু তোর সম্বন্ধে তাজুদিকে কি বলবো?"

"দেখেই তো গেলে। বলবে বেশ ভালই আছি। কপাল ভাল থাকলে কয়েক মাসের মধ্যেই ডক্টরেট পাবো।"

"কিন্তু তুই তো জানিস ছেলেদের চাকরি এবং মেয়েদের স্বামী-না হওয়া পর্যন্ত মায়েরা নিশ্চিন্ত হতে পারেন না।"

"মামা তুমি জ্বালিয়ো না।"

"জ্বালাবো কী? তাজুদির তো আর কোনো দুঃখ নেই। শুধু বলে, ওই মেয়েই আমার গলায় কাঁটা হয়ে আটকে রয়েছে। তা কাঁটা তোলার ব্যবস্থা করতে হবে তো।"

খুকু মিটমিট করে হাসতে লাগলো। আমি এবার বলেই ফেললাম, "তপন ছেলেটিকে তোর কেমন লাগে?"

খুকুর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। ও-যেন আমার কথা শুনতেই পায়নি ; একমনে ড্রাইভ করে যাচ্ছে।

"হ্যাঁরে, কিছু বল", আমি তাগাদা দিই।

খুকু এবার মুখ খুললো। "নিশ্চয় চিঁড়ে বৌদির কর্ম—তোমাকে লাগিয়েছে।"

"চিঁড়ে বৌদি কেন? এই ক'দিন তো তপনকে দুবেলা দেখলাম।"

"তোমার কেমন লাগলো ভদ্রলোককে? খুকু এবার বাঁ হাতে কপালের চুলগুলো সরিয়ে জিজ্ঞেস করলে।

"বুঝতেই পারছিস, আমার ভাল না লাগলে কথাটাই তুলতাম না", আমি উত্তর দিই। "ছেলেটার মধ্যে বেশ গাম্ভীর্য আছে, অথচ সহজ-সরল।"

"হ্যাঁ, অন্তত হ্যাংলামো নেই—ক্যামপাসে ছেলে তো কম দেখলাম না।", খুকু গম্ভীরভাবে বললো, যদিও ওর কান দুটো এখনও লাল হয়ে রয়েছে।

"তাছাড়া দু'জনেই একই সাধনায় ব্যস্ত হয়েছিস", আমি বলি।

খুকু ইচ্ছে করেই বোধহয় উত্তর দিলো না। কিন্তু ওর মনের কথা বুঝে নিতে আমার মোটেই অসুবিধা হলো না।

একটু পরেই চিঁড়ে বৌদি এয়ারপোর্টে হাজির হলেন। প্লেন ছাড়তে বেশী দেরী নেই। চিঁড়ে বৌদি হাঁপাতে হাঁপাতে আসছেন, তপনকে পিছনে ফেলে রেখে।

আমার হাত ধরে বললেন, "হুঁ হুঁ বাবা, সব জেনে নিয়েছি। হৃদয়ে শুধু সুচরিতা আর সুচরিতা! তবে সুচরিতা রাজী না হলে, মনের দুঃখে যদি ডাঃ শিপেনকে বিয়ে করে আমি তাহলে দোষ দেবো না।"

পাত্রীপক্ষেরও খবরও দিলাম আমি। চিঁড়ে বৌদি এবার দ্বিগুণ উৎসাহে পাত্র-পাত্রীকে আমার সামনে টেনে হাজির করলেন এবং বীরবিক্রমে ঘোষণা করলেন—"তা হলে, কলকাতায় ফিরে আপনি বাবা-মায়ের মতামত নিয়ে আমাকে জানাচ্ছেন।"

"মতামতের দরকার নেই—সুচরিতার মা আমাকে ব্ল্যাংক চেক দিয়েছেন। এই দেখুন কাল যে চিঠি এসেছে। পাল্টি ঘরের পছন্দসই পাত্র পেলে ফাইন্যাল সিদ্ধান্ত পাওয়ার-অফ-অ্যাটর্নি আমার রয়েছে।"

চিঁড়ে বৌদি এবার তপনকে বকুনি লাগালেন, "হাঁ করে দেখছো কি? শংকর মামাকে প্রণাম করো।"

তপনের মধ্যে লজ্জা লজ্জা ভাব এসেছে। সে মাথা নিচু করে আমার পায়ে হাত দিলো। তারপর সুচরিতা। আমি ওদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলাম।

এদিকে এরোপ্লেনে ঢোকবার জন্য মাইকে ঘোষণা হলো।

"আপনি এগোন। খুকুর থীসিস তৈরি হয়ে গেলেই, তিন-চার মাসের মধ্যে দুজনকে দেশে পাঠাচ্ছি। কিন্তু ঘটকী বিদায়ের কথাটা ভুলে যাবেন না।" চিঁড়ে বৌদি এয়ারপোর্টে হুংকার ছাড়লেন।

এরোপ্লেনের জানালা দিয়ে দেখলাম, সুচরিতা আর তপনকে দুধারে নিয়ে চিঁড়ে বৌদি আমাদের প্লেনের দিকে তাকিয়ে আছেন। ওরা সবাই হাত নাড়তে আরম্ভ করলো।

আমেরিকা প্রবাসের স্মরণীয় এক অধ্যায়কে চিরদিনের মতো পিছনে ফেলে রেখে আমাদের বোয়িং প্লেন রানওয়ে ধরে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে ছুটতে আরম্ভ করলো।

জাপানে কয়েকদিন

এই পরিচ্ছেদের নাম হওয়া উচিত ছিল : "জাপানে"—অথবা "পূর্ব পাকিস্থানের জালাল আমেদের সঙ্গে কয়েকদিন।" কিন্তু স্থান সংক্ষেপের জন্যে "জাপানে" এবং "কয়েকদিন" রেখে জালাল আমেদকে পরিত্যাগ করতে হলো।

জালালের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন বিকাশ বিশ্বাস। আর বিকাশের খবর দিয়েছিলেন "দেশ" পত্রিকার শ্রীসাগরময় ঘোষ। সাগরদা বলেছিলেন, "ইংলণ্ড হয়ে যখন আমেরিকায় ভ্রমণে যাচ্ছো তখন ফেরার পথে জাপানে কয়েকটা দিন কাটাতে ভুলো না।"

ভ্রমণের ব্যাপারে আমি যে খুবই কুঁড়ে সাগরদা তা জানতেন। আমার মুখের ভাব দেখে তাঁর বুঝতে দেরি হয়নি যে প্রস্তাবটা আমাকে খুব উৎসাহিত করছে না। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নিখুঁত হবার প্রচেষ্টায় প্যাডের কাগজ টেনে নিয়ে সাগরদা খসখস করে একটা ঠিকানা লিখে দিয়ে বলেছিলেন, "এইটা কাছে রাখো, যদি জাপান যাওয়ার মন করো তাহলে বিকাশ তোমার কাজে লাগবে।"

সাগরদা বললেন, "বিকাশের লেখা নিশ্চয় পড়ে থাকো—আমাদের টোকিও প্রতিনিধি, টোকিওর চিঠি লিখে থাকে।"

ওটা তাহলে আসল নাম! বিকাশ এবং বিশ্বাস-এর মিল দেখে আমার ধারণা ছিল এটাও কোনো ছদ্মনাম।

মার্কিন দেশে কয়েকদিন কাটিয়েই অজানা অচেনা দেশ যত্রতত্র ভ্রমণের স্বাদ পেয়ে গিয়েছিলাম। খাঁচার পাখী উড়তে শিখে গেলো। একজন রসিক মার্কিনী বললেন, "জানোই তো, আমাদের বলা হয় 'এ নেশন অন হুইলস'—সমস্ত জাতটাই মোটরগাড়ির চাকার ওপর রয়েছে। দুষ্টু লোকরা বলে—গাড়িতেই আমার জন্ম এবং গাড়িতেই মৃত্যু। চিন্তাশীলরা বলেন—চরৈবেতির দেশ। শুধু চলো, চলো। থেমে যাওয়াটাই মৃত্যুর লক্ষণ।"

এই ভবঘুরে ভাবটা ছোঁয়াচে ব্যাধি। মার্কিন মেজাজে আমিও তাই একখানা এয়ার-লেটার ফর্মে বিকাশবাবুকে চিঠি লিখে দিলাম টোকিওর কোনো গেরস্ত হোটেলে অথবা কোনো সাবেকী জাপানী সরাইখানায় আমার জন্যে একটা ঘরের ব্যবস্থা করতে।

কয়েকদিনের মধ্যেই উত্তর এসে গেলো। বিকাশবাবু আমার মোটেই অপরিচিত নন—আমাদের এক কমন বন্ধু কাশুন্দিয়া নিবাসী; এই ভেজালের যুগে ধর্মতলা স্ট্রীটের যে-দোকান থেকে ওষুধ কিনে আমি প্রাণরক্ষা করে থাকি তার পরিচালকও বিকাশের বন্ধু; এবং তার মেশোমশায় একদা আমার সহকর্মী ছিলেন। বিকাশ আশ্বাস দিয়েছেন, "জাপান নিয়ে কোনো চিন্তা করবেন না। শুধু প্লেনের

তারিখ ও ফ্লাইট নম্বরটা দিয়ে দেবেন। এখন মন দিয়ে মার্কিন দেশ দর্শন করুন।”

খুকুর ওখান থেকে বেরিয়ে ওহামা, ওহিও, সানফ্রানসিসকো, সিয়াটল ভ্রমণ করে হাওয়াইতে হাজির হয়েছিলাম। এসব জায়গায় কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন হলো যা এই অধ্যায়ে বলতে আরম্ভ করে বইয়ের আকার বাড়াতে চাই না।

হাওয়াই থেকে যথাসময়ে বিকাশবাবুর কাছে খবর পাঠিয়েছিলাম—সোমবার দুপুরবেলায় প্যান আমেরিকান-এ টোকিও রওনা হচ্ছি।

প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে উদিত সূর্যের দেশে পৌঁছতে আজকালকার বোয়িং ৭০৭ জেট বিমানের মাত্র কয়েক ঘণ্টা লাগে। সেই কয়েক ঘণ্টা বই পড়ে কাটিয়ে দিয়ে টোকিও বিমান বন্দরে অবতরণ করা গেলো। স্বাস্থ্য, পাসপোর্ট ও কাস্টমস-এর বেড়াজাল পেরিয়ে বাইরে আসতেই দেখলাম অদূরে একজন বাদামী রঙের যুবক অপেক্ষা করছেন। তিনি যে বিকাশ বিশ্বাস হবেন সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না।

ট্যাক্সিতে মালপত্র তুলে বিকাশ বললেন, “বেশ চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম আপনাকে নিয়ে!”

বললাম, “সে কি! জানেন তো প্যান আমেরিকান নিজেদের পৃথিবীর সবচেয়ে অভিজ্ঞ বিমান কোম্পানি বলে দাবি করেন! আর আমাদের বোয়িং ৭০৭ দেরি তো দূরের কথা কয়েক মিনিট আগেই ভূমিস্পর্শ করেছে।

বিকাশ বললেন, “দোষটা প্যান আমেরিকানের নয়, আমার ভূগোল জ্ঞানের! আপনি লিখেছেন সোমবারের দুপুরবেলার প্লেনে চড়েছেন! তাই যথারীতি সোমবারে বিকেলে আমি এয়ারপোর্ট হাজির—মাত্র কয়েক ঘণ্টার ফ্লাইট! প্লেন এলো, যাত্রীরা নামলেন, কিন্তু কোথাও কোনো বঙ্গনন্দনকে দেখতে পেলাম না। বেশ চিন্তায় পড়ে গেলাম। শেষে ভাবলাম একবার ওদের কাউন্টারে খোঁজ করে যাই। ওখানেই ভুল ভাঙলো। ওঁরা বললেন—আন্তর্জাতিক তারিখ-রেখার ব্যাপারটা তুমি খেয়াল রাখছো না। পশ্চিম দিক থেকে যেমনি তারিখ-রেখা অতিক্রম করবে অমনি একটা দিন বাড়িয়ে নিতে হবে। সোমবারে তোমার বন্ধু যাত্রা শুরু করলেও আমাদের এখানে হাজির হবেন মঙ্গলবারের বিকেলে!”

হাসতে হাসতে বিকাশ বললেন, “ভূগোলের কারচুপি। ইস্কুলে ব্যাপারটা পড়েছিলাম বটে, কিন্তু খেয়াল থাকে না। তারপর জুল ভার্নের সেই বিখ্যাত বই-এর সিনেমা—এরাউণ্ড দা ওয়ার্লড ইন এইটি ডেজ। সেখানেও ওই একদিনের গোলমালে নাটকের মধুর পরিসমাপ্তি।”

বললাম, “ব্যাপারটা মোটেই সুবিধের নয়। কোনো লোক ২৬শে নভেম্বর জাপান ত্যাগ করে যদি ২৫শে নভেম্বর হওয়াই পৌঁছয় সেটা খুবই চিন্তার কারণ। তবে এক্ষেত্রে আপনি এয়ারপোর্টে না এলেও বিশেষ গোলমাল বাধতো না, কারণ

বিকাশ বিশ্বাসের ঠিকানাটা আমার জানা আছে। ঠিকানাটা যদিও খুব সহজ সরল নয়, তবুও মুখস্থ বলে গেলাম "৪৭, ২-চোমে নিহনবাসি, কাবুতে-চো, চু-কু, টোকিও।"

বিকাশ এবার নিবেদন করলেন, "দাদা, আমাকে 'তুমি' বলুন।"

বললাম, "তথাস্তু!"

বিকাশ বললো, "এই ঠিকানা জিনিসটা টোকিও শহরের অন্যতম রহস্য। যে লোক ঠিকানা দেখে বলতে পারে বাড়িটা কোথায় সে জাপানী রহস্যের অর্ধেক জেনে গেছে।"

বললাম, "ব্রাদার, একটু খুলে বলো। এখানে কয়েকদিন থাকতে হবে—শেষে বাড়ি হারিয়ে ফেললে কেলেংকারি।"

এবার বিভিন্ন প্রশ্ন নিক্ষেপ করে যা জানা গেলো তার সরল অর্থ রাস্তার নাম জানলেই টোকিওতে বাড়ি খুঁজে পাওয়া যায় না। ৬৬ নম্বর রাসবিহারী অ্যাভিন্যু মানে রাসবিহারী অ্যাভিন্যুতে গিয়ে ৬৬ নম্বর বাড়ি খুঁজে বার করলাম, অত সহজ নয়। টোকিওর একই রাস্তায় হয়তো তিনটে বাড়ির একই নম্বর এবং ৬৩ নম্বর খুঁজে পেলে যে ৬৬ নম্বর আর বেশীদূর হতে পারে না, এমন ভরসাও নেই। কারণ ৬৩ নম্বরের পরেই হয়তো ২১। এই নম্বর নির্ভর করে কোন্ সময়ে বাড়িটা তৈরি হয়েছে তার ওপর—অর্থাৎ নম্বর থেকে খানিকটা বাড়ির বয়সের আন্দাজ মিলতে পারে। সোজা কথায়, টোকিওতে গৃহ অনুসন্ধান করতে হলে প্রথমে যে জিনিসটির দিকে নজর দিতে হবে সেটি হলো "চো"। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। টোকিওর নাম-করা হোটেল নিকাৎসু হোটেল।—ঠিকানা—

১, ১-চোমে,
ইউরাকু-চো
চিওদা-কু
টোকিও

কু মানে, এই হোটেল চিওদা ওয়ার্ডে অবস্থিত। তারপর "চো" সন্ধান করুন। "চো" পাবারপর কত নম্বর চোমে বা ব্লক এবং অবশেষে বাড়ির নম্বর। এত সন্ধানের পরও দেখবেন একই চোমেতে দু'খানা বাড়িরই একই নম্বর। আরও একটু অসুবিধে আছে। বেশির ভাগ বাড়িতেই বাইরে কোনো নম্বর লেখা নেই। কিছুকাল ধরে টোকিওতে মার্কিন পদ্ধতিতে রাস্তার ও বাড়ির নম্বর দেবার চেষ্টা চলছে। এই প্রচেষ্টার পিছনে সমগ্র বিশ্ববাসীর শুভেচ্ছা ও সমর্থন রইলো।

অত্যন্ত গোঁড়া ও স্বদেশবৎসল জাপানী একজন ভদ্রলোক আমাকে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, "এইখানে মার্কিন পন্থা অনুসরণ করতে আমাদের আপত্তি নেই।"

এই ভদ্রলোককে বললাম, "তাহলে একটা গল্প শুনুন। আমাদের দেশে তখন প্রবল স্বদেশী আন্দোলন চলছে। বিলাতী দ্রব্য বর্জন এবং দেশী দ্রব্যের সমাদর করো, এই হচ্ছে চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ নেতাদের আহ্বান। একজন প্রবল ভক্ত বিলিতি কাপড় ছেড়ে মোটা কাপড় পরেছেন, অন্য সব দিকে স্বদেশী হওয়ার জন্যে এই একদা শৌখিন ভদ্রলোকের সুকঠিন সংকল্প। কিন্তু মদের ব্যাপারে কী হবে? একদিন সি আর দাশের সমানে হাজির তিনি, মুখে দেশী চোলাই মদের ভয়াবহ দুর্গন্ধ। সামলাতে না পেরে একটু পরে ভদ্রলোক বমি করে ফেললেন। এবং পরম বেদনার সঙ্গে বললেন, দাশ সায়েব, এই জিনিসটা আর দেশী করবেন না।

বিকাশ বিশ্বাস ও তাঁর সহকর্মী দিলীপ সেনগুপ্ত কোনো কথাই শোনেনি, আমাকে সোজা শিবুরায় জিন তাং বিল্ডিং-এর কাছে তাদের বাড়িতে এনে হাজির করেছিল। বিকাশের দুঃখ—আমি কয়েকদিন পরে এলাম না কেন, তাহলে তার সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীর রান্না খাওয়াতে পারতো। শ্রীমতী তখন পাসপোর্ট হাতে জাপানী ভিসার জন্যে কলকাতায় মেসোমশাইয়ের বাড়িতে অপেক্ষা করছে।

বিয়ে করবার জন্যে কিছুদিন আগে বিকাশ কলকাতায় গিয়েছিল। বললাম, "তাহলে জামাই-আদর বেশীদিন ভোগ করবার চান্স পেলে না?"

বিকাশ মুখটিপে হাসছিল, কিন্তু দিলীপ বললো "বিকাশ শুধু বৌকেই দেখেছে; এখনও শ্বশুর শাশুড়ির মুখোমুখি হয়নি।"

"হাউ মাউ খাঁউ। রোমান্সের গন্ধ পাঁউ! ব্যাপারটা কী? বিকাশ ব্যাপারটা খুলে বলো।" আমি আবেদন জানাই।

বিকাশ তখন মিট মিট করে হাসছে। রসিকতা করে বললাম, "তোমাকে দেখে তো খুবই গোবেচারা মনে হয়। তুমিও কি শ্বশুরশাশুড়ীর বিনা অনুমতিতে সুভদ্রা-হরণ করলে? তোমার শক্তির প্রশংসা করতে হয়, কারণ কোথায় টোকিও আর কোথায় টালিগঞ্জ। ইন্টার কন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল যখন শান্তিপূর্ণ কাজে লাগানো হবে তখনই আমরা এই ধরনের সংবাদ আশা করতে পারি।"

বিকাশ এবার মুখ খুললো। "না দাদা, আমার বিয়েটা একেবারেই গেরস্ত ব্যাপার। তবে আমার স্ত্রীর মা ও বাবা পূর্ব-পাকিস্তানে থাকেন, মেয়ের বিয়েতে তাঁদের পশ্চিম বাংলায় আসবার কোনো উপায় ছিল না। ওঁরা ওখান থেকে দু'একটা চিঠি লিখেছেন—হয়তো কোনোদিনই মেয়ে জামাইকে দেখতে পাবেন না। চোখ দিয়ে জল এসে যায়।"

আমরা সবাই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলাম। স্পুটনিক ও এক্সপ্লোরার যুগে মানুষ চাঁদে যেতে পারবে ; অথচ ঢাকার মানুষ কলকাতায় আসতে পারবে না, কলকাতার লোক ঢাকায় যেতে পারবে না। কিন্তু আমরা দুই দেশই অতি উদার

এবং আন্তর্জাতিক! আমাদের এই সিন্ধু-গঙ্গার অববাহিকা মানব-সভ্যতার লীলাক্ষেত্র।

বিকাশ বুঝলো হঠাৎ এইভাবে মুষড়ে পড়া আমাদের উচিত হচ্ছে না। সে বললো, "সুদুর বিদেশে বসে আমি কত অভিজ্ঞতা অর্জন করছি—দেশের মানুষ আপনি কত দেখেছেন, ফিরে গিয়ে আবার দেখবেন। এখন তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিন, আমাদের বেরুতে হবে।"

আরও এক ঘণ্টা পরে আমরা টোকিওর রাস্তায়। রাতের টোকিও এবং দিনের টোকিওর মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। সমস্ত শহরটা যেন কোনো বড়ো ঘরের দুলালী—বিয়ে বাড়ির উৎসবে যাবার জন্যে আলোর জড়োয়া গহনায় সেজেছে।

দিলীপ বললো, "পৃথিবীর বৃহত্তম শহর। এক কোটির ওপর লোক থাকে টোকিওর কেন্দ্র থেকে ১০০ কিলোমিটার বৃত্ত টানলে যে অংশ হয় সেখানে দু'কোটি সত্তর লক্ষ মানুষ থাকে। এখন সমস্ত দুনিয়ার বড়ো বড়ো দেশের বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীদের এই শহরের নাম শুনলেই দুশ্চিন্তায় সারিডন ট্যাবলেট খেতে হয়। রেডিও টেলিভিশন টেপ-রেকর্ডার বলুন, মোটর জাহাজ ঘড়ি বলুন, সব ব্যাপারেই জাপানের জয় জয়কার। বড়ো বড়ো দেশ যারা বহুদিন 'কোয়ালিটির' নাম করে দুনিয়ার ওপর ডাণ্ডাবাজি করেছে আর তিন গুণ দামে মাল বেচেছে, তারা এখন জাপানী প্রতিযোগিতায় নিজের ঘর সামলাতে পারছে না।"

বিকাশ বললো, "চালিয়ে যাও দিলীপ।"

দিলীপ বললো, "কল্পনা করুন—জাপানী ক্যামেরা হাতে জার্মান যুবক পার্কের গাছের তলায় জাপানী ঘড়ি-পরা সুইস বান্ধবীর ছবি তুলছে। অদূরে মেড-ইন-জাপান মোটরগাড়ির স্টিয়ারিং-এ একটি হাত রেখে অন্য হাতে ইংরেজ প্রেমিকাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেছে মার্কিন তরুণ। ভাবী বধূটির মৃদু সঙ্গীত জাপানী টেপ-রেকর্ডারে চিরকালের জন্য সংগৃহীত হচ্ছে। প্রিয়তমের শার্টও জাপানী।"

বিকাশ বললো, "আরও গভীরে প্রবেশ কোরো না দিলীপ, তাহলে অনেকগুলো একান্ত ব্যক্তিগত এবং অস্বস্তিকর জিনিসের নাম করতে হবে যাতে জাপানী কোম্পানীদের বিশ্বজোড়া খ্যাতি।"

বললাম, "আমেরিকা ও ইয়োরোপের বাজারে জাপানী জিনিসের কি প্রতিপত্তি তা তো নিজের চোখেই দেখে এলাম। হাওয়াইতে পলিনেশিও অধিবাসীদের শিল্পকর্ম বলে যে সব কিউরিও বিক্রি হচ্ছে তার বেশির ভাগই মেড-ইন জাপান ছাপ। একটা কার্টুন দেখলাম : আমেরিকায় তৈরি জিনিস কিনুন, প্রচার বিভাগের কর্মী তাঁর কর্তাকে বলছেন, 'বায় আমেরিকান' এনামেল

সাইনগুলো খুব সস্তায় খুব সুন্দর ভাবে তৈরি করিয়ে এনেছি জাপান থেকে।"

দিলীপ বললো, "বিশ্বের দরবারে এশিয়ার মান-সম্মান একমাত্র জাপানই রক্ষা করেছে—আমরা তো লেকচার দেওয়া ছাড়া কিছুই করলাম না।"

"আমরা কোথায় যাচ্ছি?" প্রশ্ন করি আমি।

"উচ্ছন্নে।" বিকাশ হাসতে হাসতে উত্তর দিল। তারপর বললো, "আপাততঃ এক বন্ধুর হোস্টেলে। সেখানে অনেক ভারতীয় থাকেন। বন্ধু পরীক্ষায় পাশ করেছেন—তাই আমাদের সঙ্গে আপনারও নেমন্তন্ন। আর ওইখানেই আসবে জালাল আমেদ। জালাল আমেদ রোজ আমাকে জিজ্ঞেস করে আপনি কবে আসছেন।"

ছাত্রাবাসটিতে বিকাশের বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো। এখানে ট্রেনিং-এ এসেছিলেন, কাজকর্ম শেষ, এবার দেশে ফেরার পালা। যাবার আগে কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেছেন। একজন জাপানী যুবক এলেন—হাতে রঙিন কাগজে মোড়া উপহারের প্যাকেট। বিকাশ বললো, "এইটাই জাপানী রীতি। নেমন্তন্ন করলে ওরা কখনো খালি হাতে আসবে না। আর এখানে যা-ই কিনুন এমন সুন্দর মোড়ক বেঁধে দেবে যে দেখলেই লোভ লাগবে। এখানে কমলালেবু পর্যন্ত বিক্রি হয় নাইলনের তৈরি জালের ব্যাগে। ফেলতে মায়া হয়, ভাবি ইণ্ডিয়াতে বৌ ভ্যানিটি ব্যাগ হিসেবে ব্যবহার করতে পারতো।"

বিকাশ শুভসন্ধ্যা জানিয়ে যুবককে বললো, "মাকুদাসন কোনবানওয়া।" এই 'সন' আমাদের 'বাবু' এবং 'দেবীর' মতো। স্ত্রী-পুরুষ সবাইকে সম্মান দিতে গেলে নামের পর 'সন' লাগাতে হয়। সানফ্রানসিসকোতে উলওয়ার্থের দোকানে একখানা জাপানী কথাবার্তার পকেট-বই কিনেছিলাম। সেইটা কাজে লাগিয়ে বললাম, "দো-জো ইয়োরোশিকু।" অর্থাৎ আপনার সঙ্গে সাক্ষাতে প্রীতি হলাম।

মাকুদাসন আমাকে তাক লাগিয়ে দিয়ে খাঁটি বাংলায় বললেন "আপনি ভাল আছেন তো?"

দিলীপ বললো, "মাকুদা আমাদের বিশেষ বন্ধু। আমরা ওকে একটু আধটু বাংলা শিখিয়ে নিচ্ছি, না হলে আড্ডা মারার অসুবিধে হয়। অতি চমৎকার ছেলে।"

মাকুদার মুখে হাসি লেগেই আছে। অতি অমায়িক ভালো মানুষ। কোনো সদাগরী অফিসে সামান্য কাজ করে। কিন্তু অত্যন্তবন্ধুবৎসল। বন্ধুদের বিপদে-আপদে খুব দেখে। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "এই উপহার আনাটা কী আপনাদের সাবেকী রীতি?"

মাকুদা হেসে বিকাশকে বললেন, "তোমার বাড়িওয়ালার ব্যাপারটা মিস্টার শংকরকে বলোনি?"

বিকাশ বললো, "জাপানীদের মতো এমন কনসিডারেট জাত কোথাও পাবেন না। ওরা কিরকম বিবেচক শুনুন। আমাদের বাড়িওয়ালী বড়ো রাস্তার সামনের দিকটায় থাকেন। একটা সরু রাস্তা দিয়ে আমাদের বাড়ির দিকে আসতে হয় দেখেছেন। ক'দিন আগে ভদ্রমহিলা বিরাট এক ফলের ব্যাগ নিয়ে দেখা করতে এলেন। ব্যাপার কী? না, উনি বাড়িটা সারাবেন, তাই দিন-পনেরো রাস্তাটা ইঁট-কাঠে নোংরা হয়ে থাকবে, আমাদের অসুবিধে হবে। আর তারই ক্ষতিপূরণ হিসেবে উপহারের ঝুড়ি—অন্ততঃ পঞ্চাশ টাকার ফল আছে।"

"কলকাতা বোম্বাই বা দিল্লীর কোনো বাড়িওয়ালার এমন সৌজন্যেবোধ আপনারা নাটক-নবেলে পর্যন্ত দেখাতে সাহস করবেন না, যদি না বাড়িওয়ালার মেয়ে ইতিমধ্যে ভাড়াটে বিলেত-ফেরত ছেলের প্রেমে পড়ে গিয়ে থাকে।

মাকুদাসন আমাকে তাঁদের গ্রামে নিমন্ত্রণ জানালেন। মৌখিক নিমন্ত্রণ নয়—ইতিমধ্যে তিনি বাবা-মাকে চিঠি লিখে দিয়েছেন, এক ভারতীয় অতিথি এক দিনের জন্যে ওখানে যেতে পারেন। শুধু একটা অসুবিধে, বাবা-মা কেউ ইংরেজী জানেন না।

বিকাশ আবার মাকুদাকে নিয়ে পড়লো। "মাকুদা, তাহলেতোমার বাবাকে ছেলের বিয়ের ব্যাপারে লিখি?"

মাকুদা সরসভাবে উত্তর দিলেন, "সেটাই তোমাদের, অবশ্যই লেখো"

দিলীপ বললো, 'কী করলে মাকুদা, এতদিন এই টোকিও শহরে থেকে একটা মনের মতো মেয়ে নির্বাচন করতে পারলে না?"

আমাদের এই কথাবার্তার মধ্যে আনন্দের হৈ-চৈ উঠলো—"মঞ্জুলিকা এসেছে, মঞ্জুলিকা এসেছে।"

মঞ্জুলিকা এসেই আমার সঙ্গে কথা বললো। "বড্ড দেরি হয়ে গেলো, যা ভিড় গাড়িতে। আমি কলকাতার মেয়ে, ইনি আমার স্বামী মিস্টার হানাড়ে। আর এই হলেন আমার ননদ, মিস হানাড়ে।"

ভারি সহজ সরল আমোদ উচ্ছল টিপিক্যাল বাঙালী মেয়ে এই মঞ্জুলিকা। তেমনি মিষ্টি ননদটি, কোনো অফিসে কাজ করে। আর মিস্টার হানাড়ে তো অজাতশত্রু আশুতোষ। ভদ্রলোক এমন মিষ্টি হাসেন এমন ভাবে মুখের দিকে তাকান, এমন স্নেহশীল আচরণ করেন যে অপরিচিত বলে মনেই হয় না, যেন কতদিনের আলাপ। মঞ্জুলিকার ভারতীয় বন্ধুরা বলেন, "সত্যি তোমার শিবপুজো সার্থক হয়েছে। মঞ্জু।"

স্থানীয় বাঙালী ছেলেছোকরাদের লোক্যাল গার্জেন মঞ্জুলিকাদি। বিপদে-আপদে উপদেশ, আশ্বাস ও বকুনি দিয়ে মঞ্জুলিকা সবাইকে খাড়া করে রেখেছেন। তার বাপের বাড়ি এবং শ্বশুর বাড়ির দুই দেশের রান্নায় বেশ হাত

পাকিয়েছেন তিনি।

‘ইন্দো-জাপান সম্পর্কের চলমান মনুমেন্ট বলতে পারেন এই মঞ্জুলিকা এবং তার স্বামীকে। ফিসফিস করে বললেন এক ভদ্রলোক।

আর এদের বিয়ের ব্যাপার, সেও এক গল্প। সে গল্প ‘দেশ’ না ‘আনন্দবাজার’ কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলায় না গিয়েও এক বাঙালী বন্ধুর মাধ্যমে জাপানী যুবক হানাড়ে বাঙালীভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তারপর আনন্দবাজারে পাত্র-পাত্রী বিভাগে সেই ক্লাসিক বিজ্ঞাপন : “আমি একজন জাপানী যুবক—একটি বাঙালী মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।”

বক্স নম্বরের এই বিজ্ঞাপনই মঞ্জুলিকার জীবনে নতুন অর্থ এনে দিয়েছিল। তারপর যেমন বাঙালী ঘরের বিবাহ-সম্বন্ধ হয়। অবশেষে শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ। অতএব মহাশয় উক্ত দিবসে সবান্ধব মদীয় ভবনে আগমনপূর্বক শুভকার্য সম্পন্ন করাইয়া ও নব-দম্পতিকে আশীর্বাদ করিয়া বাধিত করিবেন। ইত্যাদি। বালীগঞ্জের বাঙালী মেয়ে জাপানী গৃহের বধূ হলেন অবলীলাক্রমে। মঞ্জুলিকা এখন তো স্বামীকে ব্যবসায়ে সাহায্য করে, ঘর-সংসার মাথায় করে রেখে ননদ ও দেওরদের প্রীতি উৎপাদন করে শ্বশুর-শাশুড়ীর হৃদয় জয় করে দোর্দণ্ডপ্রতাপে সে হানাড়েসনের হৃদয় সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা। তবে শাড়ী ত্যাগ করে কিমনো বা স্কার্ট ধরতে পারেননি মঞ্জুলিকা—আর পারেনি বাংলায় আড্ডা মারার লোভ ছাড়তে। টোকিওতে যে সামান্য কয়েকজন বাঙালী মহিলা আছেন (যেমন শ্রীমতী জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায়) মঞ্জুলিকার সঙ্গে ফোনে কথা না বললে তাঁদের চলে না।

মঞ্জুলিকার স্বাস্থ্য সম্প্রতি ভাল যাচ্ছে না বিকাশের কাছে শুনলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে রাজী হলো বিকাশের বাড়িতে এসে একদিন রান্নার দায়িত্ব নিতে। সেদিন ওরা কিছু বন্ধুকে নিমন্ত্রণ জানাতে চায়।

এবার আসরে যাঁর আবির্ভাব হলো তিনিই যে পূর্ব-পাকিস্তানের জালাল আমেদ তা আমাকে না বলে দিলেও বুঝতে পারতাম। খাঁটি বাংলার উজ্জ্বল শ্যাম রঙ জালালের। বয়স বোধহয় তিরিশ-এর বিপজ্জনক রেখা স্পর্শ করতে চলেছে। বড়ো বড়ো দুটি চোখ সেই পদ্মের ইঙ্গিত যা বাঙালীকে বিচিত্র বৈশিষ্ট্য দিয়েছে।

নমস্কার করবার আগেই জালাল আমেদ দুটো বাংলা খবরের কাগজ এগিয়ে দিলেন। “এই নিন আনন্দবাজার পত্রিকা—বহুদিন নিশ্চয় দেখেননি। কলকাতার সব খবর পেয়ে যাবেন। আর এইটে আমাদের ঢাকার দৈনিক ‘সংবাদ’।”

দেশের কাগজের উপর বুভুক্ষুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়লাম—বিদেশে মাঝে মাঝে স্টেটসম্যান ওভারসিজ উইকলি ছাড়া আর কিছুই হাতে আসেনি।

গোগ্রাসে আনন্দবাজারের আটটা পাতা শেষ করে জালালের মুখের দিকে তাকিয়ে লজ্জা বোধ করছিলাম। জালাল বোধহয় মনের কথা বুঝলেন। বললেন, "শংকরবাবু এতে বিব্রত হবার কিছু নেই—ঠিক মতো 'আনন্দবাজার' আর 'সংবাদ' না এলে আমার নিজেরও এই অবস্থা হয়। "আপনি আগ্রহী জানলে এক সপ্তাহের পুরনো কাগজ সংগ্রহ করে আনতাম।"

জালাল আমেদের কথার মধ্যে এমন অন্তরঙ্গতা আছে যে ওকে বহুদিনের পরিচিত প্রিয়জন বলে মনে হলো। অন্য সবাই তখন নিজেদের মধ্যে আলোচনায় মশগুল, সেই সুযোগে আমরা হল-ঘরের কোণে গিয়ে বসলাম। জালালকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। বললাম, "সারাদিন কাজ করে সোজা এসেছেন মনে হচ্ছে। শুধু শুধু কষ্ট করলেন।"

জালাল হাসলেন। "কাজ তো সারা বছরই থাকবে শংকরবাবু, কিন্তু আপনি তো টোকিওতে থাকবেন না। আপনার সঙ্গে এমনভাবে দেখা হওয়ার সুযোগ হবে তা তো কল্পনা করিনি।"

জালাল গম্ভীর হবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু ইমোশনাল বাঙালীটাকে কিছুতেই চাপা সম্ভব হচ্ছে না। এই ইমোশনটুকুই আমাদের মূলধন, আবার এই ইমোশনই জাত হিসেবে আমাদের দুর্গতির কারণ।

জালাল বললেন, "আপনার সব লেখা পড়বার সৌভাগ্য হয়নি। তবে এইটুকু জানি আপনার লেখায় প্রায়ই হাওড়ার কথা থাকে। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি গর্ব বোধ করি।"

"মানে?" একটু অবাক হয়েই জালাল আমাদের মুখের দিকে তাকাই।

হাওড়াতেই তো আমার জন্ম। এখনও আমার ভাই-বোন ইণ্ডিয়াতে আছে—ইণ্ডিয়ান নাগরিক। আমরা চলে এসেছিলাম সেই ছোটোবেলায়—তারপরও পাসপোর্ট পকেটে করে, ভিসার ছাপ নিয়ে জন্মভূমি-দর্শন করেছি।"

আমি জালালের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় পূর্ব-পাকিস্তানের তরুণদের সঙ্গে আলাপ করে আমি মুগ্ধ হয়েছি। মকবুল আমেদ, জিয়া হায়দার, বেনেডিক্ট্ গোমেজ—এদের কথা কোনোদিন ভুলতে পারবো না।

জাপানে এসেও আবার ভাগ্যের দেবতা কৃপা করলেন। জালাল আমেদের মতো যুবকের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেলো। জালাল বললেন, "শংকরবাবু, কলকাতা সম্বন্ধে যদি কোনো খবর জানতে চান আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। আমি আনন্দবাজার খুঁটিয়ে পড়ি।"

বললাম, "এই দূর বিদেশে আমার দুঃখিনী কলকাতার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। দুনিয়ার লোক কলকাতাকে ভুল বুঝতে আরম্ভ করেছে। আর তাতে

সব থেকে আনন্দ পায় তারা যারা কলকাতার নুন খেয়েছে।”

আমি বললাম, “জাত হিসেবে বাঙালী যে অন্যের চেয়ে উপাদেয় তা আমি বিশ্বাস করি না, তবে অনেকের সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। আর এই পার্থক্য থেকেই অনেক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। কোনো দূর শতাব্দীতে আমাদের এই পূর্বপ্রান্তে প্রথম রেনেশাঁর সূর্যোদয় হয়েছিল এই কথা ভেবে ডগমগ হয়ে আর কতোদিন চালানো যাবে? আমরা তিলে-তিলে নিজেদের সর্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছি, কত রকম অন্যায় অসত্যের সঙ্গে আপস করছি, অথচ আমরা সে-সম্বন্ধে মোটেই অবহিত নই।”

জালাল বললেন, “আমার লেখাপড়া বিশেষ নেই। তবে কোথায় যেন পড়েছিলাম—বাঙালী একা একশো হতে পারে, কিন্তু একশোজন বাঙালী কখনও এক হতে পারে না। তাই শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান রাজনীতিতে আমরা প্রখ্যাত বাঙালীদের নাম গড় গড় করে বলে যেতে পারি, কিন্তু কোনো প্রতিষ্ঠানের নাম করতে পারি না যার মধ্যে আমাদের বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়েছে।”

আমি জালালের কথায় সায় দিই। বলি, “অথচ এটা একার খেলা দেখাবার যুগ নয়—এখানকার সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতির ফুটবলে টিমওয়ার্কের জয়-জয়কার।”

জালাল বললেন, “দেশকে এ-বিষয়ে অবহিত করার দায়িত্ব তো আপনাদের। দৈনন্দিন নীচতা সংকীর্ণতার উর্ধ্বে থেকে আপনারা মানুষকে পথ দেখান। এক এক সময় হয়তো আপনাদের মনে হবে লেখা দিয়ে এই কুম্ভকর্ণকে জাগানো যাবে না—কিন্তু অন্ধকার পৃথিবীতে ছোটো ছোটো পাখির কলতানই প্রভাতের বারতা বয়ে আনে। আপনারা জমি তৈরি করুন—দেখবেন মানুষের অভাব হবে না। বাঙালীদের যত দোষই থাকুক—কোনো ভাল জিনিস এখানে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে নষ্ট হয়ে যায় না।

জালালকে জিজ্ঞেস করলাম। “আপনার দেশের খবর বলুন।”

জালাল বললেন, “দেশ-বিভাগের খারাপ দিক যতই থাকুক এর একটা সুফল—পূর্ব বাংলার ব্যক্তিত্ব বিকশিত হচ্ছে। মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমান আজ অনেক সুখ ও শান্তির অধিকারী হয়েছে।”

বললাম, “এটা অবশ্যই বিশেষ আনন্দের সংবাদ। মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়ালে তবে সে অন্যকে বন্ধু হিসেবে নিতে পারবে, তবে সে অন্যের মঙ্গল মন-প্রাণ দিয়ে চাইবে।”

জালাল বললেন, “সবচেয়ে যেটা ভাল লাগছে, পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালীদের দৃষ্টি ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে যাচ্ছে। অনেকেই কল-কারখানার কথা ভাবছে। আমারই তো ইচ্ছে দেশে ফিরে গিয়ে একটা কারখানা করবো।

"যদি করেন আমরা আনন্দিত হবো। কলম-পেশা কেরানীর জাত আমরা—কিন্তু যেভাবে দিন পাল্টাচ্ছে, যেভাবে অটোমেশন আসছে ... কেরানী বলে কোনো পদার্থও আর থাকবে না।"

জালাল বললেন, "কাজের কথাটা প্রথমে সেরে নিই। সময় করে রেডিও জাপানের স্টুডিওতে যেতে হবে আপনাকে। আপনার সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকার আমরা বাংলা ভাষায় প্রচার করতে চাই।

"আপনার সঙ্গে রেডিও জাপানের সম্পর্ক?" আমি প্রশ্ন করি।

"আমি রেডিও জাপানের বাংলা প্রোগ্রামের ভারপ্রাপ্ত। তাছাড়া আমি পাকিস্তান অবজার্ভার পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধ। তবে এ ছাড়াও নিজের আদি কাজ আছে যার জন্যে একদিন পূর্ব-পাকিস্তান ছেড়ে জাপানে হাজির হয়েছিলাম। সে-সব গল্প সময়মতো আপনাকে বলবো একদিন।"

জালালের সঙ্গে তখন আমি যাকে বলে বেশ জমে গিয়েছি। অন্যান্য বন্ধুরা ক্ষমাসুন্দর চক্ষে এতক্ষণ আমাদের মার্জনা করেছিলেন, কিন্তু খাওয়ার সময় এসে গেলো। আমাদের আলোচনায় ইতি টানতে হলো সেদিন।

বিকাশবাবুর বাড়িতেই আবার জালালের সঙ্গে দেখা হলো। জালাল সেদিন সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন এক জাপানী ভদ্রমহিলাকে—মিসেস ইয় মাদা। বিবাহিতা মধ্যবয়সিনী এই মহিলা আমাদের দেশে না এসেও অপূর্ব বাংলা রপ্ত করেছেন। বঙ্কিম ও শরৎচন্দ্র থেকে গড় গড় করে কোটেশন দিলেন। আধুনিক বাংলা লেখার সঙ্গেও তিনি বেশ পরিচিতা।

আমাকে এক কোণে টেনে নিয়ে জালাল বললেন, "রেডিও জাপানে ইনি আমার সহকর্মী। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে অনন্ত আগ্রহ—আমার দুঃখ, আপনাদের মতো মানুষের সঙ্গে এঁদের আলাপের সুযোগ করে দিতে পারি না। বাংলা ভাষাকে নিজের জীবন দিয়ে ভালবাসি—কিন্তু আমার বাংলা বিদ্যে আর কতটুকু।"

আমি বললাম, "বাংলা ভাষার পক্ষে খুব প্রয়োজনীয় কাজ আপনি করছেন জালাল ভাই। দেশে বসে দু'চারখানা নাটক নবেল লেখা থেকে আপনার কাজটাকে ছোটো করে দেখবার কোনো যুক্তি নেই।"

"শংকরবাবু, অত স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারি না, তবে বাংলা যে আমার মায়ের ভাষা, এর প্রতি আমার যে ঋণ আছে তা প্রায়ই মনে পড়ে যায়। হায় রে, আপনাদের মতো বাংলা যদি আমার দখলে থাকতো তাহলে কি ভালোই না হতো।"

জালাল আমেদের মুখের দিকে আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম। তিনি যে

হৃদয়ের আবেগেই কথা বলে যাচ্ছেন তা বুঝতে আমার একটুও অসুবিধা হচ্ছিল না। জালাল এবার নিজের কথায় ফিরে এলেন। "রেডিও জাপান থেকে আপনার সাক্ষাৎকারের কথাটা ভুলবেন না যেন। হয় আমি না হয় আমাদের অফিসের কেউ এসে আপনাকে বিকাশবাবুর বাড়ি থেকে নিয়ে যাবে।"

তারিখটা ঠিক হয়েছিল আমার জাপান ছেড়ে হংকং-এ যাবার ঠিক আগের দিন। ইতিমধ্যে ঘরে ফিরে টোকিওর রূপ কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করেছি। আমার প্রিয়বন্ধু সুব্রতর মতে পদযাত্রাই কোনো দেশকে জানার একমাত্র উপায়। সুব্রত চার প্রকার পদযাত্রার প্রেসক্রিপশন দিয়ে থাকে,—প্রাতঃভ্রমণ, মধ্যাহ্ন-ভ্রমণ সান্ধ্য-ভ্রমণ এবং নিশীথ-ভ্রমণ। টোকিওতে সর্বপ্রকার ভ্রমণ কিছুটা করেছি। তা ছাড়া টোকিওতে জাপান ট্যুরিষ্ট বিভাগের আয়োজিত টোকিও দর্শনেও অংশ নিয়েছি। এবং সুযোগ বুঝে 'বুলেট' নামে বিখ্যাত পৃথিবীর দ্রুততম ট্রেনে চড়ে জাপানের সাংস্কৃতিক রাজধানী কিয়টো ঘুরে এসেছি।

সেদিন জাপান লজ্জাবতী বধূর মতো কুয়াশা ও মেঘের ঘোমটা টেনে নিজেকে আমার দৃষ্টির আড়ালে সরিয়ে রেখেছিল। এত ঘন কুয়াশা আমি জীবনে কখনও দেখিনি, এক ফুট দূরের জিনিসও দেখা যায় না—মনে হচ্ছিল মেঘের মধ্য দিয়ে দ্রুতগামী জেট বিমান ছুটে চলেছে।

বিকাশের মুখেই শুনেছিলাম, জাপানে বর্তমানে ইংরিজি ভাষার বড়োই কদর। লক্ষপতি হবার সবচেয়ে সহজ উপায়—"ইংরিজী শিখুন" নামে কোনো বই লেখা। আরও শুনেছিলাম, সন্ধেবেলায় বেচারাকে প্রায়ই বিব্রত হতে হয়। কোনো না কোনো স্বল্প-পরিচিত ইংরিজি শিক্ষাভিলাষী জাপানী ভদ্রলোক টেলিফোন করে বসবেন। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, নিজের ইংরিজীটা আর একটু সড়গড় করে নেওয়া। দিলীপ হাসতে হাসতে বলেছিল "ট্রেনে আপনার কোনো অসুবিধে হবে না, দেখবেন ইংরিজীতে কথা বলার সুযোগের জন্য কেউ না কেউ আপনার বন্ধু হয়ে যাবে।

কথাটা মিথ্যে নয়। বিদেশীদের সাহায্য করবার জন্যে জাপানীরা সব সময় উদ্‌গ্রীব। তার উপর কপাল গুণে আমার পাশে যাঁর সীট পড়ে ছিল তিনি ভারতবর্ষের ব্যবসায়িক দিকের কিছুটা খোঁজখবর রাখেন। ভদ্রলোক প্রথম দিকে একটু সাবধানে কথাবার্তা বলছিলেন। আমি তাঁকে বোঝালাম যে আমি ব্যবসা করি না, সরকারী কর্মচারীও নই—সাধারণ একজন লেখক হিসেবে নতুন দেশ দেখতে এবং নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে আমার নিজের দেশকে আবিষ্কার করতে বেরিয়েছি। ধরা যাক, ভদ্রলোকের নাম আকুচি।

আকুচি বললেন, "কিছু মনে করো না, তোমাদের দেশ সম্বন্ধে যা পড়ি এবং যা চোখে দেখি তাতে মিল খুঁজে পাই না। আমরা পড়ি বুদ্ধ, গান্ধী, টেগোরের

কথা, আর চোখে দেখি সরকারী এবং বেসরকারী ইন্ডিয়ানদের যারা মাল বেচতে অথবা কিনতে এখানে আসে। ভাবী ক্রেতাদের আদর আপ্যায়ন করাটা জাপানী ব্যবসায়ের রীতি—কিন্তু ইণ্ডিয়ার ক্ষেত্রে ভাবী বিক্রেতাকে খাওয়াতে হয়। কারণ তাদের পকেটে পয়সা থাকে না, অথচ...আকুচি এখানে হঠাৎ থেমে গেলেন।

বুঝলাম, ভদ্রলোক সঙ্কোচ বোধ করছেন, বললাম, "আমার দেশের মানুষদের সম্বন্ধে যা জানেন যদি বলেন আমার উপকার হয়। আমি কিন্তু আপনার নামধাম ফাঁক করে পার্লামেন্টে প্রশ্ন তোলাচ্ছি না।"

আকুচি বললেন, "যা বলতে চাইছিলাম, পকেটে পয়সা না থাকলেও এঁদের মনে নানা রকম ইচ্ছে থাকে। জাপানে আমরা যারা বিজনেস করি তারা ধরে নিই মানুষের মনে নানা ইচ্ছে থাকে—তার কিছুটা চরিতার্থ করতে পারলে একটু ভাল দাম পাওয়া যায়, বেশি অর্ডার আসে। আপনাদের দেশ সম্বন্ধে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা, তাতে মুখে এঁরা সাত্ত্বিক, চিঠিতে ততোধিক সাত্ত্বিক, কিন্তু মনের অপ্রকাশিত ইচ্ছে আন্দাজ করে নিয়ে সেই অনুযায়ী মনোরঞ্জন না করলে কাজ হাসিল হয় না।

আমি এবার বেশ কৌতূহলী হয়ে পড়েছি। ওঁকে আরও একটু আলোকপাত করতে অনুরোধ করলাম। উনি বললেন, "মনে রাখবেন কিন্তু সব ইণ্ডিয়ানই যে এমন তা বলছি না। অনেকেই খুব ঝানু ব্যবসাদার। অন্যদের আমি তিনভাগ করে থাকি। (ক) যাঁরা কাজ-কর্মের মধ্যেই জানিয়ে দেন স্ত্রীকে একছড়া জাপানী মুক্তোর মালা দিতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যে-কোনো মুক্তোই চলবে—তবে 'মিকিমটো'র দোকান থেকে নিলে চিন্তার কোনো কারণ থাকবে না। অথবা (খ) এখন তো কাজ। সন্ধ্যেবেলায় আমি নিঃসঙ্গ বোধ করি। জাপানী 'হোস্টেস'দের রহস্যটা কী? আচ্ছা 'গীসা'রা কি শুধু নাচ গানই করে? না, ওদের সম্বন্ধে যেসব খবর শোনা যায় তা সত্যি? অথবা (গ) যাঁরা মহিলাও চান আবার যাবার আগে স্ত্রীর জন্যে মুক্তোর মালা নিতেও ভোলেন না।"

সরকারী পর্যায়ে ব্যবসা সম্বন্ধে আকুচির দেখলাম বিষম ভীতি। সামান্য এক-আধ পয়সার জন্যে বছরের পর বছর ধস্তাধস্তি করতে আমাদের সরকার নাকি অদ্বিতীয়। আর সময়জ্ঞান। সামান্য বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতেও মাসের পর মাস কেটে যায়। বিশ্ব অলিম্পিকে স্লো সাইকেল রেস থাকলে আমরা নাকি অনায়াসে প্রথমে হবো।

আকুচি বললেন, "কিছু মনে করছেন না তো?"

"মনে করবো কেন? আমাদের সম্বন্ধে আপনারা কি ভাবছেন তা অবশ্যই জানা দরকার।"

আকুচি বললেন, "আমেরিকার কাছ থেকে আমরা একটা জিনিস

শিখেছি—প্রডাকটিভিটি! কতক্ষণ ধরে কত কাজ করছো তাতে কিছু আসে যায় না—মাথাপিছু কত উৎপাদন হলো তাই বলো।”

কিয়োটো ফেরার পথে এক ভারতীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। দুই দেশের সরকারী সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি খবরাখবর রাখেন। বললেন, “দেশের কাগজে দেখি, ভারতীয় দূতাবাসের কর্মীরা নাকি ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যকর ইমেজ বিদেশে তুলে ধরতে পারেন না। কিন্তু ভিক্ষের থলি নিয়ে যে দেশ সর্বক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছে তার সম্পর্কে ভালো ধারণা সৃষ্টি করা কোনো উকিলের পক্ষেই সম্ভব নয়। যেমন ধরুন—আগ্রা কুষ্ঠ চিকিৎসা কেন্দ্রের কথা। জাপানী-দানে ও বৈজ্ঞানিক সাহায্যে এই প্রতিষ্ঠানটি খুব ভালো কাজ করছে। জাপানের প্রত্যেকটি ইস্কুলের ছেলে নিজেদের টিফিনের খরচ বাঁচিয়ে কয়েক ইয়েন করে এই পরিকল্পনায় চাঁদা দিয়েছে। খুবই সাধু প্রচেষ্টা। কিন্তু ভাবুন তো এক জেনারেশন জাপানীদের মধ্যে ভারত সম্পর্কে কী ধারণা হয়ে গেল?”

আমাকে তো একটা জাপানী ছেলে জিজ্ঞেস করলো, “তোমার দেশের লোকরা কুষ্ঠব্যাধিতে কষ্ট পাচ্ছে?”

আমার ভারতীয় সহযাত্রী বললেন, “ব্যাপারটা যেমন সত্য নয়, তেমনি মিথ্যেও নয়। আমাদের দেশের মানুষদের যখন আমরা খাওয়াতে পরাতে চিকিৎসা করাতে পারি না, তখন বাইরের কেউ দয়া করে একটা আধলা দিলে প্রেস্টিজ রক্ষার জন্যে তা প্রত্যাখ্যান করার নৈতিক বল আমি তো খুঁজে পাই না।”

রেডিও জাপানের আফিসে জালাল আমেদের সঙ্গে যখন আমার দেখা হলো তখন এইসব কথাগুলো মনের মধ্যে তোলপাড় করছিল।

জালাল আমেদ বললেন, “কী ভাবছেন শংকরবাবু?”

“কই, কিছুই নয়। দুদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছি—কিন্তু যত দেখছি তত দেশের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, জালাল সাহেব। দেশোদ্ধার করবার মতো মুরোদ নেই, অথচ দুদিনের আনন্দ থেকেও নিজেকে বঞ্চিত করছি!”

জালালের মুখে বেদনাময় হাসি ফুটে উঠলো। জালাল বললেন, “ইন্ডিয়া ও পাকিস্তানের প্রায় এক অবস্থা। অথচ আশ্চর্য, আমরা রোগীর চিকিৎসা না করে তার ভাষা কী, জাত কী, জন্ম কোথায় এই নিয়ে চুলচেরা গবেষণা করছি। নজরুলের কোনো এক কবিতায় পড়েছিলাম, ডুবন্ত যাত্রীকে জিজ্ঞেস করছে, তুমি হিন্দু না মুসলমান? কবি বলছেন সন্তান মোরা মার।”

জালাল এবার কাজে মন দিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে বাংলায় খবর লেখা শেষ করতে হবে। খবর লিখে জালাল বললেন, “দেখুন, যদি কোনো ভুলটুল থাকে ঠিক করে দিন। বিদ্যে নেই, কেবল গোঁ-এর জোরে বাংলা ভাষার সেবা

করে যাচ্ছি।”

রেকর্ডিং রুমে যাবার সময় জালাল বললেন, “বাংলার একজন সাহিত্যিককে প্রশ্ন করবার সুযোগ পাচ্ছি এটা আমার কম আনন্দের কথা নয়। আমাদের এই প্রোগ্রাম পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম বাংলার শ্রোতাদের জন্যে।”

সাক্ষাৎকারে বললাম, “ছাত্রজীবনে বিবেকানন্দ ইস্কুল থেকে প্রথম যে বই পুরস্কার পেয়েছিলাম তার নাম ‘জাপান যাত্রী’, লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছাত্রাবস্থায় যে বন্ধুর বাড়িতে সবচেয়ে বেশি যেতাম তার বাবা স্বদেশীযুগের অনুপ্রেরণায় জাপানে পালিয়ে এসেছিলেন হাতের কাজ শিখতে। আরও বড়ো হয়ে ভগিনী নিবেদিতা প্রসঙ্গে যে নাম বার বার শুনেছি তিনি জাপানী শিল্পী ওকাকুরা। জাপানপ্রবাসী রাসবিহারী বসু ও সুভাষচন্দ্র বসু বাঙালীর হৃদয়ে কতখানি স্থান জুড়ে আছেন তা মাপবার মতো দীর্ঘ ফিতে এখনও তৈরি হয়নি। সাম্প্রতিক কালে রাজকাপুরের যে গানের কলিটি ‘খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত’কে এক সূত্রে বেঁধে দিয়েছিলে তার প্রথমেই জাপান—মেরা জুতা হ্যায় জাপানী, মেরা পাতলুন ইংলিশস্তানী...ফিরভি দিল হ্যায় হিন্দুস্থানী’, আর যেদিন দেশ ছাড়লাম, তার আগের দিন আমার বন্ধু অমল সেন জানালেন, তাঁর তিনবছরের মেয়ে সারাক্ষণ গাইছে—জা-পা-ন—লাভ ইন টোকিও।”

বললাম, “উদিত সূর্যের দেশ এশিয়ার মুখোজ্জ্বল করেছে—কিন্তু ভারত-পাকিস্তানের মানুষরা জাপানের কাছে আরও অনেক বিষয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা নিতে পারে। ট্রামে বাসে ট্রেনে সর্দি হলে জাপানীরা মুখে একটুকরো কাপড় বেঁধে ঘুরে বেড়ান। কলকাতার সুন্দরী শৌখীন মহিলারা এই ফ্যাশনটি চালু করলে দেশের ও দশের (কয়েকটি ওষুধ কোম্পানি ছাড়া) উপকার করবেন। আরও বললাম, কলকারখানা, কাঁচামাল ও পণ্যদ্রব্যের বিনিময় ছাড়াও সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কিছু অধিক লেন-দেন হলে আমরা সবাই উপকৃত ও আনন্দিত হতাম।”

সময় বেশি ছিল না, সাক্ষাৎকার সংক্ষেপেই সারতে হলো। রেডিও জাপানের শক্তিশালী ট্রান্সমিটার শব্দতরঙ্গের মাধ্যমে আমার সামান্য কথাগুলো দুই বাংলার আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে, ভাবতে বেশ রোমাঞ্চ বোধ হতে লাগলো।

স্টুডিও থেকে বেরিয়ে আসার পর যিনি প্রথম অভিনন্দন জানালেন তিনি রেডিও জাপানের এশিয় কার্যসূচীর প্রধান সুমু হিরাই। আমার ইংরেজী কথার উত্তরে শুদ্ধ বাংলায় ভদ্রলোক বললেন, “আপনার ‘টক’ শুনে আনন্দ পেলাম।”

“অনেকদিন যে কলকাতার বৌবাজারে থাকতেন”, জানালেন জালাল আমেদ।

“বারো আনা বাঙালী বলতে পারেন আমাকে”, হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন

সুমু হিরাই।

বিদায় নিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু জালাল বললেন, "এর মধ্যে কোথায় বাড়ি যাবেন? কাল এমন সময় আপনি তো আর টোকিওতে থাকবেন না। যদি আপনার আপত্তি না থাকে, আমার খুব ইচ্ছে আজকের সন্ধ্যেটা আপনার সঙ্গে কাটাই।

জালালের কথায় এমন আন্তরিকতা যে মৌখিক ভদ্রতার বেড়া ভেঙে যায়। জালাল যেন আমার প্রবাসী কোনো ভাই।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা গিনজা এলাকায় হাজির হলাম। কেমনভাবে গিনজার বর্ণনা দেবো? গোটাপঞ্চাশেক কলকাতার এসপ্ল্যানেডকে এক করলে গিনজার একটা ছোটোখাটো সংস্করণ হবে। আর রাতের গিনজা—পৃথিবীর সর্বোত্তম আলোকিত শহর। প্রতিটি বাড়ি আলোকিত ফুলের মালা পরে ঝিকমিক করছে।

জালাল বলেন, 'পৃথিবীর আর কোনো শহরে এতো ফুর্তির কেন্দ্র নেই। সাতানব্বই হাজারের বেশি রেস্তোঁরা, বার, নাইট ক্লাব এবং বাথ আছে এই শহরে। শুনেছি এতো দামী খাবারের জায়গা প্যারিসেও নেই। জাপানী ব্যবসায় প্রধান লেনদেন এইসব রেস্তোরাঁয় হয়ে থাকে। অফিসের নামে অ্যাকাউন্ট থাকে—কোম্পানীর খরচে মদ্যপান, ভোজন, নারী-সঙ্গ উপভোগ করে বিলে সই দিলেই হলো। সপ্তাহের শেষে কোম্পানিতে বিল চলে যাবে।"

জালাল বললেন, "এক-একসময় ভাবি এতো রেস্তোরাঁয় লোক হয় কি করে? কিন্তু অবাক কাণ্ড, কখনও খালি দেখি না।"

আমি চারদিকে তাকিয়ে বললাম, "সব রকমের দোকান দেখছি।"

"রেস্তোরাঁর ইউ-এন-ও বলতে পারেন। সব দেশ সব জাত এখানে প্রতিযোগিতা লাগিয়েছে। রাশিয়ান খাবার চাই—ওই তো ভোল্গা রয়েছে! জার্মান? কেটেলস রেস্তোরাঁ আছে। ব্যাংকক রোস্তোরাঁয় থাইল্যান্ডের খাবার, হানানকিতে ফরাসী ডিস, সুকিয়া এনে কোরিয়ান রান্না এবং নায়ারের দোকানে ইণ্ডিয়ান-কারি পাবেন।"

আমি জালালের কথা শুনে যাচ্ছি। জালাল বললেন, "ক্যাবারের জন্যে বিখ্যাত মিকাডো বা মিমাৎসু। আর সবচেয়ে দামী সঙ্গিনীর সান্নিধ্য পাওয়া যায় কুইন বীতে। মধুর স্বভাবের জন্যে গিঞ্জানিসীর মহিলাদের সুনাম। সাধে কি আর ফোডর সায়েব লিখেছেন—পকেটে টাকা এবং ছাতিতে দিল নামক পদার্থ থাকলে কোনো পুরুষের জাপানে নিঃসঙ্গ বোধ করার কারণ নেই। বান্ধবীদের পারিশ্রমিকের হার ঘণ্টায় ২১০ টাকা। এই সব সুন্দরীরা আবার পঞ্চাশ মিনিটে ঘণ্টা হিসেব করেন।"

একটা কফি-বার দেখিয়ে জালাল বললেন, "এখানকার কফির দোকানেও

মদ পাওয়া যায়। গেরস্তপোষা মদের দোকান হলো সানটরি বার। সানটরি বিখ্যাত জাপানী হুইস্কির নাম।”

জালাল জানতে চাইলেন আমি কি ধরনের খাবার পছন্দ করবো। বললাম, “এখনও পর্যন্ত যা বুঝেছি, জাপানীরা রান্নায় বিশ্বজয় করতে পারবে না। মহাচীনের এত নিকটে থেকেও এমন অপটু রান্না—প্রদীপের তলায় অন্ধকারের কথা মনে করিয়ে দেয়। তবু যস্মিন দেশে যদাচার—জাপানী খাওয়া ট্রাই করা যাক।”

ঘুরে ঘুরে একটা গলির মধ্যে জালাল তাঁর প্রিয় সুকিয়াকির দোকানে ঢোকালেন আমাকে। টেবিলের উপরেই উনুন। জালাল বললেন, “এদের বিশ্বাস নেই, গোরুর মাংস না দিয়ে দেয়। আপনি বরং ইয়াকিতোরি নিন, সোজা কথায় যা হলো গ্রীল্ড মুর্গি।”

জালাল বললেন, “এই খাবারের সঙ্গে জাপানী অনুপান ‘সাকে’—দিশী মদ।”

“সাকী সান্নিধ্যে সাকে পান! চমৎকার মতলব” আমি মন্তব্য করি।

আমার দিকে খাবার এগিয়ে দিয়ে জালাল বললেন, “খুব ইচ্ছে ছিল আপনাকে বাড়িতে নিয়ে যাই। কিন্তু ব্যাচেলর মানুষ, একা কোনোরকমে জীবনধারণ করি। বাইরে বাইরে খেয়ে বেড়াই—বাঙালী বন্ধুরা মাঝে মাঝে দয়া করে মাছের ঝোল ভাত খাইয়ে দেয়।”

“মাছের ঝোল ভাত যাতে বাড়িতে পাওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করলেই পারেন!” আমি রসিকতা করি।

“বাড়ি থেকে প্রায়ই আজকাল চাপ আসছে। ওদের ভয় বিয়ে শাদি না করে আমি গোল্লায় যাচ্ছি।”

“যা দেশ, তাতে ভয় কি অমূলক? আমি টিপ্পনি কাটি।

জালাল এবার আমার সঙ্গে হাসিতে যোগ দিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, “জাপানে আপনার সবচেয়ে স্মরণীয় অভিজ্ঞতা কী হলো বলুন।”

বললাম, ‘আপনি হয়তো হাসবেন, লিখতে-পড়তে না জানার কি যন্ত্রণা তা জীবনে এই প্রথম বুঝতে পারলাম। দেশের বাইরে প্রথম ইংলণ্ডে গেলাম, কোনো অসুবিধা হয়নি। তারপর ফ্রান্স—ভাষা জানি না, কিন্তু রোমান অক্ষরগুলো পড়ে অন্ততঃ কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছি, জাপানে না বুঝি ভাষা, না পারি অক্ষর পড়তে। আমার চারিদিকে ভাষা ও শব্দ রয়েছে অথচ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, কোনো কিছুতেই অংশ গ্রহণ করতে পারছি না, অদ্ভুত এক অবস্থা কথা বলবার জন্য, কথা শোনবার জন্য, লেখা পড়বার জন্য মুখ, কান, চোখ অস্থির হয়ে উঠছে। আমাদের দেশের নিরক্ষর মানুষরা সারাজীবন কী কষ্ট পায় তা এই প্রথম বুঝতে পারলাম।”

জালাল বললেন, "এই জন্যেই বলে আপনারা শিল্পী। এখানে এসে প্রথমে আমিও কষ্ট পেয়েছি, কিন্তু কখনও এই কথা আমার মনে হয়নি।"

খাওয়ার পর্ব শেষ করে আমরা আবার পথে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় আলোয় আলো, লোকে লোকারণ্য। যেন মহাষ্টমীর রাত্রে কলকাতার এক পুজো-প্যাণ্ডেল থেকে আর এক প্যাণ্ডেলে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

বেশ কিছুক্ষণ লক্ষ্যহীনভাবে ঘোরবার পর জালাল আমাকে একটা বাড়িতে নিয়ে গেলেন। লিফ্‌টে হু-হু করে আমরা উপরে উঠে চলেছি। বহুতলা ওপরে রিভলভিং রেস্তোরাঁ। একটা পাক খেতে এক ঘণ্টা সময় লাগে। টেবিল অধিকার করলাম আমরা। জালাল বললেন, "ইংরেজীতে যাতে লুক-ডাউন-আপন বলে তা বাংলা মায়ের লেখকরা করেন না। কিন্তু এই উঁচু থেকে সমস্ত শহরের মোহিনী রূপ দেখাতে পারেন। আপনি শিল্পী লোক আপনার দেখা উচিত—হয়তো কোনো নতুন অর্থ খুঁজে পাবেন।"

কফির অর্ডার দিয়ে আমরা নির্বাক হয়ে তুলনাহীনা টোকিওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। রাজার প্রাসাদে রাজকুমারীর বিবাহ উপলক্ষে যেন লক্ষ প্রদীপের সমারোহ!

জালালকে বললাম, 'রেডিও জাপানে যে বাংলা বিভাগ আছে তা জানতাম না। আপনি এখানে কেমনভাবে জড়িয়ে পড়লেন?"

"সে এক গল্প" জালাল উত্তর দিলেন।

"বলুন না, শুনি।"

"আপনাকে আগেই বলেছি, আমি সাহিত্যের ছাত্র নই। পড়াশোনায় অবশ্য নেহাত খারাপ ছিলাম না। পরীক্ষা দিয়ে স্কলারশিপ পেলাম জাপানে মাইনিং এঞ্জিনীয়ারিং পড়বার জন্যে। আসলে আমি এখনও একজন খনিবিদ্যা বিশারদ—আর কিছু নই। জাপানে কিছুদিন থেকে শুনলাম—রেডিও জাপানে পৃথিবীর বহু ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার হয়।"

কফির কাপে চুমুক দিয়ে জালাল বললেন, "একটা-আধটা নয়, ডজন ডজন ভাষা। অথচ আমাদের বাংলা ভাষার স্থান নেই। আমার ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগতো না। আমাদের বাংলা ভাষা বিশ্বের সেরা ভাষা, কেন স্থান হবে না তার জাপানে? ভাবতে ভাবতে মাথায় গোঁ চেপে গেলো। জানেন শংকরবাবু, মাথায় গোঁ চাপলে আমার আর জ্ঞানগম্যি থাকে না। রেডিও জাপানকে গিয়ে ধরলাম। ওঁদের কর্তৃপক্ষ বললেন, সরকারী সূত্রে কোনো অনুরোধ এলে আমরা বিবেচনা করে দেখবো। তখন ইণ্ডিয়ার কয়েকজন বাঙালীকে ধরলাম—যদি ইণ্ডিয়ার এমব্যাসি থেকে চিঠি লেখানো যায়। কিন্তু ওঁরা বললেন, বাংলা ভাষার জন্যে কিছু বলাটা প্রাদেশিকতা—প্রভিনসিয়ালিজম।"

"তারপর?" আমি প্রশ্ন করি।

"তারপর খেয়াল হলো বগুড়ার মহম্মদ আলী পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হয়ে এসেছেন। অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে ওঁকে একদিন পাকড়াও করলাম। ভদ্রলোক বাংলাভাষাকে সত্যি ভালবাসেন। বললেন, ঠিক আছে, লিখে দিচ্ছি।"

"সেই চিঠি নিয়ে আবার ছুটলুম রেডিও অফিসে। কিছুদিন পরে আবার খবর নিয়ে জানলাম ওঁদের ইচ্ছে রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আলাপ করার। আবার মহম্মদ আলী সায়েব। টেলিফোনে কথা হলো। বললেন, বাংলায় প্রোগ্রাম করলে জাপান ও পূর্ব-পাকিস্তানের মঙ্গল হবে—দুই দেশের মৈত্রবন্ধন দৃঢ়তর হবে। এবার ফল ফললো। এর জন্যে কৃতিত্ব মহম্মদ আলী সাহেবের এবং কিছু বাংলা-প্রেমিক জাপানী পুরুষ ও মহিলার।"

দেখলাম, জালাল আমেদের চোখ দুটো নিজের মাতৃভাষার কথা বলতে গিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। জালাল বলছেন, "ছোটো থেকে শুরু হয়। রেডিও জাপানের বাংলা প্রোগ্রাম আরও বাড়ানো হচ্ছে। শুনছি দু'একজন জাপানী পণ্ডিতের আগ্রহে একবছর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়েও বাংলা ভাষা চর্চা আরম্ভ হবে।"

আমি অবাক হয়ে জালালের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। জালাল বললেন, "আপনারা এমনভাবে লিখুন যাতে এদেশের লোকরা অবাক হয়ে যায়। ওরা বুঝতে পারে আমরা গরীব বটে, কিন্তু মনের ঐশ্বর্য আমাদের কম নয়, পৃথিবীকে আমাদেরও কিছু দেবার আছে।"

এতক্ষণ যেন অন্য কোনো রাজ্যে চলে গিয়েছিলাম, জাপানী শব্দে সংবিৎ ফিরে এলো। ওয়েটার এসে জালালকে বলছে, রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাইরে তাকিয়ে দেখলাম পরিক্রমা শেষ করে আমাদের ছোটো জগৎটি তার কক্ষপথে কখন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

আমাকে কিছুতেই পয়সা দিতে দিলেন না জালাল আমেদ।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে আমাকে তুলে দিতে এলেন জালাল আমেদ। ট্রেন এসে পড়েছে। বললাম, "আপনার কাছে শুধু নিয়েই চললাম।"

জালাল হাসতে হাসতে বললেন, "ভাবছেন, কখনও আর শোধ তুলতে কলকাতায় যেতে পারবো না।"

"একবার কেন, একশোবার কলকাতায় আসুন। কিন্তু কে জানে কি আছে বিধাতার মনে। যদি কখনও দেখা না হয়—তা হলে কেমন করে লাঘব করবো এই দেনার বোঝা?"

'বাংলায় আরও ভালো বাংলা বই লিখে", জালালের শেষ কথা শুনতে পেলাম। ইতিমধ্যে ট্রেনের অটোমেটিক দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

দেখলাম, জালাল তখনও হাত নাড়ছেন। জাপানী ট্রেনের রূঢ় দ্রুতগতি আমাকে উত্তর দেওয়ার কোনো সুযোগ না দিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানের জালাল আমেদকে নিষ্করুণভাবে আমার চোখের সামনে থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিল।

ঘরে ফেরার সময় হলো বিহঙ্গের। মাকুদাসন, দিলীপ ও বিকাশ এসেছিল এয়ারপোর্টে আমাকে তুলে দিতে।

বি ও-এ-সি বিমানের এক প্রান্তে বসে হঠাৎ খেয়াল হলো ঘরে ফেরার সময় আগত। এই তো মাত্র তিন মাস আগে মধ্যরাত্রির অন্ধকারে একদিন দমদমের টার্মাক দিয়ে হেঁটে প্লেনে চড়ে পশ্চিমমুখো যাত্রা শুরু করেছিলাম। তারপর এই এতোদিন ধরে পিছনে না তাকিয়ে কেবল পশ্চিম মুখেই এগিয়ে গিয়েছে। ভাবছিলাম, ক্রমশঃ নিজের দেশ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। হঠাৎ এইমাত্র প্লেনের শব্দে খেয়াল হলো কখন আবার কলকাতার কাছে এসে গিয়েছি। কলকাতা আর দূর নয়।

মনের মধ্যে কত বিচিত্র চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে! যে-লোকটা তিন মাস আগে দেশত্যাগ করেছিল আর যে ফিরছে সে বোধ হয় ঠিক এক নয়। বিদেশের অভিজ্ঞতা আমাকে অনেকখানি পাল্টে দিয়েছে। আমার চোখ এই এতদিন পরে খুলে গিয়েছে। তাই বোধহয় হয়ে থাকে যুগে যুগে স্বদেশের প্রেম যত সেইমত অবগত বিদেশে অধিবাস যার।

মনে পড়েছিল সানফ্রানসিসকোর এই সামান্য পরিচিত তরুণ বন্ধুর কথা। নাম মিলটন গেনস। কাইজার কোম্পানিতে বড়ো চাকরি করে মিলটন। কিন্তু তার আগ্রহ আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষে—যে ভারতবর্ষ সমগ্র বিশ্বকে স্বস্তি দিতে পারে বলে মিলটনের বিশ্বাস! মিলটন আমাকে সানফ্রানসিসকো শহরে প্রশান্ত মহাসাগরতীরে কলম্বসের মর্মর স্মৃতির কাছে নিয়ে গিয়েছিল। দুঃসাহসী নাবিক রহস্যময় অপলক দৃষ্টিতে সীমাহীন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছেন।

মিলটন আমাকে নাম ধরে ডাকে। মিলটন বলেছিল, "শংকর, তোমার বিশ্বভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বলো।"

আমি প্রথমে উত্তর না দিয়ে কলম্বাসের রহস্যময় মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম, "অনেকদিন আগে ভারতবর্ষের জলপথ আবিষ্কার করতে বেরিয়ে কলম্বাস আমেরিকার নতুন পৃথিবী আবিষ্কার করছিলেন। আর এই এতদিন পরে আমেরিকা সন্ধানে বেরিয়েছিলাম আমি ; কিন্তু এখন দেখছি যদি কিছু আবিষ্কার করে থাকি সে ভারতবর্ষ, আমার ভারতবর্ষ।"

মিলটন দার্শনিক। আমাকে আর বিব্রত করেনি, আমাকে সে বুঝতে পেরে নিঃশব্দে মহাসমুদ্রের দিকে তার দৃষ্টি প্রসারিত করেছিল।

যেখানে যেমন

"দেশে দেশে আগে যাও এবং অনেক দেশের অবস্থা বেশ ক'রে দেখ, নিজের চোখে দেখ, পরের চোখে নয়, তার পর যদি মাথা থাকে তো ঘামাও, তার উপর নিজেদের পুরাণ পুঁথি-পাটা পড়, ভারতবর্ষের দেশ-দেশান্তর বেশ ক'রে দেখ, বুদ্ধিমান পণ্ডিতের চোখে দেখ, খাজা আহাম্মকের চোখে না,..."

স্বামী বিবেকানন্দ

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

প্রথম বিশ্ববাণী সংস্করণ
এপ্রিল ১৯৭৪

প্রথম দে'জ সংস্করণ
জানুয়ারি ১৯৭৯

লেখকের নিবেদন

সাতসাগরের এপারে এবং ওপারে একদা যেসব বিচিত্র মানুষের সাক্ষাৎ-সংস্পর্শে এসেছিলাম এবং যাঁদের আজও সম্পূর্ণ ভুলতে পারি নি তাঁদের স্মৃতিকে এই বইতে ধরে রাখবার চেষ্টা করলাম।

শংকর

১৫ই এপ্রিল ১৯৭৪

নমি আমি কবিগুরু তব পদাম্বুজে

এই বই শুরু করার আগে যে কবিগুরুটিকে যথাবিহিত প্রণাম জানাতে চাই তাঁর নাম স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি নবভারতের অন্যতম স্রষ্টা ; অধ্যাত্মজগতে শঙ্করাচার্য ও রামানুজের সঙ্গে একই নিঃশ্বাসে তাঁর নাম উচ্চারিত হয়, আমাদের এই যুগে ক্লেদাক্ত হিন্দুধর্মকে কলুষমুক্ত করে তিনি স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—এইসব কারণে বিবেকানন্দের চরণচর্চা করছি না। করছি সাহিত্য-রচয়িতা হিসেবে—প্রণাম জানাচ্ছি বাংলার শ্রেষ্ঠ ভ্রমণসাহিত্যকারকে।

বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক? হ্যাঁ, শুধু শ্রেষ্ঠ নন, আমি তাঁকে নির্দ্বিধায় সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করি। সেই যে ১৮৯৯ সালে কলকাতা থেকে গোলকোণ্ডা জাহাজযোগে পাশ্চাত্যদেশ যাত্রাপথে গঙ্গাবক্ষে তিনি 'পরিব্রাজক'-এর প্রথম লাইন রচনা করলেন—তারপর থেকে বাংলা ভ্রমণসাহিত্য আর এক রইলো না। 'পরিব্রাজক' ও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' লিখিত হবার পর সমগ্র এক শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ অতিক্রান্ত হলো, বাণীর বরপুত্ররা এই বিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভ্রমণসাহিত্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করলেন, কিন্তু বিবেকানন্দ আজও অদ্বিতীয়। কী স্টাইলে, কী সরসতায়, কী অন্তর্দৃষ্টিতে, কী আত্মবিশ্বাসে, কী গভীর মানবপ্রেমে 'পরিব্রাজক'-এর লেখক আজও বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের মুকুটমণি হয়ে রইলেন।

'পরিব্রাজক' রচনাকালের ঠিক আটষট্টি বছর পরে ১৯৬৭ সালে আমার বিলেত-আমেরিকা ভ্রমণের সুযোগ ঘটে। নিমন্ত্রণ এসেছিল সরকারী সূত্রে সুদূর মার্কিন দেশ থেকে। কখনও বিদেশ যাইনি—কর্মক্ষেত্র কলকাতার একশ মাইলের বাইরে গেছি মাত্র কয়েকবার। এহেন লোকের পক্ষে একলাফে সপ্তসাগর পেরনো এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে প্রথম ভ্রমণের বই 'এপার বাংলা ওপার বাংলা'য় লিখেছি। সরকারী নিয়ন্ত্রণে বিদেশ যাবার সুযোগ পেয়ে প্রচণ্ড আনন্দ হওয়ার কথা—কিন্তু আমার হলো উল্টোটা। মা বললেন, "এতো ভাবছিস কী?"

ভাবনাটা বোঝাবো কী করে? বছরের পর বছর ছাত্র, কর্মী, অধ্যাপক, গবেষক এবং রাজদূত হিসেবে পাশ্চাত্যে বসবাস করে কত দূরদর্শী ও প্রতিভাধর ভারতীয় পশ্চিমের যে-সভ্যতাকে ঠিকমতো বুঝতে পারেননি, টুরিস্টের মতো সামান্য কয়েক সপ্তাহ এখানে-ওখানে ঘুরে বেরিয়ে সেই পশ্চিম সম্পর্কে আমি

কী লিখতে পারবো? লিখতেই হবে এমন কোনো দিব্যি ছিল না, বরং না-লেখবার স্বাধীনতা আমাকে নিমন্ত্রণকারীরা আগে থাকতেই দিয়েছিলেন। তবু খটকা লাগলো, মনের মধ্যে কে যেন জিজ্ঞেস করলো, লেখককে কেন ভ্রমণের সুযোগ করে দেওয়া হয়? ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও কী করে? সপ্তসাগর পেরিয়ে সায়েববিবির দেশে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পেলে লেখকের কী কর্তব্য?

আমার মা নিজের অজান্তেই পুত্রের সমস্যার সমাধান করেছিলেন। বলেছিলেন, "সব সময় সব জিনিসের সবকিছু জেনে লিখতে হবে এমন কথা কে বলেছে? যখন যেখানে যাবি ঘরের কথা মনে রাখবি, আর যেমন যেমন দেখবি তাই ডাইরিতে লিখে নিবি।"

মায়ের কথা শুনে আমার সাহিত্যজীবনের পরিচালক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু ছোট্ট একটা কাগজের স্লিপে শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্ধৃতি পাঠিয়েছিলেন—'যখন যেমন তখন তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন'—তাহলে কোথাও ঠকতে হবে না।

এরপরে আমার আর কোনো চিন্তা থাকতে পারে না। সাত-সাগরের পারে যেতে আমার আর কোনো দ্বিধা বা দুশ্চিন্তা নেই। মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি, দেশ দেখার সুযোগে যেখানকার মানুষটি যেমন, তেমনভাবেই দেখে আসবো। আর পথপ্রদর্শক তো রয়েছেন—পরিব্রাজক ও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের লেখক।

হাওড়ার বিবেকানন্দ ইস্কুলে পড়েছি আমি। ক্লাশ এইটে পড়বার সময় পশ্চিমের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল ওই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মাধ্যমে। তখনও পরাধীনতার আমল। দৈনন্দিন জীবনে গোরা ইংরেজদের প্রচণ্ড প্রতাপ—কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের মনে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের প্রতি প্রবল ঘৃণা। পশ্চিমকে ঠিকমতো বোঝার পক্ষে পরিবেশটা তেমন অনুকূল ছিল না।

তারপর স্বাধীনতা এলো—শাসক ইংরেজ তল্পিতল্পা গুটিয়ে বিদায় নিলো। আমার জীবনেও সেই সময় ঘনিয়ে এলো দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ। বাবার আকস্মিক অকালমৃত্যু সংসারে যে বিপর্যয় ডেকে আনলো তাতে সাহিত্যচিন্তা কোথায় হারিয়ে গেলো। একটা চাকরির সন্ধানে তখন কলকাতার পথে পথে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কী ছিল বিধাতার মনে, দুর্যোগের অন্ধকারে এই কলকাতাতেই আমার সঙ্গে প্রথম পাশ্চাত্যের সাক্ষাৎ পরিচয় হলো। সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। তার একটি পরিচ্ছেদ দিয়েই কয়েক বছর পরে সাহিত্যযাত্রা শুরু করেছিলাম। ভাবছি আজ আবার সেখান থেকেই শুরু করি।

ওখান থেকে শুরু করার পক্ষে যুক্তি অনেক। কারণ যেদিন বারওয়েল সায়েবকে দেখলাম সেদিনই প্রথম আমার মানসিক বিদেশযাত্রা শুরু হলো—পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার।

সাত সাগরপারের পশ্চিম—ইউরোপ ও আমেরিকা। সাত সাগর পারে কী আছে গো? পাশের বাড়ির একটি ছেলে এই মুহূর্ত গানের সুরে তার উত্তর আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। প্রতিদিন এই সময় সে গায়—আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে সাত সাগরের তেরো নদীর পারে।

সাত সাগরের পারে শুধু স্বপ্নের রাজকন্যা নয়, রাজপুত্রও থাকে। আমার স্বপ্নের মানুষটি সাত সাগরের ওপার থেকেই এদেশে এসেছিলেন। দমদম বিমানপোত থেকে রাতের অন্ধকারে প্যানঅ্যাম ৭০৭ বিমানে চড়েও প্রথমে তাঁর কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। আমার প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংবাদ তাঁকে দিয়ে শুরু করা ছাড়া উপায় নেই। আমার অপরাধ মার্জনা করবেন।

সেই কৈশোর থেকে ভাগ্যের দেবতা আমাকে যেমন বার বার অগ্নিপরীক্ষায় ফেলেছেন, তেমন দিয়েছেন অপার সৌভাগ্যের স্বর্ণসম্ভার। আমার মতো সামান্য বিদ্যা এবং সামান্য পুঁজি নিয়ে মানুষের এই পৃথিবীকে এমনভাবে দেখবার এবং জানবার সুযোগ ক'জন পেয়েছে? কত সাধ্যসাধনায় কল্পনার সরস্বতীকে জাগ্রত করে প্রতিভাধর কাহিনীকার তাঁর মনোভূমিতে ঘটনার যে রাজসূয় যজ্ঞ করেন, কাসুন্দের এক অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের চোখের সামনেই তা ঘটে গিয়েছে। এক নয়, দুই নয়, বহু ঘটনার মণিমাণিক্যে তার স্মৃতির সঞ্চয় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এ সবই সম্ভব হয়েছিল সমুদ্রের ওপার থেকে আসা সদাহাস্য, সদাপ্রসন্ন, সদাকৌতুকময় এক বিদেশির আশীর্বাদে—যাঁর জীবনের অপরাহ্নবেলায় আমি হাজির হয়েছিলাম আকস্মিকভাবে। তাঁর নাম নোয়েল বারওয়েল।

সে এক মধুর পরিস্থিতি। একদিকে সত্তর-উত্তীর্ণ এক বিদেশি। দূর সিন্ধুপারে জন্মগ্রহণ করে, সংসারের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ধনী হয়ে, ইংলন্ডের দিক্‌প্রান্ত পেরিয়ে জীবনসন্ধ্যায় যিনি এই ভাগীরথী তীরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, অন্যদিকে এক শীর্ণকায় শ্যামল বালক—তার বাবা হঠাৎ মরে গিয়ে সংসারটাকে ভাসিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, পড়াশোনা করে খুব বড় হবার স্বপ্ন থাকলেও পয়সার অভাবে সে লেখাপড়া ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। চাকরি যোগাড়ের প্রাণান্তকর তাগিদে সে পিটম্যান সাহেবের শর্টহ্যান্ড এবং রেমিংটন সাহেবের টাইপ শিখে ফেলেছে। ছোট ভাইবোনদের খাওয়াবার জন্যে সে ছোটখাট কাজকর্ম করছে এবং সন্ধ্যেবেলায় সাবান সাপ্লাই করছে মুদির দোকানে। বয়স অনুযায়ী, একজনের সূর্য ওঠার সময়, কিন্তু আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন। আর একজনের সূর্য পশ্চিমদেশের আকাশে উদিত হয়ে অপরাহ্ন-বেলায় পূর্বদেশের কলকাতা শহরে অস্ত যাওয়ার জন্য অপেক্ষমান। একজন কেমব্রিজের এম-এ, মিলিটারির অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল, প্রথম মহাযুদ্ধের বীর (নামের পাশে মিলিটারি ক্রশ লিখতে পারেন, ভিকটোরিয়া ক্রশের পরেই যার সম্মান) এবং কলকাতা হাইকোর্টের প্রখ্যাত ব্যারিস্টার—আর

একজন, কাসুন্দের বাইরে যে কখনও যায়নি, শীর্ণ শরীরটার ওপর একটা হেঁড়ে মাথা, জীবনে সে কখনও সায়েব দেখেনি।

কিন্তু কী ছিল বিধাতার মনে, হাইকোর্টের আদালতী কর্মক্ষেত্র ওল্ড পোস্টাপিস স্ট্রীটের টেম্পল চেম্বারে একদা প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সাক্ষাৎ হলো, বিভূতিদা, আপনি শতায়ু হোন, ঈশ্বরের সমস্ত আশীর্বাদ আপনার ওপরে বর্ষিত হোক। আপনার জন্যেই হাওড়ার একটা ছেলে সায়েব ব্যারিস্টারের কাছে চাকরি পেলো। পৃথিবীর হয়তো তাতে তেমন কিছু এসে গেলো না, কিন্তু একটা জীবনের গতিপথ পাল্টে গেলো। ভোরবেলায় সর্বপাপঘ্ন সূর্য পরম স্নেহে কুঁড়ির ওপর কিরণ দিয়ে প্রাণের স্পর্শ এঁকে দিলেন। শতদলের মতো তার জীবন বিকশিত হয়ে উঠলো। সে যা চেয়েছিল তা পায়নি বলে একদিন নির্জনে চোখের জল ফেলেছিল ; কিন্তু রসিক বিধাতা মধুসূদনদাদার ছদ্মবেশে বিজন অরণ্য থেকে বেরিয়ে পথহারা বালককে এমন উপহার দিলেন যা সে কোনোদিন স্বপ্নেও চাইতে পারেনি। মনে আছে তো? ছোটবেলার সেই মধুসূদনদাদার গল্প? যিনি আসলে ঈশ্বর, বালকের দুঃখ সহ্য করতে না পেরে বন থেকে বেরিয়ে এসে তার হাতে একটা ভাঁড় দিয়েছিলেন। যে-ভাঁড় কখনও ফুরোয় না। যা চাওয়া যায় ভাঁড় উল্টে দিলে তাই এসে পড়ে। এই পাওয়ার জন্য কাসুন্দের ছেলেটি তৈরি ছিল না, তার যোগ্যও সে নয়। তাই আজও এতোদিন পরেও কোথায় যেন একটা বিষণ্ণ সুর বেজে উঠে মাঝে মাঝে তাকে উদ্বেল করে তোলে, অকারণে তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে।

এই মধুসূদনদাদার গল্পই একদিন লিখেছিলাম আমার 'কত অজানারে' বইতে। সে আমার বাদলদিনের প্রথম কদমফুল, সে যে আমার সুরের ক্ষেতে প্রথম সোনার ধান। তারপর তো কত বছর কেটেছে, পৃথিবীতে, ভারতবর্ষে, বাংলায়, কলকাতায়, কাসুন্দেতে, আমার বাড়িতে, আমার জীবনে কত পরিবর্তনই এসেছে।

সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ—মধ্যরাতের কলকাতা কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। দমদমে প্লেনের আসনে বসে আমি সেফটি বেল্ট বেঁধে নিয়েছি। বাইরে বোধহয় বৃষ্টি নামবে। মেঘের ছায়ায় আকাশ অন্ধকার, প্লেনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে গিয়ে আমার মন বিস্মৃতির ওপারে কোন দূর অতীতে ফিরে যেতে চাইছে। স্মৃতির প্লাবনে আমার বাদলদিনের প্রথম কদমফুলকে আবার দেখতে পাচ্ছি। রক্তচক্ষু সমালোচক, আপনি আমাকে মার্জনা করবেন, স্বদেশের পবিত্র মৃত্তিকা ত্যাগের পূর্বমুহূর্তে তিনি আমার স্মৃতিপটে ভেসে উঠেছেন, আমি পুনরাবৃত্তি করছি, আবার তাঁকে স্মরণ করছি, আমার ডাইরিতে তাঁর কথা লিখতে বসছি।

দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দেবার কয়েকদিন আগে এক অব্যক্ত আকর্ষণে

ক্যালকাটা ক্লাবে গিয়েছিলাম। চৌরঙ্গী রোড আর সার্কুলার রোডের সংযোগস্থলে ক্যালকাটা ক্লাবের হলদে রংয়ের বাড়িটা একদিন আমার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়েছিল। শেষজীবনে সায়েব ওইখানেই থাকতেন। লোকে বাড়িতে, হোস্টেলে, মেসে, না হয় হোটেলে থাকে জানতাম। কোন কোন ক্লাবেও যে বসবাসের ব্যবস্থা থাকে তা প্রথম জানলাম সায়েবের দৌলতে। তখন ক্যালকাটা ক্লাবের একতলায় বসবাসের স্যুইট ছিল। আর ওপরে গোটাকয়েক ঘর। একতলার এই স্যুইটেই প্রতিদিন বিকেলে কোর্টের ছুটির পর আমরা আসতাম ওঁর সঙ্গে। স্যুইট মানে যে একাধিক ঘর তা ক্লাবের খোকাবাবুর কাছে শিখেছিলাম।

এবার ক্যালকাটা ক্লাবে গিয়ে একতলায় স্যুইটের খোঁজ পেলাম না। ভেঙেচুড়ে সেখানে হলঘর বানানো হয়েছে। প্রায়ই সেই হল্-এ ডিনার, ককটেল পার্টি অথবা মিটিং হয়। এই হলঘরেই এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হলো। তিনি হঠাৎ বললেন, "আপনার 'কত অজানারে' পড়েছি। আপনার সায়েব এই ক্লাবে থাকতেন?"

মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেলো। চারিদিকে তাকিয়ে বললাম, "এই যেখানে আপনি এবং আমি দাঁড়িয়ে আছি এইখানেই তিনি থাকতেন। এইখানেই ১৯৫৩ সালের এক রাত্রে তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল।"

"আহা বড় ভালমানুষ ছিলেন। আপনার লেখা পড়ে সেটা বুঝতে একটুও অসুবিধা হয় না," ভদ্রমহিলা বলেছিলেন।

আমার লেখা পড়ে! হা ঈশ্বর! আমার লেখা পড়েই মানুষটাকে যদি আপনাদের এতো ভাল লেগে থাকে, তা হলে নিজের চোখে দেখলে কী হতো?

আমি তো ছেলেমানুষের মতো একটা বিরাট বটগাছের কয়েকটা শুকনো পাতা কুড়িয়ে জড়ো করে আমার দেশের মানুষদের দেখিয়েছি। পাতা দেখে কী বটগাছের আকার আন্দাজ করা যায়? কিন্তু সে-কথা এখন বলে লাভ কী? কেউই চিরকাল থাকে না, বটগাছও না। স্মৃতির ফ্রেমে এই শুকনো বটগাছগুলো সযত্নে বাঁধিয়ে রাখা ছাড়া আর কী উপায় আছে?

ক্যালকাটা ক্লাবে আমার সঙ্গে সায়েবের শেষ সাক্ষাতের কথা ঘুরে ফিরে মনে পড়ে যাচ্ছে।

প্রতিদিন বিকেলে সায়েবের সঙ্গে হাইকোর্ট থেকে ফিরতো দেওয়ান সিং বেয়ারা। একটু পরে আমিও হাজির হতাম। কোর্টে ব্যারিস্টার এবং বাবুদের সব কাজ শেষ হয়ে যায় না। জজরা যতক্ষণ আদালতের বেঞ্চিতে রয়েছেন ততক্ষণ তা রণক্ষেত্র। তারপরেই আবার আগামী দিনের লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি চলে।

কোর্ট থেকে ক্লাবে ফিরে এসে জামাকাপড় ছেড়ে সায়েব একটা লুঙ্গি পরে

বসে থাকতেন। একেবারে খালি গা। বলতেন, "গত জন্মে আমি ছিলাম বাঙালি চাষা—গায় কিছুই রাখতে পারি না।"

আমাকে মিটমিট করে হাসতে দেখে বলতেন, "হাসছো কী? একটু ঝাড়া-হাত-পা হলেই আমি জওহরলাল নেহরুকে চিঠি লিখবো, ইন্ডিয়ার জাতীয় পোশাক হওয়া উচিত লুঙ্গি ও গামছা।

সায়েব এবার আমার দিকে তাকালেন : কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, "হেসো না, মাইডিয়ার বয়। জওহরলাল এবং আমি এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কেমব্রিজে অবশ্য আমি ওঁর থেকে অনেক সিনিয়র।"

নেহরুকে ভালভাবেই চিনতেন সায়েব। এবং সে-চেনা সুখের দিনে নয়। পরিচয়টা সেই যুগে যখন জওহরলাল একবার জেল থেকে বেরোচ্ছেন এবং আবার ঢুকছেন। জওহরলাল যখন প্রাইম মিনিস্টার নেহরু হলেন তখন তো তাঁকে চেনবার জন্য স্বয়ং উইনস্টন চার্চিলও লালায়িত। শুনেছি, ইংরেজ আমলে সি-আই-ডি এক সময় আমাদের সায়েবের ওপর নজর রাখতো। কারণ, এঁর কলেজের অতি পরিচিত বান্ধবী সরোজিনী নাইডু। বিপ্লবীদের হয়ে সায়েব আদালতে কেস করেছেন, ফাঁসি-হয়ে-যাওয়া বিপ্লবীর পরিবারকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করেছেন, গান্ধীজীর সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখাসাক্ষাৎ করেছেন এবং বিশেষ বন্ধু কেমব্রিজের আর-এক প্রাক্তন ছাত্র দীনবন্ধু এনড্রুজ ইংরেজ সরকারকে প্রায়ই বিশেষ অস্বস্তিতে ফেলেছেন।

বিভূতিদার কাছে শুনেছি মৃত্যুর কিছুদিন আগে দীনবন্ধু একবার সায়েবের কাছে এসেছিলেন। পি জি হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায় দীনবন্ধু আবার খোঁজ করেছিলেন ছাত্রজীবনের বন্ধুকে। অপারেশনের আগে বিছানায় শুয়ে চার্লি এনড্রুজ বলেছিলেন, 'নোয়েল, আমি একটা উইল করতে চাই।' দীনবন্ধুর ইচ্ছেমতো হাসপাতালে ঘরে বসে তাঁর লাস্ট উইল এন্ড স্টেটমেন্ট তৈরি করেছিলেন আমাদের সায়েব। সেই শেষ, দীনবন্ধু আর ফেরেননি।

লুঙ্গি পরে চায়ের জন্য অপেক্ষা করতে করতে সাহেব আমাকে এক একদিন এক একটা মজার গল্প বলতেন। দীনবন্ধু এনড্রুজকে তিনি চার্লি বলে ডাকতেন। সায়েব বললেন, "ফোর্ট উইলিয়মে তখন আমি কর্নেল। সিক্রেট সার্ভিসের দায়িত্ব রয়েছে আমার ওপর। দু'জন বিপজ্জনক লোকের যাতায়াত সম্পর্কে তখন প্রায়ই গোপন টেলিগ্রাম আসতো। একজনের নাম এম এন রায়। আর একজনের নাম চার্লি এনড্রুজ। তখন সবে এদেশে এসেছি। এই এনড্রুজই যে আমাদের কলেজের চার্লি তা কেমন করে জানবো? তারপর একদিন হঠাৎ চার্লির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। আমি ততোদিনে মিলিটারি ছেড়ে কলকাতায় ব্যারিস্টারী শুরু করেছি। জোর করে চার্লিকে মিডলটন স্ট্রীটের বাড়িতে ধরে নিয়ে এলাম, অনেকক্ষণ ধরে

গল্পগুজব করে পুরনো বন্ধুত্ব আবার ঝালিয়ে নেওয়া গেলো।”

সায়েব বললেন, “আমাদের কেমব্রিজ ডিনারে চার্লিকে নেমন্তন্ন করলাম। কেমব্রিজের প্রাক্তন ছাত্ররা বছরে একবার ডিনারে জড়ো হতাম। চার্লি বললো, ‘আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে না।’ জিজ্ঞেস করলাম, তোমার অসুবিধা কী? চার্লি গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলো, ‘নোয়েল, তোমাদের পার্টিতে যাবার মতো কোনো ডিনার সুট বা ভাল জামাকাপড় আমার নেই।’ আমি বললাম, চার্লি, আমাদের এই মিটিং বড়লাটের দরবারে নয়। তুমি যা-খুশি পরে আসতে পারো, এমন কি লুঙ্গি পরে এবং গায়ে গামছা জড়িয়ে এলেও আমাদের আপত্তি থাকবে না।”

আমাদের দু’জনের মধ্যে যখন এইরকম গল্পগুজব চলতো তখন দেওয়ান সিং চা এনে হাজির করতো। চায়ের সঙ্গে সায়েবের পুরনো দিনের গল্প আরও জমে উঠতো। তারপর কাজ আরম্ভ হতো, ব্রীফের ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে সায়েব ডিকটেশন দিতেন। কিছু কিছু চিঠিও লিখতেন। আমি শর্টহ্যান্ডে ডিকটেশন নিয়ে টাইপরাইটারে টাইপ শুরু করতাম এবং সায়েব নথিপত্রের জঙ্গলে ঢুকে পড়তেন।

আরও একটা মজার দায়িত্ব এসেছিল এই সময়। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সায়েব নিজের স্মৃতিচিত্র লেখা শুরু করেছিলেন। স্টেটসম্যান পত্রিকার তখনকার সম্পাদক জনসন সায়েব ছিলেন সায়েবের টুকরো টুকরো হাসির গল্পের মস্ত ভক্ত। তাঁর বিশেষ অনুরোধ, রবিবারের কাগজে সায়েবকে ধারাবাহিক লিখতে হবে।

এই স্মৃতিকাহিনীর সবটাই আমি ডিকটেশন নিয়েছি। আইনের কাজকর্ম চুকিয়ে, দরজা ভেজিয়ে, তিনি ঘরের নীল আলোটা জ্বালিয়ে দিতেন এবং সোফায় বসে চোখ বন্ধ করতেন। ফিরে যাবার চেষ্টা করতেন ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে—তাঁর বাল্যে এবং ছাত্রজীবনে। তারপর ধীরে ধীরে ডিকটেশন শুরু করতেন। আমি শর্টহ্যান্ডের খাতায় প্রতিটি অক্ষর সযত্নে লিখে নিতাম।

আমি সামান্য ব্যারিস্টারের বাবু, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষা তখনও নেই আমার। কিন্তু সায়েব মাঝে মাঝে স্মৃতিকাহিনী সম্পর্কে আমার মতামত চাইতেন। জিজ্ঞেস করতেন, “কেমন হচ্ছে?”

আমি লজ্জা পেতাম, কিন্তু ছাড়তেন না। হাসতে হাসতে বলতেন, “তুমি মনের ভাব চেপে রাখতে পারো না, মাই ডিয়ার বয়। তোমার মুখ দেখে আমি বুঝতে পারি, আমি কেমন লিখছি।”

এক একদিন শুরু হতো সাহিত্যচর্চা। সায়েব পড়ে শোনাতেন গিলবার্টের ‘ব্যার ব্যালাড’। হাসির কবিতা শুনিয়ে আমাদের গোমড়া মুখে হাসি ফুটিয়ে ওঁর খুব আনন্দ হতো। আবার কোনোদিন ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কীটস্ এবং বায়রন। গম্ভীর হয়ে বলতেন, “তোমাদের সাবধান করে দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি

যে শেষোক্ত মহাকবির সাহিত্য এবং জীবন সম্পর্কে কোনোরকম অশোভন ইঙ্গিত আমি সহ্য করবো না। কারণ তিনি আমার আত্মীয়। সুদূর হলেও, বায়রনী রক্ত আছে এইখানে।" এই বলে সায়েব নিজের হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিতেন।

একদিন সায়েব আমাকে বেশ বিপদে ফেলে দিলেন। বেশ মনে আছে দিনটা ছিল শনিবার। ঘরের মধ্যে অন্য কেউ নেই, আমি টাইপের কাজ শেষ করে টেবিল গুছোচ্ছি। এবার বাড়ি পালাবো।

এমন সময় সায়েব বললেন, "শংকর, তোমার বিরুদ্ধে কমপ্লেন আছে।"

চমকে উঠলাম, যদি না নজরে পড়তো সায়েব মিটমিট করে হাসছেন। জানতে চাইলাম, কোনো ভুল করেছি নাকি টাইপে?

"টাইপে ভুল থাকলে আমি তা হাতে ঠিক করে নিতে পারি," সায়েব উত্তর দিলেন।

এরপর সায়েব যা বললেন তাতে আমি সত্যই বিব্রত বোধ করলাম। সায়েবের বক্তব্য, "শংকর, আমি তোমাকে সিনেমা দেখিয়েছি, খাইয়েছি, কিন্তু তুমি আমাকে এখনও খাওয়াওনি। কাল রবিবার, তুমি আমাকে সিনেমা দেখাবে এবং খাওয়াবে।"

যদিও প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক, তবুও লজ্জা পাবার কথা। আমার তদানীন্তন আর্থিক অবস্থা বুঝতেই পারছেন। এই ইংরেজ সায়েবের সঙ্গে তাল দিয়ে আমি কেমন করে তাঁকে ফ্রেন্ডের মতো খাওয়াবো এবং সিনেমা দেখাবো? মাথাটা ঘুরে গেলো।

তবু সায়েব নিজেই যখন কথা তুলেছেন তখন একটা কিছু করতেই হবে। বললাম, "বেশ, আপনার যখন ইচ্ছে হয়েছে তখন কালকেই খাওয়াবো।"

সায়েব কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে ফিসফিস করে বললেন, "একজন ভদ্রলোক, তিনি যতই লোভী হোন, তাঁকে এইভাবে নিমন্ত্রণ করলে তিনি কি তা গ্রহণ করতে পারেন? তাঁকে বলো, আমি অত্যন্ত দুঃখিত, মিস্টার বারওয়েল। আপনি যা ব্যস্ত থাকেন, তাই খুব ইচ্ছে সত্ত্বেও এতোদিন আপনাকে নিমন্ত্রণ জানাতে সাহস করিনি। যদি আপনার অন্য কোনো এনগেজমেন্ট না থাকে, তা হলে হোয়াট অ্যাবাউট টুমরো? এই শর্ট নোটিসের জন্যে আমি লজ্জিত।"

নির্দেশমতো মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললাম, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত মিস্টার বারওয়েল। আপনি যা ব্যস্ত থাকেন, তাতে... ইত্যাদি ইত্যাদি। হোয়াট অ্যাবাউট আগামী কাল? খুব ব্যস্ত আছেন নাকি?'

সায়েব বেশ কায়দায় অভিনয়ের ভঙ্গিতে বললেন, "ও ডিয়ার শংকর, আপনার এই কাইন্ড ইনভিটেশনের জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। আপনি যখন

নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন তখন আমার কোনো কাজই কাজ নয়। আমি আগামীকাল আপনার আগমনের আশায় বসে থাকবো।"

শুভরাত্রি জানিয়ে, হাসিমুখে ক্যালকাটা ক্লাব থেকে তো বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু বেশ চিন্তা আরম্ভ হলো। ইনি তো আর যেমন-তেমন অতিথি নন। সায়েবকে খাওয়াতে-দাওয়াতে, সিনেমা দেখাতে বেশ খরচের ধাক্কা। এঁকে নিয়ে তো বৌবাজারের বঙ্গলক্ষ্মীতে ভাত এবং কলেজ স্ট্রীটে জ্ঞানবাবুর দোকানে চা খাওয়ানো যায় না।

সৌভাগ্যক্রমে আমার একটা গোপন তহবিল ছিল। আকস্মিক বিপদ-আপদের মোকাবিলা করার জন্য বইয়ের আলমারির পিছনে একটা খামে লুকিয়ে-রাখা চল্লিশ টাকার স্মরণ নিলাম।

এই টাকা নিয়ে রবিবার দিন যথাসময়ে ক্যালকাটা ক্লাবে হাজির হলাম। আমার পরনে ধুতি শার্ট, পাশ-পকেটে ধুতির কোঁচা, আর বুকপকেটে বিপত্তারণ ফান্ডের বহুমূল্য সঞ্চয়।

সায়েব আমাকে দেখেই সস্নেহে অভ্যর্থনা করলেন, "গুড মর্নিং, মাই বয়।"

তারপর অভিনয়ের সুরে বললেন, "মহাশয়, আপনার জন্যেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।"

আমি মফস্বলের ছেলে, অতশত সামাজিকতা জানি না। কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু একমুখ হেসে ফেললাম।

সায়েব বললেন, "শংকর, আমি একটু বাথরুমে যাচ্ছি। টেবিলে তোমার নামে একটি চিঠি রয়েছে। তুমি ততক্ষণ দেখো।"

খামটা খুলে আমি তাজ্জব। তার মধ্যে কোনো চিঠি নেই। আছে ছ'খানা দশটাকার নোট।

একটু পরেই সায়েব গম্ভীর হয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন, "মহাশয়, আপনি যদি চান, আমি এখনই বেরোতে প্রস্তুত।"

আমি বললুম, "তাহলে যাওয়া যাক।"

সায়েব বললেন, "আপনার নিমন্ত্রণের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার কোন সন্দেহ নেই যে আপনার মধুর সান্নিধ্যে আজকের দিনটা আমি উপভোগ করবো।"

ঘর থেকে বেরিয়ে ক্লাব লাইব্রেরির দরজায় সায়েবের সঙ্গে বিরাট এক কোম্পানির জাঁদরেল বড়কর্তার দেখা হলো। "হ্যালো নোয়েল, কেমন আছো?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

সায়েব বললেন, "তোমাদের আলাপ করিয়ে দিই, ইনি হচ্ছেন... কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টার স্যার... আর ইনি আমার বিশিষ্ট বন্ধু এবং সহকারী মিস্টার

শংকর। শংকর আজ ভেরি কাইন্ডলি আমাকে লাঞ্চ খাওয়ার জন্যে বাইরে নিয়ে যাচ্ছেন।"

নিজের বাবুর সঙ্গে লাঞ্চ খাবার পরিকল্পনাটা এই জাঁদরেল ইংরেজ বোধহয় তেমন উপভোগ করলেন না। তবু ভদ্রতা সহকারে তিনি আমাকে বললেন, "হাউ ডু ইউ ডু? আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে প্রীত হলাম।" তারপরে সায়েবকে বললেন, "হাউ নাইস।"

সায়েব যেভাবে আমাদের সঙ্গে মেশেন তা তাঁর সমপর্যায়ের অনেক লোক পছন্দ করেন না। কিন্তু আমাদের সায়েব ওসব মোটেই তোয়াক্কা করেন না। একবার ওঁকে বলেছি, আমাকে সঙ্গে নিয়ে ক্লাবের ডাইনিং-হল্-এ খেতে যাবেন না। সায়েব গম্ভীর হয়ে উত্তর দিয়েছেন, "আমার কাছে তোমার বন্ধুত্ব.ওঁর সান্নিধ্য থেকে এক হাজার গুণ মূল্যবান। ভবিষ্যতে আমার কাছে এ-বিষয়ে কখনও কথা তুলবে না। আমি কী করছি তা বোঝবার মতো বয়স আমার হয়েছে।"

সেদিনও তাই আর অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারণা করলাম না। আমরা দু'জনে নুড়ি-বেছানো পথের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এবার ক্লাবের বাইরে গেটের সামনে দাঁড়ালাম।

পশ্চিম দিক থেকে একটা ট্যাক্সি আসছিল। সেইটা ধরলাম। গেট খুলে আমি ঢুকতে যাচ্ছিলাম। আমার হাতে চাপ দিলেন সায়েব। ফিসফিস করে বললেন, "আমি তোমার গেস্ট। অতিথিকে আগে গাড়িতে বসাতে হয়।"

আমি ব্যাপারটা বুঝে, গাড়ির হাতল ধরে বললাম, "মিস্টার বারওয়েল, আপনি ঢুকুন।"

সায়েব সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "তা হয় না। আগে আপনি, তারপর আমি মিস্টার শংকর। তাছাড়া আপনি তো জানেন, ক'দিন আমি বাঁ কানে একটু কম শুনছি, সুতরাং আমি আপনার বাঁ দিকে থাকতে চাই।"

ট্যাক্সিতে চড়ে আমরা কলকাতায় কয়েকটা জায়গায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরলাম। সায়েব বহু ইতিহাসের কথা শোনালেন, সেই সঙ্গে পুরোনো যুগের নানা গল্প। মাঝে মাঝে মুচকি হেসে আমাকে বললেন, "আপনার এ আতিথেয়তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।"

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে, একটা খোঁচা দিয়ে ফিসফিস করে সাহেব বললেন, "হোস্ট চুপ করে থাকলে অতিথির যে মনে লাগবে। তুমি উত্তর দাও, না মহাশয়, আপনার সুমধুর সান্নিধ্যের আনন্দ পুরোপুরি আমারই।"

পার্ক স্ট্রীটের এক রেস্তোরাঁয় সেদিন আমাদের লাঞ্চ হয়েছিল। তারপর ট্যাক্সিতে চড়ে মেট্রো সিনেমাতে গিয়েছিলাম।

আমি টিকিট ঘরের দিকে এগিয়ে গিয়ে টিকিট কাটতে যাচ্ছিলাম। সায়েব

ফিসফিস করে আমাকে মনে করিয়ে দিলেন, "আমাকে হল্-এর প্ল্যানটা দেখতে অনুরোধ করো। জিজ্ঞেস করো, কী ধরনের সীট আমি পছন্দ করবো।"

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, "কি ধরনের সীট আপনি পছন্দ করবেন মিস্টার বারওয়েল? প্ল্যানটা দেখুন।"

সাহেব হাঁ হাঁ করে উঠলেন। "যে-কোনো সীট মিস্টার শংকর। তবে সীটটা অবশ্যই আপনার পাশে হওয়া চাই। আর প্লিজ, খুব দামী টিকিট কিনবেন না। সিনেমা দেখাটাই আমাদের উদ্দেশ্য, দামী সীটে বসা নয়।"

ইন্টারভ্যালের সময় ফিসফিস করে সায়েব মনে করিয়ে দিলেন, "আমি আইসক্রীম কিংবা কফি খাবো কিনা তা এখনও পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করোনি কিন্তু। দেখছো না সেই জন্য আমি কেমন মুখ গোমড়া করে বসে আছি।"

আতিথেয়তার ত্রুটি বুঝতে পেরে আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, "একটা আইসক্রীম হোক? কিংবা কফি?"

আমার অতিথি এবার উত্তর দিলেন, "থ্যাংকস, কিন্তু এখন কিছুই নয়। আমাকে যা লাঞ্চ খাইয়েছেন তাই সামলাতে পারছি না।"

সিনেমার শেষে আমরা পার্ক স্ট্রীটের নামকরা চায়ের দোকান ফ্লুরিতে গিয়েছিলাম। বেয়ারা আমাদের টেবিলে অনেকগুলো কেক রেখে গেলো। আমি বেয়ারাকে ডেকে বলতে যাচ্ছিলাম, এতো কেক আমাদের দরকার নেই। সায়েব ফিসফিস করে জানিয়ে দিলেন, "ওকে কিছু বলবার দরকার নেই। আমরা প্লেট থেকে যে ক'টা পেসট্রি তুলে খাবো, শুধু সেই ক'টার দাম নেবে।"

ব্যাপারটা আমার জানা ছিল না। আমার ভয় হয়েছিল, টেবিলে যখন দিয়েছে, খাই-না-খাই পুরো দামটা আমার কাছ থেকে আদায় করবে। মনের সন্দেহ না চেপে রেখে সরল মনে জিজ্ঞাসা করলাম, "ও কী করে বুঝবে, আমরা ক'টা খেলাম?"

সায়েব পরম স্নেহে বুঝিয়ে দিলেন, "বিয়োগ কষে। ওরা জানে ক'টা পেসট্রি টেবিলে দিয়েছে, বিল করবার সময় দেখবে ক'টা পড়ে আছে।"

চা খাওয়ার সময় অনেক গল্প হলো। সায়েব আবার গম্ভীর ভাবে বললেন, "আপনি যে সিনেমাটা দেখালেন চমৎকার। আপনার ছবির নির্বাচন খুব সুন্দর হয়েছে।"

এবার বিল এলো। চার টাকা চার আনার মতো বিল। একটা পাঁচ টাকার নোট দিলাম। বেয়ারা ভাঙানি ফেরত নিয়ে এলো। সায়েব চোখের ইঙ্গিতে আমাকে সমস্ত চেঞ্জটাই প্লেটে রেখে দিতে বললেন। বেয়ারা কিছুই বুঝলো না, ভাল টিপস পেয়ে আমাকে একটা লম্বা সেলাম দিলো। আমি বুক ফুলিয়ে গট গট করে অন্যসব কেষ্ট-বিষ্টু খদ্দেরের মতো দোকানের বাইরে এসে ডাকলাম, "ট্যাক্সি।"

এবার আর ভুল করিনি। সায়েবকে গাড়ির মধ্যে আগে ওঠবার জন্যে অনুরোধ করলাম।

আমাকে খুশী করবার জন্যই বোধ হয় সায়েব এবার আগে গাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

যখন আমরা ফিরলাম, ক্যালকাটা ক্লাবের বাতিগুলো তখন জ্বলে উঠেছে। গাড়ি থেকে নেমে, সায়েব বললেন, "আপনাকে কীভাবে ধন্যবাদ দেবো জানি না। আপনার এই আতিথেয়তা এবং দয়া আমার বহুদিন মনে থাকবে।"

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, "আনন্দটা আমারই। আপনার সান্নিধ্য খুব ভাল লেগেছে!"

সায়েব এবার আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, "বাঃ, চমৎকার উত্তর হয়েছে।"

ক্লাবের ফয়ারে দাঁড়িয়ে সায়েব বললেন, "আপনার যদি অন্য কোনো এনগেজমেন্ট না থাকে, তাহলে আজ আমাকে ডিনারে সঙ্গ দিন। আপনাকে কোনো নোটিস না দেওয়ার জন্য লজ্জিত—কিন্তু আমাদের দু'জনের মধ্যে যা সম্পর্ক তাতে এইভাবে ডিনারে নিমন্ত্রণের অধিকার আমার আছে।"

ডিনার পর্যন্ত থেকে গিয়েছিলাম সেদিন। ভারি ভাল লাগছিল। এ যেন নতুন ধরনের খেলা সারাদিন ধরে আমরা খেলছিলাম। কাসুন্দের একটা আধা-গ্রাম্য ছেলের মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য সায়েব কী পরম স্নেহে সারাদিন ব্যয় করেছিলেন, তখন বুঝিনি। কিন্তু আজ এতোদিন পরে বিদেশগামী প্লেনের সীটে বসে সমস্ত জিনিসটার কথা ভাবতে গিয়ে কেমন যেন গল্প গল্প মন হলো—চোখদুটো অকারণেই অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠছে। সংসারের মাঠে ঘাটে এতো অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পরও আমার এই দোষটা গেলো না। আমার হৃদয়ের ওপর কিছুতেই আবরণ টানতে পারি না—একটুতেই সেই বিরলকেশ সদাহাস্যময় বিদেশি মধুসূদনদাদার কথা মনে পড়ে যায়, যিনি আমাকে এই বিরাট পৃথিবীর জটিল জীবনে প্রবেশ করার সাহস ও সুযোগ দিয়েছিলেন।

সেদিন রাত্রে ডিনারের পরও বেশ কিছুক্ষণ ক্যালকাটা ক্লাবে থেকে গিয়েছিলাম। আমার মধ্যেকার সেই লাজুক, সদাসন্ত্রস্ত ও বিব্রত বালকটি হঠাৎ সাহসী হয়ে উঠেছিল। প্রাণ খুলে কত কথাই হচ্ছিল সায়েবের সঙ্গে। আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে আমি সামান্য একজন 'বাবু', আমার চামড়ার রং কালো, আর ইনি একজন ব্যারিস্টার এবং সাতসাগরের ওপার থেকে এসেছেন। মজার গল্প শোনাতে শোনাতে সায়েব হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলেন। বললেন, "মাই ডিয়ার বয়, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে আমার।"

কথা তো সারাদিনই হচ্ছে। আরও কী কথা থাকতে পারে? আমি একটু

অবাক হয়ে গেলাম।

সায়েব আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। "কিছু বলবো বলেই তোমাকে ধরে রেখেছি।"

সায়েবকে সাধারণত এমন গম্ভীরভাবে কথা বলতে দেখি না। আদালতে অবশ্য ওইরকমভাবে তিনি সওয়াল করেন। তাঁর এই রূপটা আমার ভাল লাগে না।

সায়েব এবার বললেন, "মাই ডিয়ার বয়, ক'দিন থেকেই তোমাকে বলে রাখবো ভাবছি। আমার বয়স হচ্ছে, আমি দেখে যাবো কিনা জানি না, কিন্তু তুমি নিজে কখনও ভুলো না, তুমি একজন অসাধারণ মানুষ—ইউ আর অ্যান এক্সেপশনাল পার্সন।"

পরমুহূর্তেই হাল্কা হয়ে গেলেন তিনি। তাঁর সমস্ত মুখে দুষ্টুমি ভরা ছেলেমানুষী হাসি ছড়িয়ে পড়লো। বললেন, "রাত অনেক হয়েছে, তোমাকে বাড়ি যেতে হবে। আমাকেও কাল মাদ্রাজে রওনা দিতে হবে কেসের জন্য। তার আগে ছেলেবেলায় দুষ্টুমির জন্যে যা করতাম তাই করা যাক। ইস্কুলে কোনো ছেলের কান মলবার ইচ্ছে হলে বলতাম, মাই ডিয়ার জন, তোমার এবং আমার মধ্যে যে কোনোরকম অপ্রীতি নেই তা প্রমাণ করবার জন্যে তোমার কানটা মলে দিচ্ছি।" এই বলে আমার কানটাই মলে দিলেন সায়েব "ইন অর্ডার টু প্রুভ দ্যাট দেয়ার ইজ নো ইল ফিলিং বিটুইন ইউ অ্যান্ড মি।"

সায়েব এবার ভিতরে চলে গেলেন। আর আমার মনে হলো আমার দেহে বিদ্যুতের প্রবাহ শুরু হলো। আমি যেন কোনো দুরারোগ্য ব্যাধিতে আচ্ছন্ন হয়ে এতোদিন সংজ্ঞাহীন ছিলাম, বিদ্যুতের মন্ত্রে কে আমাকে অকস্মাৎ জাগিয়ে তুলেছে। উত্তেজনায় আমার দেহের প্রতিটি লোমকূপ খাড়া হয়ে উঠলো।

পরমুহূর্তে ভীষণ লজ্জা বোধ হলো। মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার। মনে হলো বেয়ারা দেওয়ান সিং দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সায়েবের কথাটা শুনেছে—আমি এক্সেপশনাল, আমি অসাধারণ। আমার মনে হলো, দেওয়ান সিং অবজ্ঞায় হা-হা করে হাসছে। বলছে, 'ওই চলছেন অসাধারণ পুরুষ। ইনি থাকেন হাওড়ায়। বিদ্যে আই-এ পর্যন্ত, চাকরি করেন ব্যারিস্টারের বাবুদের বেঞ্চিতে!'

কিন্তু কোথায় দেওয়ান? সে তো এখানে নেই। তবু আমার ভীষণ অস্বস্তি লাগছে। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

আমি লুকিয়ে পালাতে চাই কিন্তু আমি ধরা পড়ে গিয়েছি। মনে হল, ক্লাবের রিসেপশন টেবিলের বাবুরা বোধহয় ব্যাপারটা জেনে ফেলেছেন। তাঁরা বলছেন, 'একজন বাবুকে কেউ রসিকতা করে অসাধারণ বলেছিল, আর সে কেমন

বেমালুম তা বিশ্বাস করে বসে আছে!' আমাকে দেখে ওঁরা চিৎকার করে বলছেন, 'ওই চলেছেন এক্সেপশনাল পার্সন!'

আমি কোনো কথায় কান না দিয়ে নিজের গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু গেটের নেপালী দারোয়ানটাও হাসছে।

গেট থেকে বেরিয়ে চৌরঙ্গী রোড ধরে আমি বেশ জোরে উত্তর দিকে হাঁটতে আরম্ভ করেছি। আমার মনে হলো রাজপথের প্রতিটা ল্যাম্প-পোস্ট আমাকে ব্যঙ্গ করছে, বৈদ্যুতিক ইশারায় হাসতে হাসতে বলছে, 'ওই চলেছেন অসাধারণ পুরুষ।'

আমি এখন কী করি? এদের কাছ থেকে আমি পালাতে চাই। নিজের অজান্তেই আমি দৌড়তে আরম্ভ করেছি। দৌড়তে দৌড়তে হাঁপাচ্ছি, আর করজোড়ে বলছি, "আমাকে আপনারা ব্যঙ্গ করবেন না। আমি কী করবো? আমি তো কিছুই জানি না। অনেক দূরের একজন বিদেশি সায়েব নিজে থেকেই আমাকে এইসব কথা বলেছেন।"

চৌরঙ্গী রোড ধরে দৌড়তে দৌড়তে থিয়েটার রোডের মোড়ে এসে আমি পশ্চিমদিকে ঘুরে পড়েছি। ওদিকে তখন বেশি আলো ছিল না। বিড়লা তারামণ্ডলের বাড়িও তখন তৈরি হয়নি। অনেক বড় বড় গাছ ছিল ওখানে। প্রায়ান্ধকারে বিরাট একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আমি যেন একটু স্বস্তি পেলাম। এবার গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে আমার দৃষ্টি হঠাৎ তারাভরা প্রসন্ন আকাশের দিকে প্রসারিত হলো। কী আশ্চর্য। সুদূর আকাশের তারারা আমার দিকে শান্তভাবে তাকিয়ে আছে—আমাকে মোটেই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করছে না।

প্রায় টলতে টলতে হাওড়াগামী বাসের পাদানিতে উঠে পড়েছিলাম।

বাড়িতে ফিরেও শান্তি পাই না। চোখে একবিন্দু ঘুম এলো না। গভীর রাতের অন্ধকারে সরু সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে এসেছিলাম। সুনীল আকাশের সোনালী তারারা আজ আমার সঙ্গে কথা বলছে। তারা আমাকে মোটেই ব্যঙ্গ করলো না, বরং স্নিগ্ধ ইশারায় আশা দিচ্ছে, ভরসা দিচ্ছে।

আকাশের দিকে একমনে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন যে ভোর হয়ে গিয়েছিল খেয়াল করিনি।

বিশ্বাস করুন, অবিস্মরণীয় সেই বিনিদ্র রাত্রে আমার মধ্যে নতুন এক আমি জন্মগ্রহণ করলো। বিশ্বাস করুন, যে-আমি সকালবেলায় চল্লিশ টাকা পকেটে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম, আর এই-আমি এক নয়। যে পারে সে এমনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে। এমনিভাবেই সে মানুষের মনের গহন অন্ধকারে গভীর ঘুমে অচেতন পৌরুষকে জাগাতে পারে। ঘুম-থেকে-ওঠা এই নতুন আমি

আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ। সে বলছে, "আমি চেষ্টা করবো। আমি নিজেকে অবশ্যই মধুসূদনদাদার বিশ্বাসের যোগ্য করে তুলবো।"

এমনই ভাগ্য, সায়েবের সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা। পরের দিন তিনি মাদ্রাজে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই অকস্মাৎ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমি আর কথা বলার সুযোগ পাইনি।

মাদ্রাজ থেকে পাঠানো দেওয়ান সিং-এর সেই সর্বনাশা টেলিগ্রামটা হাতের মুঠোয় ধরে ভাগ্যহীন আমি ভেবেছি, পৃথিবীতে আমার কেউ রইল না। আমি একা হয়ে গেলাম।

তারপর শোকের প্রথম তরঙ্গ যখন কেটে গেলো, তখন বিষণ্ন হৃদয়ে এই বিশাল কলকাতার বিরাট জনপ্রবাহের দিকে তাকিয়ে ভেবেছি এই দয়াহীন উদাসীন স্বার্থসর্বস্ব পৃথিবীতে অন্তত এমন একজন ছিলেন যিনি আমাকে ভালবেসেছিলেন— আমাকে বিশ্বাস করেছিলেন। যিনি ভেবেছিলেন আমি অসাধারণ—একজন অর্ধশিক্ষিত অসহায় দরিদ্র যুবকেরও পৃথিবীতে কিছু দেবার রয়েছে।

আমার যদি ক্ষমতা থাকতো, এই মানুষের মর্মর মূর্তি গড়িয়ে প্রশস্ত রাজপথের মোড়ে রেখে দিতাম। কিন্তু মূর্তি গড়া কি অত সোজা? তার জন্যে লক্ষ লক্ষ টাকা লাগে! সামান্য একটা তৈলচিত্র তৈরির আর্থিক সামর্থ্যও ছিল না আমার। বড় ইচ্ছা হতো ওঁর একটা বিরাট ছবি তৈরি করে পৃথিবীতে মানুষদের দেখাই। বলি, "আপনারা আমাকে যাই ভাবুন পৃথিবীর একজন আমার ওপর ভরসা রেখেছিলেন।" শহরের জননেতাদের সঙ্গে আমার জানাশোনা থাকলে সায়েবের নামে একটা রাস্তার নামকরণ করা যেতো। কলকাতায় কত রাস্তা রয়েছে তো। সাহস সঞ্চয় করে এক স্বদেশী নেতার কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমার কথা শুনে বকুনি লাগালেন, "তোমার লজ্জা করে না? জানো না ইন্ডিয়া স্বাধীন হয়েছে? স্বদেশী ভারতবর্ষে তুমি এসেছো ফরেন সায়েবের নামে রাস্তা করাতে?"

হতাশ হয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। সামান্য মানুষ আমি যতই বলি তিনি এক আশ্চর্য মানুষ ছিলেন, কেউ যে আমার কথা শুনতে চায় না। এখন আমি কী করি? আমাকে কিছু করতেই হবে। তিনি যে আমাকে বলে গিয়েছিলেন, নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ো না।

আর কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত একদিন লিখতে শুরু করেছিলাম। লেখা থাক, না হলে কোনো দিন হয়তো স্মৃতিও বিশ্বাসঘাতকতা করবে। অনেক অনেক দিন পরে যখন বৃদ্ধ হবো, তখন ছোট ছেলেদের ডেকে বলবো, "শোনো, গল্প শোনো। আমি যখন ছেলেমানুষ, তখন সাত সাগরের ওপার-থেকে-আসা এক অরুণ-বরুণ রাজপুত্রের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। মানুষকে তিনি ভালবাসতেন,

বিশ্বাস করতেন। একদিন রাত্রে তিনি আমার মধ্যে এমন কাউকে দেখেছিলেন যিনি আমার থেকে অনেক অনেক বড়।”

তার পরের কাহিনী পাঠকদের অজ্ঞাত নয়। একদিন পাকেচক্রে আমার সেই লেখা সাহিত্যিক গৌরকিশোর ঘোষের অনুগ্রহে দেশ পত্রিকায় সাগরময় ঘোষকে দেখাবার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেই লেখা যথাসময়ে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল—অবশেষে, ‘কত অজানারে’ বই।

এই পরিচ্ছেদ শেষ করার আগে ছোট একটা গল্প মনে পড়ছে। সায়েবই বলতেন, “শংকর, পরের জন্মে আমি বাংলাদেশের জামাই হবো।” তারপর আমার দিকে তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলতেন, “তুমি ভাবছো বাংলাদেশের মেয়েরা পদ্মলোচনা এবং গজেন্দ্রগামিনী বলে আমি এখানকার জামাই হতে চাই? মোটেই তা নয়। আমার নজর বাংলাদেশের শাশুড়িদের দিকে। বাঙালি শাশুড়িদের তুলনা পৃথিবীতে নেই। তাঁদের দয়ার শেষ নেই। নতুন জামাই শ্বশুরবাড়িতে এসে দশ টাকা দিয়ে নমস্কার করলে শাশুড়ি আশীর্বাদ করে কুড়ি টাকা ফেরত দেন। বিয়ের পর আমি ধার করে লক্ষ টাকা নিয়ে যাবো। সেই টাকার তোড়া নিয়ে নমস্কার করবো শাশুড়িকে। তারপর বড়লোক হয়ে বাকী জীবন সুখে শান্তিতে কাটিয়ে দেবো।”

তখন ভাবতাম, সায়েব রসিকতা করছেন। পরে বুঝেছি, মোটেই রসিকতা নয়। লেখার মাধ্যমে আমি তাঁকে অন্তরের শ্রদ্ধা জানাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু রাতারাতি আমিই অনেকের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠলাম। আমি নাকি সাহিত্যিক, সত্যদ্রষ্টা শিল্পী। যা তাঁকে করজোড়ে নতমস্তকে নিবেদন করেছিলাম, মরণ সাগরের ওপার থেকে তিনি তা দ্বিগুণ করে ফেরত দিলেন।

নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যে এখন নিজেকে মাঝে মাঝে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করে। তখন কেন তাঁকে মাত্র এক টাকা দিয়ে নমস্কার করেছিলাম? যদি তাঁকে লক্ষ টাকা দিয়ে নমস্কার করতাম—কষ্ট করে, চেষ্টা করে সাত সাগর পারের সেই আশ্চর্য রাজপুত্রের কথা যদি সত্যিই আরও ভাল করে লিখতাম, তা হলে আরও কত কী পেতাম কে জানে?

এডিথ, আমোদিনী ও পটলদা

বিলেতের মাটিতে পা দিয়ে প্রথম সুযোগেই যে বিদেশিনীর খোঁজখবর করবো ঠিক করেছিলাম তার নাম এডিথ। কিন্তু পটলদার কথা না বললে এডিথকে একটুও বোঝা যাবে না। তেহেরান বিমান বন্দরে আমাদের প্লেন অনেকক্ষণ

থেমেছিল। ওই সময় পটলদার ব্যাপারটা ডায়রিতে নোট করে নিয়েছিলাম।

পটলদা মানে শ্রীপটলকুমার হাজরা।

পটলদা কোনোদিন বিলেতে যাবেন এবং মেম বিয়ে করবেন স্বয়ং ভৃগুও যদি একথা পটলদার ছাত্রাবস্থায় ভবিষ্যদ্বাণী করতেন, তাহলে আমাদের ইস্কুলের সহপাঠীদের অর্ধেক হাসতে হাসতে মারা যেতো! ক্লাসের পিছিয়ে পড়া ছেলেদের অন্যতম পটলদার গাঁট্টাগোট্টা চেহারা ছাড়া আর কিছু মূলধন ছিল না। ইস্কুলে ইংরিজীর মাস্টারমশায় হরনাথবাবু বলতেন, "আমি কোন ছার! পঞ্চতন্ত্রের বিষ্ণুশর্মা এবং স্বয়ং নেসফিল্ড সায়েব দু'জনে একসঙ্গে চেষ্টা করলেও পটলকে ইংরিজী শেখাতে পারবেন না।"

সকলের সামনে এই ধরনের অপমানকর মন্তব্য শুনেও পটলদার কোনো লজ্জা হতো না, মাথাও নিচু করতেন না। বরং ঠোঁট টিপে হাসতেন। মাস্টারমশায় আরো রেগে উঠে বলতেন, "বেহায়া এখনও হাসছিস!" পটলদা তবুও একগাল হাসিতে মুখ ভরিয়ে রাখতেন।

পড়াশোনার লোকসানটা পটলদা দুষ্টুমিতে পুষিয়ে নিতেন। সে বিষয়ে তিনি বলতে গেলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। চুপচাপ দুমিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেন না পটলদা। সব সময় নিজের শক্তি পরীক্ষা করতেন হয় কোনো সহপাঠী ছাত্রের ওপর অথবা ইস্কুলের কোনো সম্পত্তির ওপর। মাংসপেশীর ক্ষমতা দেখাতে গিয়ে পটলদা একবার ইস্কুলবাড়ির বারান্দার দুখানা রেলিং উপড়ে ফেললেন। তখন পটলদা ক্লাস সেভেনের ছাত্র। আর বেঞ্চি? সে-প্রসঙ্গ না তোলাই ভাল। এ-বিষয়ে তাঁর সুনাম এমনই ছড়িয়ে পড়েছিল যে কোনো ক্লাসে ভাঙা বেঞ্চি বেরোলেই আমাদের গজু বেয়ারা প্রথমেই পটলদার নামে রিপোর্ট করতো।

অফিস ম্যানেজার সনাতনবাবু তখন পটলদাকে ডেকে বলতেন, "পটলা, ঠিক করে বল, ক্লাস ফাইভে গতকাল যে-দুখানা বেঞ্চির পা ভাঙা পাওয়া গিয়েছে সেটি কার কর্ম?"

পটলদা কিন্তু খুব সত্যবাদী ছিলেন। পিটুনি খাবার ভয়ে মিথ্যে কথা বলে বেরিয়ে আসতেন না। দোষ করে থাকলে স্বীকার করতেন। সনাতনবাবুকে বলতেন, "স্যার, একেবারে পল্কা কাঠ। কিল কমপিটিশনে ফার্স্ট হতে গিয়ে বেঞ্চিটা মট করে ভেঙে গেলো।"

"বেঞ্চির ওপর ছুরি দিয়ে ছবি এঁকেছে কে?" সনাতনবাবু জিজ্ঞেস করতেন।

না, ওই কাজটা পটলদা একদম করতেন না। দেওয়ালে পেন্সিলের দাগ কাটা, ছুরি দিয়ে বেঞ্চিতে নাম খোদাই করা, ওসব ছিঁচকে নোংরামির মধ্যে পটলদা কখনো থাকতেন না। তবে ঝেঁকি নন্দীর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে গিয়ে বেচারার হাতটাই ভেঙে দিয়েছিলেন পটলদা। ঝেঁকি নন্দী পরের দিন প্লাস্টার-করা হাত

নিয়ে ইস্কুলে এসেছিল। যথারীতি শাস্তি দেবার আগে হেডমাস্টারমশায় বলেছিলেন, "পটল, তোমাকে যে শেষপর্যন্ত পুলিশের হাতে যেতে হবে।"

পটলদা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর লজ্জা পেয়ে সেই বিখ্যাত হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেললেন, যার নাম দেওয়া হয়েছিল পটল-হাসি। অর্থাৎ এই হাসির মালিক অনুতপ্ত, না উদ্ধতভাবে অপরাধের পুনরাবৃত্তির ফন্দি আঁটছে তা মুখ দেখে মোটেই বোঝা যাচ্ছে না। হেড মাস্টারমশায় আড়ালে বলতেন, "পটলাকে বেত মেরেই বা লাভ কী? ও নড়েও না, চড়েও না, কাঁদেও না, যন্ত্রণায় মুখও বেঁকায় না। ওর অপমানজ্ঞানও নেই।"

আর পুলিশের ভয়? সে দেখিয়ে লাভ নেই। বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সময় পটলদার বীরত্ব আমরা নিজের চোখে দেখেছি। ডালমিয়া পার্কে ছাত্রদের মিটিং হচ্ছিল। আমরাও গিয়েছিলাম ইংরেজকে ভারতছাড়া করতে। এমন সময় পুলিস এসে পড়লো। তখন প্রাণ বাঁচাতে যে যেদিকে পারলো দৌড় মারলো। জনতা ছত্রভঙ্গ। কিন্তু পটলদা তখনও দাঁড়িয়ে আছেন। ভয় পেয়ে লেজ তুলে দৌড়নো তাঁর কোষ্ঠিতে নেই।

দুপুরবেলাতেই খবর রটে গেলো পটলদা গ্রেপ্তার। সেই সঙ্গে আমাদের ক্লাসের দ্বিজপদ বেচারাও পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছে।

পরের দিন পটলদার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আমরা ধর্মঘট করবো ভাবছি। ওমা! পটলদা ঠিক সময়ে গম্ভীরমুখে ইস্কুলে এসে হাজির। আমরা আশঙ্কা করলাম, পটলদা হয়তো পুলিসের কাছে ক্ষমা চেয়ে খালাস পেয়েছে। পটলদাকে জিজ্ঞেস করতে গম্ভীরভাবে বললেন, "মোটেই না। ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। হেড কনস্টেবল রামলক্ষ্মণ সিং নাক কান মলেছে যে পটল হাজরাকে আর কোনোদিন অ্যারেস্ট করবে না।"

ব্যাপারটা যে মিথ্যে নয় তা দ্বিজপদর কাছেই জানা গেল। সে বললো, "আমাদের লক-আপে তো পুরলো। কিন্তু একটু পরেই পটলদা দাবি করলো দুপুরের খাওয়া কই? বাড়ি থেকে না-খেয়ে বেরিয়েছি। পুলিস ওই সময় ভাতটাত কোথায় পাবে? সিপাই কিছু কচুরি এনে দিলেন। ঘণ্টাখানেক পরে পটলদা আবার ডাকাডাকি শুরু করলো—সিপাইজী বহুৎ খিদে পাতা হ্যায়। ছোট ছেলে দেখে সিপাইজী আবার কোথা থেকে খাবার নিয়ে এলেন। পটলদার খাবার পছন্দ নয়—বললেন, বোঁদে কই? এই সময় বোঁদে না খেলে শরীর খারাপ করে আমার। এরপর পটলদা অন্য ছেলেদের নিয়ে জেলখানার মধ্যে স্লোগান তুলেছিলেন : বোঁদে না খেয়ে মাথা গরম।"

সিপাইজী ভাবলেন, স্বদেশীরা বন্দেমাতরম্ আওয়াজ তুলছে। ছুটে গিয়ে দারোগাবাবুকে ডেকে নিয়ে এলেন। পটলদা তাঁকে বললেন, "না স্যার, আমরা

আওয়াজ তুলেছি, বোঁদে-না-খেয়ে-মাথা-গরম। বিশ্বাস না হয় আবার স্লোগান তুলছি, আপনি শুনুন।" সন্ধে সাতটা পর্যন্ত পটলদার খাওয়ার দাবিতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে দারোগাবাবু ওদের সবাইকে ছেড়ে দিলেন। মুখ বেঁকিয়ে ভদ্রলোক বলেছিলেন, "এইরকম কিছু বিশ্বপেটুক হাজতে থাকলে আমাকে পাগল হয়ে যেতে হবে!"

এই পটলদা শেষপর্যন্ত ফেল করে আমার সহপাঠী হয়ে গেলেন। বছরের প্রথম দিনেই স্কুলে এসে বেশ মুশকিলে পড়ে গেলাম। উঁচু ক্লাসে পড়ার জন্যে ওঁকে এতোদিন 'দাদা' এবং 'আপনি' বলে এসেছি। অনেক ছেলে নির্দয়ভাবে প্রথম সুযোগেই ওঁকে পটল বলে ডাকতে শুরু করে দিলো। আমার সঙ্কোচ হচ্ছিল। পটলদাই আমাকে আড়ালে ডেকে বললেন, "তুই কেন দাদা বলিস? তুই নিয়মিত পাশ করে, আর আমি নিয়মিত ফেল করে সমান হয়ে গেছি। এখন আমার দম্ভ থাকা উচিত নয়। আমাকে নাম ধরে ডাকবি।"

কেন জানি না, আমার বড্ড মায়া হয়েছিল। সুযোগটা নিতে পারিনি। পটলদা নিশ্চয় এটা লক্ষ্য করেছিলেন। কেননা আমাকে ওরই মধ্যে একটু বেশী ভালবাসতেন, কখনও ইয়ারকি করে গাঁট্টা মারেননি বা পেটের চামড়া টেনে ধরেননি—শেষোক্ত প্রক্রিয়াটির নাম ছিল মধুখামচি!

পটলদার মামার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়েছে। আমাদের বাড়ির খুব কাছেই রাস্তার ধারে বাসনপত্তর মেরামতির এবং ঝালাইয়ের দোকান ছিল তাঁর। পটলদার মামা বাজারের থলিটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিয়ে, আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, "পটল হাজরা কেমন পড়াশোন করছে গো?"

আমি কী বলবো? চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মামা বললেন, "ওর মায়ের জন্য ভগবান আরও কত দুঃখ তুলে রেখেছেন কে জানে? এক বছরের এই ছেলেকে নিয়ে দিদি বিধবা হলো। বাড়িতে দেখবারও কেউ নেই। অথচ ছেলেটার মানুষ হবার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।"

পটলদা থাকতেন চৌধুরী বাগানে আমাদের বাড়ির খুব কাছাকাছি নবকুমার নন্দী সেকেন্ড বাই লেন। কালীবাবুর বাজারের পিছনে হাওড়ার এই অঞ্চলটা প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের একবার দেখে আসা উচিত। আণবিক যুগের সুসভ্য ভারতে আমরা এখনও কী রকম নরক জিইয়ে রেখেছি তা নিজের চোখে না দেখলে অনেকে হয়তো বিশ্বাস করবেন না।

পটলদার মার সঙ্গেও পরিচয় হয়েছে আমার। মামা বলেছিলেন, "যেও না একবার আমার বাড়িতে। দিদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো।"

জটপাকানো সুতোর মতো সরু গলির মধ্যে দিয়ে পাক খেতে খেতে বাগেদের মাঠের কাছে এসেছি। সেখানে বিরাট এক খোলা নর্দমা। তার ওপর বাঁশের

সাঁকোটাও নড়বড় করছে। সেইটা পেরিয়ে গেলেই রাস্তার ওপর পর পর তিনখানা খাটা-পায়খানার পিছন-দরজা নজরে পড়বে। সেগুলো ছাড়িয়ে কয়েক হাত এগোলেই একটা ছোট্ট কিন্তু বেজায় পুরোনো একতলা বাড়ি দেখা যায়। প্রায় পড়ো-পড়ো। এখানেই থাকেন পটলদা। বাড়ির পিছনেই উঠোন। উঠোনের ওপরে একই ধরনের আর একটা বাড়ি। সেখানে মামা থাকেন।

নর্দমার ধারে উবু হয়ে মামা বিড়ি খাচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে দিদির জন্যে হাঁক পাড়লেন। ভাই-এর ডাকে এদিকে আসতে গিয়েই অজানা পুরুষমানুষ দেখে দ্রুত ঘোমটা দিলেন। মামা বললেন, "ওকে দেখে ঘোমটা দিতে হবে না। পটলার সঙ্গে পড়ে—ওদের ফার্স্ট বয়।"

আমি লজ্জায় পড়ে গেলুম। জানালুম আমি মোটে ফার্স্ট বয় নই, আমার ওপরে তিন-চার জন ছাত্র আছে। পটলদার মামা বিড়িটা নামিয়ে বললেন, "ওই হলো। গুড বয়।"

দিদির সামনে মামা বললেন, "পটলার কোনো লজ্জা-শরম নেই। উইডোর অনলি চাইল্ড, কোথায় তুই মায়ের দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করবি, তা না ড্যাংগুলি খেলে বেড়াচ্ছিস। আমি তো শ্লা বিধবার একমাত্র ছেলে হলে ইস্কুলের বই থেকে চোখ তুলতাম না।"

পটলদার মা শান্তভাবে এবং বেশ বিশ্বাসের সঙ্গে ঘোমটার আড়াল থেকে ভাইকে বললেন, "সামনের মাসেই তো তের বছর শেষ হচ্ছে—এবার হবে। ওই ছেলেই সংসারের মুখ রাখবে।"

বিড়িতে আর একটা লম্বা টান দিয়ে মামা বললেন, "তোকে আর কী বলবো দিদি। কম বয়সে উইডো হয়েছিস, বাবা বারবার বলে গিয়েছেন— আমোদিনীর মনে কখনও কষ্ট দিস না। তবু তোকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, আজকাল সবকিছুতেই ভেজাল। ওই যে তোর ছেলের কোষ্ঠি করিয়ে গিয়েছেন বাবা, ওতেও ভেজাল। তের বছরেও যে-ছেলের কিসসু হলো না, সে-কী করে চোদ্দতে পড়ে আশু মুখুজ্জে বনে যাবে?"

আমাকে আবার আসতে বলে আমোদিনী দেবী এবার ভিতরে চলে গেলেন।

আর মামা একটা বিড়ি ধরিয়ে বললেন, "পড়াশোনা চুলোয় যাক, পটলাকে শেষ পর্যন্ত আমার ওই রাঙঝালের দোকানেই ঢুকতে হবে। তা শোনো," এই বলে মামা বিড়িতে আর একটা লম্বা টান দিলেন। তারপর অনুরোধ করলেন, "পটলা পড়াশোনায় যাই হোক, ওর ক্যারাকটারের দিকে তোমরা নজর রেখো।"

আমার বয়স কম, ক্যারাকটার কাকে বলে তখন জানতাম না। তাই ফ্যালফ্যাল করে মামার মুখের দিকে তাকালাম। মামা বিরক্ত হয়ে বললেন,

"এতোদিন শুধু লেখাপড়া সম্বন্ধে ভেবে এসেছো। এবার ক্যারাকটার সম্বন্ধে সাবধান হবার বয়স হয়েছে তোমারও। বিড়ি খাওয়া, রাস্তায় সমত্থ মেয়েছেলের দিকে তাকিয়ে থাকা, টিটকিরি করা এইসব হলো ব্যাড ক্যারাকটারের লক্ষণ।"

আমি একেবারে তাজ্জব! কারণ মনটা তখনও বয়সের অনুপাতে একটু কাঁচাই ছিল। মামা বলেছিলেন, "আমি শ্লা ইস্কুল লাইফ থেকে বিড়ি-সিগারেট খাচ্ছি—কিন্তু আমার বাপের তখন টুপাইস ছিল। পটলার বাপ তো হাঁড়ির হাল করে গিয়েছে। মায়ের বাপ না থাকলে পটলাকে তো দরজায় দরজায় ভিক্ষে করতে হতো।" দাদুই যে দয়া করে মাথা গোঁজবার মতো দুখানা ঘর পটলদার মাকে দিয়ে গিয়েছিলেন সে-কথাও মামার কাছে শুনেছিলাম।

কিন্তু পড়াশোনায় পটলদার কোনো উৎসাহ নেই। ইংরিজীটা ক্রমশই বেচারার আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। মাস্টারমশায় ক্লাসে বলতেন, "পটল, কোনো সায়েব তোর ইংরিজী শুনলে এখনই ঘেন্নায় ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাবে! বানান, গ্রামার, ইডিয়ম, টেন্স কিছুই তোর মাথায় ঢুকলো না।"

পটলদা সেই আগেকার মতো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকতেন আর ফিকফিক করে হাসতেন। কেউ কেউ পটলদার হাসিকে অবজ্ঞার নিদর্শন বলে ভুল করতেন। কিন্তু আসলে পটলদা ওই হাসি দিয়েই নিজের অপমান এবং কান্নাকে দূরে সরিয়ে রাখতেন।

আমাদের ইস্কুলে তখন প্রবল আদর্শবাদ। ছেলেরা যাতে মানুষ হয়, সমাজের সেরা হয় সেদিকে মাস্টারমশায়দের চেষ্টার অন্ত ছিল না। ছাত্ররাও অনেক কিছু জানতো। তারা জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতা পছন্দ করতো না, দরিদ্রের মধ্যে নারায়ণ আছেন বিশ্বাস করতো, পড়াশোনায় ভাল ফল দেখিয়ে দেশের এবং দশের কাজে লাগবার জন্যে তারা উদ্‌গ্রীব ছিল। ছাত্রদের মধ্যে ভবিষ্যতে কারা কারা সমাজের গর্ব হবে তা আমরা ছোটবেলা থেকেই আন্দাজ করতাম। কিন্তু আমাদের সেই তালিকায় পটলদার নাম ছিল না।

সেই পটলদা শেষ পর্যন্ত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ম্যাট্রিক পাস করলেন। নগেনবাবু স্যার বলেছিলেন, "তাজমহলটা ছিল পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য ; আর পটলের পাস করাটা হলো নবম আশ্চর্য। ভাগ্যে ইংরেজ দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।" স্বাধীনতার পরেই প্রথম যে ছাত্রদল ম্যাট্রিক পাস করে পটলদা ও আমি তার মধ্যে ছিলাম।

পটলদা আবার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বিনা প্রতিবাদে হেসেছে এবং মাস্টারমশায়ের পায়ের ধুলো নিয়েছে।

সেই পটলদার মধ্যেও উচ্চাশার বীজ লুকিয়ে ছিল। পৃথিবীর দুটো লোকের তখনও তাঁর সম্বন্ধে ভরসা নষ্ট হয়নি। একজন পটলদার মা আমোদিনী দেবী আর আরেকজন পটলদা স্বয়ং। মামার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তিনি দুঃখ

করে বলেছেন, "কী বলবো তোমায়। উচ্চশিক্ষা তোমাদের মতো ছেলেদের জন্যে, পটলার জন্যে নয়। কিন্তু ওর মা পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে রয়েছে। যেহেতু স্বামী মরবার সময় বউ-এর হাত ধরে বলেছিল, পটলাকে দেখো, ওকে খুব ভাল করে লেখাপড়া শিখিয়ে বিলেত পাঠিও, সেহেতু তিনি এখনও স্বপ্ন দেখছে।"

পটলদাও যে গোপনে গোপনে বিলেত যাবার স্বপ্ন দেখেন এ খবর ইস্কুলে প্রচারিত হলে ছেলেদের মধ্যে কী রকম প্রতিক্রিয়া হতো ভেবে আমি আঁতকে উঠেছিলাম। মামা দুঃখ করে বললেন, "বাবা নিষেধ করে গিয়েছেন তাই, নাহলে বোনকে ছ্যাড় ছ্যাড় করে শুনিয়ে দিতাম। বলতুম, জামাইদার অতই যদি ছেলেকে বিলেত পাঠাবার শখ ছিল, তাহলে বউকে বাপের বাড়ি ফেলে বাঁশতলা ঘাটে গেলেন কেন?"

পটলদার সঙ্গে মাঝে-মাঝে আমার দেখা হয়েছে। ওসব কথা তুলে তাঁকে আমি অবশ্য লজ্জা দিইনি। বাড়িতে পটলদা বড্ড আদুরে। মা নিজে না-খেয়েও পটলদার জন্য ভালমন্দ খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। আজকাল গহনা বেচে ছেলেকে নিয়মিত দুধ খাওয়াচ্ছেন। কোথায় ভদ্রমহিলা শুনেছেন, দুধ খেলে ছেলেদের মাথা খোলে। পটলদা নিজেও বলেছেন, "মা এখন দুঃখ করেন, ইস্কুলে পড়ার সময় পটলের দুধ বন্ধ ছিল। সুতরাং ছেলের মাথায় কী করে ইংরিজী ঢুকবে?"

মামা আমাকে বলেছেন, "মা-বেটার কাণ্ডকারখানা দেখি আর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ি। আমার ছেলে হলে ব্যাকে রানিং কিক্ দিতুম। তারপর কান ধরে বাড়ি থেকে বার করে এনে দোকানে বসিয়ে দিতুম। বলতুম, লেখাপড়ায় খুব কেরামতি দেখিয়েছিস, এবার ছেঁড়া গেঞ্জি আর হাফ প্যান্ট পরে ফুটো ডালডার কৌটোয় রাঙঝাল লাগা।"

আমি কিছু বলিনি। মামার কাছেই শুনলাম, এই বুড়োধাড়ি গোঁফদাড়ি গজানো পটল নিজের মায়ের কাছে কচি ছেলের বেহদ্দ ব্যবহার করে। রাত্রে মায়ের কাছে ছাড়া শোবে না, মা পিঠে হাত বুলিয়ে দেবেন তবে ঘুম আসবে। কলেজ যাবার সময় মাকে পেন্নাম করবে, মা আবার আদর করে চুমু খাবেন।

মামা বলেন, "জানো, রাগ হয় খুবই। বিধবার শিবরাত্রির সলতের মতো একটা ছেলে, যা বোঝে করুক। দিদির জন্যই দুঃখ আমার—ছেলের মুখ চেয়ে পড়ে আছে, মানুষের মতো মানুষ হয়ে মায়ের চোখের জল মোছাবে।"

পটলদাও নাকি মাকে ভরসা দিতেন। বলতেন, "ইস্কুলে যতোই খারাপ করে থাকি, দেখো এবার মেক-আপ করে নেবো।" পটলদার মা তাই বিশ্বাস করেন, কারণ ছেলের কোষ্ঠিতে ওইরকম লেখা আছে।

পটলদা ইনজিনীয়ার হবার স্বপ্ন দেখছেন। কিন্তু ওই তো রেজাল্ট। ওই তো

ইংরিজী জ্ঞান! হাওড়ার বাসে মাঝে মাঝে পটলদার সঙ্গে দেখা হয়েছে, সেট-স্কোয়ার হাতে পটলদা কোথায় চলেছেন। বৌবাজারের কাছে কি এক বেসরকারী কারিগরী ইস্কুল আছে। সেখানে মোটা টাকা খরচ করে পটলদা ঢুকেছেন। পটলদার মামা আমার কাছে দুঃখ করেছেন, "মা ও ছেলে দুজনেই ভেসে যাচ্ছে। গয়না বেচে কেউ ওইসব জোচ্চোর ইস্কুলে অত টাকা ঘুষ দিয়ে ঢোকে? আর তাও যদি পাস করতে পারতিস। ছেলেটাই দিদির শনি—কলসীর জল গড়িয়ে গড়িয়ে শেষ করে এনেছে পটলা। গয়না-গাঁটিও গেলো, এবার দিদি পথে বসবে।"

পটলদা কিন্তু মুখে সেই আত্মভোলা হাসি ফুটিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়ান।

এই পটলদাই একদিন হাওড়া থেকে উধাও হলেন। আমাদের ক্লাসের একজন ছেলে খবর দিলো, "শুনেছিস, পটলা বিলেত গিয়েছে—ফর হায়ার এডুকেশন।'

পটলদার মামার দোকানে খোঁজখবর নিয়েছি। একটা ফুটো টিনের কৌটো মেরামত করতে করতে মামা বললেন, "আমাকে আর ওসব খবর জিজ্ঞেস কোরো না। যাবার আগে বাড়িটাও বন্ধক দিয়ে গিয়েছে। কি আর বলব বলো? দিদির দোষ কম নয়—ছেলেকে একবারও বারণ করলো না!"

পটলদার মায়ের সঙ্গেও আমার একটু-আধটু সংযোগ ছিল। অত্যন্ত লাজুক মহিলা। ছেলের বন্ধুদের সামনেও ঘোমটার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে ব্যস্ত—মুখে কোনো কথা নেই। আমোদিনী দেবী বোধ হয় ভাবলেন অন্য সবার মতো আমিও আবার পটলদার বিলেত ভ্রমণের সমালোচনা করে দেখাবো যে পটল একটি আস্ত গাধা। কিন্তু আমি ওসবের মধ্যে কেন যাবো? পটলদার জন্য সব সময় আমার দুঃখ হতো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়।" আমোদিনী দেবীর বিষণ্ণ মুখে আশার আলো ফুটে উঠলো। বললেন, "ক'টা মাস আর? তারপর তো খোকা ফিরে আসবে। মায়ের যে আর কেউ নেই সে-কথা খোকা বোঝে।"

কয়েক মাস কেন, কয়েক বছরের মধ্যে পটলদার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন হলো না। পটলদার মামা দুঃখের সঙ্গে আমার কাছে খবর নিয়েছেন, "পটলা তোমার কাছে চিঠিপত্তর লেখে নাকি? যদি কখনও চিঠি পাও দিদিকে একটু খবর দিয়ে এসো। দিদি বেচারা দিনরাত চোখের জল ফেলে আর ডাকপিওনের জন্যে অপেক্ষা করে দরজার গোড়ায় বসে থাকে। চিঠি এলে সেটা অন্তত দেড়শ দু'শ বার পড়ে।"

আমার চিন্তা, ইংরেজীর সীমিত বিদ্যা নিয়ে খোদ ইংরেজদের দেশে পটলদা

কীভাবে কাজকর্ম চালাচ্ছেন? তিনি ওখানে করছেনই বা কী? পটলদার মামা বলেছেন, "ওসব কথা আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না। চিঠিতে বিশেষ কোনো খবর থাকে না। নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিও,' ইত্যাদি। কিন্তু নিজের যত্ন মা কোথা থেকে নেবে? বন্ধকী পাকা বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেলো। দিদি এখন ছোট্ট টিনের ঘরে থাকে। বিধবা মানুষ এমনিই তো অর্ধেক দিন উপোস, বাকি ক'টা দিনের খাবারও যে কী ভাবে জুটছে ভগবান জানেন।"

আরও বছর খানেক পরে শুনেছি পটলদা কিছু কিছু টাকা মাকে পাঠাচ্ছেন। মামাও স্বীকার করেছেন, "দিদির দুঃখ বোধ হয় এবার ঘুচলো—ছেলে প্রতি মাসেই এম-ও পাঠাচ্ছে। প্রথম বারের পুরো টাকাটাই তো দিদি সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়িতে পুজো দিয়ে এলো। ছেলের মঙ্গলের জন্যে প্রতি মাসে দিদি এখন বাড়িতেও পুরুত আনিয়ে পুজো করাচ্ছে। প্রতি শনিবারে একজন বাউনের পা ধুয়ে সেবা করছে, যাতে ছেলে রাজা হয়ে ফিরে আসে।"

আমাদের ইস্কুলের সুরজিতের চিঠি থেকে পটলদার আরও খবরাখবর পাওয়া গেলো। চাটার্ড অ্যাকাউনটেন্সি পড়তে সুরজিত বিলেত যাচ্ছিল। হেটমাস্টারমশায় বলেছিলেন, 'আমাদের ইস্কুলের পটলও বিলেতে আছে। কোন অসুবিধে হলে ওর খবর করো।' সুরজিত আমাকে চিঠি লিখেছিল, 'সে এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। পটলদা চিঠি পেয়ে নিজে জাহাজঘাটে হাজির ছিলেন। সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। অজানা দেশ, সায়েবদের ইংরিজী বুঝতে পারি না, এমন অবস্থায় পটলদা উদ্ধার না করলে মুশকিলে পড়ে যেতাম।' হেটমাস্টারমশায়কেও পটলদা প্রণাম জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন—'স্যর আপনার নির্দেশ মতো সুরজিতের সব ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আমি যতক্ষণ এখানে আছি ততক্ষণ সুরজিতের জন্যে চিন্তা করবেন না।'

এরপর ইস্কুল মহলে কেমন জানাজানি হয়ে গিয়েছে যে বিলেতে পৌঁছতে পারলে কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নেই, স্বয়ং পটলদা ওখানে রয়েছেন। কাজে-অকাজে যারাই বিলেতে পাড়ি দিয়েছে তারাই হেটমাস্টারমশাই কিংবা পটলদার মার কাছ থেকে চিঠি নিয়েছে : 'অমুক লন্ডন যাইতেছে। ফরেন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নাই, তাহার উপর বিদেশি মুদ্রার অভাব। সুতরাং যতটা পারো দেখিও।'

সাধ্যের অতীত দেখাশোনা করতেন পটলদা। বিলেতফেরত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে হঠাৎ আমার পরিচয় হলো। পটল হাজরাকে আমি জানি শুনে ভদ্রলোক বললেন, "সে-এক পিকুলিয়র লোক মশাই। দুনিয়ার যত বাঙালি ছোকরা তাকে জ্বালিয়ে খাচ্ছে। প্রায়ই শোনা যায়, আজ এয়ারপোর্টে, কাল রেল স্টেশনে, পরশু জাহাজঘাটে মিস্টার হাজরা যাচ্ছেন নতুন কোনো দেশোয়ালীকে নামাতে। আমরা তো মিস্টার হাজরাকে বলতাম, আপনি মশাই ট্রাভেল এজেনসির

ব্যবসায় নামুন। কাস্টমস থেকে লোক ছাড়ানো, অজানা লোকের ঘর ভাড়ার ব্যবস্থা করা, ছেলে-ছোকরাদের জামিনদার হওয়া এসব আপনার যেরকম সড়গড় হয়েছে, ব্যবসা খুবই ভাল চলবে।"

ভদ্রলোকের মুখেই শুনলাম, বন্ধুবান্ধবদের এইসব সমালোচনার কোনো উত্তর পটলদা দেন না, শুধু হাসেন। নিতান্ত চাপ দিলে বলেন, "মায়ের চিঠি নিয়ে আসে, বুঝতেই পারছেন।" বন্ধুরা বলেছে, "মাকে খবর দেবেন অত চিঠি না লিখতে। হাজার হোক আপনারও চাকরি আছে, সন্ধেবেলায় পড়াশোনা আছে।" পটলদা বলেছেন, "যাই বলুন, বিদেশে প্রথম পা দিয়ে একটা চেনা-জানা লোক পেলে খুব আনন্দ হয়।"

আর একজন প্রত্যক্ষদর্শী মারফত পটলদা সম্পর্কে আরও খবরাখবর পেয়েছি। ভদ্রলোক বলেছেন, "মিস্টার পটল হাজরা খুব আদর্শবাদী লোক। আপনাদের ইস্কুল সম্পর্কে অন্ধ ভক্তি। ইস্কুলের প্রত্যেকটি মাস্টারকে ভদ্রলোক যেভাবে শ্রদ্ধা করেন তা এযুগে বিরল। ছাত্রাবস্থায় নিশ্চয় খুব ভালবাসা পেয়েছেন, না-হলে তো পরবর্তী জীবনে এতো শ্রদ্ধা থাকে না।" আমি চুপচাপ শুনে গিয়েছি, কোনো মন্তব্য করিনি।

এইসময় আমার জানাশোনা রমেনবাবু একবার দেখা করতে এসেছিলেন। ভদ্রলোকের মন মেজাজ খুব খারাপ—জামাইকে নিজের খরচে উচ্চশিক্ষার জন্যে বিলেত পাঠিয়েছিলেন, এখন বিশেষ খোঁজখবর পাচ্ছেন না। ছোকরা নতুন কোনো নেশায় পড়েছে নিশ্চয়, নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত চিঠি-পত্তর তেমন লেখে না। সঙ্গে সঙ্গে পটলদার কথা মনে পড়ে গেলো। বললাম, "আমোদিনী দেবীর কাছে চলে যান, উনি একটা চিঠি লিখলে, পটলবাবু আপনাকে সাহায্য করতে পারেন।"

তারপর অনেকদিন খোঁজখবর ছিল না। রমেনবাবু নিজেই একদিন দেখা করতে এলেন। দুটো হাত ধরে জানালেন, "আপনার বন্ধু পটলবাবু আমাদের কী উপকার যে করলেন, সে ভাষায় বোঝাতে পারবো না। জামাই-এর কাছে মেয়েকে যে ফেরত পাঠাতে পারলাম সে একমাত্র ওঁর জন্যেই। ভদ্রলোক আমার জামাই-এর পিছনে তিন মাস ডিটেকটিভের মতো লেগেছিলেন। ছোকরাকে বুঝিয়েছেন, আড়ালে ছোকরার বালিকা বান্ধবীদের সাবধান করে দিয়েছেন, তারপর আমাকে খবর দিয়েছেন, মেয়েকে এখনই পাঠিয়ে দিন। কোন চিন্তা করবেন না, জামাই যদি কোনো গোলমাল বাধায় তাহলে আমি রইলাম।"

রমেনবাবুর মেয়ে লিখেছে : "বিলেতের বাঙালি মহলে পটলদার মতো ছেলে বিরল। মুখে বড় বড় কথা বলেন না। কিন্তু কাজে এবং চিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দের মস্ত ভক্ত। সিগারেট খান না, মদ খান না, মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি

করেন না, শুধু নিজের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের চাকরি এবং পরীক্ষার পড়াশোনা নিয়ে আছেন। ভদ্রলোক প্রতি সপ্তাহে মাকে চিঠি লেখেন। মাকে এমন ভালবাসতেও আজকাল দেখা যায় না!"

রমেনবাবুর মেয়ে এখন স্বামীর সঙ্গে সুখে ঘরসংসার করছে। পটলদার কথা সে আবার লিখেছে : "দেশ থেকে নতুন-আসা ছেলেরা পটলদাকে বড় বিরক্ত করে। পটলদার মা বোধ হয় অন্নপূর্ণার মতো চিঠি বিলিয়ে যাচ্ছেন—যে আসে তারই সঙ্গে মায়ের চিঠি থাকে। পটলদা বেচারা এইসব ছেলের জন্যে বাড়ি খুঁজতে, সপ্তাহখানেক খাওয়াতে পরাতে, লন্ডন ঘুরিয়ে দেখাতে হিমসিম খেয়ে যান। টাকারও শ্রাদ্ধ হয়। এতো বছর হয়ে গেলো পটলদা একবারও দেশে বেড়াতে যাননি। কিন্তু যাবেন কী করে? টাকা তো বাঁচাতে পারেন না।"

এই পটলদাই শেষ পর্যন্ত বিলেতে মেমসায়েব বিয়ে করে বসলেন। মা আশা করেছিলেন, ছেলে লেখাপড়া শিখে এবার দেশে ফিরে কোনো চাকরিবাকরি করবে। কিন্তু...

খবরটা শুনে আমাদের বন্ধুবান্ধব মহলে হাসাহাসি হয়েছে। কেউ বলেছে, "এতো লোক থাকতে শেষপর্যন্ত পটল হাজরা মেম বিয়ে করে বিলেতে থাকবে, এ-কথা আমাদের ইস্কুলে কেউ কি কল্পনা করতে পারতো? তাছাড়া বিলেতে দশ বছর আদর্শ সাধুসন্তের জীবনযাপন করে এবং অনেক বাঙালি ছোকরার মেম বিয়েতে বাধা দিয়ে পটলদা নিজেই শেষ পর্যন্ত এই কাজ করে বসলেন তাও অবিশ্বাস্য।

এই সব কথা যখন কানে আসছে, সেই সময় আবার বিদেশে যাবার সুযোগ এলো। কোথায় ইন্ডিয়া আর কোথায় আমেরিকা—একলাফে সেখানে হাজির হতে হলে শরীর এবং মনের ওপর যথেষ্ট ধকল হয়। তাই ভাবছিলাম, পথে ইংলন্ডে ব্রেক জার্নি করবো। সেই খবর শুনে আমাদের হেডমাস্টারমশায় বললেন, "যদি পারো বিলেতে পটলের সঙ্গে দেখা কোরো।"

জননী জন্মভূমির নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করে বিদেশের মাটিতে প্রথমে পা দিয়েই যে-অভিজ্ঞতা হলো তা মোটেই প্রীতিপ্রদ নয়। হিথরো বিমানবন্দরে ব্রিটিশ সিংহের সেবক সায়েবটি আমার পাসপোর্টে সারনাথের তিনটি সিংহকে দেখেই অবহেলাভরে ছাড়পত্রটি পাশে সরিয়ে রাখলেন। আমার পেছনে যে সব ভাগ্যবান অস্ট্রেলিয়ান এবং জাপানী ছিলেন তাঁরা এগিয়ে গেলেন।

ইস্কুলে লাস্ট বয়ের মতো আমাকে ডেকে সায়েবটি এবার প্রশ্ন করলেন, "তাহলে ইণ্ডিয়া থেকে আসা হচ্ছে? তা মহাশয় হঠাৎ ইংলন্ডে কেন?"

রাগে আপাদমস্তক জ্বলে উঠলেও জানালুম, চলেছি আটলানটিকের ওপারে

মার্কিন দেশে। পথে এই ভাঙা যাত্রা। সঙ্গে এরোপ্লেনের পাকা টিকিট, যথেষ্ট ডলার এবং ভারতস্থ ব্রিটিশ দূতের অনুমতিপত্র রয়েছে। কাগজপত্তর সমস্ত খুঁটিয়ে দেখেও বিশেষ সন্তুষ্ট হতে পারলেন না ইংরাজনন্দন। মন্তব্য করলেন, তাঁদের ভারতস্থ প্রতিনিধির এই প্রবেশপত্র দেওয়া ঠিক হয়নি। বললুম, "এই অপরাধে আপনাদের নিজস্ব প্রতিনিধিকে অবিলম্বে বরখাস্ত করবেন কি না, তা আপনারা ভেবে দেখুন। তবে বিদেশীদের সঙ্গে এইভাবে কথা বলা হয় জানলে আমি অবশ্যই এই দেশে পদার্পণ করতাম না।"

বিমানবন্দরে আমার অভিজ্ঞতার কথা শুনে কয়েকজন লন্ডন-প্রবাসী বন্ধু বলেছিলেন, "স্বভাবভদ্র ইংরেজ সাধারণ বিদেশীদের সঙ্গে ভালই ব্যবহার করেন—ব্যতিক্রম কেবল ভারতীয়দের বেলায়। কারণ এ-দেশে তারা যথেষ্ট বদনাম কিনেছে। যে আসে সে যেতে চায় না, আসবার পদ্ধতিটাও সব সময় আইনসঙ্গত নয়। সুতরাং সারনাথের তিনটি সিংহকে পাসপোর্টের ওপর একত্রিত দেখলেই দ্বীপপুঞ্জের দ্বাররক্ষী সন্দিহান হয়ে ওঠেন এবং প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করেন।"

বিদেশে পৃথিবীর বৃহত্তম ডেমক্র্যাসির যে এমন একটা ভাবমূর্তি থাকতে পারে তা আমার কল্পনাতীত ছিল। সত্যি কথা বলতে কি বিদেশে আসবার প্রথম আনন্দটুকুই নষ্ট হয়ে গেলো। এরপর লন্ডনের হোটেলে ভারতীয় বলেই চাপা অবহেলা অনুভব করেছি : রাতের অন্ধকারে আমার বাদামী রংয়ের বাঙালি চামড়া রাজপথে অহেতুক বিপদ ডেকে আনতে পারে এমন সাবধান বাণী শুনেছি। রাগে ফেটে পড়বার ইচ্ছে হয়েছে, পরমুহূর্তেই মনকে বুঝিয়েছি রাগ দেখালে এই সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠবে। আমাদের মনে রাখতে হবে কয়েক লক্ষ ভারতীয় এই দ্বীপপুঞ্জে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছেন।

ভাবলুম, হাজার হোক পুরনো মনিব—এদের পক্ষে সাম্রাজ্য হারানোর দুঃখ মাত্র বিশ পঁচিশ বছরে ভোলা সম্ভব নয়।

বিরক্ত মেজাজ একটু ঠাণ্ডা হওয়ার পর পটলদার খোঁজ করলাম। ফোন পাবার আধ ঘণ্টার মধ্যে পটলদা গাড়ি ড্রাইভ করে আমার হোটেলে হাজির হলেন। বললেন, "কোনো কথা শুনছি না, চল্ আমার সঙ্গে।"

চৌধুরীবাগানের পটলদা লন্ডনের রাস্তায় যেরকম হুড়হুড় করে ইংরিজী বলে যাচ্ছেন তা দেখে আমি তাজ্জব। ছাত্রাবস্থায় নেসফিল্ডের গ্রামার আমি নিষ্ঠার সঙ্গে কণ্ঠস্থ করেছিলাম। একজন উচ্চশিক্ষিত ভদ্র ইংরেজের সান্নিধ্যেও কিছুদিন কাটিয়েছি। তবু খোদ লন্ডনের সায়েবসুবোদের অর্ধেক কথা বুঝতে পারছি না। কিন্তু লক্ষ্য করলুম পটলদার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হচ্ছে না। অনর্গল কি সুন্দর ইংরিজী বলছেন। পটলদা আমাকে সমস্ত লন্ডন শহর ঘুরিয়ে দেখালেন, তারপর

বাড়িতে নিয়ে যাবার পথে বললেন, "চল। এডিথের সঙ্গে আলাপ করে খুশী হবি তুই। ও তোর মতোই পড়াশোনা নিয়ে থাকে, ইন্ডিয়া সম্বন্ধে খুব আগ্রহ।"

আমি চুপচাপ কথা শুনে যাচ্ছি। পটলদা নিজেই বললেন, "হ্যাঁরে আমি মেম বিয়ে করেছি বলে দেশে নাকি খুব সমালোচনা হয়েছে? লোকে বলেছে, বিধমা মা ওখানে একলা পড়ে রইলো, আর ছেলে বিলেতে মেমসায়েব নিয়ে ফূর্তি করছে।"

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "দেশের লোক অনেকরকম কথা বলে, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী পটলদা?"

"হাজার হোক দেশ তো?" পটলদা দুঃখের সঙ্গে বললেন। তারপর নিজেই মন্তব্য করলেন, "তুই তো জানিস কেন দেশ ছেড়ে পালিয়ে এলাম। মায়ের গয়নাগাঁটি সব শেষ করে দিয়ে যখন চোখে অন্ধকার দেখছিলাম, তখন ঠিক করলাম, মায়ের মুখ রক্ষের জন্যে শেষ চেষ্টা করা যাক। বাড়িটা বন্ধক রেখে সেই টাকা নিয়ে বিলেতে পালিয়ে এসেছিলাম। এখানেও কি কম কষ্ট পেয়েছি? পড়াশোনায় তো ভাল ছিলাম না, তাই ডবল পরিশ্রম করতে হয়েছে। শেষে কারখানার চাকরিতে ঢুকেছি। দিনে চাকরি, রাতে পড়াশোনা করে, মাকে দুটো ক'টা পাঠিয়ে, কোনোদিনই কিছু জমাতে পারিনি। মায়ের মান রক্ষে করবার মতো বিদ্যে না হওয়া পর্যন্ত হাওড়ায় মুখ দেখাবো না পণ করেছিলাম। ঠাকুরের আশীর্বাদে এতোদিনে সেরকম বিদ্যে হয়েছে।"

পটলদা জানালেন, "এর মধ্যে বিয়ে-থা করবার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। বারোটা বছর তো কেটে গিয়েছে। শেষে হঠাৎ একদিন লাইব্রেরিতে এডিথের সঙ্গে আলাপ হলো। এডিথ পড়াশোনার পোকা। আমি পরীক্ষায় পাশ করবার জন্যে বাধ্য হয়ে লাইব্রেরিতে বই পড়ি।"

এডিথ বড় শান্ত। পটলদার সঙ্গে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সে কথাবার্তা বলেছে। পটলদা সরল মানুষ। অন্য অনেক বাঙালি ছোকরার মতো এডিথকে নিজের বংশ সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলেননি। বরং জানিয়েছেন নিজের দুঃখিনী মায়ের কথা। নিজের সাধ্যের অতিরিক্ত স্বপ্ন দেখার বিপদের কথা। এডিথ কিন্তু সে সব জেনে পিছিয়ে যায়নি। এটাই পশ্চিমী মেয়েদের প্রশংসনীয় দিক। আমাদের দেশের মেয়েদের তুলনায় ওরা অনেক বেশী স্বাধীন। নিরাপত্তা আর অর্থকৌলিন্যের লোভে জীবনসঙ্গী পছন্দের স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে তারা মোটেই রাজী নয়। পটলদাকে এডিথ বলেছে, "আমি পারিবারিক মর্যাদা নিয়ে মাথা ঘামাই না। আমিও কিন্তু লর্ড ফ্যামিলির মেয়ে নই। তবে ইন্ডিয়া সম্বন্ধে আমি অনেক শুনেছি। আমার গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার ইন্ডিয়াতে ছিলেন—ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে তিনি চাকরি করতেন। আমাদের বাড়িতে জামালপুর ওয়ার্কশপের একটা ছবি

আছে—আমার দাদামশায়ের বাবা নিজের স্মৃতি থেকে এঁকেছিলেন।”

পটলদা বুঝতে পেরেছেন তিনি ক্রমশ প্রেমের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ছেন। ঠিক যে ইচ্ছে করে তা নয়, আবার ইচ্ছের বিরুদ্ধে একথাও বলা যায় না। পটলদার খেয়াল হচ্ছে, তাঁরও বয়স চল্লিশের কাছে এসে পড়েছে এবং বিদেশ ছেড়ে স্বদেশে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা তেমন নেই। এডিথকে পটলদা সোজাসুজি বলেছেন, “আমি যে এ-দেশে চিরকাল থাকবো, তার কোনো কথা নেই। বরং প্রথম সুযোগেই আমি চৌধুরীবাগানে ফিরে যেতে চাই।” সেই সব কথা শুনে এডিথ কিন্তু পিছিয়ে যায়নি। বরং পটলদার বাড়ির লোকের খবরাখবর নিয়েছে। বলেছে, ‘ইন্ডিয়া তো সুন্দর জায়গা—আমার দাদামশায়ের বাবা তো সেখানেই সারাজীবন কাটিয়েছেন।”

পটলদা আমাকে বললেন, “লুকিয়ে আমি কখনও কিছু করিনি। এডিথের সঙ্গে যে মিশেছি সে-কথা মাকে লিখেছিলাম।”

পটলদার মা সে-খবর পেয়ে কী করেছিলেন আমার জানবার লোভ হলো। পটলদা বললেন, “তুই হয়তো বিশ্বাস করবি না, কিন্তু পরের চিঠিতেই মা আমাকে অনুমতি দিয়েছিলেন এবং আশীর্বাদ জানিয়ে লিখেছিলেন, তোমার বাবার স্মৃতির অসম্মান হয় এমন কিছু যে তুমি করবে না তা আমি জানি।”

একটু থেমে পটলদা বললেন, “অনুমতিটা মা প্রাণ থেকে দিয়েছিলেন, না উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ করেছিলেন তা তুই বলতে পারবি। মাকে তো আমি অনেকদিন দেখিনি।”

লন্ডনের শহরতলিতে একটা ছোট্ট বাড়িতে এডিথের সঙ্গে আমার দেখা হলো। ভদ্রমহিলা আন্তরিকতার সঙ্গে আমার অভ্যর্থনা করলেন। বললেন, “তোমাদের যদি বাংলায় গল্প করতে ইচ্ছে করে, চালিয়ে যাও। আমার জন্যে লজ্জা পেও না।’

এডিথকে আমি বললাম, “বিনা নোটিশে হুট করে অতিথি আনা পটলদার উচিত নয়।”

এডিথ একমত হলো না। বললো, “সব সমাজের লোককে পশ্চিমের অনুকরণ করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আমি বইতে পড়েছি, যৌথ পরিবারের কালচার এখনও তোমাদের দেশে প্রবল, সুতরাং সেখানে অতিথিসংক্রান্ত নিয়ম-কানুন আলাদা হবেই।”

পটলদা বললেন, “এডিথ আমাকে ইন্ডিয়ানদের মতো থাকতে উৎসাহ দেয়। মার নাম করে কেউ এসে হাজির হলে মোটেই রাগ করে না। আমরা দুজনেই চাকরি করি, সুতরাং কোনো অতিথি বাড়িতে থাকলে বেশ অসুবিধে ; কিন্তু তবুও এডিথ আপত্তি করে না।”

সেদিন তো এক অচেনা ছোকরা বললো, "আপনার মায়ের খবর জানি আমি। ইচ্ছে করলেই তাঁর কাছ থেকে চিঠি আনতে পারতাম ; কিন্তু তাড়াতাড়িতে হয়ে ওঠেনি।" পটলদাকে তিনদিন ভুগিয়ে কিছু পাউন্ড আদায় করে সে বিদায় হয়েছে। পটলদা মাকে লিখতে যাচ্ছিলেন, "অনেকে তোমার নাম করে আমাদের ভোগায়। তুমি যাকে পাঠাচ্ছ তার হাতে অন্তত একটুকরো চিঠি পাঠিও, তাহলে সুবিধে হয়।" এডিথ কিন্তু লিখতে দেয়নি। বলেছে, "পনেরো বছর ধরে যা চলছে, এখনও তা চলবে। আমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বলে কিছু পাল্টে যাক তা আমি চাই না।"

ওখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে, হোটেলে ফিরবার পথে পটলদা বলেছেন, "এডিথ জানে মার জন্যে আমার বিশেষ দুর্বলতা আছে। তাই সেখানে কোনোরকম হাত দেয় না। বরং প্রতি সপ্তাহে আমাকে চিঠি লেখার কথা মনে করিয়ে দেয় ; মার কাছে টাকা পাঠালাম কিনা খোঁজ করে। ওর খুব ইচ্ছে, মা এখানে চলে আসেন। আমি লিখেছি—কিন্তু মা কোনো জবাব দেন না।"

আমোদিনী দেবীর ছবিটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। একবর্ণ ইংরিজী জানেন না, দুলাইন বাংলা লিখতেও কষ্ট হয়। মাছ-মাংস স্পর্শ করেন না, একবেলা ভাত খান। প্রতিদিনই পুজো রয়েছে—ঠাকুরের সেবাযত্ন করতে করতেই সময় কেটে যায়। সেই মানুষ হাওড়া ছেড়ে এই ইংলন্ডে এসে কতখানি মানিয়ে নিতে পারবেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকতে পারে। তার ওপর বিদেশিনী বউ।

পটলদা বললেন, "সব তো নিজের চোখে দেখে গেলি, মাকে রিপোর্ট দিস।"

"আপনি নিজে একবার দেশ ঘুরে আসবেন না?" আমি জিজ্ঞেস করেছি।

পটলদা গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, "আমার কী আর যেতে সাধ হয় না? প্রথম দিকে পয়সার জন্যে সম্ভব হয়নি। তারপর পয়সা যদি যোগাড় করা যেতো, কারখানার ছুটি নেই। পরীক্ষা দিতে দিতেই ছুটি ফুরিয়ে যেতো—আর তাছাড়া প্রতিজ্ঞা করেছিলাম মায়ের মুখ রক্ষে করার মতো বিদ্যে না নিয়ে দেশে যাবো না।"

"সেরকম বিদ্যে তো এখন হয়েছে," আমি মনে করিয়ে দিয়েছি পটলদাকে।

পটলদা বলেছেন, "হ্যাঁ। তাছাড়া নতুন যে চাকরিটা নিয়েছি তাতে মাসখানেক ছুটি পাওয়া শক্ত নয়। ভাবছি মাকে এবার বৌমা দেখিয়ে আনবো। এডিথ নিজেও আমাকে জ্বালাচ্ছে। বলছে, তোমাদের দেশে যখন নিয়ম পুত্রবধূকে মায়ের আশীর্বাদ নিতে হয়, তখন দেরি করছো কেন?"

পটলদার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের পালা চুকিয়ে আমি বার্মিংহামে গিয়েছি। সেখানকার রাজপথেই একদিন কেমন করে আমি পূর্ব-পাকিস্তানীদের প্রেমে পড়ি তা বিস্তারিতভাবে 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' বইতে লিখেছি। লন্ডনে

ফিরে এসে আরও দু'দিন পটলদা ও এডিথের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে আমি একদিনের জন্যে ফরাসিদেশে পাড়ি দিয়েছি। সস্ত্রীক পটলদা আমাকে হিথরো বিমানবন্দরে বিদায় জানাতে এসেছিলেন।

ইংলন্ডে ভারতীয়দের যে-অবস্থাই হোক, ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার জন্মভূমি ফরাসিদেশে ভারতীয়রা যথাযোগ্য সম্মান পাবে এমন একটা আশা মনের মধ্যে ছিল, প্যারিসের নতরদাম চার্চের কাছে এক বৃদ্ধ ফরাসি আমার বাদামী চেহারার দিকে তাকিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি ছড়িয়ে দিলেন। অপরিচিত বিদেশির কাছে অবশেষে স্বতঃপ্রণোদিত ভালবাসা পেয়েছি এ আনন্দে বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে যেতেই তিনি আমাকে একগোছা নিষিদ্ধ 'প্যারিস পিকচার' গছাবার চেষ্টা করলেন। বিব্রত আমি গম্ভীর হয়ে তাঁর প্রস্তাব না শোনার ভান করলাম। ফরাসি পিতামহ ভাঙা ভাঙা ইংরিজীতে আমাকে লোভ দেখালেন "বিউটিফুল নেকেড্ লেডিজ"। এবার ঈষৎ বিরক্তভাবে জানিয়ে দিলুম, বর্তমানে আমি শুধু নতরদাম গীর্জা দেখতে আগ্রহী। বৃদ্ধ বিক্রেতা সঙ্গে সঙ্গে চটে উঠলেন, "তুমি নিশ্চয় ইন্ডিয়ান। উলঙ্গ মেয়েদের ছবি দেখার টনটনে ইচ্ছে আছে, কিন্তু পকেটে পয়সা নেই।"

এখানেও রোষ সংবরণ করতে হলো। একজন প্রবাসী ভারতীয় বললেন, বৃদ্ধ ফরাসি বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকেই ভারতীয়দের সম্বন্ধে এই ধারণা করেছেন।

স্বদেশ সম্বন্ধে বিদেশে কীরকম ধারণা রয়েছে তার নমুনা পেয়ে মনটা বেশ বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল। প্যারিস থেকে সোজা আটলান্টিক পেরিয়ে লক্ষ্যস্থল আমেরিকায় চললাম। কিন্তু আমার মার্কিনি অধ্যায় শুরুর আগে পটলদা পর্বটা শেষ করে ফেলাই ভাল।

পৃথিবী প্রদক্ষিণ শেষ করে হাওড়ায় ফিরে আমি পটলদার মা আমোদিনী দেবীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। পায়ের ধুলো নিয়ে খবর দিয়েছি, "আপনার ছেলে এবং বউ বেশ ভাল আছে। বৌমাটি খুবই শান্ত এবং লক্ষ্মীমন্ত হয়েছে।"

পটলদার মা হাঁ না কিছুই উত্তর দিলেন না। মামা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভাগ্নে সম্পর্কে এখন তাঁর মতামত পাল্টাচ্ছে—হাজার হোক বিলেতে ভাল চাকরি করে, তার ওপর মেমসায়েব বউ। মামার মন্তব্য, "দিশি বউদের হালচাল তো দেখছি। ফুলশয্যার রাত্তির থেকে শাশুড়িকে হেনস্থা করবার ফন্দি আঁটছে। সেদিক দিয়ে মেমরা অত কুচক্রী হবে না। ওদের পেটে এক মুখে আর এক হবে না।"

বিনা প্রতিবাদেই এসব কথা শুনলেন আমোদিনী দেবী, কিন্তু তাঁর নিজস্ব মতামত কিছুই বোঝা গেল না। শুধু বললেন, "পটলকে যত্ন করে খেতেটেতে দেয় তো?"

"পটল তো দূরের কথা, আপনার বউমা আমাকেই এতো খাওয়ালো যে প্রাণ আইঢাই করছিল", আমি জানালাম।

অনেকদিন পরে আমোদিনী দেবীকে দেখলাম। ভগবানের আশীর্বাদে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। মামা বললেন, "তোর আর কি দিদি। কম বয়সটায় কষ্ট পেয়েছিস। জামাইবাবুর অসুখ। তারপর উইডো হলি—সবাই ভাবলো ছেলেটা মানুষ হলো না। তা ভগবান এখন তোর দিকে তাকিয়েছেন। ইচ্ছে করলে এককথায় বিলেত পর্যন্ত যেতে পারিস—এ-পাড়ায় কোন মেয়েছেলের সে সুযোগ আছে বল? এখন তো তোরই দিন।"

আমোদিনী দেবী এ-বারেও কোনো উত্তর দিলেন না। পাড়াতে গিন্নীমহলেও এখন পটলদার মায়ের প্রতিপত্তি বেড়েছে। যে মায়ের ছেলে বিলেতে থাকে, বিলাতি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে যাঁর নামে প্রতি মাসে টাকা আসে, তাঁর সামাজিক প্রেস্টিজ অনেক উঁচু। যাঁরা একদিন আমোদিনী দেবীর নামে মুখ বেঁকাতো তারাই এখন তাঁকে হিংসে করছে। আমোদিনী দেবীকে আমি বললাম, "পটলদা এবং আপনার বৌমার খুব ইচ্ছে আপনি বিলেত যান। ঘুরে আসুন না একবার, পছন্দ না হলে ফিরে আসবেন।"

আমোদিনী কোনো উত্তর দিলেন না। মামা ফিসফিস করে বললেন, "বাবার খুব আদুরে মেয়ে ছিল তো। তখন থেকেই অভিমানিনী। নিজে যা-খুশী তাই করবে— কারও কথা শুনবে না।"

কিছুদিন পরেই খবর পেলাম সস্ত্রীক পটলদা স্বদেশ ভ্রমণে আসছেন। মামার খুব আনন্দ এবং আগ্রহ। খবরটা রটতেই পাড়ায় তাঁর প্রেস্টিজ বেড়েছে। হাফ প্যান্ট পরে ডাঁটের মাথায় আজকাল রাঙঝালের দোকানে কাজ করেন। আন্তর্জাতিক কোনো কথা উঠলে মামার মতামত পাড়ার লোকেরা এবং দোকানদাররা মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। বলে, "বেশি বাক্‌তাল্লা মারিস না। তোদের তো খবরের কাগজ-পড়া বিদ্যে, আর নগেনদার নিজের ভাগ্নে বিলেতে থাকে।"

নতুন যারা পাড়ায় এসেছে তারা অবাক হয়ে যায়। অনেকে বিশ্বাস করতে চায় না। মামা তাদের দিকে অবহেলা ভরে তাকিয়ে থাকেন। অন্য লোকরা বলে, "কোথায় খাপ খুলছো? ইংরেজের সঙ্গে কুটুম্বিতে রয়েছে দাদার। বেয়াই-বেয়ান সব তো সায়েব।" মামার সগর্ব গাম্ভীর্য লোককে বুঝিয়ে দেয় কথাগুলো মিথ্যে নয়।

পটলদার আসন্ন ভ্রমণ সম্পর্কে খবরটা রটবার পর ন্যাপা দাস জানতে চাইলো, "ওরে নগেন, তোর মেমসায়েব ভাগ্নী-বৌ এলে করবি কী?"

বিড়িতে টান দিয়ে বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মামা উত্তর দিয়েছেন, "আমার

তো সায়েবদের সঙ্গে ইংরিজী বলার অভ্যাস রয়েছে। বার্ন কোম্পানির ফেটিস সায়েবদের কাছে একবার চাকরির জন্য ইনটারভিউ দিয়েছিলাম। চাকরি পাইনি বটে, কিন্তু শ্লা সায়েবের সঙ্গে পাঁচ মিনিট হুড় হুড় করে ইংরিজীটা প্র্যাকটিশ করে নিয়েছিলাম। মুশকিল আমার দিদির। বাবার আদর পেয়ে ফার্স্টবুকটা পর্যন্ত শেষ করেনি। এখন আমাকেই হেপা সামলাতে হবে। দিদিকে বার বার বলছি, দু'চারটে ইংরিজী কথা অভ্যেস কর, কিন্তু দিদির সময় হচ্ছে না!"

মামা ইতিমধ্যেই কারণে-অকারণে ইংরিজী শব্দ ব্যবহার শুরু করেছেন। সে সব অপপ্রয়োগ নিয়ে আবার অনেকে মুখ টিপে হাসাহাসি করছে। মামা হাপর দিয়ে হাওয়া করতে করতে দোকানের কর্মচারী ভজা এবং চাঁদুকে বলেছেন, "খাস সায়েবরা ব্লাডি কথাটা খুব ব্যবহার করে, বুঝলি। ফেটিস সায়েবের সঙ্গে আমার পাঁচ মিনিট কথা হয়েছিল। তার মধ্যেই দশ-এগারোবার ব্লাডি কথাটা বলেছিলেন। আর আমাদের বাঙালিবাবুদের ইংরিজী শোনো, যেন মিওনো পাঁপড়। বোতল থেকে সোডা ঢালার মতো সায়েবদের ইংরিজী বক বক বেরিয়ে আসে—তাতে কত তেজ থাকে!"

নগেন চোংদার আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এলেন। বললেন, "বৌমা তো আসছেন, কিন্তু কোথায় রাখা হবে? আমরা কী হোটেল ভাড়া করবো?"

"হোটেলে কি থাকতে চাইবে?" আমি সন্দেহ প্রকাশ করি। "তাছাড়া ইংরেজদের রাখবার মতো হোটেল এ অঞ্চলে কোথায়?" আমি বুদ্ধি দিলাম, "বরং বড় রাস্তার ওপর একটা ছোটখাট পাকা বাড়ি যদি পেয়ে যান তাই ভাড়া করে রাখুন।"

কিন্তু পরে খবর পেলুম ঘর ভাড়া হয়নি। পটলদার মতামত চেয়ে মামা চিঠি লিখেছিলেন, তিনি বউ-এর পরামর্শ নিয়েছিলেন এবং এডিথ সোজা জানিয়ে দিয়েছে, "তুমি যে-বাড়িতে জন্মেছো এবং বড় হয়েছো, যেখানে তোমার মা রয়েছেন আমি সেখানেই থাকবো।"

পটলদাও আমাকে লিখেছেন, "হাওড়ায় হাজির হবার জন্যে এডিথের ভীষণ আগ্রহ। আমি বোঝাচ্ছি—জায়গাটা নোংরা, বাড়ি ঘরদোর পুরোনো। কিন্তু সে ওসব মানতে চাইছে না। বলছে, তোমার মাকে আনন্দ দেওয়াটাই আমার সবচেয়ে বড় কাজ।"

পটলদার মার প্রতিপত্তি খুব বেড়ে গিয়েছে। মামা আগে মাঝে মাঝে দিদির সমালোচনা করতেন, এখন কিছু বলেন না। বাড়িতে সাজ সাজ রব উঠেছে। ঘরের ভিতর মামার নিজস্ব খাটখানা ভাগ্নে এবং বউ-এর জন্যে রাখা হয়েছে। নিজের স্ত্রী এবং ছেলেদের মামা ঘন ঘন উপদেশ দিচ্ছেন, কখন কী করতে হবে।

দুটি গোপন ব্যাপারে মামা আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছেন। একটি

বংশের নারায়ণ সম্পর্কে। হাজার হোক সাহেবরা গোরু খায়—সুতরাং ঠাকুরঘরে ঢুকতে দিলে পাড়ায় কথা উঠবে। ইতিমধ্যেই দু'চারজন বৃদ্ধ এ-বিষয়ে খোঁজখবর করতে এসেছেন। মামা ঠিক করেছেন, নারায়ণকে চিলেকোঠার ঘরে চালান করে তালা দিয়ে রাখবেন। তার বদলে কালীঘাট থেকে ঠাকুর-দেবতার ছবি কয়েকটা কিনে এনে ঠাকুরঘরে রাখবেন, তাহলে নতুন বউমা কিছু বুঝতে পারবেন না। আমি বললাম, "ভাল ব্যবস্থা।" দ্বিতীয় সমস্যাটি আরও গোপনীয়। টয়লেট পেপার সংক্রান্ত। সে সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত আলোচনা না করাই সঙ্গত।

এর পরবর্তী অধ্যায় আমি নানা সূত্র থেকে, এমনকি পটলদার কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি।

এডিথ বিলেত থেকে বেরুবার আগে কয়েকমাস ধরে বাঙালিদের সমাজ-জীবন সম্পর্কে অনেক পড়াশোনা করেছে। শাশুড়ি এবং পুত্রবধূর সম্পর্ক সম্বন্ধে অনেক খোঁজ-খবর করেছে। এডিথ ঠিক করেছে, স্বামীর মাকে সে অবাক করে দেবে। এমনকি আব্দার করেছে, এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ি পর্যন্ত সে খালি পায়ে যাবে, যেমনভাবে নববধূরা প্রথম শ্বশুরবাড়িতে আসে।

পটলদা খুব উৎসাহ দেখাননি। বলেছেন, "ওখানে মানুষের জীবন বড় কষ্টের। রাস্তায় তোমার পা কেটে যেতে পারে।" এডিথ কথা কানে তোলেনি, বলেছে, "কষ্টকে আমি অত ভয় পাই না। সবরকম কষ্ট আমি সহ্য করতে পারি।" পনেরো বছর আগেকার চৌধুরীবাগান এবং সেখানকার অবস্থা পটলদার চোখে সামনে ভেসে উঠেছে। তবে আশা করেছেন, এতোদিনে নিশ্চয় অনেক উন্নতি হয়েছে; এডিথ অতটা খারাপ অবস্থা দেখবে না।

এডিথ পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করা শিখেছে। বাঙালি পরিবারে গিয়ে মাথায় সিঁদুর পরা অভ্যাস করেছে। বলেছে, কলকাতা এয়ারপোর্টে নেমেই আমাকে একজোড়া শাঁখা কিনে দেবে। শাড়ি তো এখান থেকেই নিয়ে যাচ্ছি। বিব্রত বোধ করেছেন পটলদা। কিন্তু এডিথ এটাকে নতুন ধরনের অ্যাডভেঞ্চারের মতো নিয়েছে—সে স্বামীকে এবং তার মাকে অবাক করে দিতে চায়।

এডিথ জিজ্ঞেস করেছে, "অন্য দেশের মেয়ে বিয়ে করলে, তোমাদের দেশের মায়েরা কষ্ট পান কেন?" পটলদা কোনো উত্তর দিতে পারেননি।

পটলদার চোখের সামনে বিধবা মায়ের বিষণ্ণ ছবিটা ভেসে উঠেছে। পনেরো বছর পরে আবার দেখা হবে। এতোদিনে মায়ের কত না পরিবর্তন হয়েছে। মায়ের প্রতি স্বামীর দুর্বলতার কথা এডিথের অজানা নয়—এর জন্যে এডিথ রাগ করে না, বরং পটলদাকে শ্রদ্ধা করে। পটলদা সে সম্বন্ধে মাথা ঘামান না, তবে নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে করেন। মায়ের জন্যে যা তাঁর করা উচিত

ছিল তা যে পারেননি বা করেননি, সেটা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মায়ের একমাত্র সন্তান না হলেই যেন ভাল হতো, মনে হয় পটলদার।

ভারতবর্ষের দারিদ্র্য এবং কলকাতা শহরের অপরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে এডিথ শুনেছে। কিন্তু এর ভয়াবহতা সম্পর্কে বেচারার স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। দমদম থেকে বেরিয়ে হাওড়ায় আসতে আসতেই বেচারা ক্রমশ সিঁটকে উঠছিল। যেন ঘড়ির কাঁটা ধরে সময়ের উল্টো দিকে হাঁটতে হাঁটতে সে কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে এসেছে। বিরাট বিরাট খোলা নর্দমা দেখে এডিথ চমকে উঠেছিল। প্রথমে ভেবেছিল ভেনিসের মতো খাল, কিন্তু বুঝতে পেরে আঁতকে উঠেছিল। পৃথিবীতে এখনও যে এমন নর্দমা থাকতে পারে তা তার কল্পনাতীত।

পটলদার আশা ভঙ্গ হচ্ছে। সেই যে তিনি চলে গিয়েছিলেন, তারপর এই পনেরো বছর ধরে এদেশের কেউ বোধ হয় একবারও বাড়িতে রঙ লাগায়নি, এমনকি দরজা-জানলার ধুলো ঝাড়েনি। পটলদার মনে হলো, এর জন্য দারিদ্র্যকে পুরোপুরি দায়ী করা যায় না। কারণ এইসব নোংরা বাড়ি থেকে দুর্গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে রেডিওর আওয়াজ ভেসে আসছে। রাস্তার জঞ্জাল সাফ করবার জন্যে তো বিদেশি মুদ্রার দরকার হয় না। বেকার লোকেরও তো অভাব নেই।

নিজেদের বাড়ির কাছাকাছি এসে পটলদাকে ট্যাক্সি ছেড়ে দিতে হলো। এবার হাঁটার পালা, কারণ সরু গলিতে ঢোকবার উপায় নেই। খালি পায়ে বাড়িতে যাবার পরিকল্পনা ছেড়ে দিতে স্ত্রীকে অনুরোধ করলেন পটলদা। এডিথও রাস্তার অবস্থা দেখে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলো।

এডিথ এতক্ষণ অবাক হয়ে দেখছিল, এবার সে ভয় পেতে আরম্ভ করেছে। বিরাট নর্দমার ধারে বসে ছোট ছেলেরা প্রাকৃতিক আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে। তার পাশেই দুটো তিনটে ঘেয়ো কুকুর গা চুলকোচ্ছে। বাড়িগুলোর পাঁজরা বার করা দেওয়ালের বালি খসে পড়ে বীভৎস নোনাধরা ইটগুলো দেখা যাচ্ছে। অদূরেই মোষের খাটাল। সেখানে গোয়ালারা মশা তাড়াবার জন্যে ভিজে খড়ের ধোঁয়া দিচ্ছে। খাটা পায়খানার পিছন-দরজা খোলা রয়েছে। সেখানে মাছি ভনভন করছে।

পটলদা বুঝতে পেরেছেন, এডিথ চাইলেও বেচারাকে এখানে নিয়ে আসা উচিত হয়নি। কিন্তু এডিথ তখনও মুখে সাহস দেখাচ্ছে।

পাড়ায় ইতিমধ্যে খবরটা প্রচারিত হয়েছে। গোটা পঞ্চাশেক ছেলে এবং বউ তখন পটলের মায়ের বউকে দেখবার জন্যে বিদেশিনীর পেছনে পেছনে চলতে আরম্ভ করেছে। ভয় পেয়েছিল এডিথ—কিন্তু পটলদা সাহস দিলেন, "কোনো ভয় নেই, এরা নতুন বউ এলে এভাবেই কৌতূহল দেখায়।" "তোমাদের দেশে বউরা তো মুখ দেখায় না," এডিথ জিজ্ঞেস করেছে। পটলদা বললেন, "পর্দার দেশেও নববধূর আব্রু নেই, সবাই তাকে দেখতে পারে।"

কাদা প্যাচপেচে এবড়ো-খেবড়ো সরু গলির মধ্যে দিয়ে আরও কয়েকটা পাক খেয়ে পটলদা নিজের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। পটলদার মুখটা বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। এডিথকে আঙুল দিয়ে দেখালেন, 'ওই বাড়িতেই তোমার স্বামী জন্মেছিল। জরাজীর্ণ বাড়িটা যারা কিনেছে তারাও রং করেনি।' পটলদা সরল মানুষ কোনো কিছু চেপে রাখেন না। বললেন, "এই বাড়ি বন্ধক দিয়ে আমি বিলেতের টিকিট কিনেছিলাম।"

বাড়িটার পাশেই একখানা টিনের ঘর রয়েছে। সেই ঘরে পটলদার মা থাকেন। এই সম্পত্তিটুকুই পটলদা শুধু নষ্ট করে যাননি।

মা কিন্তু আজও বেরিয়ে এলেন না। ঘরের কোণে আগের মতোই ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। "মা," এই বলে পটলদা সজল চোখে এগিয়ে গেলেন। মামা বললেন, "দেখছিস কি দিদি? বউমাকে বরণ করে তুলে নে।"

দুধে-আলতা রংয়ের ফুটফুটে বউ দেখে পাড়ার সবাই অবাক। মেয়েরা তখনই বলেছে, "আহা কি রকম পাতলা চামড়া দেখো। মনে হচ্ছে এখনই যেন ফেটে গিয়ে রক্ত বেরুবে। চুলগুলি অমন সোনালী কেন? মেমদের চুল অমন হয় বুঝি!" এর আগে এ-পাড়ার কেউ জলজ্যান্ত মেম দেখেনি। মামা ক্যালেন্ডারে মেমদের ছবি দেখেছেন, এবার ভাগ্নে-বউ দেখে বুঝলেন ছবিতে যা কিছু দেখা যায় তা মিথ্যে নয়।

মামা দুজনকে আশীর্বাদ করে এডিথকে ইংরেজী বললেন, "এই তোমার মা।"

'ইয়োর মাদার' কথাটা শুনে এডিথ ঠিক বুঝতে পারছিল না। পটলদা ফিসফিস করে বললেন, "শাশুড়িকে এখানে মা বলে।"

এডিথের তাতে মোটেই আপত্তি নেই। মাথা নিচু করে সে পটলদার মায়ের দিকে এগিয়ে গেলো। মা বহুদিন পরে হারানিধি ফিরে পেয়ে দুজনকে একসঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগলো।

এরপর হঠাৎ মায়ের শরীর খারাপ হলো। তিনি মাটিতে বসে পড়লেন। মেঝেতে শুয়ে পড়তেই মামা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। পাড়ার দর্শনার্থীরা তখন বাড়ির উঠোন বোঝাই করে ফেলেছে। ঘরের মধ্যেও কয়েকজন ঢুকে পড়েছে।

মামা চিৎকার করে উঠলেন, "তোমরা এখন যাও দিকি বাপু। মেম-বউমা কিন্তু আজকেই হাওড়া ছেড়ে বিলেত চলে যাচ্ছে না। অনেকদিন থাকবে।"

শাশুড়িকে অচৈতন্য হয়ে পড়তে দেখে এডিথ দ্রুত মেঝেতে বসে পড়লো। তারপর তাঁর সেবা আরম্ভ করলো। ব্যাগ থেকে কী সব শিশি বার করে মায়ের সামনে রাখলো।

মা এবার চোখ মেলে তাকালেন। তিনি আবার উঠতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু

এডিথ সস্নেহে তাঁকে বাধা দিলো। দুজনে কেউ কারো কথা বোঝে না। কিন্তু মুখের ভাবেই পরস্পরকে বুঝতে পারছে তারা। মা পরম স্নেহে তাঁর একমাত্র সন্তানের বধূকে দু'চোখ দিয়ে দেখছেন। আর এডিথ এই অপরিচ্ছন্ন অস্বাস্থ্যকর পূতিগন্ধ পরিবেশের কথা ভুলে গিয়ে অবাক হয়ে সেই মহিলাটির দিকে তাকিয়ে আছে যিনি অনেকদিন আগে তার প্রিয়তমকে পৃথিবীতে এনেছিলেন এবং প্রবাসী সন্তানের প্রতীক্ষায় যিনি পনেরো বছর অপেক্ষা করছেন।

এডিথ এবার পরম স্নেহে আমোদিনীর সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। কাপড়ে সামান্য অডিকোলন ঢেলে নিলো। তার গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

সমস্ত পাড়াতে খবরটা ছড়িয়ে পড়তে দেরি হলো না। লোকে ভেবেছিল, মেম-বউমা নাক বেঁকিয়ে থাকবে, শাশুড়ির দিকে ফিরেও তাকাবে না, স্বামী বেশী মাতৃপ্রেম দেখালে তার লাগাম ধরে টান দেবে। কিন্তু তা তো নয়ই, বরং মেম-বউ মেঝেতে বসে শাশুড়ির গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। চারদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেলো।

আমোদিনীর সমবয়সিনীরা পরের দিন ভোরেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

রাতারাতি পটলদার মা বিশেষ সম্মানের পাত্রী হয়ে উঠেছেন। আগে যখন জল আনবার জন্যে মিউনিসিপ্যালিটির কলের সামনে তিনি লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতেন, তখন অন্য বধূরা পাত্তাই দিতো না। এখন সবাই তাঁকে বেশ একটু হিংসে করতে আরম্ভ করেছে।

গবার মা এসে আমোদিনীকে বললেন, "ঠাকুরকে এতো ডেকেছিস, তা কখনো মিথ্যে যায়? তোর ভাগ্য, এমন সোনার চাঁদ ছেলে পেটে ধরেছিস। আর বউ! এ তো গল্প-কথার মতো। জাত গোত্তর কোষ্ঠী মিলিয়ে, বংশ দেখে বউ তো এনেছিনু আমি—এখন সে-মাগীর পা টিপলে ভাল হয়। আর খাঁটি মেমসায়েব বউ তোর পা টিপছে—এ-দৃশ্য বাইসকোপে তুলে লোককে দেখালেও বিশ্বেস করবে না।"

মামা বললেন, "আপনারা আশীর্বাদ করুন বেঁচেবত্তে থাকুক।"

এরপর দর্শনাথীদের লাইন পড়ে গেলো। তারা একবার শুধু নিজের চোখে দেখতে চায়, মেমসায়েব বউ শাশুড়ির পদসেবা করছে।

আমোদিনী দেবী তবু মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারছেন না। কথা ক্ষমতা তিনি যেন সারাজীবনের মতো হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি শুধু একভাবে ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকেন, আর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ে।

মামার বাড়িটা পটলদা খুঁটিয়ে দেখেছেন। খাটা পায়খানার একটা দরজা পর্যন্ত নেই। সেখানে আব্রুরক্ষার জন্যে একটা চটের থলে টাঙানো রয়েছে।

বিরক্তিতে মন ভরে উঠলো পটলদার, এরা একটু পাল্টালো না। এরা কী করে পশুর মতো জীবনযাপন করছে? পটলদার লজ্জা লাগছে, এডিথের কাছে তিনি অকারণে ছোট হয়ে যাচ্ছেন। মামা বড় বড় কথা বলছেন, মাছ মাংস আনাচ্ছেন, বাড়িতে রেডিও বাজাচ্ছেন—কিন্তু খাটা পায়খানার একটা দরজা লাগাবার প্রয়োজন মনে করেননি। কিন্তু পরমুহূর্তেই পটলদার মনে পড়ে গিয়েছে, মামা তবু এতোদিন মাকে আশ্রয় দিয়েছেন। এই ভাঙা পায়খানা এবং বে-আব্রু কলঘর ব্যবহার করেই পটলদা জীবনের পঁচিশটা বছর কাটিয়েছেন। মামা তবু বোনকে দেখছেন, কিন্তু পটলদা তো এদের জন্যে কিছুই করেননি, বরং বাড়ি বন্ধক-দেওয়া টাকা নিয়ে বিদেশে পালিয়েছেন।

রাত্রে শোবার ঘরে স্বামীকে একলা পেয়ে এডিথ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে। এমন পরিবেশে মানুষ বছরের পর বছর বিনা প্রতিবাদে বিনা বিপ্লবে থাকতে পারে তা তার অকল্পনীয় ছিল। সে হয়তো আরও কিছু বলতো, কিন্তু স্বামীর মনোকষ্টের কথা ভেবে সাহস পাচ্ছে না।

এডিথের পক্ষে এখানে থাকা যে অসম্ভব তা বুঝতে পারছেন পটলদা। তাঁকে কিছু করতেই হবে। কিন্তু হঠাৎ তাঁর শরীর যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে। কে যেন বলছে, তোমার মাকে এই পরিবেশে এতদিন ফেলে রাখতে তোমার তো দ্বিধা হয়নি।

কী বলবেন পটলদা?

"এডিথ, তুমি কি সকালেই চলে যেতে চাও?" পটলদা জিজ্ঞেস করলেন।

এডিথ কিছু বলে না। শুধু কাঁদছে। মানুষ যে এমন পরিবেশে থাকতে পারে, স্বামী যে নিজের মাকে এমন পরিবেশে এতোদিন রেখেছে তা সে ভাবতে পারছে না।

"এডিথ, চুপ করে রইলে কেন? কথা বলো।"

স্বামীর গায়ে হাত রেখে এডিথ বললো, "তোমার মা কষ্ট পান এমন কিছুই আমি করতে চাই না।"

মা কিন্তু চরম অভিমানেই যেন এই ভয়াবহ পূতিগন্ধ পরিবেশে পড়ে রয়েছেন। পটল হাজরাকে অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যেই চৌধুরীবাগানের এই অঞ্চলটা যেন এখনও পৃথিবীর বুকে অক্ষত অবস্থায় রয়েছে।

পটলদা নিজের অজান্তে মহা বিপদে পড়লেন। একদিকে মা, অন্যদিকে এডিথ—এদের মধ্যে সাত সমুদ্রের দূরত্ব। যেখানে যেমন সেখানে তেমনভাবে পটলদা মানিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু এরা দু'জন কেবল পটলদার মুখ চেয়ে কি কাছাকাছি আসতে পারবে?

পরের দিন এডিথের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছে। মশার কামড়ে সমস্ত দেহে লাল-লাল ডুমো-ডুমো দাগ বেরিয়েছে। আমোদিনী ইতিমধ্যে একটু সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তিনি পুত্রবধূর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। এই পরিবেশ বিদেশি বধূর যে সহ্য হচ্ছে না তা তিনি আন্দাজ করতে পারছেন।

পটলদা পুরনো দিনের কথা স্মরণ করে এডিথকে বললেন, "এক সময় মায়ের পাশে না শুলে আমার ঘুম আসতো না। মা আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন।"

এডিথের মনে হলো পটলদা তার অনুমতি ভিক্ষা করছেন। বললেন, "তুমি মায়ের কাছে গিয়ে অবশ্যই শুতে পারো।"

রাত্রে মায়ের পাশে শুয়ে পড়ে পটলদা ডাকলেন, "মা।"

"কে? খোকা?" মা একবার তাকিয়ে বললেন। "বউমা একলা থাকতে ভয় পাবে না?" ছেলেকে ফিরে যেতে বললেন আমোদিনী।

পটলদা বললেন, "ওদেশের মেয়েরা অনেক শক্ত হয়, মা।"

মা কোনো উত্তর দিলেন না। কিন্তু পটলদার মনে হলো, কথাটা বোধ হয় সত্যি নয়—তাঁর মায়ের মতো নীরবে এতো কষ্ট সহ্য করবার মতো শক্ত মেয়ে ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো দেশে জন্মায় না।

"মা, তুমি আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দেবে না?" পটলদা মায়ের খুব কাছে সরে এসে জিজ্ঞেস করলেন। পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে মা বললেন, "তোর মনে আছে? আমি পিঠে হাত না বুলিয়ে দিলে তোর ঘুম হতো না?"

"মা, তুমি কি ঘুমিয়ে পড়লে?" পটলদা একটু পরে আবার জিজ্ঞেস করলেন।

"কিছু বলবি?" মা আবার জিজ্ঞেস করলেন।

"এই নোংরা ভাঙা বাড়িতে এই অবস্থায় তোমাকে রাখতে আমার একটুও ইচ্ছে করছে না।"

পটলদার কথা মা বুঝতে পারলেন না। এই পরিবেশ তাঁর কাছে তো অসহ্য হয়ে ওঠেনি—এইখানেই তো জীবন কাটলো। এর থেকে ভাল কিছুর সঙ্গে তাঁর তো পরিচয় নেই।

"মা কিছু বলো," পটলদা কাতরভাবে অনুরোধ করলেন।

"বেশ তো আছি। কোন অভাব নেই। তুই টাকা পাঠাচ্ছিস।" মা স্তব্ধতা ভঙ্গ করে আস্তে আস্তে বললেন। কোনো কিছুর বিরুদ্ধে মায়ের যেন অভিযোগ নেই। ছেলেবেলায় স্বামী হারিয়ে, সর্বস্ব দিয়ে যাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছেন, যার কাছে আশা করেছিলেন—সে ফিরে আসেনি। মায়ের কথাতে তবু কোনো দুঃখ প্রকাশ পাচ্ছে না।

"মা, আমি ঘুমোই?" পটলদা জিজ্ঞেস করলেন।

মাঝরাতে একবার যখন ঘুম ভাঙলো পটলদা দেখলেন, মা তখনও হাতপাখা নেড়ে চলেছে একভাবে, আর ছেলের গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

পটলদা বললেন, "মা ঘুমোওনি?"

"এবার ঘুমবো," মা শান্তভাবে উত্তর দিলেন।

পটলদার ইচ্ছে হচ্ছে মায়ের পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। এই নরককুণ্ডে মায়ের জীবনটা তিনি নষ্ট হতে দিয়েছেন। মাকে তিনি সুখ দিতে পারেননি, কাছাকাছি থেকে দুঃখও ভাগ করে নিতে পারেননি। পটলদা ভাবছেন মাকে বলবেন, "বিশ্বাস করো মা, তোমার কথা একদিনের জন্যে, একমুহূর্তের জন্যেও ভুলিনি। কিন্তু সুযোগ পাইনি। এখানে চাকরি নেই। ওখানে এতোদিন সংগ্রাম ছিল, এখন ততটা নেই। কিন্তু ইচ্ছে করলেই আমি হাজার হাজার মাইল উড়ে চলে আসতে পারি না।"

এডিথকে দিয়ে পটলদা মাকে বলিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে যেতে। মা কোনো উত্তর দেননি, শুধু হেসেছেন। এ-হাসির কী অর্থ এডিথ বুঝতে পারেনি। কিন্তু পটলদা একটা অর্থ করেছেন। পটলদার মনে হলো, মা জানতে চাইছেন, পটল এখন কার? তাঁর? না বিদেশি একটা মেয়ের? যাঁর ঘরে-ফেরার জন্যে পনেরো বছর ধরে তিনি অপেক্ষা করেছেন, তাকে হারিয়েও মনের দুঃখ প্রকাশ করতে চাইছেন না চিরদুঃখিনী মা।

পরের দিন অবস্থা আরও ঘোরতর হলো। এডিথের প্রবল জ্বর এসেছে। মশা-কামড়ানো ডুমোগুলা সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। জ্বরের ঘোরে এডিথ ভুল বকছে, যার ভাষা এ-বাড়ির কেউ বুঝতে পারছে না। এডিথ স্বামীকে বলছে, "এ-আমায় কোথায় নিয়ে এলে তুমি?"

ডাক্তার এলো। তিনি বললেন, "এখানে রাখবেন না। সোজা বিলেত থেকে এনে এইখানে তুললেন কী করে আপনি?"

নিজের অজান্তে ডাক্তার একটা অস্বস্তিকর সমস্যার সহজ সমাধান করে দিলেন। পটলদা বুঝলেন এপার ওপার দু'পারকে একসঙ্গে ভালবাসা তাঁর মতো অভাগার পক্ষে বিলাসিতা।

লুকিয়ে লুকিয়ে খুব কাঁদলেন পটলদা। তারপর মাকে বললেন, "মা, তুমি তা হলে যাবে না?"

নিঃস্তব্ধতার মাধ্যমেই মা জানিয়ে দিলেন তিনি যেতে পারবেন না। আমোদিনী, বোধহয় বুঝতে পারছেন, পুত্রবধূ তাঁকে স্বীকার করলেও স্বামীর অতীতকে গ্রহণ করতে পারছে না।

"মা কিছু বলো," পটলদা আবার কাতর অনুনয় করলেন।

মা মেঝের ওপর শুয়ে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। কিছুই বললেন না। এডিথ নিজেও কত অনুনয় করলো, আমোদিনী কোনো উত্তর দিলেন না।

মায়ের পদধূলি নিয়ে পটলদা বললেন, "ডাক্তার কী বলেছে শুনেছো তো। এডিথ এখানে থাকলে শক্ত রোগে পড়ে যেতে পারে।"

মা ছেলের সঙ্গে একমত হলেন। ছেলেকে বললেন, "ডাক্তারের অবাধ্য হতে নেই। সবার সব পরিবেশ সহ্য হয় না, খোকা।"

"মা আশীর্বাদ করো। এবার তবে আসি," পটলদা ও এডিথ দু'জনে বিদায় নেবার আগে মাকে প্রণাম করলো।

পটলদা ভেবেছিলেন, তাঁর জন্মদুঃখিনী মা এবার অন্তত সন্তানকে কিছু বলবেন। অনেকক্ষণ নীরবতার পরে মা শুধু বললেন, "এসো।"

আমোদিনীকে শান্ত দেখাচ্ছে—তাঁর চোখে জল নেই। কিন্তু পটলদা জানেন, এখন থেকে জীবনের শেষ ক'টা দিন প্রত্যেক রাত্রে মা অনেকক্ষণ ধরে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদবেন।

সুবর্ণরেখার স্বামী

প্রাণের এতো ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পটলদা কেন এডিথ ও আমোদিনীকে কাছাকাছি রাখতে পারলেন না? কেউ কেউ বলেছে, স্রেফ স্বার্থপরতা। এডিথ মুখে যতই মিষ্টি কথা বলুক, শাশুড়িকে সে ভারতীয় পদ্ধতিতে ভালবাসবে কেন? আমার পরিচিত এক বন্ধু বলেছিলেন, "স্রেফ স্যানিটারি কারণেই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলন সম্ভব হলো না। ইন্ডিয়ানদের নোংরামিই এর জন্যে দায়ী।"

সত্যি কথা বলতে কি ইস্ট ইজ ইস্ট ওয়েস্ট ইজ ওয়েস্ট এবং পূর্ব-পশ্চিমের কোনো দিন মিলন হবে না—এই কথাটা পটলদার কোনোদিনই ভাল লাগেনি। পটলদার মতো লিন্ডসে মিল্নারও একই স্বপ্ন দেখতো। তার সঙ্গে আমার দেখা যদিও মার্কিন মুলুক থেকে ফেরার পরে হয়েছিল, তবু ঘটনাটা এখানেই বলে রাখা ভাল।

মার্কিন দেশ থেকে ফেরবার বেশ কিছুদিন পরেই লিন্ডসে বাবাজীবনের নাটকীয় সংবাদ আমার কাছে নাটকীয়ভাবে উপস্থিত হয়েছিল।

আমার শ্রদ্ধেয়া তাজুদির কিছু কিছু খবর 'এপার বাংলা ওপার বাংলা'য় বলেছি, কিন্তু পিসতুতো দিদি ফুলির কথা লেখা হয়নি। ফুলিদি অর্থাৎ মিসেস

ফুল্লরা মুখার্জী, আমার পিসিমার একমাত্র কন্যা, বর্তমান বয়স সাতচল্লিশ। এই কয়েকদিন আগে শুভেন্দুদার সঙ্গে তাঁর শুভবিবাহের রজতজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়েছে।

রজতজয়ন্তী উপলক্ষে ফুলুদি আমাদের নেমন্তন্ন করে খুব খাওয়ালেন। আমার পাতে দই পরিবেশন করতে করতে সুরসিকা ফুলিদি বলেছিলেন, "খুব তো লেখক হয়েছিস, ইনিয়ে বিনিয়ে গল্প বানিয়ে তাজুদিকে তো ফেমাস করে দিলি। তা আজকের জন্যে কিছু একটা বিবৃতি দে!"

দ্বিতীয়বার দই চাইতে চাইতে বললাম, "১৯৪৭ সালে আমাদের জীবনে দুটো বড় ঘটনা ঘটেছিল—তোমার বিয়ে এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি। এই পঁচিশ বছরের স্বাধীনতা আদৌ ফলপ্রসূ হয়েছে কিনা সে-সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ আছে, কিন্তু শুভেন্দুদা ও তোমার বিবাহ যে ফলপ্রসূ হয়েছে সে-সম্বন্ধে কোনো মতদ্বৈধ নেই—আমরা তিনটি হীরের টুকরো ভাগ্নে-ভাগ্নী লাভ করেছি!"

শুভেন্দুদা চাকরিজীবনে তেমন কেষ্টবিষ্টু না হতে পারলেও নিজের ছেলেমেয়েদের ভালভাবে মানুষ করেছেন। বড় ভাগ্নে অনিমেষ এখন জার্মানিতে। রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত কোম্পানি সরকারী খরচে তাকে বিদেশে পাঠিয়েছে। মেজ সুবর্ণরেখা এতো সাবজেক্ট থাকতে ইংরিজী পড়বার জন্যে বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছে। বাবা-মায়ের চোখের সামনে থাকবার মধ্যে ছোট কন্যা রূপসী—এখন যাদবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। পড়াশোনায় তিনজনেই চৌকস। অজস্র ছাত্র-ছাত্রীকে বঞ্চিত করে নির্লজ্জভাবে এরা এতো পদক, পুরস্কার এবং স্কলারশিপ বাড়িতে এনেছে যে, মনোপলি কমিশনের কাছে এই পরিবারের নামে অভিযোগ আনা যায়।

রজতজয়ন্তীর দিনেই ফুলিদিকে আমি বলেছি, "পিসিমার কাছে যতদূর শুনেছি, লেখাপড়ায় তোমার তেমন নজর ছিল না। কিন্তু ছেলেপুলেদের কীভাবে এমন তৈরি করলে?"

"তুই আর চালাকি করিস না। ছেলেমেয়েদের খবরদারি করতে গিয়েই তো হাড় ভাজা-ভাজা হয়ে গেলো! এবার যদি একটু হাত-পা ছাড়া হয়ে শান্তি পাই।"

ফুলিদিকে বলেছি, "গভর্নমেন্টের উচিত তোমাকে কোনো কলেজ-হোস্টেলের সুপারিনটেন্ডেন্ট করে দেওয়া। নিজের ছেলেমেয়েরা তো মানুষ হলো, এবার পরের ছেলে মানুষ করো।"

এহেন ফুলিদি হঠাৎ আমার কাছে এস-ও-এস পাঠিয়েছেন। রূপসী আমাকে ফোনে জানালো, "মা বলেছে, খুব জরুরী—তোমাকে অবশ্যই আসতে হবে।"

ফুলিদির সঙ্গে দেখা হলে লাভ ছাড়া লোকসান নেই, ওঁর রান্না জলখাবার বেশ লোভনীয়।

ফুলিদির ওখানে হাজির হতেই দেখলাম, দিদির মুখ বেজায় শুকনো। সোফার এক কোণে দিদি চুপচাপ বসে আছেন। কোলের ওপর বোনার কাঠি ও উল পড়ে আছে, কিন্তু হাত নড়ছে না। ফুলিদিকে বেকার বসে থাকতে কখনও দেখিনি, সবসময় হাত চলছে, হয় পশম, না হয় সেলাই। তাই বেশ চিন্তিত হয়ে উঠলাম।

ফুলিদি আমাকে দেখে বললেন, "এলি তাহলে। মায়ের পেটের ভাই নেই, তোরাও যদি না দেখিস।"

ফুলিদির নিজের ভাই নেই বলে চিরকালই একটু দুঃখ। কিন্তু আমরা ফুলিদিকে অ্যাজ-গুড-অ্যাজ নিজের বোন বলেই ব্যবহার করে এসেছি, ভাইফোঁটার দিনে কোনোরকম দয়ামায়া দেখাইনি।

জিজ্ঞেস করলাম, "কী হলো তোমার? গল ব্লাডারের ব্যথাটা আবার চাগালো নাকি? মেডিক্যাল কলেজে জানাশোনা সার্জেন রয়েছে। কতদিন বলছি, চলো দেখিয়ে দিই। দরকার হলে কাটিয়ে নাও।"

ফুলিদি ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, "যাবো ওখানে, তবে চিকিৎসার জন্যে নয়, ডেথ সার্টিফিকেট লেখাবার জন্যে।"

হাবভাবে বুঝলাম, ফুলিদির শরীর বেশ ভালই রয়েছে, যা খারাপ হয়েছে তার নাম মন।

হুম! অবস্থা সুবিধের নয়। ঘোর দাম্পত্য কলহ তাহলে।

"কবে আমার মুক্তি হবে বলতে পারিস?" ফুলিদি এবার প্রায় সজল চোখে কিন্তু বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই প্রশ্ন করলেন।

পরিস্থিতি সংকটজনক। "কিন্তু এতো ঘটা করে বিয়ের সিলভার জুবিলী পালনের পর তো তার ডাইভোর্স করা যায় না। বরং আমার ওখানে গিয়ে কয়েকদিন থাকো। শুভেন্দুদা আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই বুঝতে পারবে হাউ মেনি প্যাডিতে হাউ মেনি রাইস!"

ফুলিদি এবার একটু রাঙা হয়ে উঠে আমাকে বকুনি লাগালেন। "তোর মাথায় সব সময় গল্পের প্লট ঘুরছে, পঁচিশ বছর বিয়ের পর ডাইভোর্স হয়ে গেলেই ছোটখাটো বাংলা নবেল হয়ে যায়! তোর জামাইবাবু শুনলে খুব কষ্ট পাবেন। উনি তো সাতেও থাকেন, না, পাঁচেও থাকেন না।"

"তাহলে?" বিব্রত হয়ে আমি এবার নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করি।

সোফায় হেলান না দিয়ে ফুলিদি এবার উঠে বসলেন। নিজের কপালে হাত রেখে বললেন, "কপাল। সন্তান মানেই অশান্তি, এই কথাটা তোর নবেলের কোথাও বড় বড় টাইপে ছাপিয়ে দিস। বাঁজা হওয়া অনেক সুখের, তাদের মুখ পুড়োবার কেউ থাকে না।"

আমার মন অচিরেই জার্মান-প্রবাসী যুবক ভাগ্নে অনিমেষের কাছে চলো গেলো। জার্মান যুবতীরা যে কৃষ্ণবর্ণ ইন্ডিয়ান ছোকরাদের ওপর বেশি প্রসন্ন সে-কথা শ্রদ্ধেয় সৈয়দ মুজতবা আলীর বইতে পড়েছি এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে বহুবার শুনেছি। কয়েক সপ্তাহ আগে শ্রীমান ভাগিনেয় নিজের যে-ছবি পাঠিয়েছে তার এক কোণে নাকি স-সারমেয় এক বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। ফুলিদি যে ভয় পেয়ে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণের জন্যে পাশের বাড়ি থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস চেয়ে আনিয়েছিলেন সে-খবরও আমার কানে ছোট ভাগ্নী মারফত এসেছিল।

অনিমেষের ব্যাপারটায় আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে বললাম, "ভাগ্যে যা লেখা আছে তা কি খণ্ডাতে পারবে ফুলিদি?"

ফুলিদি যেন একটু চাঙ্গা হলেন। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, "তা সত্যি। ইস্কুল ম্যাগাজিনে লেখার জন্যে মামা তোর কান মলে দিয়েছিলেন, কিন্তু ভবিতব্য কি আটকানো গেলো? বাপের অতো বাধা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তুই নবেল-নাটকের লাইনেই তো চলে গেলি। আমার ভাগ্যেও যা আছে তাই হবে। কি বল?"

আমি যে ক্রমশ ভুল পথে যাচ্ছি, তখনও না বুঝে আমি বললাম, "অনেকে বলছে, এই মহাকাশচারীদের যুগে সায়েব-মেমসায়েব বাঙালি-অবাঙালি এসব পার্থক্য আর থাকবে না। অনেকদিন আগেই তো কবি আন্দাজ করে লিখেছিলেন, জগৎ জুড়িয়া আছে এক জাতি, সে জাতির নাম মানুষ জাতি।"

"রাখ রাখ," মুখ ঝামটা দিলেন ফুলিদি। "নাটক-নবেল আর সংসার এক জিনিস নয়। দুনিয়াটা দো-আঁশলায় ভরে যাবে এটা কিছু শুভ সংবাদ নয়।"

আমি মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললাম, "অনেক ইন্ডিয়ান যুবক স্বদেশী যুগে মেম বিয়ে করবার পবিত্র শপথ নিয়েছিল। তাদের বক্তব্য ছিল, সাদা চামড়া আমাদের ওপর অনেক প্রভুত্ব করেছে, আমাদের দাস বানিয়ে রেখেছে—ঠিক হ্যায়, আমরাও প্রতিশোধ নিচ্ছি, মেম বিয়ে করে তাকে দিয়ে এঁটো বাসন মাজাবো!"

"সে তো তবু ভাল ছিল!" কাঁদো কাঁদো হয়ে ফুলিদি বললেন, "পুরুষমানুষ যা করে তাই মানিয়ে যায়। কিন্তু মেয়েদের সব মানায় না।"

"কী হলো তোমার?" আমি ফুলিদিকে একটু ঠেলা দিলাম।

চোখের জল ফেলে ফুলিদি বললেন, "তোর আদরের ভাগ্নী, অত বই ঘেঁটেঘুঁটে যার নাম রেখেছিলি সুবর্ণরেখা, সে-ই এবার বংশের মুখ ডোবাতে বসেছে। ম্লেচ্ছ বিয়ে করে সে এবার সায়েবের এঁটো বাসন মাজবে।"

বেশ একটু ধাক্কা খেয়েও ফুলিদিকে বলতে গেলাম, "বিদেশে এখন দিন কাল

পাল্টেছে, বউদের আর বাসন মাজতে হয় না, এ কাজটা স্বামীরাই সেরে নেয়।” কিন্তু ফুলিদির শোচনীয় মানসিক অবস্থা দেখে আমার গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না।

পরবর্তী খবরাখবর যা পাওয়া গেলো তা সংক্ষেপ করলে এইরকম দাঁড়ায় : সুবর্ণরেখা যাঁকে বিয়ে করবে ঠিক করেছে তিনি এক আমেরিকান অধ্যাপক। সুবর্ণরেখারই মাস্টারমহাশয়... লিন্ডসে মিল্নার। যে মেয়ে এতো শান্ত ও গম্ভীর ছিল, সেক্সপীয়র ও মিল্টন ছাড়া যার মাথায় কিছুই ঢুকতো না, সে-ই যে প্রজাপতির শরনিক্ষেপ করে সায়েব মাস্টারের মাথা ঘুরিয়ে দেবে এটা আমাদের প্রত্যাশিত ছিল না।

চোখের জল মুছতে মুছতে ফুলিদি আমার জলখাবার তৈরি করবার জন্যে রান্নাঘরে চলে গেলেন। যাদবপুরের হবু ইঞ্জিনীয়ার রূপসী মুখার্জী এবার বয়লার সুট পরে কলেজ থেকে ফিরলো।

“এ কি ড্রেস তোর!” আমি বিস্ময় প্রকাশ করি।

“মামা, একটু প্র্যাকটিক্যাল হও। শাড়ি পরে ওয়ার্কশপে কাজ করা চলে না,” রূপসী চ্যাটাং চ্যাটাং করে শুনিয়ে দিলো।

“তোর দেখছি আমার ওপর বেজায় রাগ।” আমি অভিযোগ করি।

“রাগ হবে না? না হয় বানিয়ে বানিয়ে গাঁজাখুরী গল্প লেখো, তা বলে ঐরকম একটা বিদিকিস্ত্রী নাম আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে?”

“নামটা খারাপ হলো! তুই হবার পরে, পুরো দুদিন আমি জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান ঘেঁটে নামটা পছন্দ করেছিলাম!”

“কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন!” রূপসী তড়বড় করে উঠলো।

“কোন ছোঁড়া বলেরে—?” আমি চ্যালেঞ্জ করি।

“ক্লাসের ছেলেরা আড়ালে যা বলে তা শুনলে তুমি ছেলেমেয়েদের নাম বিলোনো ছেড়ে দেবে। বুঝলে মামা? তারা আমাকে ডাকে, উপোসী!”

আমি উত্তর দিই, “তাই বল—একটু রোগা বলে রসিকতা করে। হাজার হোক যাদবপুর এখনও মফস্বল। ওরা জানে না রোগা স্লিম মেয়ে ছাড়া আজকাল বিলেত আমেরিকায় কেউ বিয়ে করতে চায় না।”

“মামা, তুমি আমাকে স্তোকবাক্য দিও না। যা বলছো তা যদি সত্যি হতো তা হলে বিদেশে দিদির বিয়ের কথাই উঠতো না।”

সুবর্ণরেখা দেহ এবং স্বভাবে একটু স্নেহময়ী, বিদেশে খাঁটি দুধ মাখনের কল্যাণে একটু ভারাতুর হয়েছে।

দিদির প্রসঙ্গে মায়ের দুঃখের কথা তুলতেই রূপসী সঙ্গে সঙ্গে বোনের পক্ষে সওয়াল শুরু করলো, “বেশ করেছে দিদি। রং যখন কালো, তখন কোনো গুণবান বাঙালি ছোকরার গার্জেন দিদিকে বিয়ে পরীক্ষায় পাস করাতো না।”

"আঃ রূপসী, বাঙালি জাতের সবাই খারাপ নয়," আমি স্বজাতি প্রীতি দেখাই।

"রেখে দাও মামা। তোমরা সাউথ-আফ্রিকানদের থেকেও বর্ণবিদ্বেষী! চেষ্টা করে নি মা? দিদির বিদেশে যাবার আগে তো লুকিয়ে কাগজে বিজ্ঞাপনও দিয়েছিল, আত্মীয়স্বজন সবাইকে পাত্রের কথা বলেছিল। অমন গুণের মেয়ে, ইংলিশে অমন রেজাল্ট, অমন ফ্যামিলি, কিন্তু পেরেছিল সুপাত্র যোগাড় করতে? চামড়া সাদা না হলে বাঙালি মেয়েদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, বুঝলে মামা।"

"তোর আর ভাবনা কী? তুই ফরসা," আমি অবস্থা আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করি।

রূপসী সে-কথায় কান না দিয়ে বললো, "আমি তো বলবো, দিদি একটা কাজের কাজ করেছে। যেসব ছোকরা এখানে বরফ-সাদা মেয়েমানুষ চায় তাদের চোখ খুলুক!"

আমি ফুলিদির দিকটা ভাগ্নীর কাছে তুলে ধরবার চেষ্টা করলাম। "আমার দিদির দুঃখের কথাটা তোরা ভেবে দেখছিস না। প্রথম মেয়ে বিয়ে দিয়ে মনের মতো জামাই আনবার সাধ থাকবে না?"

"সাধ তো থাকে, কিন্তু মুরোদ কই?" রূপসীর কড়া কথা।

"কিন্তু তা বলে যার-তার সঙ্গে!"

"যা-তা পাত্র তো দিদি পছন্দ করেনি। ভদ্রলোক হারভার্ডের এম. এ, আগে আমেরিকার সেরা ইস্কুলে পড়েছেন। বংশ ভাল, বাবা ডাক্তার, মা জজের মেয়ে—আর কী চাও তোমরা?"

আমি বললাম, "সবই স্বীকার করছি। কিন্তু আমার দিদির দুঃখ তোমাদের বোঝাতে পারবো না। মেয়ে দেওয়া মানেই হেরে যাওয়া—আমাদের কালচারের একটা ক্ষতি। বাইরের কালচার থেকে মেয়ে আমদানি হলে আমাদের লাভ, কিন্তু আমাদের মেয়ে এক্সপোর্ট হয়ে গেলে পুরো লোকসান।"

রূপসী ইঞ্জিনীয়ারিং না পড়ে তর্কশাস্ত্রের ছাত্রী হলে ভাল করতো। একটুও না ভেবে সে উত্তর দিলো, "এসব তুমি পুরনো যুগের কথা বলছো, মামা। এখন মেয়েরা যেখানে যায় সেখানেই কালচারাল কংকোয়েস্ট হয়; তুমিই লিখেছিলে, লক্ষ লক্ষ জাপানী সৈন্য প্রাণ দিয়েও যে-আমেরিকাকে হারাতে পারেনি, কয়েক হাজার জপানী মেয়ে হাসি এবং চোখের ইশারাতে সেই অসাধ্য সাধন করেছে। বিশ্বযুদ্ধ জিতবার ঠিক পরেই অনেক জাত ব্যাটল অফ বেড-এ (বিছানা যুদ্ধে) গোহারান হেরে যায়!"

ফুলিদি জলখাবার হাতে প্রবেশ করলেন। আমাকে বললেন, "তুই আমাকে সুইসাইড এনে দে। খেয়ে আমি সব জ্বালা থেকে বাঁচি।"

"ওকি আনবার জিনিস, দিদি? ওটা করবার জিনিস। তার মালমসলা যোগাড় করে দিলে তুমি বাঁচবে সত্যি, কিন্তু আমরা মারা পড়বো। তোমাকে সাহায্য করবার জন্যে শুভেন্দুদা প্রথমেই আমাকে হাজতে ঢোকাবে।"

আঁচলের খুঁটে চোখের জল মুছে ফুলিদি বললেন, "আমার কোষ্ঠী বিচার করে রথীন পণ্ডিত বহুদিন আগেই বলেছিল—সন্তানদের হাতে এ-মেয়ে অনেক দুঃখ পাবে।"

"কবে বলেছিল?" আমি জানতে চাই।

"কবে আবার? বিয়ের আগে, বাবা যখন কোষ্ঠী বিচার করিয়েছিলেন, তখন।"

ভাবলাম একবার বলি, জেনেশুনে সেক্ষেত্রে বিয়ে না করাই উচিত ছিল। কিন্তু ফুলিদির যা মনের অবস্থা তাতে টিপ্পনী কাটতে সাহস হলো না।

ভেবেচিন্তে সান্ত্বনা দিলাম, "দুঃখ দেবার জন্যেই তো সন্তান, ফুলিদি। না হলে অত যন্ত্রণা সহ্য করে মাকে ছেলেপুলের জন্ম দিতে হয়?"

ফুলিদি বললেন, "ওসব কথা থাক। সায়েবের গলায় মালা দেবার কী কী বিপদ তুই আমাকে বল তো। মেয়েকে শেষবারের মতো লিখে দেখি।"

আমি ভীষণ বিপদে পড়ে গেলাম। বললাম, "মেমসায়েব বিয়ে করার কী বিপদ তা তোমাকে গড়গড় করে বলে দিতে পারি, অন্তত আধডজন অভিযোগ আমার কানে এসেছে। যেমন—প্রত্যেক বউ এক-একটি শ্বেত হস্তিনী। ভীষণ কুঁড়ে, ইন্ডিয়ার গরম সহ্য করতে পারে না। শ্বশুর-শাশুড়িদের মুখ দর্শন করতে রাজী নয়, কম পয়সায় সংসার চালাতে পারে না। ঘন ঘন হোম লিভে যাবার জন্যে ব্যস্ত। দুর্জনেরা বলে, বেশির ভাগ মেমের মুখে গন্ধ... কমবয়সে বুড়ি হয়ে যায়। ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু দেশী মেয়ের সায়েব জামাই সম্বন্ধে তো কোনো খবরাখবর নেই।"

"আমাকে আর কত জ্বালাবি? মামা বেঁচে থাকলে তাঁর কাছেই যেতাম," ফুলিদি একেবারে কাঁদো কাঁদো।

অগত্যা মাথা চুলকে বললাম, "যে-কোনো পুরুষমানুষকে বিয়ে করবার মধ্যে যে স্বাভাবিক বিপদগুলো রয়েছে সেগুলো সায়েব-স্বামী হওয়ার মধ্যেও নিশ্চয় আছে—যেমন স্বাধীনতা নষ্ট হওয়া, ছেলেপুলে হয়ে সংসারের খুঁটিতে বেঁধে মার খাওয়া, পয়সকড়ি নিয়ে খিটিমিটি..."

আরও বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু ফুলিদি মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন, "পঁচিশ বছর স্বামীর ঘর করছি—ওগুলো তোর থেকে একটু বেশিই জানি। তুই শুধু সায়েবদের ব্যাপারগুলো বল।"

বললাম, "তুমি আমার অপরাধ নিও না ফুলিদি, সায়েবরা গোরু খায়, মদ

খায়, পরের বউকে নিয়ে নাচে, মেয়েদের বেশি জামাকাপড় পরা পছন্দ করে না, আর,...” এবার আমি নিজেই একটু সঙ্কোচ বোধ করলাম।

“থামলি কেন? বল।”

“সায়েবরা বিশ্বাস করে না বিয়েটা জন্ম-জন্মান্তরের ব্যাপার। তাই একটু বেগড়-বাঁই হলে ডাইভোর্স করে দেয়।”

ফুলিদি আঁতকে উঠলেন।

দিদিকে শান্ত করবার জন্যে বললাম, “সায়েব জামাই হলে তোমার হাঙ্গামা অনেক কম। বিয়েতে পাঁচডজন নমস্কারি শাড়ি দিতে হবে না।”

রূপসী হঠাৎ ফোড়ন দিয়ে বসলো, “হিপি জামাই হলে একটা গাঁজার কলকে দিয়ে জামাই ষষ্ঠীর দায় সারা যাবে।”

ফুলিদির সঙ্গে এখন রসিকতার সময় নয়। বকুনি দিয়ে রূপসীকে বিদায় করলাম। দিদিকে বললাম, “সায়েব জামাই হলে তোমার খুব সুবিধে। যখন খুশি মেয়ের বাড়িতে উঠে শাশুড়ি-আদর ভোগ করবার অধিকার থাকবে তোমার।”

ফুলিদির এসব কথা ভাল লাগলো না। আঁচলের খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মেয়ের বিয়ে বন্ধ করবার জন্যে ফুলিদি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। তান্ত্রিক জ্যোতিষীর সিঁদুর লাগানো এয়ার লেটার ফর্মে মেয়েকে অনেকগুলো চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু কোনো ফল হয়নি। মনের মতো ছোকরাটিকে স্বামী হিসেবে পাবার জন্যে সুবর্ণরেখা যে পুরোপুরি বেঁকে বসেছে সে খবর রূপসীর কাছেই পেয়েছিলাম এবং এসব ক্ষেত্রে শেষপর্যন্ত যা হয় তাই হয়েছিল। সুবর্ণরেখা তাঁর মুখার্জি পদবি হাডসন নদীর জলে ভাসিয়ে মিসেস মিল্‌নার হয়েছিল।

এহেন ভাগ্নীকে যখন আমরা সকলে খরচের খাতায় লিখে দিয়েছিলাম, তখন রূপসী বেচারার খুব মন খারাপ। মুখে যতই দিদির পক্ষ নিক, দিদি যে শেষপর্যন্ত বাবা মায়ের ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে করার মানসিক দুঃসাহস দেখাতে পারবে তা সে আশা করেনি।

রূপসী আমার কাছে এলে একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, “তোর এতো দুঃখ কেন?”

“সে আর তুমি বুঝবে কী করে, মামা। দিদির বরদের নিয়ে আজকাল বোনেরা কীরকম হৈ-হৈ করে সে খবর তো রাখো না। বাঙালি মেয়েদের জীবনে ওইটুকুই তো রোমান্স।”

তা সত্যি। বেচারা রূপসী কোথায় কোনো রঞ্জিতদা বা সঞ্জীবদার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করবে, সিনেমায় যাবে, রেস্তোরাঁয় খাবে, থিয়েটার দেখবে, তা না দিদি গাঁটছড়া বাঁধলো এক সায়েবের নেকটাইয়ের সঙ্গে।

"হ্যাঁ মামা, বিলেত আমেরিকায় শালীদের কীরকম পোজিসন?" রূপসী জিজ্ঞেস করলো।

"এক কথায় শোচনীয়।"

"শ্যালিকা কী বস্তু তা ওরা বোঝে না?" রূপসী প্রশ্ন করেছে।

"মোটেই নয়। স্ত্রীর সঙ্গে যত মাখামাখি হাসাহাসি করো, দহরম মহরম রাখো—কিন্তু শ্যালিকা নৈব নৈব চ! লোক নিন্দে করবে, স্ত্রীর ভগ্নীকে থিয়েটারে নিয়ে গেলে নানা কথা উঠবে।"

"বা রে! শ্যালিকারা বুঝি মানুষ নয়, তাদের বুঝি জামাইবাবুদের সঙ্গে আউটিং করতে ইচ্ছে হয় না?" বেজায় রেগে উঠলো রূপসী।

"মানুষ তো বটেই—কিন্তু মেয়েমানুষ ; সেইটাই তো যত নষ্টের কারণ।" আমি ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করি।

রূপসীর মুখে অবিশ্বাসের ভাব ফুটে ওঠায় আমাকে উদাহরণ দিতে হলো। বললাম, "অমন-যে-অমন বাঘা ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স—শ্যালিকাপ্রীতি ছিল বলে বেচারাকে কত ভুগতে হয়েছিল। কানেকটিকট না কোথায় এই সেদিন পর্যন্ত আইন ছিল, স্ত্রী দেহরক্ষা করলেও স্ত্রীর ভগ্নীকে বিবাহ চলবে না।"

রূপসী মুষড়ে পড়লো। আমি সহানুভূতি জানিয়ে বলি, "ইণ্ডিয়া ছাড়া কোনো দেশের লোক শালীর মূল্য বোঝে না। না হলে পৃথিবীতে এতো দেশ থাকতে শালিবাহন রাজারা ভারতবর্ষে কেন রাজত্ব করতে এসেছিলেন?"

রূপসী যে কিছু ভাবছে তা আন্দাজ করতে পারছি। অগত্যা জানতে চাইলাম, "তুই কি বিদেশে যাবার ফন্দি আঁটছিস? তাহলে দিদির বাড়িতে উঠতে পারবি না। মেয়েদের কোনো ডরমিটরিতে থাকিস, আর একবার ওদের ওখানে সৌজন্য-সাক্ষাৎ বা কার্টসি-কল করিস। তারপর দিদি যদি তোকে কোনোদিন ডিনারে ডাকে, সে আলাদা থাক।"

রূপসী এবার আসল খবরটা ভাঙলো। "দিদি ওই সায়েব ভদ্রলোককে নিয়ে কলকাতায় আসছে।"

"সায়েব ভদ্রলোক নয়, তোমার জামাইবাবু," আমি মনে করিয়ে দিলাম।

"সায়েবকে জামাইবাবু বলা যায় না, মামা," রূপসীর উত্তর।

"তাহলে তোর মা'র অবস্থাটা ভাব। খোদ ইংরেজকে বাবাজীবন বলে বরণ করতে হবে। আদর করে জড়িয়ে ধরে ললাটে স্নেহচুম্বন দিতে হবে।"

ব্যাপারটা আর রসিকতার পর্যায়ে রইলো না। ফুলিদি এতোদিনে শান্ত হয়েছেন। কপালে যখন সায়েব-জামাই হয়েছে তখন কী আর করা যাবে? আমাকে ডেকে অনেকক্ষণ ধরে শলা-পরামর্শ হলো। বাড়িতে এখন সাজ-সাজ রব। শোবার ঘরে নতুন ডিজাইনের খাট বিছানা এলো। সেই সঙ্গে কাঁচের

থালাবাসন, কাঁটা চামচ ডিস কাপ। সায়েব-জামাইয়ের পান থেকে চুন খসলে যে বিরাট কিছু ঘটবে সবাই তা ধরে নিয়েছে।

আমি আর কী নতুন পরামর্শ দেবো? ফুলিদি জিজ্ঞেস করলেন, "ওদেশে কী ভাবে জামাই আদর করে, বল না বাপু।"

বললুম, "শাশুড়ি-জামাই সম্পর্ক নিয়ে অনেক রসিকতা পড়লেও স্বচক্ষে একটা কেসই দেখেছিলুম। তখন আমি ওমাহার কাছে এক গ্রামে মিসেস ফেনারের বাড়িতে ছিলাম। মিসেস ফেনার একদিন টেলিফোন পেয়ে কার সঙ্গে কথা বললেন। তারপর ফোন নামিয়ে, মুখ বেজার করে বললেন, 'আজ আমার জামাই ডিনারে আসছে।' জামাই আপ্যায়নের জন্যে ভদ্রমহিলা এবার উঠে পড়ে লাগবেন ভাবলাম। ও মা, কিছুই করলেন, না, শুধু গুদোম থেকে বাড়তি কয়েকটা আলু এনে সিদ্ধ করতে দিলেন। টেবিলে জিনিসপত্তর সাজাতে সাজাতে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মিসেস ফেনার বললেন, 'আমার জামাই-এর আসবার সময় হয়ে গিয়েছে। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ডিনার টেবিলে বসে যথেষ্ট খাবার প্রথমেই নিজের প্লেটে তুলে নিও। ছোকরার এতোই লোভ এবং ব্যাড ম্যানার্স যে টেবিলের বারো আনা আলু নিজের প্লেটে তুলে নেবে।'

"আমি তো তাজ্জব। জামাই দুটো আলু খাবে তাতেও শাশুড়ির বিরক্তি। আর আমাদের দেশে 'এটা খাও, ওটা খাও, নইলে মাথা খাও' বলে শাশুড়িদের কী মিনতি।"

ফুলিদি বললেন, "বাজে বকিস না। সায়েবরা যে সব খাবার খায় সে সব তো রাঁধতেও জানি না। তুই কি হোটেল থেকে কিছু আনিয়ে দিবি!"

আমি বললাম, "কি বিপদ বল দিকি। ছোকরা ঠিক জামাইষষ্ঠীর দিনেই কলকাতায় অ্যারাইভ দিচ্ছে!"

ফুলিদি অগত্যা জামাইষষ্ঠীর ব্যবস্থা পাকা করে রাখছেন। শুধু বললেন, "হোটেল থেকে আর যা-ই আনিস, দয়া করে গোরুর মাংসটি নয়। খুকি যে আমাকে কী বিপদে ফেললো।"

রূপসী মুখে যতই তড়বড় করুক, এবার একটু ঘাবড়ে গেলো। আমাকে আড়ালে ডেকে বললো, "একে তো হুড়হুড় করে ইংরিজী বলতে অভ্যস্ত নই, তারপর মা বলছে, আদর আপ্যায়নের ভারটা পুরো আমাকেই নিতে হবে!"

ফুলিদির জামাই যেদিন কলকাতায় পৌঁছলো সেদিন বিশেষ কাজে আমাকে কলকাতার বাইরে থাকতে হয়েছিল। দিন পাঁচেক পরে হাওড়ায় ফিরে এসেই ছুটলাম ফুলিদির বাড়িতে। আমাকে দেখেই সহাস্য রূপসী চিৎকার করে উঠলো, "মামা, তুমি এসে গিয়েছো। লিন্ডসেদাকে রোজই তোমার কথা বলছি।"

"বেজায় খুশি-খুশি ভাব দেখছি, ব্যাপার কী?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"দিদির বরটি ভারি ভালমানুষ। নিজেই বলেছেন, লিন্ডসেদা বলে ডাকো।"

জামাই দেখে আমি তাজ্জব। একটি সাদা ধবধবে বিনয়ী ছোকরা, পাঞ্জাবি এবং পাজামা পরে আমাদের ঘরে ঢুকলো। আমি করমর্দন করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ছোকরা ডনবৈঠকের স্টাইলে ঘটাং করে মেঝেতে বসে পরে আমার পদধুলি নিলো।

লিন্ডসে মিল্নার মানসনেত্রে যে সায়েবনন্দনের ছবি দেখেছিলাম, তার সঙ্গে ফুলিদির জামাই-এর একটুও মিল হলো না। অত্যন্ত সৌম্য চেহারা। চোখ দুটি শান্ত—কথাবার্তাও বেশ নম্র। দোষের মধ্যে মাথায় সামান্য একটু টাকের ইঙ্গি ত দেখা দিয়েছে। আমাদের ভাগ্নীর তুলনায় জামাইয়ের চেহারা কার্তিকের মতো।

জামাই বললো, "আপনাকে যেভাবে শ্রদ্ধা জানালাম তা ঠিক হয়েছে তো।"

"শতকরা ১১০ ভাগ ঠিক হয়েছে," আমি জানাই। "অনেক দিন পরে প্রণাম পেলাম, আজকালকার ছেলেরা ও-পাট তুলে দিয়েছে। বাবা-মা কাউকে প্রণামের হুকুম করলেও বিপদে পড়ে যান ; কারণ আধুনিক ছেলেরা যা টাইট চোঙা প্যান্ট পরে—পনেরো ডিগ্রী বেঁকতে গেলে পিছনের সেলাই কেটে যাবে।"

লিন্ডসে এমনভাবে হাসলো যে বুঝলাম সে আমার কথা বিশ্বাস করছে না। সে বললো, 'ইন্ডিয়াই একমাত্র দেশ যেখানে হাজার হাজার বছর ধরে ট্রাডিশন একইভাবে চলেছে।"

বেচারাকে কে বলবে, হাজার বছর তো দূরের কথা, দু-তিন মাস অন্তর আজকাল স্টাইলের কায়দাকানুন পাল্টাচ্ছে।

রূপসী এবার আমাকে বিপদে ফেললো। জামাইবাবুকে বললো, "আপনার কোশ্চেনটা করুন। মামা টপ করে উত্তর দিয়ে দেবেন।"

আমার প্রেস্টিজ পাংচার হবার অবস্থা। ছোকরা নোটবই খুলে জানতে চাইলো, সাষ্টাঙ্গ প্রণামের আটটি অঙ্গ কী কী?

এ নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামাইনি। আধুনিক পাঠক-পাঠিকাদের এ-বিয়ে কোনো কৌতূহল নেই। ইজ্জত বাঁচাবার জন্য বললাম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানতাম বটে : তবে ঠিক মনে করতে পারছি না।"

রূপসীকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোদের বাড়িতে পুরোহিত দর্পণ, পাঁজি ইত্যাদি কিছু আছে?"

ওসবের বালাই আজকাল কোনো বাড়িতেই থাকে না। মান রক্ষার জন্যে শেযপর্যন্ত অগতির গতি আমাদের সমস্ত জ্ঞানের আধার খবরের কাগজ আপিসের রেফারেন্স-অফিসার নকুল চাটুজ্যেকে ফোন করলাম।

নকুলবাবু চটপট বললেন, "আয়ুর্বেদের অষ্টাঙ্গ হলো—শল্য, শলাকা, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র এবং বাজীকরণ। আপনি তো গল্প লাইনের লোক? নিশ্চয় অষ্টাঙ্গ মৈথুনের ডিটেল জানতে চান। লিখে নিন—স্মরণ, কীর্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প, অধ্যবসায়, ক্রিয়ানিষ্পত্তি।"

"না নকুলবাবু, এখন আমি গল্প লিখছি না। আমার জামাই-এর একটা প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কাকে বলে?"

নকুলবাবু হা-হা করে হেসে ক্ষমা প্রার্থনা করে জানালেন, "জানু, পদ, পাণি, বক্ষ, বুদ্ধি, শির, বাক্য এবং দৃষ্টি—এই অষ্টাঙ্গ দিয়ে একসঙ্গে প্রণামের নাম সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।"

লিন্ডসে বললো, "ওয়ান্ডারফুল। একটি প্রণাম মানে সমস্ত দেহ এবং মনের সিমফনি। সাষ্টাঙ্গের মধ্যে বাক্য, বুদ্ধি এবং দৃষ্টিও রয়েছে।"

আমার কথাগুলো দ্রুত নোটবুকে লিখে নিয়ে সে বললো, "আপনারা সহজেই যা স্মরণ রাখতে পারেন আমি তা ভুলে যাই, কিছু মনে করবেন না।"

রূপসী বললো, "লিন্ডসে দাদাকে একবার সুনীতি চাটুজ্যের কাছে নিয়ে যাবেন? দাদা জানতে চান, এই লিন্ডসে কথাটা বাংলাদেশে বহু ব্যবহারের পর কেমন দাঁড়াবে?"

বললাম, "তোর যদি উচ্চারণ করতে অসুবিধা হয়, লিনড়ুদা বলে ডাক। সুনীতিবাবু এখন কলকাতার বাইরে ফরেন ট্যুরে রয়েছেন।"

জামাই নিয়ে মাতামাতি করছি, কিন্তু মেয়ের দেখা নেই। রূপসী বললো, "দিদি ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে হেয়ার-ডু করছে অর্থাৎ চুল ছাঁটতে গেছে।"

চুল ছেঁটে সুবর্ণরেখা এবার হাজির হলো। আমদের ভাগ্নীর গায়ের রং যে কতটা কালো তা লিন্ডসে বাবাজীর পাশাপাশি দেখে বুঝতে পারলাম।

নাইলনের টাইট প্যান্ট পরা একটা অদ্ভুত ড্রেস করেছে সুবর্ণরেখা। চুল ছেঁটে পুরোপুরি মেমসায়েব হবার চেষ্টা করছে সে।

সুবর্ণরেখা বললো, "কলকাতার দোকানগুলো একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছে, মামা। ফেসিয়াল মাসাজ কাকে বলে জানেই না—চীনে মেয়েটা আমার মুখ খামচিয়ে দিলো।"

রূপসী বললো, "জানো মামা, কালকে যা হলো, গ্রেট! আমরা পার্ক স্ট্রীটের ম্যাড হাউসে গিয়েছিলাম। ডিসকোথেক-এ দিদির সঙ্গে লিন্ডসেদাকে দেখে ওখানকার বহু দিশি তো ট্যারা! গান না শুনে আড়চোখে শুধু লিন্ডসেদার দিকে তাকাচ্ছে—একেবারে লালা পড়ছে যাকে বলে! দিদিকে ওরা যে কী হিংসে করছিল তোমায় কী বলবো।"

সুবর্ণরেখা মিটমিট করে হাসলো। "সত্যি মামা, পার্ক স্ট্রীট পাড়ার ইন্ডিয়ান মেয়েগুলো সায়েবদের জন্যে পাগল। লন্ডনের কুলি পেলেও বিয়ে করে ফেলতে পারে!"

রূপসী বললো, "আরও কিছুক্ষণ থেকে মজাটা দেখবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু লিন্ডসেদার ওসব নাচগান ভাল লাগে না। আমাদের টেনে নিয়ে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে।"

"ওর কথা ছেড়ে দাও, সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি। বলে কিনা, জেনুইন সায়েবী চালচলন নাকি এখন ক্যালকাটা ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না!"

হাজার হোক সম্পর্কে শ্বশুর, তাই সায়েব-জামাইকে শ্যালিকার হাতে সমর্পণ করে আমি ফুলিদির কাছে এলাম। রান্নাঘরে বসে ফুলিদি তখন গলদঘর্ম হচ্ছেন।

"তোমার তো হোটেল থেকে খাবার আনবার কথা ছিল?" ফুলিদিকে আমি জিজ্ঞেস করি।

একগাল হেসে ফুলিদি বললেন, "এ-জামাই আগের জন্মে ভাটপাড়ার বাউন ছিল। পেঁয়াজ পর্যন্ত খায় না। আমাকে দু'বার করে রাঁধতে হচ্ছে। আমার মেয়েদুটির তো পেঁয়াজ রসুন ছাড়া মুখে কিছুই রোচে না! সারাজন্ম ওদের টেবিল চেয়ারে খাওয়া অভ্যেস, এখন জামাইয়ের ইচ্ছে অনুযায়ী সবাইকে মেঝেতে বসে সাবেকী কায়দায় খেতে হচ্ছে। বাছা আমার কোত্থেকে আচমন পর্যন্ত শিখে এসেছে।"

এরপরে দিদির সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে। দিদি যে জামাই-এর ব্যবহারে মুগ্ধ তা তাঁর মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারি।

ফুলিদি আজকে বলেই ফেললেন, "প্রথমে বড্ড ভয় হয়েছিল, কিন্তু খুকি ছেলে পছন্দ ভালই করেছে। বড় বিনয়ী, আমার সঙ্গে ভাঙা ভাঙা বাংলা ছাড়া কথাই বলবে না। দুজনের যে বেশ মনের মিল রয়েছে তাও বুঝতে পারি। খুকির কথার অবাধ্য হয় না। কোথায় কোন শ্লোকে পড়েছে—যে-গৃহে মেয়েদের কথা চলে সেখানে লক্ষ্মী বিরাজ করেন।"

রূপসী বললো, "দিদির তো আজকাল শাড়ি পরতে অসুবিধে হয়—সব সময় স্লাক্স পরে। জামাইবাবু কিন্তু সুটের ধারে কাছে যান না—পাজামা পাঞ্জাবি এবং চপ্পল পরে বসে থাকেন।"

সুবর্ণরেখা বললো, "এখানে আসবার আগে ও দিনরাত এদেশের সামাজিক রীতিনীতি, আচার ব্যবহার সম্পর্কে পড়াশোনা করেছে। যত বলি, এসব আজকাল ইন্ডিয়াতে চালু নেই, বিশ্বাস করে না। আমাকে জ্বালিয়ে মারে, হাজার রকম প্রশ্ন করে।"

রূপসী বললো, "এপাড়ার অনেক মেয়ে ভাবছে, সায়েব-বর বাগাবার লোভে দিদি নিজে গায়ে-পড়ে অজানা ছেলেদের সঙ্গে মিশেছে। মোটেই তা নয়। লিন্ডসেদাই ভারতবর্ষের সংস্কৃতি সম্বন্ধে দিদির কাছে খবারখবর নিতেন। এর আগে কোনো ইন্ডিয়ান মেয়ের সঙ্গে ওঁর আলাপ হয়নি।"

জামাই যে ইতিমধ্যেই কিছুটা সংস্কৃত শিখেছে এবং রীতিমতো বাংলা পড়তে আরম্ভ করেছে জেনে আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম। কারণ আমার সংস্কৃত বিদ্যে তেমন সুবিধের নয় এবং জামাইয়ের কাছে কোন মামাশ্বশুর বেইজ্জত হতে চায়?

জামাই কিন্তু আমাকে অন্য ব্যাপারেও লজ্জা দিলো। বললো, "একটা মতবাদ আছে যে-নাটক উপন্যাস ছাড়া আর কোথাও দেশের মানুষদের প্রকৃত ছবি পাওয়া যায় না। অধ্যাত্মিক দেশ এই ভারতবর্ষ, যুগযুগান্ত ধরে কত রকমের সাধনা এখানে হয়ে চলেছে। এই কিছুদিন আগেই তো শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন। তারপর শ্রীঅরবিন্দ। কয়েকখানা বাংলা উপন্যাসের নাম করুন যেগুলো পড়লে এই স্পিরিচুয়াল ভারত সম্বন্ধে কিছু জানতে পারবো।"

ভেবেচিন্তে খবর দেবো এই বলে আমি প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলাম। কারণ অধ্যাত্মিক ভারতবর্ষ কোনো ভালো উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে বলে আমার জানা নেই। আজকাল প্রায় সব গল্প-উপন্যাসে স্পিরিটের কথা আছে, কিন্তু সে হলো বোতলের স্পিরিট—দিশি ধেনো থেকে আরম্ভ করে স্কচ হুইস্কি পর্যন্ত। শুধু অধ্যাত্মবাদ কেন, ট্রাডিশনাল ভারতের দর্শন, আশা-আকাঙ্‌ক্ষা, কামনা বাসনা আমাদের সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় না।

লিন্ডসের সঙ্গে যতই আলোচনা করেছি, ততই আমার দুশ্চিন্তা বেড়েছে। বেচারা যে-ভারতবর্ষের খোঁজ করছে কোথায় পাবো তারে? আমরা যে-পরিবেশে জীবন কাটাই সেখানে ওসবের নাম শোনেনি কেউ। ফুলিদি কিন্তু বেজায় খুশি। শুধু মাঝে মাঝে ভয় পান, জামাইয়ের যা হাবভাব, শেষ পর্যন্ত বিবাগী না হয়ে যায়।

ফুলিদি একদিন টেলিফোন করে বললেন, "শংকর, তুই শুনে খুশি হবি, খুকির বর এখানের বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি চাকরি পাচ্ছে। খুকিও কিছু-একটা যোগাড় করে নিতে পারবে। তাহলে আমার আর দুশ্চিন্তা থাকে না। আমেরিকা কি এখানে! অনেক দূর।"

আমিও আনন্দ প্রকাশ করলাম। কিন্তু তারপর মনে পড়ে গেলো, এর খারাপ দিকও রয়েছে। কিছুদিন পরে খবর পেলাম, লিন্ডসে বাবাজীবন ধুতি পাঞ্জাবি পরে বাজারে গেলে লোকে আড়চোখে দেখে, অনেকে সন্দেহ করে। সায়েবরা কুলীর মাথায় ঝুড়ি চাপিয়ে নিউ মার্কেটে বাজার করবে, থলি হাতে গড়িয়াহাটায় কেন? পাড়ার চায়ের দোকানে লিন্ডসেকে বসতে দেখলেও লোকে ঘাবড়ে যায়।

ফারপো এবং ফ্লুরি ছাড়া নাকি সায়েবদের মানায় না। সায়েবরা মোটর না চালিয়ে সাইকেল চড়বে এ-দৃশ্য সুশিক্ষিত ইন্ডিয়ানদের কাছেও অসহ্য। লিন্ডসে যখন সাইকেল চালিয়ে কলেজে যায় তখন পাবলিক ভাবে লোকটা হয় পাগল না হয় স্পাই।

মাঝে মাঝে বারওয়েল সায়েবের কথা মনে পড়ে যায়। সহজভাবে সাধারণের সঙ্গে মিশতে গিয়ে তিনিও বেশ ধাক্কা খেয়েছেন। উলঙ্গ ভিখিরির ছেলেকে রাস্তায় কাঁদতে দেখে সায়েব একবার তাকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। সেই দেখে রাস্তার অনেকে মন্তব্য করেছিল, সায়েবটা পাগল।

সায়েবের কাছে কয়েকজন ভারতপ্রেমিক বিদেশি আসতেন তাঁদের অবস্থা দেখেও আমার মনে হতো, যে-সব বিদেশি আমাদের জুতোর তলায় রাখে তাদেরই আমরা বেশী সম্মান করি। শ্বেতাঙ্গকে প্রভু ছাড়া অন্য কোন রূপে আমরা এখনও দেখতে শিখিনি। যাঁরা আমাদের সঙ্গে সমভাবে মিশতে চেয়েছেন এবং সাধারণ মানুষকে ভালবাসতে গিয়েছেন, তাঁরা বিপদে পড়েছেন। নির্লজ্জভাবে আমরা সেইসব উদারপ্রাণ বিদেশীদের কাছে গ্রহণ করেছি এবং প্রতিদানে দুঃ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণা ছাড়া কিছুই তাঁদের দিইনি। ডেভিড হেয়ার, সিস্টার নিবেদিতা, দীনবন্ধু এন্ডরুজ থেকে আরম্ভ করে বারওয়েল সায়েব পর্যন্ত অসংখ্য প্রমাণ দাখিল করা যায়। বিদেশে স্বজাতি বড়সায়েবদের সান্নিধ্য হারিয়ে এবং দরিদ্র ও দারিদ্র্য পরিবৃত হয়ে এঁরা এমন এক বিচিত্র নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেছেন যা সত্যি বেদনাময়। অথচ এঁরা মুখ ফুটে কখনও তা স্বীকার করেননি ; বরং হাসিমুখে স্বজাতির অপকর্মের পাপস্খলনের চেষ্টা করেছেন।

ম্যাক্সমুলার যদি ইন্ডিয়ায় আসতেন তাহলে কত ভোগান্তি তাঁকে সহ্য করতে হতো কে জানে। ইদানিংকালে হিপিদের সম্বন্ধেও আমাদের ঘেন্না, যেহেতু তারা খালি পায়ে নোংরা জামা পরে আমাদের দেশের কোটি কোটি লোকের মতো অর্ধনগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়ায়। এরা যদি অনেক টাকা খরচ করতো, বিরাট বিরাট গাড়িতে ঘুরে বেড়াতো, গ্র্যান্ড গ্রেট ইস্টার্নের ঠাণ্ডা ঘরে বসে বোতল বোতল হুইস্কি ওড়াতো, তাহলে আমাদের মোটেই আপত্তি থাকতো না। যে-সায়েব রিক্শা চড়ে, নিজের মোট নিজে বয়, পাইস হোটেলে ভাত খায় তাদের সম্বন্ধে আমাদের কোনো আগ্রহ নেই, তাদের আমরা পছন্দ করি না। কলোনিয়াল যুগে তৈরি সায়েবের ভাবমূর্তির সঙ্গে তারা মেলে না। শ্বেতাঙ্গকে হয় প্রভু না-হয় দেবতা ছাড়া আমরা কল্পনা করতে পারি না।

আমাদের এই অভাগা দেশকে নীরবে ভালবেসে কয়েকজন বিদেশি কীভাবে স্বজাতির বিদ্রুপ এবং আমাদের অবহেলার পাত্র হয়েছেন তা লিপিবদ্ধ করলে মহাভারত হয়ে যাবে। প্রমাণ হবে যে এখনও আমরা সমানভাবে মিশতে শিখিনি।

লিন্ডসে মিল্নার সম্বন্ধেও আমার ঐরকম একটা দুশ্চিন্তা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামান্য অধ্যাপনা করে তাকে মধ্যবিত্ত জীবন যাপন করতে হবে। সে নিজে তা বরদাস্ত করলেও, আমরা তা পারবো না। সে আমাদের যত ভালবাসবে আমরা তাকে তত অবহেলা করবো। কিন্তু মুখের ওপর এসব কিছু বলিনি। প্রাণ যা চায় তা করবার স্বাধীনতা ইউরোপ আমেরিকার নাগরিকরা এখনও উপভোগ করেন ; অথচ আমাদের আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদানের যথেষ্ট সন্ন্যাসী পাওয়া যায় না। আমাদের ডাক্তাররা বাড়তি টাকার লোভে মার্কিন মুলুকে কিংবা কানাডায় ছোটে, আর কুষ্ঠরোগীর ক্ষত মুচিয়ে দেবার জন্য পুরুলিয়ার হাসপাতালে সায়েব ডাক্তার ও নার্সের অভাব হয় না। পশ্চিমী সভ্যতার এই অন্তর্নিহিত শক্তির দিকটা আমাকে বিস্মিত করে। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যায়।

লিন্ডসে মিল্নার এখানে চাকরিতে যোগ দিয়েছিল। ছাত্ররা ওকে নিয়ে রসিকতা করতো। কারণ 'সাষ্টাঙ্গ প্রণাম' কাকে বলে এই প্রশ্নের উত্তর ছাত্ররা দিতে না পারলে সে রীতিমতো দুঃখ পেতো। ক্লাসে সে বলতো, "তোমরা নিজেদের আবিষ্কার করো ; আত্মবিস্মৃত জাতি কখনও দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে না।"

সৌভাগ্যক্রমে জামাই সম্বন্ধে আমার দুশ্চিন্তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মাস কয়েক পরেই শুনলাম, লিন্ডসে মিল্নার কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। রূপসী টেলিফোনে বললো, "লিন্ডসেদার মোটেই যাবার ইচ্ছে ছিল না। এখানকার বাসে-ট্রামে যা ভিড়, রাস্তাঘাটে যা ময়লা, খাবারে যা ভেজাল তা দিদির পক্ষে বরদাস্ত করা আর সম্ভব নয়। লিন্ডসেদাকে জোর করে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দিদি শ্বশুরবাড়ির দেশ নিউইয়র্কে ফিরে যাচ্ছে।"

সুচিত্রার সমস্যা

টি-ডবলু-এ বিমানে প্যারিস থেকে প্রায় সাড়ে-আট ঘণ্টা অবিরাম বিমানচারণা করে নিউইয়র্কে পৌঁছনো গেলো। নিউইয়র্কে কেবল এরোপ্লেন বদল এবং কাস্টমসের ঝামেলা চুকনোর পালা। আমার গন্তব্যস্থল ওয়াশিংটন, ডিসি।

লন্ডনের হিথরো এয়ারপোর্টে সরকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে যে-দুর্ব্যবহার পেয়েছিলাম ঠিক তার উল্টো পেলাম নিউইয়র্কে। মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে সবরকম বিধি-নিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে মার্কিন মুলুকে যথেচ্ছ ঘুরে

বেড়াবার স্বাধীনতা পাওয়া গেলো। সরকারী অফিসারটি সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে শুধু প্রশ্ন করেছিল, আমার কাছে কোনো ড্রাগ আছে কিনা। সঙ্গে কয়েকটা মাথাধরার বড়ি ছিল। সেকথা জানাতে অফিসারটি হেসে ফেললো। বললো, ওগুলো ড্রাগ নয়—মেডিসিন। ড্রাগ বলতে ওখানে গাঁজা সিদ্ধি ইত্যাদি নেশাভাঙের জিনিস বোঝানো হয়ে থাকে।

অফিসারটি আমাকে বুঝিয়ে দিলো কোথায় ওয়াশিংটনের পরবর্তী প্লেন পাওয়া যাবে এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে বললো, হ্যাভ এ গুড টাইম ইন আওয়ার কানট্রি!

এই 'গুড টাইম' কথাটা ওয়াশিংটনের প্লেনে চড়েও আমার মাথায় ভন ভন করে ঘুরছিল। মনের খুশীতে সময় কাটাবার উপদেশ বিদেশ যাত্রার আগে মাও আমাকে দিয়েছিলেন। মা বলেছিলেন, "বেড়াতে বেরিয়ে ঘরের কথা ভেবে মন খারাপ করিস না। যেখানে যেমন দেখবি সব মনে করে রাখবি—তুই ফিরে এলে গল্প শুনবো।"

কিন্তু নদী, পর্বত, সাগর, মহাসাগর পেরিয়ে যতদূরে যাই, ঘরের কথা—দেশের আপনজনদের কথা ভোলা সম্ভব হয় না। ওয়াশিংটনের হোটেলে আমার গৃহিণীর মাসীমা সুনয়না দেবীর চিঠি অপেক্ষা করে ছিল। কাজের চাপে এবং দেশ দেখার নেশায় আমি পাছে ভুলে যাই তাই মাসীমা মনে করিয়ে দিয়েছেন, আমাকে সুচিত্রার সঙ্গে একবার দেখা করতেই হবে। বলাবাহুল্য সুচিত্রা আমার প্রিয় শ্যালিকা ও মাসীমার একমাত্র কন্যা।

মার্কিন রাজধানীতে কয়েকদিন সময় কাটিয়ে বাস যোগে নর্থ ক্যারোলিনা গিয়েছিলাম। সেখান থেকে বিমানযোগে আবার নিউইয়র্কে ফিরে এসেছি। পৃথিবীর সবচেয়ে ঐশ্বর্যময়ী নগরী নিউইয়র্ক সম্পর্কে আমার প্রচণ্ড আগ্রহ। বাড়তি আকর্ষণ কলামবিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মণি নাগের সান্নিধ্য। ওঁর বাড়িতেই কয়েকদিন মাথা গুঁজবার ব্যবস্থা আগে থেকেই করা ছিল।

সুচিত্রার ব্যাপারটা যে এতো সিরিয়াস তা আন্দাজ করতে পারিনি। সুদীর্ঘ পত্রে মাসীমা লিখেছিলেন, "জানি বিদেশে তোমার সময়ের অনেক দাম, নিশ্চয় খুব ব্যস্ত আছো। তবু যদি মাসীমার মুখ চেয়ে সুচিত্রার খবরাখবর নিয়ে না আসো তাহলে আমি বাঁচবো না—হয়তো স্ট্রোকে মারা যাবো।"

ডক্টর নাগ সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। বললেন, "ইন্ডিয়ানদের এই দিকটা সঙ্গতভাবেই সায়েবরা পছন্দ করেন না। কয়েক সপ্তাহের জন্যে এখানে এসে সমস্ত সময়টা যদি ভাগ্না, ভাগ্নী, মাসীমা, কাকীমা, শ্যালিকাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেই কেটে যায়, তাহলে মার্কিনীদের সঙ্গে মিশবেন কখন? তাদের আবিষ্কার করবেন কীভাবে?"

অধ্যাপক নাগ যা বলেছেন, তা নির্জলা সত্য। কিন্তু আমি কি করি? সুনয়নাদেবী কাতরভাবে লিখেছেন, “মেয়ের চিঠিতে জানলাম রাতে তার ঘুম নেই। সেই খবর পেয়ে আমাকেও ঘুমের বড়ি খেতে হচ্ছে। সংসারে মেয়েদের অনেক কিছু হতে পারে যা বাবা-মাকেও লিখে জানানো যায় না।”

আমার মন খারাপ হয়ে গেলো, মানুষের জীবনযাত্রা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। আধুনিক এই যুগে ঘরে-ঘরে এমন ঘটনা ঘটছে যা টেলিফোনে বলা যায় না, কানে শোনা যায় না, চোখে দেখার কথাই ওঠে না।

অধ্যাপক নাগ পেশায় নৃতত্ত্ববিদ—সুতরাং প্রায় মুক্তপুরুষ। নর-নারীর কোনো সম্পর্ক সম্বন্ধেই ওঁদের লাজ-লজ্জার বালাই নেই। ওঁকে আমাদের মতো সাধারণ লোকের চক্ষুলজ্জার কথা বলে লাভ নেই।

নিউইয়র্কে আমাদের ঘরে আর একজন জাঁদরেল বাঙালী ভদ্রলোক বসেছিলেন। তিনি বললেন, “রচেস্টার দর্শনে আপনি যদি বদ্ধপরিকর হন, তাহলে যা-হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে। এখন আমাদের যে-আলোচনা চলছিল চলুক।”

সুচিত্রা সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে আমি নিউইয়র্কের রবিবাসরীয় আড্ডায় ছন্দপতন ঘটিয়েছি। এখানে সকলের সময়ের দামও প্রচণ্ড। আড্ডার টাইমে অন্য কিছু ভেবে সময় অপচয় করলে বন্ধুরা বিরক্ত হন।

বন্ধুদের আলোচনার বিষয় ইন্টারেস্টিং—জাত হিসেবে ভারতীয়দের বৈশিষ্ট্য। মিস্টার সেনগুপ্তর কাছেই শুনলাম, প্রত্যেক দেশ অন্য দেশের মানুষদের চারিত্রিক শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে একটা মতামত তৈরি করে রাখে। এসিয়া-বিশেষজ্ঞ সেনগুপ্ত জানালেন, “যেমন এবারের ইন্ডিয়া ট্যুরে গিয়ে ডেল্লিতে একটা ভ্যালুয়েবল শ্লোক শুনে এলাম। হুজুগে বাঙালী—হিকমতে চীনে।”

উক্তির ভাষ্য দিতে গিয়ে সেনগুপ্ত বললেন, “এর অর্থ হলো বাঙালীরা হুজুগ পেলে আর কিছুই চায় না ; আর চীনেরা চরম দুর্দশায় পড়লেও হিকমত দেখিয়ে দেয়। কলকাতায় বাঙালীও থাকে, চীনেও থাকে। গরীব বাঙালী হুজুগ তুলছে আর গরীব চীনে কলকাতার রাস্তা থেকে ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে তার থেকে পুতুল তৈরি করে বেচছে।”

সেনগুপ্ত আমার মতামত জানতে চাইলেন। কিন্তু তখন আমার মাথায় শুধু সুচিত্রার কথা ঘুরছে। তাই ওইসব তর্কাতর্কির মধ্যে ঢুকলুম না।

অধ্যাপক নাগ বললেন, “চীনে-ফিনে জানি না, তবে ভারতীয় সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্পর্কে এখানে কিছু কিছু সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা হয়েছে। এইসব রিপোর্ট সরকারী মহলেও পড়া হয়ে থাকে শুনি। অন্তত যেসব এদেশীয় ভারতবর্ষে যান তাঁরা নিশ্চয় পড়েন।”

তাতে কী থাকে জানবার জন্য সেনগুপ্ত সাংবাদিক-সুলভ কৌতূহল প্রকাশ করলেন। অধ্যাপক নাগ বললেন, "কনসেনসাস কথাটা ইংরিজীতে শুনে থাকবেন, এর ঠিক বাংলা জানি না। পণ্ডিতরা বলেছেন, হাজার হাজার বছর ধরে এই কনসেনসাস-প্রবণতা ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায়। নানারকম পরস্পর-বিরোধী মতের মধ্যে থেকে ভারতবর্ষ চেষ্টা করে কীভাবে একটা মোটামুটি মতৈক্যে পৌঁছনো যায়। কেউ পুরোপুরি হারলো না, দু-পক্ষই একটু-আধটু করে ছাড়লো।"

মার্কিনীদের প্রশংসা করে সেনগুপ্ত বললেন, "শ্যামচাচা তো আমাদের সম্পর্কে ডেনজারাস পয়েন্ট খুঁজে বার করেছেন।"

অধ্যাপক নাগ বললেন, "এরা বলছে, বিভেদের মধ্যে ঐক্য খুঁজে বার করবার কাজে ইন্ডিয়ার জুড়ি নেই। ভারতবর্ষে তাই বড় বড় চিন্তার বিপ্লব এসেছে, কিন্তু কখনও নতুনের সঙ্গে পুরনোর লাঠালাঠি হয়নি।"

"মানে?" সেনগুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন।

"এই ধরুন হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মর কথা। এক ধর্ম এসে অন্য ধর্মকে নির্বংশ করতে পারলো না। বরং দুটো মতের মধ্যে কোথা থেকে একটা সমঝোতা খুঁজে পাওয়া গেলো। হিন্দুরা বুদ্ধকে অবতার বলে মেনে নিলো, আর বৌদ্ধদের মধ্যে নিজেদের অজ্ঞাতেই হিন্দুত্বের অনেক গ্লানি ঢুকে গেলো, যার বিরুদ্ধে বুদ্ধ একদা বিদ্রোহ করেছিলেন। অর্থাৎ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কনসেনসাসের জয় হলো।"

সেনগুপ্ত বললেন, "এটা মোটেই ভাল কথা নয়। এই জন্যে উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরু একই সঙ্গে আমাদের পোড়া দেশে সহ-অবস্থান করছে, অথচ কোনো সমস্যার ফয়সালা হচ্ছে না।"

অধ্যাপক নাগ বললেন, "ভাল মন্দর প্রশ্ন উঠছে না, আমরা যা তাই। এই মানিয়ে-গুছিয়ে চলাটাই আমাদের শক্তি এবং আমাদের দুর্বলতা। আমাদের যৌথ পরিবারগুলো দেখুন। এ-সম্বন্ধে বিদেশী সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের প্রচণ্ড আগ্রহ। তাঁরা বলছেন, একান্নবর্তী পরিবারের কর্তা বা গিন্নী কখনও কঠোর হাতে শাসন করেন না। তাঁরা সব সময় পরিবারের নানা লোকের মধ্যে একটা কনসেনসাস খুঁজে বার করে সংসার চালিয়ে যাচ্ছেন।"

"তাহলে দাঁড়াচ্ছে কী?" আমি এবার জিজ্ঞেস করলাম।

মৃদু হেসে অধ্যাপক নাগ উত্তর দিলেন, "দাঁড়াচ্ছে এই যে, পণ্ডিতদের মতে মানিয়ে-গুছিয়ে চলার জাত হিসাবে আমাদের জুড়ি নেই। দুটো মতবাদ, চিন্তাধারা বা জীবনযাত্রার মধ্যে যতই দূরতিক্রম্য দূরত্ব থাকুক আমরা ঠিক সেতুবন্ধন করে ফেলবো। দেখবেন, এই কারণে আমেরিকাতেও ইন্ডিয়ানরা যত

সহজে নতুন কালচারের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেয় তা আর কোনো বিদেশী পারে না!”

“কী বলছেন মশায়?” প্রতিবাদ করলেন সেনগুপ্ত। “কত জাতের ছেলেমেয়ে দেখেছি—একবারে আমেরিকান হয়ে গেছে।”

আবার হাসলেন অধ্যাপক নাগ। বললেন, “দুটো চরম অবস্থা দেখতে পাবেন। হয় সেদ্ধ হয়ে, গলে গিয়ে, নিজের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে একেবারে মার্কিনী বনে গেছে—না হয় চীনেদের মতো আসেদ্ধ হয়ে আমেরিকাতেও পুরো চীনে থেকে গেছে। কিন্তু ইন্ডিয়ানরা দেখবেন আমেরিকানও হয়েছে অথচ ইন্ডিয়ানও রয়ে গেছে।”

“অর্থাৎ দুধ ও তামাক দুই খাচ্ছে, এই বলতে চান?” ফোড়ন দিলেন সেনগুপ্ত।

ঐ মানিয়ে-গুছিয়ে চলা কথাটা আমার খুব ভাল লেগে গেলো। সুচিত্রার সম্পর্কে হঠাৎ একটু ভরসাও পেলাম। ওর সমস্যা যা-ই হোক, দিদিমাদের পুরানো মানিয়ে-গুছিয়ে চলার উপদেশটাই সুচিত্রাকে আবার দিতে হবে—এবং মনে করিয়ে দিতে হবে, সায়েবরাও এখন স্বীকার করেছেন, ইন্ডিয়ানরা এই বিষয়ে যাদুকরের ক্ষমতা রাখে।

রচেস্টারের পথে বাসের সীটে বসেও সুচিত্রার কথা ভাবছিলাম। মধুর স্বভাবের সপ্রতিভ এই বালিকাটিকে আমি ফ্রক পরা অবস্থা থেকে চিনি। কোনো বিখ্যাত গ্লিসারিন সাবানের বিজ্ঞাপন অনুযায়ী, যখন সে ‘একটি সুন্দরী মহিলা হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে’ তখন থেকেই সুচিত্রার সঙ্গে আমার মধুর রসিকতার সম্পর্ক। তখন থেকেই কিছু কিছু চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়েছে। জামাইবাবুর পত্রাবলী সুচিত্রাদেবী সযত্নে রক্ষা করেছে।

এই সুচিত্রা যথাসময়ে আমেরিকা-প্রবাসী এই ছোকরার গলায় মালা দিলো। ব্যবস্থাটা সুনয়নাদেবীই করেছিলেন। রীতিমত পণ্ডিত ও সুদর্শন এই জামাই মাসে সাড়ে সাত হাজার টাকা রোজগার করে। সাড়ে-সাত হাজার টাকা মাইনের বর পেলে বাংলার সব মেয়েই যে মঙ্গল গ্রহ পর্যন্ত যেতে পারে এমন একটা মন্তব্য গিন্নী আমাকে শুনিয়ে দিয়েছিলেন। দোষের মধ্যে, আমি বলেছিলাম—অত দূরে বিয়ে কি ভাল হবে? সুচিত্রার দিদিমা ও আমি ছাড়া তখনই সকলেই খুশি। দিদিমা বলেছিলেন, “ছোটবেলায় নাতনীকে পৈ-পৈ করে বলেছিলাম, ডাল ঝাড়ার সময় কাছে আসিস না, কুলোর হাওয়া লাগবে। আর পা-ছড়িয়ে খাস না। তা নাতনী তখন কথা শুনলো না আর আমার মেয়ে কথাটা কানেই নিলো না। এখন বোঝো, তখনই জানি এ মেয়ের দূরদেশে বিয়ে হবে।”

আমেরিকাতে যখন সুচিত্রার প্রথম সন্তান হলো তখন আমরা অমিতের কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেয়েছিলাম। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে সুচিত্রা আমাকে জরুরী চিঠি লিখেছিল : "সাতদিনের মধ্যে মেয়ের নামকরণ করে পাঠিয়ে দেবেন। খাঁটি ভারতীয় নাম হবে, অথচ সায়েবদের যেন উচ্চারণ করতে কষ্ট না হয়। এখানে এক ভদ্রলোক মেয়ের নাম রেখেছিলেন সুশ্রুতা—এখন ইস্কুলে সেই মেয়ের যা অবস্থা। কেউ উচ্চারণ করতে পারে না, অদ্ভুত অদ্ভুত বিকৃতি ঘটছে।"

আমি খেটেখুটে, বই-পত্তর ঘেঁটে সুচিত্রার অনুরোধ রক্ষা করেছিলাম। কিন্তু সুচিত্রা সে চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার পর্যন্ত করেনি। শ্বশুরবাড়িতে শুনেছিলাম, সুচিত্রা আমার পরামর্শ অনুযায়ী মেয়ের নাম কুমকুমই রেখেছে, কিন্তু আমার ওপর সে ভীষণ চটেছে, হয়তো আমার সঙ্গে কোনোদিন কথাই বলবে না। ছ'মাসের কুমকুমকে কোলে নিয়ে সুচিত্রা যখন কলকাতায় ছুটি কাটাতে এসেছিল তখনও আমার ওপর রাগ কমে নি। আমি অবশ্য শ্যালিকা সন্দর্শনে গিয়েছিলাম। পর্যাপ্ত বর্ষণের পর লতাগাছগুলো যেমন সবুজ ও সতেজ হয়ে ওঠে সুচিত্রাকে তেমন প্রাণবন্ত দেখাচ্ছিল। দেহটি বেশ সুপুষ্ট হচ্ছে—অথচ কিছুতেই তাকে মোটা বলা চলেনা। সর্বদেহে নবমাতৃত্বের স্নিগ্ধ দীপ্তি। নবযৌবনের অস্থিরতা বিদায় নিয়েছে স্বভাব থেকে, তার বদলে চোখে মুখে ফুটে উঠেছে সেই প্রশান্ত দীপ্তি যা মধ্যযৌবনেও মেয়েদের মহীয়সী করে তোলে। সুচিত্রার কাছে নিজের মনোভাব গোপন রাখিনি! সাধুভাষায় সাহিত্যিক গাম্ভীর্য নিয়ে বলেছিলাম, "মহিলারা মাতা না হইলে প্রকৃত সুন্দরী হয় না।"

প্রশংসায় খুশি হওয়া সত্ত্বেও, পুরনো রাগ ভুলতে পারছিল না সুচিত্রা। বেশ গম্ভীরভাবেই বললো, "আপনার সঙ্গে কথা বলবো না ঠিক করে রেখেছিলাম।"

খুবই দুঃখের সঙ্গে বললাম, "ছেলেমেয়েদের নাম দেবার জন্যে লেখকরা আজকাল ফি নেয়। পারিশ্রমিক তো দূরের কথা আমি এক লাইন ধন্যবাদপত্র পর্যন্ত পেলাম না।"

সুচিত্রার বিরক্তির কারণটা এবার জানতে পারলাম। ইন্ডিয়ান অথচ আন্তর্জাতিক নাম ভাবতে গিয়ে একটা নামের বদলে হঠাৎ এক সেট নাম আমার মাথায় এসে গিয়েছিল। এবং এই আবিষ্কারের আনন্দে আমি সুচিত্রাকে লিখেছিলাম, "এই মেয়ের নাম দাও কুমকুম। সায়েবদের উচ্চারণ করতে মোটেই কষ্ট হবে না। কুমকুমের সঙ্গে ম্যাচ করে আরও দুটো মারাত্মক নাম মাথায় এসে গেছে। কুমকুমের বোনের নাম যদি 'আলতা' এবং 'টিপ' হয় তাহলে যা ছন্দ মিল হবে। ও দুটো নাম হারিও না। চিঠিটা যত্ন করে রেখে দিও।"

সুচিত্রা জানালো, যত্ন করে চিঠি রাখা তো দূরের কথা, সেই অমূল্য পত্রখানি

সে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। সুচিত্রার রাগের কারণটাও এবার বুঝতে পারলাম। সুচিত্রা মনে করেছে, আমি চাইছি তার শুধু পর পর কন্যারত্নই হয়ে যাক।

"আমি শুধু ছন্দের দিক ভেবেই নামগুলো তোমাকে পাঠিয়ে ছিলাম, সুচিত্রা। আমার অন্য কোনো দুরভিসন্ধি ছিলনা।" সুচিত্রাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু সুচিত্রা কিছুতেই আমাকে বিশ্বাস করতে চায় না। ওর ধারণা আমি দুষ্টুমি করেই তিনটে নাম পাঠিয়েছিলাম। আমি আবার বোঝাবার চেষ্টা করলাম, "তুমি কষ্ট করে মা হবে, সুতরাং ছেলে নেবে না মেয়ে নেবে—সে তোমার নিজস্ব চয়েস। আমরা বাইরের লোকেরা সেখানে নাগ গলাতে যাব কেন? তবে তোমার ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক আমাদের কাছে সমান আদর পাবে।"

একটা টাওয়েল জড়ানো অবস্থায় কুমকুম মায়ের কোলেই ছিল। নিজেকে বাঁচাবার জন্য বললুম, "কুমকুম না হয়ে ইনি যদি গুমগুম হতেন তাহলেও আমি সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতুম। তুমি অযথা রাগ করছো সুচিত্রা। কোনো দুষ্ট প্রকৃতির লোক তোমাকে আমার চিঠির ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছে। হয়তো তোমার এবং আমার পরিচিত এমন কেউ আছে যে চায় না তোমার সঙ্গে আমার সহৃদয় সম্পর্কটা উত্তপ্ত থাকুক।"

সুচিত্রা দেবীর মেঘলা মুখে ফিক করে একটু হেসে উঠলো। সে জিজ্ঞেস করলো, "বাগড়া দিয়ে লাভ?"

"আমার ক্ষতি করা। শ্যালিকা-সুখ থেকে আমাকে বঞ্চিত করা।" আমি উত্তর দিই।

সুচিত্রার মুখে হাল্কা হাসির ইঙ্গিত পেয়ে আমি বললুম, "চিঠিটা ছিঁড়ে না-ফেলে যদি ঠাণ্ডা মাথায় খুঁটিয়ে পড়তে, তাহলে দেখতে, আমি হয়তো আলতা এবং টিপকে আহ্বান করেছি, কিন্তু তোমার ছেলে না হোক এমন কথা কোথাও বলিনি। তোমার ছ'টা ছেলে হোক—আমাকে একটু খাটতে হবে, কিন্তু বঙ্গীয় শব্দকোষ দেখে এবং নকুল চট্টোপাধ্যায়র সঙ্গে কনসাল্ট করে আমি পরের পর নাম সাপ্লাই করে যাবো।"

"নকুল চট্টোপাধ্যায়টি কে?" সুচিত্রা বিরক্তভাবে জিজ্ঞেস করলো।

"ইনফরমেশন টাইকুন নকুল চট্টোপাধ্যায়—তামাম সাহিত্যিকদের গ্রন্থ ও গ্রহসংক্রান্ত উপদেষ্টা! আজকাল গ্রন্থ তো লিখলেই হলো না—রচনাকালে কোন্ গ্রহ কোথায় কী ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছেন তার খবরাখবর রাখতে হবে! কুমকুমের বেলায় নকুলবাবুকে কনসাল্ট করেছিলুম। আমি তো প্রথমে রাধিকা নাম দিতে যাচ্ছিলাম—দিশী নাম, অথচ এখন সায়েবরা পর্যন্ত এক ডাকে চেনে। কিন্তু নকুলবাবু স্ট্রংলি আপত্তি জানালেন। বললেন, 'র' দিয়ে আরম্ভ করা চলবে না—কারণ রচেস্টারের কাছ দিয়ে তোমার মেয়ের জন্ম-সময়ে এমন এক

হিংসুটে গ্রহ দৃষ্টি দিয়েছেন যিনি 'র' পছন্দ করেন না। আমাকে 'ক' অক্ষরে নাম দিতে হবে। সেই থেকেই তো আমার ফ্যাসাদ হলো, এমন ফ্যাসাদ যে শ্যালিকার সঙ্গে এতো বছরের সম্পর্ক নষ্ট হতে চলেছে।"

এইবার একগাল হেসে ফেললো সুচিত্রা। এবং ফাঁস করলো যে আমার চিঠিটা শেষ পর্যন্ত ছেঁড়া হয়নি। সুচিত্রা ছিঁড়ে ফেলতে যাচ্ছিল, কিন্তু স্বামী অমিত হুমড়ি খেয়ে পড়ে সেই চিঠি উদ্ধার করেছে। সুচিত্রা বললো, 'আমিও ভাবলাম রেখে দিই। আমার যদি আবার মেয়ে হয়, ঐ চিঠির সঙ্গেই একটা 'পত্রবোমা' দিয়ে আপনার নামে ফেরত পাঠাবো।"

তারপর কয়েক বছর হয়ে গেছে। সুচিত্রার আর কোনো সন্তান হয়নি এবং পত্রবোমাও আসেনি। পত্রবোমা বলতে সুনয়নাদেবীর এই পত্র।

বাস চলেছে রচেস্টারের দিকে। আর ক্রমশ আমার চিন্তা বাড়ছে।

রচেস্টারে আমার এখন যাবার কথা নয়। কোনোরকমে মাত্র কয়েকঘণ্টা সময় ম্যানেজ করেছি। মাত্র কয়েকঘণ্টা সময় হাতে এইভাবে রচেস্টারে যেতাম না, যদি-না সুচিত্রা সম্পর্কে সুনয়নাদেবী আমাকে এইভাবে চিন্তিত করে তুলতেন। সুচিত্রার সমস্যাটা কী হতে পারে ভাবছিলাম। মাসীমা এমনও ইঙ্গিত দিয়েছেন, প্রয়োজন হলে সুচিত্রা আমার সঙ্গে দেশে ফিরে আসতে পারে।

অমিতের সঙ্গে কিছু হলো নাকি? অমিতের মুখটা মনে পড়ে গেলো। সুদর্শন অমিত ছেলেটি তো ভদ্র এবং শান্তশিষ্ট। কথা কম বলে। সে কখনও গণ্ডগোল পাকাতে পারে না। কিন্তু ভরসাও পাচ্ছি না। শঙ্করীদার কথা মনে পড়লো। তিনি বলেন, "শান্তশিষ্ট গোবেচারা ছেলেরাই হৃদয়সংক্রান্ত ব্যাপারে বেশী গণ্ডগোল পাকায়। হেঁকো-ডেকো ছেলেদের সম্বন্ধে আমরা দুশ্চিন্তা করি, কিন্তু তারা কখনও বেশী দূর এগোয় না। পরনারী থ্রম্বোসিস তাদের বিশেষ হয় না।"

শঙ্করীদার বলবার অধিকার আছে, কারণ কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষার সঙ্গে তিনি অনেকদিন সহ-অবস্থান করছেন।

মনে পড়লো, সুচিত্রার মা আমাকে কিছুদিন আগে পশ্চিমের ডাইভোর্স সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। আমি কোনোদিন ওদেশে যাইনি, আমার বিদ্যে বই থেকে এবং কিছু শোনা কথা থেকে। তার ওপর নির্ভর করে কতটুকু উত্তর দেওয়া যায়? শুধু এইটুকু বলেছিলাম, "পশ্চিমে বিয়েটা ভাঙে একটু বেশী। আজকাল আমাদের দেশেও ঘরে ঘরে ফাটা বিয়ে রয়েছে। ছেঁড়া সম্পর্কে তাপ্পি দিয়ে চালিয়ে নেবার অভ্যেস আমাদের দেশের গৃহকর্মনিপুণা ধৈর্যবতী মেয়েদের আছে—ওদেশে নেই। ওরা কেউ ফাটা বাসন ব্যবহার করে না।"

শাশুড়ী-সুলভ গাম্ভীর্য ত্যাগ করে সুচিত্রার মা আরও যা জিজ্ঞেস করেছিলেন, তা আমি ভেবেছিলাম পাঠিকা-সুলভ কৌতূহল। সুনয়নাদেবী বলেছিলেন,

"মেয়ের চিঠি পড়লে তো রক্ত হিম হয়ে আসে। হুদো-হুদো স্বামী-স্ত্রীরা নাকি অন্য কারুর সঙ্গে প্রেম করছে এবং তারপরেই ঘর ভাঙছে। দোজবউ তেজবউ-টা কিছুই নয়। এসব কি সত্যি?"

আমি বলেছিলুম, "সে-দেশের লোক যা ভালবাসে তাই করে—আমাদের কী এসে যায় বলুন।"

সুনয়নাদেবী সন্তুষ্ট হতে পারেননি। বলেছিলেন, "এসে যায় বৈকি, বাবা। এইসব সায়েবদের হাতেই তো ক্ষমতা—এরাই তো দুনিয়া চালাচ্ছে। এদের সঙ্গেই তো আমার মেয়ে জামাইকে মিশতে হয়।"

আমি বলতে গিয়েছিলাম, "ওরা যে দুশ্চরিত্র তা নয়। তবে বিয়ের আগে বহুজনের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করে ; বিয়ের পরেও অনেকের সেই অভ্যেসটা যেতে চায় না। সমাজ একদিক থেকে বেশ গোঁড়া। আইবুড়ো ছেলে-মেয়েদের জন্যে অবাধ লাইসেন্স, কিন্তু বিয়ের মন্তর পড়লেই কঠিন আইনকানুন, সব স্বাধীনতা বাতিল হয়ে গেলো।"

মনে পড়ছে, সুচিত্রার মা ওদের জন্যে কোনোরকম সহানুভূতি প্রকাশ করেননি। বলেছিলেন, "বিয়ের পরেও যারা চপল চঞ্চল থাকে তাদের ক্ষমা করা যায় না। গল্প-উপন্যাসে এদের কখনও আস্কারা দিও না। ছেলেমেয়েরা তো তোমাদের বই পড়েই শিখবে।"

পশ্চিমী হাওয়া শেষ পর্যন্ত অমিতের গায়েও লাগলো ভেবে আমি শিউরে উঠছিলাম। আহা, সুচিত্রা মেয়েটি বড় ভাল। কুমকুমও এতোদিনে নিশ্চয় খুব মিষ্টি হয়েছে। (ওর বয়স বছর সাতেকের বেশি হয়নি বলেই মিষ্টি কথাটা লিখতে সাহস করলাম। আজকালকার যুবতী মেয়েরা এই বিশেষণ মোটেই পছন্দ করে না, ওদের অঙ্গে লাগে। রেগেমেগে জিজ্ঞেস করে, মেয়েরা কি খাবার জিনিস, যে মিষ্টি বলছেন?)

সুচিত্রার সুখী সাংসারিক পরিবেশে স্বয়ং অমিত গাঙ্গুলী ছাড়া কে আর তিক্ততা সৃষ্টি করতে পারে? ভগবানের ওপরও রাগ হলো। সংসারের হাজার রকম জট ছাড়িয়ে জীবনে একবার কয়েকদিনের জন্যে বিদেশে বেড়াতে এলাম, এখনও মুক্তি দিলেন না। এখানেও স্নেহভাজনীয়া কারও চোখে জল দেখতে হবে।

বাসের হাল্কা নীল কাঁচের মধ্য দিয়ে সুচিত্রাকে দূর থেকে দেখতে পেলাম। নীল রংয়ের এক নাইলন শাড়ি পরে বিষণ্ণ মেডোনার মত দাঁড়িয়ে রয়েছে, বাসস্ট্যাণ্ডের ঠিক বাইরে।

বাসস্ট্যাণ্ডে অমিতকে না দেখে বুকটা আমার ছ্যাঁৎ করে উঠলো। সুচিত্রাকে তাহলে একলা আসতে হয়েছে। আমি মনস্থির করে ফেললাম। আমি তো মাত্র

দু'তিন ঘণ্টা থাকবো। তারপরেই তো আমাকে এয়ারপোর্টে ছুটতে হবে। এয়ারপোর্ট থেকেই সুচিত্রার মাকে আমি বিস্তারিত রিপোর্ট দিয়ে দেবো। ওঁর মতামত আমি এদেশে থাকতে থাকতেই এসে যাবে। তখন যা হয় করবো। তেমন প্রয়োজন হলে হলিউড যাওয়া বন্ধ রেখে সুচিত্রার কাছে ফিরে এসে ফয়সালা করে ফেলবো।

বাস থেকে নামতেই সুচিত্রা এগিয়ে এলো। ওর শ্রী এবং স্বাস্থ্য প্রায় একরকমই আছে, শুধু আগেকার সবুজ সতেজ ডাঁসা-ভাবটা নজরে পড়ছে না।

মুখে হাসি ফুটিয়ে সুচিত্রা আমাকে ওয়েলকাম করলো। অভিনয়ে সব মেয়ের জন্মগত অধিকার। সুচিত্রার ওই হাসির আড়ালে কতবড়ো কালো মেঘ লুকিয়ে আছে ভেবে আমার কষ্ট হলো।

"এলেন তাহলে, শংকরদা?" সুচিত্রা বললো।

"না এসে উপায় আছে? এই রকম শ্যালিকার আকর্ষণে লোকে উত্তর মেরু পর্যন্ত যেতে পারে," আমি সরস উত্তর দেবার চেষ্টা করি।

অমিত সম্পর্কে প্রশ্ন তোলাটা সমীচীন হবে কিনা ভাবছি। সুচিত্রা বললো, "খুব তো ভালবাসা। প্ল্যাটফরমে দেখা করে পালাতে চান। একদিন রাত কাটাতে রাজী হচ্ছেন না।"

অন্য সময় হলে এই রাত কাটনোর নিমন্ত্রণ সম্পর্কে বিবাহিতা শ্যালিকার সঙ্গে কত রসিকতা করা যেতো। কিন্তু এখন সে-সময় নয়। বললুম, "আজকে শুধু বুড়ি ছোঁয়া। আমেরিকা ছাড়বার আগে আবার আসবো।"

সুচিত্রা বেশ গম্ভীর হয়ে উঠলো। বললো, "আপনি কীরকম লাকি, শংকরদা! কয়েকদিন পরেই আমেরিকা ছেড়ে চলে যাবেন। আমার কপাল খারাপ। আমি রোজ প্রার্থনা করছি, ঠাকুর আমাকে এখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।"

সিরিয়াস বিষয়ের অবতারণা আশঙ্কায় আমি ভিতরে ভিতরে ঘামতে লাগলাম। বড় সরল মেয়েটা। ফ্রকপরা বয়স থেকে হাসিখুশি দেখে এসেছি—ওর চোখে জল দেখতে ইচ্ছে করে না।

"কফি খাবেন?" সুচিত্রা জিজ্ঞেস করলো। ভাবলুম একবার বলি, বাড়িতে গিয়েই খাবো। কিন্তু বাড়ির অবস্থা কি জানি না। তাই সে কথা তুলতে সাহস হলো না। বললুম, "চলো, ওই কাফেটারিয়াতে বসা যাক।"

কফির কাপে চামচ নাড়তে নাড়তে সুচিত্রা বললো, "এখান থেকে চলে যাবার জন্যে রোজ ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি, অথচ ছ'মাস আগেও এ-দেশ আমাদের খু-উ-ব ভাল লাগতো।

তাহলে গণ্ডগোলটা বিশেষ পুরনো নয়, সুচিত্রার কথা থেকেই আন্দাজ করলাম। মূল সমস্যার ভিতরে না ঢুকে, কিছুমাত্র জানবার আগ্রহ প্রকাশ না করেই

বললাম, "দেশটা তো সোনার দেশ। মানিয়ে-গুছিয়ে নাও, আবার ভাল লাগবে। এখানকার পণ্ডিতদের কাছে শুনলাম, মানিয়ে-গুছিয়ে নিতে ইণ্ডিয়ানদের জুড়ি নেই।"

সুচিত্রার চোখ ছলছল করে উঠলো। "মানিয়ে-গুছিয়ে নেবার প্রশ্নই ওঠে না, শংকরদা। আমার যা-হয় হোক, কিন্তু কুমকুমের ভবিষ্যৎ এইভাবে নষ্ট হতে দেবো না।"

তাহলে আমি যা আশঙ্কা করেছি, তাই ঠিক। সুচিত্রা বললো, "ও এখানে নেই।"

তাহলে ব্যাপারটা শেষ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। অমিত এখানে নেই। আমি বললাম, "ওর সঙ্গে আমার দেখা হলে ভাল হতো।"

ফোঁস ফোঁস করে উঠলো, সুচিত্রা, "খুবই ভাল হতো। হয়তো আপনার কথার কিছুটা মূল্য দিতো।"

মনে মনে বললাম, পার্সোনাল ব্যাপারে আজকাল কেউ কারুর কথার মূল্য দেয় না। সুচিত্রাকে বললাম, "অমিত যে চলে গেছে তা মাসীমাকে জানিয়েছো?"

গম্ভীর মুখে সুচিত্রা বললো, "জানাবো কি করে? এখনও তো দু'দিন হয়নি।"

খুবই নাটকীয় সময়ে তাহলে এসে পড়েছি—আপন একজনকে কাছে পেয়ে সুচিত্রা একটু ভরসা পাবে। বললুম, "কিছু ভেবো না, সুচিত্রা। ওপরে ঈশ্বর আছেন, সব ঠিক হয়ে যাবে?" তারপর জিজ্ঞেস করলুম, "আমি যে আসছি তা অমিত খবর পেয়েছিল?"

আমার আশঙ্কা হলো ভায়রা-ভায়ের সঙ্গে দেখা করার ভয়েই অমিত পালিয়েছে। আমার আন্দাজই ঠিক। সুচিত্রা বললো, "আপনার চিঠিটা ও-ই তো নিয়ে এলো। বললো, ব্যাড লাক। শংকরদার সঙ্গে দেখা হলো না।"

সুচিত্রার বাড়িতে এসে গেলাম। বাসস্ট্যাণ্ড থেকে বাড়ি বেশি দূরে নয়। ঘড়ির দিকে তাকালাম। এয়ারপোর্টে গিয়ে প্লেন ধরতে কত সময় লাগবে হিসেব করতে লাগলাম।

সুচিত্রা বললো, "বাড়িতে ঢুকেই ঘড়ি দেখবেন না, শংকরদা। আমি খোঁজখবর করে রেখেছি। আপনি দু-ঘণ্টা নির্ভয়ে থাকতে পারেন। তারপর ইয়োলা ক্যাবকে ফোন করে দেবো। আপনাকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাড়ি থেকে তুলে নেবে। এখানে এই সুবিধে। ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে গাড়ি না থাকলেও ওরা ওয়ারলেসের মাধ্যমে মেসেজ পাঠিয়ে দেয়। প্রত্যেক ট্যাক্সিতে বেতার যন্ত্র আছে, তার খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে হাজির হবে। আপনি ঠিক সময়ে এয়ারপোর্ট পৌঁছে যাবেন।"

অন্য সময় হলে সুচিত্রার সংসার আমি ঘুরে ঘুরে দেখতাম। কিন্তু এখন যা

মনের অবস্থা তাতে সংসার দেখে লাভ কী? চুপচাপ বসে সময় কাটিয়ে বিদায় নেওয়াই ভাল।

সময় যখন অল্প তখন আসল সমস্যাগুলো আর না এড়িয়ে আলোচনা করে নেওয়া উচিত। জিজ্ঞেস করলাম, "কুমকুম কোথায়?"

সুচিত্রা বললো, "ইস্কুলে। আপনার সঙ্গে দেখা হবে কিনা সন্দেহ। কারণ আজ আবার ইস্কুলে কি সব ফাংশন আছে।"

জেরা করতে সাহস হলো না। বেচারা কুমকুমকে সুচিত্রা হয়তো ইচ্ছে করেই সরিয়ে দিয়েছে, যাতে আমার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে। সুচিত্রা বললো, "আপনি আসবেন বলে পায়েস তৈরী করে রেখেছি, শংকরদা। পায়েস তো আপনার ফেভারিট।"

"সে ওয়ান্স-আপন-এ-টাইমের কথা, সুচিত্রা। এই বয়সে তোমার দিদির বকুনি ছাড়া কিছুই মুখে রোচে না।"

মনে একটু সুখ থাকলে সুচিত্রা যে অনেক কিছু রেঁধে রাখতো তার ইঙ্গিত পেলাম। এ সময়ে খাওয়ার তেমন কথাই ওঠে না। তবু ওদের ডাইনিং টেবিলে গিয়ে বসতে হলো। ফ্রিজ থেকে সুচিত্রা পায়েসের বাটি বার করে দিলো। পায়েসের মধ্যে চামচ চালিয়ে আমি এবার সমস্ত হলঘরটা দেখে নিলাম। ছবির মতন সাজানো সংসার। এমন সংসারের সুখী গৃহিণী সুচিত্রা। এইরকম একটা রিপোর্ট মাসীমাকে পাঠাতে পারলে কী সুখের হতো।

মিষ্টি খেতে খেতে তেতো আলোচনা ভাল লাগে না। কিন্তু সময় খুবই অল্প। সুতরাং আমাকে বলতেই হলো, "তোমাকে নিয়ে মাসীমার খুব চিন্তা।"

"চিন্তা আমারও, শংকরদা। শুধু চিন্তা নেই ওই ভদ্রলোকের, যার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছেন আপনারা। এতো করে বলছি, তবু কানে নেয় না।"

"ব্যাপারটা কী, যদি একটু গুছিয়ে বলো।" আমি পায়েস আস্বাদ করতে করতে শ্যালিকাকে অনুরোধ জানাই।

এবার যা শুনলাম, তাতে আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। গোলমালটা অমিতকে নিয়ে নয়। সে এখন শ্যালিকার শাসনাধীনেই রয়েছে। সমস্যাটা কুমকুমকে নিয়ে। অমিত হঠাৎ কী এক সেমিনারে শিকাগো গেছে। আগামীকাল ফিরবে।

আনন্দে আমি উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। তাতে সুচিত্রা ভুল বুঝলো—"মেয়ে নিয়ে আমি বিপদে পড়েছি, আর আপনি হাসছেন।"

আমি বলে ফেললাম, "আমি ভেবেছিলাম, তোমার ঘাড়ে বাঘ পড়েছে। বাঘিনীও বলতে পারো।"

সুচিত্রা আমার ইঙ্গিত বুঝতে পারলো কিনা জানি না। বললো, "বাঘিনী এক

আছেন। আমাদের প্রতিবেশী। জনের মা। জন ছেলেটি কুমকুমের বয়সী। কুমকুম ওখানে যাতায়াত করে।"

আবার দুশ্চিন্তা হলো। যা সব বাল্যপ্রণয়ের রিপোর্ট আজকাল কাগজে পড়ি। তবে হিসেব-টিসেব করে নিশ্চিন্ত হয়ে বললুম, "সবে তো সাত বছর বয়স। এখন থেকে দুশ্চিন্তা করে লাভ কী সুচিত্রা?"

সুচিত্রা বললো, "ও যদি নিজের দেশে একটা চাকরি পেতো তাহলে আমি বেঁচে যেতাম, শংকরদা।"

বললুম, "হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নেই, সুচিত্রা। অমিত শুনেছি মান্থলি দশ হাজার টাকার ওপরে মাইনে পাচ্ছে। ওই ধরনের চাকরি, যতদূর জানি স্বদেশে একটাই আছে—দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ভবনে।"

সুচিত্রা আমার ব্যঙ্গে কান দিলো না। বললো, "ডলারকে সাড়ে সাত দিয়ে গুণ করে কে চাকরি চাইছে, শংকরদা? একটা আট-নশো টাকার চাকরি পেলেই ওকে জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো আমি। টাকার চেয়ে একমাত্র মেয়ের ভবিষ্যৎ আমার কাছে অনেক দামী।"

বললাম, "হলো কী? এতো ভেঙে পড়ছো কেন সুচিত্রা?"

সুচিত্রার চোখে জল। "আমি কোন পথ খুঁজে পাচ্ছি না। এখান থেকে পালিয়ে যাওয়াটাই একমাত্র উপায় মনে হচ্ছে।"

"আহা আহা! কেঁদো না। তুমি কাঁদলে মাসীমাকে সে-রিপোর্ট দিতে হবে। এবং মেয়ের চোখে জল পড়ছে শুনলে মাসীমা শয্যা নেবেন, ব্লাডপ্রেসার তালগাছে চড়ে বসবে।" আমি সুচিত্রাকে সাবধান করে দিই।

ঘরের এক কোণে কুমকুমের ছবি রয়েছে। হাসিখুশি বালিকার রঙীন-ছবি। দেখে মোটেই দুষ্টু মনে হয় না। মায়ের চোখে জল ফেলাবার জন্যে সে যে দায়ী হতে পারে তা কল্পনাই করা যায় না।

বললুম, "ইস্কুলে পড়াশোনা করছে তো? বাবা কত বড় স্কলার, তুমিও পড়াশোনায় খারাপ ছিলে না, স্কুল-ফাইনালে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছিলে, তোমাদের মেয়ের তো পড়ায় খারাপ হওয়া উচিত নয়।"

সুচিত্রা স্বীকার করলো মেয়ে পড়াশোনা মন্দ করছে না। স্কুলে যেতে কাঁদে না। যদিও তার আগের অধ্যায়ে বেশ চিন্তার কারণ হয়েছিল। সুচিত্রা মনে করিয়ে দিলো, "আপনি তো জানেন ওর কথা ফুটতে দেরি হয়েছিল। আমাদের কী যে ভয় হয়েছিল, বোবা হবে নাকি।"

বললুম, "শুনেছিলুম বটে মাসীমার কাছ থেকে। মাসীমা আবার নাক-কানের বড় ডাক্তার তড়িৎদার সঙ্গে দেখা করলেন। তড়িৎদা বললো, বিদেশে অনেক সময় ও-রকম হয়ে থাকে। বাবা-মায়ের কাছে বাংলা শুনছে, তারপর সেই বাবা-

মা'র মুখে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে অনর্গল ইংরিজী বলতে শুনছে, বাইরে খেলার পার্কে সমবয়সীদের মুখে শুধু ইংরেজী শুনছে, এতে বাচ্চারা ঘাবড়ে যায়। ওদের বুলি ফুটতে দেরি হবেই তো।"

সুচিত্রা বললো, "কুমকুমের ঠিক তাই হলো। দিনরাত টিভি দেখতো। শেষে কথা ফুটলো, কিন্তু প্রথমে ইংরিজী।"

"তারপর?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"তারপর জনের মা এগনেসের সঙ্গে আলাপ হলো আমার। উনিও এখানে আসেন, আমিও ওঁদের বাড়িতে যাই! আমরা দুজনেই চাকরি করি না—তাই হাতে দুপুরবেলায় অনেক সময় থাকে।"

"গিন্নীদের পাড়া-বেড়ানো তাহলে এখানেও আছে," আমি আনন্দ প্রকাশ করি।

"গৃহিণীসম্মেলন আছে—তবে কী দিয়ে ভাত খেলি জিজ্ঞেস করবার পালা নেই। আর নারীগণের পতিনিন্দা নেই, বরং পতি-প্রশস্তি আছে।"

"এটা তো খুবই ভরসার কথা," আমি পুনরায় আনন্দ প্রকাশ করি।"

সুচিত্রা বললো, "পতিনিন্দার স্টেজেই এখানকার কেউ পৌঁছোয় না। 'হনি-হনি' 'ডার্লিং-ডার্লিং' করতে করতেই একদিন তালাক দিয়ে বসে। এই একটা বিশ্রী অভ্যাস এখানকার। কথায় কথায় ডাইভোর্স!"

আমি বললাম, "স্বামীকে বা বউকে চিরকাল ভালবাসুক না বাসুক—সন্তানদের প্রতি ভালবাসা আছে তো? মায়েরা তো সব দেশেই এক শুনেছি—কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কভু না হয়!"

সুচিত্রা বললো, "ছেলেপুলেকে ভীষণ ভালবাসে এগনেস—কিন্তু ভালবাসার রকম-সকমই অন্যরকম। ছেলেকে যে কী শিক্ষা দেয়, ভগবান জানেন।"

পায়েসের বাটি শেষ করে আমি সুচিত্রার মুখের দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে থাকি।

সুচিত্রা বললো, "ওইসব থেকেই তো আমার বাড়িতে গোলমাল শুরু হলো। কুমকুম তখন আরও একটু ছোট। আমাকে একদিন বললো, মা জন আমাদের বাড়িতে এলে আমার কোনো খেলনায় হাত দিতে দেবো না।"

আমি কুমকুমকে বকুনি দিলাম। "ছিঃ, জনকে খেলনা না দিলে আমি ওর মায়ের কাছে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবো না। জনের মা ভাববেন, আমি তোমাকে কুশিক্ষা দিচ্ছি।"

কুমকুম সেদিন কিছু বললো না। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জনকে তার খেলনাগুলো দিলো এবং জন সেদিন দু-একটা খেলনা ভেঙেচুরে বিদায় নিলো। আমি কুমকুমকে বোঝালাম, ভেঙেছে তো কী হয়েছে? জন তোমার ভাই হয়। আমি তোমাক আবার খেলনা কিনে দেবো।

কুমকুম তখনকার মতো শান্ত হয়ে গেলো। কিন্তু পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। একটু আগেই জনের বাড়িতে গিয়েছিল সে। চোখ মুছতে মুছতে সেই সঙ্গে বেশ রাগের সঙ্গে কুমকুম বললো, "তুমি শুধু আমাকে বকো। বলো জনকে খেলনা দাও। আর জনের বাড়িতে গেলাম, ও আমাকে একটা খেলনাতেও হাত দিতে দিলো না। ভয় দেখালো, খেলনায় হাত দিলে আমার মাথা ভেঙে দেবে।"

"তুমি কী করলে?" আমি কুমকুমকে জিজ্ঞেস করলাম।

কুমকুম যা বললে, তাতে আমি বেশ লজ্জায় পড়ে গেলাম। কুমকুম বললো, "আমি জনের মাকে বললাম, জন আমাকে খেলনায় হাত দিতে দিচ্ছে না। আন্টি শুনলো, কিন্তু জনকে কিছু বললো না।"

সুচিত্রা থামলো। আমি এই পর্যন্ত শুনে বললাম, "ভদ্রমহিলা বেশ স্বার্থপর।"

সুচিত্রা একমত হলো না। "তাই বা কী করে বলি? খুব জেনারাস—কুমকুমকে জামা কিনে দিয়েছেন, পুতুল কিনে দেন।"

"তাহলে?" আমি জিজ্ঞেস করি।

সুচিত্রা বললো, "কুমকুমের কথা শুনে আমি ভেবে ভেবে যাই আর কি! কুমকুমের বাবা পরামর্শ দিলেন মনের মধ্যে ভাবনা পুরে না রেখে, জনের মা'র সঙ্গে কথা বলো। আমি দোনোমনো করছিলাম। কিন্তু যা অবস্থা দেখলাম, এ বিষয়ে একটা সমাধান না হলে কুমকুম একদিন হয়তো ওদের সামনেই সীন ক্রীয়েট করে বসবে। হয়তো সেও বলে দেবে, জনকে কোনো খেলনা দেবো না। অগত্যা একদিন এগনেসের কাছে গেলুম। তাকে খোলাখুলি সব বললুম। উপদেশ চাইলাম।

এগনেস মোটেই বিরক্ত হলো না। লেখাপড়া জানা মহিলা—কিছুদিন কলেজে পড়েছে। এগনেস বললো, "তোমরা অন্য কালচার থেকে এসেছো—এখানকার কালচার এখনও বুঝতে পারোনি। আমার মনে হয় তুমি মেয়ের অপকার করছো।"

আমি রেগে গেলুম। বললুম, "মেয়েকে এই বয়স থেকে স্বার্থপরতা শেখাবো?"

এগনেস বললে, "চিত্রা, ব্যাপারটা তুমি বুঝছো না। জনের ওপর আমার নিজের ইচ্ছেটা কেন জোর করে চাপিয়ে দেবো? জনের যদি ইচ্ছে হয় এবং সে যদি চায় কুমকুমের সঙ্গে সে নিজের খেলনা শেয়ার করবে, আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু তার ইচ্ছে না হলে আমি কেন জোর করবো?"

আমি খোলাখুলি বললাম, "আমার মেয়ে যাতে স্বার্থপর না হয় তার জন্যে এখন থেকেই আমাকে চেষ্টা করতে হবে। আমার মা শুনলে দুঃখ পাবেন।"

এগনেস বললো, "তুমি ওকে উদারতার শিক্ষা দিচ্ছ না, ওকে হিপক্রিট হতে

বাধ্য করছো। মনের ইচ্ছে একরকম এবং মুখে আরেক রকম হবার কপট ট্রেনিং আমি জনকে দেবো না। তাহলে ওর মন নোংরা হয়ে যাবে।"

শ্যালিকাকে প্রশ্ন করলাম, "তুমি কী সিদ্ধান্তে এলে?"

সুচিত্রা উত্তর দিলো, "আমি নিজের পথেই চলবো। এগনেস যা-ই বলুক, সবার সঙ্গে মিলেমিশে মানিয়ে-গুছিয়ে থাকবার শিক্ষা তো মেয়েকে দিতেই হবে।"

সেই মতোই চালিয়ে যাচ্ছিল সুচিত্রা। নিজের সমস্ত স্নেহ-মমতা ও পরিশ্রম দিয়ে নিজের দেশের আদর্শযোগ্য করেই কুমকুমকে সে মানুষ করে যাচ্ছিল। কিন্তু আবার গণ্ডগোল বাধলো।

সুচিত্রা বললো, "শংকরদা, আপনি তো ছোটবেলা থেকে আমাকে দেখছেন। সেই ছোটবেলা থেকেই মাকে আমি কী ভীষণ ভালবাসতাম। মা'র কথার অবাধ্য হয়েছি কখনও? মায়ের দুঃখ আমাদের দেশের মেয়েরা ছোট বয়স থেকেই বোঝে। মায়ের কত ফাইফরমাশ খাটতাম।" আবার সুচিত্রার চোখ ছলছল করে উঠলো। আঁচল দিয়ে একবার চোখ মুছে ফেললো।

আমি অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, "আমার কাছে লজ্জা কী? বলে ফেলো, সুচিত্রা।"

সুচিত্রা বললো, "জানেন তো এখানকার অবস্থা—পয়সা ফেললেও ঝি-চাকর পাওয়া যায় না। এই সংসারে হাজার রকম কাজ আমাকে একা করতে হয়।"

"সে-সব তো শুনেছি তোমার মায়ের কাছে। তোমার দিদিকে বলেওছি, সুচিত্রা এখন শুধু রাঁধে না—বাসন মাজে, ঘর ঝাঁট দেয়, বাথরুম পরিষ্কার করে, মায় অমিতের ঘাড়ের চুল ছেঁটে দেয়। এক কথায় রাঁধুনি কাম তোলা ঝি কাম মেয়ের আয়া কাম মেথরানী কাম ধোপানী কাম নাপতেনী কাম শয্যাসঙ্গিনী কাম গার্লফ্রেণ্ড কাম সেক্রেটারি কাম নার্স।"

"তোমার দিদি অবশ্য দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন। বললেন, যদি ভেবে থাকো, আমিও সে রকম হচ্ছি তাহলে খুব ভুল করেছো। আমিও রেগেমেগে শুনিয়ে দিলুম, তোমার মাসতুতো বোন যদি অমন হতে পারে, তাহলে তুমি পারবে না কেন? তেমার দিদি ঠোঁট উল্টে বললেন, আমার মাসতুতো বোনের বর যত টাকা মাইনে পায় তার দশ ভাগের এক ভাগ তুমি রোজগার করো।"

সুচিত্রা বললো, "দিদিকে বকুনি দিয়ে চিঠি লিখতে হবে তো। বরকে কোথায় অনুপ্রেরণা দেবে, তা নয় আত্মসম্মানে আঘাত দিচ্ছে।"

"যদি পারো, একটু লিখো", আমি কাতর অনুরোধ জানাই শ্যালিকাকে। "কলকাতায় বেশীর ভাগ লেখকের স্ত্রীদের ধারণা সাহিত্যিকদের কোনো আত্মসম্মানবোধ নেই। অমন-যে-অমন দোর্দণ্ড লেখক অমুক বাবু, যাঁর লেখা

পড়তে তুমি খুব ভালবাসতে, যাঁর একটা কলমের খোঁচায় সমাজবিপ্লব হয়ে যেতে পারে, তাঁর ওয়াইফ বাড়িতে ওঁকে মিনসে বলে চিৎকার করে ডাকেন।”

এতো দুঃখের মধ্যেও সুচিত্রা ফিক করে হেসে ফেললো। আমি বললাম, “নিজের দুঃখের কথা থাক। তোমার কথা শোনাও।”

সুচিত্রা বললো, “এদেশে সংসার চালাতে কি পরিশ্রম হয় তাহলে আপনি তো জানেন। একে লোকজন নেই, তার ওপর ঘরদোর ঝকঝকে তকতকে রেখে দিতে হবে—কোনো মার্কিন বন্ধু এসে পড়লে যাতে ডার্টি বলে বদনাম না হয়।”

একটু থেমে সুচিত্রা বললো, “ঘরদোর পরিষ্কার করতে করতে কোমর ব্যথা হয়ে যায় শংকরদা। একদিন শরীরটা খুব খারাপ, সর্দি-জ্বরের মতো লাগছে। কুমকুম স্কুল থেকে ফিরে এলো। ওকে খেতে দিলুম, তারপর বললুম, লিভিং রুমের দরজা-জানালা আর ফার্নিচারগুলো একটু মুছে দিবি, লক্ষ্মীসোনা?”

আবার থামলো সুচিত্রা। তারপর বললো, “যে-মেয়ের জন্য এতো করি, সে আমাকে যা উত্তর দিলো তা শুনে আমার মাথা বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে লাগলো।”

আমি বললুম, “ডাক্তার দেখাও শ্যালিকা। বড় সামান্য ব্যাপারে মাথা ঘুরছে। পারবো না—এ-কথাটা ছোট ছেলেমেয়েদের মুখে লেগেই থাকে। তুমি এই প্রথম মা হয়েছো, তাই জানো না।”

সুচিত্রার দুঃখ কমলো না। বললো, “পারবো না বললে, আমার দুঃখ থাকতো না। বুঝতাম, ছেলেমানুষী করেছে। কিন্তু ও যা বললো তা মুখে আনা যায় না। কুমকুম ঘর দুটো খুঁটিয়ে দেখলো। তারপর বললো, করতে পারি। কিন্তু কত টাকা দেবে?”

কুমকুমের উত্তর শুনে তার মায়ের ফেন্ট হবার অবস্থা। মেয়ে বলে কী! ঘরের কাজ করে দেবার জন্যে পয়সা চাইছে!

সুচিত্রা বললো, “আমি বকুনি লাগালাম, ছিঃ কুমকুম, বাবা-মায়ের কাজ করে পয়সা চাইতে নেই।”

সুচিত্রা বলে চললো, কিন্তু কুমকুম অটল। জিজ্ঞস করলো, “কেন আমাকে ঠকাতে চাও? সেদিন যে-লোকটা এসে তোমাদের জলের পাইপ সারালো তাকে পয়সা দিলে আর আমাকে দেবে না কেন?”

“শুনুন মেয়ের কথা। ‘আমাদের’ জলের পাইপ বললো না, বললে ‘তোমাদের’। আমি তবু বিরক্তি না দেখিয়ে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। যিনি কল সারিয়ে গেলেন উনি বাইরের লোক। আর তুমি হচ্ছো আমাদের আপনজন। আপনজনের কাছে পয়সা চইতে নেই।”

“কুমকুমের মাথায় আমার কথাগুলো ঢুকলো না। সোজা বললো, ওসব জানি না, পয়সা না দিলে কাজ হবে না।”

"চোখে জল এসে গেলো। ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কুমকুম আবার বললো, তুমি মা হতে পারো, কিন্তু কাজ করিয়ে পয়সা দেবে না কেন?"

"বুঝুন একবার! আমার ভীষণ অভিমান হলো। আমি বললাম পয়সা দিয়ে কাজ আমি মরে গেলেও করাতে পারবো না। তোমাকে কাজ করতে হবে না, আমি নিজেই সব করে নেবো।"

সুচিত্রা ভেবেছিল, এবার ফল হবে। কুমকুম এবার নিজের ভুল বুঝতে পেরে এগিয়ে আসবে। কিন্তু কুমকুম দাঁড়িয়ে রইলো, কোনো উত্তর দিলো না।

সুচিত্রা বললো, "ভীষণ দুঃখ হলো আমার। আমরাও তো মেয়ে ছিলাম। এমন নিষ্ঠুর তো কখনও হতে পারিনি। তারপর ভাবলাম, রাগ করে লাভ নেই—মেয়েকে বোঝাতে হবে। ওকে ডেকে খুব আদর করলাম। বললাম, কুমকুম, তোমাকে আমি আর বাপি কত ভালবাসি। তোমার সেবার অসুখ করলো, আমাদের কত দুঃখ হলো, তোমার ইস্কুল থেকে আসতে দেরি হলে আমি ছটফট করি। তবু আমার কাজ করতে তুমি পয়সা চাইবে?"

কুমকুম গম্ভীর হয়ে ভাবলো একটু। তারপর বললো, "তুমি বলতে চাও, জনের মা জনকে ভালবাসে না? জন তো পয়সা ছাড়া বাড়ির কোনো কাজ করে না ; কত পয়সা দেবে সে নিয়ে রীতিমতো দরদস্তুর হয়।"

সুচিত্রার মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল, সোজা বললো, "তোমাকে আমার কথা মতো চলতে হবে। এ-বাড়িতে কী নিয়ম চালু থাকবে তা আমি ঠিক করবো। চোখের সামনে থেকে মেয়েকে দূর করে সরিয়ে দিলুম। ওর বাবা তখন ছিল না এখানে। দু'দিন পরে ফিরতেই ব্যাপারটা বললুম। প্যান্ট-কোট-টাই পরে বড় বড় গাড়িতে ঘুরে বেড়ালেই সভ্য হওয়া যায় না। যে-দেশে ছোট ছেলেমেয়েও পয়সা ছাড়া বাপ-মায়ের কাজ করে না, তাকে সভ্য দেশ বলে না।"

সুচিত্রা যে রেগেছে তা বুঝলেন কুমকুমের বাবা। বললেন, "রাগ কোরো না, শরীর খারাপ হবে। আমি বরং কুমকুমের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দেখি।" সুচিত্রা বললো, "আমাদের যুগে কথাবার্তা নয়, থাপ্পড়ই ছিল এর ওষুধ। কিন্তু যে-দেশে বাস করছি, সে-দেশে থাপ্পড় মারলে মেয়ে হয়তো থানায় রিপোর্ট করবে।"

সুচিত্রা বললো, "আমার সামনেই কুমকুমের সঙ্গে ও কথাবার্তা বললো। বুঝলাম, মেয়ের কাঁচা পয়সার লোভ হয়েছে—ইস্কুলে ছেলেমেয়েদের হাতে পয়সাকড়ি দেখে। সেই পয়সায় তারা ইচ্ছেমতো জিনিসপত্তর কেনে। আমি বললুম, আমাদের সময়ে তো ভাল ফ্যামিলির ছেলেমেয়েদের হাতে পয়সা থাকতো না। যখন যা দরকার হতো বা কেনার ইচ্ছে হতো মাকে বললেই আনিয়ে দিতেন। বুঝতে পারছি, এখন আর ও নিয়ম চলবে না।"

সুচিত্রা আবার একদিন কুমকুমকে ধরলো। বললো, "তোমার পয়সার

দরকার হলে চেয়ে নেবে। এই নাও এক ডলার। যা ইচ্ছে কিনবে।”

খুব খুশি হলো কুমকুম। পয়সাটা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে নিলো। সুচিত্রা তখন বললো, “দেখো কুমকুম, এই যে তোমাকে পয়সা দিলুম এর সঙ্গে কাজকর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। দরকার হলে তুমি পয়সা চাইবে—কিন্তু কখনও কাজ করতে বললে, পয়সার কথা তুলবে না। এতে বাপির আমার অপমান হয়, মনে কষ্ট হয়।”

এই পর্যন্ত বলে সুচিত্রা থামলো। আমি ওকে অভিনন্দন জানালাম, “জটিল সমস্যার বেশ সহজ সমাধান করলে।”

“সমস্যার সমাধান হলো কই?” সুচিত্রা দুঃখের সঙ্গে জানালো। “মেয়ে এসে বলে, এটা কিনবো। আমি পয়সা দিয়ে দিই। তারপর হঠাৎ জনের মা টেলিফোন করলেন, এখনই একবার আসতে চান। এখানের এই নিয়ম। পাশের বাড়ির লোক হলেও হঠাৎ বেল টিপবে না। ফোন করে, অনুমতি নিয়ে বাড়িতে আসবে।

জনের মা এসে সুচিত্রাকে বেডরুমে নিয়ে গেলেন। দরজা বন্ধ করে বললেন, “চিত্রা, আমি তোমাকে সাবধান করে দিতে এসেছি। কুমকুমের ভবিষ্যৎটা তুমি নষ্ট করছো কেন? কুমকুম তোমাদের মেয়ে, তাকে নষ্ট করার এভরি রাইট তোমাদের আছে। কিন্তু এর ফলে আমার জনেরও নৈতিক অধঃপতন হচ্ছে।”

ভদ্রমহিলার কথা শুনে সুচিত্রা তো অবাক—“আপনি কী বলছেন?”

এগনেসের কাছে জানা গেলো, জন গতকাল মায়ের কাছে দু’ডলার চেয়েছে। জন-এর মা সঙ্গে সঙ্গে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। বললেন, “তোমার লজ্জা করে না জন? কাজ না করে পয়সা চাইছো? জন তাতে বেশ রেগে ওঠে। কুমকুমের কথা তুলে বলে, পয়সার সঙ্গে কাজের সম্পর্ক কী? কুমকুমের মা তো ওকে বলে দিয়েছে, দরকার হলেই পয়সা চাইবে।”

এগনেস গম্ভীরভাবে বললেন, “চিত্রা, প্লিজ ডোন্ট মাইণ্ড। কিন্তু তুমি নিজের সন্তানের আত্মসম্মান নষ্ট করছো। তাকে ভিখিরী হতে উৎসাহ দিচ্ছো। আমি তো জনকে একশো ডলার দিতে পারি। কিন্তু কেন দেবো?”

সুচিত্রা বললো, “শংকরদা, বুঝুন ব্যাপারটা। আমার মেয়েকে দুটো পয়সা দিলে সেটা ভিক্ষা দেওয়া হলো। আমি কিন্তু ছাড়ছি না। এখান থেকে আট মাইল দূরে আর এক বাঙালী থাকেন। মিস্টার এণ্ড মিসেস্ কর। ওঁদের ছেলের বয়সও আট-নয় বছর। ওঁদের একই সমস্যা—ছেলেকে কাজ করতে বললে পয়সা চাইছে। ওঁরা একটু নরম প্রকৃতির মানুষ। বলছিলেন, যস্মিন দেশে যদাচার। ভাবছেন ছেলেকে মজুরি দিয়েই কাজ করাবেন। আমার কর্তাও ওঁদের দিকে ঝুঁকতে যাচ্ছিলেন। আমি কিন্তু খাপ্পা হয়ে উঠেছি। বলেছি, কিছুতেই না। বিদেশে আছি বলে সন্তানকে অমানুষ করতে পারবো না। বাবা-মায়ের কাছে পয়সা নিয়ে

কাজ করবে, এ হতে দেবো না।”

সুচিত্রার সমস্যা শুনে আমিও গম্ভীর হলাম। বললাম, “ব্যাপারটা কঠিন বটে।”

সুচিত্রা বললো, “জিনিসটা আমার কাছে মোটেই ছোট নয়। মেয়ের সঙ্গে বাপ-মায়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কটা এর ওপরেই নির্ভর করছে। দরকার হলে আমি কুমকুমকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেবো। আমিও না হয় কয়েক বছর দেশে গিয়ে থাকবো। ও তো নিজের দেশে চাকরি পাবে বলে মনে হয় না। কিন্তু সে যাই হোক, মেয়েকে আমি বাড়ির কাজের জন্যে পয়সা দেবো না। মেয়ে এখনও নিজের গোঁ নিয়ে বসে থাকে—আমিও ওকে কিছু করতে বলি না।”

ভাবলাম, সুচিত্রাকে বলি, মানিয়ে-গুছিয়ে চলো। কিন্তু এক্ষেত্রে কী উপায়? ছোট্ট এই ঘটনার মধ্যে ভারতবর্ষ ও পশ্চিমের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মুখোমুখি সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। পনেরো মিনিট ধরে অনেক মাথা ঘামালাম। কোনো সমাধান খুঁজে পেলাম না। এগনেস যা বলেছেন, তার মধ্যে যুক্তি আছে। ওঁরা শিশু বয়স থেকে সন্তানদের আত্মনির্ভর করে তুলতে চাইছেন। ওঁরা ভাবছেন ইন্ডিয়ানরা সন্তানদের পরনির্ভর করে রাখেন, বড় বয়সেও তারা খোকা হয়ে থাকে, জাতটা ভিখিরীর জাতে পরিণত হয়। আর সুচিত্রা ভাবছে, সংসারের গোড়ার কথা। বাবা-মা এবং সন্তানদের ভালবাসার মধ্যে পবিত্রতা থাকবে। সে-সম্পর্ককে পয়সা কেন কলুষিত করবে?

দুই সভ্যতার এই সংঘর্ষ সুচিত্রার সংসারে অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এটা এড়িয়ে যেতে পারলেই ভাল। কিন্তু কোনো পথ তো খুঁজে পাচ্ছি না।

সুচিত্রা বললো, “আমি অনেক ভেবেছি শংকরদা। ওঁর সঙ্গে তো রাতের পর রাত ধরে আলোচনা করেছি। মিস্টার এণ্ড মিসেস্ করও ভেবেছেন। কিন্তু মানিয়ে-গুছিয়ে চলার পথ তো খুঁজে পেলাম না।”

বললাম, “আমি উঠি সুচিত্রা। প্লেনে বসেই মাসীমাকে বিস্তারিত লিখে নেবো। ওঁরা সে-যুগের মানুষ, সমাজতত্ত্বও পড়েননি। তবু তো মা, জেনে রাখুন।”

প্লেনে বসেই সুনয়নাদেবীকে আমি সব লিখেছিলাম। বলেছিলাম “আমি কোনো আশা দেখছি না। তবে সুচিত্রাকে আপনি ভাবতে বারণ করে দেবেন। না-হলে ওর শরীর খরাপ করবে।”

রচেস্টার থেকে বেরিয়ে নানা পথ ঘুরে সপ্তাহ দুয়েক পরে আমি ডেনভারে হাজির হয়েছিলাম। ওখানে হোটেল থেকে সুচিত্রাকে দূরপাল্লার ফোন করলাম। ভাবলাম, জেনে নিই ও আমার সঙ্গে কলকাতায় ফিরবে কিনা।

ওপার থেকে সুচিত্রার স্বর পরিষ্কার শুনতে পেলাম। "শংকরদা, কবে আসছেন?" সুচিত্রাকে বেশ খুশি-খুশি মনে হচ্ছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "অমিত, কুমকুম ওরা কেমন আছে?" সুচিত্রা হৈ হৈ করে বললো, "খু-উ-ব ভাল। শংকরদা, সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। পরশু মা'র চিঠি পেয়েছি। মাকে সব লিখে দিয়ে আপনি যা উপকার করেছেন। এখন ভাবছি, মাকে আগে লিখিনি কেন? ওঁরা তো সেকালের জয়েন্ট ফ্যামিলির মেয়ে, মানিয়ে-গুছিয়ে চলতে ওঁদের তুলনা নেই।"

"সমাধানটা কী?" আমার জানবার প্রবল আগ্রহ হলো।

সুচিত্রা টেলিফোনের ওধার থেকে বললো, "মা লিখেছেন, সামান্য ব্যাপারে অত ভাববার কী আছে? কুমকুম এখনকার মতো মিস্টার করের বাড়িতে কাজ করুক, আর মিস্টার করের ছেলে সঞ্জয় তোর বাড়িতে কাজ করে টাকা রোজগার করুক। তাহলে ওদেরও কেউ ভিখিরী বলবে না, তোমাদেরও মনে কষ্ট হবে না। জানেন শংকরদা, মিস্টার কর তো হাতে চাঁদ পেয়েছেন। আমার কর্তা একটু আগেই কুমকুমকে মিস্টার করের বাড়িতে কাজ করবার জন্যে নিয়ে গেছেন। মিস্টার করের ছেলে কাল আমাদের ঘরদোর পরিষ্কার করতে আসবে।"

আমি স্তম্ভিত। সুচিত্রা বললো, "রাগ করে কী লাভ? আমাদের মানিয়ে-গুছিয়ে চলতে হবে। তাই না?

আমার উত্তরের আগেই ডেনভার-রচেস্টার দূরপাল্লার টেলিফোন কেটে গেলো।

যস্মিন দেশে যদাচার

রচেস্টার থেকে ডেনভারের পথে যে ক'টি বড় বড় জায়গায় যাত্রাভঙ্গ করেছিলাম তার মধ্যে বোস্টন অন্যতম। আমেরিকান সংস্কৃতির মহত্তর দিক সম্বন্ধে যাঁরা আগ্রহী, বোস্টন তাঁদের কাছে তীর্থস্থানের মতো। বোস্টনের অদূরেই দুই পৃথিবী-প্রসিদ্ধ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি, সংক্ষেপে এম-আই-টি।

বোস্টনের বিমানবন্দরে নেমেই প্রথমে কিন্তু আমার বন্ধু প্রিয়ব্রতর কথা মনে পড়ে গেলো। প্রিয়ব্রত বার বার বলেছিল, "যখন বোস্টনে যাচ্ছিস তখন মিস্ ডরোথি গ্রাহামের সঙ্গে অবশ্যই দেখা করিস!"

বিমানবন্দর থেকে হোটেলে পৌঁছে ডাইরি খুললাম, মিস্ গ্রাহামের ঠিকানা প্রিয়ব্রত গোটাগোটা করে লিখে দিয়েছে।

বিদেশে যাবার ঠিক আগেই আমি প্রিয়ব্রতর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য—ওর কাছ থেকে বিদায় নেওয়া। "বিদেশে দৈবের বশে জীবতারা যদি খসে, তাহলে ব্রাদার মনে-টনে রাখিস—যদি কখনও মনঃকষ্ট দিয়ে থাকি তবে ক্ষমা করিস।" বন্ধুকে এই ধরনের কিছু একটা বলবো ভেবে গিয়েছিলাম।

কিন্তু প্রিয়ব্রত চ্যাটার্জি মনমরা হয়ে বাড়িতে বসে আছে। আমাকে দেখেই প্রিয়ব্রতগৃহিণী মনে ভরসা পেলেন, মুখে একটু হাসি ফুটে উঠলো। বললেন, "খুব ভাল হলো। ওকে দেখুন তো, কী হয়েছে ওর।"

ঘরে ঢুকে দেখলাম প্রিয়ব্রত চুপচাপ বসে চিন্তা করছে। সামনের কাপে চা ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে রয়েছে। ছাইদানির ওপর একটা সিগারেট জ্বলে যাচ্ছে। অন্য সময়ে আমাকে দেখলেই প্রিয়ব্রতর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। সংসার, সমাজ, সাহিত্য ইত্যাদি নিয়ে নানা গল্পগুজব হয়। আজ কিন্তু তেমন কোনো উৎসাহ দেখলাম না প্রিয়ব্রতর মধ্যে। গভীর কোনো সমস্যার মধ্যে ডুবে রয়েছে সে।

জিজ্ঞেস করলুম, "কী হলো? বাংলা পাঁচের মতো মুখ করে বসে আছিস কেন?"

প্রিয়ব্রত বললো, "বোস। একটা কোশ্চেনের উত্তর দিতে পারিস?"

"একটা কেন, দশটা কোশ্চেনের উত্তর দিতে পারি। কিন্তু তার আগে, তোর এই অবস্থা কেন বল? বউ-এর সঙ্গে ঝগড়া করেছিস? কতবার বলেছি, তোর মেয়ে বড় হচ্ছে, এখন আর ওয়াইফের সঙ্গে মনোমালিন্য নিরাপদ নয়।"

প্রিয়ব্রত সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানালো। বউ সম্বন্ধে সে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছে না। প্রিয়ব্রতর মনোরাজ্য জুড়ে এই মুহূর্তে একটি মাত্র মহিলা বিরাজ করছেন—তাঁর নাম মিস্ ডরোথি গ্রাহাম।

ভীষণ বকুনি দিতে যাচ্ছিলাম প্রিয়ব্রতকে। গল্প-উপন্যাসের নায়করা এবং চলচ্চিত্রের তারকারা যা-ই করুক, সংসারে নায়কদের রোমান্টিক কোনো সমস্যায় জড়িয়ে পড়াটা মোটেই নিরাপদ মনে করি না। বললাম, "প্রিয়ব্রত, তোকে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, তোর মেয়ের বয়স আট বছর হতে চলেছে।"

প্রিয়ব্রত বললো, "তুই যা ভয় পাচ্ছিস তা নয়, যদিও 'এ সপ্তাহ কেমন যাবে'তে ভৃগু লিখেছেন অপরিচিতা অবিবাহিতা রমণী কর্তৃক মানসিক অশান্তি সৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা।"

"ব্যাপারটা তা হলে কী?" আমি জানতে চাই।

"তার আগে তুই আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দে।"

"বল।"

"ঈশ্বর কাদের জন্য আমেরিকা সৃষ্টি করেছিলেন?" প্রিয়ব্রত জিজ্ঞেস করলো।

বললুম, "এমন কিছু শক্ত কোশ্চেন নয়। সোজা উত্তর, আমেরিকানদের জন্যে।"

"বেশ!" প্রিয়ব্রত খুশি হলো। ছাইদানি থেকে আধপোড়া সিগারেট তুলে একটা টান দিয়ে প্রিয়ব্রত জিজ্ঞেস করলো, "চায়না এবং রাশিয়া বাদ দিয়ে রেস্ট অফ দি ওয়ার্লড ঈশ্বর কেন সৃষ্টি করেছিলেন?"

"তুই ভীষণ গোলমেলে সব প্রশ্ন করছিস। কোশ্চেনটা ভাগবানকেই করা উচিত তোর", আমি প্রস্তাব করি।

"কোশ্চেনটার উত্তর আমি পেয়ে গেছি, ব্রাদার। তোর কাছে শুধু মিলেয়ে নিতে চাই", প্রিয়ব্রত ঘোষণা করলো।

"তাহলে শুধু শুধু কেন দগ্ধাচ্ছিস? উত্তরটা দে," আমি আবেদন জানাই।

"বাকি পৃথিবীটা তৈরী হয়েছে ফরেন-ট্যুরিস্টদের জন্যে," প্রিয়ব্রত বললো।

আমি মুখিয়ে উঠতে চাইছি, প্রিয়ব্রত আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, "তুই দেখ। কলকাতার রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখার জন্যে কী যুক্তি দেখাচ্ছি? না, ফরেন-ট্যুরিস্টরা নোংরা পছন্দ করে না। কাগজে লিখছে, ভিখিরীদের কলকাতার কয়েকটা জায়গা থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া দরকার, কারণ ভিখিরীরা ফরেন-ট্যুরিস্টদের বিরক্ত করে। বস্তি উন্নয়ন এবং শ্রমিকদের কোয়ার্টার তৈরি থেকেও অগ্রাধিকার দিয়ে এদেশে আমরা ইন্দ্রপুরীর মতো হোটেল তৈরী করছি, কারণ ফরেন-ট্যুরিস্টরা এসব পছন্দ করে। পার্কে ফুলগাছ বসানো থেকে আরম্ভ করে মদ খাবার, সাঁতার কাটবার সব ব্যবস্থা আমরা করছি ফরেন-ট্যুরিস্টদের নামে।"

আমি তর্ক করি, "দেখিস নি প্রাইম মিনিস্টার জনসাধারণের কাছে আবেদন করেছেন, ট্যুরিস্টরা হলো আমাদের সম্মানিত অতিথি। অতিথিদের আদর-আপ্যায়ন করাটা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির একটা অঙ্গ।

প্রিয়ব্রত কান না দিয়ে বললো, "মায় কলকাতার দাঙ্গা-হাঙ্গামা সম্পর্কে আমরা যে চিন্তিত তার কারণ ফরেন-ট্যুরিস্টরা কলকাতা এড়িয়ে যাচ্ছে। যেন, ফরেন ট্যুরিস্টরা যদি দাঙ্গা-হাঙ্গামা পছন্দ করতো তা হলে এ বিষয়ে আমাদের আপত্তি ছিল না।"

"প্রিয়ব্রত, তোর হলো কী?" আমি জিজ্ঞেস করি। "মড়া কলকাতার ওপর আর খাঁড়ার ঘা দিস না। আফটার অল, আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের ম্যাপ থেকে কলকাতা উঠে যেতে বসেছে। একের পর এক বিমান-কোম্পানি কলকাতা থেকে পাততাড়ি গুটোচ্ছে।"

প্রিয়ব্রত বললো, "কালকেই একজন রাজনৈতিক নেতাকে ইন্টারভিউ করছিলাম। উনি বললেন, ওরা একদিন পিকিং ছেড়েও পালিয়েছিল। দুটো পয়সার লোভে ওরা জাহান্নামে যেতেও রাজী আছে। দেখছেন না, এখন আবার

পিকিং-এ আপিস খোলবার জন্যে কত ছুটফটানি!"

"এটা নিশ্চয় তোর নিজস্ব মত নয়," আমি প্রিয়ব্রতকে জিজ্ঞেস করি।

প্রিয়ব্রত বললো, "আমার চাকরিই হলো লোকের কাছে মতামত সংগ্রহ করা, তুই তো জানিস। তারপর সেইসব মতামত যোগ-বিয়োগ করে ছবি আঁকবার চেষ্টা করি আমি। আমার নিজস্ব মতামতের কোনো দাম নেই।"

বিলেত থেকে গ্যালপ পোলের এই দুরূহ কাজটা শিখে এসে প্রিয়ব্রত বিখ্যাত এক বিজ্ঞাপন এজেনসির সঙ্গে যুক্ত আছে। বিভিন্ন কোম্পানি এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সে জনমত সংগ্রহ করে বেড়ায়, তারপর সেইসব মতামত বিশ্লেষণ করে রিপোর্ট দেয়। অমুক সিগারেট থেকে অমুক সিগারেট আপনি কেন ভালবাসেন? তাজা বলে? স্বাদ চমৎকৃত বলে? না, প্যাকেট চকচকে বলে? অনেক সময় চাঞ্চল্যকর সব তথ্য বেরিয়ে যায়। কোম্পানির বড়কর্তাদের ধারণা ছিল, অমুক সিগারেটের তামাক কড়া বলেই জনপ্রিয়। জনমত বিশ্লেষণে কিন্তু দেখা গেলো, অমুক সিগারেটের বিজ্ঞাপনে যে-মেয়েটির ছবি ছাপা হয় তাকে খুব মনে ধরেছে বলেই লোকে সিগারেট কিনছে।

সম্প্রতি সরকারের পক্ষ থেকেও কিছু কিছু কাজ করছে প্রিয়ব্রত। যেমন ট্যুরিস্টদের সম্পর্কে একটা সমীক্ষা চালাচ্ছে। প্রায়ই তাকে এয়ারপোর্টে এবং বিভিন্ন হোটেলে যেতে হয়; জেনে নিতে হয়, এতো দেশ থাকতে তাঁরা কেন ইন্ডিয়াতে বেড়াতে এলেন? ইণ্ডিয়ার মধ্যে কলকাতাকে তাঁরা প্রথম পছন্দ করলেন কেন? কী কী সুখ তাঁরা ইন্ডিয়াতে প্রত্যাশা করেন? যেসব ট্যুরিস্ট প্লেনে ভারত ছাড়ছেন তাঁদেরও নানা প্রশ্ন করে প্রিয়ব্রত এবং তার সহকারীরা। এই কাজের জন্যে কয়েকটি শিক্ষিতা সুন্দরী মহিলাকে পার্টটাইম কাজ দিয়েছে প্রিয়ব্রত।

এইসব স্মার্ট মহিলারা যেসব প্রশ্ন করেন তা অনেক মাথা ঘামিয়ে তৈরি করা হয়েছে। পর্যটকদের উত্তরগুলো প্রয়োজন হলে কমপিউটরে ঢুকিয়ে নানা সমস্যা সমাধানে কাজে লাগানা হবে। এইসব প্রশ্নের মধ্যে আছে—ইন্ডিয়াতে সবচেয়ে আপনার কী ভাল লেগেছে? কোন্ কোন্ জায়গা এবং কোন্ অভিজ্ঞতা আপনার খারাপ লেগেছে? আর কী কী সুখ পেলে আপনি এদেশে আরও বেশীদিন থাকতেন? আপনি কি নিজের দেশে ফিরে গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের ইন্ডিয়া ভ্রমণে উৎসাহ দেবেন?

এই সব খোঁজখবর করতে গিয়েই প্রিয়ব্রত বোধ হয় কুমারী ডরোথি গ্রাহামের পাল্লায় পড়েছে আমি সন্দেহ করলাম। এ বিষয়ে আরও জানবার জন্যে তার ওপর চাপ দিলাম। বললাম, "যার জন্যে তুই মুখ শুকনো করে বসে আছিস সেই মিস্ গ্রাহামের কথা তো বেশ এড়িয়ে যাচ্ছিস।"

"নিজের জালেই নিজে জড়িয়ে পড়েছি," করুণ স্বীকারোক্তি করলো প্রিয়ব্রত।

"ট্রাভেল এজেন্টদের বলেছিলাম, যাঁরা কলকাতায় এসে নির্ধারিত সময়ের আগেই চলে যান, এমন দু'একজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চাই। কায়দা করে এঁদের কাছ থেকে বার করে নিতে চাই, কেন কলকাতা তাঁদের পছন্দ হলো না।"

"এ আর এমন কী শক্ত কাজ?" আমি মতামত দিই।

"ফরেন ট্যুরিস্টরা যে ভীষণ পোলাইট। সহজে অপ্রিয় সত্য কথা বলতে চান না। কাজটা তাই বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়ায়," প্রিয়ব্রত উত্তর দিলো।

"মিস্ গ্রাহামের ব্যাপারটা তুই কিন্তু এখনও এড়িয়ে যাচ্ছিস," আমি বললাম।

"মিস্ গ্রাহামই বরং আমাকে এড়িয়ে চলছেন। তোকে ভদ্রমহিলার ব্যক্তিগত খবরাখবরগুলো দিয়ে দিই, নইলে তোর সন্দেহ কমবে না। মিস্ ডরোথি গ্রাহামের বয়স আটচল্লিশ, উচ্চতা পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি, চুলের রং লাল, ডান গালে একটা তিল আছে, ওজন অন্তত পঁচাত্তর কেজি। বোস্টনের কোন এক কোম্পানিতে টাইপিস্টের কাজ করেন।"

"খোঁজখবর তো অনেক যোগাড় করেছিস," আমি একটু রসিকতা করবার চেষ্টা করি। প্রাণের দায়ে অনেকেই অবশ্য এইসব খবরাখবর হাতের কাছে রাখে।"

"প্রাণের দায় যতটুকু না হোক পেটের দায় তো বটেই। ট্রাভেল এজেন্ট ফোন করে জানিয়েছে, মিস্ ডরোথি গ্রাহাম প্রথম প্লেনেই ইন্ডিয়া ছেড়ে চলে যেতে চাইছেন। অথচ এলেন মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে।"

"তাহলে তো ইন্টারেস্টিং কেস! তুই যা চাচ্ছিস তাই তো পেয়ে যাচ্ছিস," আমি মতামত দিই। এ বিষয়ে আমার বলবার অধিকারও আছে, কারণ প্রিয়ব্রত মাঝে মাঝে আমাকেও ফরেন ট্যুরিস্ট ইন্টারভিউয়ের কাজে লাগিয়েছে।

প্রিয়ব্রত দুঃখ করলো, "যা চচ্ছি তা পচ্ছি কোথায়? মার্কনি হোটেলে দু' দু'বার ফোন করে মেসেজ রাখলাম, কিন্তু এখনও ভদ্রমহিলা খোঁজখবর করলেন না।"

"অজানা-অচেনা লোক হোটেলে মহিলাকে ফোন করলে তিনি কেন আগ্রহ দেখাবেন?"

'অজানা-অচেনা নন, ব্রাদার। চব্বিশ ঘণ্টা আগে এয়ারপোর্টে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। জাপান, হংকং, তাইল্যান্ড ঘুরে ভদ্রমহিলা কলকাতায় নেমেছেন।"

"তুই ইন্টারভিউ করেছিলি বুঝি?" প্রিয়ব্রতকে জিজ্ঞেস করি।

"ইন্টারভিউতে মিস্ গ্রাহাম এমন সব কথা বললেন যে আমি তাজ্জব।"

"যেমন?" আমি জানতে চাই।

প্রিয়ব্রত তার অভিজ্ঞতা বললো। প্রিয়ব্রত জিজ্ঞেস করেছিল, "নানা গোলমালের খবর শুনেও আপনি কেন এখানে এলেন?" ভদ্রমহিলা সবাইকে

তাজ্জব করে উত্তর দিয়েছিলেন, "কোথায় গোলমাল হচ্ছে না আজকাল? নিউইয়র্ক, টোকিও, হংকং—কাকে বাদ দেবেন? নিউইয়র্কের বহু জায়গায় মেয়েরা একলা পথ দিয়ে হাঁটতে সাহস করে না। শ্লীলতাহানি, খুনোখুনি লেগেই আছে।"

মিস্ গ্রাহাম আরও বলেছিলেন, "মিছিল, মিটিং, রায়ট ইত্যাদি থেকে তোমরা ইচ্ছে করলে ফরেন এক্সচেঞ্জ রোজগার করতে পারো। আফটার-অল যেসব গোলমালের কথা আমরা কাগজে পড়ি বা টেলিভিশনে দেখি, সেগুলো অনেকেই নিরাপদ দূরত্ব থেকে নিজের চোখে থ্রি-ডাইমেনশনে দেখতে পেলে খুশি হতেন। জাপানীরা এই সুযোগ পেলে ফরেন ট্যুরিস্টদের দেখাবার জন্যেই টোকিওতে স্পেশাল রায়টের ব্যবস্থা করতো। বুলেট-প্রুফ কাঁচের তৈরি এয়ারকন্ডিশন লাক্সারি কোচ থেকে রায়ট দেখবার জন্যে এবং রঙীন ছবি তোলবার জন্যে হাজার হাজার ট্যুসিস্ট আসতো।"

কলকাতার দারিদ্র্য ও নোংরামির কথাও উঠেছিল। মিস্ গ্রাহাম সাজাসুজি বলেছিলেন, "প্রাচুর্য এবং পরিচ্ছন্নতা দেখবার জন্য কোনো আমেরিকানের বিদেশে যাবার প্রয়োজন নেই।"

"কলকাতা সম্বন্ধে তাহলে মিস্ গ্রাহামের যথেষ্ট সহানুভূতি রয়েছে। না হলে এতো গোলমালের মধ্যে উনি কেন এসেছেন এখানে?" আমি বলি।

"সে-সম্বন্ধে কোনো সন্দহ নেই। কিন্তু এমন মহিলাও চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ইন্ডিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছেন কেন?" প্রিয়ব্রতকে বেশ চিন্তিত মন হলো।

"কী এমন ঘটলো? কেউ কি প্রাণের ভয়-টয় দেখালো?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"মিস্ গ্রাহামের সঙ্গে কথা বলতে না পেরে ওঁর সহযাত্রী বান্ধবী মিসেস্ কার্টারের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। ওঁকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে জানলুম, তেমন কিছুই ঘটে নি। কলকাতায় ওঁরা দুজনে এক-সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন। কলকাতায় ট্যুরিস্টরা নিউইয়র্ক থেকে একশ-গুণ নিরাপদ বোধ করতে পারেন—মিসেস্ কার্টারের কাছে মিস্ গ্রাহাম এই মন্তব্য করেছেন।"

"তাহলে আচমকা কলকাতা ছেড়ে যাবার কী কারণ হতে পারে বল তো?" প্রিয়ব্রত আমাকেই জিজ্ঞেস করে বসলো।

আমি ভেবেচিন্তে উত্তর দিলাম, 'মুখে যা-ই বলুন, কলকাতার জঞ্জাল দেখে মহিলা নিশ্চয় ভয় পেয়েছেন। ওয়ার্লডের আর কোনো শহরে এতো খাটা পায়খানা এবং নরক আছে বল?"

আমার সঙ্গে একমত হতে পারলো না প্রিয়ব্রত। মিসেস্ কার্টারের কাছ থেকে সে এতটুকু খবর যোগাড় করতে পেরেছে তাতে মিস্ গ্রাহাম বড়বাজার,

শ্যামবাজার, শিয়ালদহ এসব কিছুই দেখেন নি। শুধু একবার বালিগঞ্জে এবং লেকে ট্যাক্সি চড়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন। "বালিগঞ্জে ময়লা আছে একথা পাকিস্তানের পাবলিসিটি অফিসারও বলতে পারবেন না।"

"তুই ভালভাবে খোঁজ করে দেখ, ব্যক্তিগত কোনো কারণেই হয়তো মিস্ গ্রাহাম ইন্ডিয়া ছেড়ে যাচ্ছেন। দেশ থেকে হয়তো জরুরী টেলিগ্রাম বা চিঠি এসেছে। হয়তো সেখানে কেউ অসুস্থ।"

আমার কথা শুনে মোটেই উৎসাহ পেলো না প্রিয়ব্রত। বললো, "সে কি আর আমি খোঁজ করি নি? এরকম কোনো কারণ ঘটে নি, তাহলে মিসেস্ কার্টার জানতেন। তাছাড়া মিস্ গ্রাহামের স্বাস্থ্যও খুব ভুল রয়েছে, তেজী ঘোড়ার মতো টগবগ করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।"

আমি ব্রেনের মোটরটা একবার ফুল ফোর্সে চালিয়ে দিলাম। এতোদিন সায়েহসুবোদের সঙ্গে মিশে সামান্য এক মার্কিনী কুমারীর কলকাতা ত্যাগের কারণ আন্দাজ করতে পারবো না, এ কেমন কথা? জিজ্ঞেস করলাম, "মিস্ গ্রাহাম কোথাকার লোক বললি?"

"বোস্টনের।"

আমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। "তার মানে নিউ ইংলন্ডের সংস্কৃতি ওঁদের। সেই পিউরিটান কালচার, যা ধার্মিক ও চরিত্রবান পিলগ্রিম ফাদাররা বহু বছর আগে ইংলন্ড থেকে আমেরিকায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তুই তো জানিস বোস্টনের লোকেরা এখনও ভীষণ মার্জিত ও রক্ষণশীল।"

"তাই নাকি?" প্রিয়ব্রত যেন আশার আলোক দেখতে পেলো।

বললাম "ব্যাপারটা এখন জলের মতো সহজ হয়ে যাচ্ছে। হয় হোটেলের কোনো পাজি লোক টেলিফোনে মিস্ গ্রাহামের বিরক্তি উৎপাদন করেছে। নিঃসঙ্গ মহিলাকে হোটেলে দেখলে এরকম কুপ্রস্তাব করার অভ্যাস কিছু লোকের থাকে। আর না হয়, দক্ষিণ কলকাতায় যখন গিয়েছিলেন তখন রাস্তায় চ্যাংড়া ছেলেরা অশোভন ব্যবহার করেছে।"

হাতে যেন স্বর্গ পেলো প্রিয়ব্রত। বললো, "খুবই সম্ভব ব্যাপারটা। মেয়েঘটিত ব্যাপারে কলকাতা ক্রমশ কী রকম স্বাধীন হয়ে উঠছে, সে তো চোখের সামনে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।"

প্রিয়ব্রত এবার ট্রাভেল এজেন্সিকে ফোন করলো। তারপর বললো, "আমার সঙ্গে তুইও একবার দমদমে চল। মিস্ গ্রাহাম একটু পরেই প্লেনে উঠবেন। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক, যদি মুখ খোলেন। গভর্নমেন্ট এখন খুব সিরিয়াস। কলকাতায় যাতে ফরেন ট্যুরিস্ট আসে তার জন্যে কর্তৃপক্ষ সবকিছু করতে রাজী আছেন। আমাদের জানতেই হবে, মিস্ গ্রাহামের কী অসুবিধে

হলো।”

দমদম এয়ারপোর্টে আমরা সময়মতো পৌঁছতে পারলাম না। বিরাট এক শোভাযাত্রা কলকাতার রাস্তায় বিশ্রী নট-নড়ন-চড়ন ঘটিয়েছে। দমদমে পৌঁছে জানা গেলো, মিস্ গ্রাহামের প্লেন ইতিমধ্যেই চলে গিয়েছে।

আমার বিদায় দিনেও বন্ধুবর প্রিয়ব্রত বিমানবন্দরে এসেছিল এবং সুযোগ বুঝে মিস্ গ্রাহামের ঠিকানা আমার ডাইরিতে লিখে দিয়ে বলেছিল, “বোস্টনে যখন যাচ্ছিস তখন খোঁজখবর করিস।”

বোস্টনে আমার অনেক দেখবার-শোনবার ছিল। বোস্টনের অদূরেই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গুণগ্রাহী অধ্যাপকের সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাতের ফলেই স্বামী বিবেকানন্দ একদা পশ্চিমী জগতে খ্যাতনামা হবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

এই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট-আকাঙক্ষী তরুণ বন্ধু শ্রীরমেন সেনের সাহায্যে মিস্ ডরোথি গ্রাহামের অ্যাপার্টমেন্টে হাজির হয়েছিলাম।

টেলিফোনে আগেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল। তিনি নিজে দরজা খুলে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। মিস্ গ্রাহামের হাবভাবে কথাবার্তায় বোঝা গেলো, কলকাতা তাঁকে মোটেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি—মহিলা এখনও বেশ নার্ভাস হয়ে আছেন।

রমেন সেন আমার পরিচয় দিলো—বেঙ্গলী রাইটার।

আমি বললাম, “টুরিস্ট বিভাগের মিস্টার চ্যাটার্জির বন্ধু আমি। কলকাতার সত্তর লক্ষ লোকের পক্ষ থেকে তাঁরা আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। কলকাতার দারিদ্র্য, নোংরামো, কলেরা, টাইফয়েড, আমাশা এবং রাজনৈতিক উত্তাপ উপেক্ষা করেও আপনি ঐ শহরে গিয়েছিলেন, কারণ কলকাতার সংস্কৃতিকে আপনি শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু আপনি হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে আসবার সিদ্ধান্ত নিলেন কেন? আমরা জানি মার্কনি হোটেলে আপনি আটদিনের জন্য ঘর বুক করেছিলেন।”

একটু থেমে বললাম, “আমার বন্ধু মিস্টার চ্যাটার্জি খবর পেয়েছেন, আপনি প্রথম দিন বিকেলবেলায় দক্ষিণ কলকাতা বেড়াতে গিয়েছিলেন।”

মিস্ গ্রাহামের মুখ রাঙা হয়ে উঠলো। ওর ঘোরাফেরা সম্পর্কে আমরা এতো খবরাখবর রেখেছি শুনে হয়তো একটু সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন।

রমেন ছেলেটি বেশ স্মার্ট। সে বললো, “মিস্ গ্রাহাম্ এঁদের চিন্তা, কেন আপনি হঠাৎ কলকাতা ত্যাগ করলেন? দক্ষিণ কলকাতায় এমন কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল কি, যার জন্যে আপনি মার্কনি হোটেলে ফিরে এসেই প্রোগ্রাম পরিবর্তন করলেন?”

আকারে বিপুলা মধ্যবয়সিনী মিস্ গ্রাহামের গণ্ডদেশ লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। তারপর নিজেকে আয়ত্তাধীনে এনে বেশ দুঃখের সঙ্গে বললেন, "তোমাদের ব্যক্তিগত জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আমার খুব শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু কলকাতার রাস্তা ঘুরে এবার বুঝলাম খবরের কাগজ এবং বই পড়ে সব খবর পাওয়া যায় না।"

আমি ততক্ষণে নোটবই বার করে ফেলেছি। বললাম, "বোস্টনের মহিলা আপনি। কলকাতা ছেলেমেয়েদের নৈতিক অধঃপতন নিশ্চয় আপনাকে বেদনা দিয়েছে। লেকের ধারে বিকেলবেলায় ছেলেমেয়েদের কাণ্ডকারখানা আপনার নজরে পড়েছে নিশ্চয়।"

"না না, সেটাই তো স্বাভাবিক। ছেলেমেয়েরা রাস্তায় হাত ধরাধরি করে ঘুরবে, পরস্পরকে আদর করবে, আলিঙ্গন করবে এটাই তো স্বাভাবিক। তাতে বিরক্ত হবার কি আছে?" মিস্ গ্রাহাম আমার ভুল সংশোধন করলেন।

"তাহলে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

সঙ্কোচ কাটিয়ে মিস্ গ্রাহাম এবার বললেন, "কিন্তু আমি কলকাতায় যা দেখলাম, তাতে আমার সমস্ত শরীর ঘিনঘিন করছে। ইন্ডিয়ার এই ব্যাপারটা আমার জানাই ছিল না।"

অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে প্রশ্ন করলাম, "লেকের ধারে যুবক-যুবতীদের চুম্বন করতে দেখেছেন?"

"যুবক-যুবতীরা অবশ্যই রাস্তায় দাঁড়িয়ে পরস্পরকে চুম্বন করতে পারে। সে দৃশ্য দেখলে তো ভরসা পেতাম।" মিস্ গ্রাহাম বেশ গম্ভরভাবেই বললেন, "সেরকম একটা সীনও কলকাতায় নজরে পড়লো না।"

"রাস্তার মোড়ে কোনো ছোকরা আপনাকে দেখে সিটি বাজিয়েছে বা কোনো কু-মন্তব্য করেছে?" রমেন জিজ্ঞেস করলো।

"তাহলেও তো ব্যাপারটা অশ্লীল হয়ে উঠতো না। ছেলেমেয়েরা পরস্পরকে দেখে এরকম আচরণ করতেই পারে," মিস্ গ্রাহাম বললেন।

আমাদের বিদায় দেবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে মিস্ গ্রাহাম বললেন, "আজব দেশ তোমাদের। ছেলেমেয়েদের জোড়ে জোড়ে ঘুরতে দেখা যায় না। মাই গড্, প্রকাশ্য রাস্তার ওপর ছেলেরা ছেলেদের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে, পরস্পর পরস্পরের গলা জড়িয়ে ধরছে—এও আমাকে দেখতে হলো! এবং সেখানে আমাকে থাকতে হবে? আমাদের দেশে নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে, কিন্তু এখনও আমেরিকায় প্রকাশ্য রাজপথে এমন অশ্লীলতা বরদাস্ত করা হয় না।"

মিস্ গ্রাহাম দরজা বন্ধ করে দিলেন। রাস্তায় বেরিয়ে আমার মাথা ঘুরতে লাগল। রমেশ জিজ্ঞেস করলো, "কী হলো শংকরবাবু?"

"রাস্তায় ছেলেরা ছেলেদের হাত ধরে গল্প করছে, এতে কী অন্যায় হলো তা মাথায় ঢুকছে না।"

মিটমিট করে হাসলো রমেন। বললো, "ব্যাপারটা আমি বুঝেছি। এজন্যে আমিও এখানে ভুগেছি। কলকাতায় আমাদের অভ্যেস বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে কিংবা গলা জড়াজড়ি করে রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো, আড্ডা মারা। এখানে একমাত্র হোমোসেক্সুয়ালদের ওই অভ্যেস আছে। এখানকার সমাজে পুরুষরা প্রকাশ্যে যত খুশী মেয়েদের আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে ঘুরে বেড়াক—আপত্তি নেই। কিন্তু এক পুরুষের হাত ধরে অন্য পুরুষের যাতায়াত অত্যন্ত অশ্লীল ব্যাপার—কেউ সহ্য করবে না!"

রমেন বললো, "আমি এসব জানতাম না। আমার এক সহপাঠী এখানে মার্কিনী মহিলা বিয়ে করেছে। অনেকদিন পরে বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় তাকে জড়িয়ে ধরলাম, তারপর কলকাতায় পুরনো কায়দায় হাত ধরাধরি করে অনেকক্ষণ রাস্তা ঘুরলাম। বন্ধুপত্নী সেই দেখে রেগেমেগে টং হয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। পরের দিন শুনলাম, তিনি নাকি এতোই বিরক্ত হয়েছেন সে ডাইভোর্সের কথা ভাবছেন। প্রকাশ্যে দিবালোকে আমরা নাকি তাঁর সামাজিক সম্মান নষ্ট করেছি!"

রমেন বললো, "বন্ধুটি তার পরের দিনই আমাকে অ্যাডভাইস দিয়েছিল, মেয়েদের দেহ নিয়ে এখানে যা খুশি করো, কিন্তু কখনও ভুলেও ছেলেদের গায়ে হাত দিও না।"

উঠতি-বয়সে

মিস্ গ্রাহামের ঘটনা থেকেই বুঝেছিলাম ছেলেমেয়েদের সম্পর্ক সব দেশে সমান নয়। আমেরিকায় যখন এসেছি, তখন সুযোগ পেলে এদেশের খবরাখবর কিছু জোগাড় করতে হবে।

এই সুযোগ পেলাম মিসেস্ জেন লুইসের কাছে।

ওমাহার কাছে ছোট্ট এক শহরে মিসেস্ লুইসের লিভিং-রুমে বসে কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমার কালীঘাটের হরেনবাবুর কথা মনে পড়ে গেলো।

হরেনবাবু বিরক্ত ও বিভ্রান্ত হয়ে আমাকে বলেছিলেন, "উঠতি-বয়সের ছেলেমেয়েগুলো গোল্লায় গেলো। সনাতন সবকিছু বিসর্জন দিয়ে দেশটা চোদ্দ-পনেরো বছরের ছেলেরা মেয়ে-ইস্কুলের পাশে ঘুরঘুর করবে এবং একই বয়সে মেয়েরা এদের আস্কারা দিয়ে ফিকফিক করে হাসবে—এ-দৃশ্য আমাদের

ছেলেবেলায় কল্পনাতীত ছিল। চরিত্র বলে দেশে কিছু রইলো না।"

হরেনবাবুর হতাশার কারণ তাঁর পনেরো বছরের ভাইপো এবং চতুর্দশী কন্যা। চক্ষুরত্ন বিস্ফারিত করে হনেরবাবু বলেছিলেন, "ছেলে নয় তো, কালাপাহাড়! পরীক্ষা দিতে যাবার সময় পর্যন্ত বাপ-মাকে প্রণাম করে না। ছোকরা বীণাপানি ইস্কুলের মেয়েদের এমন বিরক্ত করেছে যে, হেডমিস্ট্রেস ওর বাপকে খবর দিতে বাধ্য হয়েছেন। আগের দিন হলে, এই সব ছেলেকে আঁতুড়ঘরে নুন খাইয়ে মেরে ফেলা হতো।"

তারপর ফিসফিস করে হরেনবাবু জানিয়েছেন তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ আমাদের বউদির বক্তব্য। "খুব তো পরের ছেলের নিন্দে করছো। আগে নিজের মেয়ে সামলাও।"

হরেনবাবুর মেয়ের ইস্কুল-খাতার মধ্যে এক ছোঁড়ার চিঠি পাওয়া গেছে। নাম-ধাম কিছুই নেই, শুধু লেখা—'শিখা, তোমার মুখের হাসিতে চুম্বক আছে।" শিখা এই সম্পর্কে বাবা-মা অথবা মিস্ট্রেসের কাছে রিপোর্ট না-করে চিঠিটা নীরবে নিজের লেখার খাতার মধ্যে রেখে দেওয়ায় হরেনবাবুর স্ত্রী দুশ্চিন্তার নিদ্রাহীন রাত্রি যাপন করেছেন। মেয়ের ইস্কুলে যাওয়া চিরতরে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন হরেনবাবু। ঘরের এইসব 'কেলেঙ্কারি' বাজারে রটলে, হরেনবাবু আর সমাজে মুখ দেখাতে পারবেন না।

আমাদের দেশের এইসব সংবাদ খবরের কাগজে বেরোয় না ; কিন্তু মিসেস্ লুইসকে আমি এসব সবিস্তারে বলেছি। খবরাখবর চেপে রেখে কোন দেশকে বা জাতকে ছোট বা বড় করা যায় না বলেই আমার বিশ্বাস।

আমার কথা শুনে, মধ্যবয়সিনী মার্কিনী বা মিসেস্ লুইস বেশ অবাক হয়ে গেলেন! বললেন, "তোমরা এখনও রূপকথার রাজত্বে বসবাস করছো! তোমাদের ছেলেমেয়েরা এখনও এতো পবিত্র রয়েছে যে, তাদের খাতার মধ্যে একটা দু'লাইনের চিঠি দেখলে বাবা-মায়েরা চিন্তিত হয়ে পড়েন! তোমাদের হরেনবাবু ও তাঁর স্ত্রীকে আমি হিংসে করি।"

মার্কিন দেশে ছোট্ট এক শহরে মিসেস্ লুইসের সঙ্গে আমার পরিচয়। বিদেশীদের আপন করে নিতে আমেরিকান মেয়েদের জুড়ি নেই। সাধে কি আর স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন, "এদেশের মেয়ের মতো মেয়ে জগতে নেই। কি পবিত্র, স্বাধীন, স্বাপেক্ষ আর দয়াবতী, মেয়েরাই এদেশের সব। বিদ্যে বুদ্ধি সব তাদের ভেতর। হরে হরে, এদের মেয়েদের দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম। এদেশের বরফ যেমন সাদা, তেমনি হাজার হাজার মেয়ে আছে, যাদের মন পবিত্র।...আমাদের পোড়া দেশে মেয়েছেলেদের পথ চলবার জো নেই। আর এদের কত দয়া। যতদিন এখানে এসেছি, এদের মেয়েরা বাড়িতে স্থান দিচ্ছে,

খেতে দিচ্ছে...সঙ্গে করে বাজারে নিয়ে যায়, কি না করে বলতে পারি না। শত শত জন্ম এদের সেবা করলেও এদের ঋণমুক্ত হবো না।"

মিসেস্ লুইস আমার জন্যে সারাদিন ধরে নানাভাবে পরিশ্রম করেছেন, তারপর কোনো আপত্তি শোনেন নি—সোজা বাড়িতে ধরে নিয়ে এসেছেন—ওঁদের বাড়িতে একটা রাত্রি কাটাবার জন্যে।

পরের দিন সকালে মিস্টার লুইস অফিস চলে গেছেন। মেয়ে লিন্ডা এবং ছেলে মিচেলকে ইস্কুলে পাঠিয়ে মিসেস্ লুইস নিশ্চিন্ত হয়েছেন—হাতে তেমন কাজকর্ম নেই। লিভিং-রুমে বসে আমার সঙ্গে তিনি গল্প করছিলেন। বলছিলেন, "উঠতি-বয়সের ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমাদের গোটা দেশের বাবা-মায়েরা বিব্রত। এদের আমরা কিছুতেই সামলাতে পারছি না। তাই তোমার ফ্রেন্ড হরেনবাবুকে হিংসে করছি।"

আমি বললাম, "আপনাদের এখানে টিন-এজ কথাটা প্রায়ই শুনছি। থারটিন থেকে নাইনটিন এই প্রত্যেকটা বছরের পিছনে যে 'টিন' শব্দটা রয়েছে তার থেকেই আপনারা ভারি সুন্দর কথাটা তৈরি করেছেন। আমাদের দেশে 'টিন-এজ' বলে কিছু নেই—কৈশোরের পরেই যৌবন। প্রাচীন সাহিত্যে বয়ঃসন্ধির কবিতা কিছু আছে—কিন্তু সেখানে কবিরা শ্রীরাধিকার দেহে যৌবনের আবির্ভাব নিয়েই ব্যস্ত! তবে 'ব্রোঞ্জ-এজ', 'কপার-এজ', 'আয়রন-এজ'-এর মতো আমাদের দেশেও এবার 'টিন-এজ' আসছে। হরেনবাবু এদেরই উঠতি-বয়সের ছেলেমেয়ে বলে বর্ণনা করেন।"

"উঠতি—কিন্তু মাঝে মাঝে 'পড়তি' বলে সন্দেহ হয়। বাচ্চাগুলো প্রথমে বেশ থাকে। কিন্তু বারো-তেরোতে পা দিয়ে ছেলেমেয়েগুলোর যে কি অধঃপতন শুরু হয়!" মিসেস লুইস দুঃখ করে বললেন, "আমরা চাই ছেলেমেয়েদের বন্ধু হতে। আমরা চাই ওরা সুখে থাকুক, ওদের স্বাস্থ্য যেন খারাপ না হয় এবং যেন কোনো বিপদে পড়ে না যায়। কিন্তু টিন-এজ ছেলেমেয়েরা ভাবে, বাবা-মা তাদের শত্রু—তাদের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়াই হলো আমাদের একমাত্র কাজ।"

পরের বাড়িতে কয়েকঘন্টার জন্যে এসেছি। তাদের দেশের পারিবারিক বিষয়ে আমি আর কী বলবো?

"গতকালই আমাদের বাড়িতে একটা কাণ্ড হয়ে গেলো—তুমি লক্ষ্য করো নি।" মিসেস লুইস বললেন।

"ওদের চতুর্দশী কন্যা লিন্ডা সুসজ্জিতা হয়ে সন্ধ্যাবেলায় ছেলেবন্ধুর সঙ্গে নাচে যাচ্ছিল, আমি দেখেছিলাম। যাবার আগে মেয়েটি আমার সঙ্গে দেখা করে বেশ ভদ্রভাবে শুভরাত্রি জানিয়ে গেছলো।

মিসেস্ লুইস বললেন, "ব্যাপারটা ঘটেছিল—আমাদের বেডরুমে। আমার

স্বামী ও আমি দু'জনেই একটু সাবধানী। মেয়ে কার সঙ্গে বেরোচ্ছে, উনি তার খোঁজখবর রাখেন। উনি মেয়েকে বললেন, নিজের মর্যাদা হারিও না, আর রাত এগারোটার মধ্যে ফিরে এসো। বাবার এই কথায় মেয়ের কী রাগ! বললো, কারফিউ অর্ডার দিয়ে কী লাভ? যা ভয় পাচ্ছ তা করবার ইচ্ছে হলে এগারোটার আগেও করা যায়। উনি বললেন, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। কিন্তু তোমার সম্বন্ধে বদনাম রটলে আমার ভাল লাগবে না।"

মিসেস্ লুইস বললেন, "মেয়ে রাত তিনটের আগে ফেরে নি। আমি তিনটে পর্যন্ত জেগে ছিলাম। তাতেও মেয়ের বিরক্তি!"

একটু থেমে মিসেস্ লুইস বললেন, "আজকালকার ছেলেমেয়েদের কোনো লাজলজ্জা নেই। এই মেয়েই কিছুদিন আগে আমাকে বললো, যখন দোকানে যাচ্ছ, আমার জন্যেও নিরোধ পিল কিনে এনো। আমাদের পুরনো যুগ থাকলে, গালে একটা চড় কষিয়ে দিতাম। তুমি লুকিয়ে-লুকিয়ে যা খুশী করো—কিন্তু লজ্জার মাথা খেয়ে নিজের মাকে পিল কিনতে হুকুম দেবার অসভ্যতা সহ্য হয় না।"

আমি হতভম্ব। হরেনবাবুর উঠতি-বয়সের ভাইপো-ভাইঝিরা সত্যিই এখনো এই স্তরে পৌঁছয় নি।

মিসেস্ লুইস আশঙ্কা প্রকাশ করলেন, "উঠতি-বয়সের এই বাধাবন্ধনহীন দৈহিক যথেচ্ছচারই একদিন আমাদের সভ্যতাকে নষ্ট করবে।"

নিজের মনে কি সব ভাবলেন মিসেস্ লুইস। তারপর বললেন, "কাকেই বা দোষ দেবো? বাবা-মায়েরাও চাইছেন ছেলেমেয়েরা অমন হোক। কচি কচি মেয়েদের পাকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পার্টিতে যাবার আগে বারো বছরের মেয়েদের করসেট পরানো হচ্ছে। এগারো-বারো বছর বয়সের ছেলেদের ডিনার জ্যাকেট পরে সমর্থ পুরুষমানুষ সাজবার চেষ্টা দেখলে হাসবো না কাঁদবো ঠিক করতে প্যারি না।"

মিসেস্ লুইস বললেন, "লিন্ডার যখন বারো বছর বয়স, তখন ওর ইস্কুলের মিস্ট্রেস আমাকে একদিন ডেকে পাঠালেন। বয়সের তুলনায় ও একটু উঁচু ক্লাসে পড়তো—তার ফলে ক্লাসের সবচেয়ে বয়সে ছোট মেয়ে ও। মিস্ট্রেস আমাকে গোপনে বললেন, ওর বান্ধবীদের তুলনায় লিন্ডার বক্ষ সম্পদ নেই, তাই বেচারা মন-মরা হয়ে থাকে। ওর বোধহয় প্যাডেড ব্রা-র ইমোশনাল প্রয়োজন রয়েছে। মাস্টারনীর কথা শুনে আমি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলাম। বললাম, ওর ক্লাসে কয়েক ডজন কমবয়সী মেয়ের 'ফলসী' খুলিয়ে দিলেই, আমার মেয়ের মনে কোনো সমস্যাই দেখা দেবে না। কচি কচি মেয়েদের এই ভাবে সর্বনাশ না-ই বা করলেন!"

মিসেস্ লুইস বললেন, "আমি যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি। মেয়েদের ও ছেলেদের দেহ শুদ্ধ থাকলে মনও শুদ্ধ থাকবে এবং তাতে সমাজের অশেষ মঙ্গল হবে, একথা আজকাল কেউ বুঝতে চায় না।"

কিছুদিন আগে স্থানীয় অভিভাবিকা সমিতি এক আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করেছিলেন। মিসেস্ লুইস বললেন, "দেখবে নাকি সেই মিটিংয়ের রিপোর্ট। আমিও আলোচনায় অংশ নিয়েছিলাম।"

এই রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছে। কিছু অংশ উদ্ধৃতি করছি। আধুনিক মার্কিন সমাজের নৈতিক চিন্তাধারা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যাবে ঃ

মিসেস্ লুইস—"আমার বাপের বাড়ি কিছুটা সেকেলে। আমাদের কুমারী বয়সে প্রেম ছিল একান্ত ব্যক্তিগত এবং প্রধানতঃ হৃদয়ের ব্যাপার—এখনকার মতো দেহসর্বস্ব নয়। যুবতী বয়সে আমি অবশ্যই রোমান্সের স্বপ্ন দেখতাম, কিন্তু কখনও এই নিয়ে বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলার কথা ভাবতে পারলাম না। আমার মেয়ে যখন নির্লজ্জভাবে আমাকে সেক্স সম্পর্কে খোলাখুলি প্রশ্ন করে তখন আমার খুব অস্বস্তি লাগে।"

মিসেস্ জোন্স—"আমার মা বলতেন সব পুরুষমানুষই এক। মেয়েদের কাছে থেকে তারা একটা জিনিসই চায়। সেক্স বস্তুটি যে কদর্য তা আমি কম বয়সেই জানতে পেরেছিলাম।"

মিসেস্ ডে—"পুরনো দিনে আত্মসংযমকে গুণ বলা হতো, এখনকার যুগে ওটা পাপ। আমার উনিশ বছরের মেয়ে বলে, সতীত্ব মানেই অপচয়। ওর এক কলেজ-বন্ধুর মতে, পারস্পরিক ভালবাসা থাকলে বিয়ে না করেও সেক্সের আনন্দ অবশ্যই উপভোগ করা যেতে পারে। বন্ধুটির দাদা আরও এক-পা এগিয়ে আছেন। তাঁর মতে, পারস্পরিক ভালবাসা না-থাকুক, মিলনে উভয় পক্ষ তৃপ্তি পেলেই যথেষ্ট। সেক্সের সঙ্গে প্রেম জুটলে চমৎকার। কিন্তু নেই-মামার চেয়ে কানা-মামা ভাল—অতএব প্রেমবিহীন সেক্সেও আপত্তি নেই।"

মিসেস্ টমসন—"কন্যার স্ত্রী-অঙ্গ অব্যবহৃত থাকার ওপর চারিত্রিক নিষ্ঠা নির্ভর করে একথা আধুনিকা মায়েরা মনে করেন না। তবে আমি চাই না, আমার মেয়েকে কেউ ঠকাক। আমার ফুলের মতো মেয়েটি কোনো অযোগ্য হতভাগার বাটনহোলে আটকে পড়ুক, তা আমি মোটেই চাই না।"

মিসেস্ লুইস—"আপনি বলতে চান, চরিত্র নির্ভর করে জ্ঞানের ওপর, অজ্ঞানতার ওপর নয়?"

মিসেস্ টমসন—"আজ্ঞে হ্যাঁ। টিন-এজ ছেলেমেয়েরা প্রেমে পড়বে এবং

প্রেম করবে। জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নিরাপদ উপদেশ দেওয়া ছাড়া এ-বিষয়ে আমাদের আর কিছুই করবার নেই।"

মিসেস্ জোন্স—'আমার তো দুশ্চিন্তা ওখানেই। উঠতি-বয়সের অনেক ছেলেমেয়ে জন্ম-নিরোধের ধার ধারে না। তারা বিপজ্জনকভাবে বাঁচতে চায়। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তারা আনন্দজনক উত্তেজনা লাভ করে।"

মিসেস্ ডে—"বিবাহপূর্ব সন্তান-সম্ভাবনা তো আমেরিকান সমাজে আর ট্রাজেডি নয়। কেউ গর্ভবতী হলে আজকাল অনেক কলেজ হোস্টেলে তো খোলাখুলিভাবে গর্ভপাতের জন্য চাঁদা তোলা হয়।"

মিসেস্ টমসন—কেন মিথ্যে বলবো, আমার কাছে চেস্টিটির কোনো মূল্য নেই। প্রকৃতই ভার্জিন কোনো ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে হোক, আমি চাই না।"

মিসেস্ জোন্স—"বিয়ের আগে আপনি কি নিজের মেয়েকেও বহু পুরুষের সঙ্গে বিছানায় যেতে উৎসাহ দেবেন, যাতে ভাবী স্বামীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে সে-ও পাল্লা দিতে পারে?"

মিসেস্ টমসন—"না, আমি তাকে সেক্সের মধ্যে ঠেলে দেবো না। মন চাইলে, সে অনায়াসেই বিয়ে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু সে যদি আগেই এ-ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠে, তাহলে প্রেম-করা এবং বাচ্চা-করার মধ্যে তফাতটা কি—তা আমি তাকে সবিস্তারে জানিয়ে দিতে চাই। আমার মেয়ের দৈহিক নিরাপত্তা সম্পর্কে আমাকেই ভাবতে হবে।"

মিসেস্ লুইস—"সেক্সের স্বাধীনতা খুব ভাল জিনিস হতে পারে, কিন্তু ভগবান রক্ষে করুন আমার মেয়ে যেন ওসবের মধ্যে জড়িয়ে না পড়ে। ঠুনকো জিনিসের ওপর প্রবল আকর্ষণ হলে এবং দেহের কামনা-বাসনা তাঁর সঙ্গে অযথা জড়িয়ে পড়লে, মোহ ভঙ্গ হতে দেরি হয় না। তখন বুক জুড়ে কান্না কিছুই থাকে না। ছেলেদের পক্ষে এসব ভাল হতে পারে, কিন্তু মেয়েদের পক্ষে অবশ্যই নয়। ছেলেরা মৌমাছির মতো এক ফুল থেকে আর এক ফুলের সংসর্গ করতে পারে, কিন্তু ফুল কখনোই এক মৌমাছি ছেড়ে আর এক মৌমাছির পিছনে ছুটবে না।"

রিপোর্টটা মিসেস্ লুইসের হাতে ফিরিয়ে দিতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "পড়লে?"

গম্ভীরভাবে বললুম, "হ্যাঁ! হরেনবাবুকে দেখালে তার হার্টফেল করবে।"

মিসেস্ লুইস বললেন, "তোমাদের প্রাচীন সভ্যতা। তবু এখন থেকে তোমাদের সাবধান হওয়া উচিত। না হলে একদিন আমাদের মতো অবস্থা হবে তোমাদের। জাপানকে আমরা প্রায় নষ্ট করে দিয়েছি।"

আমার হরেন-বউদির কথা মনে পড়ে গেলো। তিনি উঠতি-বয়সের

ছেলেমেয়েদের শুভবুদ্ধির ওপর নির্ভর করেন না। বলেন, ঘি এবং আগুনকে কাছাকাছি আসতে দিতে নেই।

মিসেস্ লুইস বললেন, “মিসেস্ হরেন অন্যায় বলেন না। তোমাদের মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাজের লোকেরা জানেন, লোভের সামনে পড়লে উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের পদস্খলনের সম্ভাবনা। তাই মেয়েদের মায়েরা ছেলেদের সন্দেহের চোখে দেখেন এবং মেয়েদের একলা ছাড়তে চান না। আমাদের সমাজে চ্যাংড়া ছেলেদের মোটর গাড়ি রয়েছে এবং মেয়েদের যার-তার সঙ্গে যেখানে-খুশী যাবার স্বাধীনতা আছে। কোথাও কোনো শাসন নেই। সুতরাং যা-হবার তাই হচ্ছে।”

মিসেস্ লুইসকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললাম, “আপনারা ছেলেমেয়েদের পুরোপুরি স্বাধীনতা দিয়েছেন—আবার অনেক প্রাচীন সমাজে তারা পুরোপুরি শাসনে রয়েছে। বেশি শাসনে থাকলে ফল সব সময় ভাল হয় না। আপনাদের ছেলেমেয়েরা যদি নিজে থেকে কখনও বোঝে কোন জিনিস অন্যায়, তা হলে তারা সঙ্গে সঙ্গে সৎপথে চলতে শুরু করবে।”

মিসেস্ লুইস বললেন, “আমার বড় মেয়েকে দেখো নি তুমি। এখন বাইশ বছর বয়স। এনজেলার মনটা ছিল পবিত্র। বিয়ের আগে দেহকে নোংরা করায় ওর প্রবল আপত্তি ছিল। একদিন শনিবারে ওর কলেজে গিয়ে দেখি বেচারী একলা চুপচাপ হোস্টেলে শুয়ে রয়েছে। ডরমিটরিতে আর সব মেয়েই বেরিয়ে গেছে। মেয়েকে প্রশ্ন করতে সোজাসুজি বললো, “স্রেফ বন্ধুভাবে ভালবাসবে এমন ছেলে এখন আর পাওয়া যায় না, মা। তুমি তো জানো, ডেট করতে আমার ভাল লাগে। ডেটের প্রথম দিনটা বেশ ভাল। কিন্তু দ্বিতীয় দিন থেকে ভীষণ চাপ আসবে। ছেলেবন্ধু মদ না-হয় মারিজুয়ানা পার্টিতে নেমন্তন্ন করে বসবে। ধরেই নেবে যে পার্টির শেষে তার সঙ্গে আমি বিছানায় যাবো। আপত্তি করলে ভয় দেখায়। বলে, ‘যদি রাজী হও তাহলে সমস্ত দুনিয়া তোমার সঙ্গে হেসে উঠবে ; আর যদি না বলো তা হলে একলা তুমিই কাঁদবে।’ আমার চরিত্রবতী মেয়ের চোখে তাই জল।”

মিসেস্ লুইসের কাছে শুনলাম, এনজেলার এক বান্ধবী ছিল। সে-ও দেহের পবিত্রতায় বিশ্বাস করতো। ছেলেবন্ধু নিতান্ত নাছোড়বান্দা হলে সে তাকে ‘নেকিং’ এবং ‘পেটিং’ নামক মার্কিনী আদর করতে অনুমতি দিতো। নিজের দৈহিক শুচিতা এবং বন্ধুত্বের দাবির মধ্যে সে এইভাবে আপস করে নিতো। কিন্তু ছেলেরা এতে আপত্তি করে, কারণ এর ফলে শেষ পর্যন্ত তাদের আরও উত্তেজিত হয়ে ফিরে যেতে হয়। মেয়েরাও এতে সন্তুষ্ট নয়, তারা বুঝতে পারে কামমুগ্ধ কাউকে সুড়সুড়ি দিয়ে সে আরও উত্তপ্ত করে তুলেছে। এনজেলার বান্ধবী কেট

তো মাস-পাঁচেকের মধ্যে মত পাল্টালো। সে বললো, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্তহীনভাবে পেটিং-এর আদর নেওয়া থেকে বিছানায় যাওয়া ঢের ভাল—দেহ-মিলনের নিজস্ব ডিগনিটি আছে এবং এতে সময় অনেক কম লাগে।

আমি অবাক হয়ে মিসেস্ লুইসের দিকে তাকিয়ে আছি। মিসেস্ লুইস বললেন, "তুমি তো অনেক কলেজ ক্যাম্পাসে গিয়েছো এবং যাবে। খোঁজ করে দেখো, আমি মিথ্যে বলছি কিনা। ওখানে ছেলেদের কাছে সেক্স হলো পুরুষত্বের প্রতীক—সে যে সাবালক হয়েছে তার প্রমাণ। আর মেয়েদের কাছে সেক্স হলো, আনপপুলারিটি এবং একাকিত্বের বিরুদ্ধে ইনসিওরেন্স পলিসি।"

মিসেস্ লুইস বললেন, "আমার ছেলে মেয়ে দুই রয়েছে। দেখছি তো। মেয়েরা সেক্সে রাজী হয় ভালবাসা পাবার জন্যে। আমার নিজের ছেলেই তো বলে, ভোগ করে ভাগিয়ে দাও—এই হলো আমার ফিলজফি।"

আমার মনে পড়ে গেলো ১৮৯৪ সালে আমেরিকা থেকে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছিলেন, 'বে হওয়া এদেশে বড়ই হাঙ্গামা। প্রথম মনের মতো বর হওয়া চাই। দ্বিতীয় পয়সা চাই। ছোঁড়া বেটারা ইয়ারকি দিতে বড়ই মজবুত—ধরা দেবার বেলা পগার পার। ছুঁড়িরা নেচে কুঁদে একটা স্বামী যোগাড় করে, ছোঁড়া বেটারা ফাঁদে পা দিতে বড়ই নারাজ। এই রকম করতে করতে একটা 'লভ' হয়ে পড়ে—তখন সাদি হয়।"

মিসেস্ লুইসকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি ছেলেকে কিছু বলেন না?"

"বলি তো অনেক কিছু, কিন্তু বুড়োমানুষদের কথা কে শুনতে চায়?" দুঃখ করলেন মিসেস্ লুইস।

"আপনি নিশ্চয় বুড়ী নন," আমি প্রতিবাদ করি। "আপনার বয়েস তো এখনও পাঁচের ঘর ছোঁয় নি।"

হাসলেন মিসেস্ লুইস। "আমাদের দেশে যৌবন এখন এমন উদ্ধত যে দশ বছরের বড় হলেই তাকে বুড়ো ভাবে।"

"আর লোকেও তা মেনে নেয়?" আমি একটু রাগ করে জানতে চাই।

"সেখানেও আর এক মজা। বুড়োরাও স্বীকার করেন না যে তাঁরা বৃদ্ধ। তাঁদের ধারণা, বার্ধক্য বলে কিছু নেই—কেউ শুধু অপরের থেকে অপেক্ষাকৃত কম যৌবনের অধিকারী। আমাদের এই দেশে বার্ধক্য একটা নিষিদ্ধ বিষয়, এ নিয়ে কেউ আলোচনা করে না।"

মিসেস্ লুইস আবার পুত্র মিচেলের প্রসঙ্গে ফিরে এলেন। বললেন, "মিচেলের সঙ্গে তর্ক করে পেরে ওঠার সাধ্য নেই আমার। ওর ধারণা, আমাদের এই জেনারেশনটাই খল ও অসৎ। সে আমাকে বলে, "বেশ করবো, আমাদের যা-খুশী তাই করবো। তাতে সমাজের কী? সমাজের বড় বড় কোম্পানিগুলো

যখন মাল বেচে টাকা রোজগারের লোভে খবরের কাগজে, বিজ্ঞাপনে, সিনেমায়, টি-ভিতে, পোস্টারে, রাস্তায় হোর্ডিংয়ে সেক্স ছড়িয়ে দিচ্ছে তখন দোষ হচ্ছে না! দোষ হয়, সেইসব বিজ্ঞাপন দেখে উত্তেজিত হয়ে আমরা যখন নিজেদের পথে নিজেদের দেহকে শান্ত করবার চেষ্টা করি।"

"দেশে ফিরে গিয়ে আমি যদি হরেনবাবুকে বলি, পশ্চিমী ছেলেরা এইভাবে বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলে, তাহলে উনি বিশ্বাসই করবেন না।"

মিসেস্ লুইস বললেন, "সেক্ষেত্রে হরেনবাবুকে আমার হয়ে নিয়ন্ত্রণ জানিও। আমার বাড়িতে এসে নিজের চোখে তিনি যেন সব দেখে যান। ছেলেমেয়েরা আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। সেই জন্যেই তো তোমাদের দেশের বাবা-মা'দের হিংসে করছি। তাঁরা এখনও বেশ সুখে আছেন।"

মিসেস লুইস বললেন, "আসলে ব্যাপারটা কি জানো? কী ভাবে প্রচুর অর্থ করতে হয়, তার অনেক আদর্শ উদাহরণ এদেশে আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। দেশপ্রেম এবং বীরত্বের অনেক আদর্শও আমাদের ছেলেমেয়েদের জানা আছে। শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কারা বড় তাও জানে। কিন্তু ব্যক্তিজীবনের পবিত্রতা সম্পর্কে কোনো মডেল চরিত্র এদেশে নেই, যাঁকে দেখিয়ে বাবা-মা তাঁদের সন্তানদেরও বলতে পারেন, তোমরা ওর মতো হও। সেদিক দিয়ে তোমরা ভাগ্যবান। তোমাদের দেশে এখনও এই রকম মানুষ অনেক রয়েছেন।"

কথায় কথায় আমি মিসেস্ লুইসের বড় মেয়ের কথা ভুলে যাচ্ছিলাম। মিসেস লুইসকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার বড় মেয়ে এনজেলা এখন কোথায়?"

মিসেস্ লুইসের চোখদুটো দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। বললেন, 'এনজেলার কথা বলা হয় নি তোমায়। কলেজের এই জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে গেছে। আফ্রিকার কোনো এক কনভেন্টে এখন সে নান হয়ে রয়েছে।"

একটু থামলেন মিসেস্ লুইস। তারপর বললেন, "ওর জীবনটা নষ্ট হবার দায়িত্ব বোধহয় আমার। ওর উঠতি বয়সে আমি যদি দেহের পবিত্রতা সম্বন্ধে ওকে অতবার সাবধান না করে দিতাম, তা হলে এনজেলা হয়তো অন্য পাঁচজন মেয়ের মতো স্বাভাবিক হয়ে উঠতো। আমার ছোট মেয়ে এবং ছেলেকে সেই জন্যে আমি সেক্স, সতীত্ব ও দেহ সম্পর্কে তেমন কিছু বলি না। ওরা যা-খুশী করুক।"

মিসেস্ লুইস দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বখাটে

কান টানলেই যেমন মাথা আসে, তেমন উঠতি-বয়সের বিদেশী ছেলে-মেয়েদের কথা এলেই হিপিদের প্রসঙ্গ উঠতে বাধ্য।

"জ্ঞানে গুণে গরীয়ান এবং ধনে মানে বলীয়ান আমেরিকনদের প্রেস্টিজ যদি দুনিয়ার হাটে কেউ পাংচার করে থাকে—তারা হিপি।" এমন একটা কথা শুনেছিলাম আমাদের পাড়ার নগেনদার কাছে। নগেনদা এক আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্সিতে কাজ করেন—আমেরিকান ট্যুরিস্ট এবং আমেরিকান ডলার এঁদের কাছে যথাক্রমে জগন্নাথদেব এবং পুরীর মহাপ্রাসাদের মতো পবিত্র।

সেই নগেনদাও বললেন, "এদেশে আমেরিকান হলে ট্যুরিস্টদের সাতখুন মাপ ছিল। বেটারা বিদেশীমুদ্রার টাঁকশাল। কিন্তু এই হিপিরা স্বজাতের মান-সম্মান কিছু রাখলো না। এরা নোংরা জামাকাপড় পরে, খালি পায়ে অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, দামি হোটেলের ধারে-কাছে না গিয়ে ধর্মশালার খোঁজ করে, ট্যুরিস্ট ট্যাক্সি তো দূরের কথা, কুলি পর্যন্ত ভাড়া করে না। বাবাজীরা নিজের মাল নিয়ে বয়। বাসে-ট্রামে এবং রিকশায় ঘুরে বেড়ায়, ভাঁড়ে চা খায়, বিড়ি ফোঁকে, আর শুনেছি গাঁজায় দম দেয়।"

তিতিবিরক্ত নগেনদা বলেছিলেন, "এক বেটা হিপিকে সেদিন আপিস থেকে দূর করে তাড়িয়ে দিলুম। ওমা! তার পরের দিন আমাদের নিউইয়র্ক আপিস থেকে টেলেক্স এলো, খোদ বড় সায়েবের জ্যেষ্ঠপুত্র নাকি হিপি হয়ে ইন্ডিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছোকরা যদি কোনোরকম অসুবিধায় পড়ে তবে আমরা যেন সাহায্য করি। আমার তো ভিরমি খাবার অবস্থা, কারণ গতকাল যে-ছোকরাতে প্রায় গলাধাক্কা দিয়েছি, তিনিই নাকি আমাদের খোদ মালিকের বংশধর!"

নগেনদা বলেছিলেন, "বোঝো ব্যাপারটা! আমি ঘটনাটা বেমালুম চেপে গেলাম। আমাদের আপিসে ম্যাড্রাসি ম্যানেজারের সঙ্গে আমার জিঞ্জার অ্যান্ড গ্রীন ব্যানানা সম্পর্ক—খবরটা তার কানে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আমার টুয়েলভ ইয়ারের চাকরির টুয়েলভ-ও-ক্লক বাজিয়ে দিতো।"

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তারপর?"

নগেনদা বলেছিলেন, "আমি পড়ি-তো-মরি করে ছুটলাম সাডার স্ট্রীটের এক নোংরা বাড়িতে ছোকরার খোঁজ করতে। গিয়ে দেখলাম রঙীন পাঞ্জাবি-পরা এক ডাঁসা মেমসায়েবের সঙ্গে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ছোকরা গ্লোব সিনেমার সামনে আলুকাবলি খাচ্ছে। আমি এক গাল হেসে, বিনয়ে বিগলিত কুর্নিশ জানিয়ে ছোকরাকে অনুরোধ করলাম, 'চলো গ্র্যান্ড হোটেলে, ওখানে তোমার জন্য এয়ার-কন্ডিশন স্যুইট ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তেমন ইচ্ছে হলে, সঙ্গের ওই

মেমসায়েবকেও ডবলরুমে নিয়ে তোলো।' তা ছোকরা সায়েব ওসব কথা কানেই তুললো না। কোথায় আমি ভেবেছিলাম, বড় সায়েবের ছেলে সন্তুষ্ট হলে ওকে ধরে ভাইপোটাকে আপিসে ঢুকিয়ে নেবো। তা নয়, ছোকরা যা বললো শুনে আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করতে লাগলো।"

"কি বললো?" আমি নগেনদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

নগেনদা বলেছিলেন, "আমার আক্কেল গুড়ুম। সায়েব বললো, 'কোনো রিক্‌শা মালিকের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিতে পারো? আমি রিক্‌শা টেনে দু-তিন টাকা রোজগার করতে চাই।' এই বলে ছোকরা আলুকাবলির পাতা চাটতে লাগলো। জয়গুরু! কত রোগের জার্ম যে ওই হিন্দুস্থানীর আলুকাবলিতে কিলবিল করছে তা ভগবানই জানেন। ছোকরার বাবা সেবার যখন নিউইয়র্ক ছেড়ে কলকাতা আপিস দেখতে এলেন, তখন কলকাতার একনম্বর হোটেলের খাবার জল সায়বের পক্ষে সাফিসিয়েন্টলি নিরাপদ মনে না হওয়ায়, আমরা এরোপ্লেনে প্যারিস থেকে ড্রিংকিং ওয়াটার আনিয়েছিলাম।"

নগেনদা বলেছিলেন, "ছোঁড়াগুলো হোল্ আমেরিকান জাতের ইজ্জত কেরোসিন করে দিলো। এরপর কে আর সায়েব দেখলে খাতির করবে বলো?"

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে চুপচাপ ওঁর কথা শুনে যাচ্ছিলাম। নগেনদা বললেন, "বড় সায়েবের বড় ছেলের একটা জিনিস কিন্তু আমার খুব ভাল লেগেছিল। কোনো গ্যাদা নেই। আমাদের ম্যানেজার চিদাম্বরম ককটেলে নেমন্তন্ন করে কার্ড পাঠিয়েছিল। ছোকরা কোনো পাত্তাই দিলো না! আমি মশাই আপিসের এয়ারকন্ডিশনড গাড়িতে সেই একই ককটেলে যাবার পথে দেখি কিনা সায়েবের-পো চৌরঙ্গী রোডে বটগাছের তলায় বসে রিক্‌শাওয়ালাদের সঙ্গে ছাতু মাখছে।"

আমি মার্কিন মুলুকে যাচ্ছি শুনে নগেনদা বলেছিলেন, "ভায়া, এই হিপিদের হাঁড়ির খবরগুলো ভাল করে জেনে এসো তো।"

"আপনার কাছে কী কী খবর আছে, বলুন?" নগেনদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

নগেনদা বললেন, "কী বলবো ভায়া, কিছুই বুঝতে পারি না। কেউ বলে এরা আমেরিকান সি-আই-এ। হিপি সেজে আমাদের পাড়ার গোপন খবরাখবর ফরেন পাঠিয়ে দিচ্ছে। আমার ভাই তেমন বিশ্বাস হয় না, কারণ আমাদের পাড়ার খবরাখবর জেনে ফরেনের কী এমন লাভ হবে?"

"তা হলে?"

নগেনদা বলেছিলেন, "আসলে এরা হলো বড়লোকের বখাটে ছেলে। আদর পেয়ে-পেয়ে ওদের টুয়েলভ ও-ক্লক বেজে গিয়েছে।"

নগেনদার শেষ মন্তব্যটুকু মার্কিন মুলুকে গিয়ে আমার বেশ মনে ছিল।

বড়লোকের বখাটে ছেলে বললেই এতোদিন আমার মানসপটে একটা নির্দিষ্ট ছবি ভেসে উঠতো। ছবিটি আমাদের পাড়ার বড়লোক বাবু ব্রজেন্দ্রলাল মল্লিক মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র চুনীলাল মল্লিকের। স্বদেশে যত ধনী দেখেছি তাদের অধিকাংশই আকারে বিপুল। তার থেকে আমার কেমন ধারণা হয়ে গিয়েছিল মোটা না হলে বড়লোক হতে পারে না! বাবু ব্রজেন্দ্রলাল মল্লিক দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে প্রায় সমান সাইজের ছিলেন। তাঁর মধ্যপ্রদেশের বেড় কত ফুট হতে পারে তা আমি কিছুতেই আন্দাজ করতে পারতাম না। ভাগ্যে ব্রজেন্দ্রবাবু ফুলপ্যান্ট পরতেন না, তা-হলে দর্জি বেশ বিপদে পড়ে যেতো ; কারণ, একখানা ফিতেয় বড়লোকের কোমর মাপা কিছুতেই সম্ভব হতো না।

চুনীলাল কৈশোরে তেমন মোটা ছিল না। কিন্তু যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারাতেও ক্রমশ বাপের ধাঁচ আসতে আরম্ভ করলো। সে গিলে-করা আজানুলম্বিত ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি পরতো, গলায় সোনার হার, হাতে ডজনখানেক তাবিজ। চুনীলালের গাড়ি পাড়া দিয়ে চলে গেলে অদ্ভুত এক গন্ধ ভুরভুর করে ছড়িয়ে পড়তো। শুনেছি, প্রতিদিন পুরো একশিশি ফরাসী সেন্ট ব্যবহার করতো চুনীলাল।

চুনীলাল কিছুদিন আমাদের ইস্কুলে লেখাপড়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। আধডজন প্রাইভেট টিউটরের সঙ্গে সে অভিমন্যুর মতো লড়েছে। কিন্তু যা খুব সহজে ইয়ার-বন্ধুদের কাছে সে আয়ত্ত করেছিল তা হলো ত্রৈভাষিক (ইংরিজি, বাংলা ও হিন্দি) খিস্তি, সন্ধ্যায় নিষিদ্ধস্থানে গমন এবং বেপরোয়া মদ্যপানের অভ্যাস। চুনীলালকে আমরা কখনও নিজের হাত ব্যবহার করতে দেখি নি। বেলা সাড়ে ন'টার আগে তাকে ঘুম থেকে তুলে দেওয়া বারণ ছিল। তারপর দু'জন চাকর আধঘণ্টা ধরে দলাই-মালাই করবেন নন্দদুলালকে। শুনেছি, নিজে স্নান পর্যন্ত করতে পারে না চুনীলাল। ভাত খাবার আসন থেকে বাবুকে তুলে দেবার জন্যে দু'জন চাকর দাঁড়িয়ে থাকতো। মোটর গাড়িতে উঠে নিজে কখনও দরজা বন্ধ করতো না চুনীলাল। কম বয়সে অনেক ঘটা করে ব্রজেন্দ্রলাল মল্লিক সুলক্ষ্মণা সুন্দরী পুত্রবধূ ঘরে এনেছিলেন। কিন্তু চুনীলাল ঘরের ছেলে হবার জন্যে বড়লোকের ছেলে হয় নি!

অর্থাৎ বড়লোক বললেই আমার মানসনেত্রে যে ছবিটি ভেসে ওঠে তা বৃহৎবপু, অলস, মদ্যপ, চরিত্রহীন একটি কুৎসিত আকার। আমার কেমন ধারণা হয়ে গিয়েছিল, পৃথিবীর সব ধনীই অনেকটা ব্রজেন্দ্রলাল-চুনীলাল জাতীয় হবেন। সুতরাং হিপিরা যখন বড়লোকের বখাটেছেলে, তখন তারাও নিশ্চয় চুনীলালের মতো ফূর্তিতে ও মদ্যপানে পৈর্তৃক সম্পত্তি ওড়াবে—স্বতঃই

আন্দাজ করেছিলাম।

নিউইয়র্কের পার্কে একদল হিপিকে দেখেছিলাম। কেন জানি না প্রথম দর্শনেই একটু মায়া পড়ে গেলো। এরা যদি বড়লোকের বখাটে ছেলে হয়, তহলে আমাদের চুনীলাল মল্লিকদের সঙ্গে এদের কোনো সাদৃশ্য নেই। চুনীলালরা সারাক্ষণ চাকর-বাকরদের হুকুম করে এবং ইয়ার-বন্ধু ছাড়া দুনিয়ার আর কাউকেই পাত্তা দেয় না। পার্কের এই যুবকরা কাউকে কোনো হুকুম করে না। চুপচাপ জোড়েজোড়ে কাঠের বেঞ্চিতে জড়ভরতের মতো আত্মভোলা হয়ে বসে আছে।

পার্কে ঘুরতে ঘুরতে আমিও একটা সীটে বসলাম। সেই বেঞ্চিতে দু'জন তরুণ-তরুণী চোখ দিয়ে পরস্পরকে দেখছে। যুবকের বয়স বাইশ-তেইশ। মুখে একগাল সোনালী দাড়ি। পরনে একটা শতছিন্ন নীল রংয়ের হাফপ্যান্ট। আর বালিকাটির চুলগুলো তপস্বিনীদের মতো এলো করে বাঁধা।সেও একটা জাহাজী নীল রংয়ের হাফপ্যান্ট পরেছে। ঊর্ধ্ব-দেহের পাতলা জামা বোঝা যায় ভিতরে কোনো অন্তর্বাস নেই। কাঁচা সোনার মতো রং বালিকাটির। ওরা দু'জন পরস্পরের দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে। ঠিক যেন দু'খানা পাথর—কোনো স্পন্দন নেই। ব্যাপারটা বোঝবার জন্যে আমি ঘড়ির দিকে নজর দিয়েছিলাম। পুরো দেড়ঘণ্টা সময় কেটে গেলো। আমি দেখলাম, এই অপরিচিত যুবক-যুবতী একইভাবে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে।

তখন সন্ধ্যা নেমেছে। ছোট একটি রুলকাঠ হাতে জনৈক কনস্টেবল এসে ওদের শান্তিতে বিঘ্ন ঘটালো। টিপিক্যাল খিস্তির ভাষায় নগর-কোটালের প্রতিনিধি বললে, "তোমরা দু'জনে অনেকক্ষণ অনেক জ্বালাচ্ছো। আমি আবার পনের মিনিট পরে আসবো—তখনও যদি এখানে বসে থাকো, তাহলে বিপদে পড়ে যাবে।"

ছোকরাটি নড়েচড়ে বসলো। পুলিশকে শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলো, "আমরা আপনার কী করেছি?"

"তোমাদের সঙ্গে তর্ক করার মতো সময় বা ইচ্ছে কোনোটাই আমার নেই। যা-বলবার আমি বলে দিয়েছি," পুলিশটি চড়া গলায় বললো।

ছোকরাটি এবার আমার দিকে তাকালো। আমাকে দেখেই বুঝলো বিদেশী। তারপর বিরক্তভাবে বললো, "আমরা সাতে নেই, পাঁচে নেই, চুপচাপ পাবলিক পার্কে বসে আছি। তাও পুলিশের কী অত্যাচার দেখলেন তো? ভগবানের অরুচি এই দেশকে আবার ডেমক্র্যাসি বলা হয়!"

আমি কী বলবো বুঝতে পারছি না। মহিলা একবার নড়েচড়ে বসলেন। আমাকে প্রশ্ন করলেন, "পৃথিবীর কোন অংশ থেকে তুমি এই অভাগা দেশে

এসেছো ?"

ভারতবর্ষের নাম শুনেই ওদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললো, "আমরাও তাই আন্দাজ করেছিলাম। গ্রেট পিপল। গত বছর আমরাও কাঠমাণ্ডুতে ক্রিসমাস কাটিয়েছিলাম—এবছর বড়দিনে বারাণসী যাবার ইচ্ছে।"

আশেপাশে সীটে আরও কয়েকজন হিপিকে হয় জোড়ে না-হয় বিজোড়ে চুপচাপ বসে থাকতে দেখলাম। কয়েকজনের মুখে বিশেষ ধরনের দাড়ি, যা-দেখলে দু'হাজার বছর আগের সেই মহামানবের কথা মনে পড়ে যায়, যাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে আমরা কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করেছিলাম। ছোটবেলায় ইতিহাসের বইতে ইংলন্ডে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের প্রসঙ্গে পড়েছিলাম—রোমের ক্রীতদাস-বাজারে সেন্ট পল কয়েকটি বন্দী ইংরাজ বালক দেখে মোহিত হয়ে বলেছিলেন, "এরা তো এংগল্‌স নয়, এরা এন্‌জেল!' এই বালকদের দেখেই সেন্ট পলের ইংলন্ডে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের বাসনা হয়। এতোদিন ধরে দেশে বিদেশে বহু খ্রীষ্টান দেখেছি, কিন্তু এই নিউইয়র্কে হিপি-পাড়ায় এসে মনে হলো, স্বয়ং যীশুই আবার পৃথিবীর মাটিতে ফিরে এসেছেন।

দৈহিক সাদৃশ্য থাকলেই মহামানব হওয়া যায় না—কিন্তু যুবকদের মুখে কোথাও আশ্চর্য সরলতা ও পবিত্রতা রয়েছে। কেবল এদের চোখগুলো উজ্জ্বল নয়, কেমন যেন একটু ঘোলাটে।

হিপি যুবকটি আবার কথা বললো, "ওই ন্যাবটি এখনই এসে আমাদের মাথা ভাঙবে।" হিপি অভিধানে 'ন্যাব' মানে যে পুলিশ তা আন্দাজ করে নিলুম।

ছোকরা বললো, "এই পার্কের উত্তরদিকে এক ব্লক গেলেই গুণ্ডারা প্রতিদিন রিভলবার দেখিয়ে নিরীহ পথিকদের কাছে পয়সা ছেনতাই করছে। সেখানে পুলিশ কিছু করবে না। কিন্তু আমরা চুপচাপ বসে আছি, তা ওদের সহ্য হবে না।"

মেয়ে হিপিটি বললো, "কপগুলো আমাদের যাই করুক, আমরা ওদের ভালবাসবো। জানো মিস্টার, কিছুদিন আগে গ্রীনউইচ ভিলেজে কপগুলো অনেক হিপির মাথা ফাটিয়ে দিলো। আমরা কিছুই করিনি ; বরং পরের দিনে পুলিশ-কনস্টেবলদের বাচ্চাদের জন্যে পিকনিকের ব্যবস্থা করেছিলাম। পুলিশদের সম্মানে আমরা একদিন নাচগানের আসর করতে চাই। আমরা তোমাদের গান্ধীর অহিংসা নীতিতে বিশ্বাস করি।"

ছোকরা হিপি বললো, "তুমি মহাত্মা গান্ধীকে দেখেছো ?"

আমি কয়েকবার ছাত্রাবস্থায় তাঁকে দেখেছি শুনে মেয়েটি বললো, "তোমরা ওঁকে মারলে কেন ? ওঁকে যদি তোমাদের পছন্দ না হয়ে থাকে, আমাদের এখানে পাঠিয়ে দিলে না কেন ? আমরা এই গ্রীনউইচ ভিলেজে তাঁকে গুরু করে রাখতাম।"

ছেলেটি বললো, "আমার খুব গান্ধীকে দেখতে ইচ্ছে করে—হি মাস্ট হ্যাভ বিন এ গ্রুভি ক্যাট।"

অ্যাঁ! ক্যাট মানে তো বেড়াল! আর গ্রুভি কথাটার অর্থ কিরে বাবা? গান্ধীজীকে ওরা বেড়াল বলছে কেন? পরে শুনেছি খুব পছন্দসই পুরুষমানুষকে ওরা ক্যাট বলে। পছন্দসই মহিলাদের ক্ষেত্রে শব্দটি হলো 'চিক' বা খুকুমনি।

হিপিনী বললো, "কপগুলো যদি আমাদের ওপর ওইরকম অত্যাচার করে তাহলে আমরা তোমাদের দেশে চলে যাবো। পৃথিবীর প্রথম হিপি তো ইন্ডিয়াতেই জন্মেছিলেন।"

তিনি আবার কে? আমার জানতে ইচ্ছে হয়। ছোকরা বললো "লর্ড বুদ্ধ। রাজার পুত্র হয়েও তিনি এস্ট্যাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন। রাজকীয় সুখের লোভ ত্যাগ করে প্যালেস ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। সত্যকে জেনে অনেকদিন পরে তিনি তখন আবার জন্মভূমিতে ফিরে এলেন তখন তাঁর বাবা পরাজয় স্বীকার করলেন।"

বুদ্ধ এবং গান্ধীর এরা যে এতো সম্মান করে তা আমার জানা ছিল না। আমি বললাম, "পুলিশ তোমাদের লাঠি মারলো অথচ তোমরা তাদের ছেলেদের খাওয়ালে ; এই শুনে আমাদের ভগবান চৈতন্যদেবের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। তাঁর শিষ্য নিত্যানন্দ একবার জগাই মাধাই নামক দুই স্বাধীন পুলিশের খপ্পরে পড়েছিলেন। তারা ইট মারলো, কিন্তু তিনি তাই তাদের ভালবেসে জয় করলেন।"

হিপিনী খুব আগ্রহ দেখালো। জিজ্ঞেস করলো, "তিনি এগজ্যাকটলি কি করলেন?"

আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হলো, "সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত রচনা হলো—মেরেছিস মেরেছিস কলসীর কানা তাই বলে কি প্রেম দিবো না?"

হিপিযুগল আমাকে চেপে ধরলো, সুরটা শিখিয়ে দিতে হবে। আমি লাইনটা বাংলায় গাইলাম। ওরা বললো, "ইংরিজী অক্ষরে লাইনটা লিখে দাও।" আমি রোমান অক্ষরে লিখছি—মেরেছিস মেরেছিস কলসীর কানা। ওরা ততক্ষণে সুর করে লাইনটা প্র্যাকটিস করতে লাগলো।

এমন সময় পুলিশের পুনরাবির্ভাব। পুলিশ প্রথমেই হিপি ছোকরার পেটে এক গোঁত্তা দিলো। তারপর ছোকরাকে প্রায় উলঙ্গ করে সার্চ শুরু হলো। মহিলাটিকে পুলিশ বললো, "তোর গায়ে হাত দিতে পারছি না, কোথায় কি লুকিয়ে রেখেছিস বল? পুলিশ স্টেশনে মেয়ে এসিস্টেন্ট আছে, সে তোর গোপন স্থান থেকে সব মাল বের করে ফেলবে।"

মেয়েটি শান্তভাবে বললো, "আমার কাছে কিছুই নেই। বিশ্বাস না হয় দেখো"—এই বলে মেয়েটি ঝপাং করে বুকের কাপড় খুলে অনাবৃত স্তনযুগলের

মধ্যবর্তী উপত্যকা দেখিয়ে দিলো। মেয়েটি হয়তো সম্পূর্ণ উলঙ্গ হতো, কিন্তু পুলিশ তাকে নিবৃত্ত করলো।

পুলিশের দৃষ্টি এবার আমার উপর পড়লো। "কী গোপন মেসেজ পাঠানো হচ্ছে? দেখি।" এই বলে আমার হাতের টুকরো কাগজটা ছোঁ মেরে সে কেড়ে নিলো। তারপর অদ্ভুত কায়দায় কয়েকটি শব্দ দেখে আরও চিন্তিত হয়ে পড়লো। সে বেশ সন্দেহের সঙ্গে বিড়বিড় করতে লাগলো—মিয়ারচিজ মিয়ারচিজ কোলজির কন। বিরাট শিকার ধরার উত্তেজনায় পুলিশ চিৎকার করেউঠলো, "নাউ! এতক্ষণে ব্যাপারটা বোঝা গেলো। তোমরা কোড ওয়ার্ডে গ্রাস এবং এল-এস-ডি সম্পর্কে খবর আদান প্রদান করছো।"

হিপি মহিলা আমার হয়ে বললেন, "আমাদের ওপর যা অত্যাচার করছো করো। কিন্তু এই ভদ্রলোক নিরপরাধ ইন্ডিয়ান।"

"কি রকম নিরপরাধ থানায় গেলেই বোঝা যাবে! ইন্ডিয়া থেকেই তো টন টন মারিজুয়ানা এদেশে স্মাগল করা হচ্ছে—ভাবছো আমরা কিছুই জানি না। চলো বাছাধনরা এখন থানায়।"

এবার আমি সত্যিই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। দেশ দেখতে এসে শেষ পর্যন্ত হাজতে ঢুকতে হবে নাকি! হিপি যুবক আমাকে রক্ষা করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করলো। বললো, "এটা খুবই অন্যায়। এই ভদ্রলোককে আমাদের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলার কোনো যুক্তি নেই।"

আমি কী করবো বুঝে উঠতে পারছি না। কাঁদো কাঁদো অবস্থা। এমন সময় হঠাৎ মনে পড়ে গেলো, আমেরিকায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাকে একটা সরকারী পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল, "এই কার্ডের অধিকারী সরকারের আমন্ত্রণে ইউ-এস-এ দেখতে এসেছেন। এই বিশিষ্ট অতিথিকে যেন সর্বপ্রকারে সাহায্য করা হয়।" আমি শেষবারের মতো চেষ্টা করবার জন্য আইডেনটিটি কার্ডখানা বের করে পুলিশের হাতে দিলাম। মন্ত্রবৎ কাজ হলো। আমার নাম ধরে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে পুলিশ বললো, "মিস্টার অমুক, আপনার অসুবিধা সৃষ্টি করবার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আপনি আমাকে বলেননি কেন যে আপনি আমাদের সরকারের মাননীয় অতিথি?"

পুলিশ আমাকে সময়োচিত অভিবাদন জানিয়ে বললো, "এই যে অঞ্চল দেখছেন এখানে যতরকম বে-আইনী নেশার মালের লেনদেন হয়। এই যে হিপিগুলো দেখছেন, এরা হ'ল আমাদের নেশনের কলঙ্ক। এরা কোনো কাজকর্ম করে না, স্নান করে না, দিনরাত শুধু মারিজুয়ানা, এল-এস-জি ইত্যাদি খেয়ে, নানারকম নেশার ইনজেকশন নিয়ে নিজেদের এবং ফিউচার বংশধরদের শরীর স্বাস্থ্যের সর্বনাশ করছে।"

আমার জন্যে হিপি দু'জনও তখনকার মতো রক্ষে পেয়ে গেলো। তাদের গলায় মৃদু-ধাক্কা দিয়ে পুলিশ বললো, "এ-যাত্রায় বেঁচে গেলি। যা পালা! ফের যদি কালকে এখানে দেখি, মুশকিলে পড়ে যাবি।"

হিপিযুগল অপমানিত হলেও নিজেদের বিরক্তি প্রকাশ করলো না। যাবার আগে আমাকে বললো, "আমাদের জন্যে আপনার এই কষ্ট হলো, আমরা দুঃখিত।"

"বেশি বকবক করিস না, যা পালা!" পুলিশ আবার ওদের বকুনি লাগালো।

ওরা দু'জন এবার আমাকে অবাক করে দিয়ে বাংলায় গান ধরলো, "মেরেছিস মেরেছিস কলসীর কানা..."

গান গাইতে গাইতে ওরা অদৃশ্য হয়ে গেলো। পুলিশ আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করতে লাগলো। বললো, "ওরা কোনো একটা অদ্ভুত ভাষায় আমার বাপ-মা তুলছে। এই ব্যাটাদের দুষ্টুমি—সব সময় ইংরিজীতে কথা বলবে না। নিজেদের খুশী মতো আফ্রিকান, আরাবিয়ান, নেপালী, টিবেটান ভাষা থেকে কোটেশন দিয়ে গালাগালি করবে। জানে ইংরিজীতে কিছু বলবে আমি ঘাড় ধরে থানায় নিয়ে যাবো।"

আমি বললাম, "ওরা বাংলায় গান গাইছে। বাংলা আমার মাতৃভাষা।"

উৎফুল্ল হয়ে পুলিশ বললো, "খুব ভাল হয়েছে। চট করে অনুবাদ করুন তো ওরা কী বলছে, দৌড়ে ধরে নিয়ে এসে বাছাধনদের মজা দেখিয়ে দিচ্ছি। ফরেন ভাষায় শালারা আর কোনোদিন মার্কিন পুলিশকে গালাগালি না করতে পারে তার শিক্ষা দিয়ে দেবো।"

আমার অনুবাদ শুনে পুলিশপ্রবর তো থ! প্রথমে বিশ্বাসই করতে চায় না। জিজ্ঞেস করলো, "আর ইউ শিওর, কথাগুলো কোনো কোড নয়?"

আমি বললুম, "মোটেই না। প্রত্যেক বেঙ্গলীর এই গান মুখস্থ।"

হতাশ হয়ে পুলিশ জিজ্ঞেস করলো "শেষের দিকে কী বলেছে? আমাকে ওদের সঙ্গে লাভ-অ্যাফেয়ারে জড়িয়ে পড়তে বলছে? ভগবান আমাকে রক্ষে করুন! ওদের মেয়েগুলোর গায়ে যা গন্ধ! তুমি যদি ওদের প্যাডে যাও বুঝবে।"

"প্যাড আবার কী বস্তু?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

পুলিশ বললো, "যেখানে ওরা ঢালা-বিছানায় কুড়ি পঁচিশ জন একসঙ্গে শুয়ে থাকে। প্যাডে এমন দুর্গন্ধ তোমাকে কী বলবো!"

একটু থেমে সে বললো, "তুমি বিদেশী। আমাদের দেশ দেখতে এসেছো। তোমাকে বলা উচিত নয়, কিন্তু এই কম্যুনিটি প্যাডগুলো হলো নরক। কতকগুলো সিনিয়র হিপি নাকি সেবাধর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে এইগুলো চালায়। সারাদিন টোটো করে ঘুরে গাঁজা-ভাং খেয়ে জোড়ে জোড়ে কচি কচি হিপি

ছেলেমেয়ে রাত্রে এখানে শুয়ে পড়ে। তারপর গোরু ঘোড়ার মতো এরই মধ্যে যা করে তা তোমার না শোনাই ভাল?

পুলিশকে বললাম, "এক কাপ কফি খাবেন নাকি?"

বললো, "এখন ডিউটিতে রয়েছি।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এইসব ছেলেমেয়েরা কোথা থেকে আসে?"

পুলিশ বললো, "ভগবান জানেন! আমি কয়েকদিন এই লাইনে আছি, কয়েক বছর আগেও এসব হাঙ্গামা ছিল না। হঠাৎ কী যে হলো, পঙ্গপালের মতো হাজার হাজার ছেলেমেয়ে বাপ-মায়ের সংসার ছেড়ে ইস্কুল-কলেজে নাম কাটিয়ে হিপি হচ্ছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জাত বলে আমাদের যে গর্ব ছিল তা এদের দৌলতে নষ্ট হতে বসেছে। এরা সব সময় জোড়ে জোড়ে ঘোরে। কোনো একটা পাড়ার কাছাকাছি দল বেঁধে থাকে। এরা বেজায় কুঁড়ে। এদের কোনো উচ্চভিলাষ নেই, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো ভাবনা নেই। সে-সমাজে তোদের এতো সুখে রেখে বড়সড় করেছে তোরা শুধু তাদের গালাগালি করবি? সোসাইটির সবাই নাকি লোভী, সবাই নাকি খারাপ, শুধু ওরাই ভাল। তা বাপু সবাই যদি খারাপ, দেশটা যদি সত্যিই গোল্লায় গিয়ে থাকে, তাহলে সাজেশন দে, বল কী ভাবে সমাজকে ভাল করা যায়—তা বলবে না।"

একটু থামলো পুলিশ। তারপর বললো, "ওদের আসল লোভ নেশা-ভাঙের। প্রথমে তোমাদের দেশ এবং নেপাল থেকে আসা মারিজুয়ানা দিয়ে আরম্ভ করবে। ওদের কাছে নাম হলো 'ঘাস'। এই ঘাস কখনো সিগারেটের ভিতর পাকিয়ে, কখনও কুকির সঙ্গে ভেজে, কখনও চায়ের সঙ্গে ভিজিয়ে এরা খাচ্ছে। তাতে নাকি ওরা মানসিক আনন্দ পায়—সব কিছু ভুলে একেবার আনন্দলোকে চলে যায়। ডাক্তাররা বলছে, ঘাস জিনিসটা সর্বনাশা। কিন্তু এই বেঁড়েদের সঙ্গে তর্কে পেরে উঠবেন না। থানায় গিয়ে গোঁত্তা খাবার পরও মুখের ওপর বলবে, "জুসের থেকে ঘাস অনেক ভাল।"

"জুস কী জিনিস?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"জুস হলো মদ—বিশেষ করে হুইস্কি। ওদের মতে হুইস্কি নাকি ঢের বেশী স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। হুইস্কি খওয়ার পর হ্যাংগওভার হয়, ঘাসের নাকি ওসব দোষ নেই। হুইস্কি খেলে নাকি দেহমন অধঃপতনে যায়, আর ঘাস নাকি চড়চড় করে মানুষকে ওপরের দিকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। ইস্কুল-কলেজে কুসঙ্গে পড়ে ছেলেপুলেরা ঘাসে হাতেখড়ি করে, তারপর নেশা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে হিপি হওয়া ছাড়া পথ থাকে না। আইন অনুযায়ী এদেশে ঘাস আমদানি বন্ধ। কিন্তু কী করে যে লাখ লাখ হিপি এই খাসের সাপ্লাই পাচ্ছে তা আমরাও বুঝতে পারি না। তবে ঘাসের দাম অনেক এখানে। যারা সস্তা গণ্ডায় ফূর্তি করতে চায় তারা

এখন আপনাদের দেশে চলে যাচ্ছে।”

আমি মনে মনে বললাম, এটা মন্দ নয়। আমাদের দেশে যারা সস্তায় হুইস্কি খেতে চায় তারা ফরেন যাবার জন্যে উন্মুখ, আর বিদেশের ছেলেমেয়েরা সস্তায় গাঁজার কল্কেতে দম দেবার লোভে ইন্ডিয়ায় আসতে চায়। একেই তো বলে ‘দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে’।

পুলিশ বললো, “ঘাস দিয়ে শুরু—তারপর হিপিদের প্রমোশন হয় এল-এস-ডি তে। ১৯৪৩ সালে একজন সুইস কেমিস্ট হঠাৎ এই কেমিক্যাল আবিষ্কার করেন। দুনিয়ার লোকরা বলে, সুইসরা কখনও যুদ্ধে নামে না, পৃথিবীর মঙ্গল ছাড়া ওদের মাথায় নাকি কিছুই নেই। এখন আপনারা বিবেচনা করুন। আমাদের দেশের যদি শেষ পর্যন্ত সর্বনাশ হয়, তা এই সুইসদের তৈরী এল-এস-ডির জন্যেই হবে। এল-এস-ডি সম্বন্ধে পুলিশ লাইনে আমাদের পড়াশোনা করতে হয়। পচা রাই সরষের ওপর একরকম ছাতা পড়ে। লিসারজিক অ্যাসিডের সঙ্গে যা মেশানো হয় তা এতোদিন রবার ভালকানাইজ করবার জন্যে টায়ার কারখনায় লাগতো, নাম ডাইএথাইল অ্যামিন। ওই মেশানো জিনিসটা প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জমিয়ে দেওয়া হয়। এরপর ডিসটিল করবার সময় ক্লোরোফরম, বেনজিন ইত্যাদি কী সব ব্যবহার করে। এল-এস-ডি বড়ি খেলেই আট থেকে বারো ঘণ্টা ডেঞ্জারাস অবস্থা। ছেলেমেয়েগুলোকে এই অবস্থায় দেখলে কষ্ট হয়—কখনও রেগে উঠেছে, কখনও কাঁদছে, কখনও হাসছে, কখনও ভয় পাচ্ছে, কখনও দুশ্চিন্তায় গলায় দড়ি দিতে যাচ্ছে। ছোঁড়াগুলো তবু বুঝবে না, বলবে অ্যাসিড খেয়ে ট্রিপ করছি। কোথায় যাত্রা করছিস বাবা? নরকে!”

পুলিশ এবার হাতঘড়ির দিকে তাকালো। শুভরাত্রি জনিয়ে বিদায় নেবার আগে বললো, “এইসব জায়গায় বেশী রাত্রি পর্যন্ত একলা ঘুরবেন না—হিপিগুলোর বড্ড অর্থকষ্ট, আপনার কাছ থেকে সব কিছু কেড়েকুড়ে নিতে পারে।”

এই কেড়েকুড়ে নেবার ব্যাপারটা বোধহয় সত্যি নয়। কারণ হিপিরা সাধারণত নির্বিবাদী শান্তিপ্রিয়। নিজেদের নিয়েই বুঁদ হয়ে আছে, পৃথিবীর অন্য কোথায় কী হচ্ছে সে সম্পর্কে এদের কোনো আগ্রহ নেই। হিপি রাজ্যে একলা অনেক ঘুরেছি। কিন্তু আমাকে কেউ কখনও ভয় দেখায়নি। এই বিপদ বরং সুসভ্য ওয়াশিংটনে, নিউইয়র্কে এবং শিকাগোর বিখ্যাত অঞ্চলে যথেষ্ট আছে। অনেকেই দিন দুপুরে এবং রাতের অন্ধকারে এইসব জগদ্বিখ্যাত শহরে যথাসর্বস্ব গুণ্ডাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। হিপিরা ওসব করে না, তবে অনেক সময় ভিক্ষে চায়। বিশেষ করে বিদেশীদের কাছ থেকে। স্বদেশীদের কাছে সহানুভূতি পাবে না বলেই ওদের বিশ্বাস।

এই ভিক্ষের ব্যাপারে আমি একটা ছেলেমানুষী মতলব এঁটেছিলাম। ভিখিরীর দেশ থেকে এসেছি ; বিদেশে যে হাত পাতবে তাকে বঞ্চিত করবো না, বরং যা চাইবে তার ডবল দেবো।

ডেনভার কলোরাডো থেকে ট্রেনে চড়ে আমি আমেরিকার পশ্চিমপ্রান্তে হাজির হয়েছিলাম। সেখানকার বিরাট এক শহরে ডিপার্টমেন্টাল-স্টোর থেকে কিছু জিনিসপত্র কিনে বার হচ্ছি, এমন সময় এক তরুণ হিপি যুবক আমার কাছে এসে বললো, "দশটা সেন্ট (আমাদের দশ পয়সার মতো) কি তুমি স্পেয়ার করতে পারো?"

ছেলেটির দিকে তাকিয়ে আমার মায়া হলো। আরও মনে পড়লো, এদেরই বাবা-কাকাদের দান করা গম খেয়ে একসময় দুর্ভিক্ষের হাত থেকে লক্ষ লক্ষ ভারতীয়দের প্রাণ রক্ষা হয়েছে। আমি বললাম, "দশ কেন, কুড়ি সেন্ট তোমাকে দিতে পারি, যদি বলো ওই পয়সা নিয়ে তুমি কি করবে?"

"দুপুরবেলায় কিছু খেতে চাই আজকে।" ছোকরা বেশ শান্তভাবে উত্তর দিলো।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম আমারও লাঞ্চের সময় হয়েছে। বললাম, "আমিও খেতে যাবো ভাবছিলাম। আমি যদি তোমাকে খাবার জন্যে নেমন্তন্ন করি?"

ছোকরা আমাকে অজস্র ধন্যবাদ দিলো, কিন্তু নেমন্তন্ন গ্রহণ করতে দ্বিধা দেখালো। বললম, "এতো ভাববার কী আছে?"

"না মহাশয়, আপনার অসুবিধা ঘটাতে চাই না। আপনি দশটা সেন্ট দিলেই আমার এবেলা চলে যাবে।"

আমি আরও চেপে ধরতে, ছোকবার সংকোচের কারণ বুঝতে পারলাম। অদূরে একটি কিশোরী হিপিনীও শতছিন্ন জামাকাপড় পরে ভিক্ষা করছে। ওদের ইচ্ছে দু'জনে একসঙ্গে খাবে। আমি বললুম, "ওঁকেও নিয়ে চলো—তিনজনে কোথাও গিয়ে সামান্য কিছু খাওয়া যাবে।"

ছোকরার আত্মসম্মানে লাগছিল বোধ হয়। বললো, "দশটা সেন্ট চেয়ে আপনাকে এইভাবে অসুবিধায় ফেলবার ইচ্ছে আমার ছিল না।"

আমি বললাম, "ওসব ভদ্রতার কথা ভুলে যাও। তোমার বান্ধবীর আপত্তি না থাকলে চলো।"

মেয়েটির নাম ডোরা। টোনি নামক যুবক হিপি তাকে গিয়ে নিমন্ত্রণের কথা বলতেই সে এমন হেসে ফেললো, যা আমি কোনোদিন ভুলবো না। সেই হাসির মধ্যে অনির্বচনীয় সরলতা ও পবিত্রতা ছিল। ভিক্ষা আমাদের দেশে কলুষিত হয়েছে; এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে নীচতা ও দারিদ্র্য। কিন্তু এমন একদিন ছিল, যেদিন ভিক্ষার

মধ্যে ছিল বিনয় ও পবিত্রতা। এই পবিত্রতা কখনও কখনও দেখেছি ব্রাহ্মণ বন্ধুবান্ধবদের পারিবারিক উপনয়ন সংস্কারে। মুণ্ডিতমস্তক দণ্ডধারী তরুণ সন্ন্যাসী গৈরিক ভিক্ষার ঝুলিটি খুলে যখন বলে, ভবান, ভিক্ষাং দেহি অথবা ভবতি, ভিক্ষাং দেহি—তখন অপূর্ব লাগে। আজ অনেকদিন পরে কেন জানি না সেই অনুভূতি হলো আমার।

ডোরা আমার কাছে এগিয়ে এসে বললো, "হে বিদেশী, দু'জন ভিখিরীর জন্যে কেন তোমার মধ্যাহ্নভোজনে ছন্দপতন ঘটাবে?"

কিশোরীকে বললাম, "আমি ভিখিরীর দেশ থেকে এসেছি—তার নাম ভারতবর্ষ। তোমাদের সঙ্গে গল্প করতে আমার ভাল লাগবে।"

সরল হাসতে মুখ ভরিয়ে কিশোরী এবার সখার দিকে তাকালো। তারপর বললো, "উনি এতো করে বলছেন, তখন চলো।"

কাছাকাছি একটা সেল্‌ফ-সার্ভিস রেস্তোরাঁয় এসে ঢুকলাম আমরা। এখানে কোনো বেয়ারা টেবিলের কাছে এসে অর্ডার নেয় না, নোংরা কাউন্টার থেকে খাবার এনে খেতে হয়। এবং খাবার পর ডিশগুলো একটা চৌবাচ্চায় রেখে আসতে হয়। অতিথিদের টেবিলে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কী খাবে?"

ডোরা বললো, "আমরা আজকাল যেসব খাবার খেয়ে থাকি তা এখানে পাবে না। আমরা পছন্দ করি টাটকা সব্জি, কিছু ফল এবং দুধ। তুমি বরং একটা হেভি স্যুপ এবং দু'এক টুকরো রুটি দেখো।"

টোনি বললো, "তারপর কফি খাওয়া যেতে পারে। ডিপফ্রিজে জমা টিনের কৌটোতে রাখা খাবার খাইয়ে ব্যবসাদাররা দেশটার সর্বনাশ করছে। তোমাদের দেশ যেন কখনও এই ডিপফ্রিজ এবং টিন ফুডের খপ্পরে না পড়ে। আমাদের গভর্নমেন্টও স্বীকার করছে, প্রত্যেক বছর টিন, বোতল এবং বাক্সে রাখা খাবারের মাধ্যমে প্রত্যেক আমেরিকানের পেটে তিন পাউন্ড কেমিক্যাল প্রিজারভেটিভ চালান যাচ্ছে। এর ফল বিষময় হতে পারে।"

ওদের বসতে বলে, আমি খাবারের লাইনে দাঁড়ালাম। মিনিট চারেক পরে খাবার হাতে ফিরে দেখি গোলমাল বেঁধেছে। দোকানের ম্যানেজার আমাদের টেবিলে এসে ওদের তাড়াবার চেষ্টা করছেন। আমি বেশ লজ্জায় পড়লাম। হাতজোড় করে ম্যানেজারকে বললাম, "এঁরা আমার অতিথি, ওঁদের কী দোষ হয়েছে? কেন চলে যেতে বলছেন?"

ম্যানেজার গম্ভীরভাবে বললেন, "এই রেস্তোরাঁর নিয়ম—খালি পায়ে এখানে ঢুকতে দিতে বাধ্য নই।"

আমি বললাম, "আমি যে দেশ থেকে এসেছি সেখানে বেশীর ভাগ লোকের পায়ে জুতো নেই। খালি পায়ের সঙ্গে নোংরামির সম্পর্ক কী? বড়জোর বলতে

পারেন, যে খালি পায়ে হাঁটছে, তার নিজের বিপদের সম্ভাবনা বেশী।"

ম্যানেজার ওসব কথা কানে নিলেন না। বললেন, "আমি কোনো আর্গুমেন্টে ঢুকতে চাই না। একবার এইসব লোক আমার রেস্তোরাঁয় ঢুকলে ভদ্রলোকেরা এখানে আসা বন্ধ করে দেবে।"

আমি করুণভাবে আবেদন করলাম, যদি এদের খেতে না দেন, তা হলে আমাকেও ওদের সঙ্গে চলে যেতে হয়। আমাদের খাবার কেনা হয়ে গিয়েছে। যদি মিনিট পনেরোর জন্য দয়া করেন।"

ম্যানেজার কী ভেবে শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন।

আমরা খাওয়া শুরু করলাম। টোনি বললো, "এই আমাদের দেশ! দেখলে তো? এদের যত পাপ সব কার্পেটের তলায় এবং মনের মধ্যে লুকানো থাকে। আমার খালি পা তো তোমার কী? পায়ে জুতো নেই বলে ওরা সেদিন আমাকে প্লেন থেকে নামিয়ে দিয়েছে। অথচ পয়সা দিয়ে এরা সিনেমায়, থিয়েটারে, রেস্তোরাঁয়, ক্যাবারেতে পা থেকে মাথা পর্যন্ত উলঙ্গ দেহ দেখতে যায়।"

একটু পরেই টোনি নিজের কথা বলতে আরম্ভ করলো। টোনির বয়স উনিশ। শিক্ষিত উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে সে। বাবা সম্প্রতি কোনো কোম্পানির কর্ণধার হয়েছেন।

টোনি বললো, "এই ভদ্র আমেরিকান সমাজ সম্বন্ধে আমার ঘেন্না ধরে গিয়েছে। লোকগুলোর মধ্যে লোভ ও উচ্চাশা ছাড়া আর কিছু নেই। জীবন থেকে এদের কেবলমাত্র প্রত্যাশা—মোটা টাকার ব্যাঙ্কের পাস-বই, শহরতলিতে একটা বাড়ি, দু'খানা মোটরগাড়ি এবং একখানা প্রমোদ-তরণী—এখানে বলে ইয়াট। আমার বাবা-মা'র এসব তো ছিলই, তাছাড়াও অনেক কিছু ছিল। আমাদের তিনটে গাড়ি আছে, দুটো বাড়ি আছে, কানট্রি ক্লাবের মেম্বার আমরা। বাড়িতে টেলিভিশন থেকে আরম্ভ করে দুনিয়ার ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি আছে—কোনোটা দাঁত মাজবার জন্যে, কোনোটা দেহ দলাই-মালাইয়ের জন্যে, কোনোট ভুঁড়ি কমাবার জন্যে, কোনোটা চুল শুকনো করবার জন্যে, কোনোটা গোঁফ সরু করবার জন্যে। কিন্তু আমার পিতৃদেব কি সুখী হয়েছেন? মোটেই না। অত্যধিক পরিশ্রম করেন ভদ্রলোক, কাজের চাপে শরীর ও মন দুই ক্ষয়ে যাচ্ছে। তার ওপর সবসময় ইনকামট্যাক্সের চিন্তা। মাথার যন্ত্রণায় ভদ্রলোক পাগল—কাউকে বিশ্বাস করতে পারেন না। সাফল্যের মই বেয়ে ওপরে উঠে ভদ্রলোক দেখছেন, সেখানেও আর একটা মই লাগানো আছে—আরও ওপরে ওঠা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। মাঝে মাঝে ভদ্রলোক খুব রেগে ওঠেন—কখনও চুপচাপ মনমরা হয়ে বসে থাকেন। প্রচুর হুইস্কি গেলেন। ভদ্রলোকের দেহে বার্ধক্যের ছাপ পড়েছে। এই ধরনের সাফল্য দেখলে আমার

গা-বমি করে। আমি ওই ইঁদুর দৌড়ে অংশ নিতে রাজী নই। অথচ বাবার ইচ্ছে, আমাকে নিজের কার্বন কপি বানাবেন। আমি বছর দুই আগে ওঁদের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এসেছি।"

টোনি বললো, "টয়েনবি সম্প্রতি লিখেছেন, হিপিরা হলো আমেরিকান-মার্কা জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে মানবতার সাবধান-করা লাল লণ্ঠন—রেড ওয়ার্নিং লাইট।"

"বাড়ি থেকে পালিয়ে কী করলে?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"এক বন্ধু বললো প্লাস্টিক হিপি হ'। সেটা হলো সারা সপ্তাহ রুজিরোজগার করে কিছুদিনের জন্যে কিংবা দু'দিনের জন্যে হিপি হওয়া। আমি বললাম, না। আমার মধ্যে অশান্তির আগুন জ্বলছে। আমি প্রতিবাদ করতে চাই।"

টোনি বললো, "ঘুরতে ঘুরতে আমি কার্লিফোর্নিয়াতে হাজির হলাম। সেখানে এক গুরু পাকড়ালাম। তিনি বললেন, 'ঘাস খাও। অ্যাসিড নাও। তুরীয় আনন্দে ডুবে থাকো। প্রাণ যা চায় তাই করো। শুধু এমন কিছু কোরো না যাতে অন্যের কষ্ট হয়। মানুষকে ভালবাসো।' আমার চোখের সামনে থেকে পর্দা সরে গেলো। আমি গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরলাম, ঘরে রবিশঙ্করের ছবি টাঙালাম। চকচকে ঝকঝকে রঙয়ে ঘর সাজালাম, নাচগান হৈ-হুল্লোড় করলাম। সাইকেডেলিক মিউজিকে মনের কী আনন্দ হয় তা কী করে অন্যকে বোঝাবো? প্রথম প্রথম এল-এস-ডি খেয়ে মনে হতো আমি মহাশূন্যে পড়ে যাচ্ছি। কিন্তু কোথায় যাচ্ছি? কোথাও আশ্রয় পেলে তবে তো লাগবে। মহাশূন্যে তো কেনো ভয় নেই।"

"তারপর?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"এই অবস্থায় ভিক্ষে করা শিখলাম। শিখলাম পয়সা জমানো মহাপাপ। কখনও পরের দিনের কথা ভাবতে নেই। যা আছে তা অন্যের সঙ্গে ভাগ করে খেতে হয়।"

"আর কী করতে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"যা মন চায়। শরীর এবং মনকে এতোদিনের শেকলবাঁধা অবস্থা থেকে মুক্তি দিলাম। সেক্সও করেছি প্রচুর—অবশ্য ঠকিয়ে নয়, জোর করে নয়। যার দেহের সঙ্গে আমার দেহ যুগলবন্দী হবে তার অনুমতি ও সমর্থন নিয়ে—বাই মিউচুয়াল কনসেন্ট। সেক্সের টেনসন থেকে মুক্তি পাবার পরে শুরু হয়েছে আত্ম-অনুসন্ধান। মাঝে মাঝে বাড়ির কথা মনে হয়নি এমন নয়। শেষে ওই পিছুটান কাটাবার জন্যে ক'জন হিপি মিলে পুরনো আমিকে আনুষ্ঠানিকভাবে সৎকার করলাম। আমার পুরনো নাম পর্যন্ত কাউকে বলি না।"

"তারপর?"

"তারপর চলে গেলাম পশ্চিমের এক হিপি কমিউনে। সেখানে এক পোড়ো

জায়গায় হিপি-সভ্যতা গড়ে উঠেছে। পুরনো কয়েকটা মোটরগাড়ির ছাদ দিয়ে সেখানে গুহা বানানো হয়েছে। সামনের জমিতে কিছু শাকসব্জি এবং ফসল ফলানো হয়। তাই দিয়ে চলে যায়। অন্যসময় কিছু ধূপ তৈরী করতাম আমরা। সেই বেচে কোনোরকমে এক আধখানা পাঁউরুটি কেনা যেতো। এখন আমি অনেকটা নিজেকে বুঝতে পারছি। অনেক শান্ত হয়েছি—সংসারের ওপর সেই প্রচণ্ড রাগ আর নেই। এখন আমি প্রাণভরে ছবি আঁকি। মাঝে মাঝে সেতার বাজাতে ইচ্ছে করে—পয়সা যোগাড় হলে একটা যন্ত্র কিনতাম।"

"এখন কী হতে চাও?" আমার প্রশ্ন।

টোনি হাসলো। "আমি কিছুই হতে চাই না। আমার প্রাণ যা চায় তাই করতে চাই। আমার কোনো অ্যামবিশন নেই। এই অ্যামবিশনের আগুনেই তো আমাদের জাতটা ধ্বংস হতে বসেছে। আমি বুঝেছি, আমি নিজেই জীবনধারণের পক্ষে সাফিসিয়েন্ট রিজন।"

ডোরা এতোক্ষণ চুপচাপ টোনির কথা শুনে যাচ্ছিল। ওর বয়স সতেরো। একেবারে কচি চেহারা। সে বললো, "টোনির মতো আমি অত বুঝি না। টোনি বড্ড পড়াশোনা করে। আমি অ্যাসিড খেয়ে সারাক্ষণ বুঁদ হয়ে থাকতে চাই। জানো, ইট ইজ এ গ্রেট গ্রেট অভিজ্ঞতা। যদি পারো একবার খেয়ে দেখো—তুমি কখনও রিগ্রেট করবে না।"

"ডোরা, তোমার বাবা-মা'র কথা বলো," আমি অনুরোধ করি।

ডোরা বললো, "আমার বাবা-মাকে দেখলে মনে হবে এরকম সজ্জন পৃথিবীতে আর জন্মায় নি! কিন্তু দু'জনেই বেড়ালতপস্বী। বিজনেসে আমার বাবা বহু লোককে ঠকিয়েছেন—টাকা ছাড়া আমার বাবা আর কিছুই বোঝেন না। দিনরাত মনে মনে যোগ বিয়োগ কষছেন তিনি—ওঁর মাথার মধ্যে একখানা আই-বি-এম কমপিউটার বসানো আছে। আর আমার মা বাইরে বড়াই করবেন, তিনি খুব উদার মতের মানুষ। কিন্তু একবার যেমনি শুনলেন আমাদের পাড়ায় একজন নিগ্রো ভাড়াটে আসছে, মা'র কি দুশ্চিন্তা! জনে জনে ফোন করে মা বলতে লাগলেন—এখনও সময় আছে, কিছু একটা করা যায় না? আমার এসব ভাল লাগে না—পড়াশোনাও ভাল লাগে না। আমি পালিয়ে এসে বেশ সুখে আছি।"

ঘড়ির দিকে নজর পড়লো আমার। নির্ধারিত পনেরো মিনিট অনেকক্ষণ কেটে গিয়েছে। এখনই হয়তো ম্যানেজার সায়েবের পুনরাবির্ভাব হবে।

টোনি ও ডোরা ব্যাপারটা বুঝলো। তারাও উঠে পড়লো। আমাকে ধন্যবাদ জানালো।

আমেরিকা থাকাকালে এর পরেও আমি কিছু কিছু হিপির সান্নিধ্যে এসেছি।

এরা সবাই যে বখাটে মোটেই সত্যি নয়—আবার সবাই যে ক্ষুদে যীশুখ্রীষ্ট তাও ঠিক নয়। এদের একটা আধ্যাত্মিক যন্ত্রণা আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে এরা কিছুটা বিপথগামী। এরা প্রতিবাদ করছে, কিন্তু কোন্‌পথে মুক্তি তা জানতে এখনও উৎসাহী নয়।

বেশীরভাগ আমেরিকান এদের নাম শুনলে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন। বলেন, এরা মোটেই রিপ্রেজেনটটিভ আমেরিকান নয়। সেটা সত্যি কথা। দেশের বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েই এখনও পর্যন্ত প্রচলিত আমেরিকান জীবনযাত্রায় বিশ্বাসী। হিপিদের সংখ্যাও হাতে গোনা যায়।

ওদেশ থেকে ফিরবার পথে বিখ্যাত ব্রিটিশ ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবির মতামত সংগ্রহ করেছিলাম। টয়েনবি কিছুদিনের জন্যে আমেরিকায় স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং অধ্যাপক হয়ে এসেছিলেন। টয়েনবির মতে, হিপিরা আমেরিকান জীবনধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে। মধ্যবিত্ত আমেরিকান চিন্তাধারায় যে-কোনো কাজকে বিচার করা হয় সেই কাজের বদলে কত ডলার আসে তাই দিয়ে। অর্থের বাইরেও যে কাজের মূল্যায়ন হতে পারে আমেরিকান সমাজে সেই বিশ্বাস হিপিরাই আনতে পারে।

টয়েনবির মতে, সাচ্ছল্য জিনিসটা আমেরিকায় অপেক্ষাকৃত নতুন। দু'তিন পুরুষ আগেও আমেরিকানরা ক্ষেতখামারে থাকতো। দু'তিন পুরুষ অবিমিশ্র সুখ ভোগ করে ওরা বুঝতে পারছে এতে পরিপূর্ণ আনন্দ নেই। টয়েনবি খোঁজখবর নিয়ে বলেছেন, হিপিদের মধ্যে নানারকম লোক আছে। কিছু লোকের মধ্যে শুধু ভড়ং, কিছু লোক একেবারে বোগাস, কিছু লোক স্রেফ কুঁড়ে—গতর খাটিয়ে কিছু করতে চায় না। বেশীর ভাগ হিপিই মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। অনেকের বাবা বড় বড় কোম্পানিতে উঁচু পোস্টে আছেন। এইসব কোম্পানিতে কোনো আদর্শ নেই—স্রেফ আরও টাকা রোজগারের ধান্দায় পরিবারের সবাই ব্যস্ত। ফলে এরা সবাই রক্ষণশীল, কোনোরকম পরিবর্তন এঁদের কাম্য নয়।"

হিপিদের একজন আরাধ্য পুরুষ হলেন দ্বাদশ শতাব্দীর সেন্ট ফ্রানসিস অফ অ্যাসিসি। এই ইটালীয় মহাপুরুষের বাবা ধনী বস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু পরিবারের সম্পদের মোহ ত্যাগ করে সেন্ট ফ্রানসিস স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করেছিলেন—তিনি বনে বনে পশু-পাখিদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন। টয়েনবির মতে, হিপিরা যে সেন্ট ফ্রানসিসের ভক্ত হবে তাতে আশ্চর্য কী? তিনি নিজেই তো সেকালের হিপি।

টয়েনবির আসল দুশ্চিন্তা, ঘাস ও অ্যাসিড। হিপি আন্দোলনের এইটাই অন্ধকার দিক। এইসব নেশায় এদের শরীরের সর্বনাশ হচ্ছে, এদের কাজের ক্ষমতা নষ্ট হচ্ছে। তবে নেশা-ভাঙ সব দেশের সব যুগে গোলমাল বাধিয়েছে।

আগে ছিল মদ এবং আফিম। এখন এল-এস-ডির পালা।

হিপিদের কথা চিঠিতে আমার এক মাস্টারমশায়কে লিখেছিলুম। তিনি পরের চিঠিতেই লিখেছিলেন, "আমেরিকানরা তো বুদ্ধিমান জাত—ওরা হিপিদের এতো ভয় পাচ্ছে কেন? যা বুঝতে পারছি, কিছু ছেলেপুলের মধ্যে আধ্যাত্মিক প্রশ্ন জেগেছে। তবে বড্ড ছটফটে জাত তো, তাই একটু আধটু ভুল করে বসছে। এল-এস-ডি-ফেলেসডি খেয়ে ওরা আধ্যাত্মিক সমস্যার রাসায়নিক সমাধানের চেষ্টা করছে। কেমিক্যাল সলিউশন অফ স্পিরিচুয়াল প্রবলেম যে সম্ভব নয় তা বুঝলেই ওরা অনেক এগিয়ে যাবে। তখন কেউ ওদের নাগাল পাবে না। গোটা মার্কিন জাতটা একদিন অনেক বড় হবে, দেখিস।"

পাত্র চাই? পাত্রী চাই?

টৌনি ও ডোরার সঙ্গে যে শহরে দেখা হয়েছিল, সেখানে আমার একটা কাজ ছিল। কাজটা এমন কিছু নয়—সুমন্ত সেনের সঙ্গে দেখা করা।

সুমন্ত সেন মস্ত এক আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসেবে সুনাম অর্জন করেছে। সুমন্তর দিদি আমার বিশেষ পরিচিতা। তিনি আমার হাত দিয়ে ভাইকে দু' খানা আদ্দির পাঞ্জাবি পাঠিয়েছেন।

পাঞ্জাবি পৌঁছে দিতে গিয়ে সুমন্তর সঙ্গে আড্ডা জমে উঠলো। সুমন্ত বলেছিল, "যদি আপত্তি না থাকে, আমার অ্যাপার্টমেন্টে লুচি মাংস খেয়ে যান।"

উচ্চশিক্ষিত বাঙালী ছোকরাদের রান্না যে ভোজনযোগ্য হতে পারে তা বিদেশে আসবার আগে কখনও বিশ্বাস করি নি। স্বদেশে ছেলেরা কখনও রান্নাঘরের ধারে-কাছে যায় না। কারুর যাবার ইচ্ছে হলেও, মা-বোনের মাথায় হাত দিয়ে বসেন। বলেন, "যা নিজের কাজকর্ম করগে যা। আমরা যতক্ষণ আছি ততক্ষণ হাত পুড়িয়ে খেতে হবে না।" স্বদেশের আদুরে আনাড়ি ছেলেরাই বিলেত আমেরিকায় এসে টপক্লাস ইন্ডিয়ান রাঁধুনি বনে যায়—ফরেন ট্রেনিং-এর এমন মাহাত্ম্য!

একটা কাঁচের গেলাসকে বেলুনের মতো ব্যবহার করে লুচি বেলতে বেলতে সুমন্ত বললো, "জানেন শংকরদা, তিনটে ইন্ডিয়ান জিনিসের ওপর এখানে প্রচণ্ড আগ্রহ—ইন্ডিয়ান ফিলজফি, ইন্ডিয়ান মিউজিক এবং এই ইন্ডিয়ান রান্না। বিলিতি বন্ধুবান্ধব, এমনকি আমার প্রফেসর পর্যন্ত লুচি-মাংস খাবার জন্যে পাগল। ফলে রান্নাটা মন দিয়ে শিখে নিয়েছি।"

আমি বললুম, "তাহলে ভারতীয় কালচারাল মিশনে আজেবাজে লোক না

পাঠিয়ে দ্বারিক, ভীমনাগ, দিলখুসা, নিজামের হেডকুকদের পাঠানো লাভজনক বলছো?"

গরম ঘিয়ে লুচি ছাড়তে ছাড়তে সুমন্ত বললো, "একশোবার। রান্নার জোরে আমার মতো আনাড়ির যখন এতো আধিপত্য, তখন জেনুইন রান্না-শিল্পীরা এলে এদেশে তো হৈ-চৈ পড়ে যাবে!"

বিশুদ্ধ মাখনের সুগন্ধে ঘর মাতিয়ে সুমন্ত বললো, "শুনেছি, কিসিংগার যখন প্রথম কলকাতায় গিয়েছিলেন তখন লুকিয়ে শিয়ালদার ব্যারনস হোটেলে মাছের ঝোল ভাত খেয়েছিলেন।"

"বলো কি গো?"

গরম ঘি থেকে লুচি ছাঁকতে ছাঁকতে সুমন্ত বললো, "ব্যাপারটা মোটেই বানানো নয়, সত্যিই ভদ্রলোক শিয়ালদহে খেতে গিয়েছিলেন।"

সুমন্তর তৈরি লুচি মাংস মুখে দিয়ে বাঙালী ছেলেদের বহুমুখী প্রতিভা সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ রইলো না। বললুম, "এখন বুঝছি, বাঙালী মায়েরা কেন ফরেন-ট্রেন্ড জামাই চায়। দু'চারদিন রাঁধুনি না এলে মেয়ের কোনো অসুবিধাই হবে না।"

সুমন্ত আমার দিকে আরও কয়েকটা লুচি এগিয়ে দিয়ে বললো, "ঘরকন্নার কাজে এদেশে এখন অনেক পরিবর্তন হচ্ছে। অনেক স্বামী বাড়ির রান্নাবান্না এবং সেলাইয়ের কাজ করছেন এবং অনেক স্ত্রী তার বদলে মোটরগাড়ি মেরামতের দায়িত্ব নিচ্ছেন!"

"পাঞ্জাবি দুটো কিন্তু তোমার দিদি নিজেই সেলাই করেছেন, এতে তোমার জামাইবাবুর কোনো অবদান নেই," আমি সুমন্তকে জানিয়ে দিলাম।

খাওয়ার পর সুমন্ত বললো, "আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিন, ডিশগুলো সাফ করে ফেলি।"

সুমন্ত যখন ডিশ ধোওয়া শেষ করে ফিরে এলো, আমি তখন ওর সেন্টার টেবিল থেকে একখানা ইংরাজী সংবাদ-সাপ্তাহিক তুলে নিয়ে চোখ বোলাচ্ছি। সুমন্তদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশেই বিরাট শহর, সেখানে এই কাগজ ছাপা হয়। ক্যাম্পাসের তরুণ-তরুণীদের হাতে হাতে এই কাগজ ঘোরে। কারণ এই কাগজের মতামত নাকি খুব প্রগতিশীল।

মুচকি হেসে সুমন্ত বললো, "এই কাগজের শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনগুলো [illegible] আধুনিক মার্কিন সমাজ সম্পর্কে আপনার একটা স্পষ্ট ধারণা হয়ে [illegible]"

সুমন্ত এখন যা বলছে, সেই একই পরামর্শ মার্কিন লেখক বিল বল-কে [illegible]। সুমন্ত জিজ্ঞেস করলো, "কী ভাবছো?"

বললুম, "মার্কিন লেখক বিল বল ভারতবর্ষে বেড়াতে গিয়েছিলেন কয়েক সপ্তাহের জন্যে। তাঁর সঙ্গে দেখা হতে বলেছিলাম, কোনো শহরকে খুব সহজে জানতে হলে, সেই শহর থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপনগুলো পড়তে হয়। কর্মখালি, ব্যক্তিগত, পাত্র-পাত্রী বাড়ি ভাড়া, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়, হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ ইত্যাদি শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনে স্থানীয় সমাজের আশা-আকাঙক্ষা। কামনা-বাসনা ধরা পড়ে যায়।"

"তারপর?" সুমন্ত মিষ্টি হেসে জিজ্ঞেস করলো।

আমি বললাম, "মিস্টার বিল বল খুব আগ্রহের সঙ্গে আমার কথা নোট বইতে লিখে নিলেন। জানতে চাইলেন, বোম্বাই, দিল্লী, কলকাতা, মাদ্রাজের ম্যাট্রিমনিয়াল কলম এক কিনা। আমি বললাম, মোটেই না। এসব জায়গার কাগজ খুঁটিয়ে পড়লেই দেখবেন, কোথাও কাস্ট-এর ওপর, কোথাও চাকরির ওপর, কোথাও ব্যবসার ওপর, কোথাও মেয়েদের গায়ের রংয়ের ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আরও অনেক মজার আছে, যা মন দিয়ে পড়লে আপনার নজরে পড়বে—যেমন ঘটক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন।"

আমার অনুমতি নিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে সুমন্ত বললো, "সায়েবকে আপনি তো খুব ভাল অ্যাডভাইস দিয়েছিলেন।"

আমি বললাম, "কিন্তু সায়েব যা কাণ্ড বাধিয়ে বসলেন! মাস ছয়েক পরে একটা আমেরিকান কাগজে দেখি সায়েবের ভারতবর্ষ ভ্রমণের সুদীর্ঘ বৃত্তান্ত বেরিয়েছে। ইন্ডিয়ানদের বিবাহপদ্ধতি সম্বন্ধে নানা রকম রসালো মন্তব্য করে সায়েব বলেছেন, ইন্ডিয়ানদের মনের গোপন ইচ্ছে পাত্র-পাত্রী বিজ্ঞাপনে ধরা পড়ে যায়। কোনো মেয়ে পাণ্ডিত্য চায় না, চরিত্র চায় না—চায় ফরেন ফার্মে বড় অফিসার স্বামী। কলেজ অধ্যাপকদের স্থান বিয়ের বাজারে মোটেই ভাল নয়—এমনকি অধ্যাপিকারাও তাদের বিয়ে করতে চায় না! এরপর সায়েব একখানা পাত্র-পাত্রীর কলমের ছবি ছাপিয়ে দিয়েছেন। ইংরিজী কাগজটি এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত নর্দান ইন্ডিয়া পত্রিকা। অনেকগুলো শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের তলায় ছাপা আছে : 'লিখুন বক্স...এন আই পত্রিকা।' এইখানেই সায়েব ঘায়েল হয়েছেন। তিনি কল্পনার রং চড়াতে গিয়ে আন্দাজ করেছেন এন আই পত্রিকা কোনো ঘটক কোম্পানির নাম, ওটা যে নর্দান ইন্ডিয়া পত্রিকার সংক্ষিপ্ত নাম তা খেয়াল করেন নি। লেখকের পরবর্তী মন্তব্য : এন আই পত্রিকা উত্তর ভারতের একজন বিখ্যাত ম্যারেজ ব্রোকার। মিস্টার পত্রিকার সঙ্গে ভারতবর্ষের বিবাহ ব্যাপারে আমার বিস্তারিত আলোচনা হয়। মিস্টার পত্রিকা বলেন...!"

সুমন্ত বললো, "নিজের সীমানা ছাড়ালে এই হয়।"

আমি বললাম, "আমাদের শাস্ত্রে তাই তো বলে। নিজের গণ্ডির বাইরে গিয়েই তো সীতা ধরা পড়লেন রাবণের হাতে।"

সুমন্ত বললো, "এই কাগজের বিজ্ঞাপনগুলো কিন্তু আপনার সীমানার মধ্যে। এর একটা কপি আপনার ব্যাগে রেখে দিন। এদেশের যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের এক অংশ কোথায় চলেছে তা আপনি জানতে পারবেন।"

কয়েকটি বিজ্ঞাপনের দিকে নজর দিয়েই আমার চক্ষু ছানা-বড়া। সুমন্ত অ্যাপ্লায়েড সাইকলজির ছাত্র। বয়সে ছোট হলেও ওর সঙ্গে সব বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা করা যায়। আমি বললাম, "আমাদের পাঁজির বিজ্ঞাপনের একসময় বিশেষ দুর্নাম ছিল। কিন্তু তোমার এই কাগজ তো আমাদের পাঁজিকে লজ্জা দিচ্ছে।"

সুমন্ত জানতে চাইলো, "পারমিসিভ সোসাইটির বাংলা কী হবে?"

"সাধু বাংলা কী জানি না। তবে, সোজা ভাষায় আস্কারা সমাজ বলা যেতে পারে!"

হেসে সুমন্ত বললো, "সেক্সের ব্যাপারে যৌবনকে এরা এমন ঢালোয়া স্বাধীনতা দিচ্ছে যে অনেক বিদগ্ধ লোক বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ছেন। এ এক অদ্ভুত সমাজ। আপনি যদি নিউ ইংলন্ডে যান, দেখবেন সেখানে প্রকাশ্যে নিরোধ বিক্রি করলে জেল হয়। অথচ এই দেশে প্রকাশ্যে খবরের কাগজে কী ধরনের বিজ্ঞাপন ছাপা হচ্ছে তা নিজের চোখে দেখুন। মেয়েদের দৈহিক পবিত্রতা সম্পর্কে মতামত একেবারে পাল্টে গেছে। প্রত্যেক ছেলে জানে, তার ভাবী স্ত্রী অন্তত ডজনখানেক পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছে। এখন তো এমন অবস্থা, কোনো পাত্রই প্রকৃত ভার্জিনকে বিয়ে করতে রাজী নয়। বলে, এই সব অনভিজ্ঞ মেয়ে স্বামীকে সুখ দিতে পারবে না।"

"ধীরে বৎস, ধীরে!" আমি সুমন্তকে বাধা দিই। তোমরা মনোবিজ্ঞানের ছাত্র—তোমাদের মতামতের মূল্য অনেক। তুমি কি ভেবেচিন্তে কথা বলছো?"

"আমি মিস্টার এন আই পত্রিকা নই, জলজ্যান্ত সুমন্ত সেন। সুতরাং আপনি আমাকে 'কোট' করতে পারেন।"

আমি বললুম, "পুডিং যখন সামনেই রয়েছে তখন খেয়েই তার স্বাদ বোঝা যাক। শুধু শুধু আলোচনা করে লাভ কী?"

এর পরে আমরা কাগজ পড়তে লাগলাম। বিজ্ঞাপনগুলো এখনও আমার কাছে আছে। যে-কাগজে এসব বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে তাকে সেক্স জার্নাল বলা চলে না। কারণ বর্ণসমস্যা, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ে এই সংবাদপত্র অত্যন্ত প্রগতিশীল আদর্শবাদী।

বিজ্ঞাপনের ওপরে লেখা আছে, "পুরো নাম ঠিকানা বিজ্ঞাপনের সঙ্গে

পাঠাবেন। যে-কোনো বিজ্ঞাপন না-ছাপাবার স্বাধীনতা কর্তৃপক্ষের আছে। আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে এমন বিজ্ঞাপন ছাপা হবে না।"

প্রথম সারিতে কয়েকটা বিজ্ঞাপন এই ধরনের :

আমার ডক্টরেট থীসিসের জন্যে দশজন প্রাক্তন এল-এস-জি খোরের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চাই। ফোন.....

নিজের ঠিকানা ফাঁস না করে ডাকযোগে গোপন চিঠিপত্র পেতে হলে, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। রেট খুব সস্তা। ফোন...

একটু সুন্দরী বালিকার জন্যে বিজ্ঞাপন। ছত্রিশ বছরের সুদর্শন ভদ্রলোক বিমানে মেক্সিকো বেড়াতে যাবেন। সঙ্গিনী হবেন কী? ফোন...

বত্রিশ বছরের লম্বা শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক একটি মিষ্টি মেয়েকে ভালোবাসতে চান। বক্স...

স্বাস্থ্যবান ইংরেজ (২৭) একটি আমুদে যুবতীর সঙ্গে মাঝে মাঝে নাচের আসরে যেতে চান। দেহ-সম্পর্ক আবশ্যিক নয়। বক্স...

সুরুচিসম্পন্ন এশিয়ান ভদ্রলোক (৩১) নির্ঝঞ্ঝাট সচ্ছল জীবনযাপনের বিনিময়ে যে-কোনো ধনী মহিলাকে দেহ সমর্পণ করতে প্রস্তুত। পোস্ট বক্স...

অবিবাহিত সাবালকদের জন্য। স্বাধীনচেতা পুরুষদের মধ্যে ন্যুডজম ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। তিন ডলার পাঠিয়ে যোগাযোগ করুন : সোলস্টিস সোসাইটি।

উলঙ্গভাবে মেলামেশির মাধ্যমে আপনার সামাজিক পরিচিতির পরিধি বিস্তার করুন। পুরুষ, মহিলা, বিবাহিত, অবিবাহিত সবাই যোগ দিতে পারেন। এক ডলার পাঠান—অ্যালান টুর্ক অ্যাসোসিয়েট।

এই পর্যন্ত পড়েই আমি বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। সুমন্ত বললো, "থামবেন না, পড়ে যান—এখানকার আধুনিক সমাজ সম্পর্কে আপনার দিব্যচক্ষু খুলে যাবে।"

আমি পড়তে লাগলুম।

নারীদেহ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ বুদ্ধিমান যুবক বুদ্ধিমতী রসবতী মহিলার দৃষ্টি আকর্ষণে অভিলাষী। ফোন...

মহিলাগণ, ফরাসী প্রেমে ঔৎসুক্য থাকলে সন্ধ্যাবেলায়...নম্বরে ফোন করুন। সমস্ত কিছু গোপন রাখা হবে।

পদার্থবিজ্ঞানী ও সঙ্গীতজ্ঞ (২৪), অবিবাহিত। ১৮-২৫ বয়সের যে-কোনো মতের ক্রীড়াসঙ্গিনী রক্ষিতা চাই। স্বাস্থ্য এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে আমি বিশেষ খুঁতখুঁতে। হিপিনী একেবারেই চলবে না। ফটো পাঠান। বক্স...

স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সহপাঠিনীর দিনের বেলায় কারও নজরে না-পড়ে শারীরিক সুখে আগ্রহ থাকলে লিখুন বক্স...প্রত্যেকটি চিঠির উত্তর

দেওয়া হবে।

বিচক্ষণ অবিবাহিত ফরাসী পুরুষ খুঁতখুঁতে মেয়েদের প্রত্যেকটি ইচ্ছা পূরণ করবেন। যে-কোনো আদেশ করুন। যে-কোনো সময়ে ফোন করুন...

মোটর দুর্ঘটনায় আহত একটি বিমর্ষ যুবকের দ্রুত আরোগ্যের জন্য একটি সুন্দরী মহিলার সান্নিধ্য প্রয়োজন। ঘণ্টায় দুই ডলার। কোনো অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই। বক্স...

মাইক ডবলু, তুমি যদি চাও আবার ফোন কোরো। আমার এখনও আগ্রহ আছে। ভালবাসা, জুডি।

উলঙ্গ দেহ কি আপনাকে ক্লান্ত করে? আপনার আপনজনের দেহে প্রেমচিত্র আঁকিয়ে নিন ; দ্রুত উল্কি বসানো হয়। বক্স...

সঙ্গিনীসংক্রান্ত কোনো দুশ্চিন্তা থাকলে এখনই ভারতীয় জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হন। স্বামী কীর্তনানন্দ...

লম্বা রোগা আইনের ছাত্র এমন একটি মিষ্টি মেয়ে চায় যে প্রতিদিন রেঁধে খাওয়াবে। পরিবর্তে সে সুন্দর এক জীবনযাত্রার অংশ পাবে। ফোন...

বিবাহিত, তরুণ কিন্তু সাহসী স্নাতক ছাত্র একঘেয়ে দাম্পত্য অভিজ্ঞতায় ক্লান্ত অথবা বিরক্ত গৃহবধূর সঙ্গে গোপনে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী। ছবিসব আবেদন করুন। বক্স...

পড়তে পড়তে আমি থমকে দাঁড়ালাম। বললুম, "এসব গাঁজাখুরী বিজ্ঞাপন মনে হচ্ছে। কোনো সভ্য সমাজে সুস্থ মস্তিষ্কে এই ধরনের বিজ্ঞাপন কেউ দিতে পারে তা কে বিশ্বাস করবে?"

সুমন্ত বললো, "এখানে তিন বছর বসবাস না করলে আমিও আপনার মতো অবিশ্বাস করতাম। কিন্তু এই ধরনের বিজ্ঞাপন আমার জানা-শোনা এক বন্ধু দিয়েছে এবং ডজন দুয়েক উত্তর পেয়েছে। সুসভ্য এই দেশে সবই সম্ভব।"

আমি আবার বিজ্ঞাপন পড়া আরম্ভ করলাম :

বয়স ৩৪। ভালবাসা ও দেহ সম্ভোগের জন্য একটি মেয়েমানুষ অতি জরুরি প্রয়োজন। পুরুষেরা দয়া করে জ্বালাতন করবেন না। ফোন...

চৌত্রিশ বছরের আকর্ষণীয় যুবকের শয্যায় বিভিন্ন ধরনের মজার জন্যে বিবাহিতা অথবা অবিবাহিতা গুরুনিতম্বিনী রমণী প্রয়োজন। ফোন...

অনেক বিজ্ঞাপনে 'সুইংগিং পার্টি' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। সুমন্ত বললো, "যুবসমাজে কথাটা এখন খুব চালু। অনেকের ধারণা এর অর্থ কেবল নাচের পার্টি। তা নয়, এর মধ্যে সব রকম ফূর্তি, এমনকি সেক্সও আছে।"

পরবর্তী কয়েকটি বিজ্ঞাপন এদেশে ছাপার অযোগ্য। এর মধ্যে পারস্পরিক বউ বদল থেকে আরম্ভ করে, যত রকম বীভৎস মানসিক বিকৃতি সম্ভব সব

আছে। তার পরেই আবার ভারতীয় ধূপের বিজ্ঞাপন। এবং—

শ্রীঘ্রই ভারতীয় যোগের ক্লাস শুরু হবে। স্বামী ক্রিয়ানন্দ। যোগাযোগ করুন...।

সুমন্ত এরপর আরও কয়েকটি বিজ্ঞাপনের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে:

শিক্ষিত, সুদর্শন, জাঁদরেল পুরুষ মানুষ (৩১) এমন একটি নম্র স্বভাবের মেয়ে চায় যে হুকুম মেনে চলতে দ্বিধা করবে না। হাল্কা চড়-চাপাটি পছন্দ হওয়া চাই। বক্স...

বিশ বছরের বিচক্ষণ যুবক—মহিলাদের বিভিন্ন কামনা সম্পর্কে অভিজ্ঞ হতে চান। ফরাসী ও গ্রীক সংস্কৃতিতে বিশেষ আগ্রহী। রাত্রে ফোন করুন...

স্যাটানিক চার্চের মিস্টার এনটন লেভির জন্য প্রয়োজন : পাপিষ্ঠা সেক্রেটারী, লালসাময়ী, শিক্ষিকা, দুষ্ট নার্স এবং একঘেয়ে জীবনে বিরক্ত গৃহবধূ। যোগাযোগ করুন।

ভদ্রলোক, ৪৪ স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে, বুদ্ধিমান, বামপন্থী, রসিক, নানা কাজে ভীষণ ব্যস্ত। আকর্ষণীয়া, ৩০-৪০, সমমতাবলম্বী মহিলার সঙ্গে পরিচিত হতে চান। উদ্দেশ্য—বন্ধুত্ব, ডেটিং, রাজনৈতিক আলোচনা এবং মাঝে মাঝে দেহ-মিলন। চিঠি লিখে খোঁজখবর করুন। এইভাবে হয়তো ইতিহাসের ধারা পাল্টানো যাবে না ; কিন্তু বেশ মজা হবে। পোস্ট বক্স...

ধূমপানে ফুসফুস পচে যায়। যেসব মেয়ে সিগারেট খায় তারা কুৎসিত। তামাক পাতার চাষে ভাইরাস ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা হোক।

আমি একজন শিক্ষিতা। আমার দুই শিশুপুত্রের জন্য একজন পিতা এবং আমার জন্যে প্রেমসঙ্গী খুঁজছি। ফোন...

আমি যে-পুরুষটিকে চাইছি তিনি সাধারণত এই ধরনের বিজ্ঞাপনের উত্তর দেন না। তিনি হবেন উচ্চশিক্ষিত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার অথবা অধ্যাপক। বয়স ছত্রিশ চল্লিশের মধ্যে, আগে একবার বিয়ে হয়েছে। খুব ভাল হয়, আমার যেসব বিষয়ে আগ্রহ তাকে তাঁরও আগ্রহ থাকলে। যেমন ভ্রমণ, ভাল রেস্তোরাঁয় মাঝে-মাঝে খাওয়া, নৌকা বিহার, থিয়েটার, সমুদ্র এবং অরণ্য। তিনি হবেন উষ্ণ হৃদয়, নিষ্ঠাবান রসিক, আত্মবিশ্বাসী এবং কোমল। সম্প্রতি আমার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে, কিন্তু পরিচিত মহলে সবাই বিবাহিতা। এই বয়সে নতুন করে কীভাবে ডাইভোর্সড পুরুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে হয় তা আমার জানা নেই। আমি কলেজ গ্র্যাজুয়েট, ৫ ফুট ২ ইঞ্চি, ছিমছাম, ফিটফাট এবং বেশ আকর্ষণীয়া। কোনো খবর থাকলে এই নম্বরে জানিয়ে রাখুন...। আমি যথাসময়ে চিঠি লিখবো অথবা ফোন করবো।

সভ্য শিক্ষিত পুরুষমানুষের বাংলোতে এসে ফূর্তি করার জন্যে একজন

সুদর্শনা স্ত্রীলোক চাই। ফোন...

সুশান ফিরে এসো। তোমার ইচ্ছেই পূরণ করা হবে। ইতি তোমার মা।

আমার জঘন্য চরিত্র ও নীচতার জন্যে সমস্ত পৃথিবীর কাছে ক্ষমা চাইছি। মার্থা এল।

অ্যান, তুই কি তখনও আমাকে খাওয়াবে-পরাবে এবং ভালবাসবে যখন আমার ৬৪ বছর বয়সে হবে? এন এস।

খবরের কাগজটা ভাঁজ করে সুমন্ত এবারে আমার ব্যাগে ঢুকিয়ে দিলো। বললো, "শেষের যে-বিজ্ঞাপনটা পড়লাম, ওর মধ্যেই এই জাতটার আসল দুশ্চিন্তা ধরা পড়ে গিয়েছে। এখানে অনেক কমবয়সী মেয়ে স্বেচ্ছায় ঝি-গিরি করে স্বামীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা পেয়ে অনেক ছেলে পুরনো স্ত্রীকে দূর করে দিয়ে আবার ছাঁদনাতলায় যাচ্ছে। যৌবনটা এইভাবে মন্দ কাটছে না, কিন্তু আসল চিন্তা ওই বার্ধক্যের। ৬৪ বছর বয়স হলে কে ভালবাসবে, কে দেখবে?"

"এই বিজ্ঞাপনগুলো বেশ ভাবিয়ে তুললো, সুমন্ত," ওখান থেকে ওঠবার আগে মন্তব্য করলাম, "যে-দেশে মানুষের ব্যক্তিজীবনে এতো গলদ সে দেশে কেমনভাবে সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞানের এই বিরাট কর্মযজ্ঞ চলেছে?"

সুমন্ত বললো, "এদেশের কর্মযজ্ঞটা মোটেই মিথ্যে নয়। কিন্তু কাজের মাধ্যমে বিরাট সম্পদ আহরণ করে যে-মানুষগুলো সংসার করছে, তাদের একটা বড় অংশের মধ্যে নানা অশান্তি। বাঁধাবন্ধহীন অসংযমী জীবন এই সভ্যতাকে এমন এক বিপজ্জনক অবস্থায় এনে ফেলেছে যেখান থেকে বেরিয়ে আসা বেশ শক্ত।"

"আমাদেরও বোধ হয় এই সব বিজ্ঞাপন থেকে কিছু শেখবার আছে?" আমি বলি।

সুমন্ত বললো, "অবশ্যই। ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে গল্পটা আমাদের পক্ষে মিথ্যে নয়। এখন থেকে সজাগ না হলে, বহুযুগের চারিত্রিক আদর্শকে রক্ষা করবার চেষ্টা না করলে, ভারতবর্ষও একদিন এদের মতোই বিপদে পড়বে।"

চাঁপার মা ও মিসেস্ উডফোর্ড

সুমন্তর দেওয়া খবরের কাগজে শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত সমাজের এক অংশের ছবি পেলাম। সমাজে নিচুতলার মানুষদের কিছু খবরাখবর যোগাড় করবার বিশেষ আগ্রহ ছিল। সেই লোভে সানফ্রানসিসকো থেকে উত্তরে বিখ্যাত এক

মার্কিন শহরে কয়েকদিন কাটিয়েছিলাম। সেখানেই মিসেস্ উডফোর্ডের সঙ্গে পরিচয় হলো।

বিদেশের বিলাস শয্যায় শুয়ে শুয়ে মিসেস্ উডফোর্ডের ঘটনাটা পর্যালোচনা করতে গিয়ে বারবার হাওড়ার চাঁপার মায়ের কথা মনে পড়তে লাগলো। এঁদের দু'জনের মধ্যে কত দূরত্ব—কিন্তু মিসেস্ উডফোর্ড ও চাঁপার মা'র কাজকর্ম এক।

চাঁপার মা ও মিসেস্ উডফোর্ডের গায়ের রংও প্রায় এক, দু'জনেই কৃষ্ণকলি। এঁদের দু'জনের জীবনে অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট। এঁদের কথা ভাবলে আমার মনে হয়, পৃথিবীতে যত যন্ত্রণা আছে তার বড় অংশটা ঈশ্বর মেয়েদের জন্যেই তুলে রেখেছেন।

পৃথিবীর সর্বত্র ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশী দুঃখ কষ্ট পায় এই মন্তব্য শুনে আমার হোস্ট রমাপতিদা হেসেছিলেন। রমাপতিদা এখন মার্কিন নাগরিক, এক সময় বাংলাসাহিত্যে তাঁর বেশ ঝোঁক ছিল। রমাপতিদা বলেছিলেন, "জীবনের যাত্রা যেখানে শুরু সেই উৎসমূলেই তো রয়েছে নারীর নিদারুণ দেহ-যন্ত্রণা। তারপর বিরহ, বৈধব্য, শোক ছাড়াও কত বিভীষণ বেদনা সংসারপথের অলিতে-গলিতে নিরীহ নারীর জন্যে অপেক্ষা করছে। অসহনীয় দুঃখকে সহনীয় করে তোলার নীরব সাধনায় সব দেশের জননী, জায়া, ভগ্নী ও কন্যারা পুরুষদের থেকে অনেক এগিয়ে আছেন।"

সুদূর মার্কিনী প্রবাদে মিসেস্ উডফোর্ড ও চাঁপার মায়ের ছবি দুটো আমার চোখের সামনে একসঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। চাঁপার মায়ের কথাই আগে বলি।

চাঁপার মাকে আমি সেই ছোটবেলা থেকে দেখছি। চৌধুরী বাগান লেনে আমরা যে-বাড়িতে ভাড়া ছিলাম তারই লাগোয়া বস্তিতে থাকতো চাঁপার মা। এতো কাছাকাছি বাড়ি যে চাঁপার মা ঘর থেকেই আমার মাকে বলতো, "ও উকিল-মা, আমার যেতে একটু দেরি হবে। চাঁপা সকাল থেকে বমি করছে।"

আমরা ঘরে বসেই চাঁপার মার কথা শুনতে পেতাম। আমাদের বাড়িতে বাসন মাজতে মাজতে চাঁপার মা চিৎকার করতো, "ও চাঁপি, পোড়ারমুখী ভাত রাঁধতে রাঁধতে ঘুমিয়ে পড়লি নাকি? উনুনে ফ্যান পড়ার আওয়াজ যে এখান থেকে শুনতে পাচ্ছি।"

চাঁপার বয়স ছিল, আমারই মতো। হয়তো আমার থেকে দু'এক বছরের বড়। চাঁপার মা বাসন মাজতে মাজতে আপন মনে গজ গজ করতো, "কত পাপ করেছিনু গত জন্মে, তাই এ-জন্মে দুধের বাচ্চা কোলে নিয়ে ভাতারখাগী হলাম। বাপ কত দেখেশুনে বে দিয়েছিল কপালে সহ্য হলো নি।"

সেই দুধের বাচ্চা চাঁপাকে কত কষ্ট করে তিলে তিলে যে বড় করতে হয়েছে তা আমি নিজের চোখে দেখেছি। বাড়ি বাড়ি বাসন মেজে বেড়ানোর যে কি

দুর্গতি তা আমরা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীরা জেনেও জানি না। অন্যদিকে অত্যন্ত সমাজসচেতন, প্রগতিশীল এবং সহানুভূতিসম্পন্ন হয়েও আমরা গৃহভৃত্যদের কষ্টের দিকে চোখ বুজে থাকি।

চাঁপার মা-কে পাঁচ-ছ'টা বাড়িতে কাজ করতে হতো। না করলে পেট চলে না। আর চাঁপা সকাল থেকে মায়ের পিছন পিছন ঘুরতো। ছোট মেয়েকে বাড়িতে একলা রেখে যেতে মা ভরসা পেতো না।

এরই মধ্যে চাঁপার মা আবার শনি পুজোতে টাকা খরচ করতো। আমাকে প্রসাদ এতে দিতো। আমার মাকে চাঁপার মা বলতো, "বারের দেবতার নজর তো ভাল নয়। তাই ওনাকে সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করছি মা।"

কিন্তু এতো চেষ্টা করেও কোনো ফল হয় নি। কত কষ্ট করে নিজের যথাসর্বস্ব দিতে এবং বাড়ি-বাড়ি ভিক্ষে করে চাঁপার বিয়ে দিয়েছিল। বিয়ের পর চাঁপা যেদিন বরকে নিয়ে ফিরে এলো সেদিন চাঁপার মা একবেলা ছুটি নিয়েছিল। জামাইকে আদর করবার জন্যে আমাদের বাড়ি থেকে আলাদা বাসনপত্র গিয়েছিল। নতুন জামাই এবং মেয়েকে বসবার জন্যে মা দুটো ভাল আসনও দিয়েছিলেন।

কিন্তু এতো সুখ চাঁপার বেশীদিন সহ্য হয় নি। একটা দুধের বাচ্চাকে কোলে করে বিধবা বস্তিবাড়ির সেই অন্ধকার ঘরে ফিরে এসেছিল।

বস্তিজীবন সম্পর্কে আমার যতটুকু ধারণা আছে তা চাঁপার মায়ের দয়াতেই। ছোটবেলা থেকে কতবার ওদের বাড়িতে গিয়েছি। নিজের চোখে ওদের জীবন-সংগ্রামের নানা দৃশ্য দেখেছি। পঞ্চাশ-ষাটজন লোকের জন্যে মাত্র একটা পায়খানা। একটা কল। সেখানে জলের জন্যে বালতি, ঘড়া, গামলা ইত্যাদির লাইন লেগে আছে। তাও প্রায়ই কলে জল আসে না। তখন সবাই ছোটে গলির মোড়ে টেপাকল দখল করতে। সেখানে খণ্ডযুদ্ধ লেগেই থাকে।

ভোর চারটে থেকে চাঁপার মায়ের জীবন শুরু হতো। বাড়িতে ঘড়ি নেই, তবু কেমন আন্দাজ করে প্রতিদিন যে ঠিক সময়ে চাঁপার মা উঠে পড়তো তা আমাকে আজও বিস্মিত করে। ঝটপট কাছাকাছি একটা বাড়িতে আঁচের ব্যবস্থা করে এবং এঁটো বাসনগুলো কলতলায় নামিয়ে দিয়ে, চাঁপার মা পৌনে-পাঁচটার সময় আমাদের বাড়িতে চলে আসতো।

আমাদের বাড়িতে তখন খুব সকাল-সকাল চা হতো। একটা গেলাসে নিজের পাওনা চা ঢেলে নিয়ে চাঁপার মা বাড়িতে ছুটতো। যেতে যেতেই চিৎকার করতো, "ও চাঁপি, মুখপুড়ী, তোর যে জমিদারের মাগ হয়ে জন্মানো উচিত ছিল। এখনও ঘুম থেকে উঠলি না, কখন কাজে যাবি?" বস্তিতে ফিরে গিয়ে ঘুমন্ত মেয়েকে অর্ধেক চা খাইয়ে, চাঁপার মা আবার ফিরে আসতো আমাদের বাড়িতে।

মাঝে মাঝে আবার নাতনীকে কোলে করে আমাদের বাড়িতে আসতো চাঁপার মা। নাতনী কোনো আব্দার করলে দিদিমা বিরক্ত হয়ে উঠতো। বাসন মাজতে মাজতে চাঁপার মা বলতো, "ওর নক্ষি নাম দিলে কী হবে? আসলে হাড়-জ্বালানী।"

আমি অবশ্য হাড়-জ্বালানোর তেমন কিছু দেখতাম না। নিজের মনেই লক্ষ্মী আমাদের বারান্দায় বসে বসে দিদিমার কাজকর্ম দেখতো। আর একটু বড় হয়ে, ওখানে বসে বসেই ইট আর বালি যোগাড় করে লক্ষ্মী আপন মনে বাসন-মাজা বাসন-মাজা খেলতো।

চাঁপার মার পরিবার সম্বন্ধে ছোটবেলায় অত বুঝতে পারি নি। কিন্তু পরে মনে মনে আমি ওদের সম্মান করতে শিখেছি। কত অল্পে সন্তুষ্ট ওরা। কী কষ্টের জীবন। দু'বেলা ভাতও জুটতো না অনেক সময়ে। একটা দিনও কাজ থেকে ছুটি নেই। অথচ কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, কোনো লোভের প্রকাশ নেই। আমাদের এই সমাজের এঁটো বাসনগুলো পরিষ্কার করবার জন্যেই যেন চাঁপার মাকে ঈশ্বর সংসারে পাঠিয়েছিলেন।

চাঁপার মার ধৈর্য্যেরও শেষ নেই। বুকে করে নিজের মেয়ে এবং নাতনীকে আগলে রাখতো। আর রেগে গেলে নিজের মেয়েকে বলতো, "গত জন্মে কত পাপ করেছিলি তাই ভগবান তোকে শাস্তি দিচ্ছে। পেটে একটা ছেলেও ধরতে পারলি না। আমার মতো যমে নেবার আগে পর্যন্ত বাসন মাজবি আর বাটনা বাটবি।"

চাঁপার মায়ের বস্তিতে আমার একটা জিনিস নজরে পড়তো। অন্তত জন দশ-বারো বিধবা ওখানে থাকে। ছোটবেলায় আমি একবার চাঁপার মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "বিধবা কেন হয়?"

চাঁপার মা বলেছিল, "পাপ করলে।"

"পাপ তো ছেলেরাও করে। ওরা কেন বিধবা হয় না?"

চাঁপার মা জিভ কেটে বলেছিল, "ছিঃ! ছেলে মেয়ে এক হলো?"

আমাদের বাড়ির পাশে ঠাকুরমশায় থাকতেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, "ভগবান যা করেন তার পিছনে একটা কারণ থাকে। ডজন ডজন থান-পরা বিধবা না থাকলে ঠিকে-ঝি পাওয়া যেতো না। সাধারণ মানুষের কত কষ্ট হতো তা হলে, ভাবো।"

মিসেস্ উডফোর্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পরেই চাঁপার মা এবং মেয়ের কথা আরও গভীরভাবে মনে পড়ছে। বিরাট লম্বা চওড়া চেহারা মিসেস্ উডফোর্ডের। আবলুশ কাঠের মতো গায়ের রং। ভদ্রমহিলা আমার বন্ধু রমাপতিদার বাড়িতে জ্যানিটারের কাজ করেন।

বিরাট বড়লোকের দেশ আমেরিকা। ডজন ডজন ঝি পাওয়া যায় না। খুব কম বাড়িতেই কাজের লোক আছে। যাদের আছে, যেমন রমাপতিদার, উপায় নেই বলেই। ব্যাচেলর রমাপতিদা ফ্ল্যাট নিয়ে একলা বসবাস করেন।

রমাপতিদার এই ফ্ল্যাটের একটা বাড়তি চাবি মিসেস্ উডফোর্ডের কাছে থাকে। নীল রংয়ের জার্মান গাড়ি চালিয়ে কৃষ্ণকায়া বিশালবপু মিসেস্ উডফোর্ড রমাপতিদার ফ্ল্যাটে আসেন। নিজের স্কার্টের ওপর একটা সাদা অ্যাপ্রন চাপিয়ে নেন—বাংলা সিনেমায় ডাক্তার-নায়িকাদের যেমন পরতে দেখা যায়। তারপর একটা খাতায় মিসেস্ উডফোর্ড লেখেন, ক'টার সময় এলেন। ঝটাপট কাজকর্ম শেষ করে—মানে ঘরদোর পরিষ্কার করে, বিছানাটা টেনে তৈরি করে—মিসেস্ উডফোর্ড এককাপ কফি তৈরি করবেন।কফি খেয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লগবুকে লিখবেন কখন রমাপতিদার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। মাসের শেষে লগবুক দেখে ঘণ্টা হিসেবে টাকা দিতে হবে মিসেস্ উডফোর্ডকে।

রমাপতিদার সঙ্গে মিসেস্ উডফোর্ডের কদাচিৎ দেখা হয়। কারুর কিছু বক্তব্য থাকলে চিঠি লিখতে হয়। লগবুকের মধ্যে স্লিপ রেখে যান মিসেস্ উডফোর্ড। আর মিসেস্ উডফোর্ডের প্রাপ্য চেক রমাপতিদা ওই লগবুকের মধ্যে রেখে যান। ঘণ্টায় পনেরো টাকা করে দিতে হয়।

"মিসেস্ উডফোর্ড যে কম সময় থেকে বেশী সময় লিখছেন না, তার প্রমাণ কী?" আমি জানতে চেয়েছিলাম। রমাপতিদা বলেছিলেন, "এসব ছেঁড়ামি এখানে সাধারণত কেউ করে না। উনি তো বলেই নিচ্ছেন যে তোমার টাইমের মধ্যেই তোমার উনুন জ্বেলে কফি খাবো। কফিও তোমাকে সাপ্লাই করতে হবে।"

অফিসের কাজে রমাপতিদা ভোরবেলায় বেরিয়ে যেতেন। আমি তখনও শুয়ে থাকতাম। মিসেস্ উডফোর্ডের আওয়াজে ঘুম ভাঙতো। হুড় হুড় করে কাজ সেরে ঝড়ের বেগে বৃদ্ধা মহিলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমাকে বললেন, "টেল মিস্টার চ্যাটার্জি, কাল আমি নাও আসতে পারি। আমার নাতনীর বাচ্চা হবার সময় হয়ে এসেছে, একবার হাসপাতালে যেতে হবে।"

রমাপতিদা ফিরে আসবার পরে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "এই যে শুনেছিলাম আমেরিকায় পারিবারিক টান কমে যাচ্ছে। ছেলেমেয়েরা নিজেদের ধান্ধায় থাকে, বাবা-মার খবরাখবর করে না!"

রমাপতিদা বললেন, "বুঝেছি, এখানকার বস্তি-জীবন সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান হয় নি। এখানকার এই গরীব নিগ্রো পরিবার সম্পর্কে একটু খোঁজখবর নিয়ে যাও, তোমার জ্ঞানচক্ষু খুলে যাবে। বুঝবে ভারতবর্ষের গরীবদের সঙ্গে এ দেশের গরীবদের কী তফাত।"

রমাপতিদা নিজেই আমার সঙ্গে রিসার্চ স্কলার ঝর্ণা দাশগুপ্তের পরিচয়

করিয়ে দিয়েছিলেন। ঝর্ণা ওই শহরেই থাকে এবং মিসেস্ উডফোর্ডকে ভালভাবে চেনে।

"ওঁর সঙ্গে আপনার এত আলাপ হলো কী করে?" আমি ঝর্ণার কাছে জানতে চাই।

ঝর্ণা বললো, "ওদের বস্তিতেই তো আমরা এখন বেশী সময় কাটাচ্ছি।"

"ইউনিভার্সিটির পড়াশোনা ফাঁকি দিয়ে এখন পাড়া বেড়াচ্ছে নাকি?" আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

"ঝর্ণা বলেছিল, "মোটেই না। ইউনিভার্সিটিই আমাদের এখানে পাঠাচ্ছে। মস্ত একটা বস্তিতে আমাদের সমাজতত্ত্ব বিভাগের ছাত্র ছাত্রীরা সমীক্ষা চালাচ্ছে— এখানকার প্রতিটা পরিবারের জীবনধারা সম্পর্কে আমরা খবরাখবর যোগাড় করছি।"

"তাতে আপনাদের লাভ?" আমি জানতে চেয়েছিলাম।

ঝর্ণা বলেছিল, "অনেক লাভ শংকরবাবু। দেশের বিভিন্ন ধরনের মানুষ কেমনভাবে আছে, কী তাদের ভাবনা-চিন্তা, আশা-আকাঙ্ক্ষা তা যদি না জানা থাকে তা হলে একদিন অকস্মাৎ বিস্ফোরণ হবে। এবং তখন সব কিছুই আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জানতে হবে।"

কথাগুলো ঝর্ণা যে স্বদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বলছে তা আমার বুঝতে বাকি রইলো না।

ঝর্ণা বললো, "পারিবারিক খবর জানার নানা পন্থা আছে। খাতা কলম নিয়ে একদিন দেখা করে কিছু প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করার একটা রেওয়াজ আছে। কিন্তু আমরা দেখছি, এইভাবে সব সময় পারিবারিক চিত্রটা পুরোপুরি পাওয়া যায় না। তাই এখন আমরা প্রত্যেকটি স্টুডেন্ট কয়েকটি করে পরিবারের সঙ্গে ভাব-সাব রাখছি। আমরা মাঝে মাঝে এদের বাড়িতে যাই ; কথাবার্তা বলি, এদের সঙ্গে বেশ কিছু সময় কাটাই। তারপর বাড়ি ফিরে এসে কিছুটা ঘটনা নোট করে ফেলি। প্রত্যেক পরিবারের জন্য একটা করে ফাইল আছে। কিছুদিন পরে দেখা যায়, টুকরো টুকরো দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাগুলো জুড়েজুড়ে সমাজের নিচুতলার বেশ অন্তরঙ্গ একটা ছবি পাওয়া যাচ্ছে।"

"দুলে দুলে বই মুখস্থ না করে, আপনারা জীবনের পাঠশালা থেকে সোজাসুজি পাঠ নিচ্ছেন, এটা খুবই আশার কথা" আমি বলি, "একদিন হয়তো আমাদের দেশে ইস্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েদের জন্যে এইভাবে জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা হবে। তখন আমাদের ছেলেমেয়েরা জানবে পৃথিবীটা কেমনভাবে চলছে, তারা কিছুতেই আর পরের মুখে ঝাল খেয়ে সন্তুষ্ট হবে না। খুব সম্ভবত কেউ তখন আর টুকে পাশ করতে চাইবে না, কারণ বই থেকে টুকবার অবকাশই

ছাত্রছাত্রীদের থাকবে না।"

ঝর্ণা বলেছিল, "আমরা যে সমীক্ষাটি চালাচ্ছি, তা আরও মজার হয়ে উঠেছে এই কারণে যে, বছর আষ্টেক আগে এই জায়গায় আর একদল ছাত্রছাত্রী ঠিক একই ধরনের সমীক্ষা চালিয়েছিল। ফলে আট বছর আগে এবং পরের ছবিগুলো তুলনা করা যাচ্ছে এবং বোঝা যাচ্ছে মানুষগুলো কোন্‌দিকে চলেছে।"

ঝর্ণার সঙ্গে বেরিয়ে একদিন এই গরীবদের বস্তি দেখে এলাম। বস্তি বলতে আমাদের চোখের সামনে যে দৃশ্য ভেসে ওঠে তার সঙ্গে মার্কিনী বস্তির সঙ্গে ঠিক মিল হয় না। কারণ এখানকার বাড়িগুলো পাকা এবং তিনতলা। প্রত্যেক বাড়িতে আলো, জল এবং পায়খানা আছে, যদিও ভীষণ নোংরা অবস্থায় রাখা হয়েছে এই বাড়িগুলো। ঢুকতে গেলে দুর্গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসবার অবস্থা। চাঁপার মায়ের বস্তিও নোংরা, সামনে খোলা নর্মদা ভটভট করছে, কিন্তু ঘরগুলোর ভিতর এবং উঠোনটা যতাসাধ্য পরিষ্কার।

ঝর্ণা যে-বাড়িগুলো দেখালো সেগুলো যে অনেকদিন মেরামত হয় নি তা দেখলেই বোঝা যায়। কমন প্যাসেজের সিঁড়ির সামনে যার-যা খুশী ফেলে রেখেছে...ভাঙা রেফ্রিজারেটর, পুরনো প্যাকিং বাক্স, টিন ইত্যাদি কোণে কোণে জড় হয়ে রয়েছে। সে বিষয়ে ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের একটুও মাথাব্যথা নেই। এইসবের মধ্যে যে প্রচুর ইঁদুর বসবাস করছে তা আমি বাজী ধরে বলতে পারি।

"এ এক আশ্চর্য জগৎ," ঝর্ণা বলেছিল। "আমাদের দেশের গরীবদের মধ্যে এমন পরিবেশ খুঁজে পাবেন না। আমাদের সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রতি তিনটি বাচ্চার মধ্যে দুটি বাচ্চা এখনে বাবা এবং মা উভয়ের সান্নিধ্য পায় না।"

আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম।

ঝর্ণা বললো, "ওই যে মিসেস্ উডফোর্ডকে দেখলেন, ওঁরা তিন জেনারেশন একসঙ্গে থাকেন। মিসেস্ উডফোর্ড, ওঁর মেয়ে এবং নাতনীরা। সবচেয়ে যেটা আশ্চর্যের ব্যাপার—এঁদের কারুরই বিয়ে হয় নি, অথচ ছেলেপুলে হয়ে যাচ্ছে।"

ঝর্ণার মুখেই শুনলাম, ছেলেদের মতো মেয়েরাও এখানে বারো তেরো বছর বয়স থেকেই মাস্তান হয় এবং দল বেঁধে রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মিসেস্ উডফোর্ডের নাতনী জোন এমনি এক মাস্তান দলে সারাদিন টো-টো করে ঘুরে বেড়ায়।

এইসব মেয়ে দলের সঙ্গে আবার ছেলে মাস্তানদের পরিচয় থাকে। যে ছেলে-মাস্তানদের দু'চারটে মেয়ে-বান্ধবী নেই, বন্ধুমহলে তার প্রেসটিজ থাকে না। যে ছোকরা মেয়েমানুষদের হাঙ্গামায় যেতে চায় না, সে বন্ধুদের চোখে ছোট হয়ে যায়। দলের বন্ধুরা চায়, মেয়ে পটাবার ক্ষমতা যে তোমার আছে তা হাতে কলমে দেখাও। মেয়েদের মন জয় করতে না পারলে তারা 'হ্যাক্-থু' করবে, আর

মেয়েরাও অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ফিকফিক করে হাসবে।

ঝর্ণার মুখে শুনলাম, এই অবৈধ সম্পর্ক মিসেস উডফোর্ডের নাতনীকে মোটেই চিন্তিত করে না। তার বক্তব্য, "সমর্থ মেয়েমানুষের দিকে পুরুষমানুষের নজর তো পড়বেই! কুমারী থাকার জন্যে তো ঈশ্বর মেয়েদের পৃথিবীতে পাঠান নি!" জোন এবং তার দলের বান্ধবীদের কাছে সেক্স একটা খেলার মতো। তারা জানে পুরুষমানুষরা দেখা হলেই পটাবার চেষ্টা করবে এবং তাদের একটু লাই দিলেই বিছানায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে। এ-বিষয়ে তাদের যা আপত্তি সেটা নৈতিক কারণে নয়, 'আমাকে বোকা বানিয়ে মজা লুটে গেলো,' বা 'গোলমালে না পড়ি' এই জন্যে।

ঝর্ণার কথাবার্তা শুনে আমি তো তাজ্জব। আমাদের দেশের চাঁপার মায়েরা এদের তুলনায় দেবী। দারিদ্র্য ছাড়া অন্য নোংরামি তাদের এইভাবে গ্রাস করে নি। সামান্য খেতে পরতে পেলেই তারা ধন্য হয়ে যায়।

ঝর্ণা বললো, "এ-দেশে নিচুতলার নিচু মানুষদের নিয়ে অনেক সমীক্ষা হয়েছে। দু'একটা রিপোর্ট আপনাকে দেবো।"

"বাবা-মা'রা ছেলেমেয়েদের বাধা দেন না?" আমি জানতে চাই।

"দেন, কিন্তু শোনে কে? তাঁরা অবশ্যি অস্বস্তি বোধ করেন, কিন্তু বেশী ভয় পান না। তাঁরা বলেন, আমরা আর এ-ব্যাপারে কী করতে পারি? মাঝে মাঝে তাঁরা ছেলেদের উপদেশ দেন, খুব সাবধান না হলে কিন্তু নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে করতে হবে।"

জোনের কথা আরও জানবার চেষ্টা করি। কারণ ওরই সমবয়সী লক্ষ্মীকে আমি ভালভাবে জানি। বেচারা সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকে, আর মুখ বুজে মা এবং দিদিমাকে বাসনমাজার কাজে সাহায্য করে। পৃথিবীতে জন্ম নিয়েই সে যেন এক মহা অপরাধ করে ফেলেছে এমন সদাশঙ্কিত ভাব। চাঁপার মা দুঃখ করে বলেন, "এ মেয়েকে যে কী করে পার করবো! টাকাকড়ি, গয়নাগাঁটি কিছুই নেই। একেবারে জলে ফেলে দিতে হলেও আজকাল আড়াই শ' টাকা লাগে! বন্দক দেবার মতো একটা জিনিসও নেই।" আমার মা আশ্বাস দিতেন, "নামে লক্ষ্মী, কাজে লক্ষ্মী। কিছু চিন্তা কোরো না। ওপরে ঈশ্বর আছেন। তোমরা একটি ভাল ছেলে দেখো। তেমন অসুবিধে হলে আমাদের বাড়ি থেকেই মেয়ে দেখিও।"

ঝর্ণা বললো, "জোনকে যদি লক্ষ্মীর কথা শোনাই, তাহলে আমাকে পাগল ভাববে। এখানকার মাস্তান মেয়েরা তো ছেলে পাকড়াও করবার জন্যে উদ্গ্রীব। কারণ সে যে আকর্ষণীয়া এবং 'সমর্থ' মেয়েমানুষ তার প্রমাণ দিতে চায় বান্ধবীদের কাছে। কিন্তু তা বলে বিছানা-প্রক্রিয়াটা সবার সঙ্গে নয়। মাত্র

কয়েকজনের সঙ্গে—যাদের ভাল লেগেছে এবং যারা ভয় দেখিয়ে কাবু করেছে। কথা না শুনলে, অনেকে খুন জখম করবে কিংবা মুখ পুড়িয়ে দেবে বলে ভয় দেখায়।”

“এই ভয়েই তো আমরা তিন-চারজন বান্ধবী এক সঙ্গে ঘুরে বেড়াই,” জোন বলেছিল। “যখন অনেকদিন ছেলেদের সঙ্গে দেখা হয় না তখন কিন্তু মন খারাপ হয়ে যায়। তখন আমরা কয়েকজন ছোকরাকে ফোন করি এবং এমন মিষ্টি কথা বলি যে ওদের না এসে উপায় থাকে না। ওদের আবার গাড়ি আছে। গাড়ি চড়তে আমার খুব ভাল লাগে।”

জোন বললো, “কোনো ছোকরা যদি বেশী ছটফট করে, তাকে সামলাবার জন্যে আমি ঠাণ্ডা মেরে যাই। তোমার তো অন্য গার্ল ফ্রেন্ড আছে, এই বলে সম্পর্ক ভেঙে দিই। অন্য মেয়েরাও তখন আমাকে সাপোর্ট দেয়।”

“বিয়ে-থা?” আমি ঝর্ণার কাছে জানতে চেয়েছিলাম।

ঝর্ণা বলেছিল, “শংকরবাবু, এদের সঙ্গে আপনি দিন পনেরো থেকে যান—একটা উপন্যাসের উপকরণ পেয়ে যাবেন। নিচুতলার মানুষগুলোর সমস্যা জানতে পারলে পুরো সমাজটাকে বোঝা আপনার পক্ষে অনেক সোজা হবে।”

একটু হেসে ঝর্ণা বলেছিল, “আপনার চাঁপার মা সামান্য কয়েকটা টাকার জন্যে নাতনীর বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারছে না। আর এখানে বাবা-মা, নায়ক-নায়িকা কেউ বিয়ের কথা তুলতে চায় না। বিয়ের নাম শুনলে সবাই আঁতকে ওঠে।”

এরা বলে, বিয়েটা হলো রেসপনসিবিলিটি উইদাউট রিওয়ার্ড—বিয়ের মন্ত্র পড়ার পর শুধু দায়িত্ব আছে, কোনো মজা নেই। ছেলেদের কাছে বউ মানেই বিপদ—সংসারে টাকাকড়ি ছাড়ো, সাবধানে থাকো, বউ-এর কথায় ওঠো বসো। মেয়েরাও মোটেই বিয়েতে লালায়িত নয়। কারণ বিয়ে মানেই দিদিমা এবং মায়ের পরিচিত সংসার ছেড়ে অন্য এক অপরিচিত পরিবেশে গিয়ে ওঠা। দিদিমা এবং মায়ের বাড়িতে অগাধ স্বাধীনতা, যখন খুশী বাড়ি ফেরো, যার সঙ্গে খুশী ঘুরে বেড়াও। বিয়ে করলেই কোমরে শেকল পরতে হবে। কোনো ছোকরার সঙ্গে কথা বললেই, স্বামীর কাছে উত্তর দাও। তাছাড়া বর খাওয়াবে কিনা কে জানে! চারদিকে তাকিয়ে জোন যা দেখছে! খুব কম বেটাছেলেই নিয়মিত সংসারে টাকা দেয়। দায়িত্বহীন একটা লোকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে লাভ কী?

“বিয়ে যদি করতে হয়, কেমন স্বামী তোমার পছন্দ,” জোনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল।

দাঁত দিয়ে নখ কাটতে কাটতে কৃষ্ণকুমারী জোন বলেছিল, “এমন স্বামী যে

রান্নাবান্না করবে এবং সংসারের সমস্ত কাজের দায়িত্ব নেবে। যার অনেক টাকা থাকবে এবং যে রোজ সন্ধ্যাবেলা মজার মজার জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাবে।"

ছেলেরাও বলে, "বিয়ের মধ্যে উৎসাহজনক তেমন কিছু নেই। শুধু এইটুকু বলতে পারো, বিছানায় রেগুলার একটা মেয়ে পাওয়া গেলো। যার জন্যে মারামারি কাটাকাটি করতে হবে না। মাস্তান দলের হাত থেকেও রেহাই পাওয়া যেতে পারে। কারণ দলের লোকরা কোনো বিশেষ মেয়ের প্রতি কেউ খুব গদ্‌গদ্ হয়ে পড়ে তা পছন্দ করে না।"

জোনের বক্তব্য : "ছেলেদের তোমরা জানো না। এক একটি শয়তান। এই তো আমাদের বান্ধবী মার্থা বিয়ে করলো ডেভিডকে। ওদের আগেই ছেলেপুলে হয়েছিল। ডেভিডের তখন চাকরি আছে। ওর বক্তব্য, টাকা যখন আনছি তখন আবার বাড়ির কাজ করবো কেন? ওসব বউ বুঝুক—ছেলে সামলাক, আমার সেবা করুক। বেচারা মার্থা তাই করছিল। কিন্তু কত দিন লোকটা সংসারে টাকা দিয়ে যাবে কে জানে? এরকম দেবতা স্বামী আর ক'টা আছে? বেচারা মার্থা তাই একটা চাকরি যোগাড় করেছে। ডেভিড অমনি সংসার খরচের টাকা কমিয়ে দিয়েছে। ওর মনের ইচ্ছে, বউ সংসারে টাকা ঢালুক, আর আমি আমার টাকায় বাইরে ফূর্তি করি।"

হি হি করে হেসে উঠলো জোন। বললো, "এখন চাকা ঘুরে গিয়েছে। এখন মার্থাই ডাণ্ডা ঘুরোচ্ছে।"

ব্যাপারটা যা জানা গেলো, ডেভিড যে দোকানে চাকরি করতো সেখানে একটু গোলমাল হয়। একদিন ডিউটি সেরে ডেভিড বেরুতে যাচ্ছে সেই সময় মালিকের ছেলে বললো, 'আধঘণ্টা থেকে যাও।' ডেভিড মুখ বেঁকিয়ে বসেছিল, 'ওভার-টাইম চাই।' মলিক-পুত্র বলেছিল, 'অত আব্দার সয় না। যদি কাজ পছন্দ না হয়, আমার পাছায় চুমু খাও!' তারপর যা হয়—রাগারাগি, কথা কাটাকাটি এবং চাকরি খতম। মার্থা এখন সুযোগ পেয়েছে। স্বামী বেকার হওয়ামাত্রই স্বামীসেবা বন্ধ। ঘরদোর সামলানো, ছেলেধরা এবং রান্নাবান্না সব কাজ ডেভিডের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। স্বামী মহারাজ রেগেমেগে কয়েকদিন বাড়ি থেকে উধাও হয়েছিল। নিশ্চয় কোনো পার্ট-টাইম কাজে কিছু ডলার কামিয়ে নিয়েছে। টাকা ফুরানো মাত্র আবার সুড়সুড় করে বাড়ি ফিরে এসেছে। মার্থাও প্রতিশোধ নিচ্ছে। মাইনে পেয়ে একদিন বাড়ি ফেরে নি, বাইরে ফূর্তি করে সব টাকা উড়িয়ে দিয়েছে। তাছাড়া, বোনের সঙ্গেও পরামর্শ করেছে মার্থা। সে বুদ্ধি দিয়েছে যতদিন মিনসে রোজগার করবে না, ততদিন ওর সঙ্গে এক বিছানায় শোবার কোনো প্রয়োজন নেই।

জোনের মায়ের খবরাখবরও ঝর্ণা রাখে। মিসেস্ উডফোর্ড কাউকে বিয়ে

করেন নি। তাঁর মেয়েও কাউকে বিয়ে করে নি। মেয়ের মেয়েদের নিয়েই এখন সমস্যা। দিদিমা অনেক সাবধান করে দিয়েছিলেন নাতনীদের। ছেলেদের সঙ্গে বেপরোয়াভাবে ঘুরে বেড়নোর ঝুঁকি কতখানি তাও অনেকবার বুঝিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও যা হবার তাই হলো। পনেরো বছরের জোন মা হতে চলেছে। খবরটা প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়লো না। যদিও মা, দিদিমা এবং মায়ের ফেবারিট বয়ফ্রেন্ড বললেন, "ব্যাপারটা না-হলেই ভাল হতো।" যেমন বাবা মায়েরা ভয় পান ছেলের হাম-বসন্ত হতে পারে—কিন্তু হলে কী আর করা যাবে?

জোনের নিজের তেমন চিন্তা নেই। বাচ্ছা সম্বন্ধে তার আপত্তি নেই, যদি না বান্ধবীদের সঙ্গে টো-টো করে ঘুরে বেড়ানোর অসুবিধে হয়।

ঝর্ণা বললো, "ছেলে হবার পরেই তো জোন জাতে উঠবে। কুমারীত্ব নিয়ে তাকে অযথা আর মাথা ঘামাতে হবে না। এবার থেকে প্রাণ-যা চায় তাই করতে পারবে। বাচ্চার জন্যে ওয়েলফেয়ার থেকে সরকারী টাকা পাওয়া যাবে।"

"বাড়ির অবস্থা কী?" আমি ঝর্ণার কাছে জানতে চাই।

"বাড়ির প্রধান মিসেস্ উডফোর্ডকে আপনি কি চেনেন। চারটে পাঁচটা বাড়িতে ঝি-গিরি করেন এবং সংসার সামলান। এঁর ছেলে টম বাইরে থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে সপরিবারে হাজির হয়ে মায়ের ঘাড়ে থেকে যায়। মাকে একটা পয়সা ঠেকায় না। দায়িত্বটা সবই যেন বেচারা মায়ের। যাবার সময় মাকে ফাঁসিয়ে গিয়েছে। আশি ডলারের ট্রাঙ্ককল বিল ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। ছেলে কখন যে লুকিয়ে লুকিয়ে ট্রাঙ্ককল করেছে তা মিসেস্ উডফোর্ড বুঝতে পারেন নি। পারলে, ছেলেকে ঘাড় ধরে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে বার করে দিতেন।"

মেয়ে প্যামেলা ড্রাগ স্টোরে কাজ করে। তিনটি অবৈধ সন্তানের জননী। জোন এর মধ্যে দ্বিতীয়। ছোটটিও মেয়ে, বয়স বছর বারো। বড় মেয়ে আগাথার ইতিমধ্যেই দুটি অবৈধ সন্তান হয়েছে। তারা এই বাড়িতেই থাকে। বাড়িতে হৈচৈ লেগেই আছে বাড়ির দ্বার অবারিত। কত রকমের লোক আসছে যাচ্ছে। একেবারে পুঁচকে নাতি দুটোর সমবয়সী বন্ধুরা আসছে, জিনিসপত্র ভাঙছে। এইসব বাচ্চারা নিজের খেয়ালেই থাকে—এদের বেশী দেখাশোনা করতে হয়।

ঝর্ণা বললো, "এরা আমাদের দেশের বস্তির বাচ্চাদের মতোই দোকানে ছুটছে টুকিটাকি জিনিস কিনতে, বাঁ হাতে নাকের সিকনি মুছছে। বাড়িতে বড়রা কেউ না থাকলেও এরা ভয় পায় না—প্রায়ই দরজা বন্ধ করে নিজেদের মধ্যে খেলাধুলো করে, খাবার সময় খাবার নিয়ে খায়, নিজেরাই সময় মতো ঘুমিয়ে পড়ে।"

বাড়িতে আর যারা আসা-যাওয়া করে তাদের মধ্যে রয়েছে চতুর্দশীদের

অগুনতি বয়ফ্রেন্ড, আগাথার বয় ফ্রেন্ড, জোনের বয় ফ্রেন্ড এবং ছোট বোনের বয় ফ্রেন্ড যখন খুশী বাড়িতে ঢুকে পড়ে। মায়েরও বয় ফ্রেন্ড আছে—তবে সংখ্যায় কম। তাঁদের বয়সও বেশী। মাঝে মাঝে তাঁদের সঙ্গে বেরিয়ে যান, কিংবা পাশের ঘরে সরে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দেন। শুধু দিদিমার কেউ খোঁজ-খবর করে না—পাশের ফ্ল্যাটের বুড়ী বান্ধবী মিসেস্ এলিস ছাড়া। ওঁদের দু'জনে দেখা হলে শুধু সংসারের কথাবার্তা হয়। কত কষ্ট করে কীভাবে যে মেয়ে এবং নাতি নাতনীদের দেখাশোনা করছেন তা নিয়ে আলোচনা হয়, অথচ কেউ তাদের কথা শোনে না। সবাই যে যার তালে রয়েছে।

তার জন্যে মিসেস্ উডফোর্ডের কোনও অভিযোগ নেই। "এই তো প্রকৃতির নিয়ম। ওদের বয়স কম। এখন 'শরীর' রয়েছে, ওরা জীবনকে একটু উপভোগ করে নেবেই তো।" ওদের যাতে বেশী কষ্ট না হয়, তা দেখবার জন্যেই তো মিসেস্ উডফোর্ড রয়েছেন। ওদের দেখাশোনার মধ্যে কষ্ট আছে, কিন্তু আত্মতৃপ্তিও খুঁজে পান। বৃদ্ধা মিসেস্ উডফোর্ড। বড়লোক সাদা বুড়ীগুলোর মতো একলা একটা বিরাট বাড়িতে চেক বই নিয়ে পড়ে থাকার চেয়ে এ-জীবন ঢের ঢের ভাল, অন্তত মিসেস্ উডফোর্ড তাই বিশ্বাস করেন।

ঝর্ণা আরও বলেছিল, "জোন সন্তানসম্ভবা হবার পরে ওদের নিজেদের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়েছিল।"

জোনের মা প্রথমে বেশ বকুনি লাগিয়েছিলেন মেয়েকে। মেয়ে কিছুই বলে নি।

দিদিমা বলেছিলেন, "আহা, প্রথম মা হতে চলেছে, শুধু শুধু বকছো কেন?"

দিদিকে বকুনি খেতে দেখে ছোট বোন ফিকফিক করে হাসছিল। সেই না না দেখে বেজায় চটে উঠেছিল জোন। বলেছিল, "দাঁত বার করে হাসছো কি? সামনের বছরে এরকম সময়ে তোমারও একই অবস্থা হবে।"

জোনের দিদির বাচ্চা দুটো হঠাৎ পড়ে গিয়ে কাঁদছে। দিদির সেদিকে মোটেই নজর নেই। দিদিমাকেই ছুটতে হলো ওদের সামলাবার জন্যে। মা বললেন, "খুকী, তোর মতো কুঁড়ে মেয়ে একটাও নেই পৃথিবীতে। কাজ না করে গতরে যে মরচে পড়ে গেলো।"

মেয়ে রেগে বললো, "বেশী গ্যাজর-গ্যাজর করো না।"

"করবো বইকি, হাজারবার করবো। মুরোদ তো কত জানা আছে। বাচ্চাদের বাপদের কাছ থেকে একটা পয়সাও তো আদায় করতে পারিস না।"

মেয়ে তেড়েমেড়ে উঠলো—"বেজম্মা হয়েছে বলেই তো ওয়েলফেয়ার থেকে চেক্ আসছে।"

"তবে আর কী! মাথা কিনে নিয়েছিস!" মা গজগজ করতে লাগলেন।

"মুখ যদি না সামলাও, তাহলে ছেলেদের বাপের কাছেই চলে যাবো। মিন্‌সে যদি বেশী ত্যাণ্ডাই-ম্যান্ডাই করে, তাহলে কোর্টে কেস করে আমাকে নিতে বাধ্য করবো," মেয়ে ফোঁস-ফোঁস করতে লাগলো।

দিদিমা এতোক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবার গম্ভীরভাবে বললেন, "তোমরা যেখানে খুশী যেতে পারো, কিন্তু বাচ্চারা আমার কাছে থাকবে।"

এরপর জোন সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছিল। জোনের পেটে যে সন্তান এসেছে তার বাবা কে এটা ঠিক করে নিতে হবে। কুমারী মায়ের গর্ভবতী হবার মধ্যে তেমন কোনো লজ্জা নেই। কিন্তু কে এই সন্তানের জনক তা না জানা খুবই অসামাজিক এবং লজ্জাজনক! জোনের ইচ্ছে বিলকে এ সম্মানটা দেয়। বিল জোনের থেকে বয়সে বড়। যদিও বিল বিবাহিত, তবু ডাইভোর্স হলে জোন তাকে বিয়েও করতে পারে। পলকেও জোন ছেলের বাবা হিসাবে নির্বাচন করতে পারে। নির্ধারিত সময়ে তার সঙ্গেও জোনের দেহসম্পর্ক ছিল। কিন্তু পল তার থেকে এক বছরের ছোট। আর পলকে ততো ভাল লাগে না জোনের।

পল অবশ্য খরবাখবর নিচ্ছে। বাবা হতে তার আপত্তি নেই। এইটাই হবে তার প্রথম সন্তান। ছেলের বাপ হলে মাস্তানদের মধ্যে সে জাতে উঠবে। তাছাড়া জোনের উপর তার একটু স্পেশাল অধিকারও জন্মাবে।

নিচু তলার এই নিচু নাটকের সঙ্গে পরিচয় ছিল না বলেই বোধহয় আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম।

ঝর্ণা বললো, "কী ভাবছেন?"

"ভাবছি, এই সমাজের শেষ পর্যন্ত হবে কী? আর জোনের অনাগত সন্তানের দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত কে নেবে?"

"প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো না। দ্বিতীয়টা বলে দিতে পারি। এই অনাগত সন্তানের জন্যে চিন্তা অন্য কারও নয়, সমস্ত দায়িত্ব বেচারা মিসেস্ উডফোর্ডের। তিনি যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ এই কুৎসিত সভ্যতার নীল বিষ তিনিই গ্রহণ করবেন। তাঁর তো নিজস্ব কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা নেই। মেয়ে, নাতনী, নাতনীর সন্তান—তাদের সুখী রেখে যেতে পারলেই তাঁর আনন্দ।" তিনি বলেন, "ওদের বয়স কম, তাই শরীরের নেশায় পাগল হয়ে রয়েছে। বয়স বাড়তে ওরা আমার মতো শান্ত হয়ে যাবে, আমারই মতো তখন ওরা নিজের নাতি-নাতনীদের জন্যে চিন্তা করবে।"

আমি আর কিছু বলি নি। কিন্তু আমার চোখর সামনে চাঁপার মা এবং মিসেস্ উডফোর্ডের ছবি বারবার এক সঙ্গে ভেসে উঠছিল।

জকাল যে কী সব জিজ্ঞেস করে বসে, বুঝি না।"

দিদিমাকে বোঝালাম, "এনজয় মানে উপভোগ করা। প্রাণ যা চায় সেইসব ফূর্তি করে নেওয়া। মিসেস্ জেনিংস বললেন, "এনজয় না করলে মরবার সময় আপসোস হবে। মরেও শান্তি পাওয়া যাবে না।"

দিদিমা রেগে উঠলেন। "কত পাপ করেছিলাম, তাই বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে গেলাম। মরবার পরেও যাতে নরকে জ্বলে-পুড়ে মরি, তার ব্যবস্থাও করতে বলছিস? যম যদি শোনে ভাতারখাগী হয়েও সারাজীবন ফূর্তি করেছি, তা হলে আমাকে কোলে করে সগ্‌গে পৌঁছে দেবে, তাই না?"

"কিন্তু দিদিমা, তোমার সব সাধ পূর্ণ হয়েছে?" আমি জিজ্ঞেস করি।

দিদিমা হিসেব করতে বসলেন। "উনি বেঁচে থাকতে কাশী দর্শন করেছিলাম। কেন মিথ্যে কথা বলবো, খোকা আমাকে গয়া, বৃন্দাবন হরিদ্বার ঘুরিয়েছে। কাছের গোড়ায় বাবা তারকেশ্বর অনেকবার দয়া করেছেন। কলকাতার 'ওমুকের'...স্থানও দেখেছি। শুধু বাবা পশুপতিনাথের মাথায় জল ঢালা হলো না। এই একটা ইচ্ছে রয়ে গেলো।"

মিসেস্ জেনিংস এবং দিদিমা কেউ কাউকে দেখেন নি। আমি এঁদের মধ্যে যোগসূত্র। আমার মধ্য দিয়েই এঁরা দু'জনে দু'জনকে জানেন—যদিও কাউকে বুঝে উঠতে পারেন না।

দিদিমা আমার নিজের নয়, মায়ের কাকিমা মাত্র। কিন্তু নিজের দিদিমা অনেকদিন গত হওয়ায়, এই দিদিমার কাছেই আদর-যত্ন পেয়েছি। দিদিমার দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। আর খোকামামা, অর্থাৎ কিরণচন্দ্র ব্যানার্জী, দিদিমাকে আগলে বেড়ান। রেলের চাকরিতে বদলি হতে হতে খোকামামা এখন আমাদের বাড়ির কাছাকাছি কোয়ার্টার নিয়েছেন। তাই মাঝে মাঝে দেখা হয় এবং দেখা হলেই দিদিমার সঙ্গে গাল-গল্প চলে।

আর আমেরিকায় না গেলে মিসেস্ জেনিংসের সঙ্গে আলাপই হতো না। সুদূর বিদেশে মিসেস্ জেনিংসের অকৃত্রিম স্নেহ লাভ করে ধন্য হয়েছি। মিসেস্ জেনিংস কত সহজে আমাকে আপন করে নিয়েছিলেন। যেন আমি সত্যিই তাঁর নাতি। সেই থেকে পত্রালাপ আছে। মিসেস্ জেনিংস বড় বড় করে চিঠি লেখেন, ছবি পাঠান, নানা খবরাখবর দেন। আমিও যতদূর সম্ভব উত্তর দিই।

দেশে ফিরে দিদিমার কাছে বোধহয় মিসেস্ জেনিংসের গল্প একটু বেশীই করেছি। কারণ দিদিমা মুখ টিপে টিপে হেসে বলেছেন, "দেখিস ভাই, প্রেমে-টেমে পড়িস নি তো?"

বললাম, "গার্ল ফ্রেন্ড বলতে এতোদিন তুমিই ছিলে, এখন আর একটা

"তা কোন্‌টিকে বেশী মনে ধরে?" দিদিমা জিজ্ঞেস করেছেন।

"দু'জন দু'রকম," আমি উত্তর দিয়েছি। তুমি দিনরাত ঘরের মধ্যে শুয়ে, না হয় বসে থাকো, বড়জোর একটু দরজার সামনে সিঁড়িতে এসে দাঁড়াও। মিসেস্ জেনিংস দিনরাত টো টো করে ঘোরেন, বাড়িতে প্রায় সবসময় চাবি মারা।"

দিদিমা মুখ কুঁচকে বললেন, "আ মলো যা। বিধবা মাগীকে তোর মামীর মত পাড়াবেড়ানি রোগে ধরেছে আর কী। সংসার, শাশুড়ী সব ভেসে যাক, কিন্তু তোর মামী পাড়াবেড়ানো ছাড়বে না।"

বউমা-র সমালোচনা একবার আরম্ভ হলে বিপদ। তাই দিদিমাকে অন্য আলোচনায় নিয়ে যাবার জন্য বললাম, "তুমি তো সাদা থান ছাড়া কিছুই পরো না, মিসেস্ জেনিংস কত ঝলমলে স্কার্ট পরেন।"

"কী অনাসৃষ্টি গা!" দিদিমা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। "স্বামীখাগীদের জন্যে ভগবান তো সাদা কাপড়েরই ব্যবস্থা করেছেন।"

"বিয়ের দিনে মিসেস্ জেনিংস সাদা গাউন পরেছিলেন, আমি দেখেছি," দিদিমাকে বোঝাবার চেষ্টা করি।

"এ্যাঁ! বে-র দিনে বিধবার সাজ। স্বামীর মুণ্ডু ওই দিনেই চিবিয়ে খায় বুঝি ওরা?" দিদিমা রেগে অস্থির।

দিদিমার জামাকাপড় নিয়েও মিসেস্ জেনিংস সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে আমার। এসব বিষয়ে মিসেস্ জেনিংসের ভীষণ আগ্রহ। তিনি নিজে সারাক্ষণ সভ্য-ভব্য জামাকাপড়, মোজা, জুতো মাথায় জাল ইত্যাদি পরে থাকেন। আর আমার দিদিমা তো আজকাল খালি-গায়ে থাকেন বললেই চলে। পিত্তির প্রকোপটা বেড়েছে, তাই ব্লাউজটাও অনেক সময় গায়ে রাখতে পারেন না। ছোঁয়াছুঁয়ির বাছবিচার আছে—তাই দিদিমাকে দিনের অনেকটা সময় গামছা পরে কাটাতে হয়। মিসেস্ জেনিংসের স্কার্ট ও দিদিমার গামছার ঝুল প্রায় এক।

মিসেস্ জেনিংসের কাছে এসব কথা বোধহয় আমার খুলে বলা উচিত হয় নি। শুনে তো ওঁর ফেন্ট হবার অবস্থা। বললেন, "জ্ঞানগম্যি হওয়া বয়স্কা মেয়েরাই যখন তোমাদের দেশে এই কাণ্ড করছে, তখন আর আমার নাতনীদের দোষ দিই কী করে—ওরা ব্রা-লেস হয়ে ঘুরে বেড়াবেই তো!" গম্ভীর হয়ে উঠেছিলেন মিসেস্ জেনিংস। বলেছিলেন, "গোলাপ সুনডারি তোমার দিদিমা, সুতরাং আমার বলাটা শোভন নয়—কিন্তু কমবয়সী মেয়েদের সামনে উনি ভালো এগ্‌জামপল রাখছেন না।"

দিদিমাকে এসব কথা বলি নি। দু'জন সমবয়সিনী মহিলার মধ্যে অহেতুক ঝগড়াঝাটি বাধিয়ে দেওয়াটা কোনো ভদ্রলোকের কাজ নয়।

তবে মিসেস্ জেনিংসের সৌন্দর্যচর্চা সম্বন্ধে দিদিমাকে পুরো রিপোর্ট

দিয়েছি। মার্কেটে বেরুবার আগে মিসেস্ জেনিংস পাকা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে নানা রকম পাউডার, স্নো, লোশন, সেন্ট ইত্যাদির সাহায্যে নিজেকে তৈরি করেন। শুনে দিদিমা বেশ বিরক্ত হয়েছেন। ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছেন, "রাঁড়ের আবার সাজ!"

ইন্ডিয়ায় যে ভালো লিপস্টিকের দাম অনেক, তা মিসেস্ জেনিংস কোথা থেকে খবর পেয়েছিলেন। বিপদ বাধালেন আসবার দিনে। বললেন, "তোমার দিদিমাকে এই লিপস্টিক তিনটে দিও, উইথ মাই বেস্ট উইশেস।"

শুভেচ্ছা অবশ্যই পৌঁছে দোবো। কিন্তু লিপস্টিক দিদিমা ব্যবহার করেন না, আমার এই রিপোর্ট পেয়ে মিসেস্ জেনিংস তো বেশ অবাক। পাছে অন্য কিছু ভেবে বসেন সেই জন্যে মিসেস্ জেনিংসকে বলতে হলো, "দিদিমাও সকালে একঘণ্টা ধরে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে কসমেটিক্স করেন, তবে নিজের জন্যে নয়। লর্ড কৃষ্ণ এবং রাধাকে স্নান করিয়ে, চন্দন কুমকুম ইত্যাদির দিয়ে সাজান।"

সাহেবরা আজকাল আবার লর্ড কৃষ্ণা সম্পর্কে ইন্ডিয়ানদের থেকে বেশী খবরাখবর রাখেন। এঁদের নাম শুনেই মিসেস্ জেনিংস লজ্জায় ব্লাশ করেছিলেন। "লর্ড কৃষ্ণা হচ্ছেন তোমাদের প্রেমিকশ্রেষ্ঠ, আমাদের ডন জুয়ান। যিনি অপরের বিবাহিত ওয়াইফ মিসেস্ রাধা ঘোষের সঙ্গে গোপনে অ্যাফেয়ার চালিয়েছিলেন। তাই না?"

আমি প্রতিবাদ করতে পারলাম না। কিছু বললেই মিসেস্ জেনিংস বই-পত্তর খুলে আমাকে রেফারেন্স দেখিয়ে দেবেন। গভীর দুঃখের সঙ্গে মিসেস্ জেনিংস বললেন, "এই ধরনের চরিত্রহীনতা এবং অ্যাডালটরি তোমার দিদিমা প্রশ্রয় না দিলেই পারতেন।"

মিসেস্ জেনিংসকে জেরা করে জানতে পারলাম এর পেছনেও ভারত-বিদ্বেষী অপপ্রচার আছে। একজন পাকিস্তানি ছোকরা মিসেস্ জেনিংসকে মহাভারতের এই 'ক্লিক-বাজ চরিত্রহীন হিন্দু ভদ্রলোকটি' সম্পর্কে অনেক কনফিডেনসিয়াল খবর সাপ্লাই করেছে।

দেশে ফিরে এসে দিদিমার কাছে যেতেই একগাল হেসে তিনি বলেছেন, "কী ভাই, বুড়ী হয়েছি বলে মনে ধরে না বুঝি? সেই যে বললি, একবার তোর দাদুর ঘাট ঘুরিয়ে আনবি, এখন আর উচ্চ-বাচ্য করছিস না।"

মিসেস্ জেনিংস দু'খানা ব্যাগ হাতে একলা এরোপ্লেনে বিশ্বভ্রমণ করেন। দিদিমা বেচারা একলা কোথাও কখনও যান নি। পাশের বাড়িতে যেতে হলেও গার্জেন হিসাবে ছ'বছরের নাতিকে সঙ্গে নেন। রাস্তাঘাটও চেনেন না। এক সপ্তাহের মধ্যে কালীঘাটে নিয়ে যাবো, প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় দিদিমার মেজাজ ঠাণ্ডা হলো। তখন মিসেস্ জেনিংসের কথা তুললাম, "তিনি তোমাকে শুভেচ্ছা

পাঠিয়েছেন।”

দিদিমা বেশ দুষ্টুমিভরা ডিটেকটিভ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। তারপর জেরা শুরু হলো, “বলি, ওদেশের পাহাড়-পর্বত বন-জঙ্গল ঠাকুর-দেবতার খবরাখবর না দিয়ে শুধু একটা মেয়েমানুষের কথা তুলছিস কেন ভাই?”

হেসে বললুম, “মিসেস্ জেনিংস তোমারই বয়সী দিদিমা।”

“হাসলেই বোকা বনছি না ভায়া! বুড়ী মেমরা ছোকরাদের বে করতে ভালবাসে শুনেছি।”

আমি বিনা প্রতিবাদে হাসতে লাগলাম। দিদিমা বললেন, “তা আমার সতীনটি তোকে পাকড়াও করলে কী করে।”

বললাম ব্যাপারটা। দিদিমা এখানে লোকজন ছাড়া বাড়ির বাইরে এক পা বাড়াতে পারেন না; আর ওখানে মিসেস্ জেনিংস অজানা-অচেনা লোককে শহর ঘুরিয়ে দেখান। পয়সার জন্য নয়, স্রেফ শখ। নিজের গাড়িতে তেল এবং সময় খরচ করে বিদেশীদের শহর দেখাবার জন্যে মিসেস জেনিংস গভর্নমেন্টের খাতায় নাম লিখিয়ে রেখেছেন। আমাকে শহর দেখাতে গিয়ে এমন স্নেহ করে ফেললেন যে হোটেল ছাড়িয়ে নিজের বাড়িতে এনে তুললেন।

“তারপর?” দিদিমা জেরা চালালেন।

“মিসেস্ জেনিংস বললেন, ‘শংকর, তুমি আমাকে রোজালিন্ড বলে ডেকো।’ আমি রাজী হলুম না। বললুম, দেশে আমার এক দিদিমা আপনার বয়সী। আপনাকেও গ্র্যান্ডমা বলে ডাকবো।”

“বুড়ী নিশ্চয় খুশী নন। কারণ মেমরা ওখানে কেউ বুড়ী হতে চান না। উনি বললেন, ‘বরং তুমি আমাকে ‘ডিডিমা’ বলে ডেকো।”

জেরার চাপে পড়ে দিদিমাকে মিসেস্ রোজালিন্ডের রঙিন ছবি দেখাতে হয়েছিল। দিদিমা অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ফটো দেখে বললেন, ‘মরণ আর কী? বিধবা না সধবা লোকে বুঝবে কী করে?”

বললুম, “সধবা বিধবা বোঝবার কোন উপায় নেই ওখানে।”

উত্তর শুনে দিদিমা মোটেই সন্তুষ্ট হলেন না। বললেন, “সাধে কী আর বলেছে ম্লেচ্ছ দেশ!”

দিদিমার আরও জ্বলে ওঠবার কারণ ছিল। পরে ছবিটা দেখে তিনি বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়েন আর কী। এই ছবিতে মিসেস্ জেনিংস একটা সিগারেট ধরাচ্ছেন। দিদিমার কাতরোক্তি, “হা ভগবান, মেয়েমানুষ বিড়ি সিগারেট খাচ্ছে এও আমাকে দেখতে হলো! ঘোর কলি একেই বলে!”

সিগারেটের বিরুদ্ধে মন্তব্য করতে করতেই দিদিমা মুখে একটু দোক্তা

গুঁজলেন। আমি কিছু না বলেই ওঁর দিকে তাকিয়ে আছি। দিদিমা বললেন, "যতই সাহেব হোস, নাতবৌকে যেন সিগারেট ধরাস না।"

"সিগারেট ও দোক্তা তো একই জিনিস দিদিমা", আমি বিনীতভাবে নিবেদন করি।

"ওই মাগী তাই বলেছে বুঝি? ও মাগো! ভূভারতে কে শুনেছে যে বিড়ি-সিগারেট আর দোক্তা এক জিনিস? তাহলে দুধ আর তাড়িও এক জিনিস বল?"

দিদিমার সঙ্গে এরপর তর্ক করা বৃথা।

তবে দেখেছি, দিদিমা ক্রমশ মিসেস্ জেনিংসকে সহ্য করতে আরম্ভ করেছেন। আর মিসেস্ জেনিংসও প্রতি চিঠিতে দিদিমা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করেছেন। বলতে গেলে দু'জনে দু'জনের ফ্রেন্ড হয়ে উঠেছেন।

দিদিমার সঙ্গে দেখা হলেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, "তোর সেই মেমসাহেব কেমন আছে? রুজ লিপিস্টিক মেখে মাগী এখনও পাড়া বেড়াচ্ছে নিশ্চয়?"

আমি বলেছি, "সেই রকমই তো রিপোর্ট। মিসেস্ জেনিংস তোমারও খবরাখবর করেছেন, এবং একটা কোশ্চেন করতে বলেছেন। কোশ্চেনটা হলো, এখনও তোমার কী কী ডিজায়ার আছে?"

"ডিজায়ার? সে আবার কী জিনিস বাপধন?" দিদিমা প্রশ্ন করেছেন?

"মানে এখনও তোমার কী কী আকাঙক্ষা আছে?" আমি বোঝাবার চেষ্টা করি।

"লিখে দিস, একটি মাত্র আকাঙক্ষা আছে—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যমের হাত ধরে ভেগে পড়ার।"

ইদানীং দিদিমার শরীরটা আরও খারাপ হয়েছে। এবং বাড়ির যা রিপোর্ট, অসুস্থতার অনুপাতেই দিদিমা খিটখিটে হয়ে উঠেছেন।

সেদিন মামার বাড়িতে যেতেই দিদিমা আমাকে ঘরের মধ্যে ডেকে পাঠালেন।

ইঙ্গিতে দরজাটা ভেজিয়ে দিতে বললেন। বুঝলাম, বাড়ির লোকদের বিরুদ্ধে তাঁর অনেক অভিযোগ জমা হয়ে আছে।

দিদিমা বললেন, "ঘোর কলিকাল—বুড়ো বাপ-মায়ের এখন আর দাম নেই!"

"কী হলো দিদিমা!" আমি প্রশ্ন করি।

"হবে আর কী বাছা! স্ত্রীলোকের ভাতার ছাড়া কেউ নেই। তোর দাদু বেঁচে থাকলে, আজ আমাকে কি এই গাঁটের যন্ত্রণায় কষ্ট পেতে হতো? বিয়ের পর সেবার আমার মাথা ধরেছিল। তোর দাদু অর্ধেক রাত ধরে এমন মাথা টিপে

দিয়েছিলেন যে এখনও ভুলতে পারি না। এখন বুড়ী বিধবাকে দেখে কে? একটু বাতান্তক তেল মালিশ করে দেবার সময় এ-বাড়ির কারুর নেই।"

দিদিমার মাথার গোড়ায় ওষুধের শিশি দেখতে পেয়ে বললাম, "ওই যে ওষুধের শিশি দেখছি।"

দিদিমা মুখ বাঁকালেন, "ওসব দায়-সারা। লোকলজ্জার ভয়ে বুড়ীর জন্যে সুধীর ডাক্তারের কাছ থেকে দুটো ট্যাবলেট এনে রাখলো। বড়ি খেয়ে বাতের অসুখ সারে না ভাই। এর জন্যে গরম তেল মালিশ করতে হয়। কিন্তু কে আমার দাসী-বাঁদী আছে বল?"

একটু থেমে দিদিমা বলে চললেন, "খোকার আপিস রয়েছে। বউমা সংসার আর রান্না নিয়ে ব্যস্ত। নাতিদের ফুটবল খেলা আছে।"

"ডাকছি মামীমাকে", আমি বললাম। কারণ আমি জানি মামীমা যথাসাধ্য দিদিমার পরিচর্যা করেন।

দিদিমা বাধা দিলেন, "ডেকে কোন লাভ নেই। এখনই লোকদেখানো দু'মিনিট মালিশ আরম্ভ হবে। তারপর ভূভারতে সবাই জেনে যাবে, শাশুড়ীর মালিশের জন্যে রান্না দেরি হয়েছে, সোয়ামির আপিসে লেট হয়েছে, ছেলেরা মাস্টারের কাছে বকুনি খেয়েছে।"

"তুমিও ছাড়বে কেন? মামা এলে সমস্ত ফাঁস করে দিও।" আমি পরামর্শ দিই।

"বলি না কি? রোজই তো বলি, কিন্তু কে শোনে? এ-যে ঘোর কলিকাল। কলিকালে মায়ের চেয়ে মাগ বড় হবে একথা মুনি ঋষিরা অনেকদিন আগে বলে গিয়েছেন।"

"মামীর না হয় কাজকর্ম আছে। তার উপর ঝি কামাই করছে দু'দিন। নাতিকে হুকুম করবে", আমি দিদিমাকে শান্ত করবার চেষ্টা করি।

"বয়স হোক, তখন বুঝবি ভায়া, আসলের চেয়ে ফাউ আরও পাজি! গাঁটের যন্ত্রণা যে কি জিনিস সে তোদের কী বলবো। গভ্যযন্ত্রন্না তবু সহ্য হয়, কিন্তু এর যে কী কষ্ট! যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে নাতিকে মিষ্টি করে বললাম, লক্ষ্মী দাদা আমার, একটু গাঁটগুলো টিপে দে। তা ছোঁড়া ইচ্ছে করে এমন টিপুন দিলে যে ত্রাহি মধুসূদন বলে ডাক দিতে হলো।"

হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে দিদিমা বললেন, "লোকে ভাববে বাড়িয়ে বলছি। কিন্তু তুই দেখ, এখনও ফুলে রয়েছে। পুলিসে খবর দিলে ফৌজদারী কেস হয়ে যাবে।"

"মামাকে বলো নি?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"বলি নি আবার! কিন্তু ওই লোক-দেখানো একটু বকুনি হলো। ছেলে বললে,

আমি বুঝতে পারি নি। আর বাপ তাই বিশ্বাস করে গেলো। পুত্রস্নেহে ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ!"

মুখের মধ্যে একটা ছ্যাঁচা পান পুরে দিদিমা বললেন, "সে যুগ আর নেই, যখন বাপ-মাকে ছেলেমেয়েরা দেবদেবীর থেকে বেশী ভক্তি করতো।"

সেদিন মামার বাড়ি থেকে বেরুবার সময় মামীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। সাধারণ গেরস্থ সংসার, সব কিছু সামলাতে মামী হিমশিম খেয়ে যান। এরই মধ্যে আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে শাশুড়ীর সেবা করেন। মামী জিজ্ঞেস করলেন, "কী আলোচনা হলো এতোক্ষণ?"

"বিষয়বস্তু টপ সিক্রেট!" আমি হাসি চেপে উত্তর দিলাম।

"মোটেই গোপন নয়। পাড়ার যাকে পাচ্ছেন তার কাছেই উনি রিপোর্ট করছেন। অথচ কাউকে গায়ে হাত দিতে দেবেন না। রেগে বলেছেন, পা-টেপা আর ময়দা-মাখা এক জিনিস নয়, বাছা।"

এই একই সময়ে এয়ারমেলে মিসেস্ জেনিংসের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি। লিখেছেন, রিউম্যাটিক পেনটা একটু বেড়েছিল। ডাক্তারের পরামর্শ মতো ক্লিনিকে গিয়ে রোজ আধঘণ্টা বাতের জন্য ব্যায়াম করছেন। ভাল ফল পাচ্ছেন। ছেলের খুব প্রশংসা করে লিখেছেন, "জন এবং ডটার-ইন-ল যে-ভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে তার তুলনা হয় না।"

দিদিমার সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে। এবার দিদিমার কাঁদ-কাঁদ অবস্থা। দরজা বন্ধ করে আমার হাত দুটো ধরে বললেন, "আর যা করো ভাই, বাড়িতে হুগলী রঘুনাথপুরের মেয়ে ঢুকিয়ো না। রঘুনাথপুরে ছেলের বিয়ে দিয়ে যে কী গুখুরি করেছি।"

আমি বললাম, "সেকি দিদিমা। রঘুনাথপুরের তো তোমারও বাপের বাড়ি?"

"বাপের বাড়ি বলে সত্যি কথা বলবো না?" দিদিমা কাঁদ-কাঁদ স্বরে উত্তর দিলেন.

"হলো কি তোমার?" আমি সান্ত্বনা দিতে জিজ্ঞেস করি।

"আগে হাতে মারছিল, এখন ভাতে মারছে আমায়। বিধবা মানুষ, ঘাস-চচ্চড়ি খেয়ে তো প্রাণধারণ করি। এখন বলে কিনা চায়ে চিনি দেবে না। দু'বেলা চার চামচ চিনি বাঁচিয়ে ওদের কী লাভ হবে বল তো?"

"ডাক্তার যে তোমাকে চিনি খেতে বারণ করেছে," আমি দিদিমাকে বোঝাবার চেষ্টা করি।

"ওই কথাই ওরা সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে। গোড়া কেটে আর আগায় জল ঢেলে লাভ নেই। বিধবার বেঁচে সুখ কী? চিনি বন্ধ ক'রে আমাকে আর বাঁচাতে হবে না।"

"মামাকে বলেছো সে কথা?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"বলেছি, কিন্তু কানে ঢোকে না। বউ যা বলছে তাই বেদবাক্য!"

"বউয়ের নামে কমপ্লেন করো ছেলের কাছে," আমি বুদ্ধি দিই।

"হা কপাল! সেই ছড়াটা জানিস না? যার কাছে তুই করবি নালিশ সে আমার মাথার বালিশ!"

এরপর আজকালকার ছেলেদের সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ করে গেলেন দিদিমা! ছেলেদের সঙ্গে এখন শুধু দেবার সম্পর্ক—গভ্যে ধরো, গু-মুত ঘেঁটে মানুষ করো, টাকা ছড়িয়ে লেখাপড়া শেখাও, তারপর হাতের মোয়াটি পরের মেয়ের হাতে তুলে দাসী-বাঁদির মতো পড়ে থাকো, খাও-দাও, বাসন মাজো।"

আমার মনে পড়ে গেলো, মিসেস্ জেনিংস কিন্তু মোটেই ছেলের নিন্দে করেন না। বরং প্রতি চিঠিতে ছেলে এবং বউমার লম্বা প্রশস্তি থাকে।

দিদিমা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "তোর পকেটে যেন আমার সইয়ের চিঠি?" মিসেস্ জেনিংসের ওপর রাগ কমে গিয়ে এখন দিদিমা ওঁকে সই বলে ডাকেন।

বললাম, "সইয়েরও বাতের অসুখ হয়েছিল, এখন একসাইজ করে ভাল আছেন।"

"ছেলেপুলের খবর কিছু লিখেছে নাকি?" দিদিমা জিজ্ঞেস করেন।

"ছেলের এবং ছেলের বউয়ের প্রশংসা করে লিখেছে, এরা খুউব ভাল, মাকে বেজায় ভালবাসে! বউমাটি খুবই মিষ্টি এবং নরম।"

"কপাল!' দিদিমা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন। "সন্তানভাগ্য কি সবার ভাল হয়," দিদিমা দুঃখ করলেন।

"কেন?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"মেম মাগীরা তো ছেলেদের জন্যে কোনো কষ্টই করে না। শুধু গভ্যে ধরে, কিন্তু বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ায় না, এক ঘরে শুতে দেয় না, রাত্তির জাগে না, কাঁথা কাচে না, তিন বছর বয়সে হলেই নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখিয়ে দেয়। অথচ আমাদের কি যন্ত্রণা! কিন্তু দেখো, মেম মেয়ের কত সুখ, ছেলে এবং ছেলের বৌয়ের প্রশংসা লিখে ফুরোতে পারছে না।"

সুদুর বিদেশে মিসেস্ জেনিংসের সংসারের ছবিটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। মিসেস্ জেনিংসের ছেলে বিয়ের পরও মায়ের বাড়ির কাছাকাছি থাকে। ভদ্রলোক একটা চুল কাটার দোকানের মালিক।

বিরক্ত দিদিমা বললেন, "তুই তো নিজের চোখে এখানকার অবস্থা দেখছিস। এ-বাড়ির লোকজনদের একটু বলে যা, মায়ের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয়।"

আমি বললাম, "সত্যি দিদিমা সব সময় মিসেস্ জেনিংস বলতেন, ববের মতন ছেলে হয় না। আমি ববের জন্যে প্রাউড।"

"তার মানে, এমন ছেলে যে গর্ভধারিণী মা তার জন্যে গর্ব বোধ করে, তাই তো!" দিদিমা নিজের ভাষ্য দিলেন।

আমি বললাম, "বব যখন বাড়িতে আসতো তখন সে এক দেখবার জিনিস। ছুটে এসেই মাকে জড়িয়ে ধরতো, মাকে চুমু খেতো।"

"আহা শুনলেও মনটা জুড়িয়ে যায়," দিদিমা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন।

"আদর করা জড়িয়ে ধরা তো দূরের কথা। কেমন আছো—একবার জিজ্ঞেস করতেই তোর মামার জিভ সরে না।"

আমাক পরবর্তী বিবরণও দিতে হলো। আমি বললাম, "দিদিমা, বব আবার খালি হাতে আসে না। মায়ের জন্য ফুল আনে মাঝে মাঝে। ছেলে এবং বউ দু'জনে একসঙ্গে জিজ্ঞেস করে, মামি ডার্লিং, তুমি কেমন আছো? কোনো কষ্ট হচ্ছে না তো? যদি কিছু করবার থাকে এখনই বলো। কোনো রকম লজ্জা কোরো না।"

"আমাকে না বলে, এসব কথাগুলো তোর মামাকে শোনাগে যা। একাদশীর দিন দায়-সারা গোটা কয়েক ফল হাতে করে ঘরে ঢোকেন। রোজ একবার দায়-সারা জিজ্ঞেস করবেন, গাঁটের ব্যথা কমলো কিনা? ব্যস, ওই পর্যন্ত।"

আমাকে বলতেই হলো, "ছেলের জন্যে মিসেস্ জেনিংস গর্ব বোধ করেন।"

"অমন মিষ্টি ব্যবহার পেলে আমিও গর্ব করতাম," দিদিমা দুঃখ করলেন।

"কিন্তু দিদিমা, সেবারে তুমি যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইলে, তখন তোমার চিকিৎসার জন্যে মামা প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা ধার করলেন। এখনও দেনা শোধ হয় নি। তুমি অসুস্থ হয়ে পড়া পর্যন্ত মামীমা একদিনও বাড়ি থেকে বের হন নি।"

"রাখ রাখ, ওসব লোকলজ্জার ভয়ে। বিনা চিকিৎসায় মা মারা গেলে সমাজে যে মুখ দেখাতে পারবে না, সেই জন্যে।" দিদিমা মুখ বেজার করে জানালেন।

তারপর বিছানায় শুয়ে শুয়ে দিদিমা বললেন, "তুই সইকে লিখে দে যে তিনি অনেক কপাল করে এসেছেন, তাই অমন ছেলে এবং বউ পেয়েছেন।"

সে-কথা যে মিসেস্ জেনিংসও সেবারে স্বীকার করেছিলেন মনে পড়ে গেলো। আমি তখন ওঁর বাড়িতে অতিথি। আমাকে ব্রেকফাস্ট খাওয়াতে খাওয়াতে মিসেস্ জেনিংস্ ববের নানা গুণের তালিকা দিচ্ছিলেন। বব কী রকম স্মার্ট, ব্যবসায়ে কী রকম উন্নতি করেছে, মাকে কত ভালবাসে ইত্যাদি।

ব্রেকফাস্ট শেষ করে, ভ্যানিটি ব্যাগটা হাতে নিয়ে মিসেস্ জেনিংস আয়নায় নিজের মুখটা দেখেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, "আমাকে আধঘণ্টার জন্যে বেরুতে হবে। ববের সেলুনে চুলকাটার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।"

বাড়ি থেকে বেরুবার সময় মিসেস্ জেনিংস বললেন, "বব যে আমার কত

ভাল ছেলে তা তোমাকে কী বলবো! এই যে আমি চুল ছাঁটতে যাচ্ছি, কত যত্ন করে নিজে আমার চুল ছাঁটবে, কত সাবধানে মাসাজ করবে। এবং পুরো দামও নেবে না, আমাকে কুড়ি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দেবে। আজকাল কেউ কুড়ি পার্সেন্ট ছাড়ে? এমন ছেলে ক'টা মেলে?"

কুড়ি পার্সেন্ট ছাড়ের ব্যাপারটা আমার দেহের মধ্যে বিদ্যুতের চাবুক মেরেছিল। মায়ের চুল ছেঁটে পয়সা নেয়—এ কেমন সভ্যতা? কিন্তু মিসেস্ জেনিংসকে বিব্রত করতে সঙ্কোচ বোধ করেছি। দিদিমাকেও ব্যাপারটা বলতে গিয়ে বলতে পারি নি। দিদিমা যখন মিসেস্ জেনিংসের সন্তান সুখের কথা বিশ্বাস করে একটু শান্তি পাচ্ছেন তখন আমি কেন বাদ সাধি?

দ্বিতীয় শৈশব

মার্কিনী সভ্যতার যে দিকটা আমাকে মোটেই মুগ্ধ করতে পারে নি তা হলো বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি বয়োকনিষ্ঠদের মনোভাব। এতো সম্পদ, এতো প্রাচুর্য, এতো প্রেম, এতো দয়া থাকা সত্ত্বেও আমেরিকায় বৃদ্ধরা কেন যে অবহেলিত হন তা আমি আজও বুঝে উঠতে পারি নি। এ সম্পর্কে বেশ কিছু ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে।

কিন্তু তার আগে গিনি মাসীমার কথাটা সেরে ফেলি। গিনি মাসীমার দুই ছেলে এবং দুই মেয়ে। ছেলেরা কৃতি এবং মেয়েদের ভাল ভাল বিয়ে হয়েছে। এঁদের সঙ্গে আমাদের রক্তের সম্পর্ক নেই। মেসোমশাই বীরেন রায় একসময় আমাদের বাড়ির পাশে থাকতেন। তখন থেকেই দুই পরিবারের মধ্যে নিবিড় অন্তরঙ্গতা। সামান্য চাকরি করলেও মেসোমশাই অনেক কষ্ট ও যত্ন করে ছেলেদের মানুষ করেছেন এবং মেয়েদের জন্য সুযোগ্য জামাই যোগাড় করেছেন। বেশ কয়েক বছর আগে আমাদের পাড়া ছেড়ে ওঁরা যতীন বাগচী রোডে উঠে গেলেই আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয় নি। মেসোমশাই ইতিমধ্যে রিটায়ার করেছেন এবং মোটামুটি ভাল স্বাস্থ্য নিয়ে অবসর জীবন উপভোগ করছেন।

গিনি মাসীমা আমাকে দেখেই বললেন, "তুই তাহলে এলি?"

আমি হেসে বললাম, "না এসে উপায় আছে? পোস্টকার্ডে আপনি লিখেছেন, 'এই চিঠি টেলিগ্রাম মনে করিবা!' মা তো আমাকে গত রাত্রেই ঠেলেঠুলে পাঠাচ্ছিলেন। বলছিলেন, গিনিদি যখন টেলি পাঠিয়েছেন, তখন নিশ্চয় খু-উ-ব জরুরী দরকার।"

একগাল হেসে আকারে বিপুলা মায়ের বান্ধবী গিনি মাসীমা বললেন, "অবি আমাকে এখনও ভালবাসে। হাজার হোক সমবয়সী তো—বুড়োবুড়ীদের দুঃখ বোঝে।"

আমি বিব্রত হয়ে মাথা চুলকোতে লাগলাম। "আমি গতকালই আসতাম, কিন্তু একটা নেমন্তন্ন ছিল—সেখানে দেরি হয়ে গেলো। আজ রুজিরোজগারের কাজ শেষ করেই ছুটতে ছুটতে চলে এসেছি।"

আমি এবার নিচু হয়ে গিনি মাসীমার পায়ের ধুলো নিতে গেলাম। প্রায় বলপ্রয়োগ করে পদধূলি সংগ্রহ করতে হলো। কারণ গিনি মাসীমা বাধা দিতে যাচ্ছিলেন। বেশ অভিমানভরা কণ্ঠে গিনি মাসীমা বললেন, "এসব জিনিস দেশ থেকে উঠে যাচ্ছে, বাছা। ঘোর কলিযুগ তো, গুরুজনদের আর কোনো কদর নেই। আমার ছেলেরা তো ও-পাট চুকিয়েই দিয়েছে। সেদিন ছোট খুড়ীমা এলেন, খোকাকে অত করে ইশারায় পায়ের ধুলো নিতে বললাম, কিন্তু শুনলো না। খোকা অবশ্য অফিসে যাবার সময় আমার পায়ের ধুলো নেয়। কিন্তু সে দায়সারা।"

আমি চুপ করে রইলাম। গিনি মাসীমা আঁচলের খুঁটে বিশাল চাবির গোছা সামলে বললেন, "বুড়োমানুষদের এখন কোনো সম্মান নেই, বাবা। নেহাত দুটো ভাত-ডাল না-দিলে ছেলেরা সমাজে মুখ দেখাতে পারবে না, তাই খেতে দেয়। কিন্তু ওই পর্যন্ত।"

ফিসফিস করে গিনি মাসীমা এঁর পুত্রবধূ অর্থাৎ মন্টুর স্ত্রীর প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, "একটা কথা শোনে না। যখন খুশী বাপের বাড়ি যাচ্ছে—যাবার সময় শুধু ধম্ম রক্ষের জন্যে জিজ্ঞেস করবে, মা, একবার বাবাকে দেখে আসবো?"

মাসীমা বিরক্তভাবে, বললেন, 'যাবেই যখন ঠিক করেছো, তখন জিজ্ঞেস করার মানেটা কী? আমরাও তো বউ ছিলাম, আমাদেরও শাশুড়ী ছিল। মন্টুর বয়স যখন ষোলো বছর তখনও পর্যন্ত শাশুড়ীর সঙ্গে ভয়ে কথা বলতে পারতাম না। বছরে একবার বাপের বাড়ি যাওয়া—তাও বাবা নিজে এসে শাশুড়ীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করতেন। এখন হপ্তায় হপ্তায় বাপের বাড়ি না গেলে বউদের ভাত হজম হয় না—কোন্‌টা যে নিজের বাড়ি আর কোন্‌টা বাপের বাড়ি তা বোঝা যায় না।"

আমি চুপ করে গিনি মাসীমার কথা শুনে যাচ্ছি। তিনি দুঃখের সঙ্গে বললেন, "আমরা সেকেলে বুড়ীরা নাকি ছেলে মানুষ করার কিছু জানি না! আরে বাপু তোমার ছেলের বাপকে কে মানুষ করেছিল? আদ্যিকাল থেকে আমরা শুনে এসেছি, ডিম গরম জিনিস—ছোট ছেলেদের খাওয়াতে নেই। কিন্তু বউমা শুনবেন না—ঐ তি বছরের নাতিটাকে রোজ আধকাঁচা ডিম খাওয়াচ্ছেন। তা

তোমার ছেলে, তুমি যা ইচ্ছে করো—কিন্তু ওইটুকু শিশুর পেটে কোনো গোলমাল হলে আমাকে তো চোখের সামনে দেখতে হবে! অসুখ করলেই ছোঁড়াটা ঠাকুমা ছাড়া আর কাউকে চিনতে পারে না।"

"ছেলেকে বলেন না কেন?" আমি জানতে চাই।

গিনি মাসীমা বললেন, "কত কথাই তো বলতাম? কিন্তু এক কান দিয়ে ঢোকে, আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। এখন আর সাহস হয় না, বাবা। কোনদিন হয়তো বলে বসবে, "বউ-এর কথা আগে, না তোমার কথা আগে?"

মেসোমশাই কী বলেন, আমার জানবার আগ্রহ হয়। গিনি মাসীমা বলেন, "উনি তো কেমন ধরনের! মনের সব কথা হজম করে নেবেন। রেগে গেলেও বাড়িতে মুখ খুলবেন না। বিকেল বেলায় লেকের ধারে বেড়াতে যান। সেখানে যত রাজ্যের বুড়োদের সঙ্গে দেড় ঘণ্টা ধরে বকবক করবেন। সেসব কথা আমাকে বলবেন না—ওঁর বন্ধু কেষ্টবাবু কিন্তু ফিরে এসে বউয়ের কাছে সব রিপোর্ট দেন। সেখান থেকে কিছু কিছু আমার কানে আসে। শুনি, উনিও আড্ডাতে বলেন, সমস্ত দেশটাই গোল্লায় যাচ্ছে। গুরুজনদের ভক্তিশ্রদ্ধা করা, খুড়ী-মাসীকে একটু দেখে শুনে আসা—এসব উঠে যাচ্ছে। এখন বউ-এর বাপের বাড়িই সব। যত টান ওই দিকে।"

আঁচলের চাবিটা আর একবার সামলে নিলেন মাসীমা। তারপর বললেন, "কী যুগ পড়লো? তুই আজ পেন্নাম করলি তাই—না হলে পায়ের ধুলো কাকে বলে, ভুলেই যেতে বসেছিলাম!"

এমন সময় মেসোমশাই সান্ধ্যভ্রমণ শেষ করে বাড়ি ফিরলেন। আমাদের কী সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে তা গিনি মাসীমা ইঙ্গিত দিলেন। কিন্তু মেসোমশাই ওসবের মধ্যে বিশেষ ঢুকলেন না। স্ত্রীকে বললেন, "যে-যুগের যে-হাওয়া। আমাদের যুগে বাড়ির কর্তাই ছিলেন কর্তা। এখন তা নয়। এখন আমার অবস্থা ইংলন্ডের রাজার মতো। I reign but I do not rule—আমি রাজত্ব করি কিন্তু শাসন করি না। সব ক্ষমতা এখন সাবালক ছেলে এবং বউমার হাতে। ওরা যা করতে বলবে আমাদের তাই করতে হবে।"

গিনি মাসীমা বললেন, "শুধু ছেলে-মেয়েদের কী দোষ দেবো? গরমেন্টও তাদের আস্কারা দিচ্ছে। আইনকানুন যা হচ্ছে তা মাগ ভাতারদের জন্যে, মা-বাপের জন্যে নয়। স্বামী যদি বউকে না দেখে, তাহলে বউ কোর্টে গিয়ে গলায় গামছা দিয়ে খোরপোশ আদায় করতে পারে—কিন্তু মাকে গামছা পরিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দিলেও মা কোর্টে গিয়ে ছেলের কাছে খোরপোশ দাবি করতে পারবে না। এ কি যুগ এলো রে বাবা! ঘোর কলিকাল, মহাপ্রলয়ের আর দেরি নেই।"

মেসোমশাই কোনো কথা বললেন না। শুধু জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে চা জল-খাবার দেওয়া হয়েছে কিনা। বলতে বলতেই মন্টুর বউ ঘোমটা মাথায় আমার জন্যে চা নিয়ে এলো। বাবাকে জিজ্ঞেস করলো, "আপনার গরম জলটা এখানে পাঠিয়ে দেবো কি?"

মেসোমশাই বললেন, "দাও।"

মাসীমা বললেন, "ডাক্তার বলেছে, বেড়িয়ে এসেই গরম জলের বালতিতে আধ ঘণ্টা পা চুবিয়ে বসে থাকতে।"

বউমা গরম জলের বালতি রেখে গেলেন। গিনি মাসীমা মোড়া থেকে উঠে, নিজের চাবির গোছা সামলে, একবার জলের উষ্ণতা পরীক্ষা করে দেখলেন। তারপর বললেন, "দায়সারা এই জল দেওয়ার মানে কী? শ্বশুরকে জল দিতে পারবো না, বলে দিলেই হয়। এ তো গরমই হয় নি।"

মেসোমশাই এবার গিনি মাসীমাকে সামলাবার চেষ্টা করলেন। "কালকে জলটা বড্ড গরম ছিল বলে আমিই একটু ঠাণ্ডা দিতে বলেছিলাম বউমাকে।"

গিনি মাসীমা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। বললেন, "ফুটন্ত জল, না-হয় বরফ ঠাণ্ডা জল। নিজের ছেলের জল হলে, এইভাবে এগিয়ে দিতে পারতো?"

একটু থেমে গিনি মাসীমা আমাকে বলেছিলেন, "যে-দেশে গুরুজনদের সম্মান নেই, সে-দেশের ওপর ভগবান কখনও সন্তুষ্ট হন না। দেখছিস না আমাদের অবস্থা। ক্রমশ সব কিছু শুকিয়ে যাচ্ছে—অভাব অনটন বাড়ছে।"

লক্ষ্মীর কৃপাধন্য মার্কিন মুলুক ভ্রমণের মধ্যপর্যায়ে গিনি মাসীমার কথাগুলো মনে পড়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে শিকাগোর মিস্টার রয়েডের বাড়িতে।

মিস্টার রয়েডের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন মিস্টার অলিভার। মিস্টার রয়েডের এক পার্টিতে আমি নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। নির্ধারিত সময়ের একটু আগেই আমি ওঁর বাড়িতে হাজির হয়েছিলাম—মিস্টার অলিভার তখনও পৌঁছন নি। ওঁর কাছেই আগে শুনেছিলাম মিস্টার রয়েডের দুই ছেলে। বড়টির বয়স উনিশ এবং ছোটটি পনেরো। ককটেল পার্টিতে আরও কয়েকজন অতিথি এসে পড়েছেন। মিস্টার রয়েডের বড় ছেলেকে দেখতে পেলাম না, কিন্তু ছোটছেলে টমাসের সঙ্গে বেশ আলাপ হয়ে গেলো। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার দাদা কোথায়?"

ক্ষমা প্রার্থনা করে বললো, "আপনার সঙ্গে পরিচয় করার খুব ইচ্ছে ছিল জিম-এর। কিন্তু হঠাৎ বার্কলে থেকে ওর এক কলেজ-বান্ধবী হাজির হয়েছে! তাই তাকে নিয়ে বেরিয়েছে জিম।"

টমাস আমার সঙ্গে বেশ ভদ্র ব্যবহার করেছে। তার কথাবার্তা বেশ নম্র। মিস্টার অলিভার একটু দেরিতে পার্টিতে এলেন। প্রায় ষাটের কাছে বয়স

ভদ্রলোকের। ওর সঙ্গে কয়েকদিন ধরেই এ-দেশের বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে বয়োকনিষ্ঠদের সম্পর্ক সম্বন্ধে আমার আলোচনা হয়েছে। মিস্টার অলিভার দেখলুম হল্-এর কোণে টমাসের সঙ্গে কথা বলছেন। আমি তখন মিস্টার রয়েডের সঙ্গে গল্পগুজব করছি।

একটু পরে মিস্টার অলিভার আমার কাছে এলেন। ওঁর মুখের অবস্থা দেখেই বুঝলাম গুরুতর কিছু একটা ঘটেছে। বেশ রেগে রয়েছেন। আমাকে এক ধারে নিয়ে বললেন, "অসহ্য, এ দেশের ইয়ংমেনদের দিকে তাকাতে পর্যন্ত আমার আজকাল ঘেন্না হয়। আমার যদি সামর্থ্য থাকতো, তা হলে ছোঁড়াগুলোকে চাবকে সোজা করতাম।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "কী হলো?"

মিস্টার অলিভার বললেন, "তুমি বিদেশী। দু'দিনের জন্যে এদেশে এসছো, তোমাকে হয়তো এসব বলা উচিত নয়। কিন্তু তুমি এদেশের বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্বন্ধে আগ্রহী—তোমার কাছে এসব খবর চেপে রাখাটা আমার পক্ষে অন্যায় হবে।"

মিস্টার অলিভার এবার আঙুল দিয়ে টমাসকে দেখিয়ে দিলেন। বললেন, ঐ যে চ্যাংড়া ছেলেটা দেখছো, ওর নাম টমাস। মিস্টার রয়েডের ছোটছেলে। ওকে কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম, তোমার বড় ভাই জিম কোথায়? এখন ওই ছোকরার অসভ্যতা এবং বর্বরতার কথা ভাবলে আমার সমস্ত দেহ জ্বলছে। তুমি শুনলে কানে আঙুল দেবে—তুমি ভাববে এই দেশটা এখনও ট্রাইবাল যুগে পড়ে রয়েছে।"

একটু থেমে মিস্টার অলিভার বললেন, "দাদা কোথায় এর উত্তরে ছোকরা আমাকে বেমালুম বললে, "জিম একটা পছন্দমতো ছুঁড়ী পেয়েছে, তাকে পটিয়ে-পাটিয়ে কোথাও শুইয়ে মনের খুশীতে...জন্যে বাইরে নিয়ে গেছে।' এবং তুমি বিশ্বাস করবে না, চার অক্ষরের সেই পৃথিবীবিখ্যাত কুশ্রী নোংরা ইংরাজী কথাটা ছোকরা বেমালুম ব্যবহার করলো।"

আমি অবাক। মিস্টার অলিভার বললেন, "আমাকে কেন ওইভাবে বললো তা আমি জানি। কারণ আমি বুড়ো হয়ে গেছি—এবং বুড়োদের ওরা মানুষের মধ্যে মনে করে না। গোরু ঘোড়ার কাছে যেমন আমাদের সামাজিক এবং দৈহিক লজ্জা নেই, তেমনি বুড়োদের ওরা থোড়াই তোয়াক্কা করে।"

মিস্টার অলিভারকে আমি বলতে সাহস করলাম না, এই একই প্রশ্নের উত্তরে টমাস আমাকে স্বাভাবিক সুসভ্য উত্তর দিয়েছে। ভাবলাম, আমি বিদেশী বলেই হয়তো টমাসের হাত থেকে বেঁচে গেছি—কিংবা এমনও হতে পারে যে আমি এখনও বুড়ো হইনি বলেই সামাজিক সৌজন্য পেলাম।

ওই পার্টিতে বসেই গিনি মাসীমা এবং মেসোমশায়ের কথা মনে পড়ে গেলো। এই গল্প তারা কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না। ভাববেন, এটাও এক ধরনের সাহিত্যিক পাগলামী।

গিনি মাসীমার কথায় আবার ফিরে আসা যাক। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার চিঠি পেয়েই ছুটে এসেছি। কিছু কাজকর্ম আছে নাকি?"

গিনি মাসীমা এবার স্বামীকে বললেন, "তুমিই বলো। তোমার কথা মতোই তো অবির বড় ছেলেকে চিঠি লিখলুম।"

বীরেন মেসোমশাই বললেন, "শুনলাম, তুমি ফরেন যাচ্ছো? যদি পারো একবার আমার পুরনো সায়েবের সঙ্গে দেখা করে এসো।"

মেসোমশাই সমস্ত খবরাখবর দিলেন। একটা চিঠিও আমার হাতে দিলেন।

কোনো সায়েবের নাম যে কনেমারা হতে পারে তা আমার জানা ছিল না। শিয়াল-মারা, বাঘ-মারা এই সব বাংলা কথাই এই পর্যন্ত শুনে এসেছি। মেসোমশাই বললেন, "কেন, তুমি ম্যাকনামারার নাম শোনো নি? তিনিও তো যুদ্ধের সময় কলকাতার কাছে খড়গপুরে থাকতেন।"

মেসোমশাই জানালেন, "কনেমারা সায়েবও যুদ্ধের সময় ইন্ডিয়াতে এসেছিলেন আমেরিকান আর্মির সঙ্গে।"

"বড্ড অসভ্য ছিল এই আমেরিকান সোলজারগুলো," আমি বললাম। "মাতলামী করতো, যেখানে-সেখানে ঢুকে পড়তো, বেপরোয়া ট্রাক চালাতো—কত লোককে যে গাড়ি চাপা দিয়েছিল তার ঠিক নেই।"

মেসোমশাই বললেন, "মেজর কনেমারা ছিলেন ঠিক তার উল্টো। ওঁর আন্ডারে আমি তো বছরখানেক চাকরি করেছি—একেবারে দেবতুল্য মানুষ। আমাদের মন্দির-টন্দির সম্বন্ধে খুব আগ্রহ ছিল। সময় পেলেই ছবি-টবি তুলতেন। ড্রিংক করতেন, তবে ওষুধের ডোজে কখনও মাতলামো করতে দেখি নি। আর অসাধারণ পবিত্র চরিত্র। মেয়েমানুষদের সম্বন্ধে একদম আগ্রহ ছিল না। সপ্তাহে তিনখানা করে চিঠি লিখতেন মিসেস্ কনেমারার কাছে। ঠিক তিনখানা করে উত্তর আসতে। আমি নিজে জানি। কারণ আমি ছিলাম সায়েবের পি এ। চিঠিপত্র সব আমার আসতো।"

একটু থেমে মেসোমশাই বললেন, "বড্ড ভাল লোক ছিলেন। ইন্ডিয়ানদের চাকর মনে করতেন না। যুদ্ধের চাকরি যে আমার চিরকাল থাকবে না তা সায়েব বুঝিয়েছিলেন। তাই কলকাতা ছেড়ে চলে যাবার আগে মেজর কনেমারা আমাকে ন্যাশনাল কোম্পানির এক সায়েবদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে গেলেন। বললেন, "বাইরেন ইজ লাইক মাই ফ্রেন্ড। বিপদে পড়লে ওকে একটু দেখো।" ন্যাশনাল কোম্পানির সায়েব কিন্তু বন্ধুর অনুরোধ মনে রেখেছিলেন—কনেমারা

সায়েবের সুপারিশেই দু' বছর পরে আমাকে চাকরী দিলেন। তাই ছেলেপুলে মানুষ হলো—ঘরসংসার চললো।"

এই কোম্পানি থেকেই মেসোমশাই রিটায়ার করেছেন।

কনেমারা সায়েব প্রতি বছরে বড়দিনের সময় মেসোমশাইকে একটা কার্ড ও সেই সঙ্গে কয়েক লাইন চিঠি পাঠিয়ে যাচ্ছেন। এতো বছরের প্রত্যেকটি কার্ড মেসোমশাই সযত্নে ফাইল করে রেখেছেন। মেসোমশাই বললেন, "যদি সময় পাও ওঁর সঙ্গে একবার দেখা কোরো। আমার কথা শুনলে খুব খুশী হবেন।"

আমেরিকার মাটিতে পা দিয়েই তাই কনেমারা সায়েবকে পত্রাঘাত করেছি। এবং ইউরোপ-আমেরিকার অধিবাসীদের যা প্রধান গুণ, এক সপ্তাহের মধ্যে উত্তর পেয়েছি। এক এক সময় আমার মনে হয়, মার্কিনীদের মতো গুছিয়ে অথচ মন খুলে চিঠি লিখতে পৃথিবীর আর কোনো জাত পারে না। ওঁদের চিঠিতে আন্তরিকতা থাকে—এবং সময়ের প্রচণ্ড অভাব সত্ত্বেও লম্বা লম্বা চিঠি লিখতে তাঁরা মোটেই কার্পণ্য করেন না। আমাদের দেশে কেউ কেউ সহজ সরল অন্তরঙ্গ চিঠি লিখতে জানেন, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। চিঠি লেখার আর্ট আমাদের ইস্কুলে শেখানো উচিত। বহু লোকের চিঠিতেই তাঁদের ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হয় না—কোথায় যেন সঙ্কোচ ও দূরত্ব থেকে যায়। এদেশের বিখ্যাত লোকদের চিঠির কথা নাই বা তুললাম। এগুলো চিঠি না গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ তা বোঝা দায়! পরবর্তী কালে অপ্রকাশিত পত্রাবলীর আকারে বাজারে বিক্রি হবে এই মনে করেই যেন বিখ্যাত লোকেরা চিঠি লিখতে বসেন—তার ফলে ব্যক্তিগত চিঠি পড়ার প্রধান মজা এবং উত্তেজনা কিছুই পাওয়া যায় না।

এ সম্বন্ধে গিনি মাসীমা এবং মেসোমশায়ের সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল। পাইকারী হারে চিঠি লেখবার একটা প্রধান সময় আমাদের বিজয়া দশমী এবং ওদের বড়দিন। মেসোমশাই বলেছিলেন, "আমাদের বিজয়া দশমীর চিঠির মধ্যে যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শনের উদ্বেগটাই প্রধান—তাই চিঠিগুলো সব সময় জীবন্ত হয়ে ওঠে না। অথচ ওঁদের ক্রিস্টমাসের দু'চার ছত্রের মধ্যে একটা প্রাণের স্পন্দন থাকে।"

মেসোমশাই এই প্রসঙ্গে একটা মজার কথা বলেছিলেন। শিক্ষিত বাঙালীকে বাল্যকালেই ইংরিজী চিঠি লেখা অভ্যাস করতে হয়—এবং সারাজীবন আপিসে চিঠি নামক এক ধরনের ব্যবসায়িক দলিলের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ রাখতে হয়। তাই চিঠি লেখার প্রধান মজা থেকে আমরা নিজেতে অজ্ঞাতেই বঞ্চিত হয়ে পড়ি।

মেসোমশাইয়ের পুত্র মণ্টু অবশ্য আর একটা কারণ দেখিয়েছিল। সেটা মেসেমশাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করতে পারি নি। মণ্টু বলেছিল "চিঠি লেখার

প্রতিভা সবচেয়ে বিকশিত হয় প্রেমে পড়লে। প্রেমপত্র তাই সবদেশে এতো আদরের। যে ভাল চিঠি লিখতে জানে না, সে প্রেমের প্রথম রাউন্ডেই হেরে ভূত হবে—কোনোদিন ফাইনালে উঠে শীল্ড জিততে পারবে না। আমাদের দেশে এতোদিন শুধু সম্বন্ধ করে বিয়ে হয়েছে—পাত্র ও পাত্রী পক্ষের বাবা-মা'রা দলিল দস্তা-বেজের মতো বিবাহসংক্রান্ত চিঠি লিখেছেন, নায়ক-নায়িকাদের সেখানে কোনো ভূমিকা নেই। তাই পত্রসাহিত্য এদেশে বিকশিত হয় নি।"

মার্কিন মুলুকে এসে দেখলুম, টেলিফোনে এবং টেপরেকর্ডারের অত্যাচারে চিঠি লেখার আর্ট একটু অসুবিধেয় পড়েছে—কিন্তু মরা হাতী এখনও লাখ টাকা! মিসেস্ রয়েড (যাঁর বাড়িতে একরাত কাটিয়েছিলুম) বললেন, "ছেলেমেয়েদের ব্যবহারে খুব বিরক্ত হলে আমি মুখোমুখি কথা বলি না—রাগের মাথায় মুখ দিয়ে কি বেরিয়ে যাবে কে জানে। তার বদলে আমি গুছিয়ে চিঠি লিখে ফেলি। এবং সেই চিঠি খামে পুরে ছেলে অথবা মেয়ের ঘরে রেখে আসি।

মিসেস্ রয়েড একটা চিঠি আমাকে দেখিয়েছিলেন। পনেরো বছরের জিনকে মা লিখছেন, "আজ সকালে আমাদের বিদেশী অতিথির সামনে তুমি যেভাবে ব্যবহার করছো, তাতে আমি এবং তোমার বাবা ব্যথিত হয়েছি। তোমার জানা উচিত, আমাদের এই সমাজে অন্যের সামনে দাঁত দিয়ে নিজের নখ কাটা, আঙুল দিয়ে নাক খোঁটা মোটেই শোভন বলে বিবেচিত হয় না। তাছাড়া তুমি আমাদের সামনেই টেবিলে আঙুল দিয়ে ড্রাম বাজাচ্ছিলে এবং তোমার দিকে আমরা বার বার ইঙ্গিত করা সত্ত্বেও ইচ্ছে করে মেঝেতে জুতো ঘষছিলে। তোমার নিজের ঘরের অবস্থা এমন করে রেখেছো যে ওখানে আগুন লাগলে দমকলের লোকেরাও দুর্গন্ধে ঢুকতে পারবে না। এই অবস্থায় তোমাকে আমার মনের দুঃখ জানিয়ে চিঠি লিখছি—কারণ তুমি আমার আদরের ছেলে। সবাই তোমার প্রশংসা করুক, তুমি তাদের ভালবাসার পাত্র হয়ে ওঠো, এই আমার কামনা. এ-বিষয়ে তোমার বক্তব্য চিঠি লিখে জানিও। তোমার চিঠির প্রত্যাশায় রইলাম—ইতি মা।"

মিস্টার কনেমারা আমাকে লিখেছিলেন যে চিঠি পেয়ে তিনি খুব খুশী হয়েছেন। এবং কবে কোথায় দেখা হবে জানালে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবেন।

সীয়াট্‌ল শহরে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনযাত্রা দেখতে যাবার একটা সুযোগ এসেছিল। সেখান থেকে মিস্টার কনেমারার বাড়ি খুব কাছে। মাত্র শ'দেড়েক মাইলের দূরত্বটা ওদেশে কেউ দূরত্বই মনে করে না। ভ্যানস্ মোটর হোটেল থেকে মিস্টার কনেমারাকে টেলিফোন করেছিলাম। টেলিফোনেই

পথের ঠিকানা দিয়ে দিলেন মিস্টার কনেমারা। বললেন, 'বাসে সোজা আমাদের গ্রামে চলে আসবে। আমার শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে গাড়ি নিয়ে বাস-স্ট্যান্ডে হাজির থাকবো। না-হলে তোমাকেই কোনো ব্যবস্থা করতে হবে।'

বাস-স্ট্যান্ডে মিস্টার কনেমারা উপস্থিত থাকতে পারেন নি। তার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। বললেন, "গাড়ি নিয়ে বেরুবো ভাবছিলাম। কিন্তু ফোনে খবর নিয়ে জানলাম, তোমার বাস প্রায় আধঘণ্টা দেরিতে স্টার্ট করেছে। তাই আন্দাজ করলাম, রাস্তার আলো কমে যেতে পারে। অন্ধকারে আমি কিছুই দেখতে পাই না।"

আমাকে লিভিংরুমে বসিয়ে মিসেস্ কনেমারা বললেন, "এখানে গাড়ির মালিক হওয়াটা কিছুই নয়। কিন্তু মুশকিল হলো এই ড্রাইভিং। গাড়ি থেকেও আমরা খোঁড়া হয়ে যাচ্ছি। আমার চোখে ছানি পড়ছে—গাড়ি চালানোর কথাই ওঠে না। আর আমার স্বামীটি রাতকানা। সেবার তো এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ি ফিরতে পারলেন না। এক বন্ধুকে তুলে দিতে গিয়েছিলেন। গাড়ি-সমেত এক হোটেল উঠলেন, সেখান থেকে আমাকে ফোন করলেন।"

মিস্টার কনেমারা বললেন, "জুডিথকে আমি ইন্ডিয়ার কথা বলছিলাম। সেখানে কেউ-ই বিশ্বাসই করবে না, কোনো ভদ্রলোক শুধু এই কারণেই রাস্তায় আটকা পড়লেন।"

মিসেস্ জুডিথ কনেমারা বললেন, "আমার তো ভয় হচ্ছে আজকাল। আমাদের অবস্থা শেষ পর্যন্ত পাশের বাড়ির মিসেস্ ক্যাম্পবেলের মতো না হয়। চার্চের একজন সমাজসেবক সপ্তাহে একদিন আসেন—ওঁকে দোকানে নিয়ে যান। তারপর এক সপ্তাহ আবার খোঁজখবর থাকে না! ওঁর বয়স বিরাশি বছর।"

মিস্টার কনেমারা বললেন, "আমার বন্ধুটি কতদূর থেকে এসেছেন, ওঁর সঙ্গে আমার সেকেন্ড হোম ইন্ডিয়া সম্পর্কে কথা হোক।"

মিসেস্ কনেমারা স্বামীকে মুখ ঝামটা দিলেন। "খুব তো সেকেন্ড হোম বলছো—অথচ আমাকে একবারও ভারতবর্ষে নিয়ে গেলে না।"

মিস্টার কনেমারা আমাকে বললেন, "জানো, আমার কাছ থেকে শুনে শুনে জুডিথের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে খুব কৌতূহল! ওকে নিয়ে একবার সেন্টিমেন্টাল জার্নি সেরে আসবো ভেবেছিলাম। কিন্তু যাবো যাবো করতে করতেই একশ বছরের সিকিভাগ কেটে গেলো। হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, আমরা বুড়ো হয়ে গেছি। এখন আর জমানো টাকা খরচ করতে সাহস হয় না।"

মিসেস্ কনেমারা বললেন, "বুড়ো বয়সের যন্ত্রণা কী জানো? একা একা চলাফেরার স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে যায়—কারুর ওপর নির্ভর করতে হলে আমেরিকানদের বড় দুঃখ লাগে।"

আমি বললাম, "অনেকেই তো একদিন আপনার ওপর নির্ভর করেছে—এখন যদি আপনাকে কিছুটা অন্যের ওপর নির্ভর করতে হয়, দোষটা কী।"

মিসেস্ কনেমারা হাসলেন। বললেন, আমাদের দেশে পরনির্ভরতা অপমানের। আমরা সবাই নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চাই—এইটাই আমাদের চরিত্র।"

মিস্টার কনেমারা ঘরের কোণে একটা ছবির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। প্রসাধনরতা সেই বঙ্গসুন্দরীর পরিচিত ছবিটা অবিলম্বে যামিনী রায়ের কথা মনে করিয়ে দিলো। মিস্টার কনেমারা বললেন, "বাইরেনকে সঙ্গে নিয়ে অনেক খুঁজে খুঁজে তোমাদের যামিনী রায়ের বাড়িতে গিয়েছিলাম। ভদ্রলোককে খুব ভাল লেগেছিল আমার। পশ্চিমের বন্ধন থেকে আমি মুক্তি খুঁজছিলাম—ইওর যামিনী রে আমাকে আশার আলো দেখালেন। ছবিটা কিনে নিলাম। সেই থেকে আমার সঙ্গেই ঘুরছে ছবিটা। অকুপায়েড জার্মানিতে ছিলাম কিছুদিন—সেখানেও ছবিটা নিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর মিলিটারি ছেড়ে সিভিলিয়ান জীবনে ফিরে এসে নিউইয়র্ক থেকে লস্ এঞ্জেলেস পর্যন্ত অন্তত দশ জায়গায় বাড়িভাড়া করে থেকেছি—কিন্তু এই বেঙ্গল বিউটিকে আমি চোখের আড়াল হতে দিই নি।"

মিসেস্ কনেমারা বললেন, "আমি তো একবার ভেবেছিলাম, আমার স্বামীর ভালবাসা কেড়ে নেবার জন্যে তোমাদের মিস্টার যামিনী রে-কে উকিলের পাঠাবো। যে মডেল দেখে তোমাদের মিস্টার রে এই ছবি এঁকেছেন, তার সঙ্গে আমার স্বামীর দেখা হলে যে কী কাণ্ড হতো ভাবলে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।"

আমি বললাম, "আমার মেসোমশায়ের কাছে শুনেছি মেজর কনেমারার মতো সাত্ত্বিক সচ্চরিত্র লোক আমেরিকান আর্মিতে বেশী ছিল না।"

মিস্টার কনেমারা মৃদু হেসে স্ত্রীকে বললেন, "শুনলে তো?"

মিসেস্ কনেমারা বললেন, "তার একমাত্র কারণ, মনের মতো মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয় নি। মিস্টার যামিনী রে-র ওই মডেলকে পেলে উনি আমাকে ভুলে যেতেন।"

মিস্টার কনেমারা বললেন, "এই ছবিটার দিকে তাকালেই আমার ইন্ডিয়ার কথা মনে পড়ে যায়। ব্যান্ডেল থেকে কলকাতা পর্যন্ত সমস্ত রাস্তাটা এখনও আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। নিয়ার ব্যান্ডেল একটা সুন্দর টেরাকোটা মন্দির ছিল"—নামটা মনে করার চেষ্টা করলেন মিস্টার কনেমারা। স্মৃতিশক্তি এখনও হারিয়ে যায় নি তার প্রমাণ পাওয়া গেলো—বললেন, "হনসেসোয়ারি"!

স্মৃতির অতলে ডুব দিয়ে মিস্টার কনেমারা বললেন, "বিটুইন কন্‌নগর অ্যান্ড

ভড়্ডর কালী নদীর পশ্চিম দিকে একটা সিরিজ অফ টেম্পল ছিল—ওখানেই গাড়ি থামিয়ে আমি ছবি তুলতাম, চা খেতাম। সে ছবি তোমাকে দেখাবো—আমার অ্যালবামে আছে।”

প্রবল উৎসাহে মিস্টার কনেমারা ভিতরে চলে গেলেন। মেসোমশায়ের একটা ছবি নিয়ে ফিরে এলেন। পঁচিশ বছর আগেকার মেসোমশায়ের ছবি দেখে আমার বেশ ভালো লাগলো। মেসোমশায়ের তখন বিরাট গোঁফ ছিল। মেসোমশায়ের হাল আমলের একটা ছবি ছিল আমার সঙ্গে, সেইটা ওঁর হাতে দিলাম। ছবিটা অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন মিস্টার কনেমারা। বললেন, “নিষ্ঠুর সময়! মাত্র পঁচিশটা বছর বাইরেনকে কোথায় এনে ফেলেছে দেখো। বাইরেন এখন সত্যিই আমার মতো ওল্ড ম্যান। শুধু দেওয়ালে টাঙানো ওই বেঙ্গল বিউটির বয়স বাড়লো না!”

আমি বললাম, “আমাদের সাহিত্যে বলে, মানুষ বৃদ্ধ না হলে সুন্দর হয় না। সুপরিপক্ক ফলের সঙ্গে বার্ধক্যের তুলনা করা হয়।”

মিসেস্ কনেমারা ভাবলেন আমি রসিকতা করছি। আর মিস্টার কনেমারা বললেন, “তোমাদের দেশ এবং এই দেশের সভ্যতার অনেক তফাত। বার্ধক্যকে এখানে শীতের সঙ্গে তুলনা করা হয়। জরাকে সবাই ভয় পায়!”

বয়সের ভারে মিস্টার কনেমারার দীর্ঘ দেহ ঈষৎ ঝুঁকে পড়েছে। যৌবনকালে এই দেহ কী পরিমাণ ঐশ্বর্যশালী ছিল তা সহজেই আন্দাজ করে নেওয়া যায়। মিস্টার কনেমারা জানালেন, তাঁর এখন সত্তর বছর বয়স। গৃহিণীও সমবয়সী। তারপর হেসে বললেন, “গত পঞ্চাশ বছর ধরে নিজেকে কুড়ি বছরের ছোকরা বলে ভেবেছি। এখন বুঝছি, এই অন্যায় দাবি ছেড়ে দেবার সময় এসেছে।”

মিস্টার ও মিসেস্ কনেমারা কিছুতেই ছাড়লেন না। বললেন, “আজ রাতটা এখানে থেকে যাও। কাল লাঞ্চের পর হোটেলে ফিরবে।”

আমি না বলতে পারলাম না। শুনলাম, এঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়ে থাকে তেহেরানে—স্বামী কোন এক তেল কোম্পানিতে কাজ করেন। বড়ছেলে সীয়াট্‌লে ছেলেপুলে নিয়ে ঘর-সংসার করেছে। মেজ রয়েছে ফ্লোরিডায়। ফ্লোরিডার জল-হাওয়া এমন যে বৃদ্ধদের কষ্ট কম হয়। অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ওখানে অবসর জীবন কাটাতে যান শুনেছি। একবার ভাবলাম জিজ্ঞেস করি, ওখানেই থাকেন না কেন? কিন্তু সাহস হলো না। যে-প্রশ্নে সহজে স্বদেশে করা যায়, এখানে তাই বাবা-মাকে বিব্রত করতে পারে।

আমরা তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলাম। খুবই সাধারণ খাবার। মিস্টার কনেমারা বললেন, “দু'বছর আগেও তুমি যদি আসতে আমার স্ত্রী তোমাকে ইন্ডিয়ান রাইসকারি রেঁধে খাওয়াতেন। ওঁর রান্নার শখ ছিল

খুব—দেশবিদেশের রান্না শিখিয়েছিলেন। কিন্তু এখন আর চোখে দেখতে পান না। কোনোরকমে কয়েকটা টিন গরম করে দেন। তাও হাত কাঁপে। আমি এখন রান্না শিখবো ভাবছি, যদি ওঁকে একটু সাহায্য করতে পারি।"

খাওয়া-দাওয়ার শেষে আমিই বললাম, "ডিসগুলো ধুয়ে দিই।" খুব দুঃখের সঙ্গে অনুমতি দিলেন ওঁরা। বললেন, "তোমাদের দেশে ব্যাপারটা যে কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না, তা আমি জানি। কিন্তু আমাদের যা মুশকিল—সংসারের কাজকর্ম করার লোক পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও এতো দাম যে আমাদের মতো বৃদ্ধদের পক্ষে তাদের রাখা সম্ভব নয়।"

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে মিসেস্ কনেমারা বললেন, "অন্য অনেকের থেকে আমরা ভাগ্যবান। বড় ছেলে ব্রায়ান আমাদের বলেছিল সিয়াট্‌লে ওদের বাড়ির পাশেই একটা বাড়ি নিয়ে থাকতে। এদেশে যারা বাবা-মাকে এখনও ভালবাসে, তারা এই ব্যবস্থাই করে। এক সংসারে তো থাকা সম্ভব নয়, তাই প্রতিবেশী হিসেবে রাখে।"

আমি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, তাই করলেন না কেন? তাহলে অন্তত কাছাকাছি থাকতে পারতেন। কিন্তু মিস্টার কনেমারা বললেন, "আমরা দুজনে অনেক ভেবে দেখলাম, ব্রায়ান আমাদের পাশের বাড়িতে থাকতে বলেছে, সেটা ওর মহত্ত্ব—কিন্তু আমাদের পক্ষে তা গ্রহণ করা উচিত হবে না। কারণ ব্রায়ানের কমবয়সী তিনটে ছেলেমেয়ে রয়েছে। আজকাল অনেক ইয়ং মাদার পছন্দ করে না, ছেলেমেয়েরা দাদু-দিদিমার সঙ্গে খুব মেশামেশি করুক।"

আমি তো তাজ্জব। বললুম, "বীরেনবাবুর নাতি তো সবসময় দাদু-দিদিমার কাছে থাকে। এমনকি রাত্রে ঘুমোয় এক বিছানায়!"

কনেমারা দম্পতি নিজেদের মধ্যে সবিস্ময় দৃষ্টি বিনিময় করলেন। তারপর বললেন, "ব্রায়ানের স্ত্রী আপত্তি না করলেও তার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন এবং অফিসের লোকরা কী বলবে? ছোট ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিত্ব এতে নাকি একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।"

ভীষণ রাগ হচ্ছিল আমার। মেসোমশাই, মাসীমা, মন্টু এবং তার স্ত্রী এই সব কথা শুনলে কী ভাববে, আমি আন্দাজ করবার চেষ্টা করছিলাম। কত ভাগ্য করলে ছেলেমেয়েরা দাদমশাই দিদিমার কোলেপিঠে চড়ে মানুষ হতে পারে। মিস্টার কনেমারা বললেন, "তুমি তো সাহিত্যিক? এর মধ্যে সাহিত্য এবং সাইকোলজির ব্যাপার এসে পড়ে বাপ-মায়ের ভয়টা বাড়িয়ে দিয়েছে।"

"কী রকম?" আমি জানতে আগ্রহ প্রকাশ করি।

একটা সিগারেট ধরিয়ে মিস্টার কনেমারা বললেন, "আজকাল অনেক নাটক-নভেলে দেখবে—কিশোরী মেয়ে কোনো বিগতযৌবন বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষের

প্রেমে পড়েছে। কিশোরীদের এই বৃদ্ধদের প্রতি আকর্ষণের মনস্তাত্ত্বিক নাম জেরেন্টোফিলিয়া। অনেকের ধারণা এর পিছনে মেয়েদের অবচেতন মনে গ্রান্ডফাদার ফিকসেসন থাকে। কবে কখনও দাদামশাই সম্বন্ধে ভালবাসা ছিল সেইটাই নাকি মনের গহনে চলে যায়, তার থেকেই এই জেরেন্টোফিলিয়ার উৎপত্তি।”

রাগে ও বিরক্তিতে আমি চুপ করে রইলাম। মিস্টার কনেমারা বললেন, “হয়তো দশ লাখে একটি মেয়ের এমন হয়েছে—কিন্তু আমাদের ভয় লাগে। আমার ছেলে এবং তার বউকে অহেতুক অস্বস্তিতে ফেলাটা আমাদের পক্ষে উচিত হবে না!”

আমার মনে কিন্তু অন্য ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ এখনও এই স্তরে নেমে আসে নি। কোনো একটা ইংরিজী বইতে পড়েছিলাম, দাদু সংসারের বোঝা হয়ে ছেলের সংসারে রয়েছে বলে নাকি নাতিনীরা বিরক্তিবোধ করছে। কারণ দাদুর জন্যে তারা কিছু কিছু সুখ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সেই বিখ্যাত স্প্যানিশ চলচ্চিত্র ‘এল কোচেসিটে’র গল্প মনে পড়ে গেলো—যেখানে একটি মেয়ে অধৈর্য হয়ে তার ঠাকুরদার মৃত্যুকামনা করছে। তার কারণ, তবেই সে ঠাকুরদার শোবার ঘরটা দখল করতে পারবে।

মিস্টার কনেমারা জিজ্ঞেস করলেন, “হিরেন এখন কোথায় আছে?”

ছেলেদের সঙ্গে আছে শুনে একটু অবাক হলেন। বললেন, “তোমাদের দেশে এখনও জয়েন্ট ফ্যামিলি তাহলে রয়েছে। এই যে কাগজে পড়ি, তোমরাও জয়েন্ট ফ্যামিলি ভেঙে দিয়েছো।”

বললাম, “অনেক ভাই একত্রে থাকার সিস্টেমটা অনেকখানি পাল্টাচ্ছে। কিন্তু বাবা-মাকে সংসারের বাইরে ঠেলে দেওয়ার রেওয়াজ এখনও শুরু হয় নি। হবে বলেও মনে হয় না। তবে মধ্যবিত্ত সংসারে অভাব অনটন আছে—খাবারের অভাব, ঘরের অবাব। তাই ছোটখাটো খিটিমিটি সব সময় লেগে থাকে—দু’পক্ষই ভাবে অন্যপক্ষ সুবিচার করছে না।”

মিস্টার কনেমারা খুব খুশী হলেন। বললেন, ‘খিটিমিটি কোথায় নেই? স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও তো ঝগড়া-ঝাঁটি লেগে থাকে। যারা খুব বেশী প্রেমে গদ্‌গদ্ হয়, দিনরাত হনি হনি বলে জড়াজড়ি করে, তাদের বিয়েটাই আগে ভাঙে।”

মিসেস্ কনেমারা বিছানায় শুতে গেলেন। কিন্তু মিস্টার কনেমারা বললেন, “তোমার যদি কষ্ট না হয়, তাহলে এসো দুজনে গল্প করি। ইন্ডিয়াতে তো আর কোনোদিন যাওয়া সম্ভব হবে না। এখানেও কোনো ইন্ডিয়ান আসে না। হয়তো তুমিই আমার জীবনে শেষ ইন্ডিয়ান।”

আমার কোনো আপত্তি নেই। মার্কিন দেশের মূল ভূখণ্ডে আমার সময়

ফুরিয়ে এসেছে। আগামীকাল আমি প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের দিকে রওনা দেবো। বিচিত্র অভিজ্ঞতার পর যাবার সময় হলো বিহঙ্গের।

যামিনী রায়ের পটে আঁকা সেই রহস্যময়ী সুন্দরীকে সাক্ষী রেখে সেদিন মিস্টার কনেমারা ও আমার মধ্যে অনেক কথা হয়েছিল। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে মিস্টার কনেমারা বললেন, "আমাদের দেশের লোকদের যদি কোনোদিন শুভবুদ্ধি হয়, তাহলে তারা ভারতবর্ষের সমাজজীবনে সম্বন্ধে জানবার চেষ্টা করবে। তোমাদের ওখান থেকে এদেশের অনেক কিছু শেখবার আছে।"

আমি বললাম, "ভারতবর্ষের আধুনিক শিক্ষিতরা কিন্তু সে-কথা বিশ্বাস করে না।"

মিস্টার কনেমারা হেসে উত্তর দিলেন, "তোমাদের রক্তের মধ্যে হাজার হাজার বছরের ধারাবাহিকতা রয়েছে—সুতরাং দু-চারজন অবিশ্বাস করলে কিছু এসে যাবে না।"

মিস্টার কনেমারা বললেন, "অন্য অনেক আমেরিকানদের থেকে আমরা দুজন ভাগ্যবান। কারণ আমাদের ছেলে দু-সপ্তাহে অন্তর একবার টেলিফোনে খবরাখবর নেয়। টেলিফোনে খবর দিলে উইক-এন্ডে হাজির হবে। আমরা অবশ্য তা চাই না—কারণ আফটার অল সারা সপ্তাহ ধরে ছেলেকে অফিসে পরিশ্রম করতে হয়, তারপর শনি-রবিবারে একটু হৈ চৈ আনন্দ না করে বুড়ো বাপ-মায়ের সঙ্গে সময় নষ্ট করবে, এ কেমন কথা? কিন্তু এও জানি, অসুখের খবর পেলে আমার ছেলে ছুটে আসবেই। এদেশে আমাদের সমবয়সী ক'জন আমেরিকানের এই সৌভাগ্য আছে বলো? অসুখ তো দূরের কথা, কবর দেবার সময় ছেলেমেয়েরা কাছে থাকলে ভাগ্য মানতে হবে।"

"আপনি অবসর কেমনভাবে কাটাচ্ছেন?" জানতে চাই আমি।

মিস্টার কনেমারা বললেন, "আমি এখন বার্ধক্য সম্বন্ধেই খবরাখবর যোগাড় করছি। সত্যিকথা বলতে কি, আমাদেরও তো একদিন যৌবন ছিল—তখন বৃদ্ধদের সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল বোধ করি নি। প্রকৃতি এখন বোধ হয় প্রতিশোধ নিচ্ছেন। তাই শখটা এই দ্বিতীয় শৈশবকে কেন্দ্র করেই গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। এখানে মোটামুটি একটি লাইব্রেরী আছে। ছেলেকে লিখলে ইউনিভারসিটি থেকে ডাকে বই পাঠিয়ে দেয়। কিছু ফরাসীও জানি তাই সুবিধে হয়েছে।"

"ফরাসী জানার সুবিধেটা কী?" আমি জানতে চাই।

"যৌবন ও বার্ধক্য—দুই সম্বন্ধেই ফরাসী দেশে অনেক ভাল ভাল বই লেখা হচ্ছে। আমাদের এখানে একটি মাত্র ঋতু—তার নাম যৌবনবসন্ত। বার্ধক্য সম্বন্ধে

একটা ভীতি এবং গোপন ষড়যন্ত্র এখানে অনেক দিন ধরে চলেছে।"

"ফরাসী দেশে চলছে না?" আমি প্রশ্ন করি।

মিস্টার কনেমারা বললেন, "ফরাসী দেশে প্রতি একশজন লোকের মধ্যে বার-তেরজনের বয়স পঁয়ষট্টির বেশী। আমাদের এখানে সে তুলনায় অনেক কম, শতকরা আট-ন'জনের বেশী নয়।"

এবার হেসে ফেললেন মিস্টার কনেমারা। বললেন, "এখানে এক ছোকরাকে বলেছিলাম, ভারতবর্ষ বলে একটা দেশ আছে, যেখানে এখনও বয়োজ্যেষ্ঠদের পায়ের ধুলো মাথায় দেওয়ার রীতি চালু আছে। তা ছোকরা বললো, ওদেশে ক'টা আছে? ওদেশে গড় বাঁচবার বয়সও তো এখনও তিরিশ-বত্রিশ পেরোয় নি। বৃদ্ধরা বিরল বলেই সম্মানিত। আমি তাকে বললাম, এখানেও অর্থনীতির আইন-কানুন প্রয়োগের চেষ্টা কোরো না—এটা দর্শনের ব্যাপার, এটা ভারতবর্ষের যুগযুগান্তের বৈশিষ্ট্য।

ছোকরা যে মিস্টার কনেমারাকে বিশ্বাস করে নি, তা ওঁর মুখের ভাব দেখেই বুঝলাম।

মিস্টার কনেমারা বললেন, "কিছুদিন আগে বার্ধক্য সম্বন্ধে একটা আলোচনা সভা হলো। সেখানে শুনলাম, ইউরোপ আমেরিকার মধ্যে ফ্রান্সেই এখনও অনেক বৃদ্ধ মা-বাবা ছেলের সঙ্গে থাকেন। আমাদের এখানেও কিছু কিছু লোক যে থাকেন না এমন নয়। কিন্তু এখন তো আর সম্ভব হচ্ছে না। স্বামী নিজের বাপ-মাকে সঙ্গে রাখতে চাইলে অনেক বউ ডাইভোর্সের আবেদন করছে।"

এদেশের মেয়েদের শ্বশুর-শাশুড়ী ভীতি সম্পর্কে সামান্য পরিচয় আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পেয়েছি। ওখানে ইলিনর নামে এক সুন্দরী পি-এইচ-ডি ছাত্রীর সঙ্গে যে ডেট করেছে। কফি খেতে খেতে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "সত্যি করে বলো তো ইন্ডিয়ান ছেলেদের সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা?"

ইলিনর খুব খোলা মনের মেয়ে! সে হেসে বললো, "দু'রকম ইন্ডিয়ান দেখেছি আমি। ডেটিং-এ বেরিয়ে এরা হয় সায়লেন্ট, না-হয় ভায়োলেন্ট। অনেক ইন্ডিয়ান তোমাদের বহু যুগের ট্রাডিশন মতো অনাত্মীয় মেয়েদের সান্নিধ্যে অস্বস্তি বোধ করে এবং দৈহিক দূরত্ব রেখে চলে। ভদ্রতা ও সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখায়। আর উল্টোদিকে, কোনো মেয়ে হেসে কথা বললেই কিছু ইন্ডিয়ান ভাবে সে দেহ দিতে রাজী আছে। শরীর ছাড়াও মেয়েদের যে একটা মন আছে তা তোমাদের এই সব ভায়োলেন্ট ছেলেদের মনে থাকে না। তারা ভীষণ ক্ষুধার্ত। সায়লেন্ট এবং ভায়োলেন্টের মাঝামাঝি ভারতীয় যুবক আমি এখনও পর্যন্ত দেখি নি।"

ইলিনর বলেছিল, "তোমাদের এই সব সায়লেন্ট সুসভ্য যুবক সম্বন্ধে

আমাদের সহপাঠিনী অনেকের হৃদয়দৌর্বল্য হয়। কিন্তু আমরা বেশীদূর এগোতে সাহস করি না, বিকজ অফ ইওর যৌথ পরিবার। ইন্ডিয়ানকে স্বামী হিসাবে পাবার জন্যে যদি জীবনের বাকি ক'টা দিন শ্বশুর-শাশুড়ীর জেলখানায় কাটাতে হয়—তাহলে কী লাভ হলো?"

ইলিনরকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "শ্বশুর-শাশুড়ী থাকলেই সংসারটা জেলখানা হয়ে উঠবে, ভাবছো কেন?"

ইলিনর আমাকে সোজাসুজি উত্তর না দিলেও বুঝতে পারলাম জয়েন্ট ফ্যামিলি সম্বন্ধে এই ধরনের যুবতীদের মনে যথেষ্ট ভীতি আছে। ইলিনর বলেছিল, "দেখো, আমরা স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। আমার রান্নাঘরে আজ কী রান্না হবে তা আর একজন ওল্ড লেডি ঠিক করবেন ; আমার বাড়িতে কাউকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে গেলে কোনো ওল্ড ম্যানের অনুমতি প্রয়োজন হবে—এটা আমাদের কাছে অকল্পনীয়।"

মিস্টার কনেমারা বললেন, "ছেলের সঙ্গে বাবা-মা থাকলে অনেক সুবিধে। খরচ কম হয়। দাদু, ছেলে এবং নাতি এই তিন পুরুষের মধ্যে একটা ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আর কম বয়সী স্বামী-স্ত্রী সংসারের অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপারে অভিজ্ঞ পরামর্শ পায়। কিন্তু ছেলে এবং বউমার আপত্তি অনেক। বুড়োরা নাকি যুগের সঙ্গে পা-মিলিয়ে চলতে পারেন না—নতুন ইলেকট্রনিক গ্যাজেট আমদানিতে আপত্তি করেন। ছোটখাট ব্যাপারে খিটিমিটি লেগেই থাকে, ফলে সম্পর্কটা তিক্ত হয়ে ওঠে। ছেলের যদি তখনও বাব-মায়ের ওপর দুর্বলতা থাকে, তাহলে বউ ডাইভোর্স আদালতের স্মরণ নেয়। তাই আমাদের এই সমাজে নতুন নিয়ম হলো—ইনটিম্যাসি অ্যাট ডিসট্যান্স—অন্তরঙ্গতা রাখবে, কিন্তু দূর থেকে।"

মিস্টার কনেমারা অবসর সময়ে বার্ধক্য সম্বন্ধে অনেক খবরাখবর যোগাড় করেছেন। বেশ কিছু নতুন সংবাদ পেলাম, যা আমার জানা ছিল না। মিস্টার কনেমারা বললেন, "আপনাদের এই সভ্যতা যে কেবল প্রফিটের উপর দাঁড়িয়ে আছে তা যৌবনে বুঝতে পারি নি। লাভ ছাড়া এখানে কেউ কিছু বোঝে না। মানুষের ক্ষেত্রেও তাই। যতক্ষণ সুস্থ সবল দক্ষ মানুষকে দিয়ে সমাজের লাভ হচ্ছে ততক্ষণই আগ্রহ। তারপর যেমনি জরার ইঙ্গিত পাওয়া গেলো, অমনি তাকে নির্দয়ভাবে দূরে সরিয়ে দেওয়া হলো।"

একটু থেমে মিস্টার কনেমারা বললেন, "আমাদের এই দেশে যন্ত্রবিজ্ঞানের অবিশ্বাস্য উন্নতি হয়েছে—কোনো যন্ত্রপাতিই তাই বেশী দিন ব্যবহার হয় না। আরও নতুন যন্ত্র আবিষ্কার হওয়া মাত্রই পুরনো মেশিনকে স্ক্র্যাপ করে দেওয়া হয়। মানুষের ক্ষেত্রেও আমাদের সমাজ বিজ্ঞানীরা এই স্ক্র্যাপ কথাটা ব্যবহার

করছেন, বলছেন একই মানুষকে অনেকদিন ধরে ব্যবহার করে লাভ নেই। তাই এই দেশে জীবনের শেষ পনেরো-কুড়িটা বছর মানুষ টুটা-ফাটা-বাতিল লোহা লক্কড়ের মতো অবহেলিত হয়ে থাকে।"

"সমাজ যেমনি তোমাকে বাতিল করলো অমনি শুরু হলো দুঃখের দিন। নিজের পরিবারের মধ্যেও তোমার পুরনো প্রতিপত্তি নষ্ট হলো। বুড়োদের নিয়ে এখানে অভিনয় হয়—তাঁদের ঠকাবার চেষ্টা চলে। সাবালকের সম্মান তাঁরা পান না। মুখে একটু-আধটু ভদ্রতা দেখানোর চেষ্টা হয় গোড়ার দিকে—কিন্তু যথাসময়ে তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়, তিনি এখন দু-নম্বর নগরিক। সোজাসুজি কিছু হুকুম করা হয় না, কারণ কারও হুকুম তামিল করবার কথা তো তাঁর নয়। কিন্তু সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করে, বৃদ্ধকে অনেক জিনিস মানতে বাধ্য করা হয়। মুখে বলা হয়, বুড়োর ভালর জন্যেই এসব ব্যবস্থা হচ্ছে।"

মিস্টার কনেমারা বললেন, "বুড়োলোকের সামনেই চোখ-টেপা-টেপি করে রসিকতা করা তো এদেশে খুবই চালু। বাড়ির রোজগেরে তরুণ কর্তাই সংসারের নতুন ভাগ্যবিধাতা। বউ-এর বিরুদ্ধে তিনি নিষ্ঠুর হতে পারেন না—কারণ বউ সংসার চালায় এবং বিছানাতে বিশেষ ধরনের সার্ভিস দেয়। ছোটদের সম্বন্ধে একটু ভীতি থাকে—কারণ তাদের ভবিষ্যৎ নেই—ক্রমশ তাঁরা আরও পরনির্ভর হয়ে পড়বেন, জরা ও ব্যাধি ওই দেহ-মন্দিরের কিছুই অবশিষ্ট রাখবে না। সুতরাং বাড়ির কর্তার কোনো দুশ্চিন্তা নেই।"

একটু থেমে মিস্টার করে কনেমারা বললেন, "বাড়ির কর্তা যদি ঠিক করলেন বাপকে বৃদ্ধনিবাসে পাঠাবেন—সেইটাই ফাইন্যাল। ছোট ছেলের মতো তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ওখানে পাঠানো হবে। প্রায়ই বলা হয় 'দেখে এসো না, জায়গাটা কেমন? ওখান থেকে চলে আসতে আর কত সময় লাগবে?' যিনি বলছেন এবং যিনি শুনছেন, তাঁরা দুজনেই কিন্তু জানেন, ওই বৃদ্ধনিবাস থেকে তাঁকে আর কোনোদিন ফিরে আসতে দেওয়া হবে না।"

আমার মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠছিল। মিস্টার কনেমারা বললেন, "কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, কোনো বৃদ্ধ বাবা-মা সোজাসুজি স্বীকার করবেন না ছেলেরা তাঁদের বাতিল করে দিয়েছে। ছেলেরা যে তাঁদের ভালবাসে এবং সম্মান করে এই খবরটা সুযোগ পেলেই তাঁর বন্ধুদের শুনিয়ে দেন।"

আমাদের দেশে বোধ হয় ঠিক তার উল্টো। ছেলেরা যে বাপ-মাকে সম্মান করে না, কথা শোনে না, তা গিনি মাসীমা তো সুযোগ পেলেই আমাকে এবং অনেককে জানিয়ে দেন।

মিস্টার কনেমারা বললেন, "সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো ছেলে-ছোকরাদের ধারণা, বয়স বাড়লেই মানুষের সব গুণ কমে যায়। কথাটা কিন্তু কিন্তু

মোটেই ঠিক নয়। এই তো সেদিন নুফিল্ড-ফাউন-ডেশনের রিপোর্ট পড়লাম। পনেরো হাজার বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রমিকদের কাজ পর্যালোচনা করে ওঁরা দেখিয়েছেন, বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের কতকগুলো গুণ বেড়ে যায় ; কাজে মন বসে, কাজে থেকে বয়োজ্যেষ্ঠরা বেশী আনন্দ পান। ঠিক সময়ে হাজিরা দেওয়ার ব্যাপারে তাঁরা ছোকরাদের থেকে অনেক ভাল। ধৈর্য, নিয়মানুবর্তিতা, সততা, বিচক্ষণতা অনেক বেশী।

মিস্টার কনেমারা থামলেন না। বললেন, "বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য চোখের দৃষ্টি কমে যায়, লোকে কানে কম শোনে ; স্মৃতি এবং উদ্ভাবনী শক্তি, প্রচণ্ড পরিশ্রমের ক্ষমতা, উৎসাহ, নিজে থেকে কিছু করার উদ্দীপনা, নতুন নতুন যান্ত্রিক পদ্ধতির খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা ক্রমশ কমে যায়।"

আমি বললুম, "বুড়ো বয়সে নতুন কিছু শেখা যায় না, এটা কি ঠিক? কোথায় যেন পড়েছিলাম, টলস্টয় ৬৭ বছর বয়সে সাইকেল চড়া শিখেছিলেন।"

এখানকার কোনো ইয়ংম্যানের সঙ্গে এ-বিষয়ে আলোচনা না করতে পরামর্শ দিলেন মিস্টার কনেমারা। বললেন, "ওরা তোমায় ভুল বুঝতে পারে! ভাবতে পারে, তুমি ইচ্ছে করেই এই বিরাট দেশকে অপমানের জন্যে এই সব খবরাখবর যোগাড় করছে।"

"জানো, ফরাসী দেশের এক ভদ্রলোক বৃদ্ধের সম্পর্কে খোঁজখবর করে কিছু মজার কথা লিখেছেন। লেখক বলেছেন, যৌবনটাই যে মানুষের চূড়ান্ত বিকাশের সময় তা সবক্ষেত্রে সত্য নয়। মানুষের অনেক শারীরিক ক্ষমতা আরও কম বয়স থেকে নষ্ট হতে আরম্ভ করে।"

"যেমন?" আমি জানতে চাই।

"যেমন ধরো, আমাদের চোখের কতকগুলো ক্ষমতা দশবছর বয়স থেকেই কমতে শুরু করে। খুব উঁচু গ্রামের শব্দ শোনার ক্ষমতাও কৈশোরে নষ্ট হয়ে যায়। বারো বছর বয়স থেকে কয়েক ধরনের স্মৃতিশক্তি দুর্বল হতে আরম্ভ করে। আর সেক্স সম্পর্কে কিন্‌সে যা বলেছেন তা তুমি নিশ্চয়ই জানো।"

বললুম, "কিন্‌সে সম্পর্কে তেমন কিছু জানা নেই আমার।"

মৃদু হেসে মিস্টার কানেমারা বললেন, "এ দেশেও অনেকে জানে না যে কিন্‌সের মতে ১৬ পেরোলেই সেক্স ক্ষমতা কমতে শুরু করে!"

"কুড়ি পেরোলেই বুড়ী বলে যে কথা আমাদের দেশে চালু আছে, তা মিথ্যে নয় তাহলে?"

"মোটেই নয়!" হেসে উত্তর দিলেন মিস্টার কনেমারা। "তবে বেচারা মেয়েদের শুধু বুড়ী বানিও না, ছেলেদের সেই সঙ্গে বুড়ো করে দিও!"

রাত্রি অনেক হয়েছে। মিস্টার কানেমারার আরও গল্প করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু

স্ত্রীর ভয়ে আর জেগে থাকতে সাহস পেলেন না। বললেন, "আমি এখন সম্পূর্ণভাবে স্ত্রীর অনুগত। ওর ধারণা অনেকক্ষণ না ঘুমোলে আমার শরীর খারাপ করবে। ও বোঝে না, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের প্রয়োজন কমে যায়!"

শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নেবার আগে মিস্টার কনেমারা আমাকে এস্কিমো দেশের একটা গল্পের বই দিয়ে গেলেন। বিছানায় শুয়ে শুয়ে দু একটা গল্প পড়েই শরীর শিরশির করে উঠলো। চুকচী নামে সাইবেরীয় এক উপজাতির কথা আজও ভুলি নি। পরিবারের কেউ বৃদ্ধ হলে চুকচীরা উৎসবের আয়োজন করে। বহুক্ষণ ধরে সীলমাছের মাংস এবং মদ নিয়ে হৈ হুল্লোড় চলে। সেই সঙ্গে ড্রাম বাজানো হয়। নেশা আর একটু জমলে, বৃদ্ধ লোকটির বড় ছেলে কিংবা ছোট ভাই চুপি চুপি বুড়োর পিছনে এসে দাঁড়ায় এবং সীলমাছের হাড় দিয়ে এমনভাবে টুঁটি টিপে ধরে যে, কিছুক্ষণের মধ্যে তার মৃত্যু হয়।

এস্কিমোরা বৃদ্ধদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঈগলু থেকে চলে যেতে বলে। বুড়োরা মাথা নিচু করে বেরিয়ে গিয়ে বরফের ওপর শুয়ে থাকেন মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। গ্রীনল্যান্ডের অ্যামাসালিন এস্কিমোরা বৃদ্ধ হলে আত্মহত্যা করেন। বৃদ্ধ এস্কিমো যখন বুঝতে পারেন যে দেহ দুর্বল হয়ে আসছে, এবার তিনি অন্যের বোঝা হয়ে দাঁড়াবেন, তখনই মনস্থির করতে হয়। একদিন সন্ধ্যায় পরিচিত সমস্ত এস্কিমোদের কোনো একটা খোলা জায়গায় ডেকে পাঠানো হবে। সেখানে এই বৃদ্ধ এস্কিমো নিজের জীবনের সব অন্যায় সম্পর্কে প্রকাশ্যে স্বীকারোক্তি করবেন। তার দু'তিন দিন পরেই এস্কিমো তাঁর কায়াকে চড়ে বসবেন এবং সেই যে বিদায় নেবেন আর ফিরবেন না।

মিস্টার কনেমারার দেওয়া বইতে এ-বিষয়ে একটা করুণ কাহিনী রয়েছে। একজন বৃদ্ধ এস্কিমো এমনই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন যে নিজের কায়াকে চড়ে অদৃশ্য হয়ে যাবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি তাই ছেলেদের বললেন, আমাকে তোমরা সমুদ্রে ফেলে দিয়ে এসো। এস্কিমোদের বিশ্বাস, যারা জলে ডুবে যায় তারাই সবচেয়ে তাড়াতাড়ি মরণসাগরের অপরপারে পৌঁছতে পারে। এস্কিমোর ছেলেমেয়েরা বাবার কথার অবাধ্য হলো না—তাঁর কথা মতো নৌকো থেকে বৃদ্ধকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হলো। কিন্তু শরীরের জামাকাপড় ফুলে ওঠার বৃদ্ধ তখনও বরফ-ঠাণ্ডা জলে ভেসে রয়েছেন, ডুবে যাচ্ছেন না। এস্কিমোর মেয়েটি বাবাকে খুব ভালবাসতো। সে স্নেহভরা কণ্ঠে চিৎকার করে বললো, "বাবা, তুমি মাথাটা জলের মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করো, স্বর্গের দূরত্ব তাহলে কমে যাবে।"

বিদায় নেবার আগে মিস্টার কনেমারা বলেছিলেন, "বাইরেনকে বোলো, আমরা খুব ভাল আছি। চাকরির বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে এখন অবসরসুখ,

পুরোপুরি ভোগ করছি। ছেলেমেয়েদের ভক্তি ও ভালবাসা আমি যথেষ্ট পেয়েছি।"

মার্কিন দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে বেরিয়ে কয়েকদিন হাওয়াইতে কাটিয়েছি। তারপর জাপান এবং হংকং ঘুরে আমি আবার স্বদেশে ফিরে এলাম। অনেকদিন পরে দুঃখিনী বাংলার মাটিতে পা দিয়ে এক অনির্বচনীয় আনন্দে মন ভরে উঠলো। এরোপ্লেনের সিঁড়ি দিয়ে দমদমে নামবার সময় মুখ দিয়ে আপনা-আপনি বেরিয়ে এলো—'নমো নমো নমো, সুন্দরী মম জননী জন্মভূমি, গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি'।

যথাসময়ে গিনি মাসীমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ওঁরা দুজনে তখন মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিলেন। মন্টুর বউ বললো, "একটু বসুন। আপনি চা খেতে খেতে বাবা-মা ফিরে আসবেন।"

চায়ের কাপ সামনে নামিয়ে কৃষ্ণা জিজ্ঞেস করেছিল, "ওদেশে সবচেয়ে ভাল কী দেখলেন?"

ভাল মন্দ কী বলবো? যেখানে যেমন সেখানে তেমন। আমরা একরকম, ওরা একরকম। ভাল মন্দ বিচারের প্রশ্ন ওঠে না—ওরা যা ভাল ভাবছে আমাদের চোখে তা হয়তো খারাপ দেখাচ্ছে, আবার আমাদের ভালটা হয়তো ওদের চোখে নিতান্তই মন্দ।

কৃষ্ণা কিন্তু নাছোড়বান্দা। সে বললো, "আমাদের চোখ দিয়েই একবার ওদের বিচার করুন।"

বললুম, "সবচেয়ে যা ভাল দেখেছি, তা হলো ওদেশের মানুষের কর্মোদ্যম এবং স্বাধীনতা। মানুষের যে এতো দাম হতে পারে মানুষ যে সত্যিই এতো স্বাধীন হতে পারে, তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।"

কৃষ্ণা একবার মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলো, "সব চেয়ে কুৎসিত কি দেখলেন?"

এ-বিষয়ে মনস্থির করতে আমার একটুও সময় লাগলো না। বললাম, "ও-দেশের বিরাট শহরে একটা নাট্যশালা আছে, যেখানে একদল আশি বছরের বীভৎস শীর্ণা বৃদ্ধা তাঁদের স্কার্ট তুলে নাচগান করেন। ছোকরা দর্শকরা টিকিট কেটে সেই দৃশ্য দেখতে যায় এবং বীভৎস আনন্দে হেসে লুটোপুটি। সুসভ্য কোনো দেশে এর থেকে কদর্য কোনো দৃশ্য আমি কল্পনা করতে পারি না। বয়োবৃদ্ধদের এমন অপমান যেন আমাদের এই দেশে কখনও দেখতে না হয়।"

এখানে-ওখানে

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ১৯৯১

প্রকাশক
সাহিত্যম্

উৎসর্গ
ওপার বাংলার সাহিত্যপ্রেমী রাষ্ট্রপ্রতিনিধি
মাহবুব আলম
স্বজনেষু

লেখকের নিবেদন

বিদেশভ্রমণসূত্রে মানবতীর্থের এখানে ওখানে যেসব বিচিত্র চরিত্রের সাক্ষাৎ-সংস্পর্শে এসেছি এবং যাঁরা অনেকদিন হলো আমার বুকের মধ্যে আসন পেতে বসে আছেন তাঁদের কয়েকজনকে এই বইতে অবশেষে উপস্থিত করা গেল। যথাযথ চিত্রণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, তবুও এই রচনায় যদি কোথাও কারও প্রতি তেমন কোনো অবিচার হয়ে থাকে তার জন্যে অগ্রিম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

শংকর

কলকাতা ৩০০

বিদেশে একবার পদাপর্ণ করলে বিদেশটাই মানুষের ঘাড়ে চেপে বসে। স্বদেশে ফিরে এলেও মানুষটা একা থাকে না। কোথায় যেন পরিবর্তন এসে যায়। সাধে কি আর কালাপানি পেরুনো সম্পর্কে আমাদের দেশে পুরাকালে এতো নিয়মকানুন ছিল।

বিদেশে যদি কিছু বন্ধু বা আত্মীয়স্বজন থেকে যায় তা হলে তো কথাই নেই। আমার দাদা, কাকা, জ্যাঠা কেউ বিদেশে নেই ; সুতরাং পিছুটানের কথা না-ওঠাই উচিত। কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদে দু-একটি ভাগ্নী আছে। তারা এক-একজনই একশো। এরাই আমার যোগসূত্র সাগর পারের সঙ্গে। এদের এড়ানো যায় না। বিশেষ করে বাড়িতে যদি একটা টেলিফোন থাকে। এই টেলিফোন আমাকে রাখতে হয়েছে ভাগ্নীদের ইচ্ছা অনুযায়ী, যাতে সময়ে-অসময়ে মর্জি অনুযায়ী, তারা আমাকে জ্বালাতন করতে পারে সুদূর বিদেশ থেকে।

সেবার আমেরিকার নিউজার্সি থেকে সাগর পারের টেলিফোন বার্তা পেয়ে প্রথমেই যার কথা আমার মনে পড়েছিল তার নাম রমাপতি কর্মকার। অথচ রমাপতি দু'দিন আগে যখন আমার বাড়িতে এলো তখন আমি তার সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বললাম না।

রমাপতি কর্মকার আমার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বসেছিল। দোষটা পুরোপুরি আমার নয়। রমাপতি আমাকে তার আগমন পরিকল্পনা আগে থেকে জানায়নি। সময়ের অভাব যতই প্রকট হচ্ছে ততই বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে যখন-তখন মানুষের সঙ্গে দেখা করাটা কষ্টকর হয়ে উঠছে, বিশেষ করে রবিবারের সকালবেলায় যখন জীবনযাত্রার হাজার হাঙ্গামা বেমালুম ভুলে গিয়ে একমনে কাগজকলম নিয়ে একটু লিখতে বসি।

কিন্তু যে-পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছি এবং অর্ধ-শতাব্দীর সীমারেখা অতিক্রম করেছি সেখানে রবিবারের সকালটা অপচয় করার জন্যেই সৃষ্টি হয়েছিল। আমাদের পরিচিত মহলে আগাম ঠিকঠাক করে কেউ কখনও কারও সাক্ষাৎপ্রার্থী হতো না। রেশনের চালের মতন সময়কে কেউ মেপে-মেপে

ব্যবহার করে না। সময়ের কাছ থেকে কারও কোনো প্রত্যাশাও ছিল না। কোনোরকমে দিন কাটলেই মানুষ সন্তুষ্ট। হিসেবনিকাশের খাতায় বন্দি হয়ে জীবনযাপন প্রায় সকলেরই অজানা।

রমাপতি কর্মকারও নিশ্চয় সেই মনোবৃত্তি নিয়েই আমার সঙ্গে সকালবেলা কথা বলতে এসেছিল। লেখায় যত বাধাই পড়ুক, গল্পের বুননে সাময়িক যতই জট পাকুক, রমাপতির সঙ্গে আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে দেখা করতেই হবে। কারণ আমার স্ত্রী, বন্দনা ইতিমধ্যেই টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে একাধিকবার উদ্বেগ প্রকাশ করে গিয়েছেন : "একটা মানুষ এই সকালে কত দূর থেকে কষ্ট করে বাড়িতে এসেছেন ; তোমাকে খবর পাঠানো হয়েছে, আর তুমি চেয়ার ছেড়ে উঠছোই না!"

স্ত্রীকে আমি বহুবার সবিনয়ে নিবেদন করেছি, "লেখার কাজে মনোসংযোগ লাগে ; হুট করে উঠবো বললেই ওঠা যায় না। যে জটিল প্যারাগ্রাফটা সামলাতে নাস্তানাবুদ খাচ্ছি সেটা শেষ না করে উঠে পড়লে খেই হারিয়ে যেতে পারে।"

স্ত্রী ধৈর্য সহকারে আমার বক্তব্য শোনেন। কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বাস করেন না যে দু'মিনিট কারুর সঙ্গে সৌজন্যের বিনিময় করলে মহাভারত রচনায় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, তা ছাড়া সামাজিক মানুষ হিসেবে আমার সুনাম সংরক্ষণ সম্পর্কেও গৃহিণী সর্বদা সচেতন। মানুষ যদি ভুল বোঝে যে আমি নিজে গুরুত্ব জাহির করার চেষ্টায় নিজেকে দুর্লভ করে তুলছি তা হলে দ্রুত বদনাম রটাবে এবং আমার সামাজিক ভাবমূর্তি কলঙ্কিত হবে।

রমাপতির সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে আমাকে বিস্তারিতভাবে অনেক কথা লিখতে হবে। কিন্তু আপাতত মার্কিনমুলুকের নিউজার্সি শহরের ফোন, যা ভারতীয় বিদেশ সঞ্চার নিগমের মাধ্যমে এখানে এসেছে, তা সেরে ফেলা যাক।

টেলিফোনের অন্য দিকে রয়েছে আমার ভাগ্নী, সুচরিতা ওরফে খুকু যে দীর্ঘকাল প্রবাসিনী, যাদের ইদানীং নামকরণ হয়েছে অনাবাসিনী। এইরকম শ্রুতিকটু শব্দ ভারত সরকার কী করে সৃষ্টি করলেন এবং বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের উপহার দিলেন তা আমার চিন্তার অগম্য।

"হ্যালো মামা, তুমি একদম আমাদের ভুলে গেলে!"

"দিদির মেয়েকে কি ভোলা যায়? ইচ্ছা থাকলেও আইন অনুযায়ী ভাগ্নীদের ডাইভোর্স সম্ভব নয়, খুকু।"

"ওঃ মামা! ভাগ্নীবিচ্ছেদ নয়। ভুলেও খোঁজখবর করো না—বাড়িতে টেলিফোনটা কেন রয়েছে?"

টেলিফোন তো রয়েছে কিন্তু প্রতি সেকেন্ডে ভাবের আদানপ্রদানের জন্যে

টেলিফোন আপিস থেকে যে টাকার বিল আসবে তার কথা ভাবলে মাথা লাট্টুর মতো ঘুরতে থাকে।

আমেরিকায় বসবাস করলে অতি অর্ডিনারি বাঙালিও ভীষণ ইনটেলিজেন্ট হয়ে যায়। সাগর পারের সুচরিতা আমার মনের অবস্থা আন্দাজ করেই বললো, "তোমাকে সেবারে পই-পই করে বললাম, কালেক্ট কল্ করবে।"

কালেক্ট কল্ মানে, ফোনের বিল আমি দেবো না, মহাসাগরের ওপারে যে ফোন ধরবে সে বিলের বোঝা বইবে। আমাদের কম বয়সে আমরা অনেককে ডাকটিকিট না এঁটেই বেয়ারিং চিঠি পাঠিয়েছি। বেয়ারিং ট্রাঙ্ককল্ ভীষণ লজ্জাজনক, যদিও সুচরিতা বলছে, ওটা সামান্য ব্যাপার। দেশ থেকে একটা ফোন পেলেই সামান্য বিল দেওয়ার সব দুঃখ মুছে যায়।

গড়-গড় করে খবরাখবর নিয়ে যাচ্ছে সুচরিতা। আজ কলকাতায় গরম রয়েছে কি না, বৃষ্টি হচ্ছে কি না, কতক্ষণ লোডশেডিং চলেছে, চিফ মিনিস্টার অতো চমৎকার লোক হয়েও লোডশেডিং বন্ধ করছেন না, মামীমা যেন খুব সাবধানে চালের কাঁকর বাছেন, এই বয়সে মামার দাঁতের বারোটা বাজলে ভাগ্নীরা খুব কষ্ট পাবে, এটসেটেরা, এটসেটেরা।

ট্রাঙ্কলের পিছনে ট্রাঙ্কলবিল নামক একটা দৈত্য আছে তা যেন খুকু ভুলেই গিয়েছে। অসহায় আমি ধৈর্য সহকারে প্রতিটি বিষয়ের উত্তর দিয়ে যাচ্ছি। আমেরিকায় ডালে, ছোলায়, গমে, চালে কেন কাঁকর থাকে না এই রহস্যটা আমার কাছে তিনবার বিদেশ গিয়েও পরিষ্কার হয়নি।

"কারণটা খুব সোজা, মামা। আমাদের এখানে কেন্দ্রে বলো, রাজ্যে বলো, কোথাও খাদ্যমন্ত্রী নেই। এতো খাদ্য মাঠ থেকে উঠছে যে চাষীদের চোখে ঘুম নেই—কী করবে বাড়তি দুধ, বাড়তি চিকেন, বাড়তি গম নিয়ে বুঝে উঠতে পারছে না।"

"খুকু, তোর টেলিফোন-বিল কিন্তু বাড়ছে।" মামা হিসেবে এটা মনে করিয়ে দেওয়া কর্তব্য বলে মনে করলাম, না হলে খুকুর মা দুঃখ করবেন আমি তাঁর অনাবাসী মেয়ে-জামাইয়ের টাকা নষ্ট করিয়ে দিচ্ছি।

"মামা, তুমিও যেমন! আমি অন্য বাড়ি থেকে ফোন করছি, ওদের কাজেই আমি যতক্ষণ ইচ্ছে ফোন করতে পারি, কারণ জরুরি বিজনেস রয়েছে তোমার সঙ্গে।"

বিজনেসটা এবার জানা গেল। মিস্টার জেকব মার্কাস কলকাতা আসছেন। জেকব মার্কাস ও-দেশের একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক। উনচল্লিশ বছরেই যথেষ্ট সুনাম করেছেন। ইংরিজী ছোটগল্পের পোকা হিসেবে খুকু অনেক লম্বা-লম্বা চিঠি লিখেছে মার্কাসকে—পত্রবিনিময় থেকেই আলাপ এবং পরিচিতি।

মার্কাস সম্প্রতি কিছুদিন নিউজার্সিতেই বসবাস করছেন। সেই সূত্রেই খুকুর সঙ্গে পরিচয় নিবিড়তর হয়েছে।

সেবার যখন আমেরিকায় গেলাম তখন খুকুর দয়াতেই মার্কাসের সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্যে আলাপ হয়েছিল। মার্কিন লেখকদের সময়ের মূল্য অনেক। তবু আমার সঙ্গে কিছু সময় অতিবাহিত করেছিলেন জেকব মার্কাস। ভদ্রলোক তখন কোনো বিষয়ে স্পেশাল পড়াশোনা করছেন। পশ্চিমী লেখকরা কোন বিষয়ে খোঁজখবর করছেন, কী কাজ করছেন, সব গোপন রাখেন। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কয়েক দিন পরেই তিনি নিউজার্সি থেকে অদৃশ্য হলেন।

খুকু বলেছিল, "অজানা দেশে চলে গেলেন জেকব মার্কাস। ইংরিজী গল্প উপন্যাসের বাজারে এখন প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা—সব লেখক অজানা কাহিনী, অচেনা পরিবেশ এবং অচেনা দেশের পিছনে ছুটছেন। এমন কি, যাঁরা রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনী লেখেন তাঁরাও তাঁদের পরিচিত নায়কদের নিয়ে যাচ্ছেন বিদেশে। কোনো জটিল রহস্যের উন্মোচনের জন্য নিউইয়র্কের ডিটেকটিভ হয়তো ছুটছেন গ্রিসে। এই গল্পের গ্রন্থি বাঁধা খুবই সহজ—কারণ যে-মানুষটি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেবার জন্য আমেরিকান ডিটেকটিভ মহোদয় এথেন্সে তৎপর তিনি একজন আমেরিকাবাসী গ্রিক। এঁর ব্যবসা নিউইয়র্কে বাড়ি তৈরির। অনাবাসী গ্রীকদের ইনি নানাভাবে সাহায্য করে থাকেন এবং সম্প্রতি তাঁর আশ্রয়ে একজন গ্রিক স্বদেশ থেকে এসে পাঁচ সপ্তাহ বসবাস করেছিলেন। লোকটি যেদিন গ্রিসে ফিরে গেল সেদিন সকালেই নিউইয়র্কের রহস্যময় হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছে বলে গোয়েন্দার সন্দেহ।

জেকব মার্কাস সেবারে চুপি-চুপি কোথায় গিয়েছিলেন তা জানা গেল এক বছর পরে যখন নাইজিরিয়ার পটভূমিকায় ওঁর উপন্যাসটি প্রকাশিত হলো। নাইজিরিয়া দেশটি সম্পর্কে চমৎকার ধারণা পাওয়া গেল। সেই সঙ্গে মিষ্টি একটা গল্প উপরিপাওনা।

মার্কাসের বইতে কত নতুন জনপদের নাম জানা গেল—আপকালিকী, আদোওদো, বোদেসাদু ইবেতো, পামবেগুয়া, কুকাওয়া। সেই সঙ্গে একটি নদীর নাম গঙ্গোলা—অনেকটা আমাদের গঙ্গার মতন। একটি পর্বতমালার চমৎকার বর্ণনা করেছেন জেকব মার্কাস যার নাম মন্দারা।

খুকু স্বভাবতই টেলিফোনে খুবই উৎসাহ বোধ করছে। 'ইজন্ট ইট গ্রেট মামা স্বয়ং জেকব মার্কাস কলকাতায় যাচ্ছেন কলকাতার তিনশ বছর উপলক্ষে। সুযোগটার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে।"

সব ব্যাপারেই আমার ভাগ্নীর প্রচণ্ড আগ্রহ। ওর মায়ের অভিযোগ সারাজীবনই ওর তালে তাল দিয়ে এসেছি।

জেকব মার্কাসের ব্যাপারেও আমি আগ্রহ দেখালাম। তবে বললাম, "এক জার্মানি লেখক ইদানীং আমাদের খুব দাগা দিয়ে গিয়েছেন, খুকু। কলকাতার কোথায় কোন মেয়েদের বাথরুমে স্যানিটারি ন্যাপকিন পড়ে আছে সে-নিয়ে এক কাহন লিখে ফেলেছেন। মস্ত বড় লেখক। কিছু বলবার নেই। আগের যুগে মিস মেয়ো যখন ভারতবর্ষের খারাপ দিক নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিল তখন বলা হতো, স্যানিটারি ইন্সপেক্টার্স রিপোর্ট। এখন জার্মান সায়েবকে স্যানিটারি ন্যাপকিন্স ইন্সপেক্টর এই সম্মানে ভূষিত করতে হবে।"

সুচরিতা বললো, "মামা, সঙ্গদোষে মানুষ খারাপ হয়। কী দেখানো হয়েছে ভদ্রলোককে তা তুমিও জানো না, আমিও জানি না। সুতরাং মিস্টার মার্কাসের জন্যে তোমাকে একজন খুব ভাল গাইড ঠিক করতে হবে। মনে রেখো, জেকব মার্কাস তিন দিন মাত্র কলকাতায় থাকবেন।"

"তিন দিনে তিনশো বছরের কলকাতাকে বোঝবার দুঃসাহস একমাত্র আমেরিকান সাহেবদেরই হতে পারে, খুকু।"

"ওসব কথা ছাড়ো, মামু। সায়েবকে পাঠাচ্ছে এখানকার এক ম্যাগাজিন। সুতরাং খরচাপাতি নিয়ে ওঁর চিন্তা নেই। তুমি একটা বিচক্ষণ লোকের ব্যবস্থা করে দিও, যিনি শহরটা জানেন। সারাক্ষণের গাড়ি ভাড়া করা থাকবে। যা পয়সা লাগে মিস্টার মার্কাস দেবেন। যদি পারো তুমিও একটু খোঁজখবর রেখো, আর একদিন মামীর রান্না খাইয়ে দিও। ফর ইওর ইনফরমেশন, সায়েব ভীষণ ঝাল খান। মাইল্ড, স্ট্রং, হট বললেও ওঁর মন ভরে না! উনি যে-ঝাল পছন্দ করেন, এখানকার রেস্তোরাঁয় তার নাম 'সুইসাইড'।"

খুকু তো সমস্ত বিবরণ দিয়ে দিলো। জেকব মার্কাস শেষ পর্যায়ে ফোন ধরে নিজেই বললেন, "হাই শংকর! ফর দ্য গ্রেট সিটি অফ ক্যালকাটা আই নিড্ এ 'পণ্ডা'!" শেষ শব্দটা বুঝতে পারছিলাম না। খুকু প্যারালাল লাইন থেকে ব্যাখ্যা করলো, "বুঝতে পারছো না কেন? সায়েবের কাছে কলকাতা হলো মন্দিরের মতন, উনি তাই খুঁজছেন 'পাণ্ডা', যেমন আমরা পুরীতে খুঁজি।"

আজকালকার চালু সায়েবদের নিয়ে এই হচ্ছে মুশকিল। "ব্রাহ্মণ', 'আত্মা', 'সঙ্গম', 'গোলমাল', 'চোলছে চোলবে' ইত্যাদি বাঘা বাঘা দিশি শব্দগুলো টপাটপ নিজেদের স্টকে তুলে নিচ্ছেন। এখন 'পাণ্ডা' কথাটাও আমাদের হাতছাড়া হলো।

"দরকার হলে কালেক্ট কল্ কোরো, একটুও লজ্জা কোরো না," এই বলে খুকু ফোন নামিয়ে দিলো। আর আমি পড়লাম অথৈ জলে। মার্কাস সাহেবকে নিয়ে কী করবো তা এই মুহূর্তে পঞ্চান্ন বছরের পাকা মাথাতেও ঢুকছে না।

নিজের বাড়িতে এনে জেকব মার্কাসকে একদিন ডিনারে আপ্যায়ন করবো? সম্ভব হলে, বিখ্যাত ইংরিজী কাগজের এক-আধজন সহকারী সম্পাদককে খবর

দিতে হবে? সায়েব লেখকদের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান করতে এবং এঁদের সম্বন্ধে ফলাও করে লিখতে এঁদের বিপুল আগ্রহ। হাতের গোড়ায় সাদা চামড়ার ইংরেজী লেখকদের পেলে এঁদের মাত্রাজ্ঞান থাকে না। জেকব মার্কাস অবশ্যই এঁদের সঙ্গে পরিচিত হবেন।

কিন্তু আমি নিজে কোনোক্রমেই মার্কাসের সামনে মুখ খুলছি না। একরকম কথা শুনে নোটবইতে আরেকরকম টুকতে সাহেব লেখকরা আজকাল তুলনাহীন। কোথায় কী নোংরা পড়ে রয়েছে, কোথায় একবার টানলে বাথরুমের ফ্লাশ কাজ করে না, এসব নজর করতে এঁরা সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকবেন। খ্যাতনামাদের সঙ্গেও মার্কাসের পরিচয় করিয়ে দেবার ব্যাপারে আমি বিশেষ উদ্যোগী হবো না। কারণ বিখ্যাত ওই জার্মান সাহিত্যিকের সঙ্গে সরল মনে কথা বলে কলকাতায় অনেকেই ইদানীং বিপদে পড়েছেন।

সোজা কথার বাঁকা অর্থ করে দুনিয়ার হাটে ভারতবর্ষকে ছোট করতে সাম্প্রতিক সায়েব-লেখকেরা তুলনাহীন। আপনি যদি ভেবে থাকেন জার্মান ভাষায় যা-খুশি লিখুক আমাদের কী এসে যায়? কে এখানে জার্মান পড়ছে? তা হলে খুব ভুল করছেন। ইংরিজী দৈনিক কাগজের সহকারী সম্পাদকরা উঁচিয়ে আছেন স্যানিটারি ন্যাপকিন থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত সকল জনের সম্পর্কে সায়েবের প্রতিটি তির্যক মন্তব্যের ইংরিজী অনুবাদ বড়-বড় টাইপে রঙীন ছবিসহ ছাপবার জন্যে।

সুতরাং জেকব মার্কাস কলকাতায় যা কিছু করবেন তা নিজের দায়িত্বে করবেন, আমি শুধু একজন নামগোত্রহীন গাইড জোগাড় করে দেবো যে এই শহরের সবকিছু জানে অথচ নিজে বিখ্যাত নয়। কলকাতা শহরে সারাক্ষণের জন্যে ভাড়া গাড়ি পাওয়া যায়। সুতরাং সায়েব যখন খুশি যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াতে পারেন। কলকাতা শহরের মহত্ত্ব—এখানে কিছুই লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয় না ; ভাল মন্দ সব কিছু সকলের চোখের সামনে রয়েছে। নিজের রুচিমতন তুমি খবর তুলে নিতে পারো। পৃথিবীতে দুটো-তিনটে দেশের বাইরে এমন ঢালোয়া স্বাধীনতা পরিব্রাজকরা বোধ হয় কোথাও উপভোগ করেন না। তাছাড়া কোনোরকম কুৎসা ও নিন্দা কলকাতার গায়ে লাগে না। সাহেবদের শতরকম অত্যাচার সহ্য করবার জন্যেই তো তিনশো বছর আগে হুগলী নদীর তীরে কলকাতা শহরের পত্তন হয়েছিল। কলকাতার যত দোষই থাক, এখানকার নগরবাসীদের সহ্যশক্তি নেই, একথা এখন আর বিশ্বনিন্দুকও বলতে পারবে না।

কিন্তু সময় বেশি নেই। জেকব মার্কাসের দায়িত্ব কার হাতে দেওয়া যায় তা আমার মাথায় ঢুকছিল না। এমন সময় রমাপতি কর্মকারের কথা আমার মনে

পড়ে গেল।

এই তো গত রবিবারেই আমি যখন একটু একান্তে মা সরস্বতীর মানভঞ্জনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছি, তখন গৃহিণী সংবাদ দিলেন একটা নোংরা শার্টপরা পাকানো চেহারার কালো লোক আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছে। যেহেতু ওই ঘরে তখন টি ভি চলছে সেহেতু গৃহিণী ও এই পরিবারের সকল সভ্যের আন্তরিক ইচ্ছা আমি মুহূর্তের সময় অপচয় না করে দর্শনার্থীকে আমার পাঠাগারে স্থানান্তরিত করি।

এই দেশে পাকানো চেহারার শ্যামবর্ণ মানুষের অভাব নেই এবং নোংরা শার্টের সংখ্যা পরিষ্কার শার্টের সংখ্যা থেকে সহস্রগুণ বেশি। আমার এই তির্যক মন্তব্য শুনে গৃহিণী একটু বিরক্তভাবেই সংযোজন করলেন, লোকটি লম্বাও নয় বেঁটেও নয়, চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে এবং মুখটা তেলচকচকে।

এই বাড়তি বিবরণেও আমার বিশেষ সুবিধা হলো না। এই ঘামের দেশে সব মানুষই কমবেশি তেলচকচকে। আমি এই মুহূর্তে লুঙি জড়িয়ে গেঞ্জি পরা অবস্থায় সরস্বতীর চরণচর্চায় ব্যস্ত। আমি কোনো অচেনা অজানা লোকের সঙ্গে দেখা করার জন্য বিন্দুমাত্র উৎসাহী নই।

এবার গৃহিণীর নিবেদন : আগন্তুকের পরিচয় তাঁর জানা নেই, কিন্তু লোকটি অপরিচিত নয়। কয়েকবার তাঁকে এই বাড়িতে আমার সান্নিধ্যে দেখা গিয়েছে এবং প্রতিবারেই আমি নাকি লোকটিকে পড়ার ঘরে নিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলেছি। এবার রহস্যটা কিছুটা পরিষ্কার হচ্ছে।

গৃহিণী বললেন, "ভদ্রলোক চায়ে চার চামচ চিনি খান। গতবার দিতে হয়েছিল," গৃহিণী ভোলেননি। বাড়তি চিনির ইঙ্গিতেই আমি বুঝলাম, লোকটি রমাপতি কর্মকার ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

অগত্যা গেঞ্জির ওপরে পাঞ্জাবিটা চড়িয়ে বাইরের ঘরে এসে রমাপতিকে আমার পড়ার ঘরে নিয়ে এলাম। বিনয়ে বিগলিত রমাপতির হাতে একটি জবা ফুল। সেইটি আমার হাতে তুলে দিয়ে সে বললো, "ঠনঠনে কালীবাড়িতে মায়ের পায়ে ঠেকিয়ে আপনার জন্যে নিয়ে এলাম। এমন শুভদিন আপনার জীবনে।"

আজ আমার জন্মদিনও নয়, বিবাহবার্ষিকীও নয়, আমার দুই মেয়েদের কারও জন্মদিনও নয়। আমি ব্যাপারটা কী তা বুঝবার চেষ্টা করছি।

রমাপতি একগাল হেসে বললো, "আমাদের মতন পাঠকদের পক্ষে মস্ত দিন। থার্টিফোর ইয়ারস আগে এই দিন দেশ পত্রিকায় আপনার 'কত অজানারে' বইয়ের প্রথম পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয়েছিল। বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম' বেরিয়েছে তার আগে। জরাসন্ধের 'লৌহকপাট' প্রথম পর্বও তদ্দিনে দেশ পত্রিকায় বেরিয়ে গিয়েছে।"

সাহিত্যের ব্যাপারে আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি এই মানুষটার। সাহিত্য বিষয়ক সমস্ত দিনক্ষণ জিহ্বাগ্রে। রমাপতি হুড়হুড় করে লিস্টি দেয় "বঙ্কিমের জন্ম ২৬শে জুন ১৮৩৮ আর মৃত্যু ৮ই এপ্রিল ১৮৯৪। মাইকেল মধুসূদনের জন্মদিন ২৫শে জানুয়ারি ১৮২৪, শরৎ চাটুজ্যের ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৬, আর শরদিন্দু ব্যানার্জির ৩০শে মার্চ ১৮৯৯, ওঁর মৃত্যু ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০। বিমল মিত্রের বার্থডে হলো...।"

রমাপতি তারপরেই স্মরণ করবে, "আমার বিয়েতে তিনখানা কত অজানারে এবং পাঁচখানা সাহেব-বিবি পেয়েছিলাম। একখানা করে রেখে বাকিগুলো টাইটেল পেজ ছিঁড়ে অন্য লোকের বিয়েতে উপহার দিয়েছিলাম। অনেকের আবার এমন বিশ্রী অভ্যেস বইয়ের ভিতরে সই করে গ্রহীতার নাম লেখে। সেসব বই সেকেন্ড-হ্যান্ড মার্কেটে কোনো কাজে লাগে না। আমার এই কথা শুনেই তো সাহিত্যিক নগেন পাল ফ্লাইলিফে নাম সইকরা ছেড়ে দিয়ে ভিতরের পাতায় অটোগ্রাফ করা শুরু করলেন। উপহারের শাড়িতে ওই অসুবিধে নেই ; তাই লোকে শাড়ি পছন্দ করে। একখানা উপহারের শাড়ি যদি এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি, সেখান থেকে আরেক বাড়ি—এমনি করে দশ হাত ফিরি হয় তা হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যত অপছন্দের শাড়ি তত হাত ফিরি—আপনি গ্রেশহামের আইনকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে কোনো বইতে ব্যাপারটা লাগাতে পারেন। লোকে এনজয় করবে।"

রমাপতির মুখের দিকে তাকালাম। আগে যা দেখেছিলাম তার থেকে কিছুটা শুকিয়ে গিয়েছে মানুষটা। "কী ব্যাপার রমাপতি? শরীর ভাল তো?"

রমাপতি শান্তভাবে বললো, "জানেনই তো, রাত্রে আমার ঘুম আসতে চায় না। ঘুমের ওষুধগুলোর যা দাম বাড়িয়ে যাচ্ছে, সব সময় খেতেও পারি না। শুনলাম, যে-কোম্পানি ভ্যালিয়াম তৈরি করে তারা অবিশ্বাস্য মুনাফা লুটবার জন্যে গরমেন্টের হাতে ধরা পড়ে গিয়েছে। ওদের কথাই আলাদা—সায়েব কোম্পানিকে সায়েবরাই ধরিয়ে দিচ্ছে। আমাদের গরমেন্টও নাকি সুইস কোম্পানির কাছ থেকে মোটা টাকা ফেরত চাইবে—কিন্তু তাতে আমাদের আর কী লাভ হবে? যাদের ঘুম আসে না তারা কি আর নগদ টাকা হাতে ফেরত পাবে? এখানকার সরকারই সব মেরে দেবে।"

রমাপতির মুখের দিকে তাকাচ্ছি আর আমার মনে পড়ছে, রমাপতির সঙ্গে আমার আলাপ করিয়েছিলেন সাহিত্যিক শিবতোষ চট্টোপাধ্যায়। শিবতোষবাবুর জীবনের তখন শেষ পর্ব। আমাকে খুব ভালবাসতেন, গল্প করতেও প্রচণ্ড উৎসাহ ছিল। সুস্থ অবস্থায় সমস্ত কলকাতা শহর চষে বেড়াতেন। শয্যাশায়ী হয়ে আমাদের দেখতে চাইতেন। শিবতোষদাকে দেখতে গিয়েই রমাপতি

কর্মকারের সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছি।

শিবতোষদা বোধহয় বুঝেছিলেন তিনি আর লিখতে পারবেন না। সজল চোখে বললেন, "আমার দিন তো শেষ, শংকর। তুমি বরং রমাপতির সঙ্গে আলাপ করে রাখো। যদি পারো ওকে কাজে লাগিও। রমাপতির খুব ইচ্ছে, আমার অবর্তমানে তোমার সঙ্গে একটু কাজকর্ম করে।"

আমি ভেবেছিলাম, রমাপতি জীবনবীমার দালাল। তাই বললাম, "এই বয়সে আর ইনসিওর হয় না, শিবতোষদা। তাছাড়া আমারও ব্লাডপ্রেসার আছে। ঘণ্ট আষ্টেক টানা কাজ করলেই মাথা ধরে যায়।"

"ঘণ্টা আষ্টেক মন দিয়ে লিখলে বিশ্বশ্রী মনোতোষ রায়েরও মাথা দপদপ করবে!" সরল মন্তব্যটি রমাপতির। মানুষটিকে স্নেহপ্রবণ মনে হচ্ছে।

শিবতোষদা বললেন, "তোমার ভয় নেই, জীবনকে নিরাপদ করে তোলার কোনো ব্যবসাতেই রমাপতি নেই ; বরং জীবনটাকে নিরাপত্তার বাইরে রেখেই চলতে ভালবাসে আমাদের রমাপতি। "কী রমাপতি? ঠিক বলছি তো?" শিবতোষদা রোগশয্যা থেকেই জিজ্ঞেস করলেন।

খুব লজ্জা পেলো রমাপতি। "আমার লাইফে উল্লেখ করার মতন কোনো ব্যাপারই নেই, স্যার। আপনি বারওয়েল সায়েব, স্যাটা বোস, জীমূতবাহন সেন, নটবর মিত্তির কত বড়-বড় ক্যারেক্টার দেখেছেন। আমি একজন নগণ্য সাহিত্যসেবক।"

শিবতোষবাবু বললেন, "দুনিয়া থেকে যাবার সময় তোমাকে মিথ্যে কথা বলবো না। আমার বিখ্যাত উপন্যাস 'দিন তুমি রাত নয়' যার জন্যে আমি রবীন্দ্র পুরস্কার পেলাম তার মূল স্টোরিটা সাপ্লাই করেছিল এই রমাপতি।"

রমাপতি খুব অস্বস্তিতে পড়ে গেল। "আপনিও কম মহানুভব নন। পুরস্কারটা পেয়ে আমাকে নিজে থেকে ডেকে আড়াইশো টাকা বোনাস দিলেন। আপনার দেওয়ার কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না।"

"অত লজ্জা পাচ্ছেন কেন, রমাপতিবাবু? বলুন, সাহিত্যিক উমাশঙ্কর হালদারের ব্যাপারটা।" শিবতোষ উসকে দিলেন রমাপতিকে।

রমাপতি কিছু তো বললোই না, বরং মাথা নিচু করে রইলো। তখন শিবতোষদা মুখ খুললেন, "আমিই বলছি ব্যাপারটা। উমাশঙ্কর হালদারের আকাদমী পাওয়া উপন্যাসটার গল্পও সাপ্লাই করেছিলেন রমাপতি। কিন্তু ভীষণ কিপ্টে ছিলেন উমাশঙ্কর হালদার—তিরিশ টাকার বেশি কখনও হাত থেকে গলতো না। তবু উমাশঙ্কর যদ্দিন বেঁচে ছিলেন তদ্দিন রমাপতিবাবু ওঁকেই গল্প সাপ্লাই করতেন। উনি দেহ রাখার পরে আমার সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ। কেন মিথ্যে কথা বলবো, আমি যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি।"

হাঁ-হাঁ করে উঠলেন রমাপতি। "কাদামাটি সাপ্লাই করা আর কুমোরের ঠাকুর গড়া এক জিনিস নয়। খোদায়ের মার্বেল পাথর তো অনেকেই সাপ্লাই করতে পারে কিন্তু মাইকেল অ্যাঞ্জেলো ক'জন হয়?"

আমি রমাপতিবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম কিছুক্ষণ। বিনয়ে বিগলিত রমাপতি বললো, "কাদার তাল আর রমেশ পালের প্রতিমা মূর্তি এক জিনিস নয়। এই ধরুন, সাহেব-বিবি-গোলামের কথা। কাদার তালটা হলো : এক স্বামী-সোহাগিনী মহিলা মাতাল স্বামীকে নিজের কাছে রাখবার জন্য মদ ধরলো এবং নিজেও মাতাল হলো, তারপর পাকে-চক্রে পড়ে সে খুন হলো এবং কঙ্কালটা রয়ে গেল ভিটেবাড়ির মাটির তলায়। এই ঘটনাটা আর সাহেব-বিবি-গোলাম উপন্যাস কি এক জিনিস? দুনিয়ার লোককে জিজ্ঞেস করুন। তবে একটা ভাগ্য বলতে পারেন, দেবতার মূর্তি গড়তে গেলেও কাদামাটির প্রয়োজন হয়। মহৎ সৃষ্টির জন্যে বড়-বড় লেখকদের একটা ঘটনা, একটা গপ্পো প্রয়োজন হয়। তবেই তাঁরা সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে নিমগ্ন হতে পারেন। এই ধরুন, জেনারেটরের কথা। আপনি ঢাললন চটচটে ডিজেল তেল, কিন্তু তৈরি হলো দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করা আলো। কী জিনিস থেকে কী জিনিসের যে সৃষ্টি হয়!"

শিবতোষদার দেহরক্ষার পর রমাপতির সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক নিবিড় হয়েছে। আধময়লা সাদা ফুল শার্ট পরে অনেকবার সে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।

রমাপতি বলেছে, "সাহিত্যিক শিবতোষ আর উমাশঙ্করের মধ্যে অনেক পার্থক্য।"

উমাশঙ্কর চাইতেন সলিড ঘটনা, যার জন্য রমাপতিকে ঘন ঘন ফৌজদারি আদালতেও ঘোরাঘুরি করতে হতো।

"দু'চারজন চেনা মুহুরির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখলেই উমাশঙ্করবাবুর পছন্দমতো গপ্পো পাওয়া যেতো। আর সাহিত্যিক শিবতোষ চাইতেন গপ্পো প্লাস চোখা-চোখা ডায়ালগ। শিবতোষবাবুর গপ্পো আদালতে পাওয়া যেতো না। এর জন্যে আমার প্রধান ভরসা ছিল মদনবাবুর লেডিজ হোস্টেল। রাত্রে ডিনার টেবিলে ওরা যখন খেতে বসবে তখন কান থাকলে প্রত্যেক দিন একটা-না-একটা ঘটনা পেয়ে যাবেন। মদনবাবু সুরসিক, একসময় যাত্রা করতেন, আমাকে ভালওবাসতেন খুব। গপ্পোগুলো আমাকে সাপ্লাই করতেন। শিবতোষবাবু খুব খুশি হতেন, নোট করে নিতেন। শিবতোষবাবু বলতেন, দেখো রমাপতি, নাম হওয়া মানে নিজের জালে নিজেই বন্দি হওয়া। এই আমি একসময় কত হোস্টেলে, কত মেসে, কত চায়ের দোকানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটাতাম।

ডুব-সাঁতার দিয়ে নিজেই তুলে আনতাম গল্পের হীরে জহরৎ। ওই যে নার্সের প্রেমের উপন্যাসটা লিখলাম এবং এতো নাম হলো, ওটা কোথায় পেলাম? স্রেফ নার্স হোস্টেলের একটি মেয়ের কাছ থেকে। এখন নাম হয়ে খুব মুশকিল হয়েছে। লোকে আর সেইভাবে সমান লেভেল থেকে মন খুলে কথা বলে না। এখন লোকে খাতির করে। মেয়ে হোস্টেলে গেলে তো হৈ-চৈ পড়ে যাবে, অটোগ্রাফের খাতা চলে আসবে। কিন্তু আমি ওই খাতির নিয়ে কী করবো? আমার চাই গল্পের জোগান। বুঝলেন স্যার, শিবতোষবাবুর যেখানে যাবার ইচ্ছে অথচ যেতে পারছেন না সেই সব জায়গায় পাঠাতেন এই অধমকে, রমাপতির সবিনয় সংযোজন।"

শিবতোষ স্মৃতি যেন শেষ হতে চায় না রমাপতির। চোখ বড়-বড় করে সে বললো, "একবার সকালে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। উনি পকেটে দশ টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন, এখনই কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের তেতলায় চলে যান। সারাদিন ওখানে বসে থাকবেন, কফি পকৌড়া যতবার খুশি খাবেন, আর নোট করবেন ছেলেমেয়েরা নিজেদের মধ্যে কী ভাষায় কথাবার্তা বলছে। সারাদিন ওখানে কাটিয়ে সোজা শিবতোষবাবুর বাড়িতে এসেছি। উনি দেড়ঘণ্টা ধরে অনেক ডায়ালগ নোট করলেন, আমাকে আরও দশ টাকা দিলেন। আগেকার দশ টাকার পুরোটা খরচ হয়নি, আমি সাড়ে তিন টাকা ফেরত দিতে গেলাম, উনি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, নিলেন না। তারপরেই তো কফি হাউসের পটভূমিকায় ওঁর বড় গল্প 'সান্নিধ্য' পত্রিকায় বেরিয়ে বাজিমাত করলো। উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের কথাবার্তার স্টাইল, এমনকী ভাষা প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পাল্টে যায়, স্যার। শিবতোষবাবু কখনও ওসব ব্যাপারে ঝুঁকি নিতেন না, তাই ওঁর গল্পগুলো অতো তাজা মনে হতো। 'সান্নিধ্য' পড়ে আমি নিজেই তাজ্জব, মনে হলো লেখক যেন মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ওই কফি হাউসে কাটিয়েছেন।"

"ওই গপ্পোটা নিয়ে সমালোচনাও হয়েছিল রমাপতি। যদ্দুর মনে পড়ছে, পত্রিকায় অভিভাবকদের চিঠি বেরিয়েছিল।"

"ওঃ! আপনার স্মৃতি-শক্তি খুবই প্রখর। কোথায় কী নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে সে খবর আপনি রাখেন। শুনুন স্যার। আমি 'সান্নিধ্য'-র মেইন গপ্পোটা সাপ্লাই করিনি—ওটা শিবতোষবাবু নিয়েছিলেন মদন বসাকের কাছ থেকে। সাহিত্যিক কমলেশ গাঙ্গুলির রগরগে গপ্পোগুলো যে সাপ্লাই করতো। সুঁড়িখানায় সারাক্ষণ পড়ে থাকতো মদন বসাক, মসলাদার গপ্পোর ওখানে ছড়াছড়ি। মদন বসাকই শিবতোষবাবুকে সেবার সাপ্লাই করলো। আর উনিও আধুনিক হবার তাগিদে লিখে ফেললেন পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধ অধ্যাপক এবং একুশ বছরের ছাত্রীর

রোমান্স। আমার দায়িত্ব ছিল শুধু ডায়ালগ সাপ্লাই করা, ওতে একটি কাঠি কিংবা একটি কাঁকর পাবেন না, একেবারেই ঝাড়াই-বাছাই মসলা।"

রমাপতির কাছেই জানা গিয়েছিল, 'সান্নিধ্য' গল্পের কফি হাউস ডায়ালগগুলো সবই সংগ্রহ করেছিল রমাপতি। "আমি তো স্যার, সাপ্লাই করেই খালাস, তারপর সোনার অলঙ্কারের উপর ওগুলো হীরে-জহরতের মতন বসিয়েছিলেন শিবতোষ চট্টোপাধ্যায়। পাকা জহুরি, সেই সঙ্গে অদ্ভুত পালিশের কাজ। গপ্পো পড়ে কে বলবে মদন বসাক এবং রমাপতি দু'জনেরই কাঁচামাল একটা গল্পে মেশানো হয়েছে!"

রমাপতি এরপর মাঝে-মাঝে গপ্পো নিয়ে এসেছে, আমি কয়েকবার গপ্পো কিনেওছি ওর কাছ থেকে।

রমাপতি সেবারে এসে বললো, 'একটা চমৎকার গপ্পো রয়েছে, নেবেন নাকি? আপনি তো একটু আদর্শ-টাদর্শ পছন্দ করেন, আপনার হাতে খুলবে ভাল। আদর্শও বটে আবার অদ্ভুত প্রতিশোধের গপ্পোও বটে। এক ভদ্রলোক পুরনো জমিদারবাড়ির ছেলে, এই কলকাতা শহরেই থাকেন। একজন উঠতি বড়লোক ওঁর বন্ধুত্বের মাধ্যমে বাড়িতে আসা-যাওয়া করতো, সেই সুযোগে একদিন ওঁর কমবয়সি ভাইঝিকে কোনো ছুতোয় বাড়ির বাইরে নিয়ে গিয়ে ফুসলোবার চেষ্টা করেছে। সে খবর তো শান্তশীলবাবুর কানে পৌঁছেছে। তারপর একদিন উনি আট-দশজন বন্ধু এবং ওই উঠতি রঞ্জিত মজুমদারকেও বাড়িতে খেতে ডেকেছেন। বলেছেন, খাবার পরে কিছু স্পেশাল শো হবে। প্রচুর খাওয়া-দাওয়া হলো, তারপর রঞ্জিত মজুমদার উঠতে গেলেন, তখন শান্তশীল রায় বললেন, যাবেন কোথায়? বসুন, এখনই স্পেশাল শো হবে। সবাই বসার ঘরে জমা হয়েছে, তখন কোমরের বেল্ট খুলে পেটাতে লাগলেন ওই উঠতি বড়লোক রঞ্জিত মজুমদারকে। শান্তশীল বলতে লাগলেন, 'শুনুন, এই শুয়োর-কা-বাচ্চার কথা! বাড়িতে বউ আছে, ছেলে আছে, বয়স হয়েছে, অথচ ছুঁক ছুঁক ভাব যায়নি। বিশ্বাস করে আমার বাড়িতে ঢুকতে দিয়েছিলাম, তার যোগ্য প্রতিদান দিয়েছে।' তারপর সে যে কী মার, আপনাকে কী বলবো! অথচ পনরো মিনিট আগে খাওয়ার সময় রঞ্জিত মজুমদারকে কী আদর-আপ্যায়ন! একেবারে কনট্রাডিকশন। ঠিকমতন খেলালে, আপনার হাতে গপ্পোটা যা খুলবে স্যার।"

এই গল্পের জন্য চল্লিশ টাকা পেয়ে রমাপতি বলেছিল, "অন্য কেউ হলে কুড়ি টাকার বেশি পেতাম না; আমিও নিতাম না। কিন্তু চল্লিশ টাকার কমে একটা চটি হবে না। চটিটা খুব দরকার। চটির দোষ নেই, সমস্ত শহর চষে বেড়াই, একটু বেশি ধকল পড়ে।"

এই গপ্পোটা লিখে খুব সুনাম হয়েছিল আমার। তখনকার পুলিশের আই-

জি ফোন করে জানতে চেয়েছিলেন, আইডিয়াটা কী করে মাথায় এলো? আমি বলেছিলাম, "সাপ্লায়াররা দিয়েছে।" উনি হাসতে লাগলেন। ভাবলেন আমি রসিকতা করছি।

অল্প ব্যবধানে দুটো তিনটে ভাল ভাল প্লট সাপ্লাই করেছে রমাপতি। আমি যতটা পারি পুষিয়ে দিয়েছি ওকে। রমাপতি টাকা নেয়, কিন্তু ভীষণ লজ্জা পায় আসলে সাহিত্য সম্বন্ধে ওর নিবিড় ভালবাসা। নিজের শোনা অথবা সংগ্রহ করা প্লটটা লেখকদের হাতে কেমন বিকশিত হয়ে ওঠে তা দেখতে সে খুব ভালবাসে। সম্ভব হলে রমাপতি হয়তো টাকা নিতো না। কিন্তু চাকরির রোজগার সীমিত। কোনো এক হিন্দি বিত্ত সমাচার পত্রিকায় কাজ করে। এই কাগজে শেয়ারবাজারের ওঠা-নামার খবরাখবর থাকে। অতি সামান্য কিছু গ্রাহক—সাধারণ লোক এ-কাগজ চোখেও দেখেনি, নামও জানে না।

রমাপতি বলেছে, "আপনি বাইরে এতো শান্ত লোক, কিন্তু প্রতিহিংসার দৃশ্যটা লেখায় আপনি যা চমৎকার ফুটিয়েছিলেন। আপনি আরও প্রতিশোধের গপ্পো লিখবেন, স্যার?"

"মারধোর আমি ঠিক ম্যানেজ করতে পারি না, রমাপতি। ওসব পড়ে মানুষের কী মঙ্গল হবে?"

হেসেছে রমাপতি। "ওই বারওয়েল সায়েব এবং বিবেকানন্দ আপনার খুব ক্ষতি করেছে। আপনার স্বপ্ন, প্রত্যেকের বুকের মধ্যে যে প্রদীপটা রয়েছে সেটা জ্বালিয়ে মানুষের ভিতরে অন্ধকার দূর করা। এ-যুগের গপ্পো উপন্যাসে এটা প্রায় অসম্ভব, ও-কাজটা এখন কেবল গানের মধ্যে হতে পারে। শিবতোষবাবু তো বলতেন, মানুষ যতই সাধু সাজুক সে যে আসলে একটি হাড়-হারামজাদা এইটাই আমি বার বার দেখাতে চাই। তুমি ওইরকম গপ্পো আমাকে সাপ্লাই করে যাও।"

আমি রমাপতির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। "সবাই সব জিনিস পারে না এ-পৃথিবীতে, রমাপতি।"

রমাপতি জানালো, "আমি একবার একজন ভাল লোকের গপ্পো বললাম। শিবতোষবাবু কিন্তু লাস্ট প্যারাগ্রাফে পাল্টে ওই ভাল মানুষটাকেই হাড়-হারামজাদা করে দিলেন। পৃথিবীতে ভাল মানুষ আর জন্মাতে পারে না, এইটাই ওঁর শেষ জীবনের বক্তব্য।"

রমাপতির ইচ্ছা, ওর সমস্ত গল্পই আমি নিই। আমি রাজি হইনি।

চায়ের দোকানে বসে, রাস্তায় ঘুরে অচেনা-অজানা মানুষের সঙ্গে কথা বলে রমাপতি কত রকমের, প্লট সংগ্রহ করে, সব আমার চিন্তার সঙ্গে মেলে না। আরও দু-একজন লেখকের সঙ্গে ওর যোগাযোগ থাকা উচিত। তা হলে রমাপতির কিছু

রোজগার হবে।

অভাবের মাথায় রমাপতি দু'একবার সমস্যারও সৃষ্টি করেছে। একই ঘটনা দু'জন লেখকের কাছে বর্ণনা করেছে, এবং পুজো সংখ্যায় দু'জন লেখকই ওই প্লটের উপর নির্ভর করেছেন।

সে এক গুরুতর পরিস্থিতি! রমাপতি কিন্তু মিথ্যাবাদী নয়। ব্যাপারটা সে স্বীকার করেছে। বলেছে, দোষটা পুরোপুরি তার নয়। তখন খুব আর্থিক টানাটানি চলছে। সাহিত্যিক প্রতুল গাঙ্গুলির কাছে রমাপতি গপ্পোটা বলেছে। নেশার ঘোরে ছিলেন প্রতুল। ব্যাপারটা শুনছেন কিন্তু হাঁ-না কিছুই বলেননি। পরের দিন রমাপতি বাধ্য হয়ে সুধাপদ মুখার্জির কাছে গিয়ে একই গপ্পো বলেছে। সুধাপদ গপ্পোটা সম্বন্ধে উৎসাহ না দেখালেও রমাপতিকে কিছু টাকা দিয়েছেন। তারপর প্রতুল গাঙ্গুলির সঙ্গে যখন কয়েক সপ্তাহ পরে দেখা তখন তিনি রমাপতিকে খবর দিয়েছেন গপ্পোটা তিনি ব্যবহার করেছেন।

সে ভীষণ এক সমস্যা—রমাপতি দু'রাত ঘুমোতে পারেনি। আমার কাছে ছুটে এসেছে। আইম খুব বকুনি দিয়েছি। বলেছি, "লেখকদের এইভাবে বিপদে ফেলবার কোনো মানে হয় না।"

রমাপতি একবার ভেবেছে, দু'জনের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা বলবে, ক্ষমা চাইবে। কিন্তু সাহস পায়নি। পুজোর সময় কী কাণ্ড হবে ভেবে বেচারা পাগলের মতন হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, জীবনে এমন কাজ আর কখনো করবে না।

সেবার মহালয়ার দিনে রমাপতি আবার এসেছিল। বললো, "আমার সাধ্যে কুলোয় না তবু টাকা ধার করে বাহাত্তর টাকায় দু'খানা পুজো সংখ্যা কিনেছি। আমার অশেষ ভাগ্য—প্রতুল গাঙ্গুলি গপ্পোটা বম্বের পটভূমিকায় নিয়ে গিয়েছেন, আর সুধাপদবাবু চলে গিয়েছেন মালদহের পটভূমিকায়। সুধাপদবাবু মেয়েটাকে করেছেন হাফ গেরস্ত, আর প্রতুলবাবু করেছেন বম্বে ফিল্মের একস্ট্রা। সুধাপদবাবুর নায়িকা শেষ পর্যন্ত সুইসাইড করেছে, আর প্রতুলবাবু দেখিয়েছেন মিলন। কারণ চিত্রতারকা মিসেস সেন ওই গপ্পোটাকে সিনেমায় কিনে নিতে পারেন। উনি আবার সুইসাইড পছন্দ করেন না। যাই হোক, আমি কোনোক্রমে বেঁচে গিয়েছি। ডুবতে-ডুবতে পায়ের তলায় মাটি পাওয়া, ভগবানের অশেষ করুণা।"

এরপরেও রমাপতি এসেছিল। ভীষণ টাকার দরকার। ওর কাছে নাকি একটা ভাল গপ্পো আছে।

"দুর্দান্ত গপ্পো স্যার। মুচিপাড়া থানার এক দারোগার মুখ থেকে গরম গরম শোনা। নাম দিতে পারেন ক্রোড়পতি ও পতিতা। ক্রোড়পতি এক পরিচিতা পতিতাকে অবহেলা ও অপমান করেছে। প্রতিশোধ নেবার জন্যে সে যা করলো

আপনি ভাবতে পারবেন না। অর্ডিনারি লোকে ভাববে, ক্রোড়পতির বউকে খবর পাঠিয়ে দিয়েছিল। তা নয় কিন্তু। নেভার। আগে প্রদীপ যেমন দপ করে জ্বলে ওঠে সেইভাবে অনেক মায়াজাল বিস্তার করে ক্রোড়পতির বাইশ বছরের ছেলেকে ওই পতিতা নিজের অতিথি করলো। ভাবতে পারবেন না স্যার। আমি নিজেও বিশ্বাস করতাম না। যদি না মুচিপাড়া থানার দারোগা আমাকে সমস্ত ব্যাপারটা বলতো।"

রমাপতি বলেছে, "আপনি গপ্পোটা রাখুন স্যার। পরে আরও অনেক ডিটেল এনে দেবো। আমি বুঝছি, ওই নষ্ট মেয়েটা কীভাবে ক্রোড়পতির পুত্রকে ধীরে-ধীরে আকর্ষণ করলো তা মাথা খাটিয়ে বার করা যায় না, আসল ব্যাপারটাই আপনাকে জানতে হবে।"

রমাপতির অবস্থা বুঝে বাধ্য হয়েই আমাকে কিছু টাকা দিতে হয়েছে। তারপর অনেকদিন ওর খবরাখবর নেই।

শেষে গত রবিবারে যখন কাজ করছি সেই সময় ময়লা শার্ট এবং নীল রঙের টেরিলিন প্যান্ট পরে রমাপতির হাজির।

রমাপতির বললো, "অনেক দিন আসতে পারিনি স্যার।"

আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমার বিরক্তি প্রকাশিত হলো। "ওই যে মুচিপাড়া থানার ঘটনাটা হাফ কামানো অবস্থায় রেখে তুমি চলে গেলে। পুজোর সময় মাসিক 'বিষাদ' পত্রিকায় ওটা লিখবো ঠিক করেছিলাম। কিন্তু হলো না। সম্পাদকের কাছে ছোট হতে হলো।"

খুব লজ্জা পেলো রমাপতি। "আমার দোষে আপনি শুধু-শুধু অসুবিধেয় পড়লেন। আসলে মুচিপাড়া থানার ওই মেয়েটা বিপদে ফেলে দিলো, স্যার, আমার জানাশোনা দারোগা যেমনি থানা থেকে বদলি হয়ে গেল অমনি ওই বেশ্যা অন্য মূর্তি ধারণ করলো। কী করে ওই কোটিপতির ছেলেকে নিজের ঘরে টেনে এনেছিল তা কিছুতেই ফাঁস করলো না। বোধহয় কিছু তুকতাক আছে ওদের, কিন্তু কিছুতেই তা স্বীকার করবে না।"

রমাপতি জানালো, "তাছাড়া আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, স্যার। দু'দিনের বেশি ওই বেশ্যার পিছনে ছুটতে পারিনি।" রমাপতি এবার আমাকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা চালালো। "আরও অনেক প্রতিশোধের গপ্পো হাতের গোড়ায় আসছে। আমি একের পর এক আপনাকে সাপ্লাই করে যাবো। আপনার একটা বড় বই হয়ে যাবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবো, এই বই থেকে আপনার নাম-যশ উমাশঙ্কর হালদারকেও ছাড়িয়ে যাবে।"

"আমি কাউকে ছাড়িয়ে যেতে চাই না, রমাপতি। আমি কেবল নিজের মতন থাকতে চাই।"

"এটা আপনার বিনয়। ভগবান আপনাকে চিরকাল বিনয়ী রাখুন, কিন্তু আমার প্লটগুলো আপনার দক্ষ হাতে পড়লে আপনি অনেককে ছাড়িয়ে যাবেন এ-কথা শিবতোষবাবু পর্যন্ত বলে গিয়েছেন।"

আমি ওসব কথায় কান দিতে এই মুহূর্তে আগ্রহী নই। রমাপতি বললো, "আমার চেনাশোনা দারোগা হেড আপিসে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে আগামী সপ্তাহে মুচিপাড়া থানায় ফিরে আসছে। তখন ওই বেশ্যা আমাকে আর অবহেলা করবে না, সুড়সুড় করে সব বলে দেবে। আপনি দুটো সপ্তাহ সময় দিন আমাকে।"

আমি কোনো মন্তব্য করছি না। রমাপতি জানালো, "প্রতিশোধ নিতে গেলে সবসময় ভাল হয় না, স্যার। আঘাত দিতে গেলেই আঘাত পেতে হয়। আপনাকে ভীষণ ভাল গপ্পো দিতে পারি। এটা আপনার উপন্যাস হয়ে যাবে। ঘটনাটা আমি রেখে দিয়েছিলাম। বেচবার কোনো ইচ্ছে ছিল না।"

আমি একটু গম্ভীর হয়ে বললাম, "রমাপতি, তুমি তো জানো, সবে পুজো শেষ হয়েছে। এখনই লেখার তেমন চাপ নেই। তাছাড়া আমি এখন খবরের কাগজে বিদেশভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখছি।"

"ভ্রমণকাহিনীতে আপনাদের অনেক সুবিধে, বুঝতে পারি। ট্রাভেল স্টোরিতে মেয়েমানুষের চরিত্র থাকলেও বা কি না-থাকলেও বা কি! পরিণতিতে মিলন অথবা বিচ্ছেদের, জয় অথবা পরাজয়ের বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই—লোকে ধরেই নিয়েছে মানুষটা যখন একটা অজানা দেশে ঢুকছে তখন একদিন তার ভ্রমণ শেষ হবেই, সে আবার নিজের দেশে ফিরে আসবে।"

"ভ্রমণকাহিনী আজকাল বহুলোক খুব মন দিয়ে পড়ে, রমাপতি।"

"পড়বেই তো স্যার—দেড় টাকা খরচ করে প্রতি রবিবার আমেরিকা ঘুরে আসতে পারলে মানুষ কেন নিজেকে বঞ্চিত করবে? তবে কি জানেন স্যার, উপন্যাস ইজ উপন্যাস। বাঙালির রক্তের মধ্যে ওই নেশাটা ঢুকে গিয়েছে। নিজের ঘরসংসারে যাই ঘটুক, নায়ক এবং নায়িকার কী পরিণতি হবে তা জানবার জন্যে বাঙালিরা ব্যাকুল হয়ে উঠবে। বিশেষ করে জীবন থেকে আহরণ করে আনা ঘটনা। এই যে আপনি বানিয়ে-বানিয়ে চরিত্র আঁকেন না, এতে আপনার পয়সা খরচ হয়, সময় খরচ হয়, খোঁজখবর করতে হয়, লেখার পরিমাণ কমে যায়—তবু আপনার লাভ শেষ পর্যন্ত। লোকে জেনে গিয়েছে, আপনার গল্পগুলো গপ্পো নয়, নিশ্চয় কোথাও কোনোদিন ওইরকম ঘটেছিল। যা ঘটেছে অথচ কেউ চাপা দিয়ে রেখেছে, তা জানবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠছে।"

আমি বুঝতে পারছি রমাপতি আজ আমাকে ছাড়বে না। স্পেশাল কোনো

উদ্দেশ্য নিয়ে আমাকে একটা গপ্পো শোনাবেই। এখন লগনসার বাজার নয়, নগদ দাম দিয়ে গপ্পো তুলে নেওয়ার লেখক কম।

রমাপতি বললো, "সামনেই তো বুক ফেয়ার রয়েছে। লিখুন না একটা উপন্যাস, যা কোনো পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত না-হয়েই গ্রন্থাগারে বইমেলা উপলক্ষে গরম-গরম প্রকাশিত হবে।"

গল্পের অনেকটা শুনতে হলো আমাকে। শেষে বললাম, "আমার ভ্রমণকাহিনীর কিস্তি আজ দিতেই হবে। আর গপ্পো শোনা ঠিক হবে না। নতুন কিছু মাথায় ঢুকলেই আমার পুরনো ভাবনাচিন্তাগুলো অনেক সময় তালগোল পাকিয়ে যায়।"

কিছু টাকার যে প্রয়োজন রমাপতির তা বুঝতে পারছি। চাহিদা পূরণ করে তখনকার মতন বিদায় দিলাম রমাপতিকে।

রমাপতি নিজের দারিদ্র্য সম্পর্কে কিছুই বলে না। কিন্তু আজকাল সাধারণ মানুষের যে কী অবস্থা তা বুঝতে পারি। খরচ আর কত কমানো যাবে? সুতরাং নানাভাবে রোজগার বাড়ানোটাই একমাত্র পথ। রমাপতি সৎপথে খেটেখুটে রোজগার করে। আমি এক-একবার বলেছি, "এইভাবে গপ্পোগুলো অপরের হাতে তুলে না দিয়ে নিজে লেখো না কেন?"

হা-হা করে হেসেছে রমাপতি। "ভাগ্যচক্রে মানুষ কত প্রিয় জিনিস অপরের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়। সে তুলনায় এসব গপ্পো কী আর জিনিস! তাছাড়া সাহিত্য সৃষ্টি করা অতো সহজ জিনিস নয়, স্যার। আমার জোগাড় করা ঘটনাগুলো আপনাদের কলমের মাধ্যমে চিরকাল বেঁচে থাকবে ভাবতে খুব ভাল লাগে। এই সিনেমাওয়ালাদের বা টিভিওয়ালাদের কথা ধরুন—ওদের কাছে গেলে পয়সা দুটো বেশি পাবো হয়তো, কিন্তু গল্পের মাথামুণ্ডু থাকবে না। ঘটনার পরিণতি ওরা যে কী করে দেবে তার ঠিক নেই। গল্পের শেষটা আমি যেরকম জোগাড় করে এনেছি সেরকম না থাকলে আমার মনটা খারাপ হয়ে যাবে। ভগবানের চেয়ে বড় গল্পকার তো আর কেউ হতে পারে না!"

সেদিন রমাপতি চলে যাবার পরে আশ্চর্য মানুষটার কথা অনেকক্ষণ ভেবেছি। রমাপতি যে-গল্পটা মুখে মুখে শোনাতে শুরু করেছিল তাও মাথার মধ্যে ঘুরছে।

রমাপতি যখন গপ্পোগুলো বলে তখন আমি মাথা নিচু করে লিখে যাই না ; আমি ওর মুখের ভাবভঙ্গি লক্ষ করি। লোকটার মুখের মধ্যে একটা হারিয়ে যাওয়া যুগের ছায়া আছে। এ-ধরনের মানুষ যে পৃথিবীতে বেশিদিন থাকবে না তা আন্দাজ করতে পারি। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হলেই অসংখ্য বিচিত্র চরিত্র লোপ পাবে—নতুন যুগের সাহিত্যিকরা তাদের কোনো সন্ধান পাবে না।

এইসব চিন্তার মধ্যেই নিউজার্সি থেকে ফোন এলো জেকব মার্কাস সম্পর্কে। একজন বিশ্বস্ত লোককে সঙ্গী হিসেবে দিতেই হবে।

একটু চিন্তার পরেই চট করে আমার রমাপতির কথা মনে পড়ে গেল। রমাপতির অর্থের প্রয়োজন। কয়েকদিন যদি সাহেবের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় মন্দ কী? আর জেকব মার্কাস যদি নাক উঁচু সাহেব-লেখকদের মতন বারংবার রমাপতির বক্তব্য উদ্ধৃত করে কলকাতা শহরের মানুষদের অপদস্থ করেন তা হলেও কিছু এসে যায় না। রমাপতি যখন বিখ্যাত মানুষ নয় তখন তার বক্তব্য নিয়ে সায়েবী কাগজের সহকারী সম্পাদকরাও অতিমাত্রায় উৎসাহী হয়ে উঠবেন না।

তাছাড়া এ-ব্যাপারে রমাপতির থেকে যোগ্য মানুষ আমি কোথায় পাবো? রাধারমণ মিত্তিরের সঙ্গে অনেক আড্ডা দিয়েছে রমাপতি। 'কলিকাতা দর্পণ' থেকে অসংখ্য উদ্ধৃতি দিয়েছে সে। শিল্পী রথীন মিত্রর সঙ্গে কাজে-অকাজে ঘুরে বেড়িয়েছে রমাপতি। এই আশ্চর্য ভদ্রলোক বেশ কয়েক বছর ধরে কলকাতার যেসব ছবি এঁকেছেন সায়েব হলে 'স্যার' হয়ে যেতেন। রমাপতির কাছেও কলকাতা শহরের কোনো কিছুই অজানা নয়।

কিন্তু প্রশ্ন হলো রমাপতির সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় কী করে? কোথাকার কোন যদুবাবুর মেসে থাকে রমাপতি। ঠিকানাটা একবার যেন দিয়েছিল, কিন্তু সেই কাগজ কোথায় যে রেখেছি এখুনি মনে করতে পারছি না।

আমার হঠাৎ খেয়াল হলো রমাপতি আমাকে এতো খবরাখবর দেয়, কিন্তু আমি রমাপতি সম্বন্ধে খুবই কম জানি। লোকটার যে ঘরসংসার নেই সেটা আমি আন্দাজ করে নিয়েছি। কারণ ঘরসংসার থাকলে লোকে যদুবাবুর মেসে থাকবে কেন? আর থাকলেও মাসে একবার অন্তত দেশে যাবে।

রমাপতি কখনও কলকাতা ছেড়ে কোথাও গিয়েছে বলে শুনিনি। তার সমস্ত গল্পের পটভূমিকা কলকাতা। রমাপতির কাছে এই প্রসঙ্গ তুলেছিলাম। রমাপতি বলেছিল, "অনেকদিন ধরে জানাশোনা না থাকলে কোনো জায়গা সম্বন্ধে খোঁজখবর পাওয়া যায় না, স্যার। অন্য জায়গায় গেলে আমি দিশেহারা হয়ে যাবো। লোকে ভাববে, আমি স্পাই। আমি যে স্রেফ দুটো পয়সা রোজগারের জন্যে ঘটনার পিছনে, গল্পের পিছনে ছুটি তা লোকে বিশ্বাস করবে না। আপনি তো সাহিত্যিক বরেন্দ্র মিত্রের কথা জানেন। অচেনা পরিবেশে মেয়েদের সম্বন্ধে খোঁজখবর করতে গিয়ে বেশ কয়েকবার হাঙ্গামায় পড়েছেন, লোকে ভুল বুঝেছে। ক'টা পয়সা বাঁচিয়ে ওঁর কী লাভ হয়েছে স্যার? সহজেই কোনো গল্প-সাপ্লায়ারের কাছে যেতে পারতেন বা তাকে খোঁজ নিতে পাঠাতে পারতেন।"

রমাপতির কথা যতই ভাবছি, একটু অবাকই লাগছে। লোকটি বুদ্ধিমান,

পড়াশোনা আছে। তবু কেন এইরকম পড়তি অবস্থা তা আমার খোঁজ করা উচিত ছিল। একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কতদিন ওই যদুবাবুর হোটেলে আছো?"

"হোটেল বলবেন না, মালিক খুব দুঃখু পায়। যদিও আসলে হোটেল, তবু মেস বলে সবাই। কবে থেকে যে আছি জিজ্ঞেস করবেন না, তারিখটা নিজেই ভুলে গিয়েছি। অনেকদিন আছি এটাই ঘটনা। যদুবাবু নতুন মেম্বারদের যে সিট রেন্ট এবং খাওয়া খরচ কত বাড়িয়ে দিয়েছেন ভাবতে পারবেন না। আমিই এখন সবচেয়ে পুরনো বোর্ডার, তাই একটু স্পেশাল খাতির আছে। তাছাড়া ওই যে উমাশঙ্কর হালদার, শিবতোষ চট্টোপাধ্যায়, আপনি নিজের হাতে সই করে গল্পের বই দেন এতে আশ্রয়স্থলে একটু স্পেশাল সম্মান হয়। মালিকও খাতির করে।"

সেদিন রমাপতি একটু অদ্ভুত আচরণ করেছিল। "আপনাকে একটা গপ্পো দেবো যার জন্যে কোনো টাকা নেবো না। অনেক পয়সা দিয়েছেন আপনি, ভগবানের দয়ায় কোনো অসুবিধে নেই আমার। একবার আপনাকে কিছু দেবো যা বিনামূল্যে দিতে পারি।"

"কী বলছো রমাপতি!"

"ঠিকই বলছি, স্যার। মরবার পর তো পয়সা আমার সঙ্গে যাবে না। কিন্তু কিছু স্মৃতি আপনাদের লেখার মাধ্যমে বেঁচে থাকবে।"

আমি বুঝতে পারছি রমাপতি কী বলতে চাইছে। রমাপতির ইচ্ছে, গল্পটা আমাকে বিনা পয়সায় সাপ্লাই করবে কিন্তু সে-বইটা যেন ওকে উৎসর্গ করি। এ আর বড় কথা কী! সহজেই করা যায়।

"বেশ বড় কথা, স্যার।" রমাপতি উত্তর দিয়েছিল। "উমাশঙ্কর হালদার তো আমার সঙ্গে ওঁর যোগাযোগের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গোপন রাখতেন। উনি যে বাজার থেকে গপ্পো কেনেন তা কিছুতেই প্রকাশ করতেন না, পাছে পাবলিকের কাছে তিনি ছোট হয়ে যান। সেই জন্যে কোনো বই উনি সাপ্লায়ারদের উৎসর্গ করেননি।"

"দেখো রমাপতি, আমার ওসব ভয় নেই। আমি হচ্ছি তাঁতীর মতন—আমি সুতো নিজে তৈরি করি না। হাট থেকে যখন যেমন সুতো পাই সেই অনুযায়ী কখনও গামছা কখনও শাড়ি বুনি। আমার কোনো সৃষ্টি-অভিমান নেই ; আমার গল্পের ভাণ্ডার রয়েছে পৃথিবীর মানুষদের ঘরে ঘরে।"

রমাপতি চা খেতে-খেতে বললো, "একটা গপ্পো আপনাকে শুনিয়ে রাখতে চাই, স্যার। সেদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছি। হঠাৎ বুকে একটু চাপ অনুভব করতে লাগলাম। সেই সঙ্গে নিঃশ্বাস নেবার একটু অসুবিধে। ভয় হলো, হঠাৎ না চলে যেতে হয়। অন্তত অফুরন্ত সময় আমার কাছে আর নেই, স্যার।

ব্যথাটা কমে যেতেই আপনার কাছে আসবো ঠিক করলাম। একটা গপ্পো আপনাকে উপহার দিয়ে যাই। লিখবেন ভাল করে, স্যার।"

রমাপতি শুরু করলো : "মেন ক্যারেকটারটার নাম আপনি রমাপতিই রাখবেন। বরং গোড়াতেই লিখে দেবেন—এই গল্পের সব চরিত্র কাল্পনিক। কারও সঙ্গে কোনো মিল থাকলে তা নিতান্তই আকস্মিক।"

রমাপতি বলে চলেছে, "আমি ভাবছি, আপনি গল্পটা শেষ করবেন কী করে? আপনি তো আবার শেষটা না বেঁধে গপ্পো শুরু করতে চান না। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি স্যার, যখন জীবনের গপ্পো শুরু হয় তখন শেষটা কী হবে তা নায়ক-নায়িকা কারও জানা থাকে না। শেষটা জানা থাকলে অনেক গল্পের শুরুই হতো না। এই গল্পের রমাপতির কথাই ধরুন না।"

রমাপতি এবার গড়-গড় করে গল্প শুরু করলো। "আপনি অন্য এক রমাপতি কর্মকারের গল্প লিখুন। ধরে নিন, এই রমাপতি আর সেই রমাপতি এক নয়। এই রমাপতির মাথার চুল পাতলা হয়ে গিয়েছে। কপাল তেলচকচকে, জামা প্যান্ট আধময়লা, গেঞ্জি ছেঁড়া, মুখ চোয়াড়ে হয়ে গিয়েছে, মাড়ির দাঁত চারটে নেই। আর সেই রমাপতি প্রতিদিন নতুন ইস্ত্রি করা শার্ট ও প্যান্ট পরতো। মাথায় ঢেউ-খেলানো চুল ছিল, অফিস যাবার আগে পনেরো মিনিট ধরে বউ সাজগোজ করিয়ে দিতো, মুখের তেলচকচকে ভাব তুলে ফেলবার জন্যে ল্যাকটো ক্যালামিন মাখতো। এই রমাপতি রান্না জানে, রুটি বেলতে পারে, নিজের জামাকাপড় কাচতে ও ইস্ত্রি করতে জানে, আর সেই রমাপতি চা করতেও জানতো না। সব দায়িত্ব ছিল রাজেশ্বরীর উপর।"

রমাপতি এরপর অনুরোধ করলো, ছাপাখানার চাপ থাকলেও ওই নামটা আমি যেন পরিবর্তন না করি। অনেকগুলো 'শ্ব' লাগবে, অর্ডিনারি ছাপাখানা কম্পোজ করতে পারবে না।

"গরিব বাড়ির মেয়েকে ওইরকম নাম কে যে দিয়েছিল, স্যার! ওর কোষ্ঠিতে নাকি লেখা ছিল রাজেশ্বরী হবে। কিন্তু অতো সুন্দরী হয়েও রমাপতির হাতে পড়লো। হুগলি কোন্নগর থেকে এই কলকাতায় এলো স্বামীর ঘর করতে। স্বামী তখন প্রভুদয়াল বর্মনের কোম্পানিতে কেরানির কাজ করে। অতি চমৎকার কোম্পানি। প্রভুদয়ালবাবু সত্যিই দয়ালু মানুষ—কোম্পানির সবাই ভালবাসেন, ভাল মাইনে দেন। কোম্পানিও ক্রমশ বেড়ে চলেছে, নতুন-নতুন বিজনেস আসছে। সবাই জানে আরও কয়েক বছর গেলে বিড়লা এবং জৈনদের মতন না হলেও বর্মনের কোম্পানিও বেশ বড় হয়ে উঠবে। ছোট থেকে কোম্পানির বড় হয়ে ওঠা অনেক সুবিধে, কারণ ছোট অবস্থার লোকেরাও সেই সঙ্গে বড় হয়ে ওঠে।"

"অন্তত রাজেশ্বরী ওইরকম ভাবতো, জানেন স্যার। রাজেশ্বরী সুন্দরী, বাঙালিদের তুলনায় দীর্ঘাঙ্গিনী, দুধে-আলতা রঙ। বাংলা ছাড়াও হিন্দি জানতো সুন্দর। কোন্নগরে ওদের বাড়ির পাশে হিন্দুস্থান মোটরের কারখানা, ওদের অনেক হিন্দিভাষী পরিবার ছিল। রাজেশ্বরী তার স্বামীকে বলতো, তুমি সন্ধেবেলায় কস্টিং পড়ো, পরে উন্নতি করতে পারবে। অথচ এই রমাপতির মতন সেই রমাপতিও স্রেফ গল্পের বই পড়তে ভালবাসতো। অঙ্কে ভীষণ উইক ছিল সেও। অমন লোক কী করে কস্টিং অ্যাকাউনটেন্ট হবে বলুন তো?"

"রমাপতির কোম্পানিতে দু'নম্বর ছিল প্রভুদয়ালজীর ছেলে কুমারমঙ্গল বর্মন। "হ্যাঁ স্যার. দেখতে সুপুরুষ—একেবারে রাজপুত্তুরের চেহারা বলতে যা বোঝায়। কাশ্মীরি আপেল যেন একটি। কী মিষ্ট ব্যবহার, কী সুন্দর কথাবার্তা, আপনাকে কী বলবো!"

"প্রতিদিন ওই রমাপতি বাড়িতে এসে আপিসের গপ্পো করতো। ফলে আপিসের সতীশ বেয়ারা থেকে আরম্ভ করে প্রভুদয়ালজী, কুমারমঙ্গল বর্মন সবাই কে কী করে, কখন আপিসে আসে কী খায়, ক'টার সময় যায়, কখন আপিস ছাড়ে, ছেলের উপর বাপের কত টান সব জানতো রাজেশ্বরী।"

"রাজেশ্বরী নামে এবং ভাবনায় রাজেশ্বরী। যেহেতু গণকঠাকুর কোষ্ঠিতে লিখেছেন, জাতিকা একদিন ধনবতী হবে, বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে সে বসে থাকবে, সেহেতু ব্যাপারটা সে গুরুতরভাবে নিয়েছে। রাজেশ্বরী সাজগোজ করে, শাড়ি কেনে, নিজেকে সুন্দরী রাখার জন্যে যেসব প্রসাধনী প্রয়োজন তা জোগাড় করতে চায়।"

"এই এক মুশকিল। ভগবান সুন্দরীদের ভীষণ পলকা করেছেন, স্রেফ সুন্দরী থাকবার জন্যে যথেষ্ট মেহনত করতে হয়। একটু অবহেলা হলেই সৌন্দর্য উবে যায় ছিপি খোলা সেন্টের মতন।"

রমাপতির কিছু বলবার নেই। পয়সা কিছুটা আসে রাজেশ্বরীর পিত্রালয় থেকে। মেয়ে পিতৃদেবের আদরিণী। বাপের বাড়ির পয়সায় নিজের সাধ-আহ্লাদ মেটালে স্বামীর কী বলবার থাকতে পারে? রমাপতি নিজে ওসবের মধ্যে নেই—সে নির্বিবাদী মানুষ, ধরে নিয়েছে সামান্য চাকরি করেই জীবন কাটাতে হবে। আপিসের বাইরে যেটুকু সময় তা কেবল বই পড়ার জন্যে। রমাপতির চাপা সাহিত্য-স্বপ্ন ছিল।

রাজেশ্বরী কিন্তু ধরে নিয়েছে তার ভাগ্য পরিবর্তিত হবে। চিরকাল সে এই অখ্যাত-অঞ্চলের একটা কামরায় ভাড়াটে থাকবে না। রমাপতির ভাগ্যে যে বড়লোক হওয়া নেই তার ইঙ্গিত কোষ্ঠিতে রয়েছে। কিন্তু রাজেশ্বরী পাত্তা দিচ্ছে না ওই ইঙ্গিতকে। সে জানে, রাজেশ্বরীর ভাগ্য পরিবর্তন হওয়া মানেই

রমাপতিরও ভাগ্য পরিবর্তন।

রাজেশ্বরীর পিতৃদেব মৃত্যুর আগে মেয়ের হাতে বেশ কিছু টাকা দিলেন। এই টাকা থেকে রাজেশ্বরী নিজের সাধ-আহ্লাদ মিটিয়ে নানা সম্ভার কিনলো। তারপর তার মাথায় ঢুকলো বেহালাতে সে একটা ফ্ল্যাট কিনবে। ওইসব খোঁজখবর সে নিজেই জোগাড় করেছে। আপিসের লোক বলতে বাড়িতে তখন কেবল সতীশ বেয়ারাই আসতো। সতীশের বাড়ি হাওড়ার মাজুতে। বেশ গুছনো লোক। ইতিমধ্যেই দেশে নিজের একটি বাড়ি ফেঁদে বসেছে। বেয়ারার কাজ ছাড়াও সতীশ টুকটাক রোজগার করতো। তার ধারণা, স্রেফ রোজগার করবার জন্যেই পুরুষকে ভগবান এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।

সতীশ প্রথম রমাপতির বাড়িতে এসেছিল শাড়ি বেচতে। হুগলি ধনেখালি থেকে শাড়ি আনিয়ে সে বেচতো। রমাপতি তাকে বলেছিল, শাড়ি পছন্দর ব্যাপারে তার কোনো হাত নেই, এ-ব্যাপারে গৃহিণীর নিজস্ব মতামত আছে। সতীশ ছাড়নেওয়ালা নয়, রমাপতির সঙ্গেই একদিন বউদির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তারপর সে যেন স্বর্ণভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছিল, কখনও নগদে কখনও ধারে দামি দামি শাড়ি বেচে চলেছে সতীশ। সতীশ চালু সেলসম্যান, বলেছে, "বউদি, এই শাড়িখানা স্রেফ আপনার কথা ভেবেই তাঁতি তৈরি করেছে। আপনাকে ছাড়া আর কাউকে মানাবে না।" বউদি খুব প্লিজড হয়েছেন। এই এক মুশকিল, মেয়েরা প্রশংসা পছন্দ করে। মিষ্টি কথায় তারা গলে যায়।

সতীশ এক সময় পারিবারিক পরামর্শদাতা হয়ে উঠেছে। এবং যথাসময়ে রাজেশ্বরীর সঙ্গে ওই বেহালায় বাড়ি কেনার ব্যাপারে আলোচনা করেছে। বাবার টাকায় বাড়িটা হচ্ছে না, আরও কিছু ধার প্রয়োজন। কিন্তু ধারের ব্যাপারে রমাপতির আপত্তি। রাজেশ্বরী বলেছে, "এ-ধার খারাপ নয়। আমরা তো টাকা উড়িয়ে দিচ্ছি না। সম্পত্তি কিনছি।"

রমাপতি তবু উৎসাহী নয়। আপিসে টাকা ধার চাইলেই পাওয়া যায় না। ধার মানেই সুদ—সুদের টাকা গুণতে সে মোটেই আগ্রহী নয়। টাকা শোধ হবে কী করে?

সতীশ বেয়ারা অভিজ্ঞ লোক। দেনা নাকি টুকটুক করে নিজের অজান্তেই শোধ হয়ে যায়। এই তো সতীশের মাজুর বাড়ির দেনা কমতে কমতে শেষ হতে চলেছে। রমাপতি যদি সন্ধেবেলায় দুটো টিউশনি ধরে তা হলে কিস্তি এবং সুদ সম্পর্কে চিন্তা থাকবে না।

কিছু আপিসে টাকা ধার দেবার সিস্টেম নেই, জানিয়েছে রমাপতি। এরপর সতীশ গোপন পরামর্শ দিয়েছে। "ছোটবাবুকে ধরতে হবে"—কুমারমঙ্গল বর্মনের রাজার মন। দেখতেও রাজার মতন। নিজের বাড়ি করার সময় এঁকেই পাকড়াও

করেছিল সতীশ। তবে একা নয়, বউকে আনিয়েছিল।

মন্ত্রের মতন কাজ হয়ে গেল। ছোট সায়েব ভাঙা বাংলায় বললেন, "মা, আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। আপনার স্বামী এতদিন এখানে কাজ করছেন, নিশ্চয় আপনার বাড়ি হবে।"

সতীশ একেবারে অবাক। গোপনে টাকাটা পেয়েছে। আর, যা কেউ জানে না—অর্ধেক দেনা শোধ করতেই হয়নি। কুমারমঙ্গল সায়েব নিজেই বলে দিয়েছেন, সতীশ ও টাকা তোমাকে দিতে হবে না।

এরপরেই পরিকল্পনাটা মাথায় এসেছে। অফিস কর্মীদের বার্ষিক নাট্যোৎসবের দিন রাজেশ্বরী রঙমহলে উপস্থিত থাকবে এবং কুমারমঙ্গলের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবে সতীশ। রমাপতি নিজে থিয়েটার করছে। তাছাড়া তার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই ভিক্ষের ঝুলি এগিয়ে দেওয়ার। যা তার পাওনা নয় তা সে কেন চাইবে? কিন্তু সতীশ ও রাজেশ্বরীর অন্য ধারণা, কষ্ট না-করলে কেষ্টকে পাওয়া যাবে কী করে?

রাজেশ্বরী প্রচণ্ড উৎসাহ দেখিয়েছে, সতীশ সেই উৎসাহে ইন্ধন জুগিয়েছে এবং রমাপতি একমত না হলেও প্রচণ্ড বাধা দেয়নি। বার্ষিক থিয়েটারের দিন স্পেশাল সাজগোজ করেছিল রাজেশ্বরী।

সতীশ দু'মিনিটের জন্যে দেখা করিয়ে দিয়েছিল কুমারমঙ্গলের সঙ্গে। সেই দিন বুদ্ধিমতীর মতন টাকার কথা তোলেনি রাজেশ্বরী, স্রেফ আর একটা সাক্ষাৎকারের সময় ঠিক করে নিয়েছিল। সেই সাক্ষাৎকারের সময় রমাপতির উপস্থিত থাকা উচিত ছিল, কিন্তু সাহসে কুলোয়নি। রমাপতির চরিত্রের এই একটা দোষ—অপ্রিয় সমস্যার মুখোমুখি হতে ইচ্ছে করে না। কুমারমঙ্গল সায়েব যদি হঠাৎ রেগে উঠে বলেন, যা তোমার নিজের বলা উচিত ছিল তার জন্যে কেন ঘরের বউকে লেলিয়ে দিয়েছ? না, ওইরকম একটা পরিস্থিতির কথা রমাপতি ভাবতে পারে না। সতীশই ভরসা দিয়েছে, "আপনার ভরসা না হলে থাকবেন না, বউদি একাই একশো।"

সেদিন দু'জনে একসঙ্গে কুমারমঙ্গলের মুখোমুখি হলে পরিস্থিতিটা হয়তো অন্যরকম হতো। একান্ত সেই সাক্ষাৎকারে কী যে হলো তা ভালভাবে জানাই হয়নি। শুধু রাজেশ্বরী বলেছিল, "এমন চমৎকার মানুষকে তোমার অতো ভয়! টাকার কোনো অসুবিধে হবে না। সুদও লাগবে না বোধহয়। দেখা যাক কী হয়। সতীশ তো বলছে, ওঁর দয়ার শরীর। ঠিকমতন ধরলে, সব টাকা ফেরতও দিতে হবে না।"

এরপর রমাপতিকে কিছুদিন বাইরে থাকতে হয়েছিল। বেনারসের কাছে বর্মনদের ছোট্ট একটা গোডাউন তৈরি হলো তার কাজকর্মের জন্য বাইরে থাকা।

পনেরো দিন অন্তর রমাপতি তুন এক্সপ্রেসে কলকাতায় ফিরেছে, বউকে দেখেছে, আবার ফিরে গেছে। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেনি। ব্যাপারটা যে অমনভাবে গড়িয়ে যাচ্ছে তা তার স্বপ্নেরও বাইরে ছিল। বাড়তি কিছু রোজগারের লোভে রমাপতি সংসার থেকে দূরে পড়ে রয়েছে, আর মালিকের একমাত্র সন্তানের সঙ্গে কর্মচারীর স্ত্রীর অন্য অধ্যায় শুরু হয়েছে। ব্যাপারটা ভাবা যায় না।

রমাপতির অজান্তে এবং তার অনুপস্থিতিতে প্রণয় পর্ব অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে। কুমারমঙ্গল জাপানি টয়োটা গাড়িতে ঘুরে বেড়ায় ; বছরে কয়েকবার বিদেশে যায়, অবিবাহিত। মানুষ কখন যে কে কোথায় মজে তা বলা শক্ত।

এই পর্যন্ত বলে রমাপতি হাঁপাচ্ছে। একটু দম নিয়ে সে বললো, "এখনও কিছুই বলা হয়নি, স্যার। স্রেফ এইটুকু বলা যায়, ঘর কেনার লোভ করতে গিয়ে ঘর ছাড়ার বিপদ হাজির হয়েছে রমাপতির জীবনে। রাজেশ্বরী তখন বোধহয় হাতে চাঁদ পেয়েছে। কোষ্ঠিতে রাজরাজেশ্বরী হবার যে ইঙ্গিত ছিল তা এতদিনে সম্ভব হতে চলেছে।"

একটু থামলো রমাপতি। তারপর দম নিয়ে বললো, "রমাপতির জীবনে যত বড় বিপদই আসুক, পাঠকের চোখে এটা এখনও সামান্য ব্যাপার। মালিকের ছেলের নজর পড়েছে কর্মচারীর বউয়ের ওপর—নাটকে নভেলে অনেকবার এ কাণ্ড হয়ে গিয়েছে। এতে কিছু নতুনত্ব নেই—কামুক জমিদার প্রজার বউকে ধরে বাংলা গল্পে অনেক টানাটানি করেছে, চা-বাগানের সায়েবরা শ্রমিকের বউয়ের শরীরের দিকে নজর দিয়েছে অনেক নাটকে।"

রমাপতির বক্তব্য : "এখানে ব্যাপারটা একটু আলাদা। গপ্পোটার এই সবে শুরু। এখনো অনেক ব্যাপার আছে—সেই সঙ্গে প্রতিশোধ। ওই যে প্রতিশোধ নামে আপনার বড় বইটা সম্পর্কে কথা হচ্ছিল।"

রমাপতি বললো, "ব্যাপারটা অতো সহজে ছেড়ে দেবার ক্যারাকটার নয় রমাপতির। এরপর রাজেশ্বরীর ক্যারাকটারটা কেমন যেন বাঁকতে আরম্ভ করেছে।"

রমাপতি আমাকে আরও কথা বলতে যাচ্ছিল, এই সময় আমার ঘরে আচমকা ঢুকলেন এক ভদ্রলোক। গল্পটা মাঝপথে বন্ধ হলো। আমি একটা খামে কয়েকটা নোট ভরে, চুপি-চুপি রমাপতির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, "বুক করা রইলো। আর একদিন বসা যাবে।"

গল্পের মাঝপথে রমাপতি বেচারাকে বিদায় নিতে হলো। তারপর আমার এই অবস্থা—আমেরিকা থেকে ভারতীয় ভাগ্নীর যোগাযোগ। জেকব মার্কাস আসছে—রমাপতির সঙ্গে তার যোগাযোগ প্রয়োজন।

ভাগ্যে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে রমাপতি একটা পোস্টকার্ড ছেড়েছিল।

গৃহিণী খুঁজে-খুঁজে সেই চিঠি বার করলেন। ওখানে রমাপতির মেসের ঠিকানা রয়েছে। এরপরের বুদ্ধিটাও গৃহিণী জোগালেন। "তুমি নিজে যখন পায়ের ব্যথা নিয়ে বেরুতে পারছো না তখন সব ব্যাপারটা জানিয়ে ওঁকে টেলিগ্রাম করে দাও।"

কলকাতার এক পাড়া থেকে আরেক পাড়ায় টেলিগ্রাম। বৈদ্যুতিক টেলিগ্রামের আবিষ্কারকের মস্তিষ্কে এই মতলব নিশ্চয় ছিল না। গৃহিণীর পরামর্শ শিরোধার্য করে দীর্ঘ একটি টেলিবার্তা আর্জেন্ট মার্কা করে রমাপতিকে পাঠানো গেল।

মধ্য কলকাতার সদর স্ট্রিটে মিসেস স্মিথের হোটেলে টেলিফোনে জেকব মার্কাসকে পাওয়া গেল। গ্রান্ড হোটেলে না-থেকে জেকব মার্কাস মিসেস স্মিথের হোটেলে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই ছোট্ট হোটেলে অনেক দিকপাল বসবাস করেছেন। হোটেলটির একটা বিশেষ চরিত্র আছে। পাঁচতারা হোটেল মানুষকে বড্ড দূরে সরিয়ে রাখে—লেখার কাজে সুবিধে হয় না।

জেকব মার্কাস বললেন, "হাই শংকর! গ্রিটিংস ফ্রম এভরিবডি ইন আমেরিকা, স্পেশালি চ্যারিটা।" জেকব বললেন, "ওয়ান মিনিট।" তারপর নোট বই দেখে বললেন, "একটা বড় প্যাকেট বড়ি রেডি রেখো—চ্যারিটা আমাকে ফেরত নিয়ে যেতে বলেছে, ফর মেকিং কারি।"

তারপর জেকবের কাছে জানা গেল, রামা প্যাটির সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। "প্যাটি ইজ এ জেম অফ এ পার্সন। এইরকম লিভিং এনসাইক্লোপিডিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবার জন্যে তোমাকে দশ লক্ষ ধন্যবাদ।"

চিকেন প্যাটি, ভেজিটেব্‌ল প্যাটির মতো রামা প্যাটি নয়। সায়েবকে বোঝালাম, পতি মানে স্বামী। হাজবেন্ড অফ রমা অর্থাৎ কিনা লক্ষ্মী, অর্থাৎ কিনা স্বয়ং গডেস অফ্ ওয়েলথের স্বামী।" খুব হাসলেন জেকব মার্কাস।

"অসংখ্য ধন্যবাদ"—কিন্তু ইতিমধ্যেই চুক্তি হয়ে গিয়েছে। মার্কাস তাঁর প্রদর্শককে প্যাটি বলেই ডাকবেন।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় রমাপতি যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো তখন তাকে চিনতেই পারি না।

নোংরা শার্টের বদলে রমাপতি ঝকঝকে টি শার্ট পরেছে। তাতে বড়-বড় করে লেখা 'আই লাভ' এবং ছোট্ট করে 'নিউ ইয়র্ক'। রমাপতি একেবারে হাল ফ্যাশনের আমেরিকান-কাট ব্যাগি প্যান্ট পরেছে। রমাপতির চোখে মূল্যবান পোলারয়েড সানগ্লাস। রমাপতির মণিবন্ধে ফরেন ঘড়ি। কাঁধে ক্যামেরা ও টেপ রেকর্ডার। এমন রমাপতিকে দেখার স্বপ্ন আমি কোনোদিন দেখিনি।

রমাপতি বললো, "আরও আছে। স্পেশাল দাড়ি কামানোর ব্লেড। ফোম সোপবুরুশ লাগে না কামানোর সময়। আফটার-শেভ লোশন। কামিয়ে ফ্যাঁশ ফ্যাঁশে করে পাম্প করলে শরীর এয়ারকন্ডিশন হয়ে যায়।"

রমাপতি আমার পায়ে হাত দিলো। আমি নাকি তার ভীষণ উপকার করেছি, এমন যোগাযোগ নাকি কেউ ঘটিয়ে দেয় না। সায়েব শুধু টাকা দেননি, অবিরত নানা উপহার দিয়ে চলেছেন।

রমাপতির কাছেই জানা গেল, জেকব মার্কাস কলকাতা সম্বন্ধে বই লিখবেন কিনা ঠিক হয়নি, কিন্তু তিনশো বছরের কলকাতার উপরে বিখ্যাত ম্যাগাজিনে সুদীর্ঘ ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখবেন। বিখ্যাত কথা-সাহিত্যিকরা আজকাল পত্রপত্রিকায় বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করছেন।

রমাপতি আমার জন্যে উপহার এনেছে। চুপি-চুপি বললো, "লিখে নিন স্যার। কোনো পয়সা দিতে হবে না। এই গরিবের প্রীতি-উপহার। গোটা কয়েক ইডিশ প্রবাদ।"

প্রায় হাজার বছর ধরে এইসব প্রবাদ পূর্ব ইউরোপের ইহুদিদের মধ্যে চালু রয়েছে—প্রধানত রাশিয়া, পোলান্ড, রোমানিয়ায়। এইসব প্রবাদবাক্য বিতাড়িত ইহুদিদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত মার্কিন দেশে হাজির হয়েছে। ইহুদিদের শ্রেষ্ঠ লেখকরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন না দিয়ে বৃহৎ আমেরিকান নগরে বসে-বসে এখনও ইডিশ ভাষায় সাহিত্য রচনা করে চলেছেন। এইসব রচনা ইংরিজীতে তর্জমা হয়ে কথা সাহিত্যে নতুন এক যুগকে ডেকে এনেছে।

রমাপতি বললো, "আমাদের মার্কাস সায়েব দ্বিতীয় প্রজন্মের আমেরিকান ইহুদি। ওঁর বাবা লিথুয়ানিয়া থেকে আমেরিকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন—বহু বছর এক মুদির দোকানে কাজ করেছিলেন। ওঁর মা এক দর্জির দোকানে সেলাইয়ের কাজ করতেন। জেকব মার্কাস কীর্তিমান হয়েছেন—ইংরিজী এবং ইডিশ দুটো ভাষার উপরেই ওঁর দুর্দান্ত দখল। এযুগের পাঠক ওঁর রচনায় বিগত এক যুগের সন্ধান পায়, তাই তাঁর এতো কদর।"

ফিস-ফিস করে রমাপতি জানালো, "কথায়-কথায় সায়েব ইহুদি প্রবাদ কোটেশন দেয় আর আমি আপনার জন্যে মনে-মনে নোট করে নিই—আপনার কাজে লেগে যাবে কোনো একটা বইতে।"

এরপর টপাটপ বলতে লাগলো রমাপতি, আর আমি লিখে নিতে লাগলাম, 'মদের দোকান ভাল মানুষকে খারাপ করতে পারে না, যেমন সিনেগগ (ইহুদি মন্দির) খারাপ মানুষকে ভাল করতে পারে না।' 'প্রাজ্ঞ মানুষ একটা কথা শুনেই দুটো ব্যাপার বুঝতে পারেন।' 'লোকে পঙ্গুকে ভিক্ষে দেবে, কিন্তু পণ্ডিতকে কিছু দেবে না।'...'গরিব লোক যখন চিকেন খায় তখন হয় লোকটি না হয় চিকেনটি

অসুস্থ।' 'ভগবান যদি পৃথিবীতে বাস করতেন তা হলে লোকে তাঁর বাড়ির জানালার সমস্ত কাচ ভেঙে ফেলতো।' 'যদি কামড়াবার হিম্মত না থাকে তা হলে দাঁত দেখিও না।' 'ভগবান কাউকে স্টুপিড হতে বলেননি।'

"এর পরেরটা খুব মজার। লিখে নিন স্যার—ভগবান অবশ্যই গরিবদের ভালবাসেন, কিন্তু সাহায্য করেন ধনীদের। প্রার্থনা করে যদি ফল হতো তা হলে ধনীরা লোক ভাড়া করে প্রার্থনায় বসিয়ে দিতো।"

রমাপতিই খবর দিলো। "হারশেল অনট্রোপোলিয়ার বলে গোপাল ভাঁড়ের মতন একটি ইহুদি চরিত্র আছে। তার কথা শুনলে আপনি হাসতে-হাসতে অনেক চিন্তার খোরাক পেয়ে যাবেন।"

এরপর জানা গেল, জেকব মার্কাস সায়েব কলকাতা সম্বন্ধে প্রবাদ শুনতে চান। রমাপতি ওঁকে শুনিয়েছে—রেতে মশা দিনে মাছি, এই নিয়ে কলকাতায় আছি। সায়েব আরও জানতে চেয়েছেন। রমাপতি তখন বাধ্য হয়ে শুনিয়েছে—মাটি, মেয়ে, মিথ্যে কথা/তিন নিয়ে কলকাতা।

প্রবাদটা খুব ভাল লেগেছে সায়েবের। বার বার বাংলা ছড়া হিসেবে মুখস্থ রাখবার চেষ্টা করছেন।

"তারপর, সায়েবকে আজ কোথায় নিয়ে গেলে, রমাপতি?"

রমাপতি উত্তর দিলো, "আজব সায়েব স্যার। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, রেসের মাঠ, মনুমেন্ট দেখায় কোনো আগ্রহ নেই। পায়ে হেঁটে, শহরের অলিতে-গলিতে অনেকক্ষণ টো-টো কোম্পানি করলো। তারপর আমরা চলে গেলাম সেই উত্তরে কলকাতার মগডালে। বিশ্বাস করবেন না, সায়েব সমস্ত গঙ্গার ঘাট একের পর এক দেখলেন। ভগবানের দয়ায় ওসব ঘাট তো আমার মুখস্থ। ঘাটগুলোর এখন সত্যিই ঘাটে যাবার দশা—কেউ কোনো নজর দেয় না, সব ক'টার শ্বাস উঠেছে।"

"তুমি সব ক'টা ঘাটের খবর রাখো?"

"কী বলছেন স্যার! ওখান দিয়েই তো ওপারে যেতে হবে উইদাউট টিকিটে—ঘাটের খবর রাখবো না! কলকাতায় মাত্র পঞ্চাশটা তো ঘাট। আপনি লিস্টি মিলিয়ে নিন। একেবারে উত্তর দিক থেকে—কাশীপুর প্রামাণিক ঘাট, কাশীপুর শ্মশান ঘাট, রতনবাবুর ঘাট, রাণী দেবেন্দ্রবালা ঘাট, রুস্তমজীর ঘাট, ধনুঘাট, হরিপোদ্দারের ঘাট," হুড়মুড় করে বলে চলেছে রমাপতি। দক্ষিণ দিকে এসে রমাপতি বলে চললো, "চাঁদপাল ঘাট, বাবু ঘাট, পানিঘাট, প্রিন্সেপ ঘাট, তক্তা গাট, দই ঘাট, বলরাম বোসের ঘাট।"

দই ঘাটে গিয়ে সায়েব নাকি নোটিস পড়ে খুব মজা পেয়েছেন : "এতদ্বারা

স্নানার্থীদের সাবধান করা যাইতেছে যে পাণ্ডাদের নিকট মূল্যবান দ্রব্যাদি রাখার বিপদ আছে। কোনো গচ্ছিত দ্রব্য হারাইলে ঘাটের দ্বারবান কিংবা পোর্ট কমিশনারগণের টোল অফিসের ইন্সপেক্টরকে তৎক্ষণাৎ জানানো দরকার।”

“সায়েব খুব মন দিয়ে পড়েছেন। আমারও স্যার, আপনার ক্যারাকটার রমাপতির কথা মনে পড়ে গেল। বউ তো কারও নিজের নয়, শ্বশুরের দেওয়া গচ্ছিত ধন। সেই ধন যখন রমাপতির হাতছাড়া হলো তখন কোন ইন্সপেক্টরকে জানাতে হবে?”

“আমি স্যার, একটু বেশি হেসে ফেলেছিলাম। দোষটা আমার নয়। সায়েবই বিয়র খাবার সময় আমাকেও এক বোতল খাইয়েছেন। অনেকদিন ওসব খাবার অভ্যেস নেই। ঝট করে জিভটা আলগা হয়ে গিয়েছে। আমার হাসি দেখে সায়েব পাকড়াও করলেন। হোটেলে নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কেন হাসছো? আমি তখন বাধ্য হয়ে ওই রমাপতির গচ্ছিত ধন হারানোর গপ্পোটা বলে ফেললাম। মোস্ট অর্ডিনারি গপ্পো—দুনিয়ায় আকচার হচ্ছে, তবু সায়েবের আগ্রহ হলো। বললেন, পরের গচ্ছিত ধন মেরে দেওয়ার রেওয়াজ কলকাতায় পুরো তিনশো বছর ধরে চলেছে। সুতরাং ঘটনাটা নাকি ‘সিমবলিক’—একটা প্রতীকের মতন।”

একটু থামলো রমাপতি। “আমি স্যার, বাঙালি লেখকদের মনোবৃত্তি জানি, কিন্তু আমি সায়েব লেখকদের মানসিকতা বুঝি না। সায়েব ও আমি দু'জনেই তখন আরও বিয়র টেনেছি। আমি বলছি, সায়েব, আমি আর মাল খাবো না। সায়েব বলছেন, কাম্ অন প্যাটি, বিয়র কিছুতেই মাল নয়। তোমার কোনো চিন্তা নেই। আমার সারাক্ষণের ভাড়া করা ডবলু-বি-ওয়াই গাড়ি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে।”

জেকব মার্কাস পান ভোজনের ব্যাপারে উৎসাহী হয়েও শরীরের ওজন আয়ত্তের মধ্যে রেখেছেন। “শরীরের ব্যাপারে সায়েবরা এখন খুব সাবধানী, স্যার। খাওয়া দাওয়া প্রাণভরে করবে, কিন্তু সাত-সকালে ঘুম থেকে উঠে জগিং করে মাত্রাতিরিক্ত মেদ ঝড়িয়ে ফেলবে। কত ক্যালরি ঢুকছে, কত ঝড়ছে এবং কত তেজ শরীরে পাকাপাকি আশ্রয় নিচ্ছে তা সায়েবদের নখাগ্রে। মার্কাস সায়েব কলকাতায় এসেও গেঞ্জি ও হাফ প্যান্ট পরে জগিং করেন। এদেশের লেখকদের সঙ্গে ওদেশের লেখকদের জীবনযাত্রার একটুও মিল নেই। এদেশের লেখকরা অল্প বয়সে একটু জবু-থবু হয়ে পড়েন ; চেয়ারে বসে কলম কামড়ে সময় কাটিয়ে দেন। আর মার্কস সায়েব বিয়রের গেলাস পাশে রেখে নিজের পার্সোনাল কমপিউটার চালিয়ে যান। একটা ছোট্ট বক্সের মধ্যে রয়েছে এই পি-সি—লেখক-জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।”

সায়েবের মাথায় ওই বাংলা ছড়াটা ঢুকে গিয়েছে। মাটি, মেয়ে এবং মিথ্যে

কথার কলকাতা। তার মানে, জমির দাম এখানে সাধারণের আয়ত্তের বাইরে, মাথা গোঁজবার ঠাঁই করতে মানুষকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়—যেমন রাজেশ্বরী নিজের মাটি জোগাড় করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। মেয়েমানুষের ব্যাপারটা বুঝতে কষ্ট হয় না। মেয়েমানুষের ব্যবসা ছাড়া বড় শহর গড়ে উঠতে পারে না—কলকাতা তার থেকে আলাদা হবে কী করে? প্রভুদয়াল বর্মনের ছেলে ইচ্ছে করলেই রাজেশ্বরীর মতন মহিলাকে কিনে নিতে পারেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আর কোথায় নিয়ে গেলে মার্কাস সায়েবকে?"

রমাপতি ভেবেছিল দুনিয়ার সব শিক্ষিত লোকই রবীন্দ্রনাথের ভক্ত, এখনকার শিক্ষিত সায়েবরা যে রবীন্দ্রনাথের নামই শোনেন নি তা দেখে রমাপতি বুঝতে পারেনি।

রমাপতি বললো, "সায়েব যখন রাইটার্স বিলডিংস, জি-পি-ও, রাজভবন ইত্যাদি দেখতে চাইছেন না তখন সদর স্ট্রিটের যে-বাড়ি থেকে ভোরের সূর্যোদয় দেখে রবীন্দ্রনাথ 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতা রচনা করেছিলেন সেই বাড়িটা দেখানোর কথা ভাবলাম।"

জানাশোনা এক পুলিশের সঙ্গে ব্যবস্থা করেছিল রমাপতি। রাত-বেরাতে বিদেশি নিয়ে বেরিয়ে না হাঙ্গামায় পড়তে হয়।

রমাপতি বললো, "কী লজ্জার কথা স্যার ; 'আজি এ প্রভাতে রবির কর কেমনে পশিল প্রাণের পর' যেখানে লেখা হয়েছিল সেখানে সূর্যোদয় দেখাবার জন্যে সায়েবকে নিয়ে গিয়ে দেখি দরজার সামনে বাজারের এক বেশ্যা দাঁড়িয়ে আছে খদ্দের তুলবার জন্যে। আমার পুলিশ বন্ধু লজ্জা সামলাতে গিয়ে মেয়েটাকে জোরে এক চড় মারলো। মেয়েটা কাঁদা তো দূরের কথা, খিলখিল করে হাসতে লাগলো। বললো, 'রবি ঠাকুর এখানে সুয্যি ওঠা দেখেছিল বলে আমি কি না খেয়ে মরবো! ঠাকুরকে কে বলেছিল এই খারাপ পাড়ায় আসতে?"

"কী লজ্জার কথা! রবিঠাকুর যখন ওখানে থাকতেন তখন যে পাড়াটা খারাপ হয়ে ওঠেনি এখবরটাও মেয়েটা রাখে না।"

"সায়েবটাও কীরকম স্যার! সূর্য ওঠা দেখলেন না, পাথরের ফলকটা পড়ে নিয়ে ডাইরিতে কীসব লিখলেন। তারপর একটা রিকশ চড়ে মেয়েটাকে তুলে নিলেন।" সায়েবের ইঙ্গিতে রমাপতি আর একটা রিকশয় তাদের অনুসরণ করতে লাগলো।

"অদ্ভুত এক পরিস্থিতি স্যার! সায়েব হাজির হলেন ওই বাজারের মেয়েটার ডেরায়। ওকে পুরো ফি দিলেন। তারপর গল্পগুজব শুরু করলেন ওই ভোর রাতে। আমি পড়লাম মুশকিলে। মেয়েটা ভাঙা-ভাঙা ইংরিজী জানে, তাতে কথাবার্তা চালানো যায় না। দেহের ল্যাংগোয়েজ অন্য—তাই এ-পাড়ায়

মেয়েদের শরীরের আদান-প্রদান বিদেশি সায়েবদের সঙ্গে অনায়াসে চলে, মুশকিল হয় মুখের ল্যাংগোয়েজে।"

রমাপতি অনেকক্ষণ দ্বিভাষীর কাজ করেছে। রমাপতি বললো, "রমলার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেবো, স্যার। আপনার বই পড়তে পাগল। সায়েব যে কীসব আবোলতাবোল জিগ্যেস করছে, রমলার সুবিধে মনে হয়নি।"

রমলা পরে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। পরে রমাপতিকে বলেছে, "অতো কথাবার্তার দরকার কী? সায়েবকে বলুন কাজকর্ম সারতে, চলে যেতে। আপনি বরং একটু ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকুন, ওঁর সঙ্গে একটু খেলা করি। ঠাণ্ডা দুধ গরম হতে সময় লাগে।"

মার্কাস সায়েব পরে রমাপতির মুখে ওই কথা শুনে খুব হাসলেন। "পৃথিবীতে কার যে কী আসল কাজকর্ম তা বোঝা দায়। এই মুহূর্তে রমলার কাজকর্ম ও আমার কাজকর্ম এক নয়। স্রেফ কথা শোনাবার জন্যে এতো পয়সা কোনোদিন সে পায়নি।"

"দোষ দিতে পারেন না রমলাকে। শরীর দিলে তো বিপদে পড়তে হয় না, বিপদ আসে কথাবার্তা থেকে। তাই ওরা সন্দেহ করে, ভয় পায়।" রমাপতির কথাটা শুনে মার্কাস সায়েব নাকি আবার নোটবই খুলে কীসব লিখেছেন।

রমাপতি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আমাকে বললো, "এবার উঠি। মার্কাস সায়েব আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আপনার দয়ায় আমার আজ খুব সুখ, স্যার। সায়েবের গাড়িটা আমার জন্যে রাস্তায় হাঁ করে বসে আছে, যেমন স্বপ্ন দেখেছিল রাজেশ্বরী। সেইজন্যেই সে মিথ্যে কথা বলেছিল ঝুড়ি-ঝুড়ি। আমাদের গল্পের রমাপতি স্যার, যতবার বারাণসী থেকে কলকাতায় ফিরেছে, বউ আদর-যত্ন করেছে। সেই সঙ্গে পুরো মিথ্যে কথা—মালিকের ছেলের সঙ্গে সম্পর্কটা যে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠছে, ঘন ঘন দেখা হচ্ছে, তা ঘুণাক্ষরে জানতে দেয়নি।"

জেকব মার্কাস আমার বাড়িতে খেতে এসেছেন। আমি রমাপতিকেও আশা করেছিলাম। কিন্তু মার্কাস বললেন, "আজ প্যাটির বিশেষ কিছু সেলিব্রেশন আছে, তাই সঙ্গে এলেন না।"

রমাপতির কী আবার উৎসব থাকতে পারে? জেকব মার্কাস আমাকে অবাক করে দিলেন। আজ ইংরিজী কাগজের ব্যক্তিগত কলমে প্রকাশিত হয়েছিল : রমাপতি তার বিবাহের দিনটি স্মরণ করছে। পৃথিবীতে সবার ভাল হোক, সবাই সুখে থাকুক।

জেকব মার্কাস এবার রমাপতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। ওর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবার জন্যে আমিও প্রশংসা পেলাম। রমাপতির মতন

মানুষের সঙ্গে দেখা না হলে জেকব মার্কাসের অভীষ্ট সিদ্ধ হতো না।

জেকব মার্কাসের অনুসন্ধান ও রচনার বিষয় : তিনশো বছরের কলকাতায় তিন দিন তিন রাত্রি। মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল, রাজনীতিবিদ এঁদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ স্থাপন করেননি জেকব মার্কাস। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তাঁর শরীরের কথা ভেবে সে চেষ্টাও করেননি। তার বদলে ইডেন প্রসূতিসদন থেকে শুরু করে নিমতলা ঘাট পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন মার্কাস। এমন সব মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন যাদের নাম কোনোদিন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি।

রমাপতিকে জেকব বলেছিলেন , একজন দুষ্টু লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন। রমাপতি বলেছিল, কলকাতায় দুষ্টু লোকের অভাব নেই। তারা জুড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে বুক ফুলিয়ে এই শহরে হাঁটাচলা করছে। কত দুষ্টু লোক মরে যাওয়ার পরেও অত্যাচার চালাচ্ছে—তাদের নামে রাস্তা রয়েছে। তাঁদের ব্রোঞ্জ মূর্তিও তৈরি হয়েছে, সেই মূর্তির উপর আলো পড়ছে। দুষ্টু লোকরা এমনভাবে সৎ লোকের সঙ্গে মিশে গিয়েছে যে, কে ভাল লোক এবং কে মন্দ লোক তা যাচাই করা বেশ শক্ত হয়ে উঠেছে।

এরপর জেকব মার্কাস বলেছিলেন, "একজন ভাল লোকের দেখা পেতে চাই।"

সায়েবের কথা শুনে খুব বিপদে পড়ে গিয়েছিল রমাপতি। "তা হলে চলুন মা তেরেজার কাছে। একজন ভাল লোকের সঙ্গে দেখা হবে।"

মা তেরেজা যে ভাল লোক তা সমস্ত দুনিয়া জেনে গিয়েছে। সুতরাং জেকব মার্কাসের আগ্রহ কম—তিনি চাইছেন এমন ভাল লোক যাঁকে আবিষ্কারের সম্মানটা তিনিই লাভ করেন।

রমাপতি খুব বিপদে পড়ে গিয়েছিল। কলকাতার রাজপথের জনস্রোত দেখিয়ে বলেছিল, এরা সবাই মাঝামাঝি লোক—একেবারে ভাল লোকও আছেন এই ভিড়ের মধ্যে, কিন্তু কী করে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাবে? আর সব ভাল লোক তো কবে দেহরক্ষা করেছেন—বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু, নিবেদিতা। সুভাষ বোসও ভাল লোক—কিন্তু এক শ্রেণীর সায়েব এখনও তা বিশ্বাস করতে চায় না।

সায়েব তখনও নাছোড়বান্দা। একজন ভাল লোককে সশরীরে দেখে যেতে চান। সায়েব বলেছেন, "রাজনীতিতে ভাল লোক নিশ্চয় আছেন এই দেশে।" রমাপতি বলেছে, "ভোটের আগে অনেক ভাল লোক দেখতে পাওয়া যায়, স্যার। কিন্তু ভোটের পরে কী যে হয়! ভাল লোকের খোঁজ পাবার জন্যে আবার পাঁচ বছর হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হয়।"

"বিজনেসে ভাল লোক?"

"সে তো সোনার পাথরবাটি।" এই কথা বলে রমাপতি সঙ্গে-সঙ্গে নিজের মত পরিবর্তন করলো। তারপর আমতা-আমতা করতে লাগলো। "ওই যে গল্পের রমাপতির কথা বলছিলাম। যার বউ রাজেশ্বরী হাতছাড়া হতে বসেছিল—মালিকের ছেলে কুমারমঙ্গল বর্মনের সঙ্গে যার গুপ্ত প্রণয় অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। অর্ডিনারি কর্মচারীর বউ রাজেশ্বরী তখন সত্যিকারের রাজেশ্বরী হবার স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু সেই সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। কলকাতা শহরে যে ভাল লোক আছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল।"

"কী রকম?" জানতে চেয়েছেন জেকব মার্কাস।

"আশ্চর্য ব্যাপার স্যার। ওই প্রভুদয়াল বর্মন—একমাত্র সন্তানের স্নেহে মানুষ অন্ধ হয়ে থাকে, শত অপরাধ মেনে নেয়। কিন্তু এক্ষেত্রে যখন সমস্ত খবরটা প্রভুদয়ালজির কানে গেল তখন তিনি ঋষির মতন হয়ে উঠলেন। ছেলেকে বললেন, তুমি যা করতে চলেছো তা ক্ষমার অযোগ্য। তুমি পৃথিবীর যে কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে পারো, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তুমি আমার অফিসের একজন নিরপরাধ কর্মীর ঘর ভাঙবে তা আমি ক্ষমা করতে পারবো না। যারা আমার এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করে তাদের সবার প্রতি আমার দায়িত্ব আছে। তুমি আমার সন্তান বলে তোমাকে আমি অপকর্মে প্রশ্রয় দিতে পারি না। যদি তুমি বাবার বিজনেসের সঙ্গে জড়িত থাকতে চাও তা হলে তোমাকে ওই বদখেয়াল থেকে দূরে সরে আসতে হবে। আমার কথা না শুনলে ত্যাজ্যপুত্র হতে হবে তোমাকে।"

রমাপতি বলেছে, "ভাবা যায় না, এমন মানুষ সত্যিই আছেন, যিনি আদর্শের ব্যাপারে আপস করেন না। বাড়িতে কী ভীষণ কান্নাকাটি, কত ধরাধরি। কিন্তু প্রভুদয়াল বর্মন নিজের সিদ্ধান্ত থেকে নড়লেন না—প্রত্যেকটি কর্মচারী তাঁর সন্তানের মতন, তাদের স্ত্রীকে ভাঙিয়ে নেবে তাঁর সন্তান, এ কল্পনাতীত।"

মার্কাস আমাকে বললেন, "দেখা যাচ্ছে, ঝানু বিজনেসম্যানের বুদ্ধিমান ছেলেরাও অনেক সময় বোকার মতন ব্যবহার করে। প্রত্যেক শহরেই খোঁজ করলে এক-আধজন অষ্টম এডওয়ার্ড পাওয়া যায় যারা মিসেস সিম্পসনের মতন একজন সাধারণ মহিলার প্রেমের পরিবর্তে রাজসিংহাসন ত্যাগ করতে পারে।" কী ভেবে জেকব মার্কাস বললেন, "হয়তো পিছিয়ে যাবার উপায় ছিল না ওই কুমারমঙ্গল বর্মনের। কারণ যতদূর শুনেছি, রাজেশ্বরী তখন প্রেগন্যান্ট—কুমারমঙ্গল বর্মন হয়তো ব্ল্যাকমেলিং পজিশনে ছিলেন।"

রমাপতি যথাসময়ে সায়েবকে প্রভুদয়াল বর্মনের ঠিকানা দিয়েছিল। কিন্তু নিজে আপিসে ঢোকেনি। রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল।

জেকব মার্কাস বললেন, "ভাল লোক কি না জানি না, কিন্তু প্রভুদয়াল অবশ্যই ইন্টারেস্টিং লোক। অফিসের শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যে ছেলেকে ত্যাগ করার মতন সাহস ক'জনের থাকে? রমাপতিকে নাকি প্রভুদয়াল ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তিনি খুবই লজ্জিত। কিন্তু তাঁর ছেলে যদি ত্যাজ্যপুত্র হয় তা হলেও রমাপতির কোনো অসুবিধে হবে না, তার চাকরি বহাল থাকবে।"

অফিসে এই ইন্টারেস্টিং লোকের ছবি দেখলেন জেকব মার্কাস। কিন্তু সাক্ষাৎ হলো না। তাঁর কোম্পানি অনেক ছোট হয়ে গিয়েছে। ছেলেকে তাড়িয়ে দেবার পরে ব্যবসায়ে তেমন মন দেননি। তারপর কোন সময়ে কর্মচারীদের কাছে কোম্পানি বিক্রি করে দিয়ে প্রভুদয়াল বর্মন হরিদ্বারে চলে গিয়েছেন। এখনও বেঁচে আছেন প্রভুদয়াল। অফিসের লোকেরা বললো, হরিদ্বারে গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা হতে পারে।

জেকব মার্কাস বললেন, "বোঝা যাচ্ছে, কলকাতার সিটিজানরা ভীষণ নরম। তিন সেঞ্চুরি ধরে তারা মার খাচ্ছে, কিন্তু তারা কখনও প্রতিশোধ নিতে পারে না।"

আমি চুপচাপ শুনে যাচ্ছি। মনে হচ্ছে, মার্কাসের প্রতিবেদনে রমাপতিই কলকাতার সিম্বল হয়ে উঠবে—যার সর্বস্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছে, অথচ প্রতিবাদে সে কিছুই করতে পারেনি।

মার্কাস বললেন, "ইট্‌স্ এ ফানি স্টোরি। যার বউকে মালিকের ছেলে ছিনিয়ে নিতে চাইছে তার কোনো রি-অ্যাকশন নেই ; শুধু মালিকের একটা সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে।"

রমাপতির সঙ্গে সাবধানে কথা বলেছেন জেকব মার্কাস 'ইহুদিরা কোনো অত্যাচারের কথা ভোলে না। দ্বিতীয় যুদ্ধের অর্ধশতাব্দী পরেও তার পুরনো অত্যাচারীদের খুঁজে বেড়াচ্ছে হন্যে হয়ে—ধরা পড়লে কোনো ক্ষমা নেই।"

রমাপতি বলেছে, "গপ্পোটা এইভাবে নিয়ে যাওয়া যায়, মিস্টার মার্কাস। প্রভুদয়াল ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন এমন আশঙ্কা নিশ্চয় আগে ছিল না। পৈতৃক সম্পত্তি হারিয়ে রাতারাতি রাজপ্রাসাদ থেকে রাস্তায় নেমে এসে কুমারমঙ্গল কী করবে? তার প্রেমজ্বর এবার ঘাম দিয়ে ছুটে যাবে। কিন্তু কিছুই সেরকম হলো না। রাজেশ্বরীরও স্বপ্ন ভেঙে যাবে। মাইনাস রাজত্ব এক রাজপুত্রকে নিয়ে সুখের লোভ লোপ পাবে। রাজেশ্বরীর কপালে ভোগসুখ নেই।

রাজেশ্বরীর সঙ্গে স্বামীর একটা মিটমাট কিছু হতো। কিন্তু রাজেশ্বরী বললো, "আমাকে বাধা দিও না। আমার পেটে অন্য লোকের সন্তান।" এরপর আর কী

করা যায়? যার পেটে কুমারমঙ্গল বর্মনের সন্তান তাকে নিজের কাছে রাখার চেষ্টা করে কী লাভ?

আমি এরপর চুপচাপ থেকেছি। সায়েবদের মূল্যবোধ এবং আমাদের মূল্যবোধ এক নয়। রমাপতির গপ্পোটা সায়েবের মনোজগতে কী রকম রূপগ্রহণ করে তা অবশ্যই এক সময় জানা যাবে।

আমি বললাম, "গল্পটা এখনও শেষ হয়নি। এর পরে একটা প্রতিশোধ পর্ব আছে। যার ফলে রমাপতি তার চাকরিটা হারালো।"

রমাপতি আমাকে বলেছিল, "নিজের বউ যখন মনিবের ছেলের সঙ্গে প্রেম করে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বাড়ি ছেড়ে চলে যায় তখন যে মনের কী অবস্থা হয় সে-সম্বন্ধে একটা ভাল চ্যাপ্টার লিখবেন, স্যার। যেন বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকে। এর মধ্যে কামনা আছে, বাসনা আছে, বঞ্চনা আছে, শোষণ আছে, ভুল বোঝাবুঝি আছে, প্রেম আছে, পরাজয় আছে। একটা পিক্যুলিয়র অবস্থা, স্যার। মানুষের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে যায়। আমার স্ত্রীর শরীরে আর-একজন পুরুষের বীজ বপন হয়েছে—একটা অস্বাভাবিক আদিম অনুভূতি। মন দিয়ে লিখলে আপনি হৈ-হৈ ফেলে দিতে পারবেন। ছোটখাট প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেন।"

"এই অবস্থায় মানুষ স্থিতধী থাকে না। আপনি লিখে রাখুন, রমাপতি কয়েকদিনের মধ্যে পাগলের মতো হয়ে উঠলো। স্বপ্নের মধ্যে সে গর্ভিণী রাজেশ্বরীর শরীর দেখতে পাচ্ছে। তারপর সে হিসেব করতে লাগলো—যত নষ্টের গোড়া ওই সতীশ বেয়ারা। সেই আড়কাঠির কাজ করেছে—ঘরের বউকে পরপুরুষের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিয়েছে। রমাপতির কোনো দরকার ছিল না ধারের টাকায়। সতীশ বেয়ারা লুকিয়ে লুকিয়ে আরও কী সর্বনাশ করেছে কে জানে! নিজের দেনার টাকাটা পুরো উশুলের জন্যই বোধহয় নির্লজ্জ দালালের কাজ করেছে সতীশ। রমাপতি যখন কলকাতায় ছিল না তখন কী ঘটছে তা সতীশের অজানা থাকতে পারে না। বাড়িতে কুমারমঙ্গলের দু'একটা প্রেমপত্র উদ্ধার করেছে রাজেশ্বরীর বিছানার তলা থেকে। তাতে সতীশের উল্লেখ আছে।"

এরপর উত্তেজিত হয়ে উঠেছে রমাপতি। ছুটির পরে অফিস থেকে বেরিয়ে এসে প্রকাশ্য রাজপথে রমাপতি পাগলের মতন ঝাঁপিয়ে পড়েছে সতীশ বেয়ারার উপর। "তুমি শালা যাতে আর আড়কাঠির কাজ না করতে পারো তার জন্যে দুটো কান কেটে দেবো।"

দুটো কানই কাটা গিয়েছে। গুরুতর আহত হয়েছে সতীশ। রাস্তায় বেশ হৈ-চৈ। খুনের চেষ্টার দায়ে ধরা পড়েছে রমাপতি। সতীশের কোমরও এমনভাবে ভেঙেছে যে শালা আর কোনোদিন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

অফিস যাওয়া তো দূরের কথা, বিছানায় বসে-বসে পেচ্ছাপ করতে হবে সারাজীবন।

রমাপতির কোনো দুঃখ নেই—যদিও মূল্য দিতে হয়েছে রমাপতিকে। চার বছরের জেল হয়েছে। প্রভুদয়ালজিও বিরক্ত হয়েছেন। রমাপতিকেও তিনি বরখাস্ত করেছেন। তাঁর বহু সাধের প্রতিষ্ঠানটা দু'জনের খামখেয়ালিপনায় শেষ হতে চললো।

চমৎকার প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে, রমাপতির ধারণা। একেবারে সমস্যার মূলে আঘাত করা গিয়েছে। সতীশ যদি আড়কাঠি না হতো তা হলে ওই কুমারমঙ্গলের সাধ্য কী রাজেশ্বরীর কাছে যায়?

যথা সময়ে জেকব মার্কাস কলকাতা থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাঁর প্রতিবেদন কোনো সময়ে নিশ্চয় প্রকাশিত হবে। কলকাতা শহর তিনশো বছর ধরে কীভাবে বারে বারে স্থানীয় মানুষের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে এর বিবরণী প্রকাশিত হবে। হয়তো হৈ-চৈও হবে। সায়েবদের প্রশংসা, সায়েবদের নিন্দা সম্বন্ধে এদেশের মানুষ আজও ভীষণ সচেতন।

আমার চিন্তা রমাপতিকে ঘিরে। গল্পের রমাপতিকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আমি কী করবো তা ঠিক করা হচ্ছে না। রমাপতি বেশ কিছুদিন উধাও। জেকব মার্কাস তাকে তিন দিনে একুশশো টাকা দিয়েছেন। সুতরাং রমাপতি এখন কিছুদিনের জন্যে নিশ্চিন্ত।

কয়েক মাস পরে রমাপতি আবার এলো। বললো, "আপনার পোস্টকার্ড পেয়েছিলাম, কিন্তু আসা হচ্ছিল না। রমাপতির গপ্পোটা আপনার লেখবার সময় হয়ে আসছে। আমি জানি, আপনার চিন্তা বাড়ছে।"

"সমস্ত ব্যাপারটা একটু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।" রমাপতি প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললো, "আর কখনও আমাকে সায়েবদের সঙ্গে মিশতে দেবেন না, স্যার।"

"কেন, কী হলো? সায়েব তো তোমাকে ভাল টাকা দিয়েছেন।"

"হ্যাঁ, এই তিন দিনে আমি যা রোজগার করেছি তা কোনো বাঙালি রাইটার কস্মিনকালে রোজগার করতে পারবে না। তবু বলছি, আমাকে কখনও সায়েবদের কাছে যেতে দেবেন না। এই দেখুন, আমি বিয়র কবে ছেড়ে দিয়েছিলুম, তারপর সায়েব আমাকে বিয়র ধরালো। সায়েব চলে যাবার পর সমস্ত টাকাটা আমি নেশা করে নষ্ট করলুম। আমার ব্রেক নষ্ট হয়ে গিয়েছে।"

"বিয়র বন্ধ হলেই ঠিক হয়ে যাবে, রমাপতি।"

"বিয়র তো বন্ধ হয়েছেই, কিন্তু ভিতরটা সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। সায়েব কী যে নাড়া দিলো।"

"কেন, কী হলো?"

রমাপতি বললো, "ওই গল্পের রমাপতিকে নিয়েই যত ঝামেলা। সতীশ বেয়ারার কোমর ভেঙে প্রতিশোধ নেওয়ার ব্যাপারটা শুনেও সায়েব খুব সন্তুষ্ট হলেন না। বললেন, দাস জাতিদের প্রতিশোধ একটু অন্য ধরনের। সারাক্ষণ নিজেদের উপরেই আক্রমণ করে কলকাতার মানুষরা। বউ নিয়ে গেল মালিকের ছেলে, আর প্রতিশোধ নেওয়া হলো এক নিরীহ সহকর্মীর উপরে। এইভাবেই তৈরি হয়েছে ক্যালকাটার তিনশো বছরের হিসট্রি। অন্যায় করেছে শক্তিমানরা, কিন্তু সাধারণ মানুষ প্রতিশোধের জন্যে নিজেকেই ক্ষতবিক্ষত করেছে।"

রমাপতি মুখ তুলে জানতে চাইলো, "আপনি কী বলেন?"

"আমি কী বলবো? প্রকৃত ঘটনাগুলো যেভাবে ঘটে থাকে গল্প-উপন্যাস আমি সেইভাবেই লিখে থাকি ; ইতিহাসের উপর আমি কারুকার্য করি না।"

রমাপতি বললো, "রমাপতির ক্যারেকটারটা নিয়ে খুব ফ্যাসাদে পড়ে যাবেন আপনি। সতীশ বেয়ারার খোঁজখবর করা গিয়েছে—সে অনেকদিন মরে ভূত হয়ে গিয়েছে। নিজেরও নাক কেটেছে রমাপতি—জেল খেটেছে, চাকরি খুইয়েছে, কায়ক্লেশে নিঃসঙ্গ জীবনধারণ করেছে। রমাপতি ইহুদি হলে এমন হতো কি?"

একবার ভাবলাম, রমাপতিকে বলি, আমেরিকায় গিয়ে দেখো। ইহুদির বউ একে ছেড়ে আরেকজনকে বিয়ে করছে, সবাই মেনে নিচ্ছে। কিন্তু বলা হলো না।

উত্তেজিত রমাপতি বললো, "আমি বুঝতে পারছি না। প্রতিশোধটা কার উপরে নেবে রমাপতি? ওই কুমারমঙ্গল বর্মনের তো যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। বাপের সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে খুব কষ্ট পেয়েছে। এই শহর ছেড়ে তাকে চলে যেতে হয়েছে। রাজেশ্বরীও সুযোগ পায়নি রানি সাজার। কলকাতার বাইরে গিয়ে তাকে কিছুদিন কাজকর্ম করতে হয়েছে। আপনি হয়তো বলতে পারেন, কুমারমঙ্গল যখন ত্যাজ্যপুত্র হতে চলেছে তখন রাজেশ্বরীকে একটা সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সে নিজে বলেছে, তার গর্ভে অন্য লোকের সন্তান। অপরের সন্তানকে রমাপতি কেন বিপদে ফেলবে বলুন তো?"

একটু ভেবে রমাপতি বললো, "আপনি রমাপতির গপ্পোটা অন্যভাবেও শেষ করতে পারেন। রমাপতি গর্ভবতী বউকে বহু বছর আগে ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু এখনও মানসিক মুক্তি দেয়নি। প্রতিবছর বিয়ের দিনে এখনও সে স্টেটসম্যানে বিজ্ঞাপন দেয়। স্রেফ রাজেশ্বরীকে একটু খোঁচা দিতে।"

"ওরা যখন কলকাতার বাইরে থাকে, তখন ওই বিজ্ঞাপন কি ওদের নজরে পড়ে?"

"আমিও তাই ভাবতাম, স্যার। কিন্তু ইদানীং ওরা কলকাতায় ফিরে এসেছে। ওরা অবস্থাও অনেকটা ফিরিয়ে ফেলেছে। মাসী না কার সম্পত্তি পেয়ে কুমারমঙ্গল নিজে কিছু ব্যবসাপাতি করেছে—কিন্তু সে এখনও পাপের মধ্যে রয়েছে। রাজেশ্বরীকে তো রমাপতি ডাইফোর্স দেয়নি। তার মানে বুঝতে পারছেন? রমাপতি প্রতিশোধ নিয়েছে—ওদের নিজের সন্তান জারজ হয়ে গিয়েছে।"

আমি চুপচাপ রমাপতির কথা শুনে যাচ্ছি। রমাপতি বললো, "তা হলে প্রতিশোধ সিরিজে আপনার উপন্যাসটা ভালভাবেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।"

আমাকে তখনও নির্বাক দেখে রমাপতি বললো, "এই গল্পের জন্যে খেপে খেপে অনেকগুলো টাকা নিয়েছি আপনার কাছে। এই সমাপ্তি যদি আপনার অপছন্দ হয় তা হলে সোজাসুজি বলুন।"

"রমাপতি, তুমি তো জানো, ঘটনাটা যদি সত্যিই এই রকম ভাবে শেষ হয়ে থাকে তা হলে আমি সন্তুষ্ট, না হলে আমি সন্তুষ্ট নই।"

রমাপতি এবার কিছুটা উত্তেজিত হয়ে উঠলো। "আমি চাইছিলাম যে রমাপতির গপ্পোটা এইভাবেই শেষ হোক। রাজেশ্বরী যে ঠকেছে সেইটাই স্পষ্ট হয়ে উঠুক। প্রভুদয়ালের মতন মানুষ যে পৃথিবীতে আছে তা লোকে জানুক। কিন্তু কলকাতা শহরে কিছুই শেষ হয় না, স্যার। ইংলিশ কাগজের শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন বিভাগে আমার এক বন্ধু আছে। সে আমাকে বললো, মজার ব্যাপার। একটা লোক এসে বললো, প্রতি বছর অমুক তারিখে বিবাহ বার্ষিকীর বিজ্ঞাপন বেরোয়, ওয়ান রমাপতির নামে। সেটা বন্ধ করা যায়? কাগজের লোক রাজি হয়নি—অনেক বছর ধরে একই বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে। যদি মিথ্যা দাবি কিছু থাকে তা হলে অন্য কথা। লোকটা বলেছে। এক ভদ্রমহিলার শরীর খারাপ, বিজ্ঞাপনটা দেখলে তাঁর মানসিক উত্তেজনা হতে পারে। তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে বিজ্ঞাপনটা ভীষণ খারাপ।"

রমাপতি বললো, "বুঝতেই পারছেন, রমাপতির গপ্পোটা শেষ হয়েও হলো না। এই লোকটা নিশ্চয় ওই কুমারমঙ্গল বর্মন। কিন্তু এতদিন পরে সামান্য একটা বিজ্ঞাপন থেকে রাজেশ্বরীর মানসিক উত্তেজনা কেন? সুদর্শন প্রেমিক এবং তার ঔরসজাত সন্তান নিয়ে সে তো বেশ সুখেই জীবন চালাচ্ছে।"

রমাপতি হঠাৎ আমাকে অনুরোধ করলো, "উপন্যাসটা আপনি জানুয়ারি মাসের বিনোদন সংখ্যায় লিখে ফেলুন। আমি চাই লেখাটা রাজেশ্বরী পড়ুক। ওর স্বামী পড়ুক। ওর ছেলে পড়ুক। ওইটাই হবে গল্পের রমাপতির মোক্ষম প্রতিশোধ। আপনি কোনো ক্যারাকটারের নাম পাল্‌বেন না, স্যার। প্রয়োজন হলে বলে দেবেন রমাপতির মুখেই আপনি সব ব্যাপারটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনেছেন।

সতীশ বেয়ারার কান কেটে, কোমর ভেঙে দিয়ে তেমন প্রতিশোধ নেওয়া হয়নি, মার্কাস সায়েব ঠিকই বলেছেন। কলকাতার লোকেরা তিনশো বছর ধরে এতো যন্ত্রণা সহ্য করেও প্রতিশোধ নিতে শেখেনি। এবারে লোকে বুঝুক, কন্দর্পকান্তি মালিকপুত্রের সম্পদ ও শরীর দুই-ই রাজেশ্বরীকে চরম প্রলোভন দেখিয়েছিল, শুধু অর্থ নয়।"

বেশ রাত হয়েছে। গল্পের শেষটা আরও ভেবে দেখা দরকার। রমাপতি পরের দিন সকালে আসবে কথা দিয়ে বিদায় নিলো। সে যে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছে তা বোঝা যাচ্ছে।

পরের দিন ভোরবেলায় রমাপতি আবার আমার বাড়িতে হাজির।

আসবার কথা ছিল সকাল সাড়ে ন'টায়, কিন্তু এখন মাত্র সাতটা। রমাপতি এখনই শ তিনেক টাকা চাইছে, জরুরি প্রয়োজন।

রমাপতির মুখেই শুনলাম, রাজেশ্বরী আর ইহলোকে নেই। আজ সকালে কেওড়াতলায় তার দাহ। রমাপতিকে কেউ খবর দেয়নি, আজকের ইংরিজি কাগজের 'ডেথ' কলমে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে: বর্মন-১০২ ডিভিসি রোডে বুধবার রাজেশ্বরী। ডিপলি মোনর্ড বাই কুমারমঙ্গল অ্যান্ড উমাপতি। লাস্ট রাইট অ্যাট কেওড়াতলা বৃহস্পতিবার সকালে।"

"ডাকেনি রমাপতিকে। তবু একবার ঘুরে আসি, কী বলেন স্যার? বাড়ির ঠিকানাটা আমার জানা ছিল না। তাছাড়া একটা অদ্ভুত ব্যাপার, এই উমাপতিটি কে? নিশ্চয় সেই ছেলেটি, যাকে গর্ভে নিয়ে রমাপতির পর্ণকুটির ছেড়ে চলে গিয়েছিল রাজেশ্বরী।"

এখন রাত আটটা। শুকনো মুখে রমাপতি আবার আমার বাড়িতে ফিরে এলো। বোঝা যাচ্ছে শ্মশানে অনেকক্ষণ ছিল রমাপতি। আজ শুধু-শুধু কষ্ট করে আমার কাছে আবার ফিরে আসবার কোনো প্রয়োজন ছিল না তার।

"ফিরে না এসে পারলাম না, স্যার। শ্মশান থেকে সোজা আসিনি, আমি একটু ড্রিংক করেছি। মানুষ ঘরসংসার ভেঙে অপরের ঘরে চলে গেলেও তার মৃত্যুর সময় শোক হয়। রাজেশ্বরী আমাকে ভীষণ ঠকিয়েছে, আমি বুঝতে পারিনি।"

এবার হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো রমাপতি। প্রথমে মনে হলো নেশার ঘোরে, পরে মনে হলো সত্যিই মনের দুঃখে কাঁদছে রমাপতি।

"মরা মানুষের উপর প্রতিশোধ নেওয়া যায় কী করে? আপনি তো অনেক পড়াশোনা করেছেন," রমাপতি আমার হাত ধরে জিজ্ঞেস করছে।

"অনেক তো হয়েছে, আবার, প্রতিশোধ কেন? সেই কত বছর আগে রাজেশ্বরী তার স্বামীর সংসার ছেড়ে চলে গিয়েছে; তারপর এতোদিন পরে

তার মরা-মুখ দেখা হলো, এই তো যথেষ্ট।" এও তো এক নতুন ধরনের শুভদৃষ্টি—ছাদনাতলার বদলে শ্মশানে।

"সেই সঙ্গে রাজেশ্বরীর ছেলেকে প্রথম দেখলাম, সংসার ভাঙবার সময় যে মায়ের পেটে ছিল। কতদিন যোগাযোগ নেই। সব সম্পর্ক নষ্ট হয়েছে, তবু রমাপতির সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। রাজেশ্বরী আমাকে মিথ্যে বললো কেন?"

"কী হলো রমাপতি? এতো উতলা হলে চলবে কেন? মনে রাখতে হবে গল্পের রমাপতির সঙ্গে রাজেশ্বরীর সমস্ত সম্পর্ক অনেকদিন আগে ছিন্ন হয়েছে।"

"কিন্তু ছেলেটির কি কান্না, স্যার। মায়ের বুকের উপর আছড়ে পড়লো। কত আর বয়েস? এই উনিশ বছর। মা-মা করছে, আর এই রমাপতির বুকটা মুচড়ে উঠতে লাগলো। আর আমি বুঝতে পারলাম রাজেশ্বরীর সঙ্গে রমাপতির সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি।"

এবার রমাপতি হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসলো। পকেট থেকে তিনশো টাকা বার করে টেবিলে রাখলো। তারপর আমার হাত ধরে বললো, "আমি আপনার সমস্ত দেনা আস্তে আস্তে শোধ করে দেবো, কিন্তু দয়া করে রাজেশ্বরীর গল্পটা লিখবেন না আপনি। আমি আপনার কাছে চিরঋণী হয়ে থাকবো।"

"কী হলো রমাপতি?"

রমাপতি চোখ মুছতে-মুছতে বললো, "ছেলেটিকে দেখেই আমি বুঝতে পারলাম রাজেশ্বরী আমাকে ঠকিয়েছে। সদ্য মাতৃহারা ছেলেটার মুখটায় আপনার এই রমাপতি বসানো! কুমারমঙ্গলের সঙ্গে কোথাও কোনো সাদৃশ্য নেই। হাবভাব চলনবলন, সব এই রমাপতির মতন। ভীষণ রাগ হলো রাজেশ্বরীর উপর। বেঁচে থাকলে হয়তো ফাটাফাটি হয়ে যেতো। ও যদি আমাকে মিথ্যে না বলতো যে ওর গর্ভে অন্য লোকের সন্তান রয়েছে তা হলে আমি রাজেশ্বরীকে যেতে দিতাম না কিছুতেই। আমাকে ঠকালেও রাজেশ্বরী কিন্তু নিজেকে ঠকায়নি—রমাপতির ছেলের তো তাই নাম রেখেছে উমাপতি। আমার উপর অভিমান করেই বোধহয় সে মস্ত প্রতিশোধ নিয়েছে। যার ছেলেই ওর পেটে থাক, আমার উচিত ছিল রাজেশ্বরীকে সংসারে আটকে রাখা।"

আমি অবাক হয়ে মানুষটাকে দেখছি। রমাপতি আমার হাত দুটো আরও জোর করে ধরে ঝরঝর করে কাঁদতে-কাঁদতে বললো, "আপনার খুব অসুবিধা হবে জানি। তবু এ-গল্পটা আপনি লিখবেন না। গল্পটা জানাজানি হলে আমার উমাপতির ভীষণ ক্ষতি হবে। ও যেখানে আছে ওখানেই সুখে থাকুক। ওর কোনো অমঙ্গল করবো না। আমি জানবো, কলকাতা শহরে মরা মানুষের উপর প্রতিশোধ নেওয়া যায় না।"

ইন্ডিয়া

হাওড়া রামকৃষ্ণপুরে নৃসিংহধামের কাছে বোসদের বাজারে, রাস্তার ওপরে ঝুড়িতে রাখা কয়েকটা আপেল উল্টেপাটে দেখলো সে। দূর থেকে মন্দ লাগছিল না, কিন্তু প্রত্যেকটাতেই খুঁত—হয় আকারে অষ্টাবক্র, না হয় পোকা।

"নিন না স্যার, দাম কমিয়ে দেব", দোকানদার বলে উঠলো। আরেকজন দোকানদার ওকে সামলে দিলো, "কাকে কী বলছিস!"

একটু এগিয়ে গেলেও কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পেলো অভিজিৎ। একজন ফলওয়ালাকে লঙ্কাওয়ালা বলছে, "চিনতে পারলি না! সোমেশ্বরবাবুর ছেলে! ফরেনে থাকে। খুঁতের জিনিস বিনাপয়সায় পেলেও ওঁরা নেবেন না।"

কত বছর পরে বোসদের এই ছোট্ট বাজারে পদার্পণ করেছে অভিজিৎ। সেবারে যখন শেষ ইন্ডিয়াতে এসেছিল অভিজিৎ তখন মা বলেছিলেন, "থলে দুটো নিয়ে একটু বাজারটা ঘুরে আয় না। পাড়ার পাঁচটা পুরনো লোকের সঙ্গে দেখা হবে।"

সেবার আঁতকে উঠেছিল অভিজিৎ, "তোমার তো মাথা খারাপ হয়নি, মা! ওই ভিড়ের মধ্যে, ওই নোংরা ঠেলে, পায়ে কাদা লাগানো! বাজার করবার নামে হাজারখানেক লোক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ধস্তাধস্তি করছে। সেই সঙ্গে রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বড় ছুঁচো এবং ইঁদুর।"

এই 'র‍্যাট'-এর কথা এক সময় উঠেছিল ডায়ানার সামনে। ইংরিজি ভাষার উপর মেয়েটির দখল প্রচণ্ড। সেই সঙ্গে ব্যঙ্গর ক্ষমতা। ডায়ানা বলেছিল, "র‍্যাট নয়—প্রকৃত শব্দটা হলো ব্যানডিকুট।" তারপর সে ব্যঙ্গ করেছিল, "ইউ সুড নো, শব্দটা তোমাদেরই দান বিশ্বকে।"

অভিজিৎ জানতো না—তেলুগু প্যানডি-কোক্কু শব্দটাই আদি, যার অর্থ শুয়োর সাইজের ইঁদুর, যার আদিভূমি এই ভারতবর্ষ। সাতশো বছর আগে একজন বিদেশি পরিব্রাজক বলেছেন, এদের আকার শিয়ালের মতন। ১৩৪৩ সালে ইবন বতুতা লিখেছেন, দৌলতাবাদের যে অন্ধকার গর্ভগৃহে নবাবী আমলের অপরাধীদের ছেড়ে দেওয়া হতো সেখানে ছিল এই ব্যানডিকুটের বসবাস। বেড়ালরা পর্যন্ত এই ইঁদুর দেখলে ভয় পায়। ডায়ানার ব্যঙ্গ অভিজিৎ চুপচাপ হজম করেছে। যে জন্তু একদিন জঘন্য অপরাধীদের শাস্তির জন্যে বন্দিশালায় রাখা হতো তা এখন ছড়িয়ে পড়েছে হাওড়া কলকাতার বাজারে, হাটে, হাসপাতালে, মন্দিরে, এমনকী কিছু বসতবাটীতেও।

সেবারে অভিজিতের মনে ছিল, ইঁদুরের দাঁতে বিষ আছে। যদিও মা ব্যাপারটার উপর গুরুত্ব দেননি। একসময় অভিজিৎ তো নিয়মিত যাতায়াত

করেছে বোসদের বাজারে, কালীবাবুর বাজারে। ইঁদুর অনেক আছে, কিন্তু কেউ শোনেনি তারা মানুষকে কামড়েছে। বরং বাজারে গেলে পাঁচটা মানুষের সঙ্গে দেখা হয়, খোঁজখবর পাওয়া যায়, মনটা হালকা হয়ে যায়।

সেবারে যে-লোক বাজার যাওয়ার নামে আঁতকে উঠেছে, যে বলেছে পৃথিবীর সমস্ত জীবাণু ওই মাছের থলিতে বাসা বেঁধেছে ; সে নিজেই এবার বাজারে যাবার উৎসাহ প্রকাশ করল। মা বরং অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তোর গায়ে কাদা লাগতে পারে। ভীষণ পিছল মাছের বাজারে। বলেছিলেন, তুই একটু অপেক্ষা কর। আমি দুটো নতুন বাজারের থলে দোকান থেকে আনিয়ে নিচ্ছি।

অভিজিৎ বারণ করেছে। পুরনো থলে না হলে বাজারের অর্ধেক আনন্দই তো নষ্ট! অভিজিতের মনে পড়ল ইস্কুলে পড়ার সময়ে সে যখন নিয়মিত বাজারে যেত তখন থলের একটা হ্যান্ডেল অবধারিতভাবে ছেঁড়া থাকত। অনেক কসরতের প্রয়োজন হতো ওই থলের ভারসাম্য বজায় রাখতে।

শুধু ব্যানডিকুট নয়, সেবারে আরও অনেক অভিযোগ তুলেছিল অভিজিৎ। মায়ের নিশ্চয় মনে আছে। হাওড়ার বাজারে এখনও মধ্যযুগের পরিবেশ—যেমন বর্ণনা পাওয়া যায় ইবন বতুতার লেখায়। হই-চই হুল্লোড়, খরিদ্দারকে অহেতুক টানাটানি, অহেতুক দরাদরি। কোথাও কোনো সততা নেই—ওজন কম, ভালো জিনিসের সঙ্গে খারাপ জিনিস মিশিয়ে দেওয়া। ঠগ, পকেটমার, পাজি সব একসঙ্গে বাজারে জড়ো হচ্ছে প্রতিদিন সেই মধ্যযুগীয় পরিবেশে। অঢেল সময় মানুষের, এরই মধ্যে অকারণে প্রতিদিন ঘন্টাদেড়েক সময় নষ্ট করছে, প্রতিদিন দরদাম চলেছে এবং প্রতিদিনই বুদ্ধির লড়াই অথবা সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি!

মা শকুন্তলা দেবী ছেলের কথা শুনে সেবার চুপ করে গিয়েছেন। তর্ক করেননি, কিন্তু মেনেও নেননি। মানবেন কী করে? হাওড়ার বাজার সম্বন্ধে এই সব কথা তো এর আগে কেউ বলেনি!

বলবে কী করে? পৃথিবী ইতিমধ্যে কোথায় পৌঁছেছে, তা এ-পাড়ার কে তার খোঁজখবর করেছে? অভিজিৎ মুখার্জি এখনে ক'জন হয়েছে? তাছাড়া এখানে কেউ পড়াশোনা করে না, পৃথিবীর বড়-বড় রাষ্ট্রপ্রধান, গুটিকয়েক খেলোয়াড় আর চিত্রতারকা ছাড়া পশ্চিমের সাধারণ মানুষের জয়যাত্রা সম্পর্কে এরা কোনো খবরাখবরই রাখে না। রাখলে, জানতে পারতো কালীবাবুর বাজার, বাঙালবাবুর বাজার, বোসেদের বাজার পৃথিবী থেকে উঠে গিয়েছে। দাঁড়িপাল্লায় দু' নম্বরি বাটখারায় ওজনের কারসাজিতে পৃথিবীর লোকের ঘেন্না ধরে গিয়েছে। এখন বাছাবাছির পর, ওজন হয়ে, প্যাকেটে পুরে মাল আসছে

বিপণনকেন্দ্রে! সেখানে কোনো হৈ-চৈ নেই, দরদাম নেই। সবার জন্যে একদর। ঠাণ্ডা পরিবেশে, শুকনো খটখটে মেঝের উপরে কোটি-কোটি ডলারে জিনিস বিক্রি হচ্ছে। কাঁচা বাজার আর মণিহারী বাজারের পার্থক্য ঘুচে গিয়েছে। সময়ের দাম হয়েছে মানুষের।

এর আগের বারে প্রতি মুহূর্তে ভারতবর্ষের ভুল দেখতে পেয়েছে অভিজিৎ। এখানকার কিছু মেনে নিতে পারেনি। বিরক্তি ধরে গিয়েছে মানুষের উপর। এরা সমালোচনা শোনে, মিটমিট করে হাসে, কিন্তু কাজ কিছু এগোয় না। ভারতবর্ষের এইসব জনপদ অদৃশ্য ক্ষয়রোগের শিকার হয়—সমস্ত সমাজ-শরীরে ঘুসঘুসে জ্বরের প্রকোপ। নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে, কিন্তু কারও কোনো মাথাব্যথা নেই।

হাওড়ার কথা ভাবতে লজ্জা হয়েছিল অভিজিতের। এই জনপদ যে ডুবে যাচ্ছে, হেরে যাচ্ছে সে-খেয়ালও নেই। কেমন নিশ্চিন্ত আড্ডা চলেছে রোয়াকে-রোয়াকে। কেমন হাত গুটিয়ে বসে আছে শক্তসমর্থ পুরুষমানুষের দল—কেউ কিছু করবে না আগ বাড়িয়ে। বসে আছে, কবে কোন্ জনদরদী সরকার এসে রাস্তা সারাবে, জঞ্জাল পরিষ্কার করবে, ঘরের ঝুল ঝাড়বে, বাথরুমের দুর্গন্ধ দূর করবে, কলে জল দেবে, চাকরির ব্যবস্থা করবে এবং সবার মুখে হাসি ফোটাবে।

অভিজিৎ জানে, এরপর লোকগুলো কী চাইবে জনদরদী নেতার কাছে। বলবে, আর এক-আধখানা ঘর তুলে দাও, সস্তায় বিদ্যুৎ দাও, মেয়ের বর জোগাড় করে দাও, টিভি-তে হিন্দি নাচাগানা চালু রাখো সারাক্ষণ, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল প্রতিদিন মিট করুক, ক্রিকেটের টেস্ট চলুক অষ্টপ্রহর ধরে।

ওসব ভাববার দরকার নেই অভিজিতের—যাদের ভাবা দরকার তারা ইডিয়ট বক্সের সামনে বসে বম্বে ফিল্মিস্টারের নাচ দেখুক, তাসপাশা খেলুক। অভিজিতের কোনো 'স্টেক' নেই এই দেশের সঙ্গে। সে মার্কিন নাগরিকত্ব পেয়ে যাচ্ছে। একটা মানুষের দুটো আনুগত্য থাকে না, থাকা উচিতও নয়।

মা শকুন্তলা দেবী ছেলেকে সামলাতে চেষ্টা করেন। বলেছেন, তুই নিমাইসাধন বোসের সামনে ওসব বলিস না। বোসেদের বাড়ির ছেলেরাও তো বিদেশে গিয়েছে, অনেকদিন থেকেছে।

মায়ের এই দু'মুখো নীতি ভালো লাগেনি অভিজিতের। বোসেদের বাড়ির ছেলেরা গিয়েছিল পড়াশোনা করতে, ফিরে এসেছে এখানকার এই অচলায়তনকে মেনে নিয়ে সভাসমিতিতে গলায় মালা পরতে। মা, তোমার অভিজিৎ গিয়েছিল পড়তে, কিন্তু ওখানেই প্রতিযোগিতায় জিতে

রুজিরোজগারে নেমেছে। ওখানের কমপিটিশন জিতেই ডায়ানা রবার্টসনকে অভিজিৎ নিজের জীবনসঙ্গিনী করেছে।

পিলগ্রিম ফাদার্সদের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে ডায়নার ধমনীতে, তিন পুরুষ ইংলিশ দেশত্যাগীদের মধ্যেই বিবাহসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। ডায়ানার শরীর তার সাক্ষ্য দিচ্ছে, ডায়ানার ইংরিজি উচ্চারণ তার প্রমাণ দিচ্ছে। প্রতিযোগিতা ছিল যথেষ্ট—তিনজন সাদা মার্কিনির সঙ্গে ডেটিং-এর রেসে জয়লাভ করে ভিক্‌টরি স্ট্যান্ডে আরোহণ করতে হয়েছে অভিজিৎকে, তবেই পেয়েছে ডায়ানাকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে।

ডায়না তার পৈতৃক পদবী ত্যাগ করে মুখার্জি হয়নি অবশ্য। ওই নামটা কোনো আমেরিকান হাজার চেষ্টা করেও সঠিক উচ্চারণ করতে পারে না—মুকহ্যারজি, মাক্‌হিয়ারজি, মাকহারজাই কতরকম শব্দ ওরা সৃষ্টি করে!

দুঃখ নেই অভিজিতের—মুখুজ্যে নামের বীজটা বিদেশের মাটিতে বুনবার জন্যে কোনো মাথাব্যথা নেই তার। ডায়ানাকে সে বলে দিয়েছে, ছেলেপুলে হলে তারাই সিদ্ধান্ত নেবে তারা মুখার্জি হবে না রবার্টসন হবে। পছন্দটা তাদের—অবাধ পছন্দের দেশ এই আমেরিকা। যার যা পছন্দ তাই কাজ করো, যার যা পছন্দ বিয়ে করো, যার যা পছন্দ তাই পেটে জমা না রেখে বলে ফেলো। প্রত্যেক মানুষেরই সেই একই স্বাধীনতা—পছন্দ হলে দোকানে এসো, পছন্দ না হলে দোকান উঠে যাক। পছন্দ না হলে কর্মচারীকে সরিয়ে দাও চাকরি থেকে। পছন্দ না হলে স্বামী বউ কোনো কিছুই সহ্য করার প্রয়োজন নেই মহান এই সমাজে—পৃথিবীর একমাত্র স্বাধীন মানবসমাজ।

সেবারের সেই অভিজিৎ এতোদিন পরে আবার দেশে এসেছে। সেবারে দেশে থাকবে ঠিক ছিল দু'সপ্তাহ। কিন্তু তিনদিনেই অবস্থান অধৈর্য হয়ে উঠলো। হাওড়া ব্রিজে জ্যাম ছিল—সমস্ত ট্রাফিক নট নড়ন চড়ন দু' ঘন্টার জন্যে। বাঘমার্কা সরকারি বাস মাতালের মতন কালো ধোঁয়া ছেড়েছিল হাজার-হাজার মানুষের উপর। তার উপর বিদ্যুৎ বিভ্রাট—আলো নেই অনেকক্ষণ ধরে। বিদ্যুৎ শুধু আলো দেয় না জলও দেয় একথা খেয়াল হলো যখন বিদ্যুৎহীন পাম্পিং স্টেশন থেকে জল এলো না।

ওভারহেড ট্যাংকে জল না-থাকলে টয়লেটব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়। মা তবুও অভিজিতের মুখ চেয়ে বাথরুমে কয়েক বালতি জল আনিয়ে রেখেছিলেন রাস্তার টিউবওয়েল থেকে।

ঠিক সেই সময় বাহাত্তর ঘন্টা বিকল-থাকা হাওড়ার টেলিফোনটা হঠাৎ প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো। টেলিফোন এলো ডায়ানার কাছ থেকে। ওর কেমন ধারণা হয়ে গেল স্রেফ গাফিলতির জন্যে ফোন করেনি অভিজিৎ। এদেশের

টেলিফোন যে বেশির ভাগ সময় অচৈতন্য হয়ে থাকে আমেরিকার কোন মেয়ে তা বিশ্বাস করবে? অতএব ভুল বোঝাবুঝি ভীষণ বাড়ছে—কারণ ডায়ানা একবার চেষ্টা করেই অভিজিতের হাওড়ার ফোন নম্বর পেয়েছে। কথা বাড়ায়নি, ঝট করে কেটে দিয়েছে ডায়ানা, সংযোগ ছিন্ন করেছে। তারপর টেলিফোন আবার সমাধিস্থ। কিছুতেই কোনো নির্দেশ সে গ্রহণ করবে না।

অতএব আচমকা বিনা নোটিসে ফিরে গিয়েছে অভিজিৎ। মা কেঁদেছেন, কিন্তু বিশেষ কিছু বলেননি। সারাক্ষণ ওই এক নিমাইসাধন বোসের কথা গ্যাজর-গ্যাজর করে। ও তো হারভার্ড থেকে ফিরেও হাসিখুশি আছে—জ্যাম, লোডশেডিং, পলিউশন ইত্যাদি সম্বন্ধে কখনও কারও উপর রাগ দেখায়নি। বরং রসিকতা করেছে, এসবই তো ইংরিজি সমস্যা—পশ্চিমি সভ্যতাই এসব হাওড়ায় নিয়ে এসেছে। পাঁচশো বছর আগে এমনকী কবি ভারতচন্দ্রের সময়েও এসব সমস্যা ছিল না হাওড়া শহরে।

রসিকতার একটা সীমা আছে। আসলে, ধৈর্যের নার্ভে নিমাইসাধনবাবু হয়তো কোনো গোপন অস্ত্রোপচার করিয়ে এসেছেন হারভার্ড মেডিক্যাল স্কুল থেকে।

মায়ের কথার মধ্যে একটা চাপা সমালোচনা আছে আন্দাজ করে অভিজিৎ আরও বিরক্ত হয়েছিল। টেলিফোনেই ডায়ানাকে বলেছিল, জীবন অসহনীয়।

সেই কথা দূর থেকে খুড়তুতো বোন অসীমা শুনেছিল। সে ভুল বুঝে অন্য কথা প্রচার করে বেড়াচ্ছে—বউদি অনেক দূরে, দাদার জীবন বিরহের বোঝায় বেসামাল, আর বহন করা যাচ্ছে না।

অভিজিৎ কেয়ার করেনি—একটা ফচকে ইন্ডিয়ান মেয়ে, যে পৃথিবীর রমণীদের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নয়, তার কথায় কী এসে যায়?

এই খুড়তুতো বোনই আড়ালে রসিকতা করেছিল, দাদা মেমবউদির প্রেমে গদগদ।

দাদা বিরক্ত হয়েছিল। ইন্ডিয়ার ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা, কোথাও কোনো প্রেম আছে বলে মনে হয় না। তবু কী করে যে এদেশে বছরে-বছরে এতো বেবি হয় তা-ই একটা রহস্য! কোথায় যেন অভিজিৎ লিখেছিল, ইন্ডিয়ানদের যত প্রেম সব বিছানায়। এদেশে প্রেম মানে সম্ভোগ। লাভ কথাটার কোনো মানে ইন্ডিয়ানরা জানতো না-হাজার-হাজার বছর ধরে।

এর প্রমাণও অভিজিৎ ওদেশে ফিরে গিয়ে দাখিল করেছিল। এ ব্যাপারে ডায়ানা সাহায্য করেছিল—সাউথ এশিয় সাহিত্য সম্পর্কে খবরাখবর জোগাড় করে এনে দিয়েছিল ওঁদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ওখানে রিচার্ড সেলিগম্যান নামে এক ছোকরা কমপিউটার প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের চুলচেরা বিশ্লেষণ

চালাচ্ছিল। গুগেনহাইম ফাউন্ডেশন থেকে কী একটা বৃত্তি পেয়েছে ওই সেলিগম্যান ছোকরা।

সেবার ওইভাবে আকস্মিকভাবে যাওয়া! মা বোধহয় আন্দাজ করেছিলেন অভিজিৎ আর ফিরবে না। তাই কাঁদতে-কাঁদতে বলেছিলেন, তোকে কষ্ট করতে হবে না। শুধু আমার শ্রাদ্ধটা করিস। মায়ের ধারণা, পরলোকে ভীষণ তৃষ্ণা। ইহালোক থেকে সন্তান জল দান না করলে তৃষিত আত্মা ছটফট করবে। এইভাবে অন্তহীন সময় চলতে থাকবে যদি-না গয়াধামে পিন্ডদান করে আত্মজ। ছেলেকে গয়াতে আসতে বলতে সাহস পেলেন না শকুন্তলা মুখার্জি। ওখানে কোনো পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি চলে না, সন্তানকে স্বয়ং উপস্থিত থেকে পিতৃপুরুষের সঙ্গে লেনদেন সমাপ্ত করতে হয়। কিন্তু তর্পণ করা চলে পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্ত থেকে—সঙ্গে একটু নদীর জল থাকলেই হলো। নদী নেই এমন দেশ তো হয় না, সুতরাং অভিজিতের তেমন কিছু কষ্ট হবে না।

এদেশে আবার ফেরা, অপ্রত্যাশিতভাবে। ট্যাক্সিটা যখন দমদম থেকে অভিজিৎকে নিয়ে হাওড়ার এই বাড়িতে এলো তখন মা তো বিশ্বাসই করতে পারেন না। লটারিতে ফার্স্ট প্রাইজ পেলেও শকুন্তলা এতো খুশি হতেন না। মঙ্গলময়, তোমার দয়ার সীমা নেই—তুমি কখন কী দাও তা কেউ বুঝতে পারে না। মা প্রথমে হাসলেন, পরে কাঁদলেন কিছুক্ষণ। তারপর আবার হাসিতে মুখ বোঝাই করে ঠাকুরঘরে চলে গেলেন।

"রাস্তার অবস্থা নিশ্চয় আগের থেকে খারাপ দেখলি," শকুন্তলা ভয়ে-ভয়ে আছেন। এ দেশের রাস্তার দায়দায়িত্ব যেন তাঁরই।

রাগ দেখাল না অভিজিৎ। "বর্ষার পরে চিরকালই তো রাস্তা খারাপ হয়, মা। পুজোর আগে সারাবে। এক জায়গায় দেখলাম, খোয়া ফেলছে।"

"ট্রাফিক জ্যাম।"

"হাওড়া ব্রিজে ট্রাফিক আটকেছিল। কিন্তু মিনিট পনেরো মাত্র। একটা লরি খারাপ হয়ে রাস্তার অর্ধেক আটকে দিয়েছে। গরিব দেশ ইচ্ছে করলেই সমস্ত পুরনো ট্রাক জাংক ইয়ার্ডে ফেলে দিতে পারে না।"

"ফোনটা দু'দিন বেগড়বাঁই করছে।"

বিরক্ত নয় অভিজিৎ। "ঠিক হয়ে যাবে নিশ্চয়।"

তা ছাড়া ফোন থেকে একটু মুক্তি মন্দ নয়। প্লেনে কোন ম্যাগাজিনে পড়ল অভিজিৎ, ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় শিল্পী গণেশ পাইন বাড়িতে ফোন রাখেননি। শিল্পী যামিনী রায়েরও ফোন ছিল না, কলিং বেল ছিল না। ফোন মানুষের সৃষ্টিকে বিন্দুমাত্র সাহায্য করেনি, বরং মানুষের প্রাইভেসি কেড়ে নিয়েছে—কোথায় যেন লিখেছেন আমেরিকার বিখ্যাত এক দার্শনিক। এই

লেখকের বক্তব্য : যোগাযোগ ব্যবস্থা যত উন্নত হচ্ছে মানুষের দূরত্ব তত বাড়ছে। যান্ত্রিক নৈকট্য মানুষকে শেষ পর্যন্ত দূরে সরিয়ে দেয়!

সেই অভিজিৎ, যে ব্যানডিকুট সম্পর্কে ভয় পেয়েছিল, সে পরের দিন সকালে বাজারে যেতে চাইলো। শকুন্তলা বললেন, "তোর বাবাকে পাঠাচ্ছি।"

অভিজিৎ বললো, "আমিই যাই। বোসেদের বাজারটা অনেকদিন দেখা হয়নি। জানো মা, এসব বেশিদিন থাকবে না পৃথিবীতে। সব শেষ পর্যন্ত বোঝাই হয়ে যাবে সুপারমার্কেটে। রোবটের সঙ্গে কেনা বেচা করতে হবে। যদি আমরা এই কালীবাবুর বাজার, বোসেদের বাজার শেষ পর্যন্ত রক্ষে করতে পারি, তা হলে দুনিয়ার মস্ত ট্যুরিস্ট আকর্ষণ হবে। স্রেফ ওরিয়েন্টাল বাজারের রোমাঞ্চ অনুভব করতে ছুটে আসবে হাজার-হাজার আমেরিকান, জার্মান, কানাডিয়ান, সুইডিশ, এমনকী জাপানিরা পর্যন্ত।"

"মাছের বাজারে বঁটিগুলো ঠিক আগেকার মতন আছে তো মা?" অভিজিৎ জানতে চাইছে।

"বঁটি আবার কী হবে? বঁটি আছে বঁটির মতনই।" মা ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। মা জানে না, এইরকম খাড়া ছুরি—আপরাইট নাইফ পৃথিবীর কোথাও নেই—ওয়ান্ডার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। এই বঁটিতে মাছ কাটা দেখলে আই.বি.এম-এর চিফ এগজিকিউটিভ ভিরমি খাবে! ধৈর্য এবং স্কিল—দুটোই অক্ষত রয়েছে অনন্তকালের এই হাওড়ায়। কত ত্যাগ স্বীকার করে এই সব হেরিটেজ অবিকৃত রাখতে হয় তা পশ্চিমের লোকরা ইতিমধ্যেই বুঝতে শুরু করেছে।

মায়ের হাত থেকেই নোংরা থলে দুটো তুলে নিল অভিজিৎ। "পুরনো না হলে বাজারের থলে জাতে ওঠে না।"

বাজারে গিয়ে চাঞ্চল্য অনুভব করেছে অভিজিৎ। "সোমেশ্বরবাবুর ছেলে না?" অনেকেই চিনতে পেরেছে অভিজিৎকে। অথচ কতদিন তারা অভিজিৎকে দেখেনি।

সবচেয়ে যা বিস্ময়কর, সকলেই অভিজিতের জন্যে গর্বিত। "তুমি তো আমাদের গর্ব।" অথচ এই গর্ববোধের কোনো কারণ নেই। এঁদের কিন্তু কোনো প্রত্যাশা নেই অভিজিতের কাছ থেকে। এই সব মানুষের জন্যে অভিজিৎ কোনোদিন কিছু তো করেনি, বরং এদের একটু ছোটভাবেই দেখে এসেছে। তবু এঁরা অসীম দয়ায় অভিজিতের সমস্ত অপরাধ শুধু ক্ষমা করেনি, বরং তার জন্যে গর্ব বোধ করছে। নিই ইয়র্কে, শিকাগোয়, স্যানফ্রান্সিসকোতে এই মনোভাব সম্ভব নয়—একমাত্র হাওড়াতেই এই ধরনের ভালোবাসা এখনও বেঁচে রয়েছে।

অভিজিৎ প্রাণভরে বাজার করেছে। একটা ছেলের সঙ্গে পাতিলেবু নিয়ে দরদস্তুর করেছে। তারপর দুটো পাতিলেবুর জন্যে একটা দু'টাকার নোট রেখে দিয়ে সে চলে আসছিল। ছেলেটা পিছন-পিছন ধাওয়া করেছে প্রাপ্য খুচরো নিয়ে—সে শুনছে না যে অভিজিৎ ইচ্ছে করেই দু'টাকা রেখে চলে এসেছে। দু'টাকা দশ সেন্টের মতন—ওই দামে কিছুই পাওয়া যায় না বিদেশে। ছেলেটা শুনল না, খুচরো ফেরত দিল। এরা ভীষণ সম্মানের মানুষ—না দিয়ে কিছু নেয় না, অভিজিৎ আবিষ্কার করলো।

খাবারের দোকাকে অভিজিৎকে দেখে সবার খুব আনন্দ। রাজেন ময়রা নেই, কিন্তু ওর ছেলে বীরেন ঠিক ওইরকম দেখতে হয়েছে। সেই গোল মুখ, তিন নম্বর বলের সাইজের ভুঁড়িতে আলগা করে ধুতি জড়ানো, হাতাওয়ালা জালি গেঞ্জি, গলায় কণ্ঠী, ডান হাতে ভারী তাবিজ। রাজেন টু যেন রাজেন ওয়ানের স্থান অধিকার করেছে।

এই দোকানেই আলুর দম খেতে আসত অভিজিৎ ইস্কুলে পড়ার সময়। মাটির ভাঁড়ে সেই একই আলুর দম কিনল অভিজিৎ। নিউ ইয়র্কে দোকান করলে মিলিয়নিয়ার হয়ে যেতো লোকটা, অভিজিৎ ভাবলো। "এথ্‌নিক আলুর দম!"

রাজেনের ছেলে চিনতে পারল অভিজিৎকে। শুনল না, জোর করে বিনামূল্যে একটা সিঙাড়া ও একটা জিলিপি খাওয়াল। নিউ ইয়র্কে সিঙাড়ার সাইজ কেমন জানতে চাইছে রাজেনের ছেলে। সিঙ্গাড়া, জিলিপি, আলুর দম ছাড়া যে কোনো দেশ আছে তা ধারণাই নেই রাজেনের ছেলের!

শেষ পর্বে আপেল কিনতে গিয়ে পোকাধরা আপেল আবিষ্কার। এবং পিছন থেকে ওই মন্তব্য শোনা। "সোমেশ্বর মুখার্জির ছেলে! খুঁতের জিনিস বিনা পয়সায় দিলেও নেবে না।"

শেষ কথাটা বাড়িতে বিছানায় শুয়েও ভুলতে পারছে না অভিজিৎ। খুঁতের জিনিস—দাম কমালেও সে নিতে চায় না। খুঁত! অভিজিৎ নিজেই খুঁতের জিনিস হয়ে গিয়েছে। সেই নিষ্কলঙ্ক, সম্ভাবনাময় অভিজিৎ মুখার্জি আর নেই।

শকুন্তলা দেবীর মনে পড়ল, সেবার সাত সকালে হাফ প্যান্ট, স্পোর্টস গেঞ্জি ও একটা ঢাউস রবারের জুতো পরে ছুটতে বেরুতো অভিজিৎ। পাক্কা পঁয়তাল্লিশ মিনিট এইসব সরু গলিতে ছোটা কি সম্ভব? কিন্তু উপায় নেই। মেমসায়েব বউয়ের নিশ্চয়ই ওই ধরনের নির্দেশ রয়েছে।

ছোটাছুটির নেশায় পড়েছে জাতটা—ইচ্ছে না-হলেও ছুটতে হবে।

ছেলে-বুড়ো মেয়ে-মরদ শিক্ষিত-অশিক্ষিত বড়লোক-গরিব সবাই ছুটছে ক্যালরি নামক অসুরকে পুড়িয়ে মারবার জন্যে। স্নানের পরে ওজন যন্ত্রের খবর নিয়েছিল অভিজিৎ। শকুন্তলা দেবী খোঁজখবর করেছিলেন। কিন্তু এ পাড়ায় কারও ওজনের যন্ত্র নেই শুনে অবাক হয়েছিল অভিজিৎ।

সেই অভিজিতের শরীর ভগবানের দয়ায় একটু ভালো হয়েছে। শরীরে একটু শাঁস লেগেছে—স্বামীকে কেন আমেরিকান মেয়েরা হাড়গিলে করে রাখতে চায় তা শকুন্তলা দেবী বুঝতে পারেননি।

লুচি পরোটা বোঁদে রসগোল্লা ছোটবেলার প্রিয় কোনো জিনিসই সেবার স্পর্শ করেনি অভিজিৎ। বউমা কোনো দিব্য দিয়ে রেখেছিল মনে হলো। একটু দুধ, একটু মাখন, একটু মিষ্টি শরীরে না-গেলে শ্রী আসবে কী করে? শকুন্তলা বুঝতে পারেননি। কিন্তু অভিজিতেরও কোনো ধৈর্য ছিল না। মাকে কিছুই বোঝাবার চেষ্টা করেনি। বরং শুনিয়ে দিয়েছিল, খাওয়া নিয়ে তর্ক চলে না ; যা আমাদের ওখানে চলে না তা এখানেও চলে না!

সেই অভিজিৎ এবার পরম আনন্দে লুচি-আলুর তরকারি খেল। সেই সঙ্গে একটু মিহিদানা। ভালো লাগায় মিহিদানা রিপিট হলো।

আপেলগুলো আবার দেখতে পাচ্ছে অভিজিৎ। দূর থেকে কী সুন্দর! কিন্তু হাতে নিলেই ফুটোটা নজরে পড়ে যায়—পোকাধরা আপেলের বাজার-দর নেই।

অভিজিৎ নিজেই একটা পোকাধরা আপেল হয়ে গিয়েছে। তার দাম্পত্যজীবনের সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।

ডায়ানা কিছুদিন থেকে ধৈর্যহীনা হয়ে পড়ছিল। অভিজিতের কোনো কিছুই তার পছন্দ হচ্ছিল না। বিশেষ করে ওর শরীর—কুড়ি পাউন্ড বাড়তি ওজন নিয়ে সে নাকি ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ মিস্টার ফ্যাটির কোনো চিন্তা নেই। ইন্ডিয়ানরা নাকি ভীষণ মোটা হয়—ওবেসিটি কালাদের বিশেষত্ব! একেবারে বাজে কথা—হাওড়ায় মোটা লোক তেমন কই? কিন্তু ডায়ানা রবার্টসন ওসব তর্ক পছন্দ করে না। কোমরে একটা ফুলানো টায়ারটিউব নিয়ে ঘুরে বেড়ানো তার দু'চক্ষের বিষ।

একদিন হাত দিয়ে খাবার তুলে খেয়েছিল অভিজিৎ। ডিনার টেবিলে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিল ডায়ানা। বিয়ে হয়েছে বলে ওরিয়েন্টাল বর্বরতা সহ্য করবে না ডায়ানা। সভ্য হতে হবে। সুসংহত হতে হবে অভিজিৎকে। তারপরেই তীব্র আঘাত হেনেছিল ডায়ানা। যারা সভ্যতা শিখতে রাজি নয় তাদের ইন্ডিয়ায় ফিরে যাওয়া উচিত। ইন্ডিয়ার প্লেন এখনও বন্ধ হয়নি।

অভিজিৎ খুবই অস্বস্তি বোধ করেছে। বলতে ইচ্ছে করেছে এদেশে

ঢোকবার অনুমতি ডায়ানা রবার্টসনের দয়ায় পাওয়া যায়নি ; এদেশে থাকার অনুমতিও তার দয়ার উপর নির্ভর করছে না।

কিন্তু ও-সব বলার সাহস হয়নি অভিজিতের। রাগ না চণ্ডাল, মায়ের কথা মনে পড়ে গিয়েছে অভিজিতের। রাগ কমলে ডায়ানাও বুঝবে এবং হয়তো লজ্জা পাবে।

কিন্তু কোনো লজ্জা পায়নি ডায়ানা। রিচার্ড সেলিগম্যানকেই মনে ধরে গিয়েছে ডায়ানার। তার আগে অবশ্য দেহেও ধরা দিতে হয়েছে বেশ কয়েকবার। অভিজিৎ যখনই শহরের বাইরে গিয়েছে তখনই অভিজিতের বিছানাতে আতিথ্য নিয়েছে রিচার্ড সেলিগম্যান। সে খবর ডায়ানা পরে নিজেই স্বীকার করে নিয়েছে। 'পট বেলিড' অভিজিৎ সম্পর্কে ডায়ানার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই একথা জানাতে দ্বিধা করেনি ডায়ানা।

বাড়িটা দু'জনের নামে ভাড়া নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ডায়ানা বিতাড়িত করেছে অভিজিৎকে। মেয়েরা যে কতখানি হৃদয়হীনা হতে পারে তা আন্দাজ করাও বেশ কঠিন। ডায়ানা যা কিছু যোগাযোগ করেছে তা উকিলের মাধ্যমে। বিয়ে ভাঙার পরে অভিজিৎ প্রথমে উঠে এসেছে হোটেলে। তারপর একটা ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্ট দেখে নিয়েছে। সুপার মার্কেটে সেলিগম্যানের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তাকে উইশ করেছে সেলিগম্যান। ডায়ানাকে ছিনিয়ে নিয়ে ছোকরা এখন খুব সুখে রয়েছে মনে হলো। খুব উৎসাহের সঙ্গে বউয়ের একান্ত ব্যক্তিগত শারীরিক প্রয়োজনের জিনিসপত্তরও কিনছে—কোনো লজ্জাও নেই তার।

এই সেলিগম্যানই অভিজিৎকে উপাদান সংগ্রহ করে দিয়েছিল। ভারতবর্ষের নারী-পুরুষের সম্পর্ক যে দেহসর্বস্ব তা সংস্কৃত সাহিত্যের উদ্ধৃতি থেকে বোঝাতে চেয়েছিল অভিজিৎ। হাজার দেড়েক বছর আগে প্রকাশিত কথাসরিৎসাগরের গল্পগুলো খুব কাজে লেগেছিল। পদে-পদে শুধু নারীর স্থূল দেহবর্ণনা। নারীর অন্তরের কথার কোনো উল্লেখ নেই—পুরুষের কামনায় ইন্ধন জুগিয়ে সন্তান উৎপাদনই তার বেঁচে থাকার একমাত্র যুক্তি। সংস্কৃত সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ সুন্দরীরা নিজেদের স্তনভারে বিব্রত, মদনের শরাঘাতে তারা বস্ত্রহীনা হয়। বক্ষ, নিতম্ব, নীবিবন্ধনের কী পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। কিন্তু যৌনসম্পর্কবিবর্জিত কোনো চিন্তার উপস্থিতি নেই কোনো নারীচরিত্রে।

কয়েকটি উদ্ধৃতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সংস্কৃতে লেখা হয়েছে : "বিবাহিত কি অবিবাহিতা, পিতৃগৃহবাসিনী অথবা বারবনিতা কোনো প্রকার স্ত্রীলোকের প্রতি আস্থা স্থাপন করিবেন না, তাহারা সকলেই চপলমতি।...স্ত্রীজাতিকেই ধিক্ যাহারা মক্ষিকার ন্যায় কর্পূর ত্যাগ করিয়া অশুচি

শংকর ভ্রমণ (১)—৩০

দ্রব্যে আকৃষ্ট হয়।"

অনূঢ়া রাজকন্যাদেরও নাকি সেকালে কোনো ব্যক্তিত্ব ছিল না। পরোপকারী নামে এক নৃপতি তাঁর মহিষীকে অনূঢ়া কন্যা সম্বন্ধে বলেছেন : "কন্যা অন্যের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করে এবং তন্নিমিত্তই তাহাকে লালনপালন করিতে হয়। বাল্যকাল ব্যতীত পিতৃগৃহ তাহার পক্ষে বাস করিবার উপযুক্ত স্থান নহে। অবিবাহিতা রজঃস্বলা কন্যা গৃহে থাকিলে তাহার আত্মীয়স্বজনেরা নরকে গমন করে।...যুবতী কন্যাকে গৃহে রাখা সমীচীন নয়।...কুমারী কন্যার উপযুক্ত বিবাহ না হইলে তাহা বেসুরা সঙ্গীতের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। উহা অপরিচিতেরও কর্ণপীড়া উৎপাদন করে।"

রমণীশরীরের জয়স্তুতিতে বারাঙ্গনাগণও সেকালের সাহিত্যে গৃহস্থ রমণী অপেক্ষা বেশি স্থান অর্জন করেছে, লিখেছিল অভিজিৎ।

বৃহৎ হনুযুক্তা, দীর্ঘদন্তী এবং ভগ্ননামা এক কুট্টিনী তাহার কন্যাকে যে শিক্ষা দিয়েছিল তাও অভিজিৎ বিদেশে ফাঁস করতে দ্বিধা করেনি। "ধনের নিমিত্তই সকলে পূজ্য হয়, বিশেষত বারাঙ্গনাগণ। প্রেমাসক্ত হইলে বেশ্যা বিত্তলাভ করিতে সমর্থ হয় না।...সুদক্ষা অভিনেত্রীর ন্যায় সুশিক্ষিতা বারবনিতা মিথ্যা প্রেমের ভান করিবে। এই প্রকারে পুরুষের আসক্তি আকর্ষণপূর্বক সে তাহার সমস্ত ধন অপহরণ করিবে এবং তাহার সর্বনাশ হইলে অবশেষে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।"

ডাইভোর্সের পরে আফসোস করেছে অভিজিৎ। এক ধরনের বিচিত্র নিঃসঙ্গতা ঘিরে ধরেছিল অভিজিৎকে। ডায়ানা যে এমন হতে পারে তা ভাবতেও কষ্ট হচ্ছিল। মনে হয়েছিল দূরত্বই সবচেয়ে কাম্য। যে তাকে বঞ্চনা করেছে তার থেকে দূরত্ব এবং দেশের আপনজনদের থেকে দূরত্ব দুই-ই কাম্য।

সেলিগম্যানদের থেকে দূরত্ব সৃষ্টি করা কষ্টসাধ্য নয় আমেরিকায়। চাকরি পরিবর্তন করেছে অভিজিৎ। সরে গিয়েছে মধ্যপশ্চিমে যা মিডওয়েস্ট নামে পরিচিত।

এই মিডওয়েস্টেই প্রায় নির্বাসিত জীবন যাপন করেছিল অভিজিৎ। স্থানীয় ভারতীয়দের সঙ্গে যোগসূত্র কখনই দৃঢ় ছিল না, নিঃসঙ্গ জীবনে সম্পর্কটা আরও দুর্বল হয়ে উঠেছিল। পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে ভারতীয়দের কৌতূহল অতি মাত্রায়। তবু মাঝে-মাঝে জন্মভূমির মানুষদের জন্যে মন টানে। বিদেশে অর্থোপার্জনই সব নয়, আরও কিছু প্রয়োজন থেকে যায় আত্মার।

অবশেষে বাংলায় যখন শরৎ এলো ঠিক সেই সময় প্রবাসের বাঙালিদের মন শারদোৎসবের জন্যে হাহাকার করে উঠলো। উইক এন্ডে দেবী দুর্গার আবাহন ও আরাধনার জন্যে প্রবাসীর মন উদ্বেল হয়ে ওঠে। এই পূজা মানুষকে

টেনে আনত দূর-দূরান্ত থেকে।

প্রবাসের পূজা এক অনন্য অভিজ্ঞতা। না অংশ গ্রহণ করলে দেবীমাহাত্ম্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। দিনক্ষণ দেখে পূজা সম্ভব হয় না। মাকে আনতে হয় নির্ধারিত সময়ের আগের শনি-রবিবারের অথবা নির্ধারিত সময়ের পরবর্তী শনি-রবিতে। ভাড়া করা হয় স্থানীয় কোনো সভাগৃহ। দেবী-মূর্তি আসে স্বদেশ থেকে অথবা তৈরি হয় কোনো সুনিপুণ বঙ্গবধূর বেসমেন্ট স্টুডিওতে। যারা তাও পারে না তারা নির্ভর করে পটের উপর।

শারদোৎসব আসলে বাঙালির বাৎসরিক মিলনোৎসব। যেভাবেই হোক, সবাই আসেন সপরিবারে এবং দীর্ঘসময় ব্যয় করেন। খাওয়া-দাওয়া সবই একাসনে।

এইখানে পুরোহিত ও তাঁর সহকারী যে-মন্ত্র পাঠ করেন তা স্বদেশে আজকাল শোনা সম্ভব হয় না। কারণ অ্যামেচার পুরোহিত প্রায়শঃই কোনো বিশেষ বিদ্যায় ডক্টরেট। প্রাণের তাগিদে শেখা তাঁর সংস্কৃতে কোনো খাদ থাকে না।

এই পূজার সভায় অভিজিৎ লক্ষ করলো এক দম্পতিকে। দুধসাদা সিল্কের উপর চওড়া লাল পাড় শাড়ি পরেছেন এক পদ্মলোচন বঙ্গললনা। ছেলেটির বয়স দশ এগারো, মায়ের তুলনায় একটু চাপা রঙ। ছেলেটি যে-লোকটিকে বললো, বাবা এবার পুষ্পাঞ্জলি দিতে হবে, তারপর আমরা কফি খাব, সেই মানুষটি গোবেচারা ধরনের। বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে মনে হলো।

পুষ্পাঞ্জলির পরে এই পরিবারের সঙ্গে আরও আলাপ হলো। তারপর মহিলা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলেন, আপনার স্ত্রী কখন আসবেন?

অভিজিৎ অস্বস্তিতে পড়লো, কিন্তু চেপে রাখল না। ওই পর্বটা তার শেষ হয়ে গিয়েছে। ভেবেছিল এবার দূরত্ব বেড়ে যাবে। কারণ প্রবাসের বাঙালী বধূরা ঘরভাঙা মানুষদের সঙ্গে একটু দূরত্ব রেখে চলেন। একটু অস্বস্তি এসে যায়। স্ত্রীই হচ্ছে এই সমাজে মেলামেশার চাবিকাঠি।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেরকম কিছু হলো না। ছেলেটি হঠাৎ বাবাকে টেনে নিয়ে চললো কফির লাইনে। ওরা সবাই উপবাস করেছে। মহিলা কিছুক্ষণ অভিজিতের কাছে রয়ে গেলেন। অভিজিৎ ব্রেকফাস্ট করে পূজা দিতে এসেছে শুনে মহিলা শাসনের সুরে বললেন, "ওই জন্যেই তো মা চটে যান। কাল না খেয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে আসবেন, আর মায়ের কাছে প্রার্থনা করবেন, আমার সমস্ত দুঃখ দূর করে দাও।"

অভিজিৎ একটু অবাক হলো। স্নেহের সঙ্গে শাসনের মিশ্রণ একমাত্র মা ছাড়া কারও কাছ থেকে পায়নি সে। সেই মাও এখন অনেক দূরে এবং তেমন

যোগাযোগ নেই। বিয়ে ভাঙার পরে ব্যাপারটা আরও শিথিল হয়ে গিয়েছে, অভিজিৎ অকারণে নিজেকে আরও দূরে সরিয়ে নিয়েছে।

অবাক হবার বাকি ছিল। মহিলা বোধহয় অভিজিতকে অনুপ্রাণিত করার জন্যেই বললেন, "একবার ভুল হলেই জীবন শেষ হয়ে যায় না, মিস্টার মুখার্জি। ফেলকরা ছাত্রছাত্রীরা আবার পরীক্ষা দিতে পারে। এই তো আমরা আবার পরীক্ষায় বসে পাস করেছি। আমরা বেশ সুখী। আমাদের কোনো কষ্ট নেই।"

অভিজিৎ বিশ্বাস করতে পারছিল না ওই লোকটি ওই ছেলেটির জন্মদাতা নয়। সুপ্রভা রায় বললেন, "আমি এদেশে এসেছি দু'বছর। আমি নতুন জীবন আরম্ভও করেছি।"

সুপ্রভার স্বামী ছিল মদ্যপ এবং জালিয়াত। একটা রিভলভার সবসময় সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াত, কত হাঙ্গামায় যে জড়িয়ে পড়েছে লোকটা। তারই ঔরসে সন্তান। কিন্তু সংসার করা সম্ভব হয়নি শেষ পর্যন্ত, সুপ্রভা ফিরে এসেছে পিত্রালয়ে। ডাইভোর্সও হয়েছে।

"এই ডাইভোর্সে আমাকে সবচেয়ে সাহায্য করেছিলেন বড় ননদ। অদ্ভুত মহিলা। তিনি মাকে বললেন, ওর জীবন নষ্ট করবেন কেন? আবার বিয়ে দিন। দু'বছরের চেষ্টার পরে ডঃ নীতিশ রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ হলো। উনি মেমসায়েব বিয়ে করেছিলেন—বিয়ে টেকেনি। তারপর বিয়ে হলো ; আমরা চলে এসেছি দু'বছর আগে। মনে নানা ভয় ছিল—কিন্তু আমরা সুখী হয়েছি, মিস্টার মুখার্জি। বিশেষ করে আমার ছেলে। বাবার সঙ্গে ওর ভীষণ ভাব।"

হাস্যময়ী সুপ্রভার ডাক পড়লো পুত্র ও স্বামীর কাছ থেকে। তারা কফি ও ব্রেকফাস্ট নিয়ে অপেক্ষা করছে।

সুপ্রভা এগিয়ে গেল। কিন্তু তার আগে কেমন সহজভাবে বলে গেল, "কাল খালি পেটে মায়ের কাছে মন দিয়ে প্রার্থনা করুন। তারপর দেশে চলে যান। দেশে আমার মতন অনেক দুঃখী মেয়ে আছে। কোনো অসুবিধে হবে না।"

কেউ কোনোদিন বিদেশের মাটিতে সামান্য কিছুক্ষণের পরিচয়ে এইভাবে উপদেশ দিতে সাহস পায়নি অভিজিতকে।

পরের দিন আবার দেখা হয়েছিল, পূজাপ্রাঙ্গণে। সুপ্রভা নিজেই বললো, "এই তো, দেখেই বুঝছি, কথা শুনেছেন। উপবাস করেই এসেছেন পুষ্পাঞ্জলি দিতে। খুব ভালো করে প্রার্থনা করুন, মা সব শোনেন।"

সুপ্রভা কী করে বুঝল অভিজিৎ আজ সত্যিই উপবাস করেছে? নিষ্ঠাবতী বাঙালি রমণীরা বোধহয় সত্যিই ত্রিনয়নী। এদের নতুনভাবে দেখতে শুরু করেছে অভিজিৎ। এই আনন্দময়ীরাই তো পূজাপ্রাঙ্গণ আলো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হাওড়ার বাড়িতে বসে অনেক কথা মনে হচ্ছে। ছেলে আবার বিয়ে করতে রাজি হয়েছে, এই খবর মাকে খুব আনন্দ দিয়েছে।

অভিজিৎ স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় চিরদিনই খুব ভালো ফল করেছে। পাস করবে কি না এই দুশ্চিন্তা স্বদেশে অথবা বিদেশে কখনই আসেনি। তাই সুপ্রভা রায়ের ওই ফেল-করা ছাত্রের উপমাটা মনে পড়ে যাচ্ছে ঘুরে-ফিরে। ভারি সুন্দর বলেছিল মিসেস রায়—ফেল-করা ছাত্রছাত্রীদের আবার পরীক্ষায় বসতে তো কোনো বাধা নেই।

শুধু দাম্পত্যজীবনের দ্বিতীয় পরীক্ষাটা একটু অন্যরকম। ফেল-করা ছাত্রকে এমন দোসর খুঁজতে হবে যে নিজেও ফেল করেছে। দু'জন অকৃতকার্য ব্যক্তির মধ্যে সার্থক যোগাযোগ স্থাপনের সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু সেখানেও যথেষ্ট সুখ রয়েছে—তার প্রমাণ তো ওই আনন্দময়ী সুপ্রভা রায় ও নীতিশ রায়। সবচেয়ে লাভ হয়েছে যার সে ওই দশ-এগারো বছরের ছেলেটির। কলকাতায় বসে অসহায়ভাবে মায়ের চোখের জল মোছা না দেখে সে বিদেশের প্রাণস্রোতের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। ডঃ নীতিশ রায়ও এমন একটি রেডিমেড সন্তান পেয়ে খুবই সুখী মনে হলো। তৃষিত ব্যথিত ব্যর্থ জীবনেও আবার সুখ সার্থকতা ফিরে আসে। সুখ যেতেও যতক্ষণ আসার ফিরতেও ততক্ষণ।

মা শকুন্তলা দেবী ঘরে ঢুকে ছেলেকে চা দিয়ে গেলেন। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে এমন রাজকীয় স্টাইলে চা পান অনেকদিন হয়নি। অথচ হাওড়ায় অনেকেই এই বিলাসিতা সারাজীবন উপভোগ করে যাচ্ছে। চায়ের কাপ মাজবার কথাও ওঠে না। পুরনো অভ্যেসমতো অভিজিৎ চায়ের কাপ ধুতে গিয়েছিল—বাড়িতে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল।

ছেলে অনেক শান্ত হয়ে গিয়েছে, মা লক্ষ করছেন। দেশ সম্বন্ধে যা-সব লিখছিল তাতে অনেকেই অস্বস্তি বোধ করছিল। একজন তো তাকে বলেছিল, অভিজিতের নাম পাল্টে অভিযোগ মুখার্জি রাখুন।

সেই পর্ব শেষ হয়ে গিয়েছে। দেশের যেসব জিনিস প্রথম প্রবাসের পর অসহ্য মনে হয়েছিল তা এখন ততটা খারাপ মনে হচ্ছে না। সব ব্যর্থতার পিছনে যেন একটা যুক্তি লুকিয়ে রয়েছে। এখানে মানুষের সহ্যশক্তি একটু বেশি। ফলে সমস্যার সমাধান হতে দেরি হয়। অধৈর্য ও অশান্তরাই পৃথিবীতে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু অভীষ্ট লাভ করেও তারা শান্তি পায় না। অভিজিতের মনে হলো।

মায়ের দুঃখ অনেক। একসময় কত আশা বুকে করে বসেছিলেন, মনের মতন বিয়ে দেবেন ছেলের। সেই আশায় সেবার কাগজে বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলেন। 'আমেরিকায় শিক্ষিত ও কর্মরত ব্রিলিয়ান্ট মুখার্জি (২৬) পাত্রর জন্য প্রকৃত সুপাত্রী চাই। পাত্রীই একমাত্র বিবেচ্য।'

তারপর কী হয়েছিল শকুন্তলার মনে আছে। চিঠি এসেছিল প্রায় এক হাজার। আর টেলিফোনে যে কত খোঁজ এসেছিল। সেই সব চিঠিগুলো এখনও যত্ন করে বান্ডিল বাঁধা অবস্থায় এ-ঘরের টেবিলে পড়ে রয়েছে।

বাঙালির ঘরে যে কত সুযোগ্যা পাত্রী রয়েছে তা শকুন্তলা দেবীর জানা ছিল না। এইসব পাত্রীরা কেউ বি.এ পাসের কম নয়। এম.এ, এম.এসসি অনেকে। আর আছে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার গবেষিকা। এরা শুধু পড়াশোনায় কৃতী নয়, এরা গান জানে। কেউ ছবি আঁকায় পারদর্শিনী। নাচেও সুদক্ষা কেউ-কেউ। মেয়েরা এ দেশে সর্বগুণান্বিতা হয়। অনেকে ছবিও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কে বলে বাঙালি মেয়েরা সুন্দরী সুলক্ষণা নয়? শকুন্তলা দেবীর দশটা ছেলে থাকলেও কোনো অসুবিধা হতো না দশটি প্রকৃত গুণান্বিতা পাত্রী নির্বাচন করতে।

সেবারে কে না উৎসাহ দেখিয়েছিল! শকুন্তলা দেবী অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। পত্র-লেখকদের মধ্যে হাইকোর্টের জজ, সরকারের সেক্রেটারি, বড় কোম্পানির কর্ণধার, ভাইস-চ্যান্সেলার, ডাক্তার, খ্যাতনামা উকিল, মিলিটারির ব্রিগেডিয়ার পর্যন্ত ছিলেন।

একজন খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ ও প্রখ্যাত ভাস্করও তাঁদের কন্যাদের বিবরণ পাঠিয়েছিলেন। এইসব মানুষ যে কোনোদিন হাওড়ায় আসবার উৎসাহ দেখাবেন তা কল্পনায় ছিল না শকুন্তলা দেবীর। একজন প্রখ্যাত গায়িকাও ছিলেন পাত্রীর তালিকায়। খুব উৎসাহ বোধ করেছিলেন শকুন্তলা—এর গান বেতারে ও টিভিতে বেশ কয়েকবার শুনেছেন শকুন্তলা। এমন মেয়েকে পুত্রবধূ হিসেবে পাওয়ার সম্ভাবনায় গর্ববোধ করেছিলেন তিনি।

চিঠিগুলি পড়ে এবং মেয়েদের বিবরণ জেনে স্বামীকে বলেছিলেন শকুন্তলা, কত গুণের মেয়েকে বাবা-মা কত যত্ন করে মানুষ করেছে দেখো। তবু লোক বলে, বাঙালিরা নাকি পিছিয়ে পড়ছে। একেবারে বাজে কথা।

সোমেশ্বরবাবু কিছু বলেননি। তিনি তাঁর পুত্রের ব্যঙ্গাশ্রয়ী ইংরিজি রচনা পড়েছেন। ভারতীয় মেয়েদের বন্ধনদশা ঘুচিয়ে দিয়ে নতুন এক প্রজন্ম তৈরি হোক। তারপরে যদি ভারতীয় পুরুষগুলো মানুষ হয়। "দেয়ার উইল নেভার বি এ জেনারেশন অফ গ্রেট মেন আনটিল দেয়ার হ্যাজ বিন এ জেনারেশন অফ ফ্রি উইমেন—অফ ফ্রি মাদারস।'

এই সব চিঠি কোনো কাজে লাগেনি। যার জন্যে এই সব আয়োজন সে তো আগেই বিবাহ করেছে ডায়ানা রবার্টসনকে। ভি-পি ডাকে ইন্ডিয়ানরা বিয়ে করে এমন একটা রসিকতা ক্যামপাসে ছড়ানো আছে। যারা ভারতবর্ষকে জানে এ-বিষয়ে তাদের হাসাহাসির অন্ত নেই।

এবারে ঘটকও লাগিয়েছিলেন শকুন্তলা দেবী। চুপি-চুপি বিবাহ বন্ধনের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন শুকুন্তলা দেবী। একটু জোর কম তাঁর, কিন্তু আকর্ষণ কম নয়। হ্যাঁ, ডাইভোর্সি—কিন্তু নিরপরাধ পাত্র। কাগজপত্তর রয়েছে, যে কেউ দেখতে পারে। নির্ঝঞ্ঝাট ডাইভোর্সি—ওই শব্দটার অর্থ যে ছেলেপুলে নেই তা এদেশের সবাই জানে। নিঃসন্তান কথাটা হয়তো আরও যোগ্য, কিন্তু কেউ ব্যবহার করে না। বোধহয় বুঝিয়ে দিতে চায়, পরবর্তী বিবাহে সন্তানসম্ভাবনা সুদূরপরাহত নয়। তা ছাড়া শকুন্তলা দেবীর ছেলের পরীক্ষা পাসের রেকর্ড যে কেউ দেখবে, অবাক হয়ে যাবে। আর চাকরি—সে তো কিছু না বলাই ভালো।

তবু ঘটকরা লাইন লাগাননি শকুন্তলার বাড়িতে। ফোনে বলেছে, ‘‘সুদর্শনা, সুনয়না, সুশিক্ষিতা মেয়ে তো রয়েছে ডজনে-ডজনে। কিন্তু ওই যে খুঁত। খুঁত কেউ চায় না।’’

‘‘অতি সামান্য খুঁত’’ বলতে গিয়েছেন শকুন্তলা দেবী—‘‘তাও মেমসায়েবের সঙ্গে।’’ কিন্তু ঘটকরাও কম যায় না। বলেছে, ‘‘মস্ত দুধের পাত্রে একফোঁটা চোনাই যথেষ্ট, মিসেস মুখার্জি।’’

রাতারাতি কীভাবে পরিস্থিতি পাল্টে যায়। দুঃখ করেছেন শকুন্তলা দেবী। কোথায় লোকে তাঁর পিছনে ছুটবে তা নয়, তাঁকেই লোকের পিছনে ছুটতে হচ্ছে। তবু তেমন আগ্রহ দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। কে যেন বিবাহবিচ্ছেদের ইঙ্গিত দিয়ে বললো, ‘‘কাচের বাসন একবার ভাঙলে আর জোড়ে না।’’

একদম বাজে কথা—ফেভিকল সব কিছু জুড়ে দেয়—শুধু ভাঙা বাসনের সব ক'টা অংশ হাতের গোড়ায় থাকা চাই। তা তো রয়েছে তাঁর ছেলের মধ্যে—অভিজিৎ তো গোটাই রয়েছে। বরং মিষ্টি হয়েছে সে। কিন্তু এ সব তো তর্কের কথা—পছন্দের বাজারে তর্কে কোনো লাভ হয় না।

খুড়তুতো বোন অসীমা একসময়ে দাদার সঙ্গে দেখা করে গেল। অসীমার বিয়ে হয়েছে কোতরঙ্গে। বর ব্যাংকে কাজ করে।

অসীমা এসেছে বাপের বাড়িতে ছুটি কাটাতে। ওদের এখানে আলাদা হাঁড়ি, কিন্তু একই বাড়ি। সোমেশ্বরবাবু ভাইয়ের সঙ্গে স্বেচ্ছায় পার্টিশন করে

নিয়েছেন। কিন্তু সম্পর্ক ভালো। অসীমার ভাই নেই। তাই এই দাদার উপর একটু টানও আছে।

অসীমা দেখলো দাদা চুপচাপ বসে কী যেন ভাবছে। তাকিয়ে আছে জানালা দিয়ে। দৃষ্টি অনেক দূরে চলে গেছে, কিন্তু উপায় নেই। একটু দূরেই একটা তিনতলা বাড়ি উঠে আকাশ আড়াল করে দিয়েছে।

দাদা কি হারিয়ে-যাওয়া বউয়ের কথা ভাবছে? না, আরও আগের সেই চিন্তাহীন জীবনের কথাও যখন এই বাড়িতে থেকে রোজ কলকাতায় সায়েন্স কলেজে পড়তে যেত।

অসীমার মনে আছে দাদা তখন এ-পাড়ার হিরো। সোমেশ্বর মুখার্জির একমাত্র ছেলে। সোমেশ্বর মুখার্জি বার্ন কোম্পানিতে ভালো কাজ করেছেন। অফিসার হয়েছেন সায়েবি আমলে। একটা অস্টিন গাড়ি আছে গ্যারাজে। মাঝে-মাঝে দাদাই চালাত। দাদা বাঙালি মতে ভীষণ সুন্দর। হাইট পৌনে ছ'ফুট—ঝকঝকে, ছিপছিপে চেহারা। দাদার মুখে বুদ্ধির দীপ্তি—চওড়া কপাল, কিন্তু ঘন চুল যেন কপালের অনেকটা জবরদখল করে বসেছে। খুঁত বলতে শুধু চোখের চশমা। কিন্তু দৃষ্টির ক্ষীণতাও যেন চশমার মাধ্যমে সৌন্দর্যবৃদ্ধি করেছে দাদার।

এই দাদার দিকে অসীমার বান্ধবীদের নজর ছিল। তখন বাড়ি পার্টিশন হয়নি। বান্ধবীরা এলে একবার দাদার পড়ার ঘরেও নজর দিয়ে যেতো। দাদা অবশ্য পড়াশোনায় ডুবে থাকতো।

দাদার নাম তখন এ পাড়ায় সবাই জানতো। জানবে না? সেই দেবী খাঁয়ের পর কে আর তেমন হাওড়া থেকে স্কুল ফাইনালে ভালো ফল করেছে? অভিজিৎ পঞ্চম হয়েছিল স্কুল ফাইনালে। হায়ার সেকেন্ডারিতেও কৃতিত্ব ছিল অভিজিতের, যদিও স্থানটা নবমে পৌঁছেছিল। অসীমার বান্ধবী প্রণতি বলেছিল, নবমটাও জাঁদরেল স্থান, না-হলে নবরত্ন এতো বিখ্যাত হবে কেন? নয়ের নিশ্চয় কোনো দাপট আছে।

এই প্রণতিও থাকত রাজবল্লভ সাহা লেনে। বাপ উকিল ছিলেন। তেমন প্র্যাকটিস ছিল না, কিন্তু কম ভাড়ায় অনেকদিন আছেন। শকুন্তলা বলতেন, আইনের মাথা খুব ভালো প্রণতির বাবার, কিন্তু অনেক উকিলের জিভ মোটা থাকে। তারা আদালতে তেমন বলতে-কইতে পারে না।

শকুন্তলার জানবারই কথা, কারণ তাঁর বাবা এই হাওড়া কোর্টেরই ডাকসাইটে উকিল ছিলেন। "আমার বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্যে মক্কেলরা ভোর সাড়ে ছ'টা থেকে বাড়ির সামনে ঘোরাঘুরি করতো এবং চায়ের দোকানে ভাঁড়ে চা খেতো।"

প্রণতি মেয়েটি ছিল শান্ত। বাবার জিভ মোটা হলে কী হয়, প্রণতি সুন্দর আবৃত্তি করতো। নজরুল, রবীন্দ্রনাথের কত কবিতা যে ওর মুখস্থ ছিল। ইস্কুলে প্রাইজও পেয়েছে প্রণতি। প্রণতি খুব ফর্সা নয়, আবার কালোও নয়। ত্বকের অসামান্য শ্রী আমাদের হাওড়ায় তেমন ঘোষিত হয় না। তার কারণ ত্বকের পরিচর্যার যেসব পদ্ধতি দক্ষিণ কলকাতার মেয়েরা বিউটি পার্লারে গিয়ে নিয়মিত ব্যবহার করে তা হাওড়ার মেয়েদের সাধ্যের অতীত। ঘষা-মাজার অভাবে একটু পিছিয়ে থাকা আর কি! কিন্তু লাবণ্য তো শুধু প্রসাধনী কোম্পানির বোতল থেকে আসে না, আসে জন্মগত বৈশিষ্ট্য থেকে।

প্রণতির মা বলতেন, আমার মেয়ের জেল্লা খুলবে কী করে? হেঁটে-হেঁটে কত দূরে ইস্কুলে যেতো ; তারপর এখন কত দূরের কলেজ। গোখেল কি এখানে! কেন যে ওখানে হায়ার সেকেন্ডারি পড়তে গেল! রোদে বৃষ্টিতে হাওড়ার বাসের জন্যে কতক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। রঙ যে একেবারে কালো ভূত হয়ে যায়নি এটাই আশ্চর্য কথা!

শকুন্তলার মা বলতেন, একটা শুধু ভালো কথা। বিয়ের পরে মেয়েদের আসল রঙ আবার ফিরে আসে।

"কিন্তু সে তো বিয়ের পরে দিদি", প্রণতির মা বলেছেন। "বিয়ের আগের রঙ দেখেই তো বিয়ে ঠিক হবে!"

শকুন্তলা বলেছেন, "ছেলের মায়েরা আজকাল অতো বোকা নয়। তারা রঙ দেখে দেখে ভিরমি খায় না। তারা খোঁজে শ্রী। তারা খোঁজে লক্ষ্মীশ্রী। তারা খোঁজে গড়ন-পিঠন, তারা খোঁজে স্বভাব। এদেশে তো মেমসায়েব তৈরি হবে না। আর ফ্যাটফেটে মেমসায়েবরাই যে সুন্দর নয় তা হীরু ডাক্তারের বউকে দেখেই বুঝবে। লাল চুল, সাদা রঙ। স্বাস্থ্য ভালো। কিন্তু কেমন যেন মুখটা—একটুও শ্রী নেই। কী দেখে যে হীরু ডাক্তার বিয়ে করলো। অমন ভালো ছেলে, ঘর ভালো-করা বাঙালি বউ আনতে পারতো।"

প্রণতির মা বলেছিলেন, "শুনেছি ওরা তুক করে—একবার কারও দিকে এইসব মেয়ের নজর পড়লে আর উপায় নেই। ওষুধের গুণে বনের সিংহ পর্যন্ত বশ হয়ে যাবে।"

তখন হাসাহাসি হয়েছিল। কিছুটা অনুসন্ধানও। ওষুধটা কী? কেউ বললো, গাছের শিকড় চুলে বেঁধে রেখে দেয়। কেউ বললো, শিকড় নয়, চোখের সুরমা। কেউ বললো, সুগন্ধ। একটা বোতল থেকে নিজের শরীরে ফ্যাঁশ-ফ্যাঁশ করে ছড়িয়ে দেয় প্রিয় লোকটির কাছে যাবার আগে, তারপর ওষুধ ধরে যায়—ওই গন্ধের জন্য মন আকুল হয়ে ওঠে। বিয়ের পরেও ওই ওষুধ ছড়িয়ে যায় মেমরা।

এই প্রণতির গান শুনেছে দাদা নিজের বাড়িতে বসেই। অসীমার ঘরে বসে হারমোনিয়াম নিয়ে গান গাইছে প্রণতি। দাদা কখন পড়া ছেড়ে উঠে এসেছে। দাদাকে আবিষ্কার করে অন্য মানে করলো প্রণতি।

গান আচমকা বন্ধ হয়ে গেল। দাদা ততক্ষণে ফিরে এসেছে নিজের ঘরে। একটু পরে অসীমা ভয়ে-ভয়ে ঢুকেছে দাদার ঘরে। "তোমার পড়ার অসুবিধে হচ্ছিল? প্রণতি আমার কথাতেই গান শোনাচ্ছিল। আমাদের খেয়াল ছিল না, তোমার পরীক্ষা সামনে।"

দাদা বলেছিল, "সেকি! রাগ করবো কেন? গানে কখনও পড়া খারাপ হয়?" দাদা এরপর প্রণতির গানের প্রশংসা করেছে। "কে মেয়েটা? বেশ ভালো গায়। কোথায় শিখলো?" অসীমা জানিয়ে দিয়েছে, "ভবশঙ্করবাবুর মেয়ে। গান শেখে গণেশ দাসের কাছে। ওদের গ্রুপেও গাইতে যায়।"

তারপর কত কী হয়ে গেল, অভিজিতের কি সেসব মনে আছে? গানটা অভিজিৎ পছন্দ করত। পড়ার সময়ে রেডিও অথবা টেপ রেকর্ডার চালিয়ে দেবার অভ্যাস হলো। গান না থাকলে মনঃসংযোগ হয় না অভিজিতের।

অনেকের খোঁজখবর নিচ্ছে অভিজিৎ। তার ফেলে আসা জগতের কে এখন কোথায়? কী করছে তারা?

এইসব খবর সাপ্লাই করছে অসীমা ও শকুন্তলা। ভবতারণ নাপিত লটারি পেয়েছে লাখ টাকার। তাছাড়া প্রায় সবই খারাপ খবর। কারও তেমন ভালো হয়নি। তবু অভিজিৎ অবাক হয়ে যায়। কোথাও কোনো তিক্ততা নেই। কারও বিরুদ্ধে কারও কোনো অভিযোগ নেই। এই জন্যেই বোধহয় মানুষকে অমৃতের সন্তান বলা হয়েছে, অভিজিতের মনে হলো।

এরপর অন্য কাজে বেরিয়ে পড়েছে অভিজিৎ। সুপ্রভা রায় বিদেশেই কাজটা এগিয়ে দিয়েছে। সেখান থেকেই 'পাত্রী চাই' কলমে বিজ্ঞাপন পাঠিয়েছিল সুপ্রভা। এই বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে খুবই বিশ্বাস তার। এইখানেই ডঃ নীতিশ রায়ের একটা বিজ্ঞাপন থেকে সুপ্রভার অন্ধকার জীবনে আলো এসেছে।

বক্স নম্বরে বিজ্ঞাপন দেয়নি সুপ্রভা। অভিজিতের জন্যে বিজ্ঞাপনে নিজের ও নীতিশের নাম ঠিকানা ব্যবহার করেছে। এতে ফল ভালো হয়। লোকে ভরসা পায়। বক্স নম্বরকে এখনও সবাই পুরো বিশ্বাস করে উঠতে পারে না।

বিজ্ঞাপনটা সুপ্রভা লিখেছিল ভালো করে। এই ধরনের বিজ্ঞাপন রচনা করতে দেখেছে তার মাকে সুপ্রভার জন্য। শেষে ইঙ্গিত ছিল 'পাত্রীও লিখিতে পারেন নির্ভয়ে'। এই নির্ভয়ে কথাটাও যে প্রয়োজনীয় তাও জানে সুপ্রভা।

মাত্র একটি ক্ষেত্রে সুপ্রভা নিজেই উত্তর দিয়েছিল। সেইখানেই ফললাভ। ডঃ নীতিশ রায় পরে স্বীকার করেছেন, সুপ্রভার নিজের হাতে লেখা চমৎকার চিঠিটাই মনস্থির করতে সাহায্য করেছিল। ওর মধ্যে কী এক বিশেষ সুরের সন্ধান পেয়েছিলেন নীতিশ রায়।

এবারেও চারটি চিঠি নির্বাচন করে পাঠিয়ে দিয়েছে সুপ্রভা। কাজ পাকা। কারণ প্রত্যেককে স্বহস্তে উত্তর দিয়েছে সুপ্রভা। পাঠিয়েছে পাত্রের পূর্ণ বিবরণ। নিজেকে পাত্রের স্থানীয় বউদি বলে পরিচয় দিয়েছে। আর সেই সঙ্গে জানিয়েছে পাত্র অমুক দিনে কলকাতায় থাকবেন। এবং সেই সময় দেখাসাক্ষাৎ হবে।

চারটে চিঠির তিনটি লিখেছে পাত্রীরা স্বয়ং। এবং একটি পাত্রীর ছোটবোন। এঁদের দূত মারফৎ খবর পাঠানো হলো।

এবার আর বাড়ি গিয়ে আসরে বসে দেখা নয়। পার্ক স্ট্রিটের কোয়ালিটিই এ ব্যাপারে আদর্শ স্থল। পাত্রীর পক্ষে চেনা শক্ত হওয়ার কথা নয়। পাত্রের হাতে রবীন্দ্র রচনাবলীর একটা খণ্ড থাকবে।

রবীন্দ্র রচনাবলী হাতেই দাঁড়িয়ে ছিল অভিজিৎ, কোয়ালিটির দরজার কাছে। প্রথমে ভেবেছিল খবরের কাগজ হাতে রাখবে—কিন্তু যা আজকাল কাগজের সার্কুলেশন। হয়তো দশটা লোককে দেখা যাবে কাগজ হাতে চলেছে। রবীন্দ্র রচনাবলীটা কলেজের একটা গল্পে নিজেই লিখেছিল অভিজিৎ। তখন ছোটগল্প লিখবার সখ ছিল। কতদিন আগেকার সব কথা।

দুই মহিলাকে দেখা যাচ্ছে বটে। চারদিকে সাবধানে তাকাচ্ছে ওরা। কোয়ালিটির সামনে আলো কিছুটা কম। কার হাতে কি বই আছে তা খুঁজে বার করা অসম্ভব হতো।

রবীন্দ্র রচনাবলীটা আরও একটু খেলিয়ে ধরলো অভিজিৎ। ওরা এগিয়ে এলো। "আমিই অভিজিৎ মুখার্জি।"

ওরা একটু ভয়ে-ভয়ে রয়েছে। ওদের দু'জনকে নিয়ে একটা টেবিলে গিয়ে বসল অভিজিৎ। একটি মেয়ে সপ্রতিভ। সে বললো, "এর নাম মাধুরী মজুমদার। আমি পাত্রীর ননদ—নন্দিতা সান্যাল।"

চা ও কিছু খাবার অর্ডার দিয়েছে অভিজিৎ। মাধুরী মজুমদারকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছে অভিজিৎ। নন্দিতা সান্যাল বলে চলেছে—"মাধুরী বি.এ পর্যন্ত পড়েছে। পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। তার আগেই দাদার সঙ্গে বিয়ে। পরীক্ষা দিলে নিশ্চয় পাস করত।"

মাধুরী মেয়েটির টিপিক্যাল বাঙালি চেহারা। শরীরটা একটু ভারীর

দিকে—স্তনভারে যেন সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে। রঙ চাপা—কিন্তু এখানে আসবার সময় যেন প্রচুর চুনকাম করা হয়েছে। পাউডার, ক্রিম একটু বেশিই প্রয়োগ হয়ে গিয়েছে।

নন্দিতা বলছে, "হাইট ১৬৫ সেমি। ওজন ৬২ কিলোগ্রাম। ওর মাথার চুল অনেক। গান জানে, সেলাই জানে, রান্না জানে। সংসার সুখের করতে হলে যা-যা প্রয়োজন তা সবই জানে। বুঝতেই পারছেন, এসব গুণ না থাকলে আমরা নির্বাচন করতাম না।"

"কাগজপত্তর", প্রসঙ্গটা তুলতেই হলো অভিজিৎকে। প্রসঙ্গটা তুলবার জন্যে নিজের কথাই বলতে লাগলো অভিজিৎ। "আমার ডাইভোর্স পেপারের জেরক্স রয়েছে। দরকার হলে নিয়ে যেতে পারেন। আমার বিয়ে হয়েছিল একজন মার্কিনি মহিলার সঙ্গে। তিনি ডাইভোর্স চাইলেন।"

নন্দিতা বললো, "আমি গল্পে পড়েছি, বউ ডাইভোর্স চাইলে দিতেই হয়।"

মাধুরী বলছে, "বাঃ রে! ছেলের হাতের মোয়া নাকি?"

অভিজিৎ বললো, "ডাইভোর্স লড়া যায়, কিন্তু ভীষণ খরচ। আমেরিকায় উকিলরা মিনিট হিসেবে চার্জ করে। অত টাকা নষ্ট করা আমার পক্ষে..."

"কী করে সম্ভব হবে!" নন্দিতা বুঝে ফেলেছে অভিজিৎকে। "ডলার তো আর খোলামকুচি নয়।"

এ পক্ষের কাগজপত্রের। নন্দিতা বললো, "আমাদের তো কোর্টের ব্যাপার ছিল না, স্রেফ একখানা কাগজ। স্বামীর ডেথ সার্টিফিকেটখানা আমরাও জেরক্স করিয়ে এনেছি। রাখতে পারেন। দাদা মারা গেলেন—ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে। বিয়ের পরেই অফিসে যেতে গিয়ে। দাদা ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতেন হাওড়া টু ব্যান্ডেল। ওখানেই মস্ত এক রবার কারখানায় কাজ করতেন। ভালো চাকরি ছিল দাদার।"

পিওর, সিম্পল, দুর্ঘটনা। ভবিতব্যকে কে আটকাবে? ননদের বক্তব্য।

চায়ের প্রথম পর্ব শেষ হতে চলেছে। অভিজিৎ বলছে আমেরিকার গল্প। মেমসায়েবরা রূপে গুণে সব সময় এদেশ থেকে সেরা নয়। ওদেশে সুখ আছে, কিন্তু শ্রমও আছে যথেষ্ট। শ্রম ছাড়া সুখে থাকা যায় না ওদেশে। স্রেফ কথার কথা। কিছু একটা কথা তো বলতে হবে। মাধুরী মজুমদার এখনও তেমন সপ্রতিভ হয়ে ওঠেনি।

এবার ননদিনী এক ছুতোয় উঠে পড়লো। "আমি আসছি। আপনারা কথা বলুন।" ওয়াশ রুমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মাধুরী মজুমদারের ননদিনী।

এবার অভিজিতের দিকে ভালোভাবে তাকাচ্ছে মাধুরী। খুঁটিয়ে দেখছে মানুষটাকে। এইভাবে দেখা উচিত, যত ইচ্ছে দেখা উচিত কাউকে বিয়ে করার

আগে। কিন্তু এখানে কেউ দেখে না। ফলে বিপদ হয়। আগেও বিপদ হতো, কিন্তু মানুষ মেনে নিতো। এখন কেউ মেনে নিতে চায় না।

মাধুরীকে জিজ্ঞেস করবে ভাবলো, আমাকে আপনার পছন্দ? কিন্তু পারলো না অভিজিৎ। এদেশের মেয়েদের সব প্রশ্ন করা যায় না যা ওদেশে করা যায়। এদেশের মেয়েদের সম্বন্ধে নতুন এক সম্ভ্রমবোধ জেগে উঠেছে তার বুকে।

প্রশ্নটা মাধুরীই করল, "খরচ বাঁচাবার জন্যে আপনি ওই মেয়েটিকে বাঁচালেন না।"

"না, ঠিক তা নয়," অস্বস্তি বোধ করছে অভিজিৎ। "মামলা জিতেও কিছু হতো না। ডায়ানা আমার কাছে থাকত না।"

"দোষটা কার?" মাধুরী জানতে চাইছে।

"ডায়ানা আর একজন পুরুষকে পছন্দ করে বসে আছে, আমি আপনার কাছে চেপে রাখবো না, যদিও কোর্টের কাগজপত্তরে ওসবের উল্লেখ নেই। ওদেশে বছরে এগারো-বারো লাখ ডাইভোর্স হচ্ছে, কিন্তু কোথাও আর একটা প্রেমের উল্লেখ পাবেন না।" একটু থামলো অভিজিৎ। "দোষটা পুরোপুরি ওকেই দেবো কেন? নিশ্চয় আমার কাছ থেকে কিছু একটা পায়নি, কোথাও একটা দোষ অথবা ভুল হয়ে গিয়েছে। দু'পক্ষই তো বেঁচে রয়েছে। ব্যাপারটা আপনার হাতের ওই ডেথ সার্টিফিকেটের মতন সোজা নয়।"

এবার মাধুরী নড়েচড়ে বসলো। সে সোজাসুজি জানিয়ে দিলো, "ডেথ সার্টিফিকেটও সব বলে না। প্রণব মজুমদার দুর্ঘটনায় নিহত হয়নি। ওটা আত্মহত্যা—ফুলশয্যার তৃতীয় দিনে। লোককে বুঝতে দেওয়া হয়নি—প্রণব মজুমদার কোনো সুইসাইড নোট রেখে যায়নি। কিন্তু আমি জানতাম সে ভীষণ অসুখী।"

হাঁপাচ্ছে মাধুরী। "আপনি খোলখুলি বললেন, আমিও খোলাখুলি বললাম। এখন আমার শাশুড়ি ও ননদ আমার বিয়ে দিতে চাইছেন। আমি চাইছি না। ওঁরা জোর করছেন। আমাকে ভালোবাসে বলে নয়। আমার ঘরটা ওঁদের দরকার বলে। ঘরের খুব অভাব, বুঝতে পারছেন। ছেলে যখন নেই তখন ঘরটা শুধু-শুধু কেন আটকে থাকে?"

অভিজিৎ হঠাৎ আবিষ্কার করলো, মাধুরী চা ছাড়া কিছুই খায়নি। সে জিজ্ঞেস করলো, "কী হলো, খেলেন না?"

মাধুরী বললো, "ওতে চিকেন আছে ; ফুলশয্যার পরের দিন থেকে আমি তো মাছ মাংস খাই না।"

মাধুরী কী ভেবে বললো, "আমার উচিত ছিল আমার স্বামীকে ডাইভোর্স করা। দুঃখের বিষয়, মরা মানুষকে ডাইভোর্স করা যায় না।"

দূর থেকে ননদিনীকে দেখা যাচ্ছে। টয়লেট থেকে বেরিয়ে খুব আস্তে-আস্তে সে এই দিকেই এগিয়ে আসছে।

মাধুরী চাপা গলায় বললো, "আপনি বলে দেবেন, আমাকে আপনার পছন্দ হয়নি। ফুলশয্যার রাতে আমাকে আমার স্বামীর কেন পছন্দ হলো না তা না-জেনে আমি আর কিছুতেই বিয়ে করবো না—ওদের যতই ঘরের দরকার থাকুক।"

ঘড়িতে এখন তিনটে। কোয়ালিটি রেস্তোরাঁর দরজার সামনে আবার ফিরে এসেছে অভিজিৎ মুখার্জি। হাতে এবারেও সেই রবীন্দ্র রচনাবলী।

এই মুহূর্তে যার জন্যে অভিজিৎ অপেক্ষা করছে তার নাম মালিনী চ্যাটার্জি। বাইরে অসময়ে বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

তিনটে বেজে পাঁচ মিনিটের সময় পার্ক প্লাজার দিক থেকে দুই তরুণী জলে ভিজতে-ভিজতে কোয়ালিটির দরজার কাছে হাজির হলো। একজন কম ভিজেছে তার কারণ পলিয়েস্টারের শাড়ি, ওতে জল ধরে না, পিছলে পড়ে যায়। আর একজন কটন প্রিন্ট পরেছে। সেই ভিজেছে বেশি—শরীরের প্রোফাইলটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যেমন একসময়ে দেখা যেতো হেমেন মজুমদার অথবা মিস্টার টমাসের সিক্তবসনা সুন্দরীদের ছবিতে।

সে যুগে গুরুস্তনীদের জন্যে ছিল সকল রসিকের জয়ধ্বনি, এখন যুগ পাল্টেছে। পশ্চিমিরা পুরুষের আকর্ষণ কেন্দ্রকে ঊর্ধ্বাঙ্গ থেকে সরিয়ে রমণীনিতম্বে ফোকাস করেছে। এদেশেও সে খবর পৌঁছে গিয়েছে, সন্দেহ করছে অভিজিৎ। রমণী-শরীর সম্বন্ধে হাহাকার এখনও বুকের মধ্যে রয়ে গিয়েছে, অভিজিৎ অস্বীকার করবে না। প্রাক্ বিবাহ পর্বে বিদেশে নারী-শরীরের স্থাপত্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আহরণ করেছে আলেখ্য দর্শনে এবং যৎসামান্য ডেটিং-এ।

মালিনী তার ননদিনীকে নিয়ে আসেনি। সে কথা আসতে পারতো সহজেই। কিন্তু বাঙালি মেয়েদের পুরুষভয় কাটতে চায় না। সে সঙ্গে এনেছে বান্ধবী কুমুদিনী বিশ্বনাথনকে। কুমুদিনী বাঙালি, বিয়ে করেছে দক্ষিণীকে। মালিনী ও কুমুদিনী দু'জনেই এক অফিসে কাজ করে। সে অফিস এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়।

কুমুদিনী অনেক ফ্র্যাংক। টেবিলে বসেই বললো, "বয়সের তুলনায় আপনি অনেক ইয়ং, মিস্টার মুখার্জি। আপনি বয়সে ভেজাল দেননি।"

মানে? একটু অবাক হচ্ছে অভিজিৎ।

"এখানে সব জিনিসের সঙ্গে বয়সেও ভেজাল। আমার স্বামীর অনেক আত্মীয়ের বয়স শুরু হয় মাইনাস এইট থেকে। আমাদের অফিসেও ভাইস-প্রেসিডেন্টদের দেখুন। কে বলবে এদের এখনও ফিফটি-ফাইভ হতে

দেরি আছে? আমি মালিনীকে বলেছিলাম, মেক আপ ইওর মাইন্ড। হয়তো গিয়ে দেখবে একজন এলডারলি ভদ্রলোক। তখন ভালো লাগবে কিনা।"

"আমি উইডোয়ার নই, ডাইভোর্সি।" পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বয়সটা পুরুষদের পক্ষে বিপজ্জনক—ওই সময় স্ত্রী বিয়োগ হলে ত্রিশঙ্কু অবস্থা—ন যযৌ ন তস্থৌ।

কুমুদিনীর সেই অবস্থা। স্বামী বিশ্বনাথনের বয়স আটচল্লিশ। কিন্তু কুমুদিনীর কোনো দুঃখ নেই। "আমাকে কে বিয়ে করতো বলুন তো? আমার অ্যাজমা আছে। আমার স্বামী চার্টাড এবং কস্ট দুই-ই। একটা ডিভিশনের ডেপুটি জি এম। এখন আমি জানি ওই আটচল্লিশটাও ঠিক নয়, ভালোভাবে অডিট করলে ওটা ফিফটি ওয়ান হবে। কিন্তু আমার তাতে কিছু এসে যায় না। আমার স্বামীকে বলে দিয়েছি, আমরা বাঙালিরা সেই ছোটবেলা থেকে বলে আসছি যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন।"

মালিনীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো কুমুদিনী বিশ্বনাথন। বললো, "অসাধারণ মনোবলের মেয়ে। নিজের স্বামীর সঙ্গে দুর্ভাগ্যের পর আলাদা হয়ে কেঁদে সময় নষ্ট না-করে নিজেই চটপট টাইপ শিখে নিয়েছে। শুধু ম্যানুয়াল নয়, ইলেকট্রনিক মেশিনেও কাজ শিখে নিয়েছে। এবার ওয়ার্ড প্রসেসরও শিখে নেবে। আমাদের অফিসে এখন লিভ ভেকান্সিতে আছে। কিন্তু মেয়েরা প্রায়ই ছুটিতে যায়, সুতরাং কাজের অসুবিধে নেই।"

মালিনী একটা হালকা নমস্কার করে চুপচাপ বসে আছে। ভিজে শরীরটা এখনও সামলে উঠতে পারেনি।

অভিজিৎ বললো, "আমার প্রায় সব খবরই চিঠিতে পেয়েছেন। আমি এখন মিড্ ওয়েস্টে কাজ করছি। আসবার আগে আমার পদোন্নতি হয়েছে। আমি এখন ড্র করছি দশ হাজার ডলার।"

"সেটা ইন্ডিয়ান রুপিতে কত, মিস্টার মজুমদার?" বিশ্বনাথন জানতে চাইছেন।

"এবাউট এক লাখ পঁচাত্তর হাজারের মতন।"

"বছরে তো?"

"না, না, মাসে। বছরে ও-মাইনেতে আপনি জ্যানিটরও পাবেন না।"

"কী বলছেন, মিস্টার মুখার্জি! আমার অফিসের বস তো সাড়ে-সাত হাজার টাকা ড্র করেন মাসে।"

ওইভাবে কেউ সারাক্ষণ ডলারকে গড়ে-সতেরো বা আঠারো দিয়ে গুণ করে না। করে কোনো লাভ নেই। শিকাগোতে পাঁচ হাজার ডলার ভাড়া দিয়েও একটা ভালো অ্যাপার্টমেন্ট-ভাড়া নাও পেতে পারেন।

"বড় গাড়ি?"

"ওটা এখানকার রবারের স্লিপারের মতন—গাড়িটা কোনো ব্যাপারই নয়। ভিখিরি থেকে আরম্ভ করে পকেটমার পর্যন্ত গাড়ি ব্যবহার করতে অভ্যস্ত।"

ডাইভোর্সের কাগজপত্তর বার করল অভিজিৎ। "সব খবরাখবর পাবেন এখানে। কবে আমাদের মনোমালিন্য হলো, সেদিন আমার স্থাবর অস্থাবর কী ছিল, কবে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে এলাম।"

"আপনাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলো?" ওদের কণ্ঠে বিস্ময়।

"ইয়েস। ব্যাপারটা চেপে রেখে আপনাদের বিভ্রান্ত করবো না। তারপর ডাইভোর্স হয়েছে। আমরা ইন্ডিয়ায় যেতে অন্য স্টেটে চলে গিয়েছিলাম। ওখানে ডাইভোর্সের খরচ কম। সময়ও কম লাগে। আমার বউকে নিয়ে যাবার খরচাও আমাকে দিতে হয়েছিল। সে আবার একা যায়নি। তার নতুন বন্ধুকে নিয়ে গিয়েছিল আমার খরচে। হোটেলে আমার পাশের ঘরে ডাইভোর্সের আগেই ডবল বেড শেয়ার করেছিল।"

"সে কি! আপনি আপত্তি করেননি?"

"আপত্তি করলেই খরচ। দু'জনকে দুটো আলাদা ঘর বুক করে দিতে হতো আমার টাকায়। তারপর রাত্রে কে কোথায় চলে আসতো তা তো আমার উপর নির্ভর করে না ওদেশে।"

"একটি ডাইনিকে বিয়ে করেছিলেন তা হলে আপনি," মিসেস বিশ্বনাথন বলছে।

চুপ করে রইলো অভিজিৎ। "সেটা বলা বোধহয় ঠিক হবে না। এমনিই তো হয়ে থাকে ওদেশে। কেউ তো এই কারণে কাউকে ডাইনি বলে না।"

"আপনার টাকা দেখেই তা হলে বিয়ে করেছিল ওই মেমসায়েব।"

তাও তো বলতে পারছে না অভিজিৎ। "আমরা যখন প্রথম মিট করেছিলাম, তখন আমার ভালো চাকরি ছিল না, মিসেস বিশ্বনাথন। আমি তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমার প্রথম চাকরির খবরটা ডায়ানাই এনেছিল।"

"তা হলে?"

"ওই ওদের স্বভাব। যখন ভালোবাসে ভীষণ ভালোবাসে। যখন ভালোবাসা শুকিয়ে যায় তখন ওরা নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে।"

"তা হলে?"

মামলার কাগজগুলো মালিনী হাতে নিলো, কিন্তু দেখলো না।

মালিনীর কাগজ?

"আমাদের দিক থেকে কোনো কাগজই নেই, মিস্টার মুখার্জি। আমরা

বলছি, মালিনী ডাইভোর্সি, স্বামীর সঙ্গে সহবাস করেছে, কপালে সিঁদুর পরেছে। কিন্তু উকিল তা বলছে না।”

মালিনী তখনও ভিজে কাপড়ে পাথর হয়ে বসে আছে। মাথা নিচু হয়ে রয়েছে। যা জানা গেল, ব্যাপারটা এই রকম।

মালিনীর বিয়ে হয়েছিল সম্বন্ধ করেই যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে। সম্বন্ধটাও ঘটকের মাধ্যমেই হয়েছিল। কিন্তু দোষটা তারও নয়। সে ব্যাপারটা জানবে কী করে? যদি একলক্ষ খবর চেপে রাখে তা হলে ঘটক কী করবে?

বিয়ে হলো। বউ শ্বশুরবাড়ি গেলো। ফুলশয্যা হলো। আরও এক সপ্তাহ সহবাস হলো। তারপর দীঘায় হনিমুনে যাবার জন্যে বেরিয়েছে। সমুদ্রতীরে দু'জনে বসে আছে। সেই সময়ে হৈ-চৈ করে ওরা এলো। কলকাতা থেকে ওদের মেয়ে নিয়ে তারাও দীঘার একই হোটেলে উঠেছে। তারপর সে এক কাণ্ড। জানা গেল যজ্ঞেশ্বর আগেই বিয়ে করেছিল, লুকিয়ে। মেয়ের নাম ফুল্লরা।

ওরা জোর করে যজ্ঞেশ্বরকে ধার নিয়ে গিয়ে ফুল্লরার ঘরে ঢুকিয়ে দিল। মালিনী একলা পড়ে রইলো একই হোটেলে হনিমুন সুইটে। বাধা দিলে খুন হতো যজ্ঞেশ্বর।

পরের দিন বাসে একলা কাঁদতে কাঁদতে কলকাতায় ফিরে এসেছে মালিনী। খোঁজখবর হয়েছে। ফুল্লরার সঙ্গে বিয়েটা মিথ্যে নয়—রেজিস্ট্রি অফিসের সার্টিফিকেট রয়েছে।

ডাইভোর্সের কথা উঠেছিল। কিন্তু আলিপুরের উকিল হরিনারায়ণবাবু মতামত দিলেন, কোনো হাঙ্গামায় যাবার দরকার নেই। বিয়ে হলে তবে তো ডাইভোর্স। হিন্দু আইনে একটার বেশি দুটো বিয়ে হয় না। একটা বিয়ে থাকতে আর একটা বিয়ে সম্ভব নয়।

মিসেস কুমুদিনী বিশ্বনাথন বললেন, “দরকার হলে যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে ফুল্লরার বিয়ের সার্টিফায়েড কপি দিয়ে দেবে মালিনী। আসলে যে ভাগ্যবানটি মালিনীকে বিয়ে করবে সে ডাইভোর্স বিয়ে করছে না, আইনত একজন কুমারীকে বিয়ে করছে।”

কুমুদিনী বিশ্বনাথন এবার উঠে পড়ল। সেও মেয়েদের পাউডার রুমে যাচ্ছে কিছুক্ষণের জন্যে।

মালিনী এবং অভিজিৎ এবার মুখোমুখি হলো। “বিয়েতে ঠকেছি বলার থেকে বিয়ে হয়ে ভেঙে গিয়েছে বলা ভালো”, মালিনী শান্তভাবে নিজের অবস্থা ব্যাখ্যা করলো। “আমার দাদা বিয়ের আগে খোঁজখবর করলো না। ঘটকের কথা ধ্রুবজ্ঞান করলো।”

মালিনী জানতে চাইছে অভিজিতের খবর। ''আপনি তো পুরুষ মানুষ। বিয়ের আগে খোঁজখবর করেননি?''

চুপ করে আছে অভিজিৎ। বিয়ের আগে সে অনেক মেলামিশি করেছে ডায়ানার সঙ্গে। ''ওকে আপনি কতটুকু জানতেন?'' মালিনী জানতে চাইছে।

অভিজিৎ মিথ্যাচার করবে না। অভিজিৎ বলেই ফেললো, ''আমাদের কিছু জানতে বাকি ছিল না। পরস্পরের শরীরকে পর্যন্ত ভালোভাবে জেনে নিয়েছিলাম। টানা এক সপ্তাহ আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি বিয়ের আগে। তবু বুঝলাম, শরীরটাকে জানলেই মানুষটাকে জানা যায় না। মানুষের চরিত্রে কোনো ধারাবাহিকতা নেই, 'কনসিসটেনসি' নেই।''

মালিনীর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ''আমি না জেনে যে অবস্থায় আপনি জেনেও সেই অবস্থায়। আমার ভীষণ ভয় করছে, মিস্টার মুখার্জি। বিয়ে করা আমার পক্ষে ঠিক হবে না।''

অভিজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে মালিনী বললো, ''আমার এতোদিন ঠিক খেয়াল হয়নি। আজ মনে হচ্ছে, আমি ডাইভোর্সড উয়োম্যান নই, তার থেকে অনেক খারাপ অবস্থা আমার, আমি রেপড উয়োম্যান। আপনি একবার ঠকেছেন, জানাশোনার পরেও আবার কেন ঠকবেন আপনি?''

মালিনীর অনুরোধেই অভিজিৎ বিদায়ের সময় মিসেস বিশ্বনাথনকে বললো, ''আমি আরও মেয়ে দেখবো। তারপরে কর্মস্থলে ফিরে যাব। আরও ভাববো। তার আগে কিছু এগোবো না।''

এখন পাঁচটা দশ। রবীন্দ্র রচনাবলী হাতে অভিজিৎ আবার দাঁড়িয়ে আছে কোয়ালিটি রেস্তোরাঁর গেটের সামনে। ঘড়ির দিকে তাকালো অভিজিৎ। তার জানা আছে, এই পর্বের নায়িকার আসতে একটু দেরি হতে পারে। পাঁচটায় অফিস ছুটি, তারপর গণেশ অ্যাভিন্যু থেকে পার্ক স্ট্রিট আসা।

কলকাতার পথঘাটে যা ভিড়। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে আদৌ এখানে দেখাসাক্ষাৎ হয় এটাই আশ্চর্য। কিন্তু এখন অভিজিতের বিরক্তিবোধ নেই। দেখাসাক্ষাৎ না-হয়েও মানুষের জন্যে মানুষের এতো টান কী করে থেকে যায় তা অভিজিতের চিন্তার বাইরে। মানুষের মনে বিশেষ এক ভালোবাসা রয়েছে, না হলে এই টান সম্ভব নয়।

পাঁচটা পনরোর সময় একটি মেয়েকে দেখা গেলো। অভিজিতের হাতের রবীন্দ্র রচনাবলীর দিকে সে নজর দিচ্ছে। কিন্তু মেয়েটির সিঁথিতে সিঁদুর। সীমন্তিনীর সঙ্গে সম্পর্ক এদেশে যে আইনগত বিপদ ডেকে আনতে পারে

তা অভিজিতের অজানা নয়। ডাকে একখানা অদ্ভুত চিঠিও এসেছিল। কলকাতার একটি মেয়ে এখনও আইনের স্বাধীনতা পায়নি। সে লিখেছিল, "আমার স্বামীর সহিত ডাইভোর্স মামলা চলিতেছে। কয়েক মাসের মধ্যেই কাজ সমাধা হইবে।"

মেয়েটি অস্থির হয়ে ইতিমধ্যেই স্বামীর সন্ধানে তৎপর হয়েছে। ওখানে কোনো উত্তর দেওয়া হয়নি। নীতিশ রায় বারণ করেছিলেন। আইনের নানা জটিলতা আছে ভারতবর্ষে—অসাবধান হলেই বিপদ।

সীমন্তিনী এবার অভিজিতের কাছে এগিয়ে এলো। "আপনি অভিজিৎ মুখার্জি?"

"আপনার লোক চিনতে ভুল হয়নি।"

"আমি একটু আগে এসে গেলাম। সাধনা রায়চৌধুরী আমার দিদি। আমাদের বড়দি। দিদির আসতে আরও দেরি হবে, পথ অবরোধ চলছে এসপ্ল্যানেডে।"

"কারা পথ অবরোধ করলো?" অভিজিৎ জানতে চায়।

দলের নাম জানে না মেয়েটি। শত-শত দল আছে কলকাতায়। তাদের আবার সংখ্যাহীন উপদল আছে। যার যখন ইচ্ছে হয় তখন কলকাতায় পথ অবরোধ করে। কী তাদের দাবি, পথ রোধ করে কীভাবে সে দাবি ফলপ্রসূ হবে, এসব প্রশ্ন করা হয় না। কলকাতায় থাকতে হলে এখন সব মেনে নিতে হয়। অবরোধ, অবস্থান, মিছিল ইত্যাদিতে শুধু সাধারণ মানুষের ভোগান্তি হয়, বাস পাওয়া যায় না, ট্রেন ফেল হয়, বাড়িতে দুশ্চিন্তা। কলকাতার পথঘাটে বেরিয়ে শেষ পর্যন্ত বহাল তবিয়তে বাড়ি ফিরতে হলে খুব ভালো স্বাস্থ্যের প্রয়োজন। স্বাস্থ্য না-থাকলে খুব মুশকিল বেঁচে থাকা। কিন্তু যারা পথ অবরোধ করে, বিক্ষোভ দেখায়, মিছিলে নেতৃত্ব দেয় তারা এসব বুঝতে চায় না। কেন তারা কান দেবে? সব বুঝে চলতে হলে, আওয়াজই তোলা যাবে না। দুনিয়ার নয়া জমানা তো মিছিল এবং অবরোধ থেকেই আসবে।

অভিজিৎ বললো, "চলুন, বসা যাক। আপনার দিদি আপনাকে নিশ্চয় চিনবে। আমার হাতের রবীন্দ্র রচনাবলীর প্রয়োজন হবে না।"

সাধনা রায়চৌধুরীর বোনের নাম ইন্দিরা। সে বললো, "আমার বাবা খুব ইন্দিরা গান্ধীর ভক্ত ছিলেন। বলতেন, ভারতবর্ষের হিসট্রিতে গ্রেটেস্ট উয়োম্যান। মেয়েদের যেমন হওয়া উচিত ঠিক তেমন।"

না, সাধনা রায়চৌধুরীও খালি হাতে আসবেন। তার হাতে কোনো আদালতী কাগজপত্র থাকবে না। বৈধব্য, ডাইভোর্স কোনো কিছুই স্পর্শ করতে পারেনি নবীন রায়চৌধুরীর মেয়ে সাধনাকে। কারণ অতি সহজ—সাধনার

বিয়েই হয়নি। কুমারী সাধনার সামনে এখন কেবল চিরকুমারী হবার আশঙ্কা।

ইন্দিরার কাছে সব খবর পাওয়া গেল। কারণ চিঠিতে লেখা ছিল : পাত্রী শিক্ষিতা, সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্মনিপুণা, অতীব কোমলস্বভাবা ও সঙ্গীত অনুরাগিণী। উচ্চতা ১৬২ সেমি, দীঘল গঠন, মাধুর্যমণ্ডিতা এবং ফর্সা। ঐতিহ্যমণ্ডিত পরিবার। ব্যক্তিগত কারণে এতোদিন বিবাহ সম্ভব হয়নি, কিন্তু সম্পূর্ণ গ্লানিমুক্ত।

ইন্দিরা জানালো, "চিঠিটা আমিই লিখেছি, বিজ্ঞাপনটা আমিই দেখেছিলাম। ওদেশে সমানে-সমানে বিয়ে হয়। সুতরাং পাত্রের পঁয়ত্রিশ ও দিদির পঁয়ত্রিশ কিছু এসে যাবে না।"

হ্যাঁ, নবীন রায়চৌধুরীর পরিবার ঐতিহ্যমণ্ডিত, গর্বের সঙ্গেই জানালো ইন্দিরা। "যশোরের রতন রায়চৌধুরীর বংশ। সেই রতনবাবু যিনি মায়ের গঙ্গাস্নানের সুবিধের জন্যে যশোর থেকে কলকাতা পর্যন্ত যশোর রোডে গাছ লাগিয়েছিলেন। নবীনের বাবা প্রবীণ রায়চৌধুরী পরাধীন যুগের দেশকর্মী, বহুবার কারাবরণ করেছিলেন দেশের স্বাধীনতার জন্যে। দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে-সঙ্গে অবশ্য তাঁকে দেশছাড়া হতে হলো, হারাতে হলো পিতৃপুরুষের ভিটে।

নবীন রায়চৌধুরী ছিন্নমূল পরিবারকে নিয়ে সম্পূর্ণ দিশাহারা। সারা জীবনে বিশেষ কিছুই করতে পারেননি—যৌথপরিবারের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে। অবশেষে যৌথপরিবারের দায়মুক্ত হয়ে নিজের স্ত্রী ও কন্যাদের নিয়ে বেহালায় বাড়ি ভাড়া করেন। রতনবাবুর চার কন্যা। জ্যেষ্ঠা সাধনা, দ্বিতীয়া সরোজিনী, তৃতীয়া বাসন্তী এবং চতুর্থী ইন্দিরা। ইন্দিরার বয়স এখন একুশ, এক বৎসর হলো বিবাহিতা।

সওদাগরী অফিসের কেরানী এবং অবসর সময়ের কংগ্রেসকর্মী নবীনবাবু নিজেই সাধনার বিবাহের যোগাযোগ করছিলেন। বিবাহ প্রায় ঠিকঠাক, সেই সময় ছুটে বাস ধরতে গিয়ে তিনি অসুস্থ হন। পথেই মৃত্যু, যদিও ওই অবস্থায় পি.জি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

সাধনা বিয়ে করেনি। বরং টাইপ শিখেছে এবং একটা চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে। "শুধু চাকরিতে চলেনি, তাই দিদি কোচিং ক্লাস শুরু করেছে। দিদি যা করে ভালোভাবে করে", ইন্দিরার গর্ব, কোচিং-এ নাম আছে দিদির, বেহালা অঞ্চলে।

দিদি একে একে বোনেদের পাস করিয়েছে এবং পাত্রস্থ করেছে। ঈশ্বরের আশীর্বাদে কিন্তু সাধনার ত্যাগে সরোজিনী, বাসন্তী ও ইন্দিরা আজ বিবাহিতা। সরোজিনীর স্বামী শিক্ষক, বাসন্তীর স্বামী ইনকামট্যাক্সে ইন্সপেক্টর হয়েছে

সম্প্রতি। ইন্দিরার স্বামী বেসরকারি অফিসে জুনিয়ার অফিসার। এবার সাধনার বিয়ে না-করার যুক্তি নেই।

"এখন বিয়ে না-হলে আর তো বিয়ে হবে না। পঁয়ত্রিশের পরে মেয়েদের আর কী থাকে বলুন?"

অভিজিৎ বললো, "ছত্রিশ থাকে, সাঁইত্রিশ থাকে...এইভাবে সাতাত্তর আটাত্তর পর্যন্ত রয়েছে। ওইটাই মার্কিন দেশে মেয়েদের গড় পরমায়ু।"

ইন্দিরা বললো, "আপনি এদেশের কথা জানেন না। বিধবা ভালো, ডাইভোর্সিও ভালো—কিন্তু চিরকুমারীর অনেক অসুবিধে।"

ইন্দিরা দিদির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। "এমন অসাধারণ মানুষ বিরল। সবসময় হাসিখুশি। কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। বোন-অন্ত প্রাণ। না-হলে কেউ নিজের জীবন এইভাবে নষ্ট করে?"

"ইংরিজি জানেন?"

"এখানে সাধারণ ঘরে যেমন জানে। পছন্দ হলে শিখিয়ে-পড়িয়ে নেবেন।" একটু থামল ইন্দিরা। তারপর বললো, "দিদি দেখতে সুন্দরীই। কিন্তু ডবল শিফটে কাজ করে এবং রাস্তায় ধোঁয়ায় ধুলোবালিতে প্রতিদিন লড়াই করে দিদির সেই রূপ চাপা পড়ে গেছে। দিদি কোনো মেক-আপ করে না, আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন। একটু আদর-যত্ন হলেই একেবারে অন্যরকম হয়ে যাবে।"

দিদিকে দূর থেকে দেখা গেল। ইন্দিরা বললো, "দিদিকে বসিয়ে দিয়েই আমি চলে যাবো। আপনি মনে কিছু করবেন না। আমরা সামনে থাকলে দিদি হয়তো কথাই বলতে পারবে না।"

চা না খেয়েই দিদিকে বসিয়ে ইন্দিরা চলে গেল। অভিজিৎ খাবার অর্ডার দিলো। কিন্তু এবারও সমস্যা। আজ শুক্রবার—সন্তোষী মায়ের পুজা। মাছ মাংস স্পর্শ করবে না সাধনা রায়চৌধুরী। "অন্তত চিজ পাকোড়া? ওটা ভেজিটারিয়ান।" ওটাও স্পর্শ করল না যখন শুনলো ওতে ছানা আছে।

মেয়েটিকে মন্দ লাগছে না অভিজিতের। বললো, "আপনার বোন তো আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সংসারের জন্যে আপনি অনেক কিছু করেছেন।"

চুপ করে আছে সাধনা। অভিজিৎ বললো, "আমার স্ত্রী চলে গিয়েছেন অন্য লোকের সঙ্গে। ওদেশে যত বিয়ে হয় তার অর্ধেকই ভেঙে যায়। কেন কেউ তা জানে না।"

এবার মুখ খুললো সাধনা। "আপনার তা হলে খুব কষ্ট—রান্নাবান্না?"

রান্নাবান্না নিয়ে ওদেশে মাথা ঘামাতে হয় না। ওটা বড় সমস্যা নয়। বড় সমস্যা মনকে স্থির রাখা। সব ব্যাপারেই মানুষ অস্থির। হয়তো অস্থির বলেই

ওরা অতটা এগিয়েছে।”

সাধনা এবার জিজ্ঞেস করলো, “সব কথা ইন্দিরা আপনাকে বলেছে?”

“আপনার ত্যাগের কথা শুনেছি। আপনার দায়িত্ব ইদানীং শেষ হয়েছে।”

সাধনার মুখ শুকিয়ে গেল। “শেষ হয়নি, অভিজিৎবাবু। আমার মা, যিনি এই সংসারের হাল ধরেছিলেন (আমি তো শুধু দুটো টাকা এনে খালাস) তিনি ইন্দিরার বিয়ে পর্যন্ত বেশ সুস্থ ছিলেন। এই কিছুদিন হলো তাঁকে নিয়ে অসুবিধে। বেশ অসুস্থ। বিছানা থেকে উঠতে পারেন না।”

সাধনা এবার জানিয়ে দিলো, “মাকে এইভাবে ফেলে রেখে চলে যাওয়া সম্ভব হবে না। মা আমাদের জন্য অনেক কষ্ট করেছেন।”

সাধনার চোখে জল। মনে হলো সে বিয়েতে আগ্রহিণী, কিন্তু কিছু সময় ভিক্ষেও করছে।

মা এইভাবে কতদিন থাকতে পারেন তা তো জিজ্ঞেস করা যায় না এই দেশে। চুপ করে রইল অভিজিৎ।

বাইরে বেরিয়ে অস্বস্তি বোধ করলো অভিজিৎ। ফুটপাথে দিদির জন্যে অপেক্ষা করছে ইন্দিরা। “একি, আপনি দাঁড়িয়ে! ভিতরে থাকলেন না কেন? আমরা কী এমন কথা বলতে পারতাম?”

ইন্দিরা বললো, সে শুনেছে যারা ওদেশে থাকে তারা প্রাইভেসি না পেলে ভীষণ বিরক্ত হয়।

বাড়িতে ফিরে এসেছে অভিজিৎ। মায়ের তৈরি রান্না খেয়ে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে সে ভাবছে সারাদিনের অভিজ্ঞতার কথা। এদেশে মেয়েদের একটা নতুন রূপ সে দেখতে পাচ্ছে। এই সব মেয়েদের তো তার জানা ছিল না।

বোন অসীমা একটা চিঠি লিখে গিয়েছে। “দাদা, প্রণতিকে তোমার মনে আছে? আমার বান্ধবী। যে একদিন তোমার অ্যাডমায়ারার ছিল।”

প্রণতির ঠিকানা পাঠিয়ে দিয়েছে অসীমা। ওর সঙ্গে দেখা করার প্রস্তাব দিয়েছে অসীমা।

প্রণতির কথা মনে পড়ছে অভিজিতের। না মনে পড়বার কথা নয়। সেই মিষ্টি মেয়েটি যে পাশের ঘরে বসে গান গাইতো, আর এই ঘরে বসে অভিজিৎ শুনতো।

তখনও বাইরের বিশ্ব আঁখি মেলে তাকায়নি অভিজিতের দিকে। হাওড়ার এই সীমিত পৃথিবীতে প্রণতিকে দেখেই প্রথম পরিচয়ের রোমাঞ্চ অনুভব করেছে অভিজিৎ। অভিজিৎ নিজেই গোপনে এক টুকরো কাগজ পাঠিয়েছিল

তার গানের তারিফ করে।

তারপর একবার গোখেল কলেজের গেটের কাছেও দেখা হয়ে গিয়েছিল। "আপনি এখানে?" অবাক হয়ে গিয়েছিল প্রণতি।

"এই পি.জিতে একজনের সঙ্গে দেখা করার ছিল। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।" অভিজিতের মনে পড়ছে। ঠিক হঠাৎ নয়। প্রণতির আশায় পনেরো মিনিট দাঁড়িয়েছিল। দু'জনে একসঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে রবীন্দ্রসদনের বাসস্ট্যান্ডে এসেছে। মনে আছে, যত শ্লথ গতি সম্ভব তত শ্লথ হয়েছিল অভিজিৎ। তখনও বিদেশের ক্যাম্পাসে প্রণয়ের আধুনিকতম কারিগরী বিদ্যা তার আয়ত্তে আসেনি। এইভাবে প্রণয় চলে না পৃথিবীর কাছে। ওখানে একটা সুবিধা টেলিফোন। টেলিফোন নেই এমন মেয়ে নেই। টেলিফোন ছাড়া ওদের ডেটিং সিস্টেম ভেঙে পড়তো।

আরও একদিন "হঠাৎই" দেখা হয়েছিল গোখেলের গেটে। সেদিন ঈশ্বর দয়া করেছিলেন—রবীন্দ্রসদন বাসস্ট্যান্ডে বাস আসে না। হাওড়ায় এবং কালীঘাটে একই সঙ্গে জ্যাম। অগত্যা হাইকোর্টের সামনে চাঁদপাল ঘাট থেকে স্টীমার ধরবার প্রস্তাব দিয়েছিল অভিজিৎ। রাজি হয়ে গিয়েছিল প্রণতি। মেয়েদের পক্ষে এইসব রাস্তায় একলা হাঁটার ভয় আছে, বাবারও বারণ। কিন্তু অভিজিৎ যখন রয়েছে তখন চিন্তা কী, বলেছিল প্রণতি। কথাটা খুব ভালো লেগেছিল অভিজিতের, একটা মেয়ে তার উপর আস্থা স্থাপন করতে পারছে।

এরপর দ্রুত পটপরিবর্তন হয়েছে। অপ্রত্যাশিত সুযোগ নিয়ে আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছে অভিজিৎ। সেখান থেকেও প্রথম দিকে চিঠি এসেছে প্রণতির কাছে। এবং সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের পিকচার পোস্টকার্ড।

সেবারে যখন এসেছিল তখন দেখা করেনি প্রণতির সঙ্গে। সময় ছিল না। তাছাড়া ডায়ানার চিন্তায় অভিজিৎ বিভোর। বোন অসীমা বলেছে, "দাদা, তোমার রিয়েল অ্যাডমায়ারার ওই প্রণতি। তোমার সব ক'টা চিঠি রেখে দিয়েছে যত্ন করে। একবার দেখা করো, মানুষের কত দুঃখ থাকে।"

ভালো লাগেনি অভিজিতের। কে কবে কাকে কী চিঠি লিখেছে তা সাবধানে সংগ্রহ করে রাখার মানে কি? অসীমাও বা তা জানতে পারে কী করে?

অভিজিতের মন অবশ্য গ্লানিশূন্য। একটা প্রণয়ঘটিত কথা চিঠিতে নেই। প্রণতির সান্নিধ্য তার ভালো লেগেছে, কিন্তু তার বেশি কিছু এগোয়নি। দু'দিন একসঙ্গে রাস্তা দিয়ে হেঁটে বেড়ানোর মানে প্রেম নয়। বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি নয়। এই সহজ জিনিসটা এদেশে কেউ বোঝে না বলেই তথাকথিত ডেটিং এদেশে এতো বিপজ্জনক। মানুষকে পরস্পরকে আবিষ্কারের সুযোগ ও সময় দিতে হবে তো।

এবারে খবর নিয়েছে অভিজিৎ। প্রণতির বাবা, আদালতে যাঁর ভালো প্র্যাকটিস ছিল না, মা যাকে জিভমোটা উকিল বলতেন, তিনি জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

প্রণতির খবরও ভালো নয়। প্রণতির বিয়ে হয়েছিল—স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষ। সস্তায় বিয়ে দিতে হলে দোজবরে ছাড়া উপায় কী? সেই স্বামীও ছিল মদ্যপ ও স্বাস্থ্যহীন।

প্রণতি বিধবা হয়েছে গত বছরে।

প্রণতি বিধবা! কোথায় যেন আশার আলো দেখা দিচ্ছে। আবার নিজেকে বকুনি দিলে অভিজিৎ। প্রণতি, তুমি বিবাহিত জীবনে সুখী হলেই আমি সুখী হতাম। আমি তো তোমার এই ভাগ্যবিপর্যয়ে কোনো অংশগ্রহণ করিনি। আমি দুঃখিত, তোমার স্বামী চলে গিয়েছেন, তুমি এই বয়সে বিধবা হয়েছো। আমার ধারণা ছিল, ইন্ডিয়া অনেক এগিয়ে গিয়েছে। স্বাস্থ্যের নাটকীয় উন্নতি হয়েছে, অন্তত ষাট বছর বেঁচে থাকার প্রত্যাশা করতে পারে এদেশের প্রতিটি মানুষ।

অবশেষে প্রণতির সঙ্গে দেখা হলো। ব্যবস্থাটা করে দিয়েছে অসীমা। ও বলেছে, "দাদা, তুমি তো জানো, ওর মতন মেয়ে হয় না। সেবারে সে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। মুখ বুজে। ও কাউকে বলেনি যে তুমি ওকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিয়েছো। অবশ্যই দাওনি, প্রতিশ্রুতি দিলে সোমেশ্বর মুখার্জির ছেলে তা কেন রাখবে না? কিন্তু তবু মানুষের মনে অলীক প্রত্যাশা জাগে—গরিব দেশের মানুষ তো। আমাদের এই হাওড়ার সরুগলিতে বসেও মানুষ কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চাইবে তো। দাদা, প্রথম দিকে তুমি ওকে চিঠি পাঠিয়েছ তো বিদেশ থেকে। সেইসব চিঠি যদি কেউ বার বার পড়ে থাকে তুমি তাকে দোষ দিতে পারো না।"

কলকাতায় অফিসের সামনেই প্রণতির সঙ্গে দেখা হলো। তাও রক্ষে, থান শাড়ি পরে প্রণতি উপস্থিত হয়নি অভিজিতের সামনে। সে পরেছে নীল রঙের হালকা প্রিন্ট। শাশুড়ির নির্দেশ। সব রঙ পরবে। শুধু লাল রঙ পরতে সাহস পায় না বিধবারা। লালের ধারে-কাছে থাকে না ওরা। অথচ ইন্দিরা গান্ধী তো পরতেন। তার উত্তর প্রণতিই দিয়েছে উনি তো দেবী, দেশের জননী। একজন অর্ডিনারী বিধবার সঙ্গে তো ওঁর তুলনা চলে না।

দ্বিধা করছিল প্রণতি। কিন্তু অভিজিৎ শোনেনি। ভাড়া করা সারাক্ষণের গাড়িতে তুলেছে ওকে। নিরাপদ দূরত্ব রেখে চলেছে অভিজিৎ। বিদেশে

বসবাস করলে, মানুষ অনেক দায়িত্ববোধসম্পন্ন হয়। মানুষের শারীরিক প্রাইভেসিকেও রেসপেক্ট করতে শেখে।

ওরা প্রথমে সেই কোয়ালিটিতে হাজির হলো। কিন্তু আজ কোয়ালিটিতে ভীষণ ভিড়। বসবার জায়গার জন্যে ধৈর্য ধরতে হবে।

বেরিয়ে আসছিল। ঠিক সেই সময় একটা টেবিল খালি হলো। প্রণতি সব খবর রাখে। অভিজিৎদা এখন মস্ত লোক হয়েছেন। অভিজিৎদা বাড়ির মালিক হয়েছেন। সেখানে দোতলায় চারখানা শোবার ঘর আছে। একতলায় কেউ শোয় না, শুধু রান্না ও বসবার জায়গা। তাছাড়াও বেসমেন্ট আছে—একতলারও নীচে, যাকে কুঠুরি ঘর বলা চলতে পারে। অভিজিৎদার একটা নয়। তিনটে গাড়ি আছে। একটা মানুষ তিনটে গাড়ি নিয়ে কী করবে?

তিনটে গাড়ি কেউ একসঙ্গে চড়ে না। একটা চটি, একটা সু, একটা কাবলির মতন। ছোটটায় রোজ অফিসে যাওয়া। বড়টা নিয়ে বন্ধুবান্ধবসহ কোথাও একটু ঘুরে আসা। আর ভ্যানটা নিয়ে বনবাস গমন। মাসে একবার বনে চলে যাওয়া।

"আপনি কেন বনবাসী হবেন?" প্রণতি চায় না, অমন কিছু ঘটুক।

"বনের মধ্যে একটা কাঠের বাড়ি করে থেকে যেতে মন্দ লাগবে না, প্রণতি।"

প্রণতির নিজস্ব সাইকেলও নেই। রেলকলোনি কলোনি থেকে পাঁচ মিনিট পথ হেঁটে বাসস্ট্যান্ড। বাসে অথবা রিকশায় ফেরিঘাট। সেই ফেরিতে বাবুঘাট। তারপর আবার পদযাত্রা এবং অফিস।

"অনেক সময় লেগে যায় না?"

"যায়। কিন্তু আমি তো একলা নই, আমাদের ওখানে সবাই একই কষ্ট করছে, তাই মনে লাগে না।"

প্রণতির বাড়িতে বিদ্যুৎ আছে, কিন্তু রান্নার গ্যাস নেই। রান্নার গ্যাস নেবে সামনের বছরে অফিসে মাইনে বাড়লে। এখন কয়লা ও জনতা স্টোভ। জনতা কাজ দেয় না, কারণ কেরোসিনের দোকানে মস্ত লাইন। যতটুকু জোগাড় হয় হ্যারিকেনে লেগে যায়। সন্ধেবেলায় লোডশেডিং আছেই। ওই সময়ে রান্না।

অভিজিতের বিবাহিত জীবন সম্পর্কে কথা উঠবার আগেই সে নিজে সব বললো। "ঘরটা ভেঙে গেল। আমি না, ডায়ানাই চাইলো।"

ডায়ানার নিন্দা করতে রুচিতে বাধলো। বরং প্রশংসা করলো, "প্রাণবন্ত মেয়ে ছিল। কিন্তু ওদের ধৈর্য নেই, ওরা যা চাইবে তা সঙ্গে-সঙ্গে পেতে হবে। পশ্চিমের মানবধর্ম ওটা। আসলে আমরা ক্লিক করলাম না।"

ক্লিক জিনিসটা কী ঠিক বুঝতে পারছে না প্রণতি। "ওই যে একটার সঙ্গে একটা যখন ঠিকমতন লেগে যায়, একটা ক্লিক করে আওয়াজ হয়। ওই

আওয়াজটা না হলে বুঝতে হবে ঠিক লাগেনি। এই দ্যাখোনা আমার অ্যাটাচি কেস।" ডালাটা খুলে আবার বন্ধ করে ক্লিক দেখালো অভিজিৎ।

প্রণতির বিয়েটাও তো ক্লিক বলা চলে না। স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষ। বিয়ের পর থেকেই স্বাস্থ্য খারাপ। একের পর এক রোগ। তার উপর ড্রিঙ্ক করেছে। শেষ পর্যন্ত থাকলো না। চলে গেল। শেষ দশদিন নীলরতন হাসপাতালের জেনারেল বেডে খুব কষ্ট পেয়েছে।

ভাগ্য ভালো, চাকরি পেয়েছে প্রণতি। না-হলে কষ্টের শেষ থাকতো না। ওই যে বিয়ের আগে শর্টহ্যান্ড শিখেছিল, ওটা কাজে লাগল। একসময় তো ভেবেছিল বিয়ে করব না। তখন মা ভয় দেখালেন, কুমারী মেয়েদের ভীষণ অবস্থা।

এসব কষ্ট আর প্রয়োজন কী? যা ভুলে যাবার তা তো অতীতে সরে গিয়েছে। বিবাহিত জীবনে প্রণতি তো কিছুই পায়নি।

কোয়ালিটি থেকে বেরিয়ে, গাড়িটা ঘুরিয়ে পি.জি হাসপাতালের দিকে চললো ওরা। ওখানে বিধবা প্রণতি ও ডাইভোর্সি অভিজিৎ গোখেল কলেজের গেটটা দেখলো। রবীন্দ্রসদনের সামনে এখনও তেমন ভিড়! সামনের বাসস্ট্যান্ডেও কিছুক্ষণ গাড়িটা থামল। তারপর সোজা চাঁদপাল ঘাট—সেই লঞ্চঘাট যেখানে অনেক বছর আগে পায়ে হেঁটে ওরা দু'জন এসেছিল পি.জি থেকে। সেদিনই কি প্রণতিকে সে একটা চিঠি লিখেছিল? অভিজিৎ মনে করতে পারছে না।

হ্যাঁ, ওইদিনই চিঠি লিখেছিল, প্রণতি মনে করিয়ে দিলো। তারিখটা বলে দিলো প্রণতি। তারপর বললো, "চিঠিগুলো আর নেই।" বিয়ের আগের দিনে সব নষ্ট করে ফেলেছে প্রণতি। নতুন জীবন আরম্ভ করতে চেয়েছে প্রণতি।

এবার কী হবে? ঘুরেফিরে আবার সেই একই ঘাটে তো দু'জনে চলে এসেছে। অথচ এখন একজন বিধবা এবং আরেকজন ডাইভোর্সি।

হঠাৎ প্রণতি বললো, "আমি এখানে নেমে যাই। একটা লঞ্চ এখনই আমাকে হাওড়ায় নিয়ে যাবে। এবং সেখান থেকে সোজা লঞ্চে চলে যাবো উত্তর কলকাতার শেষ প্রান্তে।"

আরও একটু থাকার অনুরোধ করেছিল অভিজিৎ। কিন্তু প্রণতি বললো, "শাশুড়ি অসুস্থ। বাড়িতে গিয়ে রান্না চাপাতে হবে।"

ফেরির লঞ্চ চলে গেল। সেই শেষ খেয়ার মতন। হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলো অভিজিৎ কিছুক্ষণের জন্য।

পরের দিন চিঠি পাঠিয়েছিল প্রণতি। "এই প্রথম আপনাকে চিঠি লিখছি। ভীষণ ভয়-ভয় করছে। আমি বুঝতে পারছি, যেখানে আছি আমাকে সেখানেই

থাকতে হবে। যিনি আমার সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছিলেন, তিনি নিজেকে ঠকিয়েছেন যথেষ্ট, কিন্তু আমকে ঠকাননি। আমার শ্বশুর-শাশুড়ি সম্পূর্ণ আমার উপর নির্ভরশীল। তাঁরা সুস্থও নন। চাকরিটা পেয়েছি বিধবা হিসেবে ওঁরই অফিসে কমপ্যাশনেট গ্রাউন্ডে। জীবনে যা কিছু পেতে ইচ্ছে করে তা পাওয়ার জন্যে ভাগ্য করে আসতে হয়। সেইসব ভাগ্যবতীরা কেন বিধবা হবে? আমার নমস্কার নেবেন।

ইতি প্রণতি।"

অভিজিৎ মাথা নিচু করে অনেকক্ষণ বসে রইলো। চিঠিটা নিজের কপালে ঠেকিয়ে বোধহয় প্রণিতিকেই নমস্কার করলো।

অভিজিৎ মুখার্জি শেষ পর্যন্ত সাধনা রায়চৌধুরীর সঙ্গেই যোগাযোগ করেছে। কারুর পরামর্শ না শুনে সাধনাকেই সে বিয়ে করেছে। তাকে বলেছে, "ওদেশে যেতে হবে না। যতদিন খুশি এখানে থাকো, পঙ্গু মায়ের সেবা করো। তারপর দেখা যাবে।"

সাধনার মতন একজন মেয়ের সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছে মনে রেখেই সুদুর মার্কিন দেশের মাটিতে অভিজিৎ মনোবল পাবে। এখন থেকে তার আত্মবিশ্বাসের কোনো অভাব হবে না।

মধুর চেয়েও মিষ্টি

শুধু সুচরিতা নয়, আমার আর এক ভাগ্নীও বিদেশে থাকে। এবারে তার বৃত্তান্ত শোনা যাক।

দমদম বিমানবন্দরের পাবলিক টেলিফোন থেকেই রূপসী দেশাই সোজাসুজি তার লেখক মামাকে ফোন করেছিল।

আচমকা আমেরিকাপ্রবাসী ভাগ্নীর কাছ থেকে ফোন পেয়ে মামা কিছুটা মধুরভাবেই সারপ্রাইজড!

"হাই মামা! রূপসী হিয়ার!"

"কোথা থেকে কথা বলছিস? ক্লিভল্যান্ড, ওহায়ো থেকে?"

"আওয়াজ শুনেও বুঝতে পারছো না?" রূপসীর রসিকতা।"

"আজকাল এই কৃত্রিম উপগ্রহের দয়ায় কিছুই বুঝতে পারি না, কে কোথা থেকে কথা বলছে। নিউইয়র্ক থেকে ফোন এলে মনে হয় যেন পাশের ঘরের সঙ্গে কথা বলছি ; আবার এখানে পাশের গলি থেকে ফোন করলে মনে হয় মঙ্গলগ্রহ থেকে সিগন্যাল আসছে, কিংবা আমি কালা হয়ে গিয়েছি।"

মামাটি রসিক। বললো, "নিজের মামাকে তুলতে চাইছো—'হাই' বলে, কিন্তু এখন আমরা একটু লো আছি।"

রূপসীর বিদেশে পঠনপাঠন। ওখানে বসবাস করে সে আত্মপ্রত্যয়ের অধিকারিণী হয়েছে। সে বললো, "হোয়াট অ্যাবাউট তোমার আদরের বোনের টেলিফোন? ওটা কি 'হংক' করেছে?"

'হংক' মানে যে খারাপ হয়ে পড়ে থাকা তা সাহিত্যিক মামা শিখেছে এই রূপসীর কাছেই। রূপসী বুঝিয়েছিল, বাংলা ভাষার দরজা খুলে দাও মামা, নতুন-নতুন শব্দ দেশ-বিদেশ থেকে তুলে নাও। হংক মানে হর্ন বাজানো—অনেকটা মরে গেলে যেমন শিঙে ফোঁকা বলে বাংলায়।

মামা তারপর ঐ শব্দটা লেখায় ব্যবহার করছে, কিন্তু 'হাই' কথাটা এখনও হজম হয়নি।

"বড্ড ইয়াংকি-ইয়াংকি মনে হয়, কানে খচখচ করে। আফটার অল, মাই ডিয়ার রূপসী, আমাদের মনে রাখতে হবে বাংলা ভাষা ইজ নো অর্ডিনারি ভাষা! স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ভাষায় হোল লাইফ লিখে গিয়েছেন এবং স্বয়ং 'সাটাজিট্রে' এই ভাষাতেই চলচ্চিত্র বানিয়েছেন।" রূপসী জানে, সত্যজিৎ রায়ের ওই বিকৃত বানানটাও মামা চয়ন করে এনেছেন ক্লিভল্যান্ড, ওহায়ো থেকে।

টেলিফোনে মামা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। "বালাই ষাট, দুঃখে তোমার মায়ের টেলিফোন পটল তুলবে? ও-পাড়ায় যে টেলিফোন মিস্ত্রি আছে স্বয়ং তাজুদি, তাকে ভায়ের লেখা প্রতিটা স্বাক্ষরিত সংস্করণ উপহার দিয়ে যাচ্ছে। খুবই সাহিত্যরসিক মিস্ত্রি—এবং ওনলি সিটি ইন দ্য ওয়ার্লড যেখানে বই, ছবি, মিউজিক ক্যাসেট দিয়ে তুমি সাতখুন মাপ করাতে পারো।"

মামা বললেন, "তোমার মা তো বলেনই, টেলিফোনের লোকের মনোরঞ্জন কিছুতেই করতাম না যদি-না আমার প্রাণাধিক মেয়েরা ফরেনে থাকতো।"

তাজুদির ভীষণ দুঃখ হিরের টুকরো মেয়েরা কেউ এদেশে ঘরসংসার করলো না। ভীষণ রাগ তাজুদির ওই কলাম্বাস সায়েবের উপর। ওই বাউন্ডুলে লোকটা যদি পেটের দায়ে আমেরিকা আবিষ্কার না করতো তা হলে তাঁর মেয়েরা দেশছাড়া হতো না—থাকতো চোখের সামনে এই ভবানীপুর, বেহালা কিংবা কোন্নগরে। তাজুদি সারাক্ষণ টেলিফোনটা বাঁচিয়ে রাখার জন্যে ব্যাকুল। মরবার

সময় ওরা চোখের সামনে না থাক, টেলিফোনে নাড়িছেঁড়া আদরের মেয়েদের গলা শুনতে পাবেন।

মামা বলেছে, "তাজুদি, ভবসংসার থেকে যাবার সময় কেউ 'হাই মামি' শোনে না, শুনতে হয় হরিনাম, আর মুখে গঙ্গোদক।"

তাজুদি সব ব্যাপারেই ভীষণ গুছনো, আগাম ভেবে নিয়ে আগাম কাজ করতে তিনি তুলনাহীনা। ফোনে তো আমেরিকা থেকে মুখে জল দেওয়া যাবে না। অথচ যা ওজন বেড়েছে, যা হার্টের অবস্থা, যেরকম দুশ্চিন্তা, অকারণে যেরকম বুকের ধুকপুকুনি এবং স্বামীর নিরন্তর খ্যাঁচাখেঁচি তাতে কখন যে ঝপ করে ভবসিন্ধু পার থেকে ডাক আসবে ঠিক নেই। তাই মেয়েদের হাত দিয়ে প্লাস্টিক বোতলে গঙ্গাজলে ঢুকিয়ে সিল করিয়ে নিয়েছেন, প্রয়োজনে সন্তানের স্পর্শে পবিত্র গঙ্গোদক হাতড়াতে হবে না।

"কিন্তু তাজুদি, জল বেশিদিন থাকলে পোকা হয়—একেবারে দূষিত জল যে স্বাস্থ্যের পক্ষে কত ক্ষতিকারক তা টিভি-তে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা থেকে শুনেছো নিশ্চয়। কাটা ফল এবং পচা জল—আন্ত্রিক রোগের স্পেশাল এজেন্ট।"

"তোর তাজুদি বোকা, কিন্তু অত বোকা নয়। তা হলে দু-দুটো আমেরিকান মেয়ের মা হতে পারতো না। যখন শ্বাস উঠেছে, খাবি খাচ্ছে, যখন যাবার সময় হয়ে যাবে তখন কোন দুঃখে স্বাস্থ্যের পরোয়া করবো?"

মামা আরও বলেছে, "যার দু-দুটো এন-আর-আই জামাই, তাকে কী ভাবে খিটখিট করতে সাহস পায় জামাইদা? আমরা টেক আপ করবো সিরিয়াসলি, বিবাহের চল্লিশ বছর পূর্তি হলেও বধূ নির্যাতন নট অ্যালাউড। নিষিদ্ধ।"

তাজুদি বলেছেন, "তোর মায়ের কাছেই ছড়াটা শিখেছিলাম ঃ

'মিটমিটে বাতি আর পিটপিটে ভাতার,
কোন দিকে যাইবা গো দুনিয়াই আঁধার'।"

"কলকাতার মিটমিটে বাতির জন্যে ভগবান ছাড়া আর কারও কাছে অভিযোগ করার নেই, তাজুদি, কিন্তু জামাইদাকে কথা শুনিয়ে যাও প্রাণ খুলে। আমার মা তো তোমাকে বলে গিয়েছেন—'অবলার মুখে বল'।"

"তুই ডাক্তার রাজেন রায়চৌধুরীর কাছে নিয়ে গিয়ে ওঁর একটা কানের কল্ করে দে—আজকাল আমার কোনো কথা ওঁর কানে ঢোকে না। আমার গলা চিরে রক্ত বেরিয়ে যায়, কিন্তু কোনো ফল হয় না। এতো দেখে-শুনে বাপ মা বিয়ে দিয়েছিল, তবু যে এমন কালার খপ্পরে পড়তে হবে কে জানতো!"

মামা বলেছে, "আঃ তাজুদি, পিতৃপুরুষকে নিয়ে অযথা অন্যায়ভাবে টানাটানি কোরো না। চল্লিশ বছর আগে যখন জামাইদাকে স্পেশাল সিলেকশন করা হয়েছিল তখন ওঁর চেহারা ছিল ফিল্ম হিরোর মতন। রোল্স রয়েস,

মার্সেডিজ বেন্‌জ পর্যন্ত মোটর গাড়ির পার্টস-এর জন্যে চল্লিশ বছরের গ্যারান্টি দেয় না।"

টেলিফোনে মামা তাঁর ভাগ্নীকে জানালো, "তোর মাকে ফোনে পাবি কী করে? জামাইদার সঙ্গে ঝগড়ার মিটমাটের পর ভীষণ ভাব হয়েছে, দু'জনেই ফ্ল্যাট খালি করে বেরিয়ে গিয়েছেন দ্বিতীয় মধুচন্দ্রিমায়।"

মামার এতোক্ষণ ধারণা ছিল মহাসমুদ্রের ওপার থেকেই কথা বলছে রূপসী। কিন্তু দমদম এয়ারপোর্টের নাম শুনে খুব অবাক হলো। মামা বললো, "তুই অপেক্ষা কর, আমি এখনই আসছি।"

"আমি অবলা বঙ্গললনা নই, মামা। আমি যদি ক্লিভল্যান্ড থেকে জে-এফ-কে এয়ারপোর্ট, জে-এফ-কে থেকে ইন্দিরা গান্ধী ইনটারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট টু পালাম ডমেস্টিক এয়ারপোর্ট এবং সেখান থেকে দমদম বিমানবন্দরে আসতে পারি তা হলে দমদম থেকে তোমার বাড়ি অনায়াসে হাজির হতে পারবো।"

মামা রাজি হলো না। "তুই ওখানে একটু অপেক্ষা কর, লাগেজ ক্লিয়ার হোক, আমি ঝট করে চলে আসছি। তোর মা যদি শোনে তোকে একলা কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালার দয়ার উপরে নির্ভর করে মামাবাড়ি পৌঁছতে হয়েছে তা হলে আমার রক্ষে থাকবে না। একেই তাজুদি ভীষণ চটে আছেন, সেদিন পোস্ত চচ্চড়ি খেতে যাইনি বলে।"

মামা সত্যিই যেন উড়ে এলো দমদমে। রূপসীর বাক্সপ্যাটরার বহর দেখে মামার চক্ষু চড়কগাছ। হঠাৎ বলে ফেলেছিল, "একি রে! তুই যে পুরো সংসার গুটিয়ে এনেছিস!"

রূপসীর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। কিন্তু মুখে কিছু বললো না। মামার যা পুরনো স্বভাব, সারাক্ষণ রসিকতা করে যাচ্ছে : "তোকে এরোপ্লেন কোম্পানি এতো মাল তুলতে দিলো?"

"মামা, তোমার জানা উচিত, বাড়তি ভাড়া দিলে তুমি হাতি পর্যন্ত সঙ্গে নিয়ে আসতে পারো। ওই হাওয়া তো এদেশেও লেগেছে—দিল্লিতে তিনখানা মোটর গাড়ি ওঠানো হলো আজকের প্লেনে।"

"তোরা খুব সারপ্রাইজ দিতে পারিস! উইদাউট নোটিসে এখানে চলে এলি! তাজুদি তো খুব লজ্জা পেয়ে যাবেন। ঠিক এই সময়েই সেকেন্ড হনিমুনে পুরীতে।"

মামা জানালো, "যাবার দিনেও তাজুদি দোনোমোনো করছিলেন। হঠাৎ হাত থেকে পড়ে একটা কাচের প্লেট ভাঙলো। বললেন, "নিশ্চয় কেউ আসবো-আসবো করছে। আমি ব্যাপারটা পাত্তা দিলাম না। মোটা ইনভেস্টমেন্ট করে

ফেলেছি—ওদের দু'জনের জন্যে। দুটো সুইম সুট্ কিনেছি। ওই দেখে খুব রাগ তাজুদির—বললেন, মাসিমা নেই, কার কাছে আর লাগাবো তোকে শাসন করতে। জামাইদাও বাইরে যাবার জন্যে উৎসাহিত—ওঁর কথা কানে তোলা হলো না। শেষ পর্যন্ত তাজুদি রাজি হলেন, যাই জগন্নাথের কাছে—মানত্টা করে আসি। বড়র বেলাতেও করেছিলাম, হাতে-নাতে ফল পেয়েছি।"

মানত্টা কী রূপসী তা প্রথমে বুঝতে পারেনি। মামা খুব খোলাখুলি লোক। বললো, "রূপসীর জন্য সন্তান প্রার্থনা—তাজুদি একটু অধৈর্য, 'কী যে সব ওষুধপত্তর বেরিয়েছে! কেউ মা ষষ্ঠীকে পাত্তা দেয় না! যার যা খুশি করে'।"

এখানকার মেয়ে হলে লজ্জায় মুখ রাঙা হয়ে উঠতো। কিন্তু রূপসী বিদেশে লেখাপড়া করেছে, সেখানে বসবাস করেছে। সে বললো, "ভগবানের দায়িত্ব ও-দেশের মেয়েরা অনেক কমিয়ে দিয়েছে মামা। তবে ইদানীং বেবি বুম চলেছে, চল্লিশ লাখ প্রেগনেন্সি হয়েছে গত বছরে।"

মামা বললো, "ওসব ব্যাপারে ইন্ডিয়ার কিছু শেখার নেই, ওই একই সময়ে তিন কোটি ভারতবাসীকে গর্ভে ধারণ করেছেন ভারতবর্ষের মায়েরা।"

রূপসীকে মালপত্র সমেত গাড়িতে তুললো মামা। রূপসী জিজ্ঞেস করলো, "তোমাদের এখানে নতুন একটা হোটেল হয়েছে—তাজ বেঙ্গল?"

"হয়েছে, রূপসী। অনেক চেষ্টা-চরিত্তির পর। সর্বহারার নেতারা ওই পাঁচতারার জন্যে খুব ফাইট দিয়েছেন। আরও ফাইট দেবেন ওঁরা ক্যালকাটাকে তারায় তারায় ভরিয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু মাই ডিয়ার ভাগ্নী, তুমি ওসব জিজ্ঞেস করছো কেন? আমরা জানি, তোমাদের দস্ত থলিকায় ট্রাভেলার্স চেক থাকে, ক্রেডিট কার্ড থাকে—হোটেলে নগদ পয়সাও চাইবে না, বরং ডবল খাতির করবে। কিন্তু মনে রেখো, তোমার স্থায়ী ঠিকানা' 'তাজু বেঙ্গল অ্যান্ড নট তাজ বেঙ্গল।' তাজুদি এখন নেই, কিন্তু তাঁর সুযোগ্য ভাই রয়েছে, যে অ্যাজ গুড অ্যাজ তাজুদির মায়ের পেটের ভাই।"

রূপসীর মুখে দীর্ঘ বিমানযাত্রার পরেও চাপা হাসি ফুটে উঠেছে। মামা বলেছে, "স্বয়ং রামপ্রসাদ বলে গিয়েছেন, কুমাতা যদি বা হয়, কুমামা কভু না হয়!"

মামা সত্যি ভালোবাসে রূপসীকে। বললো, "এই মার্কিনি স্পিরিট আমার ভালো লাগে ক্যালকাটা থ্রি হানড্রেড চলছে—চলো কলকাতা, এখনই। একি প্রেসিডেন্টের ভ্রমণ যে ছ'মাস আগে থেকে আমলারা সব কিছু প্ল্যান করবে! উঠলো বাই তো ক্যালকাটা যাই, কেন হবে না?"

মামা নিজের বাড়িতেই হাজির করেছে রূপসীকে। রূপসী যদি চায়, এখনই টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেবে তাজুদিকে। "তাজুদি হনিমুন কাট করে পরের ট্রেনে

যদি ফিরে না আসেন তা হলে অন্য মামা দেখো।”

রূপসী অত ব্যস্ত নয়—ওরা বিলম্বিত হনিমুনে গিয়েছে বিবাহের চল্লিশ বছর পরে—ওদের জ্বালাতন করে লাভ নেই।

যতদিন ইচ্ছে থাকা যায় মামার কাছে। তাজ বেঙ্গলে থাকাটাও আয়ত্তের বাইরে নয়। ডলারের দেশ থেকে আসার এই এক মস্ত সুবিধে। সতেরো আঠারো দিয়ে টাকাকে ভাগ করলে এখানকার অন্য কোনো খরচকেই তেমন বেশি মনে হয় না।

হোটেল ছাড়াও পথ আছে। মায়ের ফ্ল্যাটের চাবি মামার কাছেই রয়েছে। সাউথ ক্যালকাটায় গিয়ে ওখানে থাকা যায়। মা ফিরে এসে মেয়েকে দেখে অবাক হয়ে যাবেন।

কিন্তু মামার একটাই চিন্তা। ওখানে রান্নার লোক ছুটিতে গিয়েছে।

রূপসী হাসলো। মামা ভুলে যাচ্ছে, সে-রূপসী নেই। এদেশে থাকার সময় ওসব চিন্তা ছিল। মা, রান্নার মাসিমা, কাজের লোক মোক্ষদা, জমাদারনী বিমলা এসব ছাড়া জীবন অকল্পনীয় ছিল। এখন আপনা হাত জগন্নাথ—এই রূপসীই মা মাসিমা মোক্ষদা বিমলা কমবাইনড—প্লাস আরও কিছু। কারণ রূপসী সোফার। রূপসী নাপতেনিও বটে। স্বামীর চুল প্রত্যেক পনেরো দিন অন্তর মেয়েদেরই কাটতে হয়। যদিও ওকাজটা রূপসী ইচ্ছে করেই গত দেড় মাস ধরে করেনি। ঘরের এতো কাজ করেও রূপসী স্রেফ গৃহবধূ নয়—নিজেও রোজগার করেছে। রোজগারের আগে দুনিয়ার সেরা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে লড়াই করে পরীক্ষা দিয়েছে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে—এবং সবাই জানে রূপসী খারাপ ফল করেনি।

এখানে থাকতে থাকতেই রূপসীর খেয়াল চেপেছিল সে বিদেশে যাবে। কেন যাবে, গিয়ে কী হবে, তারপর কী হবে, এসব ভাবেনি রূপসী। সবাই যেতে চায়, ওইটাই হাওয়া, যাদবপুরের ছাত্রী রূপসীও যেতে চেয়েছিল।

তাজুদি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। ফুল্লরা মাসিমার বড় মেয়ে তখন আমেরিকান সায়েব বিয়ে করেছে। লিন্ডসে দা-কে নিয়ে পরিবারে নানা গুঞ্জন। তাজুদি বলেছিলেন, “শেষে ফুলির মেয়ের মতন কিছু হয়ে বসুক।”

রূপসী তার মামাকে উকিল খাড়া করেছিল। “তাজুদি, হবার হলে মানুষ বাথটবেও ডুবে মরে, সমুদ্রে যেতে হয় না। তুমি ভুলে যাচ্ছো, সুবর্ণরেখা প্রথমে আমেরিকায় যায়নি—এই যাদবপুরেই তাদের প্রথম দেখা লিন্ডসে বাবাজীবনের সঙ্গে।”

“তুই গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর, সায়েব বিয়ে করবি না,” তাজুদি কাতর আবেদন করেছিলেন।

"বিয়েই করছি না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। বিয়ে করবার জন্যে কেউ স্কলারশিপ জোগাড় করে না—করে পড়াশোনার জন্যে।"

মামা বলেছে, "আজেবাজে সায়েব বিয়ে করবে কেন? রূপসীর একটা রুচি আছে—যার তার ভাগ্নী সে নয়।"

সায়েবের সঙ্গে বিয়ে হয়নি রূপসীর। কিন্তু মার্কিন ক্যামপাসে আলাপ হয়েছে অনুরাগ দেশাই-এর সঙ্গে। ব্রাইট, বোল্ড, গুজরাতি যুবক। ওদের পরিবারের সঙ্গে গুরুদেবের শান্তিনিকেতনের কী সব সম্পর্ক ছিল। পরিবারে বাংলার চর্চাও ছিল কিছু কিছু।

অনুরাগ দেশাই এক সময় ভবানীপুরেও বসবাস করেছে। ফলে তার বাংলা সম্পর্কে জ্ঞান কম নয়।

এই অনুরাগের সঙ্গেই রূপসীর অনুরাগ। আত্মীয়স্বজন কী বলবে এ নিয়ে তাজুদির প্রথমে দ্বিধা ছিল। কিন্তু রূপসীর মামা মনোবল দিলো—"গুজরাতি বাঙালি তো পাল্টি ঘর। খুব মিশ খায়, তাজুদি। আপনি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর ডক্টর আই জি প্যাটেলকে দেখুন—বাঙালি বউয়ের কথায় উঠছেন বসছেন। আপনি কবি সুধীন দত্তর বউ রাজেশ্বরীর রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনুন—পনেরো কোটি বাঙালি লজ্জা পেয়ে যাবে, এমন উচ্চারণ, এমন নিষ্ঠা, এমন সাধনা বাংলা গানে।"

রূপসীর বাবার তখন অন্য চিন্তা। "গুজরাতিরা ভেজিটেরিয়ান হয়—মেয়েটার প্রোটিন খাওয়ার কী হবে?" তখন তাজুদি অনেকটা মনস্থির করে ফেলেছেন। স্বামীকে এক দাবড়ি লাগালেন, "নিজের বউকে হপ্তায় ক'দিন মাছ খাইয়ে রেখেছো? বাঙালি স্বামীদের আর্থিক মুরোদ কত!"

জামাইদা তখন বেগতিক দেখে বাংলা ও গুজরাতের যৌথ ইতিহাস খোঁজখবর করছেন। "রবি ঠাকুরকে তো মহাত্মা গান্ধীই গুরুদেব বানিয়েছিলেন। দু'জনের মধ্যে খুব টান ছিল।"

রূপসীর বিয়ে কলকাতাতেই হয়েছিল। মামা রসিকতা করেছিল, "খুব সাবধান তাজুদি, জামাইকে কখনও বুঁদিয়া আনতে বলবেন না। আমেদাবাদে ভারত সেবাশ্রম সঙেঘর এক সন্ন্যাসী খুব বিপদে পড়ে গিয়েছিলেন উৎসবে বুঁদিয়া অর্ডার দিয়ে। বোঁদের বদলে এলো ঝুড়ি ঝুড়ি গোবরের ঘুঁটে। মিষ্টান্নের ব্যাপারে গুজরাতিরা একটু বেরসিক অন্তত বাঙালিদের তুলনায়।"

বিয়ের পর তাজুদি খুশি—অর্থাৎ কি না বেজায় খুশি। নিজের আনন্দ চেপে রাখতে পারছিলেন না। "কী সুন্দর বাংলা বলে! কার সাধ্য বলে পাল্টি ঘরের জামাই নয়! শুধু ওই নামটুকু ছাড়া। আমাদের মোক্ষদা তো ঠিক না বুঝে, দেশলাই দেশলাই করছে!"

তাজুদি আরও গর্ব করেছিলেন, "জামাই আমার স্কলার মানুষ। বিদেশের অমন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট করেছে। আবার সেই সঙ্গে বাড়তি পড়েছে দর্শন। সাত রাজার ধন এমন মানিক আমি কোথায় পেতাম? স্বীকার করছি, আমার মেয়েও কম যায় না। সে-ও ডক্টরেট না করলেও পড়াশোনা ভালো করেছে, গড়ন-পিঠন খুব ভালো। লম্বাও বটে। কিন্তু রঙ তো দুধে-আলতায় নয়, একটু চাপা। সে তুলনায় আমার জামায়ের রঙ মাখনের মতন।"

মামা রসিকতা করেছে, "রূপে গুণে সায়েব, স্বভাবে বাঙালি, এমন জিনিস গুজরাত ছাড়া এ যুগে কোথাও পাবে না, তাজুদি। তুমি ভাগ্যবতী।"

"তোমরা সবাই আশীর্বাদ করো, বেঁচেবর্তে থাকুক।" তাজুদি সবাইকে বলেছিলেন একটু চাপা গর্বের সঙ্গেই।

দীর্ঘ বিমানযাত্রার শেষে মামার বাড়ি পৌঁছে, কিছু খেয়ে রূপসী বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছিল।

পাখাটা জোরে চালিয়ে দিয়ে মামা বলেছিল, "এয়ারকুলার নেই, তোর একটু কষ্ট হবে।" কাঠের জানালাগুলো টেনে দিয়েছিল যাতে আলো না আসে। মামা বলেছিল, "যতক্ষণ খুশি বিশ্রাম নে—ঘুমই হচ্ছে জেট-ফ্যাটিগের শ্রেষ্ঠ ওষুধ। যখন যা খাবার ইচ্ছে হবে আমাকে ডাক দিস।"

অনেক দিন পরে রূপসী অন্য এক ধরনের সুখ ও নিরাপত্তা অনুভব করছে। এখানে কিছু করতে হবে না নিজের হাতে, যত কষ্টই থাক মামার বাড়িতে সব কাজ নিঃশব্দে হয়ে যাবে। তেমন হলে, মামা নিজেই হাতপাখা নিয়ে হাওয়া করবে। ভাগ্নীদের খুব ভালোবাসে মামা। বলে, "ভাগ্নে যখন হয়নি তখন ভাগ্নীদের মধ্যেই তো মামার প্রকাশ ও বিকাশ।"

চোখ বন্ধ করে, টান-টান হয়ে শুয়েছে রূপসী। গরম তেমন নেই—কিন্তু এই ভিজে গরমের সঙ্গে শরীরের অনেক দিন সম্পর্ক ছিল না। ব্লাউজের বগল ভিজে যায়, নাইলন এদেশে অচল হওয়া উচিত—কিন্তু পৃথবীর যত নাইলন সব যে এদেশের দিকে ছুটছে।

রূপসীকে মামা একটু বিপদে ফেলে দিয়েছিল। বলছিল, "জোড়ে ভ্রমণ হলে আরও আনন্দের কারণ হতো। কিন্তু প্রয়োজনে অর্ধেক পেয়েই পণ্ডিতরা খুশি।"

অনুরাগের খোঁজখবর করেছিল মামা কিন্তু প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চাইছিল রূপসী। মামার তো সব সময় রসিকতা। আমেরিকানদের সম্বন্ধে খোঁজখবর করার মানে হয় না—ওখানে তো গুণী লোকের ভালো থেকে আরও ভালো আরও ভালো হয়। ভালো হওয়ার শেষ নেই বলেই তো দেশটা ওইভাবে এগিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর সব দেশের লোকদের বুকে জ্বালা ধরিয়ে।

মামা জিজ্ঞেস করেছিল, আমেরিকায় একটা খবর পাঠিয়ে দিতে হবে কি না। রূপসী চুপ করে থাকায় মামা ভুল বুঝলো। ক্ষমা চেয়ে বললো, "ওহো, আমার খেয়ালই থাকে না, টেলিগ্রাম ওদেশে অচল হয়ে গিয়েছে। একটা ফোন করো—লজ্জার কিছু নেই। মামা গরিব হলেও একটা আন্তর্জাতিক ফোন বিল-এর ধাক্কা সইতে পারবে।"

রূপসী এড়িয়ে গেল—বললো, "ও ওখানে নেই, ওহায়ো স্টেট-এর কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

রূপসীর মনে পড়লো, বিয়ের পরে অনুরাগ আগে কলকাতা থেকে বিদেশে ফিরে গিয়েছিল। তখন ওকে ফোন করবার জন্যে কী পাগলামি! খেয়ালই নেই টেলিফোন ধরে কত সময় কেটে যাচ্ছে। মায়ের বিল এসেছিল, সতেরো হাজার টাকা। ভীষণ লজ্জা লেগেছিল। মা কিন্তু খুশি হয়েছিলেন। "আমরা গরিব। কিন্তু ওই ছেলে তো পণ নেয়নি। সতেরো হাজার টাকায় অনুরাগকে তো আমরা পেতাম না।"

"পণ-ফন ওসব ইতিহাসের ডাস্টবিনে চলে গিয়েছে মা। এখন হামভি মিলিটারি তুমভি মিলিটারি। বিয়ে করে কাউকে ধন্য করে দিচ্ছো না।"

তাজুদি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেননি। কারণ দুষ্টু লোকেরা তাঁদের সমালোচনা করেছে—কায়দা করে খরচাপাতি না করেই হুমদা হুমদা দুটো মেয়েকে পার করে দিলেন তাজুগিন্নি।

মায়ের শূন্য ফ্ল্যাটেই চলে এসেছে রূপসী। জেট-ক্লান্তি কাটিয়েই মামার বাড়ি থেকে বিদায় নিয়েছে রূপসী, মামার হাজার অনুরোধ সত্ত্বেও।

রূপসীর মনে হয়েছে এইভাবে একলা থাকাটাই এই মুহূর্তে তার পক্ষে ভালো হবে। বিদেশে থেকে-থেকে কোন সময়ে প্রাইভেসির উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে রূপসী। যখন মানসিক সঙ্কট চলেছে তখন মনে হচ্ছিল আপনজনের কাছে গিয়ে বুকটা হাল্কা করাই ভালো। অথচ জেট প্লেনে এতো দূরে এসে মনে হচ্ছে, আপনজনেরা কাছাকাছি থাকুক, কিন্তু তারা যেন যখন তখন মনের অন্দরমহলে ঢুকতে না চায়।

রূপসীকে মোকাবিলা করতে হবে নিজের সঙ্গে। অনুরাগের সঙ্গে সম্পর্কটা যে এইরকম অবস্থায় এসে পৌঁছবে তা কল্পনা করা যায়নি।

কে একজন লিখেছিল, প্রতি পাঁচ বছর অন্তর-অন্তর মেয়েরা পাল্টে যায়—আদর্শ স্বামীরা এই নতুন রমণীটিকে নতুনভাবে আবিষ্কারের উল্লাস উপভোগ করেন। পুরুষরাও পাল্টায়—পাঁচ বছর আগেকার সেই অনুরাগ আর আজকের অনুরাগ দেশাই কোনোক্রমেই এক নয়।

ক্যামপাসের পি-এইচ-ডি স্কলার অনুরাগ, যাকে রূপসী পছন্দ করেছিল, সে অন্য মানুষ ছিল। সেই অনুরাগ একদিন রবীন্দ্রনাথের উর্বশী কবিতা নির্ভুল আবৃত্তি করে রূপসীকে অবাক করে দিয়েছিল। বিস্ময় প্রকাশ করতে দেখে অনুরাগ উল্টো আক্রমণ করেছিল—রবীন্দ্রনাথ যে একমাত্র বাঙালিদের সম্পত্তি তা তো কোথাও লেখা নেই। আমার মা আমেদাবাদে মাস্টার রেখে বিয়াল্লিশখানা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছিলেন। আমার বাবা আমেদাবাদে রক্তকরবী স্টেজ করিয়েছিলেন, নিজে অভিনয়ও করেছিলেন। ক্যামপাসে বাঙালি নেহাত কম ছিল না, কিন্তু অনুরাগ দেশাইয়ের কাছে তাদের রবীন্দ্রসাহিত্যজ্ঞান অতি সামান্য।

অনুরাগের হিরো পঙ্কজ মল্লিক—তাঁর গানের ক্যাসেট আমেদাবাদ থেকে আমেরিকায় গিয়েছিল। অনুরাগ ইচ্ছে করেই রূপসীকে চটিয়ে দিয়েছিল। এই প্রথম একজন বাঙালি মেয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল যে পঁচিশখানার কম রবীন্দ্রসঙ্গীত জানে।

রূপসী রাগ দেখিয়েছিল। প্রত্যেক বাঙালি মেয়েকেই গাদা গাদা গান মুখস্থ করে মোবাইল গীতবিতান হয়ে ঘুরতে হবে এমন দিব্যি তো রবীন্দ্রনাথ দিয়ে যাননি।

"আমি রবীন্দ্রনাথ অপছন্দ করি না, কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত না-শিখলে জীবন অসম্পূর্ণ তা বিশ্বাস করি না। আমার ফার্স্ট লাভ আমার নিজস্ব বিষয়, যা পড়তে এদেশে এসেছি, সেকেন্ড লাভ ফিলজফি। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দর্শন আমার ভালো লাগে। ওই দর্শনের আলোকে রবীন্দ্রনাথ আমার মন্দ লাগে না।"

এই সময়েই সেই বিখ্যাত রসিকতা হয়েছিল। ক্যামপাসের পরিচিতরা জানতো না কার মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্যে অনুরাগ দেশাই দর্শনের বাড়তি ক্লাসে জয়েন করেছে। রূপসীও ব্যাপারটা বুঝে ওই বিষয়ে অনুরাগের সহপাঠিনী হয়েছে। মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই এক মস্ত সুবিধে—কত রকমের জ্ঞানান্বেষণের সুযোগ রয়েছে। ফিজিক্সের ছাত্র কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে পড়ছে ল্যাটিন, অর্থনীতির ছাত্র শিক্ষা নিচ্ছে ব্যবিলনের সভ্যতা সম্পর্কে। কমপিউটরের গবেষক নিচ্ছে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের পাঠ।

ওদের দু'জনকে দর্শনশাস্ত্রে ডগমগ দেখে বিজনেস ম্যানেজমেন্টের ছাত্র শুভজিত ব্যঙ্গ করেছিল—পুরনো কথা আছে, ফিলজফি বেক্‌স্ নো ব্রেড! দর্শনে রুটি তৈরি হয় না।

রূপসী এর উত্তর জানতো না। বলতে যাচ্ছিল, একমাত্র রুটি খেয়েই মানুষ বেঁচে থাকে না, মনের খোরাকও চাই।

কিন্তু অনুরাগ তাকে রক্ষা করেছিল তার শাণিত বুদ্ধির দীপ্তিতে। সে

বলেছিল, "ভাই শুভজিত, জেনে রেখো, দর্শন ছাড়া পৃথিবীর কোনো ব্রেডই তৈরি হতো না। কারণ রুটি তৈরির আগে আদৌ বেঁচে থাকার প্রয়োজন আছে কি না এই দার্শনিক সিদ্ধান্ত মানুষকে নিতে হয়েছে। রুটিওয়ালা হয়তো সোজাসুজি ঠিক এইভাবে জীবনের প্রশ্নটার মুখোমুখি হয় নি, কিন্তু দর্শন চেষ্টা করে সেইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে রাখতে যা সাধারণ মানুষকে বিশেষ কোনো মুহূর্তে উদ্বেল করে তোলে।"

অনুরাগ সেদিনই বলেছিল, "বিজনেস ম্যানেজমেন্টের মুশকিলই হলো ব্যবসায়ীর কাজের জন্য দাম দিতে চাইলেও চিন্তার জন্যে দাম দেবার উৎসাহ দেখায় না।"

সেদিনই অনুরাগকে স্বামী হিসেবে পাবার ইচ্ছে হয় রূপসীর। যদিও বিয়ের পর দু'জনেই চেষ্টা করেছে বার করতে কে আগে অপরকে ভালোবাসতে আরম্ভ করেছিল।

সেইসময় রূপসীর লেখক মামা আমেরিকায় উপস্থিত ছিল। মামা রসিকতা করেছিল, "বিজনেস ম্যানেজমেন্টের ছাত্র হলে তোমাদের এই সমস্যা হতো না। হেনরি ফোর্ড নোট করে গিয়েছেন, ভাবী স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের তিরিশ মিনিট পরেই তিনি বুঝতে পারলেন এই মেয়েটি তাঁর জীবনসঙ্গিনী হবার যোগ্য। লাইক মাইনডেড পার্সন—সমমানসিকতার মানুষ। যেমন তোমরা। তোমরা প্রেমে গদগদ হয়ে সারাক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নেই—একই সঙ্গে তোমরা দু'জনে কোনো এক ধ্রুবর দিকে তাকিয়ে আছো?"

অনুরাগ তখনই ফাঁস করলো, হেনরি ফোর্ড হেরে গিয়েছেন। রূপসী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে তার লেগেছিল মাত্র ১৮ মিনিট। প্রথম সাক্ষাতে কী তার চোখে মায়া অঞ্জন লাগিয়ে দিয়েছিল অনুরাগ দেশাই তা প্রথমে গোপন রেখেছিল। রূপসীর শরীর? তার ব্যক্তিত্ব? তার কথা বলার ভঙ্গি? তার হাসি?

শরীর বললে, প্রথমে সুখ হতো রূপসীর, কিন্তু পরে নিরাপত্তা বোধ করতো না। মেয়েদের শরীর পারফিউমের গন্ধের মতন—একটু অসাবধানী হলেই উবে যায়। তখন তো দেহের ভালোবাসা টেকে না। আসলে, রূপসী পছন্দ করবে একটা প্যাকেজ—রূপ যৌবন, ব্যক্তিত্ব, মানসিকতা সব কিছু নিয়ে মিক্স্‌ড গ্রিল। কিন্তু এবার এতোদিন পরে অনুরাগ যা ফাঁস করেছে তা ভীষণ ধাক্কা দিয়েছে।

রূপসী তো যখন প্রথম অনুরাগকে ভেট করেছিল তখন বেশবাসের উগ্রতা রাখেনি। রূপসী সেদিন তো জিন্‌স্‌ পরেনি—পরেছিল একটা দিশি তাঁতের শাড়ি। মার্কিন পরিবেশে যদিও ওটা বিলাসিতা। কারণ কাপড় কাচা কঠিন কাজ—তাঁতের শাড়ি ধোলাই ও ইস্ত্রি করবার জন্যে বিলিতি ওয়াশিং মেশিনগুলো

আবিষ্কৃত হয়নি। এবার উত্তেজনার মাথায় কথাটা অনুরাগ ফাঁস করে দিলো।

কী একটা ফিগার ঢোকাচ্ছিল ওর ব্যক্তিগত কমপিউটার যন্ত্রে যার ডাক নাম পি-সি। সেইটা 'কি' করতে-করতে অনুরাগ বললো, "আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল তোমার হিসেববোধ। ক্যামপাস লনে বসে যখন তুমি বললে, দুটো কোক কিনে লাভ নেই। একটা কিনে ভাগ করে নেওয়া যাক। লেটস্ স্পিল্ট এ কোক। আমি বুঝলাম, এ মেয়ে অপচয়, নষ্ট পছন্দ করে না। এ মেয়ে সংসারের লক্ষ্মী হবে।"

আঁতকে উঠেছিল রূপসী। এ জানলে সে বড় একটা কোক নিয়ে, এক সিপ আস্বাদ করে, বাকিটা গার্বেজ টিনে ফেলে দিতো। আদিম গুজরাতি মনোবৃত্তি নিয়ে আদিম সম্পর্কের ভিত্তিভূমি রচনা হয়েছে, এটা ভালো কথা নয়।

কিন্তু সঙ্গীত, দর্শন, চিত্রকলা এসব তো মিথ্যা মুখোশ ছিল না অনুরাগের। ক্লিভল্যান্ডের মিউজিয়ামে গিয়ে ভারতীয় চিত্রকলা সম্পর্কে কত সুন্দর কথা বলেছে অনুরাগ। ওর এক মামা শান্তিনিকেতনের কলাভবনে অনেকদিন নন্দলালের সঙ্গে কাজ করেছেন। বেঙ্গল স্কুলের ছবি ভালো লাগতো না রূপসীর—প্রেমপর্বে অনুরাগই ওকে শিখিয়েছিল কী করে অবন-গগন-নন্দলালের ছবির তারিফ করতে হয়। তারপরেই হয়তো ঘড়ি দেখেছে অনুরাগ। রাতে ল্যাবরেটরিতে কাজ রয়েছে। সময় নষ্ট করেনি কৃতি ছাত্র অনুরাগ দেশাই।

সেই অনুরাগের সঙ্গে কয়েকটা ঘণ্টা যেন কয়েকটা মিনিট মনে হতো। এমন লোকের সঙ্গে সারাজীবনটাই ক্লান্তিবিহীনভাবে কেটে যেতে বাধ্য।

কিন্তু এমন পরিণতি হবে কে জানতো! অনুরাগ এবার নিশ্চয় বুঝেছিল অবস্থাটা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। রূপসীর ধৈর্য এবার শেষ হতে পারে। কিন্তু সে তখনও ব্যাপারটা তোয়াক্কা করলো না। রাত্রে বিছানার পাশে রাখা কমপিউটারকে কীসব নির্দেশ দিতে লাগলো।

মামা সরল মনে জিজ্ঞেস করেছিল, "হ্যাঁরে, সব ভালো তো? অনুরাগ কেমন আছে?"

"অনুরাগ আছে মাইনাস হিজ অনুরাগ।" রূপসীর এই কথা মামা রসিকতা হিসেবে নিয়েছিল।

মামা বলেছিল, "তুই চলে আয় আমাদের এই লাইনে।"

অনুরাগ যে ভীষণ সফল তা মামা খবর পেয়েছে। কিন্তু কিসে সফল তা মামা জানে না। মামা আরও জানে, আমেরিকায় ভীষণ সাফল্য কিছু চিন্তা আনে—পুরনো সব সম্পর্ক একঘেয়ে মনে হয়, নতুন অনুরাগ জন্মায়।

অন্য কোনো মেয়ের প্রতি অনুরাগ জন্মালে জন্মাবে। অন্তত প্রমাণ হবে

মানুষটা এখনও রক্তমাংসে গড়া, একটা কারও জন্যে কিছুটা সময় দিচ্ছে, একটা কারও কাছে দাক্ষিণ্য পাবার তৃষ্ণা রয়েছে শরীরে। কিন্তু এই অনুরাগ একেবারে আলাদা—সে দুরারোগ্য নেশার শিকার হয়েছে।

এই কথা শুনলে মামা পর্যন্ত ভীষণ চিন্তিত হবে। মা তো পা ছড়িয়ে কাঁদতে শুরু করবেন। ওদেশে অনেকে প্রথম বয়সের ধাক্কা কাটিয়ে দ্বিতীয় পর্বে মদ কিংবা ড্রাগের খপ্পরে পড়ছে। অনুরাগ কি মাত্রাহীন হুইস্কি সেবন করছে?

রূপসী মিথ্যে কথা বলবে না। “আমরা ধোয়া তুলসীপাতা নই, মামা। আমরা সবরকম ড্রিংকসের স্বাদ জানি—কিন্তু এখনও ড্রিংকস আমাদের স্বাদ পায়নি। আমরা বাড়িতে ওসব হাঙ্গামা রাখি না। যদি অনুরাগ প্রত্যহ একটু ড্রিংক নিয়ে বসতো, সব ভুলে গিয়ে রূপসীকে একটু সান্নিধ্য দিতো, তা হলে আপত্তি ছিল না। কিন্তু তার বিপদ আরও বেশি।”

রূপসী এবার কিছু চেপে রাখেনি। মামাকে বলেছে, “তোমার জামাই এখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে ইস্তফা দিয়েছে। তুমি এখন আর একজন রিসার্চ সায়েনটিস্টের মামাশ্বশুর নও।”

অনুরাগের চাকরি গিয়েছে ভেবে মামা আঁতকে উঠলো।

“চাকরি যায়নি, মামা। ও ছেড়ে দিয়েছে।”

“পলিটিক্‌স! কর্মক্ষেত্রের পলিটিক্‌স এমন হয় যে মানুষ কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।” অভিজ্ঞ মামা বলে উঠলেন।

তাও হয়নি অনুরাগের ক্ষেত্রে। ওকে ল্যাবরেটরি থেকে না যেতে অনুরোধ করেছিল, তবু ছেড়েছে।

মামা হয়তো ভাবছে, ল্যাবে কোনো মেয়ের সঙ্গে আকস্মিকভাবে একটু-আধটু জড়িয়ে পড়া। কিন্তু ওসব কিস্‌সু নয়। স্রেফ টাকা! রুপাইয়া! ইউ এস গ্রিনব্যাক! অর্থাৎ ডলার।

“আমেরিকান হাওয়া লেগেছে গুজরাতি মনে। যেখানে বেশি টাকা সেই প্রতিষ্ঠানে মানুষ তো যাবেই।” মামার ভাষ্য।

“কিংবা গুজরাতি হাওয়া এখন আমেরিকায় লেগেছে”, রূপসী এবার একটু তিক্ত।

মামারও দোষ আছে। সেবার ক্লিভল্যান্ডে বেড়াতে গিয়ে বললো, আর্ট মিউজিয়াম দেখবে না, দেখবে রকিফেলারের আদি কীর্তিভূমি। ৩২ নম্বর রিভার স্ট্রিট, ক্লিভল্যান্ড—যেখানে জন ডি রকিফেলার একজন ইংরেজ সায়েব মরিস ক্লার্কের সঙ্গে ছোট্ট একটা দোকান খুলেছিলেন। সেই রকিফেলার যিনি ছোট্ট একটা দোকান থেকে শুরু করে যথাসময়ে বিশ্বের এক নম্বর ধনী হয়েছিলেন—আমেরিকার পয়লা নম্বর মিলিয়নিয়ার।

অনুরাগ এসব খোঁজখবর রাখতো না। রকিফেলার এখনও আমেরিকান হিরো নয়। কিন্তু বই পড়ে দূর থেকে ইন্ডিয়ানরা ব্যাপারটা বুঝতে পারে না, ভাবে আমেরিকানরা ওদের বড়লোকদের পুজো করে। মামা যাবার সময় রকিফেলারের জীবন সম্পর্কে একখানা বই অনুরাগকে উপহার দিয়ে গেল।

মামা তো চলে গেল এবং রকিফেলারের জীবনীটা অনুরাগের মাথায় ঢুকে গেল। কী করে বড়লোক হওয়া যায় এইসব বই নিয়ে বুঁদ হয়ে বসলো। রকিফেলারের জীবন ওর ভীষণ ভালো লেগে গিয়েছে। "গুজরাতিরা তো ওই সবই পছন্দ করবে—রকিফেলার, কার্নেগি, ফোর্ড এট্‌সেটরা ; থরো, এমারসন, মার্টিন লুথারকিং এসব নিয়ে কোনো কৌতূহল নেই।"

"রকিফেলার বলতে আমাদের কলকাতার রকে বসা আড্ডাবাজ বেকার বোঝায়।" স্ত্রীর কথাটা অনুরাগ কানে নিল না। "ভদ্রলোক সাত বছর বয়স থেকে টাকা সম্পর্কে মাথা খাটিয়েছেন। সংসারে ফাইফরমাশ খাটলে বালক বয়সে সিকি আধুলি যা পেতো সব একটা ভাঁড়ে জমা রাখতো জন ডি রকিফেলার। যখন দশ বছর বয়স তখন একটা লোক জনের বাবার কাছে এসে বললো, আমার পঞ্চাশ ডলার ধার দরকার। সাড়ে সাত পার্সেন্ট সুদ দেবো। বাবা বললেন, তোমার দরকার বুঝছি, কিন্তু আমার কাছে টাকাটা নেই। দশ বছরের ছেলে দরজার আড়াল থেকে ওদের কথা শুনছিল। হঠাৎ বেরিয়ে এসে সে জিজ্ঞেস করলো, কাকু, সুদ কী জিনিস? পাড়ার কাকু সস্নেহে বোঝালেন, কেউ যদি তার নিজের টাকা অন্যকে দেয় তা হলে তাকে ধন্যবাদ হিসাবে এক বছরে প্রতি একশো ডলারে সাত ডলার দিতে হয়, এর নাম সুদ।"

"কবে এই সুদ পাওয়া যাবে?"

"ঠিক একবছর পরে।"

"কতদিন পাওয়া যাবে?"

"যতদিন না টাকাটা শোধ হচ্ছে।"

"আমার কাছে পঞ্চাশ ডলার আছে, তোমায় এনে দিচ্ছি। তুমি আমাকে তিন ডলার পঁচাত্তর সেন্ট সুদ দেবে?"

"কোথায় এই টাকা পেলে?"

"খেটে রোজগার করেছি, জমিয়েছি ভাঁড়ে।"

সেই আরম্ভ হলো দশ বছরের ছেলের বিশ্বজয়—রকিফেলার ডলারকে কখনও কুঁড়েমি করতে দেননি, ডলারকে খাটিয়েছেন তাঁর নিজের জন্য।

রকিফেলার-এর ভূত অনুরাগের ঘাড়ে চেপেছে। রূপসী ব্যাপারটা তখনও সিরিয়াসলি নেয়নি। বলেছে, "তুমি, যার ভক্ত সেই রবীন্দ্রনাথ এদেশের অতিমাত্রায় লক্ষ্মীপুজো পছন্দ করেননি।"

রূপসী বলেছে, "রকিফেলারের হচ্ছে সুদখোরের জীবন। তাই ওঁর নিজের লোকরাই ওঁকে অক্টোপাস, অ্যানাকোন্ডা বলে ডাকতো। ইসলামে সুদ নিষিদ্ধ। হিন্দুরা কখনও সুদ সহ্য করতেন না।"

শেষ কথাটায় একটু কাজ হলো। অনুরাগ নিজেকে একজন আদর্শ হিন্দু বলে মনে করে।

কিন্তু ফল ভালো হলো না। লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করে রূপসীর সঙ্গে সে তর্কে নামলো। অনুরাগের বক্তব্য : রূপসী না-জেনেই তাকে ভুল তথ্য দিয়েছে।

"রকিফেলার শতকরা সাড়ে সাত শতাংশ সুদে সন্তুষ্ট, কিন্তু প্রাচীন হিন্দুদের ধর্মসূত্র অনুযায়ী সুদের হার ছিল ১৫ শতাংশ। বিনা সিকিউরিটিতে সুদের পরিমাণ অনেক বেশি ছিল। স্বয়ং মনুর তালিকা অনুযায়ী দেয় সুদের হার: ব্রাহ্মণ ২৪ শতাংশ, ক্ষত্রিয় ৩৬ শতাংশ, বৈশ্য ৪৮ শতাংশ এবং শূদ্র ৬০ শতাংশ। সমুদ্রযাত্রার ব্যবসায়ে সুদের হার ছিল ২৪৫ শতাংশ। আমাদের পূর্বপুরুষরা সুদ ভালোবাসতেন না তা বলা যাবে না। বউ ধার করলে তার দায়দায়িত্ব স্বামীকে নিতে হতো প্রাচীন ভারতে। কিন্তু স্বামীর ঋণের জন্যে মেয়েদের কোনো দায়দায়িত্ব ছিল না।" অনুরাগ রসিকতা করেছিল।

অর্থোপার্জনের জন্য অনুরাগ এবার কিছু ব্যবসা করবেই। গুজরাতে অনেকেরই নাকি একটা 'ধান্দা' থাকে—নিজের কাজের বাইরে আরও অনেক কাজ।

"কিন্তু বিজনেসে মূলধন লাগে। আমরা মূলধন কোথায় পাবো? কিছুদিন আগেও তো আমরা ছাত্রছাত্রী ছিলাম।"

স্ত্রীর কথায় অনুরাগ তখনকার মতন ঠাণ্ডা হলেও একেবারে শান্ত হয়নি।

এবারেও মামা ক্ষতি করেছে। দেশ থেকে একখানা সংস্কৃত গল্পের বই পাঠিয়েছিল ভাগ্নীজামাইকে। সেই বই পড়ে অনুরাগ আবার উত্তেজিত হয়ে উঠলো। সংস্কৃত বইতে লেখা : "সংযমী পুরুষ অর্থ দ্বারা অর্থ উপার্জন করতে পারে। স্বপ্ন থাকলে, চেষ্টা থাকলে অর্থ ব্যতীত শ্রী লাভ করা যায়। একজন দরিদ্র খবর পেলো বিশাখিল রাজ্যে এক ধনী সদ্বংশজাত দরিদ্রদের অর্থ ধার দেন। সেখানে গিয়ে দেখলো ওই ধনী এক বণিকপুত্রকে ভর্ৎসনা করছেন। মাটিতে পড়ে থাকা ওই মরা ইঁদুর দেখো। কুশলী ব্যক্তি ওর থেকেও পয়সা রোজগার করতে পারে, আর তুমি পয়সা নষ্ট করছো।"

এই কথা শুনে নতুন ছেলেটি বললো, "এই ইঁদুরটি আমি আগাম হিসেবে নিচ্ছি এবং রসিদ লিখে দিচ্ছি।"

তারপর অনুরাগ বই থেকে স্ত্রীকে পড়ে শোনালো : "দুই মুষ্টি ছোলা মূল্যস্বরূপ গ্রহণ করিয়া আমি এক বণিকের নিকট তাহার মার্জারের আহার্য

হিসাবে উহা বিক্রয় করিলাম। সেই চানা পিষ্ট করিয়া এবং এক কলসী জল লইয়া আমি নগরীর বহির্দেশে একটি ছায়ানিবিড় চত্বরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অতিশয় ভদ্রতা সহকারে একদল কাঠুরিয়াকে সেই চানা ও জল প্রদান করিলে তাহারা প্রত্যেকে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ সন্তুষ্টচিত্তে আমাকে দুই খণ্ড করিয়া কাষ্ঠ প্রদান করিল। আমি সেই কাষ্ঠখণ্ডগুলি বিক্রয় করিয়া যে মূল্য পাইলাম তাহার কিয়দংশ ছোলা ক্রয় করিয়া দ্বিতীয় দিবসে আবার কাঠুরিয়াদিগের নিকট হইতে কাষ্ঠখণ্ড সংগ্রহ করিলাম। তিনদিন এইভাবে আমি কাষ্ঠখণ্ড ক্রয় করিলাম। অতঃপর সহসা অতিবৃষ্টিতে কাষ্ঠের অভাব উপস্থিত হইলে আমি ওই কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া বেশ কিছু উপার্জন করিলাম। ওই ধন দ্বারা একটি বিপণী স্থাপন করিয়া বাণিজ্য করিতে-করিতে স্বীয় বুদ্ধিবলে এখন প্রভূত বিত্তশালী হইয়াছি।"

টাকার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে অনুরাগ। টাকাই তার ধ্যানজ্ঞান। গবেষণার কাজ ছেড়ে দিয়ে সে মার্কিনি জমির দালালি শুরু করেছে।

রূপসীর পক্ষে কত বড় অপমান! সে কী করে বাপমায়ের কাছে মুখ দেখাবে?

কিন্তু অনুরাগের যুক্তি : যস্মিন্ দেশে যদাচার! এখানে একজন জিওলজিস্ট মাছ ভাজার লাইসেন্স নিয়ে দোকানে মাছ ভাজছেন পয়সা বেশি বলে। ইতিহাসের অধ্যাপক জীবনবীমার দালাল হলেন স্রেফ পয়সার জন্যে। ডাক্তার নিজের পেশা ছেড়ে জমিজমা নিয়ে মেতেছেন।

এসব যুক্তি মোটেই ভালো লাগেনি রূপসীর। কিন্তু যা হবার তা হয়েছে। এখন অনুরাগ দেশাই দিনরাত পয়সার পেছনে ছুটছে। পয়সাই তার ধ্যানজ্ঞান—সারাদিন কত জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। বাড়িতে এসেও শুধু ফোন করে। তারপর মাঝরাত পর্যন্ত শেয়ারবাজারের খেয়াল।

আজকাল লোকজন দরকার হয় না, শেয়ার ব্রোকাররা বাড়িতেই যন্ত্র বসিয়ে দিয়ে যায়, যাতে গভীর রাতেও কেনাবেচা চলে।

শুক্রবার অনুরাগ কী সব করে। টেলিফোন এবং কমপিটারের আমেরিকান ডলার পাঠিয়ে দেয় টোকিওতে, ফ্রাঙ্কফুর্টে, লন্ডনে, প্যারিসে। সোমবার আবার ডলারকে ঘরে ফিরিয়ে আনে। ডলার, ইয়েন, মার্ক, স্টারলিং-এ কীসব ঠোকাঠুকি হয় তা অনুরাগ ভেবেছিল রূপসী বুঝবে, কিন্তু ওই বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

শনিবার-রবিবারও অনুরাগ বেরিয়ে পড়ে জমিজমার খোঁজে—দুশো মাইল দূরে কোথায় বন আছে, পাহাড় আছে যা একদিন জনপদে পরিণত হতে পারে। কেনাবেচা ঠিক সময়ে করলে অনেক অর্থ। এর নাম রিয়েল এস্টেট।

অনুরাগ ভেবেছিল রূপসীও এই ব্যবসার ব্যাপারে আগ্রহ নেবে যেমন নিয়েছিলেন হেনরি ফোর্ডের বউ। না-হলে ১০০ ডলারের মাসমাইনের চাকরি করে বাড়ি ফিরে এসে হেনরি ফোর্ডের পক্ষে নতুন ধরনের মোটর গাড়ি তৈরি করা সম্ভব হতো না।

রূপসীর এসব খুব খারাপ মনে হয়েছে। সে মনে করিয়ে দিয়েছে, "অনুরাগ, তুমি তো আগে এমন ছিলে না।"

"তুমি মনে করছো টাকাই সব। কিন্তু নিউ ইংলন্ডের প্রবাদ কী বলছে দেখো। টাকা সম্বন্ধে ঈশ্বরের মনোভাব কী তা যাঁদের তিনি ধনী করেছেন তাঁদের স্বভাবচরিত্র দেখলেই বুঝতে পারবে।"

অনুরাগ ওসব মন্তব্য তোয়াক্কা করে না। সে চাইছে টাকা, আরও টাকা, আরও টাকা।

অনুরাগ গান ভুলে গিয়েছে, ছবি ভুলে গিয়েছে। নিজের বিজ্ঞান ভুলে গিয়েছে। দর্শন যে একদিন জানতো তাও মনে হয় না।

কমোডিটি বিজনেস নিয়ে এখন পড়াশোনা করছে অনুরাগ—ডাল, ভোজ্যতেল, বীজ, গম, এটসেটেরা। শিকাগো গ্রেন মার্কেটের সঙ্গে সারাক্ষণ যোগাযোগ রেখে চলেছে।

অনুরাগ যে টাকার প্রেমে পড়েছে তাও মনে থাকছে না।

টাকা নিয়ে কী হবে? অনুরাগ কেন দেখছে না, এদেশের মানুষ টাকা সম্বন্ধে শ্রদ্ধা হারাচ্ছে। রূপসী অ্যাগাসিজ-এর সেই বিখ্যাত উক্তিটা তার স্বামীকে দেখিয়েছে। একটা সামান্য কাজের জন্যে অনেক ডলার প্রস্তাব করায় ভদ্রলোক সোজা বলেছিলেন, আমার এতো সময় নেই যে ডলার কামাবার জন্যে সময় অপচয় করবো।

রূপসী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। টাকা সম্বন্ধে এই নির্লজ্জ লোভ তার নেই। অনুরাগ ওর কথা কানে নেয়নি। রূপসী আরও চটেছে। জাতের কথা মনে পড়েছে। গুজরাতি বেনেদের সঙ্গে বাঙালি ব্রাহ্মণের ওই তফাত। টাকা হি জীবনম্ নয়।

টাকা সম্বন্ধে একটা বিচিত্র অনীহা ঘিরে ধরেছে রূপসীকে। টাকা নিয়ে চিবিয়ে খাবে নাকি? একটা লোক ক্রমশ টাকার কাদার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। কে তাকে বাঁচাবে?

"অনুরাগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই দিনগুলো ভুলে গেলে কেমন করে? তখন সাচ্ছল্য ছিল না, একটা কেক দু'জনে ভাগ করে খেয়েছি, কিন্তু তখন পৃথিবী অনেক সবুজ ছিল।"

রূপসী অনেক ইঙ্গিত দিয়েছে। বিজনেসের বাইরে একটা সুন্দর জীবন

আছে। অর্থই এই পৃথিবীকে চলমান রাখেনি। পৃথিবীর যা কিছু সেরা তা আজও বিনামূল্যে পাওয়া যায়। কিন্তু কে শোনে ওইসব কথা?

অবশেষে নিরুপায় হয়ে রূপসী দেশে চলে এসেছে। মানুষটা সম্বন্ধে তার বিশ্বাস ক্রমশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। টাকার স্লট মেশিন বিয়ে করে এই পৃথিবীতে কেউ আনন্দ পায় না।

রূপসী হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়েছে চলে আসার। টেলিফোনে ট্রাভেল এজেন্টকে ফোন করেছে। সেদিনই এয়ারপোর্টে টিকিট ডেলিভারি নিয়েছে। ভাগ্যে পাশপোর্টখানা ইন্ডিয়ান, ভিসার হাঙ্গামা নেই নিজের জন্মভূমিতে ফিরতে।

অনুরাগ বিজনেসের সুবিধের জন্যে পাশপোর্ট বদল করছে। ও করুক, রূপসী করবে না। টাকার উপর ওই রকম ভালোবাসা নেই কলকাতায়। ওইখানেই ফিরে যাচ্ছে রূপসী। একটা চিঠি লিখে এসেছে রূপসী। "টাকা এমনই এক রূপসী যে অন্য রূপসীকে সহ্য করতে পারে না। তুমি তোমার ডলার প্রেম চালিয়ে যাও, আমি আপাতত ঘুরে আসি সেখান থেকে যেখানে টাকার অক্টোপাস বাঁধন নেই—মানুষ যেখানে টাকার রেশমি ফাঁসে স্বেচ্ছাবন্দী নয়, যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মেছিলেন। তুমি থাকো সেখানে যেখানে বহুবছর যুদ্ধ করে ক্রীতদাস প্রথা তুলে দিয়েও মানুষ আবার স্বেচ্ছায় লক্ষ্মীর ক্রীতদাসত্ব গ্রহণ করেছে। আমার টাকা সম্বন্ধে কোনো মোহ নেই।"

রূপসী নিজের বাপের বাড়িতে বিছানায় পাশ ফিরলো। আশা করি অনুরাগ বুঝবে, রূপসী তার আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে। রূপসী এমনভাবে এসেছে যে পিছনের সেতু পুড়ে গেলেও কিছু এসে যাবে না। উঃ কী সুন্দর এই কলকাতা! এখানে টাকা নিয়ে পাগলামি নেই। এখানে মানুষ এখনও স্বাভাবিক। সবার উপরে অর্থ সত্য এই কথাটা এখানে পৌঁছয়নি। রূপসী নিশ্বাস নিয়ে বাঁচতে চায়—যে বাতাসে রুপোর গন্ধ নেই। বিয়েটা ভাঙছে—কিন্তু কিছু করার নেই। তৃতীয় একটা শরীর নিয়ে টানাটানি হলে তবেই বিয়ে ভাঙবে এমন কথা নেই। আত্মারও একটা ভূমিকা আছে বিবাহিত জীবনে।

ঘুম থেকে উঠে ভুজিয়াওয়ালার দোকানে গিয়েছিল রূপসী। গরম মুড়ি এনেছে। দিদিমণির ওই কাণ্ড দেখে কাজের লোক মোক্ষদা অবাক। মোক্ষদার ধারণা দিদিমণি কেক খাবে।

হেসেছে রূপসী। কেক কিনে বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে ওর হাতে টাকা দিয়েছে রূপসী। গতকালই এয়ারপোর্টে বেশ কিছু ডলার ভাঙিয়ে নিয়েছে রূপসী।

একখানা 'লাইলন' শাড়িও পেলো মোক্ষদা। খুব খুশি—এখন পরবে না, পুজোর সময় ঠাকুর দেখতে বেরুবে 'লাইলন' পরে।

'আশীর্বাদ করছে মোক্ষদা। "মায়ের দুঃখু দূর করো, এবার পেটে ছেলে ধরো। এবারেই ছেলে পেটে নিয়ে এখানে চলে এলে না কেন? মা যত্ন-আত্তি করতো।"

"ছেলে ধরায় অনেক সুখ গো, দিদিমণি। তোমার মাকে জিজ্ঞেস কোরো।"

মোক্ষদা জানালো সে তিনবার পেটে ধরেছে, আরও ধরতো।

"ধরলে না কেন?"

"ওই যে, পেটের চিন্তা! একবার পেট হওয়া মানেই আর একটা পেট নিয়ে আসা। প্রতিদিন পেট ভরাতে হয়, দিদিমণি।"

রূপসীর গাড়ি এসে গিয়েছে। মামার পরামর্শে সারাদিনের জন্যে গাড়ি ভাড়া করেছে সে। ট্যাক্সি ধরার ঝামেলা নেই, একটু খরচ বেশি, কিন্তু নিজের গাড়ির মতন। আসলে মোর দ্যান নিজের গাড়ি, ক্লিভল্যান্ডে নিজের গাড়ি আছে কিন্তু চালক নেই—আপনা হাত জগন্নাথ!

এখন কী করবে রূপসী? আত্মীয়দের কাছে যাবার ইচ্ছে নেই রূপসীর। ওর কী রকম একটা ভয়, জেরার মুখে অনুরাগের খবরটা বেরিয়ে পড়বে। এমনিই তো মা-মাসিদের ধারণা, বিয়ে ভাঙবার জন্যেই ওদেশে লোকে বিয়ে করে। ওরা বোঝে না, মানুষের একটামাত্র জীবন। ঘরসংসার তো যাবজ্জীবনের জেলখানা নয়—শাস্তির কোটা শেষ হলে আবার মুক্তি।

রূপসীর মনে পড়লো, বিয়ের পরে অনুরাগের সঙ্গে একটা ছবি দেখতে গিয়েছিল। মনে দাগ কাটবার মতন ছবি। একজনের সংসার ভেঙেছে—বউ চলে গিয়েছে। শূন্য সংসারে লোকটা কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। তখন সে ফিরে এলো ছোট্ট শহরে যেখানে সে পড়াশোনা করেছিল। সেখানে সে ছাত্রজীবনে ডায়রি খুলে বসলো—কাদের সঙ্গে ভাব ছিল, একটু-আধটু ডেটিং ছিল। তাদের খুঁজে-খুঁজে ফোন করতে লাগলো নিঃসঙ্গ লোকটি।

এখানেও অনেক ঘটনা ঘটেছে রূপসীর জীবনে। ছাত্রী অবস্থায় অনেক গল্পগুজব করেছে ওরা। রাস্তায় হেঁটেছে, লেকে বসেছে, সিনেমায় গিয়েছে, কফি হাউসে ভিড় করেছে। দু'একজন ছেলে বন্ধু ছিল, কিন্তু বেশির ভাগই বান্ধবী।

ডায়রি রাখার অভ্যাস ছিল না। কিন্তু নামগুলো এখনও বিস্মরণ হয়নি। আমেরিকান নোট বইতে নামগুলো লিখতে আরম্ভ করলো রূপসী।

এবার সুমিত্রার কথা মনে পড়ছে। ওদের সঙ্গে পড়তো, হাসিখুশি প্রাণবন্ত মেয়ে। খুব পিছনে লাগতো কল্যাণ সেনের। কল্যাণ থেকে ক্যালি—তারপর কালো—অবশেষে কেলো। সহপাঠিনীরাও আজকাল হেকো, ডেকো, কেলো এইসব নাম দেয়। অধ্যাপক পঞ্চানন চক্রবর্তীর নাম দেওয়া হয়েছিল পেঁচো।

এই কল্যাণকেই শেষ পর্যন্ত বিয়ে করলো সুমিত্রা। সুখী দম্পতি। রূপসীর

বিয়ের সময় ছেলেকে নিয়ে এসেছিল। সবে তখন সেকেন্ড চাইল্ড হয়েছে, ওকে আনেনি। ব্যালানস্‌ড ফ্যামিলি পোর্টফোলিও—এক ছেলে, এক মেয়ে। কল্যাণ নামকরা কোম্পানিতে ভালো কাজ করে। বাড়িতে টেলিফোন ছিল। নিজেদের গাড়ি। ওরা ভেরি ভেরি হ্যাপি।

"কল্যাণ, এখনও সেতার প্র্যাকটিশ করছো তো?" রূপসী জিজ্ঞেস করেছিল। সুমিত্রা বলেছিল, "করতেই হবে। মার্চেন্ট অফিসের বক্সওয়ালাকে বিয়ে করতাম না। রবিশঙ্করের সেতারের আসরেই তো ওর সঙ্গে আলাপটা জমলো কলামন্দিরে। ওখানেই তো জানলাম, ও একটু-আধটু সেতার বাজায়।"

সুমিত্রার ফ্ল্যাটে বেল বাজলো। ও নিজেই দরজা খুললো।

"চিনতে পারছিস?"

"ওমা! রূপসী, তুই? কবে এলি ইউ-এস-এ থেকে?"

"এসেছি হঠাৎ—তোদের খোঁজখবর করতে। কল্যাণ কীরকম সেতার-টেতার বাজাচ্ছে খোঁজ করতে।"

সুমিত্রার কাপড়টা একটু ময়লা। "বর ট্যুরে গিয়েছে বুঝি? তাই এইরকম বেশবাস!"

অনুরাগের খবর চাইবার আগেই ও আক্রমণ করতে চায়। হয়তো অনুরাগের রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা জিজ্ঞেস করে বসবে। ও তো জানে না গত চার বছর একবারও গান গাইতে বসেনি অনুরাগ।

ওকে একটা ফরাসি পারফিউম উপহার দিলো রূপসী। নাম 'পয়জন'—বিষ। "তবে খাবার জন্যে নয়—বরের মন যাতে অন্য কোনো রমণী বিষাক্ত না করতে পারে তার জন্যে সুগন্ধের মোহমায়া। যখন বরের সঙ্গে কোম্পানির পার্টিতে যাবি—সুরক্ষা হিসেবে ব্যবহার করবি।"

সুমিত্রা উপহার নিয়েও রসিকতার উত্তর দিলো না। টেলিফোন নিয়েও কথা উঠলো। রূপসী এন অ্যান্ড ডি কোম্পানির নাম ডাইরেক্টরি বার করে তাতে কল্যাণের রেসিডেনসিয়াল ফোন নম্বর বার করেছিল। যতবারই ফোন করে একটা যান্ত্রিক অথচ ভূতুড়ে কণ্ঠস্বর ঘোষণা করে,—এই লাইন নেই, দিস লাইন ডাজ নট এগজিস্ট। কখন হয়তো বলে বসবে, কলকাতা ডাজ নট এগজিস্ট!

সুমিত্রা এবারেও চুপ করে রইলো। ওকে এক কাপ চাও খাওয়াতে পারলো না। বললো, "গ্যাস ফুরিয়েছে। তুই বরং একটু চিনির সরবৎ খা। কিন্তু ঠাণ্ডা হবে না।" ওটা ভালোই রূপসীর পক্ষে—গলাটা ঠিক নেই।

ছেলেমেয়েসহ সুমিত্রা ও কল্যাণের ছবি খাবারের টেবিলে রয়েছে। সুখী পরিবার বলতে যা বোঝায়। হরলিক্‌সের সুচিত্রার সংসারের সঙ্গে তুলনা করা

যায়। কল্যাণের সঙ্গে প্রেমের একটা সার্থক পরিণতি হয়েছে—নট লাইক অনুরাগ ও রূপসী।

"কল্যাণ যথেষ্ট সময় দেয় তোকে?" জিজ্ঞেস করে রূপসী।

"যত ইচ্ছে সময়। ওটা কোনো প্রবলেম নয়, রূপসী।"

"অ্যাটেনশন? তোর উপর নজর?"

"সে তো দেবেই। বউ ছাড়া অন্য কাউকে নজর দেবে কোন দুঃখে? বউ তো এখনও দাঁতফোকলা বুড়ি হয়নি।"

রূপসীও দাঁতফোকলা বুড়ি হয়নি। অন্য কোনো মেয়েও উপস্থিত হয়নি অনুরাগের জীবনে। তবু অসুবিধা এসেছে। টাকার পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছে অনুরাগ—এই নেশা মদের নেশা, মেয়েমানুষের নেশা, খ্যাতির নেশা থেকেও ভয়ঙ্কর। এর কিছুতেই নিবৃত্তি নেই।

কিন্তু সুমিত্রার মুখ শুকনো কেন? প্রাউড মাদার। হ্যাপি হাউজওয়াইফ। সুখী দম্পতি।

ব্যাপারটা জানা গেল। সুমিত্রাই আস্তে-আস্তে বললো, চেপে রাখলো না। "তুই তো জানতিস বিয়ের পর বাড়ি থেকে চলে এসেছিল। কোম্পানিই সব দিয়েছিল—ফ্ল্যাট, গাড়ি, ফোন।"

"এন অ্যান্ড ডির খবর কাগজে পড়িসনি?" সুমিত্রা জিজ্ঞেস করছে।

"পৃথিবীতে কত কোম্পানি রয়েছে। তাদের খবর আমেরিকান কাগজে বেরোয় না। বিশেষ করে ইন্ডিয়ার খবর—এসবে ইউ-এস-এতে কারও কোনো আগ্রহ নেই।"

এন অ্যান্ড ডি আট মাস ধরে বন্ধ। অসুস্থ কোম্পানি। কবে খুলবে ঠিক নেই—আদৌ খুলবে কি না কেউ জানে না। প্রথম কয়েক মাস অফিসাররা কিছু মাইনে পেয়েছিল। এখন সবকিছুই অনিশ্চিত।

যেখান থেকে কল্যাণ গাড়ি নিয়েছিল কিস্তিতে তারা গাড়ি নিজেদের কাছে ধরে রেখেছে। লিজিং কোম্পানি একটু বেশি সাবধানী। ফ্রিজটা বিক্রি করে দিয়েছে সুমিত্রা। ফোনের বিল দেওয়া হয়নি। ফোন কেন কাটা, ভাগ্যিস ওই যান্ত্রিক কণ্ঠের মহিলা তা ফাঁস করে দেয় না, শুধু বলে এই নম্বর নেই। ও ফিকস্ড ডিপোজিটগুলো অকালে তুলে নেবার জন্যে ধরাধরি করতে গিয়েছে। জীবনবীমার প্রিমিয়ামও দেওয়া হয় না।

ওর সঙ্গীতের সাধনা অন্তত চলছে, আশা করে রূপসী। "দুঃখের মধ্যেও সুর বেঁচে থাকে, সুমিত্রা। সুর মানুষকে শক্তি দেয়।"

সুমিত্রা একমত হলো না। "ছেলে ও মেয়েকে বাধ্য হয়ে ইংরিজি ইস্কুল থেকে সরিয়ে আনার পর সুর কোনো শান্তি দেয় না, রূপসী।"

"ওর সাধের সেতারটা বিক্রি করে দিয়েছে কল্যাণ। ভালো দাম পেয়েছিল, কেন ছাড়বে?"

"এক-এক সময় মনে হয় যৌথ পরিবার ছেড়ে না চলে এলেই ভালো হতো। ছেলেমেয়ের কষ্ট কম হতো—সব ভাইয়ের অফিস তো একসঙ্গে বন্ধ হয় না?"

সুমিত্রা বিদায়বেলায় বলেছিল, "আমাদের সব আছে রূপসী—স্বাস্থ্যবান সন্তান, ছোট্ট গৃহকোণ, দাম্পত্যপ্রেম, রুচি, ভগবানে বিশ্বাস। কিন্তু এক অভাবে সব পাওয়া নষ্ট—টাকার অভাবে।"

আজ কল্যাণীর কথা মনে পড়লো রূপসীর। ইস্কুলে ওর প্রিয় বান্ধবী ছিল। তারপর একসঙ্গে উচ্চমাধ্যমিক পড়লো একই কলেজে।

কল্যাণীকে সবাই একটু হিংসে করতো। ওর সৌন্দর্যের জন্যে। ভারি মিষ্টি দেখতে—সবাই জানতো একবার দেখলেই বিয়ে হয়ে যাবে। বিয়েতে কোনো কষ্ট হবে না। নিজের সৌন্দর্য সম্বন্ধে ওর কোনো চেতনা ছিল না। কিন্তু ক্লাসের ফার্স্ট গার্ল ইন্দিরা পর্যন্ত ওকে সমীহ করতো।

কালো ও ঈষৎ রোগা ইন্দিরা বলতো, "পড়াশোনায় ভালো হলে মেয়েদের কোনো লাভ হয় না, রূপসী। এই কল্যাণীর দেখবি কত ভালো বিয়ে হয়ে যাবে; আর আমাকে তখনও চাকরি করে মরতে হবে। যদি দেখি আমি যে-অফিসের কেরানি সেই অফিসের বসের গিন্নি হয়েছে কল্যাণী তাহলেও আশ্চর্য হবো না। তখন তো ওকে ম্যাডাম বলে ডাকতে হবে।"

কল্যাণীর ঠিকানা খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে না। ওর বিয়ের কার্ড রূপসীর মা আমেরিকায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। লিখেছিলেন কলকাতায় বিয়ে হচ্ছে। তারপর তাজুদি দুঃখ করেছিলেন, "শুধু আমার মেয়েরই বিয়ে হলো সেই ধ্যাধ্বেড়ে গোবিন্দপুরে।"

কল্যাণীর বাপের বাড়িটা রূপসীর স্মরণে আছে। ওখানে একবার মাসিমার সঙ্গে দেখা করে ঠিকানাটা নিয়ে এলেই হলো। সঙ্গে সারাক্ষণের গাড়ি রয়েছে, কোনো অসুবিধে নেই।

কল্যাণীকে উপহার দেবার জন্যে রূপসী নিয়েছে বিখ্যাত আমেরিকান সাবান। প্রোকটর অ্যান্ড গ্যামবেলের তৈরি ক্যালি সোপ। ঠিক যেন ক্রিম দিয়ে তৈরি—মেয়েদের নরম শরীরকে আরও নরম করে দেবে। রূপসীর জন্মদিনে কল্যাণী একবার লাক্স টয়লেট সোপ উপহার দিয়েছিল, বেশ মনে আছে।

গাড়ি এসে থামলো সরু গলির সামনে। পায়ে হেঁটে রূপসী হাজির হলো কল্যাণীর বাপের বাড়ির দরজায়।

কল্যাণীর মা খুব খুশি হলেন। "ও মা! তুমি তো মোটেই মেমসায়েব হওনি!

ঠিক যেমনটি ছিলে তেমনটি রয়েছো!"

কল্যাণীকে যে ওইখানেই পাওয়া যাবে তা রূপসী প্রত্যাশা করেনি। একি হাল হয়েছে কল্যাণীর! রূপ কোথায় চলে গিয়েছে! মাথার কয়েকটা চুল এই বয়সেই সাদা হলো কী করে?

সাবানটা ওর হাতে তুলে দিলো রূপসী। কল্যাণী বললো, "ভালো আছিস নিশ্চয়। সুখে থাক, সুখে থাকাটা খুব দরকার রূপসী।"

স্বামীর প্রসঙ্গ তুলতে চায় না রূপসী। লোকে যখন ভাবছে তার সুখ রয়েছে তখন ভাবুক না।

কল্যাণী বললো, "যদি বসিস তা হলে ট্যাক্সি ছেড়ে দে। শুধু-শুধু টাকা নষ্ট করবি কেন?"

রূপসী লজ্জা পেলো। বোঝাতে হলো সারাদিনের জন্যে ব্যবস্থা। কলকাতার সব রাস্তা সে বুঝতে পারে না। কল্যাণী বললো, "সত্যিই তো পারবি কী করে? এ তো ক্লিভল্যান্ডের রাস্তা নয়।"

কল্যাণীকে বিকেলে বাড়িতে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দিয়েছিল রূপসী। ও কিছুতেই রাজি হলো না। অন্য কাজ আছে।

এরপর কল্যাণী একবার বেরিয়েছিল রাস্তার দোকান থেকে জিলিপি কিনতে। বাড়িতে অন্য কোনো লোক নেই।

সেই সময় মাসিমা দুঃসংবাদটা দিয়েছিলেন। "কল্যাণী এখন বাপের বাড়িতেই রয়েছে। খুব বিপদ চলেছে।"

"কার যে কখন বিপদ আসে মা, এদেশে। ভালো ছেলে দেখে বিয়ে দিলাম। তারপর আপিসে কী একটা গণ্ডগোল। ওদের ডিপার্টমেন্টের সায়েব আর জামাইকে পুলিশ একই সঙ্গে অ্যারেস্ট করলো। অফিসের হিসেবপত্তরের ব্যাপারে মামলা হলো।"

খারাপ খবরটা হলো, কল্যাণীর স্বামী এখন জেলে। 'দু'বছর জেল হয়েছে।

কল্যাণী ফিরে এসেছে। সঙ্গে জিলিপি। "মনে আছে তোর? জিলিপি খেতে খুব ভালোবাসতিস?"

"জীবনটাই তো জিলিপির প্যাঁচ!" রূপসী বললো।

"ওর শরীরটা ভীষণ ভেঙে গিয়েছে", কল্যাণী স্বামী সম্বন্ধে বললো। "মনে লেগেছে খুব।"

কল্যাণীর মুখেই শুনলো, কল্যাণীর স্বামীর কোনো দোষ ছিল না। চুরি করেছিল অফিসারের ম্যানেজার।

মায়ের মুখেই রূপসী শুনলো, ম্যানেজার ছাড়া পেয়েছে বিচারে। মস্ত উকিল এস দত্ত ম্যানেজারের হয়ে এমন আর্গুমেন্ট করলো তিন দিন ধরে!

কল্যাণীর স্বামীর পক্ষেও দত্তমশায়ের সওয়াল করার অসুবিধে ছিল কোথায়? রূপসী ভাবছে।

মাসিমা বললেন, "ওই উকিলের যা ফি! অত টাকা দিয়ে আমরা কী করে ওঁকে রাখতে পারবো? আমাদের কম দামের জুনিয়র উকিল।"

মাসিমার শেষ কথা, "আমাদের কপাল পুড়লো, মা। আমার নির্দোষ জামাই জেল খাটছে টাকার অভাবে, স্রেফ টাকার অভাবে!"

অনেক কষ্টে মাধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করলো রূপসী। মাধুরী সুন্দর ছবি আঁকতো। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে বড় আর্টিস্ট হতে পারতো।

সেই মাধুরী এখন চামড়ার ব্যাগ তৈরির কারখানায় কাজ করে।

"এই ব্যাগ তো তোদের ইউ এস এ-তেও যায়! মিসেস মোরারকা তো বড়লোক হয়ে গেলেন চামড়ার ব্যাগ এক্সপোর্ট করে।"

মাধুরী দিন-রাত খেটে কোনোক্রমে মাসে পাঁচশো টাকা বাড়িতে আনে।

মাধুরীকে নিয়ে রূপসী এসেছে কোয়ালিটি রেস্তোরাঁয়। অর্ডার দিয়েছে খাবারের।

"এই, এতো অর্ডার দিস না। অনেক টাকা লেগে যাবে। টাকা নষ্ট করিস না—কখন টাকার দরকার হবে কিছু ঠিক নেই।" মাধুরী বলেছে।

মাধুরী নিজেও একসময় এইভাবে রেস্তোরাঁয় অনেক টাকা খরচ করেছে। তখন স্বামীর উপর কন্ট্রোল ছিল। ভেবেছিল এইভাবেই দিন কাটবে।

"জানিস রূপসী, দুষ্টু গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো।"

মাধুরীর ডাইভোর্স হয়ে গিয়েছে। "হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না, রূপসী। নির্লজ্জভাবে অন্য মেয়ের সঙ্গে শোবে আর আমাকে তা মেনে নিতে হবে?"

মাধুরীর মা তবু চাপ দিয়েছিলেন, মানিয়ে-শুনিয়ে চলতে। "মা বোঝেন না। আমার শরীরে কখন রোগটোগ ঢুকিয়ে দিতো। এক-একটা লোকের কোনো দয়ামায়া থাকে না।"

"আমি মিসেস মোরারকার ওখানে কাজ পেয়ে বেঁচেছি ভাই, যত কম মাইনেই হোক। মায়ের ভীষণ দুশ্চিন্তা ছিল, স্বামীর ঘর থেকে বেরিয়ে এলে খাবো কী?"

"হ্যাঁরে, আসল কথাটার উত্তর দে। এই যে ব্যাগ এক্সপোর্ট হচ্ছে, এতে কত সংসার টিকে রয়েছে। মিসেস মোরারকা বলছিলেন, হঠাৎ নাকি হাওয়া বদলাতে পারে। এই ধরনের জিনিস মেমসায়েবদের পছন্দ নাও হতে পারে। আউট অফ ফ্যাশন হলে আমাদের অনেকের সর্বনাশ হবে। তুই তো ওখানে রয়েছিস, একটু নজর রাখিস।"

রূপসী অসহায় বোধ করলো। ওখানে রূপসীর কথা শুনবার মতন কে আছে? আর রূপসী তো আদৌ ফিরবে না বোধহয়। মাধুরী তা জানে না।

বাড়ি ফিরবার সময় রূপসীর মা আঁচলে চোখ মুছলেন। "সতী সাবিত্রী হও মা। আমার দুঃখ তো ভগবান বুঝলেন না।" ডাইভোর্সের দুঃখ নয়। মাসিমা বললেন, "ওই তো আমার মাসতুতো দিদির মেয়েরও তো ডাইভোর্স হলো। জামাইদা মস্ত উকিল—আবার বিয়ে দিয়ে দিলেন। আমার মেয়েটার আবার বিয়ের কথা ভাবতে পারলাম না টাকার অভাবে।" এই বলে মাসিমা আবার চোখ মুছলেন।

মাধুরী রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিল রূপসীকে। বলেছিল, "আমার কপাল। নিশ্চয় স্বামী যা চাইতো তা দিতে পারিনি। স্বামীকে সুখী রাখিস ভাই, বিশেষ করে একটু সারপ্রাইজ, একটু রোমান্স। ও-দেশের মেয়েরা কী করে রে স্বামীকে অনুরক্ত রাখতো?"

রূপসী উত্তর দেয়নি। ওর মনে পড়লো, অনুরাগের মধ্যে রোমান্সের সব ধারা শুকিয়ে গিয়েছে—এক-একটা ঝরনাধারা যেমন আচমকা শুকিয়ে যায়। তবে অন্য কোনো রমণী নেই, স্রেফ অর্থ। ওনাসিসের জীবনী বেরিয়েছে—চাঞ্চল্যকর বই। যে মানুষ বিশাল ধনী হয়েও রোমান্স চালিয়ে গিয়েছে—মারিয়া কালাস, জেকলিন কেনেডি এদের শয্যাসঙ্গিনী করেছে। জিনিসটা সহজে হয়নি নিশ্চয়—যাই বলুক, আমেরিকার সবচেয়ে বিখ্যাত বিধবার মন জয় ছেলেখেলা নয়। অনুরাগ প্লেনে বসে, বিজনেসের মাঝে-মাঝে বইটা পড়েছে এবং রূপসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। রূপসী ভেবেছে, অনুরাগ অন্তত প্রেমের পাঠ কিছুটা নতুন করে শিখেছে।

কিন্তু ব্যাপারটা অন্য। ওনাসিসের প্রেমপর্বগুলো ওর মাথাতেই ঢোকেনি। ওর নজরে পড়েছে, কোনো মূলধন ছাড়াই ওনাসিস পৃথিবীর বিখ্যাত ধনী হয়েছেন। প্রথম প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল ইস্কুলের ছাত্র হিসেবে। একবার ইস্কুল যেতে যেতে ওনাসিস দেখলো একটা দোকান পুড়ে গিয়েছে। পোড়া জিনিস জলের দরে বিক্রি হচ্ছে। জলখাবারের পয়সা দিয়ে ওনাসিস সমস্ত আধপোড়া পেনসিল কিনে নিলো। তারপর কিনলো একটা ছুরি। ধৈর্য ধরে সমস্ত পেনসিলগুলো সে ব্যবহারের উপযোগী করলো। এবার সেগুলোই সস্তা দরে বেচে দিলো নিজের সহপাঠীদের মধ্যে—বেশ কিছু টাকা জমিয়ে ফেললো ওনাসিস।

মিসেস কেনেডি, মারিয়া কালাস এদের কী করে জয় করলো ওনাসিস তা লক্ষ করবার সময় নেই অনুরাগের। টাকা যদি জল হয় তা হলে গুজরাতিরা

মাছের মতন—সাঁতার শিখতে হয় না ওদের। রূপসী সমস্ত রাগটা জাতের উপর চাপিয়ে হাল্কা হতে চায়।

টাকার ব্যাপারটা ভালো নয়। সেই কত দিন আগে পিটার কুপারের লেখায় রূপসী পড়েছিল। সেই মোজেসের সময় থেকে টাকা নিয়ে যারা মাতামাতি করে তারা বিপজ্জনক লোক।

কলকাতায় যখন রূপসী ফিরে এসেছে তখন অতোটা চিন্তা নেই। বাঙালিরা যে টাকার চাকর নয় তা অনুরাগকে রবীন্দ্রনাথ ও রামকৃষ্ণের রচনা থেকে শুনিয়ে দিয়ে এসেছে রূপসী।

এখন একবার সুলতার খোঁজ করা যাক। সুলতা সান্যাল। কী চমৎকার নাচতো সুলতা—নটীর পূজায় অংশ নিয়ে রুপোর মেডাল পেয়েছিল ইস্কুলে। সুলতা তখন হিরোইন—ওর সঙ্গে একটা গ্রুপ ফোটোতে দাঁড়িয়েছিল রূপসী।

সুলতাকে সারপ্রাইজ দেবে রূপসী। ওকে একটা লেডিজ হ্যান্ডব্যাগ উপহার দেবে। ক্লিভল্যান্ডের ভালো দোকান থেকে কিনেছিল—স্প্রিং কালেকশন, বসন্ত সংগ্রহ। অবশ্য জানা ছিল না, জিনিসগুলো এই কলকাতা থেকেই যায়।

সুলতার মা ও বাবা দু'জনে বাড়িতে ছিলেন। রূপসীকে চিনতে পারলেন। বললেন, "ওমা! কী সুন্দর দেখতে হয়েছে!" এরপর একটা পিক্যুলিয়র বক্তব্য। "স্বামীর ভালোবাসার জল না পেলে এমন শ্রী হয় না মেয়েদের।" বয়োজ্যেষ্ঠরা জানে না, প্রসাধনী কোম্পানিরা পিছনে থাকলে এবং শরীরের মালিক একটু সচেতন থাকলে শরীরটা অন্য কারও দয়াদাক্ষিণ্য ও জলসিঞ্চন ছাড়াই থাকতে পারে। শরীর কখনও-কখনও মনকে ফাঁকি দিতে পারে।

ভীষণ বোকামি করেছে রূপসী। সুলতা কোথায় জিজ্ঞেস করতেই মাসিমা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। "তুমি জানো না সুলতার খবর?"

সুলতা নেই। বিয়ের এগারো মাস পরে সুলতা রান্নাঘরে স্টোভের আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছে। হাসপাতালে তিন দিন যুদ্ধ করেছিল। যাবার সময় বলে গিয়েছে, দুর্ঘটনা। কেউ দায়ী নয়। কিন্তু মাসিমা জানেন, ওটা দুর্ঘটনা নয়, আত্মহত্যা। নিজের প্রাণ নষ্ট করে সুলতা শান্তি পেয়েছে শ্বশুরবাড়ির অপমান থেকে।

কী আশ্চর্য, শ্বশুরবাড়ির উপরে প্রচণ্ড বিরক্তি দেখাচ্ছেন না সুলতার মা, কোনোরকম প্রতিশোধের আগুনও জ্বলছে না ওঁর মনে।

সুলতার বৃদ্ধ বাবাও বারান্দায় চুপ করে বসে বাংলা কাগজ পড়ছেন। "দোষটা আমাদেরও, মা। বিয়ের কথাবার্তার সময় উনি লম্বা-চওড়া কথা বলে এলেন। এই দেবো, ওই দেবো। বিয়ের সময় দিলেন না, মাসের পর মাস কথার খেলাপ

করলেন। শ্বশুর শাশুড়ি বললেন, জোচ্চোরের মেয়ে। সুলতার মনে লেগে গেল। আমি তো ওঁকে বলি, যা দেবে না তা বলতে গেলে কেন?"

সুলতার বৃদ্ধ বাবা অসহায়ভাবে কাগজ থেকে মুখটা বার করে নিলেন। কী আশ্চর্য, দোষটা তিনি নিজের ঘাড়ে নিচ্ছেন। "রূপসী, তোমরা মা আমাকে ভুল বুঝো না। আমি অস্বীকার করছি না কথার খেলাপ করেছি। জিনিসগুলোর যে অতো দাম তা আমার জানা ছিল না। দেওয়া হলো না স্রেফ টাকার অভাবে।"

না, মেয়েদের সঙ্গে আর দেখা করবে না রূপসী। কিছু ছেলেকেও তো চিনতো রূপসী। শুভজিত মিত্র—পড়াশোনায় অতো ভালো হয়েও মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিল। বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে কতো কষ্ট স্বীকার করেছে শুভজিত।

শুভজিত কি এখনও বিপজ্জনকভাবে বেঁচে রয়েছে? সিস্টেমটা ভেঙেচুরে মানুষের উপযোগী করে তোলার স্বপ্ন দেখতো শুভজিত। তার জন্যে যদি রক্তপাত হয় হোক। এতো মানুষ রয়েছে এই দেশে—কিছু ঘর শূন্য হয়ে যদি ভবিষ্যৎটা নিশ্চিত হয় হোক।

শুভজিত সেই শহিদনগর কলোনির ছিটেবেড়ার ঘরে নেই। শুভজিত উঠে গিয়েছে যোধপুর পার্কে। শুভজিতের ওয়াইফ বললো, বম্বে থেকে ফিরে এয়ারপোর্ট থেকে সোজা কাজে চলে যাবে শুভজিত।

কাজ বিদেশি কোম্পানিতে। মিডলটন রো-তে ওর অফিসে ধাওয়া করেছে রূপসী। শুভজিত বলতো, টাকা থেকেই সব গোলমাল। পৃথিবীতে যত নোংরা শক্তি আছে তার মধ্যে 'মানি পাওয়ারই' সবচেয়ে নোংরা।

শুভজিত-এর জন্যে ছোট্ট একটা আয়না এনেছে রূপসী—মেড ইন ফ্রান্স; বিপ্লবের ধাত্রীভূমি। আমেরিকার কিছু তো ও নেবে না।

শুভজিত সুন্দর সুট পরেছে—চমৎকার শার্ট—ব্রাইট টাই। শুভজিত বললো, "এসব বিলিতি নয়, এ দেশেই তৈরি হচ্ছে। পার্ক অ্যাভিন্যু কলেকশান।"

শুভজিত মেড-ইন-ইন্ডিয়া কাপে কফি খাওয়ালো। লেডি সেক্রেটারির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো। "আমাদের কলেজ বান্ধবী—এখন ইউ এস এ-তে সুখী জীবন। জাতীয় সংহতির মূর্ত প্রতীক—বিয়ে করেছে গুজরাতি সায়েনটিস্টকে।"

সংশোধন করে দেওয়া উচিত ছিল—সায়েনটিস্ট নয়, গুজরাতি রিয়াল এস্টেট স্পেকুলেটরকে। কিন্তু পারলো না রূপসী।

শুভজিতের সেই সব স্বপ্নের কী হলো! 'বাবা ও মা বাঁচিয়ে দিলেন—ফিরে আসতে সাহায্য করলেন। আন্দোলনটার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কিছু হলো না—ছেলেগুলো টিকে থাকতে পারলো না।"

"কেন? এমন তো কথা ছিল না।"

শুভজিত অবাক করে দিলো। "আমি অনেক ভেবে দেখেছি, রূপসী। অতো কষ্ট, অতো রক্তপাত ব্যর্থ হলো স্রেফ টাকার অভাবে।"

তার অর্থ, আজকাল বিপ্লবও হবে না টাকা ছাড়া! শুভজিত অফিসের কাজে একটা ট্রাঙ্ককল্ বুক করলো দিল্লিতে। তারপর বললো, "সমগ্রর স্বার্থ ছেড়ে এমন কয়েকজনের স্বার্থ নিয়েই বেঁচে থাকার চেষ্টা চালাচ্ছি, রূপসী। দেখি, তোমার উপহারটা দাও। ফ্রান্সের আয়নায় আমাকে কীরকম লাগছে দেখি।"

যাবার আগে রূপসী জানতে চেয়েছিল, "সুন্দরবনের সেই জঙ্গলঘাঁটি থেকে এই পার্ক অ্যাভিন্যু তো অনেক দূরে। পৌঁছলে কী করে?"

শুভজিত বললো, "সুন্দরবন হাইড-আউটে যারা ছিল তাদের কেউ বেঁচে নেই, আমি ছাড়া। আমিও বাঁচতাম না, যদি-না আমার মায়ের কিছু পিতৃদত্ত গহনা থাকতো। যদিও দুঃখ থাকে, তবু বলতে পারো, টাকার জোরেই আমি বেঁচে গিয়েছি।"

এইসব লোককে আয়না উপহার দিতে নেই। হয়তো শুভজিত ভুল বুঝলো, কিন্তু বুদ্ধিমান ছেলে, হজম করে গেল। বললো, "একটা টাইম দাও। টলিতে নিয়ে যাবো, রীণাও সঙ্গে থাকবে। টলির চিকেন টিক্কা কাবাব তোমার ভালো লাগবে।"

রূপসী যে বিয়ের পর চিকেন কেন মাছও ছেড়ে দিয়েছে তা বললো না। অনুরাগের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। সবচেয়ে দুঃখের, যার জন্যে রূপসী নিরামিষাসী হলো সেই অনুরাগ এখন বিজনেসের প্রয়োজনে মাংস খায়। বিফ পর্যন্ত। শ্বশুরবাড়ির লোকরা বিশ্বাস করবে না। ভাববে বাঙালি বউয়ের খপ্পরে পড়েই অনুরাগের এই অধঃপতন হলো।

টেলিভিশনে শ্যামলদাকে দেখে উল্লসিত হলো রূপসী। লেনিনের ছবিতে মালা দিচ্ছেন শ্যামলদা, খুব ধীরে-ধীরে, যাতে টি ভি ক্যামেরাম্যানকে কষ্ট পেতে না হয়। তারপর আরও একটা সাক্ষাৎকার। বেলভিউ থেকে বেরিয়ে আসছেন শ্যামলদা লাটসায়েবের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে। এখানেও টিভি ক্যামেরাম্যানকে যাতে হুটোপাটি না করতে হয় তার জন্যে শ্যামলদা খুব ধীরে-ধীরে হাঁটলেন।

শ্যামলদা অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু জেলে সময় কাটিয়েছেন অনেক। নিজের জন্যে কখনও ভাবেননি। পার্টি অফিসে একটা বেঞ্চিতে পড়ে থাকতেন। যা মাইনে পেতেন তার প্রায় সব চলে যেতো পার্টি ফান্ডে—কিন্তু স্বপ্ন ছিল অনেক, মানুষের মঙ্গল হবে এমন কিছু করবেন।

সেই সুযোগ অনেক সাধনার পরে এসেছে। ক্ষমতায় এসেছে শ্যামলদার দল। ওয়ান্ডারফুল—মানুষের দুঃখ যারা মনে-প্রাণে বুঝেছে তারা ক্ষমতায় এলে মানুষের মঙ্গল হতে বাধ্য। রূপসীর মনে কোনো সন্দেহ নেই।

শ্যামলদা দেখা করলেন তাঁর দপ্তরেই। রূপসী বললো, "আপনার শেখানো ইংরিজি কাজে লেগে গিয়েছে, শ্যামলদা। আমেরিকায় ইংরিজি নিয়ে আমাকে মাথা ঘামাতে হয় না।"

"শ্যামলদা, আপনারা সুযোগ পেয়েছেন, আমরা ভীষণ খুশি। আমার মনে আছে, আমাদের ক্লাসের অমর যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। আপনি নিজে রিকশ করে ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। দেড় ঘণ্টা আউটডোরে দাঁড়িয়ে রইলেন। ওদের শিথিল কাজকর্মে আপনি বিরক্ত হলেন, ক্লাসে বললেন, সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে এরা কখনোই শায়েস্তা হবে না।"

রূপসীর দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে শ্যামলদা ফাইল সই করতে লাগলেন।

"খুব ব্যস্ত থাকতে হয় আপনাকে, শ্যামলদা?"

"ভীষণ। এই দ্যাখো না, বেলভিউ, উডল্যান্ড, বি এম বিড়লা হার্ট ফাউন্ডেশন, কোঠারি হাসপাতাল সব জায়গাতে যেতে হবে আজকে। প্রত্যেক জায়গায় রয়েছেন ভি-আই-পি অর্থাৎ ভেরি ইমপর্টান্ট পেশেন্ট। লাটসায়েব, পার্টির সিনিয়র কমরেড, কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী, সবাই অসুস্থ। এঁদের তো দেখতে যেতেই হবে—টি ভি আসবে। জনগণকে তো সারাক্ষণ বোঝাতে হবে আমরা হাত গুটিয়ে বসে নেই, আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি।"

"মেডিক্যাল কলেজে যেখানে অমর অজ্ঞান হয়ে যাওয়ায় আপনি কয়েক ঘণ্টা বসে ছিলেন?"

শ্যামলদা হাসলেন। "ওটা তো সরকারি হাসপাতাল—আমাদের অধীনে। ওখানে যাওয়ার উপায় নেই। গেলেই কোনো একটা ছুতোয় ঘেরাও করে বসবে। ওখানে আটকে গেলে উডল্যান্ডে কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রীকে দেখতে যাওয়া হবে না, কেন্দ্র ভুল বুঝতে পারে। ওখানে টি ভি থাকবে—নিশ্চয় দিল্লির খবরেও দেখাবে। তুমি জানো তো কখন জাতীয় কার্যক্রমে ইংরিজি খবর হয়। এখন আমাদের দেখাচ্ছে—অ্যাট লং লাস্ট।"

শ্যামলদার জন্যেও উপহার নিয়ে এসেছে রূপসী। দাড়ি কামানোর ব্লেড। বললেন, "মেড ইন ইউ-এস-এ তো? ভালো করেছো। দাড়ি কামিয়ে সুখ পাওয়া যাবে। টি ভি-তে যা আলো ফেলে—দাড়ি একটু থাকলেই জনগণ বুঝতে পারেন। তোমাকে একটা মজার কথা বলি, রূপসী। আমি রাশিয়া গিয়েছিলাম কয়েক বছর আগে। ব্লেড নিয়ে যাইনি—রাশিয়ান ব্লেড যে অতো খারাপ আমার

জানা ছিল না। টেমপোরারি দাড়ি রাখতে শুরু করলাম। আমি তখনই ফিরে এসে বুঝতে পেরেছি কিছু একটা পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী: ওই দাড়ি কামানোর ব্লেড মানুষ বেশিদিন সহ্য করবে না।”

“কিন্তু শ্যামলদা, দেশের কী অবস্থা হয়েছে! রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, আবর্জনা। লোকে আপনাদের অসৎ বলে না, কুঁড়ে বলে না। জনগণও তো রয়েছে আপনাদের সঙ্গে। আপনি মানুষের ভালোর জন্য বিয়ে করলেন না। সারাজীবন কষ্ট করলেন। অথচ...”

শ্যামলদা ব্লেডের প্যাকেটটা নিয়ে খেলতে লাগলেন। তারপর কী ভেবে দাড়িতে হাত বুলোলেন। “অনেক ভেবেছি, রূপছি, রূপসী। জনগণও একদিন জিজ্ঞেস করবে, সব কিছু থেকেও কোনো কিছু হলো না কেন? উত্তরটা তুমি শুনে রাখো—রাস্তা সারাতে চাই, হাসপাতালে বেড বাড়াতে চাই, ওষুধ বিতরণ করতে চাই, ডাক্তারদের যন্ত্রপাতি দিতে চাই, নার্সদের, কর্মীদের সুখি করতে চাই—কিন্তু ফিনান্স মিনিস্টার টাকা দেয় না। সব ব্যর্থ হলো টাকার অভাবে। দেশব্রতীরা স্বাস্থ্যমন্ত্রী না হয়ে ফাইভস্টার নার্সিংহোমের ভিজিটিং পি-আর-ও হয় টাকার অভাবেই।”

হাতব্যাগে হাত দিতেই একটা লিপস্টিক বেরিয়ে এলো। ফরাসি লিপস্টিক এখন ক্লিভল্যান্ডে সুন্দরীদের বিশেষ প্রিয় হয়েছে। একটা নয়, দুটো নয়, চৌষট্টিটা শেডে পাওয়া যায়। দোকানে গেলে কমপিউটার ম্যাচিং করে দেয়—ঠোঁটের উপর দিয়ে কী এক লেজার আলো চালিয়ে কোন কোন রঙ দিনের কোন সময় কোন জামার সঙ্গে মানাবে তা বলে দেওয়া হয়।

রূপসী দেখলো টকটকে লাল রঙ-এর লিপস্টিক—যার বাংলা নাম করেছিল কণিকা ‘ঠোঁটকাঠি’। আর সেই দুষ্টু ছেলেটা, ভুল করে যার বাবা নাম রেখেছিল সুবোধ, বলেছিল, প্রকৃত বাংলাটা হওয়া উচিত ‘ঠোঁটলাঠি’।

এই গল্পটা অনুরাগকে বলেছিল রূপসী। তখন বিজনেসের বিষ ওর সমস্ত মাথায় ছড়িয়ে পড়েছে। তাৎপর্যটা বুঝবার যখন চেষ্টা করছিল সেই সময় লং ডিসট্যান্স কল্ এলো। পনরো মিনিট ধরে ফ্লোরিডার কোন এক জঙ্গল সম্বন্ধে কীসব আলোচনা হলো, দশ বছর পরে কীভাবে ওই জঙ্গলের দাম দশ গুণ হবে তা এক ডাক্তারকে বোঝালো অনুরাগ। তারপর ওই ঠোঁটলাঠি প্রসঙ্গে ওর আর তেমন আগ্রহ রইলো না। রূপসী বোঝাবার চেষ্টা করলো, ঠোঁট রাঙানো যে লাঠি পুরুষের হৃদয় ভাঙতে সাহায্য করে। যে-জন্যে মেয়েদের ভ্রূকে কামদেবের ধনুর সঙ্গে তুলনা করেছেন সংস্কৃত কবি। পক্কবিম্বোধরোষ্ঠির কথাও উঠেছিল—ওর মাথায় অন্য আইডিয়া খেলে গেল। ফ্লোরিডার ওষ্ঠ

জমিতে ডালিমের চাষ অসম্ভব নাও হতে পারে। কোথায় মেয়েদের ওষ্ঠ আর কোথায় ফ্লোরিডা। দশ বছর পরে রূপসীর ডালিম-ওষ্ঠের দাম যেহেতু দশ গুণ দামি হবে না সেহেতু ফ্লোরিডা এখন অনুরাগের প্রধান আকর্ষণ।

কণিকা দাশগুপ্ত। বিয়ের পরেও কণিকা দাশগুপ্ত থাকলো। "এমন ভেবে-চিন্তে বিয়ে যে নামটাও পাল্টাতে হবে না," কণিকা রসিকতা করে চিঠি লিখেছিল রূপসীকে। উত্তর দিয়েছিল, "যদি সুযোগ হয় দাশগুপ্তমশাইকে নিয়ে এখানে চলে আসিস। গুজরাতি আতিথেয়তার ত্রুটি হবে না বদ্যি দম্পতির জন্যে।" কণিকাও পুরনো রসিকতা ভোলেনি। লিখেছিল, "লিপস্টিক ওখানে খুব সস্তা নিশ্চয়।"

"সস্তা নয়, তবে ভ্যারাইটি। মাথা খাটিয়ে একজোড়া ঠোঁটকে কতরকমভাবে রঙিন করা যায় তা নিরন্তর বার করে যাচ্ছে।"

যতো রঙের লিপস্টিকই বেরুক, শেষ পর্যন্ত বাঙালি মেয়েদের জন্যে লাল ঠোঁটকাঠি। সেই জন্যেই তো ছিল তাম্বুলরাগ—পান খাওয়া রাঙা ঠোঁট। সেই সঙ্গে লালপেড়ে শাড়ি। সিঁথিতে লাল সিঁদুর। বাঙালিরা রাজনীতিতে লাল হলো সেদিন, কিন্তু মনে লাল হয়ে আছে সেই কোন আদিকাল থেকে। অমন যে অমন কালী, তার জিভও লাল!

কণিকাকে পাওয়া গেল। বেরিয়েছিল, ফেরার পথেই দেখা হয়ে গেল। কিন্তু এ কী রূপ কণিকার! একটা কালোপাড় শাড়ি পরেছে কণিকা। কপালে সিঁদুর নেই। ঠোঁটটা ফ্যাটফেটে সাদা। অনেক দিন কোনো প্রসাধনের সঙ্গে যে সম্পর্ক নেই তা বোঝা যাচ্ছে।

কণিকাকে দেখে বুকটা কেমন দুমড়ে উঠলো। রূপসী বললো, "চল, গাড়ি রয়েছে সঙ্গে, আমাদের স্বপ্নের সেই কোয়ালিটিতে গিয়ে একটু বসা যাক।" কোয়ালিটি যে একটা মোস্ট অর্ডিনারি রেস্তোরাঁ তা বুঝতে রূপসীর কয়েক বছর সময় লেগেছে।

কণিকা রাজি হলো না। আজ ওর একাদশী। "তুই একাদশী করিস?" রূপসীর চোখে জল। আমার ধারণা ছিল বিধবারা আচারের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়েছে, অন্তত বাংলায়।

কণিকা হাসলো। "এখনও এক বছর হয়নি, ভাই। সামনের শনিবারে বাৎসরিক। একটা বছর নিয়মকানুন মেনে না চললে ছেলেটার অমঙ্গল হবে। ও অবশ্য যাবার আগে বলেছিল, "তুমি রঙিন শাড়ি পোরো, মাছ খেয়ো, একাদশী কোরো না। আমি ওসব নির্দেশ শুনতে বাধ্য নই, রূপসী। অতোই যদি আমাকে রঙিন শাড়ি পরিয়ে রাখার ইচ্ছে তা হলে বেঁচে থাকলেই পারতো।" কান্নায় ভেঙে পড়লো কণিকা।

এক বছর হতে চললো, এখনও ইনসিওরের টাকা আদায় হয়নি। সবাই চেষ্টা করছে, সবাই চায় বিধবার ভালো হোক, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিয়মকানুনে আটকে যায় "টাকা পয়সার ব্যাপার তো, বুঝলেন কি না।" সবাই বলে কণিকাকে।

এই ইনসিওর থেকে ধার নেওয়ার চেষ্টা করেছিল কণিকা, স্বামীর অসুস্থতার সময়।

"অনেক চেষ্টা হলো, কিন্তু ওকে রাখা গেল না।"

"ভাগ্য!" বললো রূপসী। "তুই কী করবি?"

আবার কান্নায় ভেঙে পড়লো কণিকা। "ভাগ্যের ঘাড়ের আর কতো দোষ চাপাবো, রূপসী? ভাগ্যের তো পিঠ কুঁজো হয়ে যাবার কথা।" কাঁদতে-কাঁদতেই কণিকা বলেছে, "ব্রেনের ব্যাপার তো। মাদ্রাজে একটা ভালো হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলেই ঠিক হয়ে যেতো। ইনসিওর থেকে ধারটা জোগাড় করতে পারলাম না। আমি বিধবা হলাম শুধুমাত্র টাকার অভাবে।" কণিকা মুখ চাপা দিয়ে কাঁদছে।

ব্যাগের মধ্যে রাখা লিপস্টিকটা গাড়ি থেকে সোজা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে রূপসী। একজনের ঠোঁট ভেবে আনা—অন্য কারুর ঠোঁটে যাবার কোনো মানে হয় না।

কণিকার বাবার খোঁজও করেছে রূপসী। শ্রদ্ধেয় লোক যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত। মেদিনীপুরে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। মাতঙ্গিনী হাজরাকে মরতে দেখেছেন পুলিশের গুলিতে। জেলে বহু বছর কাটিয়েছেন।

যতীন্দ্রমোহনবাবু দেশসেবার স্বীকৃতিস্বরূপ তাম্রপত্র পেয়েছেন। স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধী সেবার ওঁর হাতে তাম্রপত্র তুলে দিয়েছেন। দেশের জন্যে সব কিছু দিয়েছেন। এ পাড়ায় গান্ধী বলতো সবাই।

যতীন্দ্রমোহনবাবু স্বাধীনতা-সংগ্রামী হিসেবে পেনশন পেতেন। কারও দাসত্ব তাঁর পছন্দ ছিল না।

রূপসী শুনলো যতীনবাবু তেমন ভালো নেই। কণিকা বললো, "শেষ বয়সে বাধ্য হয়ে বাবা কমপ্রোমাইজ করেছেন। চামারিয়াদের নাম শুনেছিস? ওদের ওখানে কাজ নিয়েছেন বাবা—এই লোকজনকে ধরা, পলিটিশিয়ানদের কাছে যাওয়া পোদ্দারদের ফাইল নিয়ে। হাজার হোক, তাম্রপত্র বিজয়ী হিসেবে বাবার একটা সম্মান আছে।"

চামারিয়াদের ওখানে কেন? ওদেরই তো একটা বাড়ি ভেঙে পড়লো, বাজে মালমশলার জন্যে। গোটা দশেক বউ বিধবা হলো ওদের লোভে।

কণিকা বললো, "বাবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু পেনশনের টাকায় চলে না। বাড়িওয়ালা ভাড়া বাড়িয়ে দিলো। শেষ জীবনে এসে বাবা আত্মসম্মান বিক্রি

করলেন...” এর পরের কথাটা রূপসী আন্দাজ করে নিয়েছে...‘টাকার অভাবে।”

বাড়িতে এসে টেলিগ্রামটা পেলো রূপসী। অনুরাগ পাঠিয়েছে। টেলিফোন করেছিল, কেউ নাকি ধরেনি।

কে ধরবে? বাড়িতে কে আছে? কখন অনুরাগ দেশাই ফোন করবে তার জন্যে সারাক্ষণ টেলিফোনের পাশে ওৎ পেতে থাকবার জন্যে রূপসী এখানে চলে আসেনি। আনুরাগকে তো যথেষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছে রূপসী। একটা চমৎকার মানুষ কীভাবে মানি চেঞ্জিং মেশিন হয়ে যাচ্ছে, অথচ সে নিজেই বুঝতে পারছে না। মেশিনরা কাজে খুব ভালো কিন্তু তাদের বোধশক্তি থাকে না।

টেলিগ্রামেও মানসিকতা পরিবর্তনের কোনো লক্ষণ নেই। বলেছে, লাস্ট চার দিনে আমি তৃপ্ত—ফ্লোরিডার বন খুব সস্তা দরে মক্কেলদের কিনিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। অনুরাগ শুধু দালালি করছে না, নিজেও একটা অংশ রাখছে।

রূপসী হিসেব করলো এই চার দিনই সে ক্লিভল্যান্ড ছেড়ে চলে এসেছে—এবং সেই সময়েই অনুরাগ সবচেয়ে ‘তৃপ্ত’। চমৎকার! টাকার বিষে অবশ হয়ে যাচ্ছে ওর সমস্ত অনুভূতি।

কার্ল স্যান্ডবার্গের একটা লেখা থেকে উদ্ধৃতি রেখেছিল রূপসী তার স্বামীর টেবিলে। ‘টাকার খোঁজে বহু মানুষের ‘মৃত্যু’ হয় কবরে যাবার অনেক আগে। ভালো-ভালো মানুষ শুকনো কেঁচো হয়ে যায় টাকাকে তাড়া করে।” অনুরাগের কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি—হয়তো বউয়ের লেখাটাও নজরে পড়েনি।

রূপসী মনে পড়ছে সেই চলচ্চিত্রের কথাটা। যেখানে নায়ক বিবাহবিচ্ছেদের পরে ছাত্রজীবনের পুরনো বান্ধবীদের সন্ধানে বেরুলো। সেইসব বান্ধবী যারা তার জীবনে একসময়ে এসেছিল। যাদের সঙ্গে রয়েছে অনেক রঙিন স্মৃতি।

রূপসী চায় কারুর সঙ্গে অনেকক্ষণ সময় কাটাতে। কাউকে নতুনভাবে, নিবিড়ভাবে আবিষ্কার করতে। এই জন্যেই মামার কাছে আশ্রয় নেয়নি, নিজের স্বাধীনতাটুকু অক্ষুণ্ণ রেখেছে। ছবিটাতে একটা চমৎকার দৃশ্য আছে। পুরনো এক বান্ধবীকে নিজের সাময়িক আবাসে নিয়ে এসেছে নায়ক। ভাবছে, একে বিয়ে করবার সুযোগ ছিল। প্রাক্তন বান্ধবী এতো দিন পরে স্বীকার করছে, সে আশা করে বসেছিল, তুমি প্রপোজ করবে। প্রস্তাবের কী ফলাফল হতো তা জানবার অদম্য কৌতূহল নায়কের মনে। কিন্তু বান্ধবী বললো না। কেন বলবে? কী হলে কী হতো তা নিয়ে মাথা ঘামাবার মতন অতো সময় নেই।

কেউ যদি এই মুহূর্তে কাছে থাকতো! যদি সবার খবর কারও নখাগ্রে থাকতো! কলকাতায় অনেক অসুবিধে। বেশির ভাগ মানুষের ফোন নেই। বাড়ি গেলেও প্রাইভেসি নেই। নিরিবিলি কথা বলাটা মস্ত এক বিলাসিতা। মানুষকে

তিলে তিলে আবিষ্কার করে তারপর গ্রহণ করার উপায় নেই এখানে। গ্রহণ করবার পরে যতো খুশি আবিষ্কার করো, এই চায় সবাই।

স্মৃতির থলিকা হাতড়ে বেড়াচ্ছে রূপসী। এমন একজন যে জড়িয়ে পড়েনি। যে নিজের পায়ের উপর বৃত্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ কাগজে সদাপ্রসন্নর কথা দেখলো রূপসী। এই সেই সদাপ্রসন্ন ব্যানার্জি যার সঙ্গে ছাত্রীজীবনে আলাপ হয়েছিল। সদাপ্রসন্ন তখনও ছবি আঁকে, আর্ট স্কুলে ঢুকেও কোর্স শেষ করতে পারেনি। পরীক্ষায় পাস করাটা ওর ধাতে ছিল না। বড় হবে যারা তারা কেন পরীক্ষার দাসত্ব স্বীকার করবে? পরীক্ষাই তো পরে ওদের দাস হবে—ওদের নিয়েই তো পরীক্ষকরা প্রশ্নপত্র তৈরি করবেন।

সদাপ্রসন্নর যে রূপসীর প্রতি অনুরাগ ছিল তা খুব গোপন ব্যাপার নয়। রূপসী ওর সঙ্গে কফি খেয়েছে, ঘুরে বেরিয়েছে, ছবি দেখেছে তা মিথ্যে নয়। কিন্তু প্রণয় তো ওয়ান-ওয়ে ট্রাফিক নয়।

সদাপ্রসন্নর জানা উচিত, রূপসীর একটা ন্যূনতম লাইফস্টাইল আছে। সেই ন্যূনতম জীবনযাত্রার একটা খরচ আছে। রূপসী তার ছবিতে আগ্রহিণী। তার সাধনাতেও কৌতূহলী। কিন্তু মানুষটা সম্বন্ধে খোলাখুলি কোনো কথা হয়নি।

রূপসীর বান্ধবীরা ওকে টিটকিরি দিয়েছে। যদি ওইরকম মেয়েকে সত্যিই চাও, পরীক্ষায় পাস করো, আর্ট কলেজে অধ্যাপনা করো, নিদেনপক্ষে বিজ্ঞাপন এজেন্সিতে ঢোকো।

সদাপ্রসন্ন নড়েচড়ে বসেনি। সদাপ্রসন্ন তখন কীসব আঁকতো। মানুষের বঞ্চনার ছবি, যন্ত্রণার ছবি, হতাশার ছবি। ভীষণ ডার্ক। কোথাও যেন কোনো ভরসা নেই। ওই সব অন্ধকার ছবি বিক্রি হতে চায় না। পয়সা দিয়ে কে দুঃখ কিনবে এবং বাড়িতে টাঙিয়ে রাখবে।

সদাপ্রসন্ন কিন্তু মেনে নেয়নি। সমঝোতার মধ্যে নেই সদাপ্রসন্ন। যারা কমপ্রোমাইজ করে তারা সহজে বড় হয় না।

রূপসী যখন চলে যাচ্ছে তখনও বান্ধবীরা ওকে টিটকিরি দিয়েছে। যথাসময়ে ওর বিয়ের খবরেও নিরাশ হয়নি সদাপ্রসন্ন। একজন বান্ধবী আমেরিকাতে লিখেছিল রূপসীকে : একজন পাগল এখনও তোমার গুণ ও রূপগ্রাহী। কী পেয়েছে তোমার মধ্যে তা সে-ই জানে। সে বলেছে, এ-জন্মে না পাওয়া গেলেও ওয়ার্থ ওয়েটিং পরের জন্ম তো রয়েছে।

অর্থাৎ শুধু এ জন্মে নয়, আরেক জন্মের জন্যে অপেক্ষা।

বিড়লা আকাদেমিতে সদাপ্রসন্নর ছবির প্রদর্শনীতে বেশ ভিড়। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে সদাপ্রসন্ন হিমশিম খাচ্ছে—মিস্টার মজুমদার, মিস্টার কানোড়িয়া, মিসেস ভারতিয়া, মিসেস সিংঘানিয়া। মিস্টার নন্দী মুম্বাই থেকে ফ্লাই করে

আসছেন স্পেশালি ; সদাপ্রসন্নর ছবি সম্বন্ধে লিখতে। মিস্টার কাশ্যপ, মিস্টার মোদিও আসবেন।

অনেক দিন পরে রূপসীকে দেখে সদাপ্রসন্ন একটু প্রসন্নই হলো। কিন্তু সবিনয়ে বললো, "শুধু আমার ছবি চেয়ো না, রূপসী। সব বুক্‌ড্‌। মিস্টার ইনামদার মুম্বাই থেকে এসে রাগ করছেন, শূন্য হাতে ফিরে যেতে হবে। ছবির দাম ডবল করে দিয়েছি তবু ভিড় কিছুতেই কমলো না।"

অর্থাৎ সদাপ্রসন্ন থেকে সদাপ্রসন্নর ছবির মূল্য বেশি। তোমার সৃষ্টির চেয়ে তুমি যে মহৎ যে লিখেছিল সে বিশ্বসংসারের কিছুই জানে না।

সদাপ্রসন্নকে অনেক কষ্টে তাজ বেঙ্গলে নিয়ে এসেছে রূপসী। এখন রাত ন'টা। যে-সদাপ্রসন্ন আগে মদ স্পর্শ করতো না সে এখন স্কচ পছন্দ করে।

"তোমাদের এখন নিশ্চয় অনেক পয়সা," সদাপ্রসন্ন বলেছে।

চুপচাপ বসে আছে রূপসী। "ওই সব সাড়ে সতেরো দিয়ে ডলারকে গুণ আমার আসে না।" "দেখো, ডলার একদিন একশো হবে, তখন করতে অসুবিধে হবে না।"

হিসেবটা সদাপ্রসন্ন অনেকটা অনুরাগের মত্যেই শিখে ফেলেছে মনে হচ্ছে। সদাপ্রসন্ন তার ছবির কথা বলতে চায় না, স্রেফ তার সাফল্যের কথা। "মুম্বাইতে আমার ছবির জন্যে আমবানিরা হায়েস্ট দাম দিয়েছে।"

অনেকক্ষণ ড্রিংক করেছে সদাপ্রসন্ন। সঙ্গ দেবার জন্যে রূপসীও কিছুটা গলায় ঢেলেছ।

সদাপ্রসন্ন বলেছে, "থ্যাংক গড। তুমিও হ্যাপি, আমিও হ্যাপি। ভাগ্যে কোনো অঘটন ঘটেনি ; তা হলে তুমি ও আমি দু'জনেই মুশকিলে পড়ে যেতাম। বস্তাপচা আদর্শের সম্মানে বিয়ে করলে তুমি আমার আদর্শের সঙ্গে ঘর করতে, আমার সঙ্গে নয়।"

সদাপ্রসন্ন দাবি করেছে, সে অনেক ম্যাচিওর হয়েছে। ম্যাচিওর কীভাবে হয়েছে তাও বর্ণনা করেছে সদাপ্রসন্ন। দিল্লির শিল্পপতি কাঠুরিয়া, ওঁর ছোট মেয়ে প্রতিমা। ওর সঙ্গে ছিলাম আড়াই বছর। একই বেডরুমে। প্রতিমা কাঠুরিয়া শুধু আর্ট ভালোবাসে না, আর্টিস্টও ভালোবাসে। কাঠুরিয়া আমাকে নতুনভাবে লনচ করলো। প্রতিমা আমার চোখ খুলে দিলো। দুনিয়াতে বড়লোকদের কতো দুঃখ, কতো কষ্ট। যে যা চায় তা দাও—ভগবান তৃপ্ত হবেন।

"আমি ওইসব কালো কালো রঙ, গোমড়া গোমড়া ভাব, ওই নেগেটিভ মানসিকতা ত্যাগ করলাম প্রতিমা কাঠুরিয়ার অনুপ্রেরণায়। ভেরি নাইস উয়োম্যান—বড়লোক, এ ছাড়া কোনো দোষ নেই। স্ত্রীর মতো প্রশ্রয় দিয়েছে আমাকে কিন্তু স্ত্রীর মতো সারাক্ষণ শাসন করেনি। ফলে আমি বিকশিত হয়েছি—

আমার ছবির এতো কদর হয়েছে।”

আরও হুইস্কি সেবন করেছে সদাপ্রসন্ন। বলেছে, লেখক শিল্পী এসব তো একজাতের জমি, স্বীকার করবে তা? স্যামুয়েল জনসন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন তাও স্বীকার করবে। প্রতিমা কাঠুরিয়া একদিন আমাকে পড়িয়েছিল জনসনের উক্তি—নো ম্যান বাট এ ব্লকহেড এভার রোট একসেপ্ট ফর মানি। একমাত্র বোকচন্দর ছাড়া সবাই টাকার জন্যে লেখে। কার্ল মার্কস পর্যন্ত প্রায় একই কথা বলে গিয়েছেন ১৮৬০ সালে। আর্টিস্টদেরও ওই একই কথা।

পুরনো দিনের ছবিগুলো কোথায় গেল, জানতে চেয়েছে রূপসী। প্রতিমা কাঠুরিয়ার নজর ছিল আমার উপর কিছুদিন। যখন তোমার বিয়ের খবর পেলাম, যখন ঠিক করলাম প্রতিমার রক্ষিত হয়েই আমাকে দিল্লি যেতে হবে তখন সব গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিলাম। সরস্বতী পুজোর ভাসান ছিল সেদিন—খড়কুটোর সঙ্গে ভেসে গেল, কোনো অসুবিধে হলো না।

রাত অনেক হয়েছে। বেসামাল সদাপ্রসন্নকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে চলেছে রূপসী। প্রতিমা ও সদাপ্রসন্নর সম্পর্ক এখন নেই। “প্রয়োজন নেই। আমি যা পাবার পেয়ে গিয়েছি, প্রতিমারও কৌতূহলের নিবৃত্তি হয়েছে। আমার কাছ থেকে ওর নতুন কিছু পাবার নেই। তবে আমরা গুড ফ্রেন্ডস। দিল্লিতে আমার এগজিবিশনে আসে।”

রূপসীর মাথাটাও টলছে। কেন ড্রিংক করলো শুধু-শুধু? সদাপ্রসন্ন বসেছে সামনের সিটে। রূপসী পিছনে। “পরস্ত্রী তুমি—দূরত্ব থাকুক রূপসী। মদ মানুষকে বেহেড করে দেয়—ব্রেক ফেল করে।”

রূপসীর শরীরটা জ্বলছে। হঠাৎ মনে হচ্ছে সদাপ্রসন্ন যে একদিন একটু হাসি পাবার জন্যে হা-পিত্যেশ করতো সে সুযোগ পেয়ে অপমান করছে রূপসীকে—তার ব্যক্তিত্বকে, শরীরকে, এভরিথিং।

রূপসী জ্বলে উঠলো। “সদাপ্রসন্ন, আমি তোমার স্ত্রী নই, রক্ষিতা নই—জাস্ট এ ফ্রেন্ড। একজন ওয়েল উইশার মাত্র। তোমার এগজিবিশন দেখলাম। যত খুশি লোক ঠকাও, কিন্তু নিজেকে ঠকাচ্ছো কেন? যেগুলো আঁকছো ওগুলো ছবি? আগে কী কাজ তুমি করেছো মনে করো!”

রূপসী আশঙ্কা করেছিল সদাপ্রসন্ন জ্বলে উঠবে। হয়তো গাড়ি থেকে নেমে পড়ে পিছনের সিটে উঠে রূপসীকে চড় মারবে।

কিন্তু কী আশ্চর্য! কিছুই হলো না। নিজের বাড়ির সামনে এসে সদাপ্রসন্ন বললো, “আজ আমি মত্ত। তাই বাড়িতে নিয়ে গেলাম না।”

কাঁদছে সদাপ্রসন্ন। গাড়ি সচল হবার আগে সদাপ্রসন্ন বললো, “আমি এখনও নিজেকে ঠকাইনি রূপসী। আমি ভালো ছবি আঁকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু খারাপ

হয়ে গেলাম স্রেফ টাকার অভাবে।”

টাকার অভাব! টাকার অভাব! কথাগুলো সমস্ত রাত ধরে রূপসীর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছে। ঘুম আসেনি, কিন্তু ঘোর ছিল।

ভোর হয়েছে অনেকক্ষণ। রূপসী এবার রাতের পোশাক ছেড়ে শাড়ি পরে নিলো। কাগজে সদাপ্রসন্নর ছবির ভূয়সী প্রশংসা বেরিয়েছে। “যেভাবে আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রদর্শনীর সব ছবি বিক্রি হয়ে গেল তার থেকেই প্রমাণ হয় সদাপ্রসন্ন এখন প্রথম সারিতে।”

কাল খুব ঝুঁকি নিয়েছিল রূপসী। ওইভাবে ওর সঙ্গে বেরুনো নিরাপদ হয়নি। কিন্তু একটা অঘটন ঘটে গেলে কিছু বলবার থাকতো না। আবার মনে হলো, সদাপ্রসন্ন শেষ হয়ে গিয়েছে—প্রতিমা কাঠুরিয়ারা ওর কোনো কিছু অবশিষ্ট রাখেনি।

রেডিওতে মীরার ভজন শুরু হয়েছে। মনের মধ্যেও কোনো এক উদাসী কিছু একটা গাইবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠছে।

অথচ কেমন এক অনিশ্চয়তা ঘিরে ধরছে রূপসীকে। যে-কলকাতাকে সে অনেক দিন আগে চিনতো, যে কলকাতাকে কলকাতায় রেখে সে সুদুর বিদেশে পাড়ি দিয়েছিল, সে যেন নেই। লেফট লাগেজে অনেক সময় মাল বদলি হয়ে যায়। ব্যাগটা একই রকমের, একই রঙের, কিন্তু ভিতরের জিনিস আলাদা।

কলকাতা কোথায় যেন হেরে গিয়েছে। মীরার ভজন শুনতে-শুনতেই আর একজনের কথা মনে পড়লো। মহীতোষদা। অসামান্য মানুষ মহীতোষদা। রূপসীদের পুরনো বাড়ির সামনেই থাকতেন।

কম বয়স থেকেই মহীতোষদার মধ্যে ধর্মভাব ছিল। ওঁর মায়েরও ছিল ধর্মে মতি। সোজা চলে যেতেন দক্ষিণেশ্বরে, বেলুড়ে, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে। মা আনন্দময়ীর সঙ্গেও ছিল ওঁর মায়ের যোগাযোগ। মহীতোষদা কৃতী ছাত্র ছিলেন। ইস্কুলে কলেজে অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। গান গাইতেন অসামান্য। সেই মহীতোষদা শেষ পর্যন্ত বৈরাগ্যের পথ ধরলেন। যে বয়সে লোকে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকে, তাদের সান্নিধ্য পেলে ধন্য হয়, যে বয়সে ছেলেরা সিনেমায় যায়, বাবরি চুল রাখে চিত্রাভিনেতাদের স্টাইলে, সেই বয়সে মুণ্ডিতমস্তক হলেন মহীতোষদা। সাদা পাঞ্জাবি ও কাছাবিহীন কাপড় পরা সেই ব্রহ্মচারীকে রূপসী দেখেছে ঠাকুরের জন্মদিনে, আর্তদের সেবা করে চলেছেন নীরবে।

মহীতোষ মহারাজের পরে কী একটা নাম হয়েছে। কয়েক বছর কংখলে তপস্যা করে কাটিয়ে দিয়েছেন। ওঁর সঙ্গে দেখা হলে মন্দ হতো না। ভক্তির

পথে, সন্ন্যাসের পথেই তো চিরদিনের ভারতবর্ষ মোক্ষের সন্ধান করেছে। বিবেকানন্দ তো বলেছিলেন, আমরা স্বর্গসুখের সন্ধান করি না, আমরা চাই মোক্ষ, মুক্তি। এই শাশ্বত বাণীই তো অভিনব রূপ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানে।

মহীতোষ মহারাজ একবার অনুপ্রাণিত হয়ে রচনা করেছিলেন অসামান্য কাব্য যা রূপসী পড়েছে কোনো এক সাপ্তাহিক পত্রিকায়। বিবেকানন্দর অনুপ্রেরণায় রচনা :

আ-হা, আবার সেই মধুর বাণী, সেই চিরচেনা কণ্ঠস্বর।
কন্টকিত অন্তর, রোমাঞ্চিত প্রাণ,
নেই বন্ধন মায়াজাল।
নেই জীবনের আকর্ষণ।
শুধু আছে প্রভুর মধুর গম্ভীর আহ্বান।
যাই প্রভু যাই।
ওই তিনি বলছেন,
মৃতের সৎকার করুক মৃতেরা,
সংসারের ভালোমন্দ দেখুক সংসারীরা,
ওসব ফেলে তুই চলে আয়।
যাই প্রভু যাই।
নির্বাণ-সমুদ্রের অপূর্ব বিস্তার সামনে—ওই।
অসীম শান্তির ওই পারাবার,
মায়ার বাতাসে নেই তরঙ্গ-বিক্ষেপ,
আমি যাই।
আমি যে জন্মেছি তাতে খুশি,
দুঃখ যে পেয়েছি তাতে খুশি,
জীবনে যত ভুল, তাতে খুশি,
নির্বাণে চলেছি, তাতে খুশি।

মহীতোষদা যেদিন সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন সেদিনটাও মনে আছে। রাণুমাসিমা পুত্রশোকে কাতর—আবার কতো মেয়ে তাঁকে প্রণাম করছে এমন সন্তানের গর্ভধারিণী হওয়ার জন্যে।

অনেক চেষ্টায় মহীতোষদার খবর পাওয়া গেল। কলকাতা থেকে বেশ দূরে নির্জন সমুদ্রতীরে আশ্রম গড়েছেন মহীতোষদা—স্বামী নির্বাণানন্দ নাম নিয়েছেন।

মুক্তির সন্ধানে সংসারের সমস্ত বন্ধন অগ্রাহ্য করে মহীতোষদা ভারতবর্ষের প্রান্তরে-প্রান্তরে ঘুরেছেন। চরম দুর্যোগে দুঃখী মানুষের সেবা করেছেন।

হিমালয়ের গহনে বসে পাঠ করেছেন সংস্কৃত সাহিত্যমালা। নিজেই অনুবাদ করেছেন যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ।

মহীতোষদাই দিতে পারেন রূপসীকে দু'দণ্ডের শান্তি। মহীতোষদা ভীষণ স্নেহপ্রবণ। এতো স্নেহভালোবাসা নিয়ে তিনি কী করে মাকে কাঁদিয়ে সংসার ত্যাগ করতে পারলেন তা শুধুমাত্র তিনিই জানেন।

অনেকক্ষণ ড্রাইভ করে মহীতোষদার আশ্রমের সন্ধান পেলো রূপসী। মহীতোষদাক সব বলবে রূপসী। কোনো কিছুই লুকিয়ে রাখবে না সর্বত্যাগী পুরুষের কাছ থেকে।

মহীতোষদা অনেকদিন পরে রূপসীকে দেখে খুশি হলেন। রূপসী যে এতো বিদ্যাবতী হয়েছে এবং একজন বিদ্যাপতি লাভ করেছে তা জানতেন না। বিদেশে বসবাস করছে এবং সামান্য কয়েকদিনের জন্যে দেশে এসে সে আশ্রমে ছুটে এসেছে তাতেই তৃপ্তি মহীতোষদার।

মহীতোষদা জানেন না, এছাড়া পথ নেই রূপসীর। একজন প্রাণবন্ত পুরুষকে মাল্যদান করেছিল, সে এখন একটা মানি এক্সচেঞ্জার হয়ে দূরদুরান্তে ছুটে বেড়াচ্ছে। সুদূর কলকাতা হাতছানি দিলো—সেই আকাশ যা একদিন রামকৃষ্ণকে, রবীন্দ্রনাথকে, বিবেকানন্দকে আশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু কোথায় কী যেন হয়ে যাচ্ছে, দেশটা দিশাহারা হতে আরম্ভ করেছে। রূপসী জানে, এই দেশ এই সভ্যতা এখনও শূন্য হয়নি। এইখানেই কোথাও তার ঈপ্সিত শান্তি খুঁজে পাবে রূপসী।

মহীতোষদা এসব জানেন না, জানবার প্রয়োজন নেই, কোন আগুনে জ্বলে পুড়ে মরছে রূপসী।

রূপসী বুকের মধ্যে কিছুটা শান্তি অনুভব করছে। আশ্রমে উপনিষদের বাণী পঠিত হচ্ছে। মহীতোষদা বলছেন সেই পূর্ণের কথা যা কিছুতেই অপূর্ণ হয় না। পূর্ণ থেকে পূর্ণকে বিয়োগ করলেও পূর্ণ থেকে যায়।

সূর্য অস্তাচলের পথে। সমুদ্রতীরে ধীরপদক্ষেপে ভ্রমণ করছেন মহীতোষদা। কোনো খেদ নেই তাঁর।

শেষ মুহূর্তে রূপসী স্তম্ভিত হলো। বাধার কথা জানতে চাইছিল রূপসী—সাধনার কথা, তপস্যার কথা। একটু ভেবে মহীতোষদা হঠাৎ বললেন, আরও দ্রুত এগুনো যেতো। কিন্তু টাকার অভাব।

রূপসী চমকে উঠলো। মোক্ষও তা হলে বিলম্বিত হয় টাকার অভাবে! জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে তৃষিত ধরিত্রী যেন চাতক পাখির মতন বলছে—টাকা দাও, টাকা দাও। টাকার অভাবে সব শূন্য হয়ে যাচ্ছে এই মানব-অরণ্যে।

রূপসী ফিরে এসেছে গভীর রাত্রে। তার সমস্ত শরীর কাঁপছে। তা হলে ওই

লোকটা যে ক্লিভল্যান্ডে বসে টাকা রোজগারের চেষ্টা করছে সে তো অন্যায় কিছু করছে না। অনুরাগ যা করছে সেও এক তপস্যা।

টেলিফোন বাজছে। অনুরাগের গলা কী পরিষ্কার শোনাচ্ছে? অনুরাগ বলছে, "তোমার অভাবে বাড়ি মরুভূমি। কবে আসছো?" জানতে চাইছে অনুরাগ।

টাকা যখন সর্বত্রই ঈশ্বর হয়ে বসে আছে তখন অনুরাগ কী দোষ করলো?

"আমি নিজেকে আবিষ্কার করেছি অনুরাগ। আমি আগামী কালই যাচ্ছি। তুমি এয়ারপোর্টে থেকো", এই বলে টেলিফোন নামিয়ে দিয়ে রূপসী নিশ্চিন্ত হলো।

"হাই, মামা! আমি রূপসী বলছি। আমি ফিরে যাচ্ছি কাল সকালেই। বরের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল, মিটে গিয়েছে।"

কী নিয়ে ঝগড়া, মামা জানতে চাইছে। "কী নিয়ে আবার! যা নিয়ে দুনিয়ার সব জায়গায় ঝগড়া—টাকা।" রূপসী ফোন নামিয়ে দিলো।

নামমাত্র বিবাহ

বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে কখনও কখনও। হাওড়া থেকে আমি বিদেশ পাড়ি জমাবার সুযোগ পেয়েছি।

সুদূর আমেরিকায় শীতাতপনিয়ন্ত্রিত লিভিংরুমের সুকোমল আশ্রয়ে বসে সুপ্রতীক সেন বললেন, "বাঙালিদের সম্বন্ধে জমকালো গল্প লিখতে হলে আপনাদের বিদেশেই আসতে হবে শংকরবাবু।"

বক্তব্যটা আমার মনঃপূত হচ্ছে না আন্দাজ করে সেনমশাই ব্যাখ্যা করলেন, "যতদূর খবর পাই বাংলার পরিচিত পরিবেশে গল্প ক্রমশই ফুরিয়ে আসছে, যেমন শেষ হয়ে আসছে সবুজ অরণ্য ও স্রোতস্বতী নদী। ওদেশে মানুষ আছে অনেক, কিন্তু তাদের জীবনস্রোত গতানুগতিকতায় বন্দি। ওখানে হতাশা আছে, বঞ্চনা আছে, পরাজয় আছে। কিন্তু স্বপ্ন নেই, সংঘাত নেই, সাফল্য নেই। প্রতিবাদ নেই, বন্ধন ছিন্ন করার স্পর্ধা নেই। মানুষ অতিমাত্রায় হিসেবি হয়ে উঠেছে। যে-পরিবেশে মানুষ সব কিছু মেনে নিতে ব্যগ্র সে-পরিবেশে জমাট গল্পের জন্ম হয় না। বিদেশের এই পরিবেশে বোস ঘোষ সেন সাহা মুখার্জি ব্যানার্জির সংখ্যা কম, কিন্তু এরা আকর্ষণে অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অনাবাসী বাঙালির বুকের মধ্যে একটা করে গল্প জমা হয়ে রয়েছে; আপনাকে কেবল সেটি সংগ্রহ করে লিখে ফেলতে হবে।"

সুপ্রতীক সেনের বয়স পঁয়ত্রিশ। সুঠাম, বুদ্ধিদীপ্ত শরীর। আপাতত তিনিই আমাকে আশ্রম দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, অনেক শহর ও অনেক পথ ঘুরে মধ্যপশ্চিম আমেরিকার এই ছোট্ট শহরে আমি উপস্থিত হয়েছি।

আমার কাপে গরম কফি ঢেলে সুপ্রতীক সেন বললেন, "দেশে থাকতে সাহিত্যিক যাযাবরের একটা অবিস্মরণীয় লাইন পড়েছিলাম—'বিজ্ঞান দিয়েছে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ।' এখানে বাঙালিদের দেখলে আপনার অন্যরকম মনে হবে। স্বদেশ থেকে বুকের মধ্যে আবেগ নিয়ে এসেছিলাম আমরা এদেশে তার সঙ্গে যোগ হয়েছে বেগ। আবেগ কিন্তু বিদায় হয়নি—বেগ ও আবেগের চমৎকার লুকোচুরি খেলা চলেছে এখানকার বোস ঘোষ মজুমদার তরফদারের মধ্যে।"

সুপ্রতীক বললেন, "সে বোধহয় ১৯৬৮ সালের কথা, পত্রপত্রিকায় আপনার প্রথম আমেরিকা ভ্রমণের কাহিনী পড়তে লাগলাম ; স্বপ্ন জেগে উঠলো, ওই স্বপ্নের দেশে একবার যেতেই হবে। তা পাকে-চক্রে এখানে হাজির হলাম। তখন ভেবেছি আমেরিকা সম্বন্ধে আপনি কতো জানেন। দু'দশক পরে অনেক চেষ্টা করে আপনাকে নিজের বাড়িতে আনতে পেরেছি। আপনি বলছেন, মার্কিন দেশ সম্বন্ধে আপনি কিছুই জানেন না। আপনি আমার কাছ থেকে দেশটা সম্বন্ধে খবরাখবর নিচ্ছেন!"

সুপ্রতীক বললেন, "এর মধ্যে কী প্রচণ্ড ড্রামা রয়েছে আপনি লক্ষ করুন। বাদুড়বাগান লেনের একটি ছেলের হাতে আপনার একটা লেখা পৌঁছলো, তারপর কতো জিনিস ঘটে গেল। সে মন দিয়ে পড়াশোনা করলো, পরীক্ষায় ভালো করলো, পাসপোর্ট ভিসার দুস্তর ঝামেলা পেরিয়ে এদেশে পড়তে এলো। দেশে ফিরবো বলেছিল, কিন্তু ফেরা হলো না।"

সুপ্রতীক এবার হেসে উঠলেন। "বাদুড়বাগানের ভাড়াটেবাড়ির ছেলে ইউ এস এ-তে বাড়ি কিনেছে। এই যে ভদ্রাসনটি দেখছেন এটি আমার নিজস্ব। আরও যা আশ্চর্য, শংকরবাবু, আমি এখন ইউ এস সিটিজেন, ইন্ডিয়ার সঙ্গে খাতায়-কলমে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ যে দেশকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছি তা বুকের মধ্যে গেঁথে বসে আছে। প্রতিদিন রাত্রিবেলায় আলো নিভিয়ে যেমনি শুয়ে পড়ি অমনি বাদুড়বাগান লেন আমার কাছে চলে আসে। আমি ঘুমোবার আগে পর্যন্ত বাদুড়বাগান লেনেই বসবাস করি। সেই সরু গলিটা, সেই ভাঙাচোরা বাড়িটা কোন সময়ে আমার আদরের ধন হয়ে উঠেছে। অথচ আমার জন্মের দেশে ঢুকতে গেলে এখন সরকারি অনুমতি প্রয়োজন হয় ; বেশিদিন থাকতে হলে লোয়ার সার্কুলার রোড ফরেনার্স রেজিস্ট্রেশন অফিসে আমাকে নাম লেখাতে হয়। অভিমান হয়, রাগ হয়—কিন্তু পরের মুহূর্তেই আমি বুঝতে

পারি এসব অসুবিধে আমি নিজেই সৃষ্টি করেছি। কেউ আমাকে আপনার আমেরিকা ভ্রমণ বৃত্তান্ত পড়তে বলেনি, সেউ আমাকে বাদুড়বাগান লেন ছেড়ে বিদেশে আসতে বাধ্য করেনি; আমার ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট কেউ কেড়ে নেয়নি ; আমি নিজেই ওটা অকেজো করে দিয়েছি। সবই যেন কেমন পাকে-চক্রে হয়ে গিয়েছে, যার নিমিত্ত আপনি। অথচ আপনি কেমন মনের সুখে সেই হাওড়া শিবপুরে বসবাস করছেন ; সুযোগ বুঝে অনেক দিন পরে আবার দেশ দেখতে এসেছেন।”

একটু থামলেন সুপ্রতীক সেন। তারপর বললেন, “আপনি এদেশে এসেছেন খবর পেয়েই কেন জানি না ইচ্ছে হলো একটু মোকাবিলা করার। আমি খোঁজখবর করে ফোনে আপনাকে বোস্টনে পাকড়াও করলাম। আপনারা স্বদেশে দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু বিদেশে আয়ত্তের বাইরে নয়। আপনি অনুগ্রহ করে আমার এখানে আসতে এবং আমার অতিথি হতে রাজি হয়ে গেলেন। শুক্রবার রাত্রিতে বাঙালিদের সঙ্গে সাহিত্যালাপ ও জলযোগ, ওটা নিমিত্তমাত্র—আপনি এসেছেন ডিসকভারি অফ বেঙ্গলে। আপনি জানেন, বিদেশ ছাড়া আর কোথাও এখন বাঙালিদের আবিষ্কার করা যাবে না। আমাদের সংখ্যা এই বিশাল দেশে মাত্র হাজার চল্লিশেক—কিন্তু চল্লিশ হাজার উপন্যাসের উপাদান আমরা বুকে নিয়ে প্রবাসে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এমন উপন্যাস মার্কিনবাসীদের কাছে যার কোনো তাৎপর্য নেই, কিন্তু বাঙালিদের পক্ষে মহামূল্যবান।”

সুপ্রতীক সেন সুরসিক। পাসপোর্ট পাল্টালেই যে জাতীয়তা পাল্টায় না তাও বোঝা যায় মানুষটির সঙ্গে কথা বললে। সুপ্রতীক সাংসারিক কাজেও সমান সুদক্ষ। বাড়িটা ঝকঝকে তকতকে রেখেছেন। যে জিনিসটি যেখানে থাকবার ঠিক সেখানেই রয়েছে। রান্নাঘরটি তো ছবি তোলার মতন—কে বলবে এই গৃহে কোনো গৃহিণী নেই।

সুপ্রতীক হাসতে-হাসতে বললেন, “বাদুড়বাগানে আমি কিন্তু ভীষণ অগোছাল ছিলাম। ওয়াম্স অগোছালো অলওয়েজ অগোছালো কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। সব নির্ভর করে ট্রেনিং-এর উপর। আমেরিকা এখনও বাঙালিদের দুটো বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারে—তা হলো স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা। যে-মানুষ জীবনযাত্রায় পরনির্ভর সে-মানুষ কী করে প্রকৃত স্বাধীন হতে পারে? আমেরিকান জীবনযাত্রার প্রেশারকুকারে তিন মাস সিদ্ধ হয়ে আমার পরনির্ভরতা উধাও হয়ে গেল, শংকরবাবু। যে-লোক জীবনে চা তৈরি করেনি এবং খাওয়ার পরে চায়ের কাপ টেবিলের তলায় গুঁজে রেখেছে সেই লোক বাসনমাজা, কাপড়কাচা এবং ইস্ত্রি থেকে দিশি-বিলিতি রান্না সব শিখে ফেললো। আজকাল এক-একসময় মনে হয় প্রকৃত আত্মনির্ভরতা থাকলে কলকাতার জীবনসংগ্রামে আমরা অতোটা

পরনির্ভর হয়ে উঠতাম না। সেই সঙ্গে শৃঙ্খলা—প্রতিটা দিন, প্রতিটা মাস, প্রতিটা বছর যদি একটা পরিকল্পনা মাফিক সাজিয়ে না নেওয়া যায় তা হলে এখানে কল্কে পাওয়া খুব শক্ত।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "ভীষণ প্রতিযোগিতার বাজার, তাই না?"

"প্রতিযোগিতা বলে প্রতিযোগিতা! এবং শুধু নিজের দেশের মানুষের সঙ্গে নয়। আমি হয়তো একটা কাজ স্থানীয় কারও তুলনায় ভালো করছি, কিন্তু সেখানে হঠাৎ হয়তো একজন জাপানি অথবা সুইডিশের আবির্ভাব হলো। দরজা এখানে খোলা রয়েছে, কখন যে কে এসে কাকে চ্যালেঞ্জ জানাবে ঠিক নেই। অনিশ্চয়তাকে প্রশ্রয় দিয়েই এই দেশ নিশ্চয়তাকে নিশ্চিত করতে চায়।"

"এতো ধকল আমাদের দেশের মানুষদের সহ্য হবে না, সুপ্রতীকবাবু।"

সুপ্রতীক হেসে উত্তর দিলেন, "আমিও এদেশের হালচাল দেখে প্রথম দিকে তাই ভাবতাম। তারপর এই প্রতিযোগিতার ব্যাপারটা ক্রমশ সহ্য হয়ে গেল। আসলে সারাক্ষণ নতুনের চোখরাঙানি না থাকলে পুরাতন অতিমাত্রায় শ্লথগতি হয়ে পড়ে। আমাদের দেশে ইস্কুল কলেজ থেকে আরম্ভ করে হাসপাতাল, কলকারখানা এইজন্যে উন্নতি করছে না। এখানে কতো প্রতিষ্ঠান যে প্রতিযোগিতায় পিছু হটতে-হটতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে তার ঠিক নেই। এরা মৃত্যু নিয়ে মাথা ঘামায় না—যে এগোতে পারছে না সে যে মুছে যাবে তা সবাই মেনে নিয়েছে।"

আমি ওর কথাগুলো লিখে নিচ্ছিলাম।

সুপ্রতীক বললেন, "প্রতিযোগিতার পরিবেশ গড়ে উঠলে আমরা যে বিপদে পড়লো না তার প্রমাণ এদেশের বাঙালি সমাজ। এখানকার প্রত্যেকটি বাঙালি জানে প্রতিযোগিতায় শুধু পাস-মার্ক পেলেই চলবে না, স্থানীয় লোকদের থেকে ভালো করতে হবে আমাদের, তবেই তো বিদেশে আমরা বেঁচে থাকতে পারবো।"

"সেটা বলা হয়তো সম্পূর্ণ ঠিক হবে না। অনেক সময় আপনি যে কাজটা শিখেছেন সেই কাজটারই বাজারদর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমার বন্ধু সুশীল পোদ্দার এদেশে এসেছিল জিওলজিস্ট হিসেবে—কিন্তু এদেশে ভূতত্ত্বের বাজার পড়ে গেল। সুশীল এদেশের মনোবৃত্তি গ্রহণ করে, স্পোর্টিং স্পিরিটে এই বয়সে বৃত্তি পাল্টালো। বিদেশের পাস করা জিওলজিস্ট এখন রিয়াল এস্টেট এজেন্ট, যাকে বলে কিনা বাড়ির দালাল। ভালোই করছে সুশীল—বৃত্তি পরিবর্তনের জন্যে তার ফ্যামিলিতে কোনো উদ্বেগ নেই। আমাদের দেশে কোনো কলেজের শিক্ষককে বাদামভাজার দোকান দিতে বললে তিনি হয়তো আত্মহত্যা করে বসবেন। শুনলে অবাক হবেন, সুশীল চুল ছাঁটার ট্রেনিং-ও নিয়ে রেখেছে, রিয়েল এস্টেটে কিছু

গোলমাল হলে একটা হেয়ার ড্রেসিং সেলুন ফ্রানচাইজ নিতে পারবে।”

সুপ্রতীক সেনের নিঃসঙ্গতার কারণ সম্পর্কে আমার কৌতূহল স্বাভাবিক। এ-বিষয়েও খোলাখুলি কথা হলো। সুপ্রতীকের মন্তব্য, “রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মতন সামাজিক স্বাধীনতাও একটা মস্ত জিনিস। আপনি একলা থাকেন, না বিবাহিত, না অবিবাহিত অবস্থায় কারও সঙ্গে ঘর করছেন এ-বিষয়ে এদেশে কারও কোনো মাথাব্যথা নেই। আপনি যেরকম থাকতে চান সেরকম থাকুন ; শুধু আমার ঘাড়ে চাপবেন না—এই হচ্ছে এদেশের সামাজিক নীতি। এর সুফল হলো আপনি সব অর্থে স্বাধীন ; আর কুফল হলো আপনি নিজের ব্যাপার ঠিকমতন সামলাতে না পারলে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। এই নিঃসঙ্গতা ভয়াবহ হতে পারে। বাঙালিরা সাধারণত নিঃসঙ্গ হয় না ; কারণ দেশ থেকে আমরা পৈতৃক শরীরটুকু ছাড়াও কিছু মূল্যবোধ নিয়ে এসেছি—আমাদের নিজেদের মধ্যে টান আছে। আর নিজের জাতের প্রতি টানকে এদেশে খারাপ চোখে দেখা হয় না। আমরা যাকে প্রাদেশিকতা বলে গালাগালি করি সেইটাই এখানে স্বাভাবিক মনে করা হয়। তুমি যদি ইতালিয়ান হও তা হলে ব্যবসাবাণিজ্যের ব্যাপারে একটু ইতালীয়র দিকে ঝুঁকবেই ; তুমি ইতালীয় অ্যাকাউন্টেন্ট রাখবে না তো কে রাখবে? তোমার আপিসে ইতালীয় কর্মী কিছু থাকতেই পারে। এদের চাকরি দিয়ে তুমি যদি কমপিটিশনে টিকে থাকতে পারো তা হলে কার কী বলবার আছে?”

“দৃষ্টিকোণটি বেশ অভিনব,” আমাকে স্বীকার করতে হলো।

সুপ্রতীক বললেন, “এদের বক্তব্য, তুমি যাদের জন্যে দরদ অনুভব করছো তারা ইতালীয় বংশোদ্ভূত হলেও আমেরিকান, সুতরাং তোমার ভালোবাসায় আমেরিকাই উপকৃত হচ্ছে। এই জন্যেই তো ইহুদিরা চড়া গলায় ইজরায়েলকে সাপোর্ট করে, মদত দেয়। আমাদেরও কোনো বাধা নেই। আমরাও যতো ইচ্ছে ভারতবর্ষকে ভালোবাসতে পারি ; ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি। আপনি দেখবেন, তৃতীয় প্রজন্মের ভারতীয়-আমেরিকানদের কাছ ওই লাভটাই অক্ষত থাকবে—তারা হিন্দি অথবা বাংলায় কথা বলতে না-পারলেও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভালোবাসা মুছে যাবে না। এদেশে সবাই আমেরিকান, আমিও আমেরিকান, কিন্তু ভারতীয়-আমেরিকান হিসেবে আমার বাড়তি কিছু উত্তরাধিকার আছে এই কথা ভাবতে এরা গর্ববোধ করবে।”

নিজের প্রসঙ্গে ফিরে এলেন সুপ্রতীক। “যারা ছাত্র হিসেবে এদেশে আসে তাদের সঙ্গে আমেরিকার পরিচয়টা অনেক নিবিড় হয়। কর্মসূত্রে যারা আমেরিকাবাসী তাদের অনেক সময় এদেশের সঙ্গে পরিচয়ই হয় না। কোনোক্রমে দুপুরবেলায় আমেরিকায় কাজ করে তারা প্রতিদিন বিকেলে

ইন্ডিয়ায় ফিরে যায়। দেশ থেকে আনা বউ হলে তো কথাই নেই। আমেরিকা কী জিনিস তা তারা বুঝতে শুরু করে ছেলেমেয়ে ইস্কুলে পড়তে শুরু করলে। তখন যেসব সমস্যার উদয় হয় তা আপনাদের লক্ষ করা উচিত। এইসব পরিবার দেখলে সহজেই বুঝতে পারবেন দুটো সভ্যতার পার্থক্য কোথায়।”

আমি চুপচাপ সুপ্রতীকের কথা শুনে যাচ্ছি। তিনি বললেন, “আমি এদেশেও ছাত্রজীবনের কিছুটা কাটিয়েছি। তারপর, শংকরবাবু, এদেশের মেয়েও বিয়ে করেছিলাম। বাবা-মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। নিজের ইচ্ছাটুকু ছাড়া অন্য কারও ইচ্ছার বিন্দুমাত্র মূল্য নেই এই সভ্যতায়—সুতরাং বিয়েতে অন্য কোনো অসুবিধে হয়নি। বাদুড়বাগানের বরের সঙ্গে আটলান্টার অ্যালিসার সম্পর্ক কী রকম হতে পারে তা আপনাকে পরে একদিন বিস্তারিত বলবো। এখন শুধু জানিয়ে রাখি, আমি মাতাল ছিলাম না। দেহমিলনে অক্ষম ছিলাম না, আমার স্ত্রীরও পরপুরুষে আকর্ষণ ছিল না, প্রাণবন্ত ঘরণি ছিল সে। তবু আমাদের বিয়ে টিকলো না। আমাদের ডাইভোর্স হয়ে গেল। ওই জিনিসটা এখানে সর্দিকাশির মতন—সবারই এক-আধবার হচ্ছে, মাথা ঘামাবার কিছু নেই। কয়েকদিন বিশ্রাম নাও, নিজেকে সবল করে তোলো, তারপর আবার সঙ্গীসংগ্রহে মন দাও। আমার বাবা-মা বিয়েতে যতো কষ্ট পেয়েছিলেন, বিয়েভাঙায় কষ্ট পেলেন তার অনেক বেশি। তারপর পরামর্শ দিলেন দেশের মেয়ে বিয়ে করতে। আমি প্রতিবাদ জানাইনি। তখন ওঁরা দেশের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন। সেই বিজ্ঞাপনের কাটিং আমার কাছে পাঠালেন। বিজ্ঞাপনটা পড়ে আমার মাথা ঘুরে গেল।”

আমার মুখের দিকে তাকালেন সুপ্রতীক। “বাংলায় যে এমন একটা কথা তৈরি হয়েছে তা আমার জানা ছিল না।”

শব্দটা জানবার জন্যে আমার আগ্রহ হচ্ছে।

সুপ্রতীক জানালেন, “নামমাত্র বিবাহিত' ডাইভোর্সি পাত্রের জন্য পাত্রী চাই।...বিজ্ঞাপনের কয়েকটা উত্তর বাবা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়েদের বাপ-মায়েরা তাঁদের মেয়েদের আমেরিকায় কর্মরত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য কতটা ব্যাকুল তা আমার ধারণা ছিল না। কিন্তু আমার মনের মধ্যে তখন শুধু ওই 'নামমাত্র বিবাহিত' কথাটা ঘুরপাক খাচ্ছে। অ্যালিসার সঙ্গে আমার প্রাকবিবাহ প্রণয় হয়েছে, তারপর বিবাহ করে আমরা ঘরসংসার পেতেছি ; আমাদের সন্তান হয়নি ; কিন্তু আমাকে নামমাত্র বিবাহিত বলা চলে না। একদিন কথাটার অর্থ চিন্তা করতে করতে আমি অনেকটা ড্রিংক করে বসেছিলাম। নেশার ঘোরে আমি অ্যালিসাকে টেলিফোন করে ফেললাম। জানতে চাইলাম আমাদের বিবাহকে 'নামমাত্র বিবাহ' বলা চলে কি না।

অ্যালিসার সঙ্গে আমার বিবাহ বিচ্ছিন্ন, কিন্তু সেও অবাক হয়ে গেল। বললো,

"প্রতীক, আমরা বিবাহ করেছিলাম, বিবাহিত জীবন যাপন করেছিলাম। আমরা ভবিষ্যতে যাই করি, আমাদের বিবাহটা জীবনের একটা পরিচ্ছেদ হয়ে থাকবে।"

আমি এখানে দেশ থেকে সদ্য-আগতা এক বাঙালি বধূকে জিজ্ঞেস করলাম এর অর্থ। সে যা বললো তাতে আমার মাথা ঘুরে গেল। দুম করে বাবাকে চিঠি লিখে দিলাম, "নামমাত্র বিবাহ শব্দটির মধ্যে ইঙ্গিত রহিয়াছে বিবাহের পরে দেহসম্পর্ক হয়নি। মিথ্যাচারের উপর কোনো চিরস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে ওঠা যুক্তিযুক্ত নয়। আমি রীতিমত বিবাহিত এবং ডাইভোর্সড।"

"আমি আমার মার্কিনি বন্ধুমহলে যতই কথাটা আলোচনা করেছি ততই তারা বিস্মিত হয়েছে। নামমাত্র বিবাহিত শব্দটি একমাত্র ভারতবর্ষেই আবিষ্কৃত এবং ব্যবহৃত হতে পারে বলে তাদের ধারণা।"

আমার কাপে আরও কিছুটা কফি ঢেলে সুপ্রতীক বললেন, "আমি বুঝলাম, সব ব্যাপারে ভারতবর্ষের সঙ্গে তাল রেখে চলার ক্ষমতা আমি হারিয়ে ফেলেছি। বাবাকে লিখে দিলাম—আমার বিবাহে প্রয়োজন নেই।"

এবার হা-হা করে হাসলেন সুপ্রতীক। "দেশে ফিরে যদি পারেন, এই নামমাত্র বিবাহিতদের সম্বন্ধে একটু উল্লেখ করবেন। এমন একটা অদ্ভুত শব্দ কী করে আমাদের সামাজিক বিজ্ঞাপনের অঙ্গ হয়ে উঠলো তা অনুসন্ধান করলে হয়তো নতুন কিছু জানতে পারবেন। তবে আমার সম্বন্ধে কোনো চিন্তা করবেন না। যেসব কারণে বাদুড়বাগানের ছেলেরা বিয়ে করে তার কোনোটাই এখানে নেই। ওখানে প্রশ্ন : রান্না করে খাওয়াবে কে? উত্তর : মাইক্রোওয়েভ যন্ত্র। তাছাড়া এদেশে এতো তৈরি খাবার পাওয়া যায়! রান্না না জানার জন্যে এখনও একটি লোক পৃথিবীর কোথাও অনাহারে মারা যায়নি। জামাকাপড় কাচবার জন্যে বউ প্রয়োজন হয় না, ওয়াশিং মেশিন আছে। অসুখ করলে হাসপাতাল আছে। এমন কি, মরে যাবার পর বুক চাপড়ে শোক করার জন্যেও প্রফেশনাল কোম্পানি আছে। বললেন, সারাদিন খেটেখুটে এসে একটু সময় কাটানো, একটু কথাবার্তা। তার জন্যে টি-ভি আছে—আঠাশটা চ্যানেল। টেলিফোন আছে—যার সঙ্গে খুশি গল্পগুজব করা যেতে পারে। আমার এক বন্ধু আছে—এখান থেকে একত্রিশ মাইল দূরে থাকে। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় আধ ঘণ্টা ফোনে আড্ডা হয়—ওরও বউ নেই।"

সাজানো সংসারের চাবিটি আমার হাতে দিয়ে সুপ্রতীক সেন কর্মক্ষেত্রে বেরিয়ে গেলেন। বললেন, "প্রাণখুলে খান, বই পড়ুন, লেখালিখি করুন, ফোন করুন। এঅঞ্চলে আপনার ভক্তের সংখ্যা বেশি না হলেও শূন্য নয়। স্থানীয় বঙ্গীয় সমাজের টেলিফোন তালিকা আমার টেবিলের উপরেই রইলো। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসছি।"

আমি জানি নিয়মানুবর্তিতার দেশ আমেরিকা। এখানে কর্মক্ষেত্রেও কঠিন শৃঙ্খলা। বললাম, "আমার জন্যে নিজের অসুবিধে সৃষ্টি করবেন না।"

সুপ্রতীক বললেন, "আপনি একটুও ভাববেন না। একই আপিসে অনেকদিন কাজ করছি—পুরনো চাল ভাতে বাড়ে। তাছাড়া আমাদের বাঙালি ব্রেন, প্রচণ্ড চাপের মধ্যেও কী করে একটু ফাঁকি মারা যায় তা খুঁজে বার করে নিতে পারে। আপনার অবগতির জন্যে জানাই, ফাঁকি মারতে খোদ আমেরিকানও কম যায় না। বাইরে ওই রকম বলে বেড়ায়—সব কিছু স্কেডিউলের শিকলে বাঁধা। ওসব মিটিং কা বাত—সবাই যদি পুরনো যুগের আমেরিকানের মতন নিষ্ঠাবান হতো তা হলে জাপানিদের হাতে জাতটার এই বে-ইজ্জতি হতো না।"

নরম বিছানায় শুয়ে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে আমি 'নামমাত্র বিবাহিত' শব্দটি সম্পর্কে চিন্তা করছি। পাত্রপাত্রী স্তম্ভে শব্দটি লক্ষ্য করেছি কিন্তু কথাটা কেন বিস্ময় জাগায়নি তাই ভাবছি।

এদেশে বিবাহ থেকে মানুষের প্রত্যাশা অনেক। অন্নবস্ত্র সুরক্ষার জন্যে এদেশের মেয়েরা স্বামীর গলায় মালা দেয় না। এমনকী সেক্সও বিবাহসম্পর্কের বাইরে যথেষ্ট পাওয়া যায়। সত্য কথা বলতে কি, বিবাহ মানেই বাধাবন্ধনহীন দেহবিলাসের উপর নিয়মশৃঙ্খলার আধিপত্য। আসলে বিবাহ একটা বিরাট জিনিস। অ্যালিসা ঠিকই বলেছিল সুপ্রতীককে, বিয়েটা নামমাত্র বিবাহে পর্যবসিত যাতে না হয় সেই জন্যেই ডাইভোর্স করেছি আমরা।

আমার হঠাৎ মনে হলো, ভারতবর্ষে আমরা প্রায় সকলেই নামমাত্র বিবাহিত। কারণ, আদর্শবিবাহিত জীবনের বিস্তৃতি ও গভীরতা আমাদের অজ্ঞাত। আমরা স্রেফ একদিন উপোস করে ঘণ্টাখানেক ওং ভোং করে সন্ধেবেলায় একটি উপোসী মেয়ের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিই। তারপর ঘরসংসারের নাম করে একটি মেয়ের অন্নবস্ত্রের জোগান দিই। তারপর আমরা সন্তান উৎপাদন করি, সন্তান মানুষ করতে-করতেই আমরা ল্যাজেগোবরে হয়ে যাই। যুগলজীবনের গভীরে প্রবেশের প্রচেষ্টাই নেই আমাদের মধ্যে, অথচ আমরা বিবাহিত। সুতরাং 'নামমাত্র বিবাহিত' শব্দটি আমাদের ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থে প্রযোজ্য।

বিবাহ প্রসঙ্গে আচমকা রূপার কথা মনে পড়ে গেল। রূপা একসময় চৌধুরী ছিল। বিয়ের পর হয়েছিল রূপা মিত্র। তারপর বিশেষ বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এখন তার পদবী কী হয়েছে কে জানে! অথচ রূপার সঙ্গে আমার একবার দেখা হওয়া প্রয়োজন। কত ঘটনা যে সুদূর কলকাতায় শুরু হয়ে সুদূর প্রবাসে হাজির হয়েছে, কিন্তু অসমাপ্ত রয়ে গিয়েছে তার ঠিকঠিকানা নেই।

ওই যে বঙ্গীয় সম্মেলনে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বললেন, আমরা সবাই ভাগ্যসন্ধানে বিদেশ পাড়ি দিয়েছিলাম তা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। অবশ্য ভাগ্য বলতে

যদি শুধু বৃত্তি ও অর্থ বোঝায়।

রূপা মিত্রর তো বৃত্তি ও অর্থ কোনোটার ওপরেই তেমন আকর্ষণ ছিল না। কবে কোথায় হাওড়ার এক অখ্যাত গলিতে রূপার শাশুড়ির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, তার জের বিদেশে টানার কোনো মানে হয় না। কিন্তু তাঁকে আমি কথা দিয়েছিলাম, সুযোগ পেলে আমি রূপাকে খুঁজে বার করবো।

মাসিমা আমাকে পুরো বিশ্বাস করতে পারেননি। আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, "হাজার কাজে ব্যস্ত, তুমি ভুলে যাবে।" আমার থেকে শত গুণ ব্যস্ত লোক পৃথিবীতে আছে, আমি ভুলবো না, মাসিমাকে আমি আশ্বাস দিয়েছিলাম।

আমি তখনই শুনেছিলাম, রূপা ও প্রতিমাদি দু'জনেই এই যেখানে আমি এই মুহূর্তে শুয়ে আছি তার কাছাকাছি কোথাও বসবাস করেন।

(প্রতিমাদির গল্প পরে বলা যাবে।)

রূপা কোনোদিন আমার সঙ্গে বিদেশ থেকে পত্রালাপ করেনি, শুধু এদেশে পৌঁছে আমাকে একটা রঙিন পিকচার পোস্টকার্ড পাঠিয়েছিল। তাতে লিখেছিল, "শংকরদা, অবশেষে আপনার আবিষ্কৃত দেশে হাজির হয়েছি পরে বিস্তারিত খবরাখবর দেবো।"

পরে আর কোনো খবরাখবর সরাসরি রূপার কাছ থেকে আসেনি। কিন্তু মাসিমার কাছে আমি যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তা মুম্বাই থেকে মার্কিন মুলুকের বিমানে চড়েই আমার মনে পড়েছিল। জীবনটা কেমন এক ধারাবাহিক উপন্যাসের মতন এগিয়ে চলেছে—কত চরিত্র সেখানে উপস্থিত হচ্ছে, বিস্তারিত হচ্ছে, আবার কিছু সময়ের জন্যে হারিয়ে যাচ্ছে পরিসমাপ্তির আগে। কত মানুষের সঙ্গে হঠাৎ পরিচয় হলো, কত সুখ-দুঃখের ইতিহাস আমার চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হলো, ভাবলে এক একসময় বিস্ময় লাগে। ঈশ্বর আমাকে অনন্ত সুযোগ দিয়েছেন। বহুমানবের তীর্থশালায় প্রবেশের অনুমতি পেয়ে আমি ধন্য।

বেঙ্গল সোসাইটির সভ্যতালিকায় রূপার নামটা যে অতো সহজে খুঁজে পাবো তা কল্পনা করিনি।

রূপার টেলিফোন নম্বর আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে ; আর আমি ভাবছি, আচমকা এইভাবে রূপাকে টেলিফোন করাটা যুক্তিসঙ্গত হবে কি না। ভারতবর্ষে মানুষের বিন্দুমাত্র প্রাইভেসি নেই, তাই সেখানকার মানুষ বিদেশে এসে প্রথমেই প্রাইভেসির ভক্ত হয়ে ওঠে। প্রাইভেসির অভাব যে কী নিদারুণ অস্বস্তির কারণ হতে পারে তা মার্কিনিরা জানে না। প্রাইভেসি শব্দটার অর্থ গোপনীয়তা বললে সবটা পরিষ্কার হয় না। 'গোপনীয়তা' শব্দটার মধ্যে কিছুটা লুকনো-লুকনো ভাব আছে।

হাওড়ার যে পরিবেশে আমি মানুষ হয়েছি, সেখানে প্রাইভেসি মানে

কলঘরের দরজা ভিতর থেকে আঁটবার ব্যবস্থা যাতে মেয়েরা নিশ্চিন্তে কাপড় ছাড়তে পারে। প্রাইভেসির প্রসার যে অনেক বিস্তৃত তা সমাজের উঁচুতলায় না-উঠলে পরিপূর্ণ বোঝা যায় না। আমেরিকান মেয়ে ক্যাথারিন আমাকে বলেছিল, 'প্রাইভেসি মানে নিজেকে নিজের কাছে রাখার অধিকার। তোমরা কোনোদিন প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা সবাইকে প্রাইভেসির অধিকার দিচ্ছো। পরের ব্যাপারে অকারণ নাক গলিয়ে গলিয়ে তোমাদের প্রত্যেকটা মানুষের নাকে কালসিটে পড়ে গিয়েছে ; তাই তোমরা নিজেদের আবিষ্কার করতে পারছো না।' ক্যাথারিনের বলার অধিকার আছে, সে হাওড়ার টিকিয়াপাড়ায় এবং বাগনান গ্রামে ন'মাস কাটিয়ে গিয়েছে। তার গবেষণার বিষয় ছিল পাড়াপড়শিদের সম্পর্ক।

রূপার মুখের ছবিটা আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠছে। রূপা স্বভাবতই বিরক্ত হতে পারে, সাতসমুদ্র পেরিয়ে আমি তাকে তাড়া করছি কেন? যে সব কথা সে ভুলতে চাইছে তা আমি কেন গায়ে পড়ে তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি? আমি যতদূর জানি, বহু বছর সে দেশে ফেরেনি, আমার জানাশোনা লোকের কাছে সে চিঠি লিখেছে এখনও শুনিনি। আসলে দেশের সঙ্গে সে বোধহয় কোনো যোগাযোগই রাখতে চায় না।

রূপার মনোভাব যদি সত্যিই অমন হয় তো হলে আমার বলবার কিছু থাকতে পারে না। হাজার হোক, একটা জীবন নিয়েই আমাদের হিসেবনিকেশ। যে দেশে আমি জন্মেছি সে দেশেই যে আমাকে মরতে হবে তার কোনো আইন নেই—বার্থ সার্টিফিকেটের সঙ্গে ডেথ সার্টিফিকেটের কোনো সম্পর্ক নেই। যে দেশে আমি শৈশব, কৈশোর ও যৌবন কাটিয়েছি তার থেকে দূরে আসবার সরকারি পাসপোর্ট যদি আমার মিলে থাকে তা হলে সে দেশের সঙ্গে সব যোগাযোগ ছিন্ন করার অধিকারও আমার আছে।

আমি দ্বিধায় পড়ে গেলাম। রূপাকে ফোন করাটা আমার কি ঠিক হবে? নানা জনপদ ঘুরতে-ঘুরতে আমি যদি রূপার বাড়ির খুব কাছাকাছি এসেও থাকি তাতে কী এসে যায়? কত হাজার-হাজার লোক প্রতিদিন এই দেশে আসছে। তাদের অনেকেরই বসবাস কলকাতায়, তারা তো রূপার প্রাইভেসি ভঙ্গ করছে বলে শুনিনি। কিন্তু মাসিমার কথাও আমার মনে পড়ে যাচ্ছে। মাসিমা বিছানায় শুয়ে বলেছিলেন, "মনে থাকবে তো?" স্বীকার করছি, আমি মাসিমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। যে মানুষ আর পৃথিবীতে নেই তাকে কোনো কথা দেওয়া থাকলে তা পালনের চেষ্টা করা উচিত এমন একটা রেওয়াজ সব সমাজে আছে। কিন্তু এর মধ্যে কোথাও ফাঁকিও আছে। মাসিমা যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন কত লোককে ডেকে ডেকে তিনি কত অনুরোধ করেছেন, কেউ সে

সব অনুরোধ রাখেনি। সুতরাং শেষ অনুরোধের কোনো বাড়তি মূল্য থাকাটা অর্থহীন।

না। এতোদূর যখন এসেছি তখন রূপার সঙ্গে যোগাযোগ করাটাই যুক্তিযুক্ত। মধ্যপশ্চিমের এই শহরে আমি সুপ্রতীক সেনের আকর্ষণেই ছুটে আসিনি ; আমার প্রধান লক্ষ্য অবশ্যই রূপা। এরপর আছেন প্রতিমাদি। দেশটা যতই বড় হোক মানুষকে খুঁজে পাওয়া এখানে ততটা শক্ত নয়। তার একটা কারণ টেলিফোন। টেলিফোন ছাড়া কোনো বাড়ি এদেশে আছে কি না সন্দেহ। ধন্য আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলসায়েব তোমার আবিষ্কার! কোনো মানুষই তোমার থেকে পাঁচ সেকেন্ডের বেশি দূর নয়। এই অসাধারণ যোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিক মার্কিন সভ্যতার ভিত্তিভূমি। কেউ কখনও বিনা নোটিসে কারও বাড়ি হাজির হয় না ; প্রথমেই টেলিফোনে সময় ঠিক করে নিতে হয়। টেলিফোন খারাপ অথবা চেষ্টা করেছিলাম কনেকশন হয়নি এই বুজরুকি মার্কিন দেশে অচল। ভারতবর্ষে নিজেদের কত দোষ মানুষ বিকল টেলিফোন ও বিফল ডাকবিভাগের উপর চাপিয়ে দেয়। সুপ্রতীক সেনের মুখেই শুনেছিলাম, যেমন দেশ তেমন টেলিফোন, বলে একটা প্রবাদ মার্কিন সমাজে চালু আছে। টেলিফোন যন্ত্র যে আদৌ খারাপ হতে পারে তা মার্কিন দেশে বসবাস করলে বিশ্বাস হয় না।

আজকাল আবার টেলিফোন থেকে কত বাড়তি পাওনা। এই যে একলা মানুষ সুপ্রতীক সেন। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় যন্ত্রটিকে রিডিরেক্ট করে যেতে পারেন। মনে করুন, সুপ্রতীক তাঁর বন্ধু অবিনাশের বাড়িতে যাচ্ছেন। সমস্ত কল্ বিনাবাক্যব্যয়ে অবিনাশের ফোনে চলে যাবে। অন্যত্র কনফারেন্স কল্-এর কথা লিখেছি।

শহরের তিন বন্ধু একসঙ্গে তিন পাড়া থেকে একত্রে টেলিফোনে আড্ডা দিতে পারেন। আড্ডা জিনিসটা আমেরিকানদের মনঃপূত নয়, তাই বলা হয় কনফারেন্স। আমাদের দেশে অফিসের আড্ডাকে যেমন প্রায়ই মিটিং বলা হয়। দেশি সায়েবরা চা খেতে-খেতে প্রাণ খুলে গল্পগুজব করছেন, কিন্তু দর্শনপ্রার্থীকে বেয়ারা বলছে সাব 'মিটিন' মে হ্যায়।

এবার সমস্ত দ্বিধা ত্যাগ করে রূপার নম্বরে ডায়াল করলাম। রূপা ফোন ধরলো না, কিন্তু রূপার সেই পুরনো কণ্ঠস্বর ভেসে উঠলো। "হাই! রূপা বলছি। আমি একটু বেরুচ্ছি, ফিরবো দশটা নাগাদ। যদি কিছু বলবার থাকে বলে ফেলো।"

আমি বুঝলাম যান্ত্রিক টেলিফোন অপারেটর কাজ করছে। একটি টেপ রেকর্ডার থেকে রূপার নিজস্ব কণ্ঠস্বর যা শোনা যাচ্ছে। সুপ্রতীকের কাছে আজ

সকালেই শুনেছি, বন্ধুবান্ধবরা অনেক সময় মজা করে গালাগালি রেকর্ড করে রাখে। যেমন : "তুমি হতচ্ছাড়া সারাক্ষণই বাইরে-বাইরে ঘুরে বেড়াও। কতদিন আর এমন বাউন্ডুলে থাকবে? বাড়ি ফিরেই লুচি, আলুরদম আর চিকেন কারি রাঁধতে বসবে, আমরা জনা পাঁচেক অতিথি হাজির হচ্ছি।" অনেক সময় ইংরিজির দেশে বাংলায় মেসেজ দেওয়া থাকে বিশেষ কারও জন্যে। প্রথমে ইংরিজি ঘোষণা। তারপরেই হয়তো : "জগদীশ, শালা তোর মুখদর্শন করতে চাই না। সেই জন্যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। দুপুরটা আমার ফ্রি, বাড়িতেই থাকবো, রান্নাবান্নাও করা আছে—কিন্তু তোর জন্যে নয়।" যন্ত্রকে কেন্দ্র করেও নানা রসিকতা চলে এইভাবে। রেকর্ডেড বাণী শুনে জগদীশ বুঝবে আজ দুপুরে তার নেমন্তন্ন রয়েছে। বন্ধু নিশ্চয় বাজার করতে বেরিয়েছে।

সুপ্রতীক বললেন, "ঘুমোবার সময়ে, অথবা টানা বিশ্রাম নেবার প্রয়োজন হলে, অথবা কোনো কাজ মন দিয়ে করার সময় এই রেকর্ডার চালানো যায়। নির্দিষ্ট সময়ের পরে আপনি দেখে নিন কেউ ফোন করেছিল কি না। যোগাযোগ ব্যবস্থা ত্রুটিহীন বলে আপনার প্রাইভেসি নষ্ট হবে তা এদেশের লক্ষ্য নয়। টেলিফোনের কল্যাণে দূর যেমন নিকট হয়েছে, তেমন ইচ্ছে করলে কাছে থেকেও দূরত্ব সৃষ্টি করা যায়।"

রূপার ফোনে হেঁয়ালি করার ইচ্ছে হলো। মজা করে বললাম, "আমি কে তা আন্দাজ করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়, রূপা। তবে যদি ইচ্ছে করো একবার এই নম্বরে ফোন করো...।"

আমার টেলিফোন নামিয়ে রেখেছি। ভালোই হয়েছে, রূপা বাড়িতে ছিল না। এখন রূপার প্রাইভেসিকে সম্মান করা গেল। তার ইচ্ছে হলে যোগাযোগ করবে, ইচ্ছে না হলে ফোন করবে না।

আমেরিকান সোফায় আধশোয়া অবস্থায় ক্রমশ ইন্ডিয়ায় ফিরে যাচ্ছি। দেশে যখন থাকি তখন প্রায়ই বিদেশ দেখার ইচ্ছে হয়, কিন্তু বিদেশে এলেই দেশের জন্যে মন কেবলই আনচান করে। আমি বেহালায় ঘোষাল লেনের রূপাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। সরু রাস্তাটা সরু হতে হতে এমন সরু হয়ে গিয়েছিল যে সেখানে রিকশ ঢোকাও কষ্টকর ছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরীতে ইংরেজের শাসনকালে এইসব পথঘাট কীভাবে সরকারি স্বীকৃতি পেয়েছিল তা আন্দাজ করা অসম্ভব। হয় তখনও নগরপরিকল্পনা সম্বন্ধে কোনো ভাবনা-চিন্তা ইংরেজের মস্তিষ্কে প্রবেশ করেনি, না-হয় ঘুষ নামক মহাশক্তি তখনও সক্রিয় ছিল। কালা আদমির মহল্লায় মানুষ কীভাবে বসবাস করবে সে সম্বন্ধে কোনো মাথাব্যথা ছিল না।

সেই সরু গলিতে আমি রূপাকে নানা রূপে দেখেছি। বেহালা ঘোষাল

লেনের সেই সরু গলি পেরিয়ে, ভারতবর্ষকে পিছনে ফেলে রেখে রূপার মতন মেয়ে যে কখনও এই সুদূর দেশে আসতে পারবে তা আমার কল্পনার অতীত ছিল। এই আসার পিছনে আমারও একটু ইন্ধন ছিল কি না তা আমার ঠিক মনে পড়ে না। কিন্তু মাসিমা যখন খুব মানসিক যন্ত্রণা পেতেন তখন বলতেন, “কী যে হলো! কেন যে রূপাকে তুমি আরও পড়বার জন্যে উৎসাহ দিলে!” আমি চুপচাপ থেকেছি। সমস্ত জীবনে অনেক ছেলে-মেয়েকেই পড়াশোনায় উৎসাহ দিয়েছি, সময়কালে নিজে ওই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছি বলে মনের কোথাও দুঃখ ছিল। উৎসাহ, অনুপ্রেরণা পেলেই পড়াশোনায় মন বসে না—কত জানাশোনা ছেলেমেয়ে আমার কথা এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বার করে দিয়েছে। একমাত্র রূপাই হঠাৎ যখন বিপুল উৎসাহ নিয়ে অধ্যয়ন তপস্যায় ডুবে গেল তখন নিশ্চয় অন্য কোনো শক্তি তার মধ্যে কাজ করছিল। মাসিমা শুধু-শুধু আমার উপর দোষটা চাপাতে চান। আমার বলবার কিছু নেই।

কিন্তু সবচেয়ে যা আশ্চর্য, বিদেশ সম্বন্ধে রূপার বিন্দুমাত্র জ্ঞান ছিল না। একবার বিদেশে গিয়ে আমি তখন বিদেশ বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছি। কত লোককে বোঝাবার চেষ্টা করছি আমেরিকা দেশটা কত বড়—খান কয়েক ভারতবর্ষ তার মধ্যে ঢুকে পড়বে। কী অবিশ্বাস্য বিস্তৃতি এই দেশের এবং কী তার বৈচিত্র্য ও বৈভব।

সদ্যপ্রাপ্তজ্ঞান থেকে আমি কতজনকে বোঝাচ্ছি ওয়াশিংটন বললে চলবে না, সঙ্গে ডি-সি কথাটাও লাগাতে হবে যদি আমেরিকার রাজধানী বোঝাতে চায়। কারণ আরও অনেকগুলো ওয়াশিংটন আছে ওদেশে—আমাদের নেতাজি নগর অথবা মহাত্মা গান্ধী রোডের মতন। মায় লন্ডন শহরও আছে মার্কিন দেশে—একটু অসাবধান হলেই বিপদ।

যাদের বিদেশ সম্বন্ধে হাতেখড়ি দিয়েছি তাদের কয়েকজন শেষ পর্যন্ত বিদেশে পাড়ি দিয়েছে। আমেরিকায় তারা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আমার এবারের বিদেশ থাকাকালীন তারা কেউ-কেউ দেখা করেছে। আমি তাদের তুলনায় বিদেশ সম্বন্ধে কত কম জানি ; তাদের অনেকেই মার্কিন সভ্যতা সম্পর্কে আমার অজ্ঞতা দূর করেছে। আমার অবস্থা প্রাইমারি ইস্কুলের মাস্টারের মতন। যাদের হাতে খড়ি দিয়েছিলাম তারাই সময়ের স্রোতে বিদ্যার জাহাজ হয়েছে, আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই পড়ে আছি।

রূপার কথাটা স্পষ্ট মনে আছে। ঝট করে কোথা থেকে একটা স্কুল অ্যাটলাস নিয়ে এলো, তারপর নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, স্যানফ্রানসিসকো কিছুই খুঁজে না পেয়ে এমন ভাব করলো যেন ওসব শহরই নেই। বড় বড় শহরের সমস্যা শেষপর্যন্ত সমাধান হলো, কিন্তু যখন আমি চ্যাপেল হিল নামে একটি

বিশ্ববিদ্যালয় শহরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলাম তখন রূপা আমাকে চ্যালেঞ্জ করলো, ম্যাপে দেখিয়ে দিন। অনেক খোঁজখবরের পরও যখন মানচিত্রে চ্যাপেল হিলের সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে আমাকে বলতে হলো, ওটা চ্যাপেল হিলের দোষ নয়, ম্যাপের দোষ। কিংবা চ্যাপেল হিলের মানুষরা দূরদর্শী—ম্যাপে নাম ছাপিয়ে আজেবাজে লোককে আকর্ষণ করে তারা পুরবাসীদের শান্তি বিঘ্নিত হতে দেয়নি। আমি বলেছিলাম, "রূপা, তুমি ব্যাপারটা বোঝো। ম্যাপটা ছোট।" সুরসিকা রূপা তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিল, "বাঃ শংকরদা, ইন্ডিয়ান মেয়ে পেয়ে বোকা বানাবার চেষ্টা করছেন! বড়-বড় ম্যাপে বড়-বড় শহরের কথা থাকবে, ছোট-ছোট ম্যাপে ছোট ছোট জায়গার নাম থাকবে।" রূপার সেই রসিকতা আমার এখনও মনে আছে। মেয়েটা তখনও কত সহজ, সরল ও অনভিজ্ঞ ছিল। সেই রূপাই এখন আমেরিকাপ্রবাসী, ভাবতে অবাক লাগে।

আধুনিকতার তীর্থভূমি আমেরিকায় এসে ভারতবর্ষের সহজ সরল মানুষদের দ্রুত পরিবর্তনের ব্যাপারটা আমাকে বিস্মিত করে জেনে সুপ্রতীক মৃদু হেসেছিলেন। বলেছিলেন, "বাইরের গেঁয়ো লোকেরাই এদেশে এসে মডার্ন আমেরিকান হয়ে যায়। এর অসংখ্য মজার ছবি পাবেন মার্কিনপ্রবাসী ইহুদি সাহিত্যিকদের লেখায়। আধুনিকতার পীঠস্থান নিউইয়র্কে কিছু-কিছু গাঁইয়া ইহুদির ছবি সিংগার ইত্যাদি ইহুদি সাহিত্যিক যেভাবে এঁকেছেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। খবরের কাগজের রিপোর্ট বেরুলে ভাবতাম গালগল্প, ইহুদিদের ছোট করবার জন্য লিখছে। কিন্তু আপনিই তো লিখেছেন, কাগজের রিপোর্টে চরিত্রগুলো সত্য হলেও ঘটনাগুলো কাল্পনিক, আর গল্প উপন্যাসে চরিত্রগুলো কাল্পনিক হলেও ঘটনাগুলো প্রায়শই সত্য।"

সুপ্রতীক ইতিমধ্যেই আমাকে কয়েকটি ইহুদি গল্পসংকলন উপহার দিয়েছেন। মাত্র কয়েক বছর আগেও এরা কী দরিদ্র ও অসহায় ছিল তা জানা নাকি আমাদের প্রয়োজন। অন্তত ভারতবাসীদের নিরাশা কাটবে, সকলে মিলে চেষ্টা করলে যে দারিদ্র্যের এবং অনগ্রসরতার অপসারণ হতে পারে এই বিশ্বাস আমরা ফিরে পাবো।

সুপ্রতীক বলেছিলেন, "পোল্যান্ড, রুমানিয়া, লিথুয়ানিয়া, রাশিয়া থেকে যেসব ইহুদি রিফিউজি এদেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন সৌভাগ্যক্রমে তাদের মধ্যে কয়েকজন সৃষ্টিশীল মানুষও ছিলেন। তাই প্রবাসে নবজীবনের অবিস্মরণীয় চিত্রমালা তাঁরা পৃথিবীর পাঠকদের উপহার দিতে পেরেছেন। ভারতীয়দের সেই সৌভাগ্য এখনও হয়নি। এম-এস-সি, পি এইচ ডি-ধারীরা এদেশে নিরন্তর চেষ্টায় প্রতিষ্ঠা লাভ করছেন, কিন্তু হাতের গোড়ায় প্রবাসী সাহিত্যিক না-থাকায়

আমাদের ইতিহাস অলিখিত থেকে যাচ্ছে।”

টেলিফোন বাজতে শুরু করেছে। ওদিকে রূপার কণ্ঠস্বর। আমার উত্তর শুনেই রূপা বললো, “আপনি ভাবছেন, নাম না বললে আমি চিনতে পারবো না। কিন্তু তা হয় না, শংকরদা।”

“রূপা! এতদিন পরেও তুমি আমার গলার স্বর মনে রেখেছো?”

রূপা হাসলো। “আপনি আমার খোঁজ করেন কি না দেখছিলাম। না হলে ওই শুক্রবারের সাহিত্যসভায় আপনাকে পাকড়াও করতাম।”

এবার তা হলে রহস্যটা পরিষ্কার হচ্ছে। আমার আগমন-সংবাদ এখানে বাঙালি মহলে কিছুটা প্রচারিত হয়েছে, আর বাকিটা আন্দাজ করে নিয়েছে রূপা। আমি বললাম, “রূপা, তোমার গলার স্বরে সেই পুরনো ঝংকার রয়েছে। একটু ওজন এসেছে তোমার উচ্চারণে।”

“আপনিই তো বলেছিলেন, আকাশবাণীতে ঘোষিকার পদে আবেদন করতে। অ্যাপ্লিকেশনও করেছিলাম, কিন্তু কোনো উত্তর এলো না।”

“রূপা! তোমার সে-সব কথা মনে আছে?”

“সব মনে আছে, শংকরদা। সেই সেবারে বাসে আমার পার্স চুরি হয়ে গেল। চন্দ্রমাধব রোডে আপনার অফিস থেকে পাঁচ টাকা নিতে গেলাম, আপনি এগকারি, টোস্ট, চা খাইয়ে ছাড়লেন।”

“তোমার মাথায় বোধহয় একটা কমপিউটার বসানো আছে, রূপা। তাই তুমি এদেশেও সফল হয়েছো, পি-এইচ-ডি পেয়েছো।”

“শংকরদা, আপনিই বলেছিলেন প্রত্যেক মানুষের বুকের মধ্যে একজন সুপারম্যান অথবা সুপারউয়োম্যান ঘুমিয়ে আছে। কথাটা অবশ্য আপনার নয়, আপনার বারওয়েল সায়েবের।”

“রূপা, তুমি আমাকে অবাক করে দিচ্ছো।”

“শুনুন, শংকরদা, প্রত্যেক মানুষের মাথায় একটা সুপার কমপিউটার বসিয়েই ভগবান তাকে বিশ্বসংসারে পাঠিয়েছেন। আমার এক মাস্টারমশাই এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে হিসেব করে দেখিয়েছেন, মানুষের মাথার কমপিউটার মাত্র ১/৩ কিউবিক ফুট জায়গা নেয়, মাত্র দশ ওয়াট পাওয়ার কাজ করে। মাথার মধ্যে রাখতে পারে ২৮০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ ঘটনা।”

“আমার মাথা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে রূপা। তোমার সঙ্গে কথা বলে চিরকাল আমি আনন্দ পেয়েছি।”

“খুব সোজা—২৮০-র পিঠে আঠারোটা শূন্য বসিয়ে দেবেন। আপনার পাঠকদের বলবেন, মানুষের অসাধ্য কিছু নেই।”

রূপা এবার নিজের কথায় ফিরে এলো। "আমি খুব লাকি, শংকরদা। ভাগ্যে আজ আমি কাজে যাবো না ঠিক করেছিলাম। সেই পুরনো রোগ মাঝে-মাঝে মাথা ধরা। একবার ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম, ফিরে এসেই রিপ্লাই রেকর্ডারে আপনার গলা শুনলাম। খুব মিসট্রি ক্রিয়েট করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পারেননি। মনে আছে? আপনার রহস্য উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির পাঁচপাতা পড়ে আমি বলে দিয়েছিলাম দোষী কে।"

"সেই দুঃখেই আমি তো রহস্য উপন্যাস লাইনে গেলাম না, রূপা। প্রতিটি বুদ্ধিমতী মেয়ে শুরুতেই ধরে ফেলে আমার রহস্য উপন্যাসে কে দোষী।"

রূপা হাসলো, "আপনিই তো বলেছিলেন, পাজী লোকদের বুঝে নেবার সহজাত শক্তি আছে মেয়েদের।"

"কত লোককে কত কথা বলেছি, আজকাল মনে থাকে না, রূপা। তুমি যত্নে করে মনে রেখে আমাকে অবাক করে দিচ্ছো।"

টেলিফোন নামিয়ে দিয়েছি। রূপা আসছে।

টেলিফোন নামাবার আগে আমি বলেছি, "রূপা, তোমাকে খুঁজে বার করবার প্রয়োজন ছিল আমার। মাসিমা মৃত্যুশয্যায় আমাকে বার বার অনুরোধ করেছিলেন, আমি কথা দিয়েছিলাম তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবো।"

মাসিমা, অর্থাৎ রূপার শাশুড়ি নেই, একথা রূপার কানে পৌঁছয়নি। সে শুধু বললো, "মা নেই?"

পৃথিবীতে কেউ চিরকাল থাকে না। হাতের গোড়ায় যখন থাকে তখন কোনো খোঁজখবর না নিয়ে, চলে যাবার পরে দুঃখ করারও অর্থ হয় না। কিন্তু পৃথিবীর এই নিয়ম—জীবিতকালে অবহেলা, অবর্তমানে অনুশোচনা। আয়ত্তের বাইরে চলে না গেলে মানুষের দাম বাড়ে না, এই নির্মম সত্যটুকু আমরা বুঝেও বুঝতে চাই না।

রূপা চৌধুরী এখানে কীর্তিমতী মহিলা। গবেষিকা হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা রেকর্ড স্থাপন করে সে অধ্যাপনা শুরু করেছিল। এখন অধ্যাপনা থেকে সাময়িক ছুটি নিয়ে সরকারের পক্ষে কী এক সমীক্ষা চালাচ্ছে। ডজনখানেক সায়েব-মেমকে তার কথায় উঠতে বসতে হয়।

রূপা চৌধুরী যে এখানকার বাঙালি সমাজের সঙ্গে তেমন যোগাযোগ রাখে না সে খবর আমি অন্য সূত্র থেকে পেয়েছি। আজও যখন রূপা শুনলো আমি ডাইভোর্সি সুপ্রতীক সেনের বাড়িতে আছি তখন কিছুটা স্বস্তি পেলো। কোনো আদর্শ বাঙালি পরিবারে আমার আশ্রয় জুটলে তার অসুবিধা হতো। কারণ নাথবতী বাঙালি মহিলারা নিঃসঙ্গ বাঙালি মহিলাদের অত্যন্ত সন্দেহের চোখে

দেখেন। তাঁদের সম্বন্ধে নানা কৌতূহলে মন ভরে ওঠে। এই সব উৎসুক নাথবতী স্বদলে থাকলে সি-আই-ডি অথবা সি-বি-আই-এর সম্পদ হতে পারতেন। এখানকার বাঙালিদের ব্যক্তিজীবনের কোনো সংবাদই তাঁদের অজানা থাকে না। এঁদের অনেকেই প্রাইভেসি-সুখেও অভ্যস্ত হয়ে উঠলেও অন্যের প্রাইভেসিকে এখনও সম্মান করতে শেখেননি। এই সব পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রূপা সহজবোধ্য কারণে এড়িয়ে চলে। তাছাড়া সৌজন্যের ব্যাকরণ নিয়েও টানাপোড়েন চলে। নাথবতী গৃহিণী সৌজন্যের খাতিরেই খাবার এগিয়ে দেন, অতিথি কিছু মুখে না তুললে গৃহস্থের অকল্যাণ এই ধারণা বিদেশের মাটিতেও প্রবল থেকে যায়। এরপর বলতে হয়, এখানে বসেই দাদার সঙ্গে গল্প করুন, দুপুরেও দাদার সঙ্গে লাঞ্চ করুন। কিন্তু অনাথবতীর একটাই ইচ্ছা, কোনোক্রমে দাদাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন, শ্যাম রাখি না কুল রাখি? দু'জনের প্রতিই অনুগত হতে গিয়ে অকারণে বাড়তি সমস্যার সৃষ্টি হয়ে যায়।

অনেক লাজুক অনাথবতী সাহস করে এতোটা এগোতে চান না, ফলে গল্প হাতছাড়া হয়ে যায়। আমার মতন মানুষদের জীবনে নিষ্ঠুর সত্যটি হলো: দেশ দেখবার জন্যে নয়, মানুষ দেখার লোভেই স্বদেশের নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করে বিদেশে পাড়ি দিয়েছি। সুতরাং মানুষের সান্নিধ্যে আমার সুযোগ যেন নষ্ট না হয়।

বাইরে বেল বাজছে। দরজা খুলে দিতেই অনেকদিনের হারিয়ে-যাওয়া রূপাকে খুঁজে পেলাম। "রূপা, তোমার চশমার ফ্রেমটা ছাড়া আর কিছুই পাল্টায়নি! আমি ভাবতে পারিনি, এতো বছর পরে, এতো ঘটনার শেষে তুমি ঠিক সেই একই রকম থাকবে।"

অপ্রত্যাশিতভাবে রূপা ঢিপ করে আমাকে প্রণাম করলো। আমি ওর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করতে গিয়ে লক্ষ করলাম মাথায় সিঁদুর নেই। শেষবার যখন কলকাতায় ওর প্রণাম গ্রহণ করেছিলাম তখন সিঁথিতে সিঁদুর ছিল।

রূপা এবার তার পুরনো সুরসিক মেজাজ ফিরিয়ে আনলো। আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "আপনার মাথার চুল কমেছে, গুরুত্ব বেড়েছে এবং ট্রপিকাল কানট্রিজে থেকেও রং ফর্সা করেছেন। কিন্তু বয়স আপনার তেমন বাড়েনি, শংকরদা।"

"এসব ক'টার জন্যেই দায়ী তোমার বউদি। সকালবেলায় শিবকালী ভট্টাচার্য নির্দেশিত কী এক পাঁচন খাওয়ায়—যার মধ্যে অনন্ত যৌবন ও অনন্ত জীবনের সম্ভাবনা রয়েছে।"

"শিবকালীবাবুর অনুমতি নিয়ে পাঁচনের পেটেন্ট নিন, এদেশে আপনি বিলিয়নিয়ার হয়ে যাবেন, শংকরদা। শরীর সুস্থ রাখতে ও যৌবনকে বুঝিয়ে-

সুঝিয়ে বেঁধে রাখবার জন্যে মার্কিনিরা সর্বস্ব দিতে পারে।"

"ওই হাওয়া আমাদের দেশেও হাজির হয়েছে, রূপা। আমার সমবয়সি বন্ধুরা সবাই বৌকে বলেছে কেউ বুড়ো হতে চাইছে না।"

"বউদিদের পক্ষে এটা তো সুসংবাদ।" রূপার তাৎক্ষণিক উত্তর।

"হ্যাঁ, আগে বলতো কুড়ি পেরোলেই বুড়ি। এখন বুড়ি হয়েই তোমার বউদির বান্ধবীরা দ্রুতগতিতে কুড়িতে ফিরে আসছেন। যোগাসন, সুখাসন, ফেসিয়াল, কেশকালিমা ইত্যাদির রমরমা ব্যবসা চলেছে কলকাতায়।"

শেষ বস্তুটির অর্থ বুঝতে পারছিল না রূপা। হেয়ার-ডাই-এর বাংলা শব্দ তৈরি হয়েছে শুনে খুব খুশি হলো। বললাম, "বাংলাদেশিদের ভয়ে আমাদেরও দু' চারটে বাংলা শব্দ ব্যবহার করতে হচ্ছে রূপা, ওরা বাংলাভাষাকে এমনভাবে সাজিয়ে নিচ্ছে যে ইংরিজীর উপর নির্ভর করার প্রয়োজনই হবে না। এমনকী বাংলায় ডাক্তারি প্রেসক্রিপসন পর্যন্ত লিখছে ওরা!"

আমি রূপাকে সোফায় এনে বসালাম। জানালাম গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে আমিই এই সংসারের মালিক। ওর মুখের দিকে তাকালাম। "রূপা তোমার ওজন বাড়েনি, বয়স বাড়েনি, শুধু ইন্দিরা গান্ধী স্টাইলে কপালের কাছে কয়েক গাছি চুল সাদা করে নিজেকে বিশেষত্ব দিয়েছো।" একটু ঝকঝকেও হয়েছে রূপা। চিরকালই সে শ্যামা, কিন্তু স্বাস্থ্যকর বিদেশি পরিবেশে শ্যামবর্ণের উপর যেন এক কোট পালিশ পড়েছে।"

"রূপা, তুমি আমাদের সেই রূপা, ভাবতে খুব আনন্দ হচ্ছে।"

" রুপো তো সোনা হয় না, রুপোই থেকে যায়, শংকরদা।" কী সুন্দরভাবে বললো আমাদের রূপা।

"রূপা, তুমি নাকি এদেশে এসে দিগ্বিজয় করেছো?"

"হরগোবিন্দ খুরানা আর চন্দ্রশেখর ছাড়া কোনো ইন্ডিয়ানই এ দেশ জয় করেনি, শংকরদা। তবে পরীক্ষায় একটু ভালো করতে হয় সবাইকে—না-হলে এরা থাকতে দেবে কেন? কিছু লোক ইদানীং ব্যবসায়ে ভালো করছে। এর ফলাফল হয় খুব ভালো হবে, না-হয় খুব খারাপ হবে।"

"রূপা, তুমি এরকম আশঙ্কা প্রকাশ করছো কেন?"

রূপা বললো, "সুপ্রতীক সেনকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন। বিজনেসে হাত পড়া মানে জাতে হাত পড়া। তাছাড়া পৃথিবীর কোথাও অনারাসী ইন্ডিয়ান বিজনেসম্যানের তেমন কিছু সুনাম নেই। দুষ্টুরা বলে, একখানা খাতায় ওদের অনেকেরই মন ভরে না। আইনকানুনকে ঝাঁপিতে পুরে মনের সুখে বাণিজ্য করার লোভ হলে এদেশে অন্য ইন্ডিয়ানদের সম্মানহানি হবে। এসব অবশ্য নাও হতে পারে, শংকরদা। ডাক্তারি করে অথবা চাকরি করে পৃথিবীতে কোনো জাত

কখনও বড়লোক হতে পারেনি। ব্যবসার প্রয়োজন রয়েছে।”

“তুমি এখন কী করছো, রূপা?”

“অনেকগুলো সমীক্ষা একসঙ্গে চলেছে, শংকরদা। তার মধ্যে একটি হলো বিভিন্ন জাতের ছোট ব্যবসায়ীদের নীতিবোধ, বিজনেস এথিক্স। ব্যবসায়ের উপর ধর্মীয় প্রভাব নিয়েও একটা বড় কাজ ইদানীং শেষ হলো। আমাদের টিমে দার্শনিক আছেন, অ্যানথ্রপলজিস্ট আছেন, অর্থনীতিবিদ আছেন, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ আছেন।”

আমার মন চলে যাচ্ছে সুদূর সেই অতীতে। আমি তখন ফিলিপস-এ কাজ করি। সংবাদপত্রের এক পরিচিত জনের চিঠি নিয়ে রূপা এসেছিল আমার অফিসে। মধ্যবিত্ত মহিলাকর্মীদের মানসিকতা নিয়ে সে তখন উপাদান সংগ্রহ করছে। আমাদের কারখানায় অনেক মহিলা কর্মী—শিক্ষিতা মহিলা শ্রমিকদের প্রথম প্রজন্ম সম্পর্কে অবহিত হতে হলে ফিলিপসের মতন জায়গা তখন সারা দেশে নেই।

রূপার মেধা ও তার ব্যক্তিত্ব আমাকে মুগ্ধ করেছিল। ওর চিন্তার স্বচ্ছতা, ওর ভাবনার বিশিষ্টতা দেখে কে বলবে সে তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পর্ব শেষ করেনি। আমি ওকে গবেষণার উপাদান সংগ্রহে সাধ্যমতো সাহায্য করেছি। ওর মাধ্যমে আমার নিজের প্রতিষ্ঠানের কর্মীদেরও আমি নতুনভাবে আবিষ্কার করেছি। বুঝেছি, নিয়মিত অনুসন্ধানের অভাবে আমরা কর্মীদের মনোভাব সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারি না। জ্ঞানের এই অভাব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সুদূরপ্রসারী ক্ষতি করে। রূপা দিনের পর দিন মহিলাদের সঙ্গে ক্যানটিনে খাওয়াদাওয়া করেছে। প্রেসে গিয়েছে, তাদের বাড়িতে হাজির হয়েছে। এদের জীবনের কাজের প্রভাব এবং কাজের উপর ব্যক্তিজীবনের প্রভাব অনেকটা উপন্যাসের মতন মনে হয়।

বলা বাহুল্য, রূপা বিশিষ্টতার সঙ্গে এম-এ পাস করেছে। তারপর সে আরও গবেষণায় আগ্রহী। আমাদের কারখানার ম্যানেজার খুশি হয়ে ওকে চাকরি দেবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু রূপা উৎসাহ দেখায়নি।

এরপর আমি ফিলিপস ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছি ভাগ্যসন্ধানে। কিন্তু রূপার সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়নি। রূপা তখনও পুরনো গবেষণাকে আরও গুছিয়ে নিয়ে মহিলা শ্রমিকদের সামাজিক সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে চায়। এই সময় আমার প্রথম বিদেশে যাবার সুযোগ হলো। রূপার তখন উৎসাহের অন্ত নেই—সে কলকাতার বাইরে কখনও যায়নি। আমাকে অনেক খবর দিলো, বললো ওসব খুঁটিয়ে দেখে আসবেন।

ফিরে এসে রূপার শুভবিবাহের সংবাদ পেলাম। বিবাহ, কিন্তু কতটা শুভ

তা বলা শক্ত।

রূপা নিজের ইচ্ছাতেই বিয়ে করেছে শুনলাম। কিন্তু যাকে বিয়ে করেছে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই। পাত্রটি ব্যবসায়ী। বেহালায় বসবাস।

বিয়েতে নেমন্তন্ন খাওয়া হয়নি বলে একদিন সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ জুটলো বেহালায় সেখানেই মাসিমাকে আবিষ্কার করা গেল। মাসিমার আদিনিবাস আমাদের চৌধুরী বাগানে। ওখানে ঘোষপরিবারের মেয়েরা সৌন্দর্য ও সুরুচির জন্যে সুখ্যাত। মাসিমাকে ওই বাড়িতে বহুবার দেখেছি—চৌধুরীবাগান লেনের প্রতিটি ইট আমার চেনা—আমার জীবনের স্মরণীয়তম অধ্যায়টি ওখানেই কাটিয়েছি। ওখান থেকেই ইস্কুলে গিয়েছি, ওখানেই অকালে বাবার মৃত্যুতে অথৈ জলে পড়েছি, ওখানেই শুরু হয়েছে আমার জীবনসংগ্রাম। ওখানেই আমি নিজের উপর বিশ্বাস ফিরে পেয়েছি। ওখানেই আমি প্রথম লেখক হবার স্বপ্নে বিভোর হয়ে বহু নিদ্রাবিহীন রাত্রি যাপন করেছি।

মাসিমা মানুষটি অতি শান্ত, কিন্তু নিষ্ঠাবতী হিন্দু। শুনেছিলাম বিবাহিত জীবনের প্রথম পর্বে নানা কষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্বাদে সেইসব অগ্নিপরীক্ষা আগেই শেষ হয়েছে। মাসিমার মেয়েটির ভালোই বিয়ে হয়েছে—সে বরোদাতে থাকে। আর পুত্রটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা না পেলেও সুরুচিসম্পন্ন ও প্রতিষ্ঠিত। সে ব্যবসায় মন দিয়েছে। যারা কোনো কারণে ম্যাট্রিক পাস করেনি অথচ উচ্চাশা রেখেছে তাদের পক্ষে ব্যবসাই তো শ্রেষ্ঠ পথ।

মাসিমার মনে ছেলের বিয়ে সম্বন্ধে নানা সন্দেহ ছিল। যদিও মাসিমা এমনই শান্ত প্রকৃতির যে কোনো প্রতিবাদই জোর গলায় করেন না।

মাসিমা বললেন, "যখন রূপার বাড়ি থেকে সম্বন্ধ এলো তখন দু'মাস আমি মুখে চাবি লাগিয়ে বসেছিলাম। বাউনের মেয়ে কায়েতের সংসারে আনার মধ্যে অনাচার আছে।" এতে ভালো হয় না বলেই তাঁর বিশ্বাস।

দু'একজন মাসিমাকে বলেছে, "এসব সেকেলে কথা। এখন বাউন, কায়েত, বদ্যি, সদ্গোপ, তিলি, এতো জাত নেই। এখন জাত দু' রকম—ভদ্রলোক ও ছোটলোক।" মাসিমা মুখ বুজে শুনেছেন, কিন্তু অকারণে সনাতন ধর্মকে অবজ্ঞা করার যুক্তি খুঁজে পাননি। মাসিমাকে বলা হয়েছে, "পতন হচ্ছে তো বামুনের মেয়ের—সে তো জেনেশুনেই কায়স্থতে বিয়ের মত দিয়েছে।" মাসিমার ভিন্ন ধারণা। "রূপাও তো আমার স্নেহের পাত্রী—আমার স্বার্থের জন্য অকারণে তাকে অধঃপতনে যেতে দেবো কেন?"

আর একটি বিষয়েও মাসিমা চিন্তিত। মেয়ে নাকি বিদ্যের জাহাজ। ইস্কুলে, কলেজে মেডেল পেয়েছে। তাঁর ছেলের তো লেখাপড়া হয়নি। বিদ্যায় ও গুণে স্বামী পাত্রী থেকে বড় হবে এই তো চায় বাপ-মা। তাঁর মেয়ে বি-এ, কিন্তু জামাই

এম-এসসি। বীরু, অর্থাৎ মাসিমার একমাত্র ছেলে, মোটেই উদ্বিগ্ন হয়নি। বলেছে, "কী সব বস্তাপচা ধারণা তোমার! বিয়েতে এখন ছোটবড় নেই—বিয়ে হয় সমানে সমানে।" মাসিমা মনে-মনে ভেবেছেন, এ তো সমানে-সমানে নয়—

এখানে মেয়ের বিদ্যের কাছে ছেলে কিছুই নয়। কিন্তু বীরু বলেছে, "আমি তো লুকিয়ে কিছু করছি না। আমি যে স্কুল ফাইনাল পাস নই তা তো রূপার জানা।" মাসিমাকে বোঝানো হয়েছে, পুরুষের পক্ষে বিদ্যের বহরটা তত বড় নয় যত বড় রোজগারের বহর। তাঁর ছেলে ব্যবসায়ে রোজগার করে ; দুদিন পরে আধডজন এম-এ পাস কর্মচারী তাকে স্যর স্যর করতে পারে।

মাসিমা তবুও মত দিতেন না, যদি-না তিনি বুঝতেন এ-বিয়ে হবেই। তাঁর অনুমতিটা এখানে লৌকিকতা মাত্র। তখন তিনি রূপার মা-বাবার সঙ্গে কথা বলেছেন।

রূপার সঙ্গে বীরুর আলাপ হয়েছিল এক বন্ধুর বাড়িতে। আচমকা পরিচয়টা যে শেষপর্যন্ত এতোদূর গড়াবে তা কেউ ভাবেনি। বীরু ব্যাপারটা চ্যালেঞ্জের মতন নিয়েছিল। যাদের ধারণা, স্কুল ফাইনাল ফেল ছেলেদের প্রেমের ক্ষেত্রে বাজার দর নেই তাদের একটু নাড়া দেওয়া আর কি!

বিয়ে হয়েছে, ধুমধাম করেই। জামাই বিজনেস করে এটাই যথেষ্ট—কেউ তার পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেট নিয়ে টানাটানি করছে না। মাসিমা মেনে নিয়েছেন। পরে আমাকে বললেন, "আমার ভয় কেটে গিয়েছে, শংকর। প্রথমে ভেবেছিলাম বিদ্যের জাহাজের সঙ্গে বীরু কেমন করে মানিয়ে নেবে? কিন্তু দেখলাম, বীরু আমার পাস না করলেও দুনিয়ার খোঁজখবর রাখে, ইংরিজি কাগজ পড়ে, ভালো গপ্পো করতে পারে।"

"আর বিদ্যের জাহাজটি?"

মাসিমা বললেন, "সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী!"

"মা সরস্বতী বলুন, মাসিমা।"

"সরস্বতীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির বংশে কেউ তো ঘর করেনি। আমরা মা লক্ষ্মীকেই চিনি। কে বলবে, পেটে যার এতো বিদ্যে সে কেমন করে এতো সরল হয়। ঠিক যেন আমার মেয়ে বুড়ি।"

আপাতবৈষম্য থাকলেও বিয়েটা ক্লিক করেছে দেখে আমারও আনন্দ। আমার গৃহিণী বললেন, "পরীক্ষায় গোল্ডমেডেলই পাক আর যাই হোক, মেয়েরা মেয়েই। সংসার করতে পেলে তারা আর কিছু চায় না।"

"ওসব সেকেলে চিন্তা, বন্দনা", আমি স্ত্রীকে সাবধান করে দিয়েছিলাম। কিন্তু বন্দনা একমত হয়নি। তার ধারণা, মেয়ের সমন্বয়ে তুলনাহীন। স্বয়ং মাসিমা যখন বউমার মায়ায় পড়েছেন তখন আর কোনো চিন্তা নেই।

বেশ কয়েক বছর রূপা মন দিয়ে সংসার করেছে। আমার সঙ্গে মাঝে-মাঝে যোগাযোগ হয়েছে। কিন্তু রূপা তখন রান্নার রেসিপি, ঘর-সাজানোর উপকরণ, দেওয়ালের প্লাস্টিক ইমালসন পেন্ট ইত্যাদি নিয়েই বেশি ব্যস্ত।

মাসিমা একগাল হেসে বলেছেন, "তোমাকে কী বলব। বীরু তবু বই-টই পড়ে, কিন্তু বউ আমার সংসার নিয়ে মেতে আছে। গোপালের সেপও ওর হাতে দিয়ে দিয়েছি—দায়িত্ব নিক। আমি তো পঁয়ত্রিশ বছর ধরে দেবতার মনোরঞ্জন করছি।"

রূপার সেই শাণিত বুদ্ধিদীপ্তি যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে। সে এখন দামি-দামী শাড়ি পরে, রান্নার ক্লাসে বিরিয়ানি তৈরি শেখে। ও যে একদিন এম, এ'তে গোল্ডমেডেল পেয়েছিল তা-ও ভুলে যাবে। শাড়ি, গহনা ও রান্না রূপাকে ক্রমশই গিলে খাবে।

শেষে একদিন আমি রূপাকে বলেছিলাম, "ঈশ্বর যাকে যা দিয়েছেন তার পূর্ণ ব্যবহার না হলে সেটা ঈশ্বরের অবমাননা। রূপা, তোমার গবেষণা, তোমার মেধা, তোমার গোল্ডমেডেল এসব গেল কোথায়?"

রূপা তখন মিষ্টি হেসেছিল। আমার সন্দেহ হয়েছিল গোল্ডমেডেল অপেক্ষা গোল্ড নেকলেসেই রূপার এখন বেশি আগ্রহ।

কিন্তু আমার ভুল ভাঙল। মাসিমা একদিন বললেন, "তুমি কী বলেছ রূপাকে? ও আবার মন দিয়ে পড়াশোনা করছে। প্রায়ই প্রফেসরের কাছে যাচ্ছে, ক'দিন ফিলিপস কারখানাতেও যাতায়াত করছে।"

ছোট্ট মেয়ের মতন রূপা বলেছে, "যে রাঁধে সে শুধু চুল বাঁধে না, পি. এইচ. ডি.-ও করতে পারে। আমাকে আপনারা সবাই বকেছেন, আমিও দেখিয়ে দেবো।"

আমি উৎসাহ দিয়েছি। "কয়েকটা বছর নষ্ট হয়েছে তো কী হয়েছে? আবার উঠেপড়ে লেগে পড়।"

এরপর কিছু দিন রূপার সঙ্গে আমার যোগাযোগ কমে গিয়েছে। হাওড়া থেকে পার্ক স্ট্রিট ছোটাছুটি করতেই আমার সমস্ত উদ্যম ফুরিয়ে যায়—বেহালা যাবার প্রাণশক্তি থাকে না। তারপর একদিন রূপা আমার কাছে হাজির হয়েছে। জানতে চেয়েছে, ওর বিষয়ে মার্কিন দেশের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো পড়াশোনা হয়। আমি অকপটে স্বীকার করেছি, একবার বিদেশ গিয়ে আমি কিছু গল্প লিখেছি ; কিন্তু ও-দেশ সম্বন্ধে আমার বিস্তারিত জ্ঞান নেই। রূপাকে পাঠিয়ে দিয়েছি বিখ্যাত সেই সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে—মার্কিন দেশের চলমান এনসাইক্লোপিডিয়া বললেও যাকে কিছুই বলা হয় না।

তারও কিছুদিন পরে টেলিফোনে খবর পেয়েছি রূপা বিদেশে যাচ্ছে। আমি রসিকতা করলাম, "কর্তা রাজি হয়েছেন? শাশুড়ির আশীর্বাদ পেয়েছ? পাসপোর্ট ও ভিসা ছাড়াও গৃহবধূর পক্ষে ওই দুটি অনুমতি বিশেষ প্রয়োজন।"

রূপা খুব হেসেছে। বলেছে, "আমি যে বিদ্রোহিণী নয় তা তো আপনি জানেন, শংকরদা।"

বিদেশে যাবার আগে রূপাকে একদিন পার্ক স্ট্রিটে লাঞ্চ খাইয়েছিলাম। সামান্য কিছু কথা হলো, বেশির ভাগ সময় আমেরিকার দু-একটা শহর সম্বন্ধে এবং সেখানকার বাঙালি সমাজ সম্বন্ধে রূপা খবরাখবর নিলো।

তারপর একটা কথা হয়েছিল, যার গুরুত্ব তখন বিন্দুমাত্র বুঝিনি। আমি বললাম, "সাবধানে থেকো, তাড়াতাড়ি পড়া শেষ কর, আর রেকর্ড টাইমে ফিরে এসো।" আমি যা বলতে চেয়েছিলাম, "স্বামীকে বেশিদিন বিরহযন্ত্রণায় ভুগিও না!" রূপা যা উত্তর দিয়েছিল তাও আমি রসিকতা মনে করেছিলাম, "কে চায় আমি ফিরে আসি?"

এরপর তো অনেকদিন কেটে গিয়েছে। রূপা আর এদেশে ফিরে আসেনি। ওদেশে যথেষ্ট নাম করেছে সে। রেকর্ড টাইমে পি. এইচ. ডি. জোগাড় হয়েছে ; অধ্যাপনার চাকরিও জুটেছে রূপা মিত্রের। কিন্তু এ-দিকে তার স্বামী বীরুর অধঃপতন শুরু হয়েছে—ব্যবসায়ে বড় রকম ক্ষতির আঘাত এসেছে। বীরু মিত্রকে অলিম্পিয়া বারেও দেখা গিয়েছে প্রায়ই। দুষ্টুজনে বলেছে, রূপা আর ফিরবে না, দেখো। কেন ফিরবে? কোন দুঃখে ফিরবে? ওখানে মুক্তির স্বাদ পায় মেয়েরা। নন-ম্যাট্রিকের ঘরসংসার পি. এইচ. ডি. মেয়ের ভালো লাগবে না। আমি এসব কথায় কান দিইনি।

তারপর আরও দুঃসংবাদ এসেছে। রূপা মিত্র আর নাকি দেশেই ফিরবে না। বীরুকে সে ডিভোর্স করেছে। মেয়েরা নাকি ভীষণ খেয়ালী হয়—কখন কাকে খেলনা হিসেবে ব্যবহার করে পরমুহূর্তে ছুঁড়ে ফেলে দেবে তার ঠিক নেই। আত্মীয়-বন্ধু মহলে রূপার বদনাম রটেছে যথেষ্ট। এরকম যে হবে, মোহভঙ্গ ঘটতে দেরি হবে না, তা নাকি প্রায় সবারই অগ্রিম জানা ছিল।

"স্বামীর সঙ্গে যখন ঘর করত তখন কী সতীসাধ্বী ভাব! সিনেমায় সুচিত্রা সেনও অমন অভিনয় করতে পারবে না।" কেউ বলেছে, "অতি লোভে তাঁতী নষ্ট। ওই বীরু মিত্র এবং তার মায়ের বোঝা উচিত ছিল যা ম্যানেজ করতে পারবে না তা ঘরে আনবে না।" অন্য একজন বলেছে, "মেয়েমানুষকে চোখের আড়াল হতে দিলে এই রকমই হয়।"

বিদেশে ব্যক্তিজীবনে রূপা নতুন কী পেয়েছে তা অনেকেরই গবেষণার

বিষয়। আমিও ব্যাপারটা ঠিক বুঝিনি। এইরকম হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু রূপার মতন মেয়ের কাছ থেকে আমাদের প্রত্যাশা অন্য রকম ছিল। স্রেফ বিদ্যা নেই বলে কাউকে তুমি ত্যাগ করতে পার না—তা হলে বিবাহবন্ধনের পবিত্রতা থাকে না।

আমি মাসিমার কাছেও যাইনি। সঙ্কোচবোধ করেছি। প্রথমত তিনি বউমার এই কাণ্ডে সমাজে ছোট হয়ে গিয়েছেন। তারপর তাঁর নিশ্চয় মনে আছে, দ্বিতীয়পর্বে রূপাকে পড়াশোনায় নামাবার পিছনে আমার একটা ভূমিকা ছিল। এই অবস্থায় তিনি রাগ দেখালে আমার কিছু বলার থাকবে না।

এরপর শুনেছি মাসিমা হঠাৎ চৌধুরীবাগানে বসবাস শুরু করেছেন। এই বয়সে পিত্রালয়ে ফিরে আসবার যুক্তি থাকে না। কিন্তু পুত্র বীরু বেহালার সংসার তুলে দিয়েছে। তার ব্যবসা লাটে উঠেছে। লোকে বলেছে, মনের দুঃখে মানুষ নিজেরও ক্ষতি করতে পারে। অবশেষে খবর পেয়েছি মাসিমা অসুস্থ, একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি হাজির হলাম চৌধুরীবাগানে। মাসিমার শরীর তখন সত্যিই খারাপ। জানতে চাইলাম, বীরু কোথায়? শুনলাম, আসানসোলে নতুন এক বিজনেস ফেঁদেছে। এখানে এখন প্রায় আসেই না। কারণটা আন্দাজ করতে পারি। এদেশে বউ পালানো স্বামীর সামাজিক অবস্থা স্বামী পালানো বউ থেকেও শোচনীয়।

আমার কথা শুনে মাসিমা হাসবার চেষ্টা করলেন। আমার খেয়াল হলো এই ধরনের কথা বলাটা উচিত হয়নি। মাসিমা হঠাৎ বলে উঠলেন, "তুমি লেখো তুমি বুঝবে। আমিও বুঝি—কারণ আমার স্বামী আমাকে এই চৌধুরীবাগানে ফেলে রেখে পালিয়েছিলেন। আমার কোলে তখন মেয়ে, বীরু পেটে। পনেরো বছর আমি নরকযন্ত্রণা ভোগ করেছি। স্বামী তখন পাটনায় অন্য মেয়ের সঙ্গে ঘর করছেন। তারপর কী সুমতি হলো সেই মহিলা মারা যাবার পরে আবার ফিরে এলেন। আমার জীবন তো নষ্ট হয়ে গিয়েছে, কিন্তু খুকুর কথা ভাবলাম। বাপ দাঁড়িয়ে থেকে না বিয়ে দিলে বদনাম হবে, ভালো ছেলেও পাবে না।

মাসিমা তারপর একটু থামলেন। এবার বললেন, "বীরু আমার সব। বীরু ছাড়া আমার কিছু নেই। সারাজীবন ঈশ্বর তো হাত তুলে ওকে ছাড়া আমাকে কিছুই দেননি। তবু..."

"কিছু বলবেন মাসিমা?" আমি ওঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে জিজ্ঞেস করেছি।

মাসিমা বললেন, "আমি শুনলাম তুমি আবার আমেরিকা যাচ্ছ।"

"কথা হচ্ছে, কিন্তু ঠিক নেই, মাসিমা।"

মাসিমা আমার হাতটা চেপে ধরলেন। "রূপার সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ নেই। কিন্তু ওকে বোলো, ও ঠিক কাজই করেছে।" মাসিমা ছেলে সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না। তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। ঘরে তখন অন্য লোকও ঢুকে পড়েছে।

এরপর মাসিমার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। রোগের সঙ্গে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত পরাজয় মেনে নিয়েছেন। বীরুর আসানসোল ঠিকানা থেকে শ্রাদ্ধের চিঠি এসেছিল, আমার যাওয়া হয়নি।

যার কাছে একটা খবর পৌঁছে দেবার জন্যে মাসিমার এতো আকুতি, তাকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেয়েছি। সে এখন আমার সামনে বসে আছে।

মাসিমার মৃত্যুসংবাদও রূপা পায়নি। "দেশের সঙ্গে অনেক বছর আমার কোনো যোগোযোগ নেই, শংকরদা। বাবা-মা এদেশে আসবার আগেই মারা গিয়েছেন। ভাই থাকে দুবাইয়ে, সে সিংহলী মেয়ে বিয়ে করেছে।"

আমি বললাম, "জীবনে সব সাফল্য হয় না, রূপা। তুমি পড়াশোনা ও কর্মজীবনে বড় হয়েছো।"

"সংসারজীবনে মস্ত একটা গোল্লা পেয়েছি, শংকরদা। সব সাবজেক্টে পাস মার্ক না পেলে পরীক্ষায় পাস হয় না।"

আমি জানতে চাইলাম, "দেশের জন্যে মন টানে না তোমার?"

"টানে, কিন্তু সেখানে নাকি ভীষণ বদনাম আমার। দেশে ফেলে আসা স্বামীকে ডিভোর্স করেছি বলে।"

আমি এ-কথার কোনো উত্তর দিচ্ছি না। রূপা বললো, "এ-দেশের এই সভ্যতা আমাকে মুক্তির স্বাদ দিয়েছে, শংকরদা।"

"তুমি কী বলতে চাও রূপা?"

"আমার শাশুড়ির কথা জানেন আপনি? পনেরো বছর ধরে স্বামী পরিত্যক্তা হয়ে মুখ বুজে সব সহ্য করেছেন। স্বামী অন্য একটি মেয়েকে নিয়ে নিজের খেয়ালখুশি চরিতার্থ করতেন। ভারতবর্ষে সীতা-সাবিত্রী তো—আমার শাশুড়ি বিদ্রোহ করেননি, ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত স্বামীকে ফিরে পেয়েছেন। কপালের সিঁদুর অনেক বছর অক্ষত রেখেছেন বিরাট মূল্য দিয়ে।"

আমি বললাম, "নতুন একটা বাংলা কথা কাল রাত্রে সংগ্রহ করলাম। 'নামমাত্র বিবাহ'। সেই পর্যায়ে এটাও পড়ে কি?"

রূপা বললো, "বাংলার মাটিতে মেয়েদের ভীষণ ধৈর্য। আমার শাশুড়িকে স্বামীর ছবিতে চন্দনের ছাপ দিতে দেখেছি। জীবন যাকে এতো বঞ্চনা করেছে তিনিও নিশ্চয় ছেলের জন্যে কোমর বেঁধে ঝগড়া করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। এইটাই পৃথিবীর নিয়ম।"

রূপা উত্তেজিত হয়ে উঠছে। "আমি কাউকে বলিনি—মুখও ছিল না। কারণ আমি তো জোর করেই বীরুকে বিয়ে করেছিলাম। এতো বিপত্তির পরে মালাবদল করে, কয়েক বছর বিবাহিত জীবনের পরে আপনি যদি শোনেন আপনার স্বামী অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে গোপন সম্পর্ক রাখছে তখন আপনার কী মনে হতে পারে?"

রূপা বললো, "আমার শাশুড়ি ব্যাপারটা জানতেন। আমি কার কাছে কান্নাকাটি করব? উনি বললেন, ধৈর্য ধরতে—সময়ে সব নাকি ঠিক হয়ে যায়; যেমন ওঁর হয়েছিল। আমি সেই সময় সুযোগ পেলাম। বাইরে চলে এলাম। তারপর বীরু আরও অধঃপতনে গিয়েছে। মাতাল হয়েছে, ব্যবসা নষ্ট করেছে, অন্য মেয়ের সঙ্গে গোপন সম্পর্ক জোরদার করেছে। আমার শাশুড়ি তখনও আশা ছিল আমি ফিরলে এবং ধৈর্য ধরলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এ-দেশের পরিবেশ ততক্ষণে আমাকে স্বাধীন হতে শিখিয়েছে। আমি সম্পর্ক ছেদ করেছি, শংকরদা। আমি শাশুড়িকে তখন চিঠি লিখেছিলাম, তুমি অন্তত আমাকে বুঝবে—তুমি আমাকে ধৈর্য ধরতে বোলো না, আমি এক অধৈর্য দেশে বসবাস করছি। তিনি সে চিঠির উত্তর দেননি, শংকরদা।

"তারপর এতদিন পরে আপনি তার কাছ থেকে কী খবর নিয়ে আসছেন তা আন্দাজ করতে পারি—আমি নিশ্চয় তাঁর ছেলের সংসার শ্মশান করে দিয়েছি।"

আমি এবার বললাম, "মাসিমা লিখতে পারেননি কিন্তু বিদায় মুহূর্তে জানিয়ে দিয়েছেন তুমি ঠিক করেছ।"

"মা বলেছেন? সত্যি বলছেন? আপনি বানিয়ে বলছেন না আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে?"

রূপা এবার হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো।

আমি ভাবলাম, মাসিমা যদি বেঁচে থাকতেন তা হলে বলতাম, এ-দেশের মেয়েদের ধৈর্য কমানো প্রয়োজন। ধৈর্য না কমলে বোধহয় 'নামমাত্র বিবাহে'র সংখ্যা কমবে না।

খুঁত

"মানুষের সৃষ্টি শিল্পকর্ম কখনও-কখনও নিখুঁত হলেও হতে পারে কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টি মানুষ কখনও খুঁতবিহীন হয় না।" যে-সম্পাদকের প্রসন্ন প্রশ্রয়ে গত কয়েক বছর ধরে লেখালেখি করে চলেছি, সম্প্রতি বিদেশে যাবার আগেই তিনিই

আমাকে একথা বলে সচেতন করে দিয়েছিলেন।

প্রচারে ও গুরুত্বে এই সম্পাদক তুলনাহীন হলেও বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ। কিন্তু কারণে-অকারণে বয়োজ্যেষ্ঠদের ভুল ধরাই যাঁরা তারুণ্যের একমাত্র প্রকাশ বলে মনে করেন তিনি তাঁদের মধ্যে নন। নবীনতার সঙ্গে অভিজ্ঞতার কিছুটা মিলন ঘটানোর জন্যেই বোধহয় তিনি তাঁর বহুল প্রচারিত পত্রে আমার মতন পঞ্চাশোর্ধ্ব পুরুষকেও নতুন-নতুন ভূমিকা গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

এমনই এক আমন্ত্রণ থেকেই কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে কিছু সাক্ষাৎকার রচনার দুঃসাহস অর্জন করেছি। যেসব রক্তমাংসের মানুষ সংবাদের শিরোনাম হচ্ছেন অতি নিকট থেকে গল্পলেখকের চোখে তাঁদের কাউকে-কাউকে দেখতে পাওয়ার সুযোগটা মন্দ নয়। কল্পনার পাম্পটা অনেকদিন একটানা কাজ করার পর একটু ছুটি পায় এবং বলা যায় না, ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে কথা সাহিত্যের জন্য নতুন কিছু সঞ্চয়ও অভিজ্ঞতার ঝুলিতে জমা হতে পারে।

নতুন ভূমিকায় আমার এই লেখাগুলি সম্পর্কেই সেবার আলোচনা হচ্ছিল সম্পাদকীয় কক্ষে। আমি যাতে নতুন ভূমিকায় নিরুৎসাহিত না হই সে-বিষয়ে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেই তরুণ সম্পাদকের মন্তব্য : "আপনার লেখাগুলো পাঠকের ভালো লাগছে। প্রতিবারেই কিছু মানবিকতার স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে। সাহিত্যিক ও রিপোর্টার যে ঠিক এক জিনিস নয় তা আপনি আর-একবার প্রমাণিত করে দিয়েছেন। নিছক সংবাদের পাঠকও মাঝে-মাঝে একটু 'রিলিফ' চায়।"

এই পর্যন্ত শুনতে অবশ্যই ভালো লাগছিল। দূরদর্শী লেখক অবশ্যই প্রত্যাশা করেন পাঠকের প্রীতি, কিন্তু সম্পাদকের শ্রীমুখ থেকে তিনি জানতে চান কী করে লেখাকে আরও আকর্ষণীয়, আরও গ্রহণীয় করা যায়। বিদেশে একেই বলা হয় মার্কেট রিসার্চ, বিপণন সংক্রান্ত গবেষণা। আপনার পণ্যটির দোষ-ত্রুটি আগাম যতটুকু জেনে নেওয়া যায় ততই লাভ। প্রতিযোগিতার পৃথিবীতে কোনো মানুষেরই আত্মতুষ্টির অবকাশ নেই। তুষ্টির আবির্ভাবই প্রতিযোগিতার আসন্ন পরাজয়ের প্রথম ইঙ্গিত। আমি জানতে চাইলাম, নবপর্যায়ে আমার লেখার দোষ কী বলুন?

আমার খোলাখুলি প্রশ্নে সম্পাদক একটু অস্বস্তিতে পড়লেন। তাঁর ধারণা, যাঁরা সাহিত্য রচনা করেন তাঁরা অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর হন। সামান্য সমালোচনার অ্যাসিডেও তাঁরা জ্বলেপুড়ে নষ্ট হয়ে যান, ফলে কারও কোনো মঙ্গল হয় না।

মৃদু হেসে তিনি বললেন, "আপনার শক্তি ও দুর্বলতার উৎস কিন্তু একটাই। আপনি মানুষকে বড্ড বেশি বিশ্বাস করে বসেন। গল্প-উপন্যাসে মাঝে-মাঝে

এক-আধটা নির্ভেজাল ভালো চরিত্র চলে যায়, কিন্তু সংবাদপত্রে কখনও নয়।"

সম্পাদকের বক্তব্যে ইঙ্গিত ছিল আমার সদ্যপ্রকাশিত 'নগরকোটালের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।' বললেন, "লেখা অবশ্যই ভালো হয়েছে, পড়তেও ভালো লাগছে, কিন্তু প্রশ্নগুলোর মধ্যে কোনো 'স্পিন' নেই—নায়ককে কখনও অস্বস্তিতে ফেলার প্রচেষ্টা নেই।"

সম্পাদক আমার মুখটা খুব সাবধানে লক্ষ করছেন, দেখছেন তাঁর সমালোচনা আমি কতখানি বিনা কষ্টে গ্রহণ করতে পারি। অনেকে নাকি সমালোচনা চেয়ে পরে বেশ বিপদে পড়ে যান।

"আমার মা বলতেন, মানুষের এত ভালো গুণ আছে যে সারাজীবন ধরে লিখেও তা শেষ করা যায় না। ভালোগুলো যদি খুঁজে বার করে লিখে দাও তা হলে সবাই বুঝতে পারবে মানুষটার কী কী দোষ—মানুষ তো আর বোকা নয়!"

হাসলেন তরুণ সম্পাদক। "আপনার মা জানতেন যে তাঁকে কোনো দিন বহুলপ্রচারিত দৈনিক পত্রিকা চালাতে হবে না। কাগজে লেখার বিষয় অনন্ত কিন্তু সময় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তাই কোথায় কী গড়বড় হচ্ছে তা জানিয়ে দিলেই মানুষ বুঝে নেবে কোথায় কী ঠিক রয়েছে।"

একই সত্যের দুটি দৃষ্টিকোণ। যাঁরা ঠকেছেন, ঠকেছেন তাঁরা খারাপটাই চটপট জেনে নিতে চান, আর যাঁরা অবিশ্বাসের ধোঁয়ায় হাঁপিয়ে উঠেছেন, তাঁরা বহু ঠকবার পরেও আবার বিশ্বাস করতে চান। আমার মা বলতেন, "মানুষ ছাড়া মানুষের চলেও না, অথচ মানুষকে বিশ্বাস করতে পারে না মানুষ।"

সম্পাদক ব্যস্ত মানুষ—তাঁর অনেক কাজ। তবু যে কিছুক্ষণের নিভৃত আলোচনা হল তার কারণ আমার আসন্ন বিদেশ-ভ্রমণ।

উৎসাহ দিয়ে তিনি বললেন, "আপনার কলমে আরও কতকগুলো প্রিয় চরিত্রের সৃষ্টি হবে আশা করতে পারি। আমার কাগজ তো খোলা রইলো আপনার জন্যে। তবে আপনার নিন্দুকরা বলে, এতদিন কলকাতা শহরে থেকেও আপনি সে-ই মফস্বলের মানুষটি রয়ে গেলেন। আপনি যে মার্কিন দেশে যাচ্ছেন সে-দেশের একজন লেখক সম্প্রতি বলেছেন, মানুষের সৃষ্টি কখনও কখনও সর্বাঙ্গসুন্দর হলেও হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টি মানুষ কখনও ত্রুটিহীন হয় না।"

"জাপানে, জার্মানিতে, আমেরিকার কারখানায় আপনি 'জিরো ডিফেক্ট' আন্দোলনের কথা নিশ্চয় শুনেছেন, কিন্তু ও-ব্যাপারে ঈশ্বরের মাথাব্যথা নেই বিন্দুমাত্র। তাই কুসুমে কীট, চাঁদে কলঙ্ক এবং অসংখ্য ভুলে-ভরা মানুষ। ঈশ্বরের অবশ্য একটা মস্ত সুবিধে আছে, তাঁর কোনো প্রতিযোগী নেই—একমেবাদ্বিতীয়ম্ হয়ে সৃষ্টির বাজারে একচ্ছত্র সুযোগ-সুবিধে উপভোগ

করছেন।”

এসব সম্পাদকের নিজস্ব কথা নয়, পৃথিবীর দিকপাল সাংবাদিকদের বক্তব্য। “আমার অত ভাববার সময় কোথায়? কিন্তু ভাবুকদের ভাবনা-চিন্তা আমি সংগ্রহ করে রাখি,” এই বলে একটি মূল্যবান ইংরিজি রচনার জেরক্স কপি তিনি আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারে মার্কিন দেশ ভ্রমণে এসে, বিশেষ করে নবগোপাল ব্যানার্জির সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময়ে আমি বেশ দোটানায় পড়ে গিয়েছিলাম।

একদিকে সম্পাদকের সাবধানবাণী, অন্যদিকে আমার মায়ের উপদেশ। সম্পাদক বহুবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছেন এবং আমার শুভানুধ্যায়ী। মা কখনও বাংলা ছেড়ে বিদেশ তো দূরের কথা বেনারস পর্যন্ত যেতে পারেননি। একবার বিলেত ঘুরতে পারলে আমার মা-ও হয়তো মত পরিবর্তন করতেন, আমাকেও পরামর্শ দিতেন মানুষের ফুটো খুঁজে বার করো। কিন্তু সে সুযোগ যখন তাঁর হয়নি তখন আমি দিশেহারা। মানুষের পূর্ণতা সন্ধান? না, তার শূন্যতা যাচাই করব? আমার স্ত্রী আমার এই অস্থির অবস্থা আন্দাজ করে লং ডিসট্যান্স টেলিফোনে বলেছিলেন, “দুটোই করো।”

“দুটো করার মতন দুর্লভ ক্ষমতা আমার নেই। চা ও কফি একসঙ্গে খাওয়া যায় না.” এই কথাটা বলবার আগেই টেলিফোন যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছিল। সাগরপারের দূরভাষণ যে ভীষণ খরচাসাপেক্ষ তা আমার গৃহিণীর অজানা নয়।

মার্কিন মুলুকে আমার সাময়িক আশ্রয়দাতা সত্যব্রত দত্ত খুব হাসাহাসি করলেন। সত্যব্রত বললেন, “মানুষকে বেশি খবর দিতে গেলে বেশি সময় লাগে, আর বেশি সময় মানেই বেশি খরচ। আর সব জিনিসের সরবরাহ এই সোসাইটিতে বাড়ানো যাক, একমাত্র এই সময় ছাড়া। সেই কলম্বাসের যুগেও প্রতি দিনে ছিল চব্বিশ ঘণ্টা, এখনও এই মহাকাশযাত্রার যুগেও চব্বিশ ঘণ্টা। যার অর্থ হলো, ...জাস্ট এ মিনিট...” এই বলে হাতের গোড়ার একটা খেলনা ক্যালকুলেটার টিপতে লাগলেন সত্যব্রত দত্ত... “অর্থাৎ ১৪৪০ মিনিট অথবা ৮৬৪০০ সেকেন্ড। এই সেকেন্ডকেও ভাঙতে পারা যায়...নাইনটিন সিক্সটিফোর-এ ওয়েট্স্ অ্যান্ড মেজারস-এর জেনারেল কনফারেন্সে যে ‘সিজিয়াম রেজোনেন্স’-এর মাপ দেওয়া হল—৯, ১৯২, ৬৩১, ৭৭০ সাইক্ল অফ র‍্যাডিয়েশন, সিজিয়া অ্যাটম-১৩৩...” কী সব গড়-গড় করে বলে চললেন সত্যব্রত।

সত্যব্রত পণ্ডিত মানুষ, নামের অন্তে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ-ডি

আছে, ওঁরা সময়কে চুলচেরা ভাগ করবেন না তো কারা করবেন? আমাদের শাস্ত্রেও সময়ের চুলচেরা বিশ্লেষণ আছে, নানা নামও আছে—তবে আমাদের সব কিছু 'আন্দাজিফাই' নিখুঁত মাপজোকের ব্যাপারটা অনেক কম, সবই বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল।

সত্যব্রত দত্ত আমাদের বয়সি। প্রায় একই সময় আমরা ইস্কুল পেরিয়ে কলেজে ঢুকেছি। স্বদেশের কলেজ থেকে একসময় বিদেশের কলেজে হাজির হয়েছেন সত্যব্রত। জ্ঞানান্বেষণ সমাপ্ত করে সত্যব্রত গবেষণাকার্যে লিপ্ত হয়েছেন বিশ্ববিদালয় প্রাঙ্গণে।

সত্যব্রত বলেছেন, "শংকরবাবু, জ্ঞানান্বেষণটা এদেশে বিলাসিতা নয়। এদেশ সর্ববিষয়ে ভীষণ হিসেবি, কিন্তু জ্ঞানসন্ধানের কোনো খরচকেই এরা বাজে-খরচ বলে মনে করে না। এদেশের গবেষণা সংক্রান্ত ব্যয় শুনলে অনেক দেশের মানুষ ভিরমি খাবে।"

"আপনি বলছেন, গবেষণাটাই এদেশের বৃহত্তম বিলাসিতা।"

হাসলেন সত্যব্রত। "মোটেই বিলাসিতা নয়, শংকরবাবু। ভবিষ্যৎকে মুঠোর মধ্যে রাখার এইটাই যে একমাত্র অস্ত্র তা এই দেশের জাত খুব ভালো করে বুঝে গিয়েছে।"

"আজকাল আমাদের দেশেও বিশ্ববিদ্যালয়ে, ল্যাবরেটরিতে কিছু গবেষণা হয়। কিন্তু কোথাও যেন ফাঁকি থেকে যায়। অনেকটা কলকাতা শহরে বনমহোৎসবের সময় গাছ পোঁতার মতন—খুব কায়দাকানুন করে ঢাক বাজিয়ে গাছ পোঁতা হয়, কিন্তু গাছও বড় হয় না, ফলও দেয় না। অথচ প্রতিবছর ঘটা করে, খবরের কাগজে ছবি তুলিয়ে একই রাস্তার ফুটপাতে প্রতিবার গাছ পোঁতা হচ্ছে!"

সত্যব্রত হাসলেন। তিনি মাঝে-মাঝে কর্মসূত্রে নিজের দেশে এসেছেন, দু'একটা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কেন্দ্রের খোঁজ-খবরও রেখেছেন।

সত্যব্রত বললেন, "গবেষণার নাম করে বহু পণ্ডিত দেশের দরিদ্র মানুষদের ঠকাচ্ছে এবং নিজেদেরও ঠকাচ্ছে। সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজির নামে বিরাট ধাপ্পাবাজি চলেছে, অথচ কেউ এর অনাচার উন্মোচন করতে পারছে না।"

আমি বিদেশে বসে দেশের নিন্দা হজম করতে পারি না, শরীরের কোথায় যেন জ্বালা ধরে যায়। তাই সত্যব্রতকে শুনিয়ে দিলাম, "মানুষগুলোকে ধাপ্পাবাজ বলতে কষ্ট হয় সত্যব্রতবাবু, কারণ এদেরই কেউ-কেউ যখন ছিটকে বিদেশে আসে তখন তো বেশ ভালো কাজ হয়। বোঝা যাচ্ছে, দোষ মানুষগুলোর নয়, দোষ সিস্টেমের— পরিবেশের, ব্যবস্থাপনার।"

"তা হলে অনেক কথা বলতে হয়, শংকরবাবু। প্রথম গায়ে-গতরে গবেষণার

নিম্নস্তরের কাজগুলো করিয়ে নেবার জন্যে মার্কিনিরা এশিয়া থেকে বৈজ্ঞানিক আমদানি করে—যে-দাম পেলে পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়ার সেরা ব্রেনগুলো বর্তে যায় এবং মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে আসে, সে-দামে মেমসায়েব ঝি-ও পাওয়া যায় না। আর এখানকার বড়-বড় গবেষণাগারে এমন চেইন সিস্টেমে কাজ হয় যে উপরের দু'একজন ছাড়া নিচুর দিকে কেউ পুরো ব্যাপারটা বুঝতেই পারে না। এখানে ভালো কাজ করছো ভালো কথা, কিন্তু এখান থেকে বিদায় নিয়ে নিজের দেশে গেলে কোনো কিছুই করতে পারবে না।"

"মার্কিনীরা বেশ ধুরন্ধর জাত মনে হচ্ছে।"

"নিজের স্বার্থের ব্যাপারে কোন জাত ধুরন্ধর নয়? এরা তবু তো চাকর-বাকর হিসেবে বিদেশ থেকে মানুষ আসতে দিচ্ছে, কিন্তু আপনি জাপান অথবা জার্মানির—এমনকী ফ্রান্সের কথা ভাবুন। আপনি কি চেনেন কোনো ইন্ডিয়ানকে যে জাপানের কোনো গবেষণাগারে কাজ করছে? অথচ শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ওদের এখন পয়সার অভাব নেই—খোদ নিউইয়র্কের বড় বড় সম্পত্তির মালিকানা ওদের হাতে চলে যাচ্ছে। পৃথিবীর প্রথম দশটা ব্যাঙ্কের প্রায় সব ক'টাই এখন জাপানিদের—সুতরাং হাতে কাঁচা পয়সা নেই বলতে পারবেন না।"

আমার বক্তব্য : "গবেষণা নিয়ে আমাদের মতন দরিদ্র দেশ কী করবে? আমাদের চাই উৎপাদন—কল-কারখানায় ক্ষেতখামারে মানুষ সারাক্ষণ কাজেকর্মে মশগুল হয়ে থাকলেই আমাদের মুক্তি। আর নামে ফ্যাক্টরি রয়েছে, লোকদেখানো ফার্ম রয়েছে অথচ কাজে লবডঙ্কা হলে চলবে কী করে? জাপানিরা, কোরিয়ানরা এই পথেই তো নিজেদের ভাগ্য ফিরিয়ে নিচ্ছে।"

সত্যব্রত দত্ত নিজের হাতে কফি তৈরি করে আনলেন। তারপর মন্তব্য করলেন, "এক-এক সময় পৃথিবী এক-একটা ধারণার বশবর্তী হয়ে চলে। কোনো এক সময় ধারণা ছিল, যে-দেশে যত প্রাকৃতিক সম্পদ সেই দেশ তত সমৃদ্ধ হবে। এই অঙ্ক অনুযায়ী ইন্দোনেশিয়ার সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার অবস্থা কী তা দুনিয়ার সবাই জানে। পরে এক সময় ধারণা হলো, যে-দেশের শ্রমিক যত দক্ষ সে-দেশ তত সমৃদ্ধ হবে। আবার কখনও ধারণা হলো, পুঁজিটাই সব। যার যত ক্যাপিটাল সে তত ধনী হবে, সোনা দিয়ে ডলার দিয়ে, মার্ক দিয়ে অন্যদেশের মানুষকে তোমার জন্য খাটিয়ে নেওয়া চলবে। এখন ব্যাপারটা পুরো পালটে গিয়েছে। যার যত বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞান আছে সে তত বড় হবে। 'নো-হোয়াই' এবং 'নো-হাউ' থাকলে অর্থ, শ্রম, কাঁচামাল কোনোটারই অভাব হবে না।"

আমি সত্যব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি বললেন, "জ্ঞানের সীমান্ত অঞ্চলে বসে আছে আমাদের এই ইউ-এস-এ। পৃথিবীতে যা কিছু নতুন জ্ঞান

এ-বছরে বা সামনের বছরে পাওয়া যাবে তার সিংহভাগই যে এখানে সৃষ্টি হবে তা আপনি ধরে নিতে পারেন। এই জ্ঞানকে রক্ষে করা এবং তাকে ঠিকমতন কাজে লাগানোও এক মস্ত ব্যাপার। সায়েবদের সব সময় ভয়, কিছু বুঝি হাতছাড়া হয়ে গেল, চুরি হয়ে গেল, বা ফাঁস হয়ে গেল। দু'দশ লাখ টাকা বা সোনা চুরি হয়ে গেলে আমেরিকান অত বিচলিত হবে না, যত হবে গবেষণাগার থেকে কোনো নতুন উপাদান বা তথ্য হাতছাড়া হয়ে গেলে। তাই গবেষণাগারে ভীষণ সিকিউরিটি, ভীষণ সতর্কতা। গোটা কয়েক যন্ত্র, গোটা কয়েক কমপিউটার এবং গোটা কয়েক শিশিবোতল নিয়ে বসে আছে, কিন্তু সতর্কতা দেখে মনে হবে রানি এলিজাবেথের কোষাগারে ঢুকছেন আপনি।"

"ঠিকই বলেছেন আপনি। এক একটা মার্কিন গবেষণাগারে সিকিউরিটির লোক এমনভাবে আগন্তুকের দিকে তাকায় যে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। জানতে ইচ্ছে হয়, এতোই যদি সন্দেহ তা হলে কেন দেখতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছো?"

সত্যব্রত বললেন, "আসল ব্যাপারটা কী জানেন? এই বজ্র আঁটুনির মধ্যেও জ্ঞান চুরি হচ্ছে। ইনডাস্ট্রিয়াল এসপায়োনেজ বা শিল্প গুপ্তচরবৃত্তি এখন কোটি-কোটি ডলারের উদ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই চুরির প্রচেষ্টায় দেশের প্রতিযোগীরাও আছেন আবার বিদেশের চোররাও আছেন। জাপানিদের, ইতালীয়দের এইসব ব্যাপারে খুব সুনাম নেই। ঠিকমতন একটা জ্ঞান হাতসাফাই করতে পারলেই কারও পৌষমাস কারও সর্বনাশ!"

আবিষ্কার এবং সেই জ্ঞানকে ঠিকমতন কাজে লাগানোর ব্যাপারে ইউরোপ আমেরিকার যে তুলনা নেই সে-কথাও বোঝালেন সত্যব্রত দত্ত। "আপনি একটা কিছু জ্ঞান আহরণ করলেন কিন্তু সেই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে নেপোয় মারলো দই এমন খবরও ইতিহাসে অনেক পাবেন।"

আমি টেকনোলজির ইতিহাসে অতো রপ্ত নই। কিন্তু শুনতে খারাপ লাগছিল না। সত্যব্রত বললেন, "বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও টেকনোলজিই যে একটা জাতের সবচেয়ে বড় সম্পদ সে-সম্বন্ধে কোনো দ্বিধা রাখবেন না, শংকরবাবু। এটা হয়তো গল্প-উপন্যাসের বিষয় নয়, কিন্তু এই অপ্রিয় সত্যটা সাধারণ মানুষের কাছেও পৌঁছে দিতে হবে আপনাদের।"

"সাধারণ মানুষ কেন এইসব নীরস ব্যাপারে আগ্রহী হবে, সত্যব্রতবাবু?"

সত্যব্রত হাসলেন। "আগ্রহ হবে যদি ইতিহাসকে আপনি সেইভাবে মানুষের সামনে উপস্থিত করতে পারেন। যেমন ধরুন, আমাদের দেশের ছেলেরা জানে যে ইতিহাসের সেই আদিকাল থেকে আমরা গ্রিক, শক, হূণ, পাঠান, মোগলের হাতে মার খেয়েছি, আমাদের উত্তর-পশ্চিম প্রবেশদ্বার আমরা সুরক্ষিত করতে

পারিনি। এখন, ইস্কুলে আমার ধারণা ছিল, বহিরাগতদের তুলনায় আমাদের বীরত্ব কম ছিল। কিন্তু পরে যুদ্ধের ইতিহাস পড়তে-পড়তে দেখলাম বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এটা বীরত্বের পরাজয় নয়—টেকনোলজির পরাজয়। আপনি হাতি চড়ে চলমান আরব অশ্বারোহীকে তাড়া করতে পারেন না, যত বড় বীরই হোন না আপনি তির-ধনুক দিয়ে গাদা বন্দুকের সঙ্গে লড়াই করতে পারেন না। আবার গাদা বন্দুক কখনও পারে না রাইফেলের সঙ্গে পাল্লা দিতে। অর্থাৎ শত্রুদের তুলনায় টেকনোলজিতে আমরা সবসময় একদাগ পিছিয়ে পড়েছিলাম।"

ব্যাপারটা মন্দ লাগলো না। আমি দ্রুত নোট বইতে দু'একটা পয়েন্ট লিপিবদ্ধ করে নিলাম।

সত্যব্রতর ধারণা, "জ্ঞানকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও কাজে না-লাগানোর বড় দৃষ্টান্ত হলো এশিয়ার। ব্যাপারটা আপনি নিশ্চয়ই আগে শুনেছেন, কিন্তু আপনাকে আবার মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন মনে করছি।"

"আপনি বলুন। বার বার মনে করিয়ে না দিলে আমরা কোনো জিনিস কাজে লাগাতে পারি না। বাঙালি মধ্যবিত্তর মজ্জায়-মজ্জায় দীর্ঘসূত্রতা, কোনো কাজ আগামিকালের জন্যে ফেলে রাখতে পারলে আজ তা ধরতে ইচ্ছে করে না আমাদের। যদিও এদেশে এসে শুনেছি দোষটি কাটিয়ে ওঠা খুব শক্ত ব্যাপার নয়। তবে রোগটা ভীষণ ছোঁয়াচে—একজন হাই তুলছে দেখলেই অন্য লোকের হাই উঠতে আরম্ভ করে!"

সত্যব্রতর মন্তব্য, "সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপ যে কয়েকশো বছর ধরে সমস্ত পৃথিবীকে পদানত করে রাখলো, এবং মহাসাগরের ওপারে নতুন বিশ্ব আমেরিকা আবিষ্কার করে তা ভাগদখল করলো এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে অবিশ্বাস্য ধনী হয়ে উঠলো এর পিছনে তার জাহাজ, তার বন্দুক-কামান আর তার 'বিল অফ এক্সচেঞ্জ'। এই তিনটেই অসম্ভব হতো যদি-না তার হাতে থাকতো দিগদর্শন যন্ত্র—কম্পাস, বারুদ তৈরির জ্ঞান এবং হুন্ডি ব্যবহারের দূরদর্শিতা। এই তিনটির একটাও কিন্তু তার আবিষ্কারের মুরোদ হয়নি। কম্পাস ও বারুদ আবিষ্কার হয়েছিল চিনে এবং হুনডি ব্যাপারটা প্রথম মাথায় এসেছিল ভারতবর্ষের এক দূরদর্শী বণিকের।"

"তা হলে আমাদের শিল আমাদের নোড়া দিয়ে ইউরোপীয়রা আমাদেরই দাঁতের গোড়া ভাঙলো, কয়েকশো বছর ধরে পায়ের তলায় চেপে রাখলো আমাদের!"

সত্যব্রত বললেন, "ঠিক ধরেছেন। কিন্তু দোষটা আমাদেরও বটে, জ্ঞান অর্জন করেও আমরা তার ব্যবহার করতে পারলাম না। মার্কিন দেশের মানুষরা ইতিহাসের এই শিক্ষা সম্বন্ধে খুবই সজাগ। তাই নিষ্কাম জ্ঞানার্জনের পিছনে না

ছুটে, জ্ঞানকে মানুষের কাজে লাগানোর ব্যাপারে এরা সারাক্ষণ ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। এবং ফলও পাচ্ছে, এ-কথা আপনাকে স্বীকার করতে হবে। উত্তর আমেরিকার ভোগের ইন্ধন জোগাবার জন্যে সারা পৃথিবীর মানুষ যে দিনরাত খেটে মরছে, তার একটি কারণ এ-দেশের এই জ্ঞানভাণ্ডার। পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক, কপিরাইট ইত্যাদির প্রহরায় এরা অর্জিত জ্ঞানের সুরক্ষা নিশ্চিত করছে। যত রকমের চোর-ডাকাত আছে তার মধ্যে জ্ঞান-চোরকে এরা সবচেয়ে কঠোর শাস্তি দিতে চায়, কারণ এক-একটা পেটেন্টে এক-একটা দেশের ভাগ্য পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।"

আমি চুপ করে রইলাম। কারণ আমাদের দেশের শিল্প-বাণিজ্য পুরোটাই ধারকরা সেকেন্ডহ্যান্ড জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল, আমরা এখনও ছেঁড়া কাপড়ের ব্যবসাদার, জাতে উঠতে আমাদের অনেক সময় লাগবে।

সত্যব্রত বললেন, "অপ্রিয় সত্যটা হলো, অনেক দিন পরেও যে জাতে ওঠা যাবে এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। কারণ সেই সময়ে, এইসব দেশ জ্ঞানের ভাণ্ডারে আরও কী সঞ্চয় করে বসবে তা কেউ জানে না। জাপানিদের মতন, কোরিয়ানদের মতন আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং কিছু-কিছু সুযোগের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, তবে যদি ভাগ্যলক্ষ্মী দু'একটা ক্ষেত্রে আমাদের উপর দয়া বর্ষণ করেন।"

আমি এই কথাগুলোও নিজের নোটবইতে লিখে নিলাম। "সুযোগ পেলে দেশে গিয়ে লিখব—কিন্তু কোনো ফল হবে কিনা জানি না।"

সত্যব্রত বিশ্বাস করেন, মানুষের মাথায় কোনো নতুন খবর পৌঁছুলে তার ফল হতে বাধ্য।

কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে তিনি বললেন, "যদি লেখেনই তা হলে আর-একটা প্রসঙ্গ তুলবেন। কোনো কাজেই শেষ-কথা বলে কিছু নেই। আমাদের দেশে ঘটি বাটি থালা ছুরি এসব শত-শত বছর আগে যেরকম ছিল এখনও সেই একই রকম রয়েছে। অথচ পশ্চিমে এবং সুদূর প্রাচ্যে গত বছরের সমস্ত ডিজাইনিং-এর মধ্যে অস্থিরতা রয়েছে ; এ-বছরের জিনিসপত্তরের সঙ্গে গত বছরের জিনিসপত্তরের কিছু তফাত থাকবেই। পুনরাবৃত্তির জালে জড়িয়ে পড়তে রাজি নয়—আর নতুন যা কিছু হচ্ছে তার পরিকল্পনা করছে সেইসব মানুষ যারা এইসব উৎপাদনের ব্যাপারে জড়িয়ে রয়েছে। আমাদের দেশে যারা কল-কারখানার কাজকর্মে জড়িয়ে রয়েছে তারা কলুর বলদের মতন ব্যবহার করে, তাদের চোখে ঠুলি বাঁধা, তারা চোখেও দেখে না, কানেও শোনে না, মাথাও ঘামায় না। ফলে পরিবর্তন স্তব্ধ হয়ে যায়, আমরা সেরা কর্মী হয়েও নতুনকে অসম্মান করার জন্য ক্রমশ পিছিয়ে পড়ি।"

"সত্যব্রতবাবু, অনেক জায়গায় কিন্তু স্রেফ নতুন কিছু করতে হবে বলেই নতুন কিছু করা হচ্ছে। এই অস্থিরতা সব সময়ে ভালো কিনা তাও তো আমরা বুঝি না।"

সত্যব্রত মন দিয়ে আমার কথা শুনলেন। "আপনি প্রশ্ন করছেন, নতুন ভালো, কিন্তু তাই বলে নতুন সম্পর্কে এই অহেতুক হ্যাংলামোটা ভালো কিনা? আপনার কথায় গুরুত্ব আছে, কিন্তু সে এদেশ সম্পর্কে, জাপান সম্পর্কে। এখন অনেকসময় পুরনো ডিজাইন ফিরে আসছে। সম্প্রতি যে পার্কার ফাউনটেন পেন বেরিয়েছে তা বহুবছর আগের প্রথম পার্কার মডেলের মতন। কোকাকোলার যে বোতল-ডিজাইন বিশ্ববিজয় করেছে তাও তো কয়েক দশক আগের একটা ডিজাইনের পুনর্জীবিত সংস্করণ। কিন্তু এটাও জানা এক ধরনের নতুনত্বের সন্ধান—নতুন করে পাব বলেই পুরনোকে ফিরিয়ে আনা। আমাদের কিন্তু কোনো পরিবর্তনই আসে না। ফলে আমাদের সমাজজীবনের, জনজীবনের এবং কর্মজীবনের ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। আমরা নতুনকে সবসময় পরের কাছ থেকে আহরণ করছি—এই পরনির্ভরতা আমাদের আর্থিক ক্ষতি করছে, আমাদের অগ্রগতিকে শ্লথ করছে অকারণে।"

"এসব বলবেন না, সত্যব্রতবাবু। যা চেনা, যা পরীক্ষিত, যা নির্ণীত তাকে ধ্রুবের মতন আঁকড়ে থাকার মানসিকতা আছে বলেই আমাদের পারিবারিক মূল্যবোধ এখনও ধ্বংস হয়নি। এই দিকটা আমাদের বোধহয় লাভজনক হয়েছে।"

হাসলেন সত্যব্রত। "লোকে তাই ভাবছে, মধ্যবিত্ত বাঙালিরা মনে-মনে হয়তো কিছুটা গর্ববোধও করছে। কিন্তু আমার মনে হয়, নতুন মূল্যবোধের চাপ নেই বলেই পুরনো মূল্যবোধকে আমরা 'শাশ্বত' এই তকমা পরিয়ে শান্তি বোধ করছি। কিন্তু এই তথাকথিত শাশ্বত মূল্যবোধ যখন মার্কিন দেশের মাটিতে ল্যান্ড করছে এবং নতুনের মুখোমুখি হচ্ছে তখন নানা অঘটন ঘটছে এই ভারতীয় সমাজে। এইসব মানুষকে আপনি নিশ্চয় এবার স্টাডি করছেন, অনেক মূল্যবান খবরাখবর পাবেন, যা দেশের মানুষদের কাজে লাগবে, কারণ একদশক অথবা দু'দশক পরে ভারতবর্ষে কী ঘটবে তার একটা মোটামুটি ইঙ্গিত পেয়ে যাবেন এখানকার ভারতীয় জীবন থেকে।"

আমি বললাম, "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কথা এখন থাক। এ-বিষয়ে দুঃখ পাওয়া ছাড়া এই মুহূর্তে আমাদের তেমন কিছু করবার নেই। বরং স্থানীয় বাঙালিদের জীবন সম্পর্কে কিছু বলুন। এদের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না সাফল্য-ব্যর্থতা সম্পর্কে খোঁজখবর নেবার জন্যই এতোদূর ছুটে এসেছি।"

সত্যব্রত দত্ত নিজে ব্যাচেলার মানুষ। কিন্তু এদেশের অনাবাসী ভারতীয়দের

সম্পর্কে অনেক খোঁজখবর রাখেন। বললেন, "বাঙালি লেখকদের ভাবনার কিছু নেই। এককালে একটু বিশেষ ধরনের বাঙালির ছবি আঁকার জন্যে, পাবার জন্যে লেখকরা ছুটতেন বার্মায়। তারপরে কিছুদিন নজর পড়ল বিলেতের দিকে। এখন আপনাদের সবচেয়ে বড় সুযোগ এই মার্কিন মহাদেশে।"

আমি মৃদু হাসলাম। "শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এবং মা ষষ্ঠীর দয়ায় বাংলা গল্পলেখকদের সংখ্যা তো কম নয়। এবং তাঁদের সকলকে তো করে খেতে হবে।"

"কোনো চিন্তা নেই বাঙালি লেখকদের। কোনো রকমে কষ্ট করে একখানা এক্সকারশন ফেয়ারের এরোপ্লেনের টিকিট কেটে হাজির হোক এই মার্কিন মুলুকে। বাঙালি দেখলেই জাল ছুড়ে দিক, প্রতি ক্ষেপে যদি মাছ না-ওঠে তো কী বলেছি। দেশে আপনাদের কোটি-কোটি লোক, কিন্তু কেউ নতুনত্বকে সাদর আহ্বান জানাতে চাইছে না বলে জীবনের সব পর্যায়ে একঘেয়েমি, আর কে না জানে একঘেয়েমি হলো গল্পের শত্রু। বিলিতি 'নভেল' কথাটার মধ্যেই নতুনত্ব কথাটার ইঙ্গিত রয়েছে!"

সত্যব্রত কফির কাপ নিঃশেষ করে জানালেন, "এত বড় দেশে ঘোষ বোস মিত্তির হাজরার সংখ্যা হাজার তিরিশেকের বেশি নয়—কিন্তু অভিজ্ঞ চোখে দেখলে হয়তো হাজার তিরিশেক গল্পই আপনারা পেয়ে যাবেন।"

"ধীরে, সত্যব্রতবাবু, ধীরে। বিরাট একটা মন্তব্য আপনি করে ফেলেছেন। যেন এখানকার বোস ঘোষ মিত্তির এবং আমাদের বোস ঘোষ মিত্তিরের মধ্যে বিরাট একটা তফাত রয়েছে।"

"অবশ্যই আছে, এটা আপনি ধরে নিতে পারেন, শংকরবাবু। কেন, তা আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এদেশে সুখ আছে প্রচণ্ড, সুযোগও ততোধিক। কিন্তু মনে রাখবেন, বাইরের লোক, বিশেষ করে এশিয়া এবং আফ্রিকার লোকের পক্ষে এখানে ঢোকাটা বেশ শক্ত কাজ। এখানে যে সব বাঙালি দেখবেন তাদের নানা শ্রেণী। এক, যারা অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এদেশে ঢুকেছে এবং এখানে থেকে যাবার অনুমতি পেয়েছে। গ্রিনকার্ড বস্তুটি খুব সোজা নয় এটা মনে রাখবেন। এখানে ডলারের রঙও গ্রিন এবং চাকরির অনুমতির কার্ডও গ্রিন। এখন প্রশ্ন হলো কারা এদেশে এসেছে? দেশে যাদের সুখে থাকতে ভূতে কিলোলো, অনাবাসী হবার জন্যে তারা যে সাধারণ মানুষ থেকে একটু আলাদা তা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে। এদের কেউ এসেছে ছাত্র হিসেবে তারপর ফিরে যেতে চায়নি। অনেকে ছাত্রজীবন শেষ করে নিজের বিদ্যাবুদ্ধি এবং উদ্যমের জোরে ঢুকেছে এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।" সত্যব্রত আরও বললো. "প্রবাসী বউদের মধ্যেই আপনি কিছু টিপিক্যাল বাংলার বধূ দেখতে পাবেন। বিশেষ করে

যাঁদের স্বামীরা বিয়ের পরেই প্রবাসী হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর আছে যারা 'মেল অর্ডারে' বিয়ে করেছে গ্রিনকার্ড হোল্ডার বাঙালিকে। এদের বাবা-মায়েরা সবুজ ডলারকে কখনও পাঁচ, কখনও সাত, কখনও বারো, কখনও চোদ্দো টাকা দিয়ে গুণ করে পুলকিত হয়েছে এবং ঝুঁকি নিয়ে বিয়ে দিয়েছে। এইসব স্ত্রীদের অনেকেই বছরের পর বছর ধরে বিরহ-বেদনা ভোগ করেছে এবং মার্কিনি ভিসা অফিসারের সুমতির জন্যে কালীঘাটে পুজো দিয়েছে এবং শেষপর্যন্ত অনুমতি-পত্র লাভ করে এদেশে হাজির হয়েছে।"

"অর্থাৎ অ্যাভারেজ বাঙালিনী থেকে এরা যে সাহসিনী তা প্রমাণ দিয়েই তারা এই সমৃদ্ধির দেশে সুখের সন্ধানে হাজির হয়েছে।"

"ঠিক শুনেছেন। আর একটি শ্রেণী হলো যারা মেড-ইন-ইন্ডিয়া হলেও আমেরিকান সিটিজেন বাঙালি দাদা, দিদি অথবা জামাইবাবুর স্পনসরশিপের দয়ায় বিনা প্রতিযোগিতায় এখানে হাজির হতে পেরেছে। এরাই শেষপর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ভোগে এবং কখনও কখনও হেরে গিয়ে অভিমানে দেশে ফিরে যায় এবং আমেরিকার চিরশত্রু হয়ে দাঁড়ায়।"

সত্যব্রতর সংযোজন আরও একটি শ্রেণী আছে, শংকরবাবু। একদিন এরাই সংখ্যায় গরিষ্ঠ হবে। এরা 'বামারিকান'—বাঙালি, কিন্তু বর্ন-অ্যান্ড ব্রট-আপ ইন আমেরিকা। এরা নতুন প্রজন্ম—এরা আপনাকে তোয়াক্কা করবে না। এদের বুঝতে গেলে আপনাকে এদেশে দীর্ঘদিন থেকে অনেক অনুসন্ধান চালাতে হবে। এরা এই মুহূর্তে ভারতবর্ষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, অথচ শেষ পর্যন্ত এরাই ভারতবর্ষের ভরসা, কারণ নতুন করে এদেশে আর ভারতীয় ইমিগ্রেশন হবে বলে মনে হয় না। ষাট ও সত্তরের দশকের সময় আপনারা হয়তো বুঝতে পারেননি, কিন্তু নিঃশব্দে আমেরিকায় প্রবেশ করে আমরা এক ধরনের ইতিহাস তৈরি করেছি। কখনও যদি এই পর্বটা নিয়ে আপনারা বাংলায় বই লেখেন তা হলে মন্দ হয় না, কারণ প্রথম প্রজন্মের অনাবাসীদের মধ্যে ছেড়ে আসা সম্পর্কে একটা প্রচণ্ড ভালোবাসা-ঘৃণা মেশানো নাড়ির টান থেকে যায়।"

"এটা কি বাঙালিদেরই বিশেষত্ব?"

"সেটা বলা বোধহয় ঠিক হবে না। হাতের গোড়ায় আমাদের আইজাক সিঙ্গারের গল্প-উপন্যাসগুলো রয়েছে—ইউরোপীয় ইহুদিরা দলে-দলে এদেশে এসেও কীভাবে সেই পুরনো জগতেই মানসিকভাবে পড়ে রয়েছে তার শত-শত নিদর্শন রয়েছে ইডিস ভাষায় রচিত সাহিত্যে। আমাদেরও কয়েকজন পুরোসময়ের সাহিত্যিক এদেশে স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়ে এই কাজ করলে আমাদের সাহিত্যভাণ্ডার আরও ধনরত্নে পূর্ণ হতো।"

নানা শহর পেরিয়ে মার্কিন দেশের যে-অঞ্চলটিতে এসে পৌঁছেছি তা আকারে সুবৃহৎ নয়। যেসব মহানগরীর নাম ট্যুরিস্টদের মুখে-মুখে ঘোরে এটি তার মধ্যে অবশ্যই নয়। এখানেই সত্যব্রত দত্ত দীর্ঘদিন বসবাস করেন।

মার্কিন দেশের একটি বৈশিষ্ট্য, অনেক ছোটখাট অজানা জায়গাতেও বড়-বড় কোম্পানির প্রধান কর্মকেন্দ্র থাকে। আমাদের মতন আধডজন মেট্রোপলিটান অঞ্চলে সব কিছু বড় ব্যবসা অথবা কর্মোদ্যোগ সীমাবদ্ধ নয়।

সত্যব্রতর মুখেই শোনা, "তার একটি কারণ ছোট-ছোট অঞ্চলেও মানুষ বিরাট কর্মোদ্যোগের সূচনা করতে সক্ষম হয়েছে। এবং এখানেও স্থানীয় আকর্ষণ বলে একটা জিনিস আছে—যার ফলে একটু নাম হলেই হেডঅফিস দিল্লি, মুম্বাই অথবা বেঙ্গালুরুতে স্থানান্তর করার রেওয়াজ এখানে নেই। বরং ইদানীং একটা উল্টো মনোবৃত্তি দেখা দিচ্ছে—বড়-বড় কোম্পানি তাদের সদর দপ্তর যেখানে সরিয়ে নিতে চাইছে তা একটি গ্রাম ছাড়া কিছুই নয়। কোম্পানিরা পরিবেশটা গ্রামের মতন রেখেই বিশ্বজোড়া ব্যবসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছে।"

আমি বললাম, "আমাদের ওখানে বর্তমান রেওয়াজ—চলো দিল্লি। সরকারি কর্মকর্তাদের সান্নিধ্য ব্যবসায়ের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে অনেক কোম্পানির বড় সায়েবই এখন দিল্লিতে অফিস সরাচ্ছেন।"

সত্যব্রত দত্ত বললেন, "ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নেই, কারিগরি দক্ষতা নেই, একমাত্র ভরসা সরকারি পারমিট অথবা অনুদান। তাই ওখানে শ্রেষ্ঠীকে হুজুর-হুজুর করার জন্যে সারাক্ষণ সম্রাটের দরবারে কাছাকাছি থাকতে হয়। আমি বলছি না, এদেশে সরকারি সংযোগ ব্যবসায়ীর পক্ষে দরকারি নয়। কিন্তু তার জন্যে মাইনেকরা লোক আছে যে ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। সরকারি প্রসাদ পাবার জন্যে গোটা আমেরিকার শ্রেষ্ঠীরা অবশ্যই সারাক্ষণ রাজধানীতে সদরদপ্তর খুলে বসে থাকবে না।"

সত্যব্রতর প্রতিষ্ঠান রাজধানী থেকে এত দূরে থেকেও ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে এবং রাজধানী থেকে দূরে বলে কেউ এখানে হীনম্মন্যতায় ভোগে না।

সত্যব্রত এখানে সুখেশান্তিতে আছেন। "আমেরিকানদের মতন আমি আজ এই কোম্পানিতে কাজ নিইনি। কথায় বলে চাকরি এবং বউ বদলাতে আমেরিকানদের প্রাণে একটুও বাজে না। আমরা ইন্ডিয়ানরাও ব্যাপারটায় ক্রমশ রপ্ত হয়ে উঠছি। এখানকার ম্যানেজমেন্ট শাস্ত্রে 'লয়ালটি' বা আনুগত্য শব্দটার কোনো মূল্য নেই—সবকিছুরই পরিমাপ এফিসিয়েন্সি বা উৎকর্ষে। ফেলো কড়ি, মাখো তেল, আমি কী তোমার পর : এই পলিসির উপর ভর করেই এদেশের শিল্প-বিজ্ঞান গড়-গড় করে এগিয়ে গিয়ে আমাদের আয়ত্তের বাইরে

চলে যাচ্ছে!"

একই জায়গায় দীর্ঘদিন কাজ করায় সত্যব্রতর আর্থিক কী ক্ষতি হয়েছে জানি না, কিন্তু মানসিক লাভ হয়েছে। একই অঞ্চলে দীর্ঘদিন বসবাসের সুযোগ পেয়েছেন এবং স্থানীয় সবার সঙ্গেই তাঁর জানাশোনা।

"ব্যাচেলারের ডেরায় থাকবার সুবিধা অনেক, রসিকতা করেছিলেন সত্যব্রত। "এখানে দেশের রান্নাবান্না হয়তো একটু 'মিস' করবেন, কিন্তু গৃহস্বামীর স্ত্রীর অজস্র বাজে-বকুনি আপনাকে হজম করতে হবে না। আপনি এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন। দুপুরে আমিও থাকছি না, সুতরাং ইচ্ছে করলেই আপনার ক্যারাক্টারদের ইনভাইটও করতে পারেন।"

মুখে যাই বলুন, সত্যব্রতর সংসার করার দক্ষতা অপরিসীম। এই ঝকঝকে তক-তকে বাড়ি দেখে কে বলবে গৃহলক্ষ্মী এখানে অধিষ্ঠিতা নন? সত্যব্রত অবশ্য বলেন, "বাড়িতে লোকজন থাকলে তবে তো বাড়িঘরদোর অগোছালো হবে! গোছানোর কোনো প্রয়োজনই হয় না!"

সত্যব্রত এইসব কথা বলছেন সকালে দ্রুত ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করতে করতে। তারপর অফিসে বেরুবার আগে অবিশ্বাস্য আমেরিকান দক্ষতায় আমার জন্যে দিশি ভাত ডাল কারি তৈরি করে ফেললেন যাতে দুপুরে মধ্যাহ্নভোজনের সময় আমি হোমসিক অনুভব না করি। এই রান্নার পরিমাণ থাকে তিনজনের জন্যে, যাতে প্রয়োজন হলে আমি আমার পছন্দমতন কাউকে খাওয়াতে পারি! "এইটা আপনার নিজস্ব ডেরা, আপনার কাজের লোকটি শুধু আজ দুপুরে কয়েকঘণ্টা ছুটি নিয়ে বেরিয়েছে এই মনে করে আপনি এখন এখানে থাকবেন!"

রাত্রিবেলায় সত্যব্রত নানা গল্প বলেন এবং সেই সঙ্গে রান্নার কাজকর্ম এগোয়। আমি তাঁর নিপুণতা দেখে দুঃখ করি, "এমন ছেলের বিয়ে না হওয়ার কোনো মানে হয়? একটি বাঙালি মেয়ে অন্তত বিবাহিতা হয়েও ঘরসংসারের হাঙ্গামা থেকে কিছুটা মুক্তি পেতো।"

রান্না চালাতে-চালাতে সত্যব্রত রসিকতা করলেন, "আপনি বোধহয় ঠিক বললেন না। বাঙালি মেয়েরা হেঁসেলের সম্রাজ্ঞী, সেখানে তাঁরা স্বামীকেও বরদাস্ত করতে রাজি নন!"

আমি বললাম, "এই অঞ্চলে আমার আসার কথা নয়। কেন এসেছি তাও আপনার অজানা নয়।"

মিষ্টি হাসলেন সত্যব্রত। "আপনার ক্যারাক্টারের ঠিকানা আপনার কাছে আছে, আমি টেলিফোন নম্বরটাও জোগাড় করে এই কার্ডে লিখে দিলাম। আমি বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই যোগাযোগ করতে পারেন। তবে যে সেন্টিমেন্টের উপর আপনারা এখনও বাংলায় গল্প লিখছেন তা কোনোদিন রপ্তানি করা যাবে না।

এ-দেশে এটা কোনো গল্পই নয়।"

আমি এখন কমলার কথা আলোচনা করতে চাইছি না। চেনাশোনা মানুষকে নিয়ে শুধু লেখাটাই আমার কাজ নয়, আমার মধ্যেও একটা সামাজিক মানুষ আছে, আমাকে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব নিয়ে সমাজে বসবাস করতে হয়, আমি তো একজনকে কথা দিয়েছি কমলার সঙ্গে দেখা করে আসবো।

সত্যব্রত বললেন, "আপনি তো কিছু সফল বাঙালির খবরাখবর চাইছেন। আপনি নবগোপাল ব্যানার্জির সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেন। তবে লোকটাকে আমার তেমন পছন্দ নয়। তা ছাড়া..."

"আর কিছু বলতে চান?"

সত্যব্রত হাসলেন, "মার্কিন দেশে বাঙালিরা সাকসেসফুল এই কথাটা দেশে রটা ঠিক কিনা তা বুঝতে পারি না। আমাদের এখানে নানা ধরনের ব্যর্থতাও আছে, শুধু স্বপ্নসম্ভব নয় স্বপ্নভঙ্গেরও নানা ঘটনা এখানে ছড়িয়ে আছে—সেগুলো আপনি দেখলে বোধহয় খুব খারাপ হতো না।"

আমি বললাম, "আপনি যা বলতে চাইছেন তা নিশ্চয়ই সত্যি। কিন্তু আমিও স্বার্থপরের মতন মার্কিন মুলুকে হাজির হয়েছি। বাঙালিরা যে জীবন সংগ্রামে ব্যর্থ, প্রতিযোগিতায় পরাভূত, অন্নসমস্যায় জর্জরিত তা আজ পৃথিবীর কারও অজ্ঞাত নয়। দরিদ্র অসফল বাঙালিদের কথা পড়ে বাঙালিদের এখন কী লাভ হবে? যে-জাত হীনম্মন্যতায় ভুগছে, আত্মহননের আশঙ্কা যার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তার জন্য প্রয়োজন সাফল্যের সঞ্জীবনী সুধা। মৃতসঞ্জীবনী সালসার প্রথম উপাদান হল, কে বলে বাঙালি ব্যর্থ? কে বলে বাঙালি কর্মবিমুখ? কে বলে বাঙালি সাধনায় পরাঙ্মুখ, দেখো, সুদূর বিদেশেও বাঙালি কী করতে পারে! হে অমৃতের সন্তান, ওঠো, জাগো, বিজয়ী হও, সাফল্যের স্বর্ণসিংহাসন তোমার জন্যেই শূন্য রয়েছে।"

সত্যব্রত বললেন, "তাহলে তো আপনাকে নবগোপাল ব্যানার্জির গপ্পোটা শুনতেই হবে। ওঁর সঙ্গে আপনার যোগাযোগটা 'মাস্ট'।" কিন্তু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে এবার গাড়ির দিকে ছুটলেন সত্যব্রত। দেরিতে কর্মক্ষেত্রে হাজির হওয়াটা এদেশের কালচারে নেই। তাছাড়া ট্রাফিক জ্যামের বা রাস্তা রোকোর ধুয়ো তোলাটাও এ অঞ্চলে প্রায় অসম্ভব।

আমি এবার কমলার কথা চিন্তা করতে লাগলাম। সেই সঙ্গে নবগোপাল ব্যানার্জির কথাও। নবগোপাল যখন সর্বজনস্বীকৃত একজন সাকসেসফুল বাঙালি তখন তাঁকেও খুঁজে বার করতে হবে।

"শংকরদা, আপনি!" টেলিফোনে আমার গলা শুনে অবাক

হয়ে গেল কমলা। "কোথা থেকে কথা বলছেন? ওয়াশিংটন না ন্যুইয়র্ক?"

এই এক ঝামেলা এই দেশে! প্রযুক্তির কল্যাণে দশ হাজার মাইল দূর থেকে কথা বললেও দূরত্ব বোঝা যায় না! আমি কমলার ছোট্ট শহর থেকেই কথা বলছি শুনে কমলা আরও অবাক হয়ে গেল।

"খুব ভালোদিনে ফোন করেছেন, শংকরদা! আজ আমার অফ্-ডে! অন্যদিন আমাকে এই সময় ফোন করে পেতেনও না।"

আমি জানতে চাইলাম, কিছুক্ষণের জন্যে হলেও একবার দেখা হয় কিনা? আমি অবশ্য মনে-মনে প্রস্তুত, কমলা ওর দেশের জানাশোনা কোনো লোকের সঙ্গে দেখা করতে চাইবে না। আমি একবার ভাবলাম বলি, তুমি দেখা না-করলেও আমি মোটেই ভুল বুঝোব না।—এদেশে দু'বার এসে, এদেশের গল্প-উপন্যাস পড়ে আমি প্রাইভেসিকে সম্মান করতে শিখেছি। মানুষ যদি কাউকে এড়াতে চায় সেটা তার ব্যক্তিগত অধিকার—মানুষ তো আর কলকাতার পাঁচনম্বর রুটের বাস নয়, যে যার খুশি সে-ই হাত দেখিয়ে বাস থামিয়ে ভিতরে ঢুকে যাবে।

আমি কোথায় আছি শুনে তবু একটু স্বস্তি বোধ করলো কমলা। সে বোধহয় ভেবেছিল আমি মুখার্জি অথবা হাজরা দম্পতির বাড়িতে উঠেছি। কপালে সিঁদুর লাগানো মেয়েদের যে কমলা পছন্দ করতে পারে না তা আমি আন্দাজ করি।

কমলা বললো, "আপনি নিউ জার্সির ডট্‌বাস্টারদের কথা শুনেছেন? মাথায় সিঁদুরের টিপ পরা ইন্ডিয়ান মেয়েদের স্বামীদের যারা মারধর করে।"

আমি শুনেছি, এই সব বিশ্ব-বখাটে গুন্ডাদের কথা। কয়েকটা খুন-খারাপিও করেছে তারা। শুধু অশিক্ষিতগুলো জানে না, সিঁদুরের টিপ ফাটিয়ে ফেলা যায় না, সিঁদুর কেবল মোছা যায়। ডট্‌বাস্টার নয় ডট্‌ওয়াইপার!

কমলা নিশ্চয় আরও খুশি হতো আমি যদি কোনো হোটেলে উঠতাম। এটা আমি বিদেশে বেরিয়ে বারবার লক্ষ করেছি। সবাই আলাদা-আলাদা ভাবে কথা বলতে চায়, কেউ চায় না স্থানীয় সমাজের সন্দিগ্ধ চোখের সামনে কারুর মুখোমুখি হতে। কিন্তু বিদেশে বাঙালি পরিবারের স্নেহ-প্রশ্রয়ে থাকবার সুবিধেও অশেষ—অনেক জিনিস খুব সহজে জানা হয়ে যায়। গৃহস্বামী শুধু আতিথেয়তা দেন না, সামাজিক গাইডের কাজও করেন। তাছাড়া আমি ভীষণ 'ঘরকুনো'—হোটেল আর মোটেই ভালো লাগে না। দীর্ঘদিন যৌথ পরিবারে বসবাস করলে বোধহয় এই রোগ হয়। কাজের শেষে বাড়ি ফিরে চোখের সামনে নিজের লোকজন না-দেখলে মনটা কাতর হয়ে ওঠে। বিদেশে অচেনা স্বদেশের লোককেও মুহূর্তে আপন করে নিতে বাঙালিরা আজও তুলনাহীন। এঁদের স্নেহপ্রশ্রয়েই বিদেশকে আবিষ্কার করার দুঃসাহস আমার হয়েছে।

কমলা বললো, "আপনি রেডি থাকুন, আমি আসছি।"

রেডি আমি সবসময়েই হয়ে আছি। টেলিফোন নামিয়ে আমি কমলার কথা ভাবতে শুরু করলাম।

কমলার সঙ্গে আমার যোগাযোগ না হলেই বোধহয় ভালো হত। কারণ কমলার মা আমাকে বলেছেন, "ওকে বোলো, আমি ওর মুখ দেখতে চাই না।"

যার মুখ দেখতে চাই না তার সঙ্গে দেখা করার হাঙ্গামা না-হওয়াই তো ভালো। কিন্তু আমাদের অর্চনা-মাসিমার দুঃখ আমি বুঝি। অনেকদিন কোনো খবর নেই। মুখ দেখতে না-চাইলেও কেমন আছে তা মা-বাবা অবশ্যই জানতে চাইবেন সারা জীবন ধরে।

আমি অর্চনা মাসিমার কাছে ঠিকানা চেয়েছিলাম। কমলা কোথায় আছে তা তাঁর জানা নেই। কিন্তু তাঁর স্থির বিশ্বাস আমি সহজেই আমেরিকা প্রবাসী মেয়েকে খুঁজে বার করতে পারবো। ওখানে ক'টা আর বাঙালি আছে? তার মধ্যে ক'জনেরই বা কমলা নাম? "তোর কোনো অসুবিধে হবে না।"

"অর্চনা মাসিমা, আমেরিকা দেশটা কত বড় তা আপনার ধারণা নেই। প্রথমে ইন্ডিয়া কত বড় তো একটু আন্দাজ করে নিন, দ্বারকা থেকে ডিব্রুগড় কতখানি চওড়া তার আন্দাজ আপনার আছে। এইবার মনে করুন এইরকম কয়েকখানা ইন্ডিয়া ঢুকে যাবে এই ইউ-এস-এর মধ্যে। সেই দেশে আমাদের ওয়ান-থার্ড এর কম লোক বসবাস করে। তাদের মধ্যে বাঙালির সংখ্যা ছুঁচের ডগার থেকেও কম।"

"কে বারণ করেছিল ওদের বাঙালিদের নিয়ে যেতে?"

মাসিমার উত্তরে আমি হেসে ফেলেছিলাম। "মাসিমা, আপনি জানেন আমাদের কেউ নিতে চায় না। আমরা বুদ্ধি করে ওখানে বেশি সংখ্যায় ঢুকতে পারিনি। ঢুকলে আমেরিকানদেরও ভালো হতো আর আমাদেরও ভালো হতো। কিন্তু যা বলছিলাম আপনাকে, ওখানে আমি কী করে কমলাকে খুঁজে বার করবো? আপনি ওর শহরের নামটাও বলতে পারছেন না।"

কমলার মা অর্থাৎ আমাদের অর্চনা মাসিমা এরপরে চুপ করে ছিলেন। আমি আন্দাজ করে নিলাম, উনি নীরবে বললেন, ব্যাপারটা ঘটবার পরে কখনো একবারও চিঠি দেয়নি। কিন্তু রাধানাথ তো মাসিমার সঙ্গে দু'একবার যোগাযোগ রেখেছেন। মাসিমা আমার হাতেই রাধানাথের জন্যে একটা প্যাকেট দিলেন। বললেন, 'একটা চিঠিও দিলাম।"

এই প্যাকেটে জামাইকে পাঠানো একটা ধুতি ছিল। আমি ওয়াশিংটনে পৌঁছে মাসিমার জামাই রাধানাথের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম।

কমলার ঠিকানাটা রাধানাথ আমাকে দিতে পারেনি। কিন্তু যে জায়গাটায় কমলা চলে গিয়েছিল তার ইঙ্গিত দিয়েছিল। এবং সেই জন্যই আমার এই ছোট্ট শহরে আসা। মনে পড়ে গেল গতবারে ক্লিভল্যান্ডের এক সাংস্কৃতিক সভায় সত্যব্রত দত্তর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল এবং তিনি বাড়িতে যাবার জন্যে কত নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

রাধানাথ আমার সঙ্গে ওয়াশিংটনে যোগাযোগ করেছিল। কিন্তু আমি তাকে কোনো প্রশ্ন করিনি। আসলে কথাটাই তুলিনি। শুধু রাধানাথ বলেছিল, "এবারে আপনাকে হোটেল থেকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারলাম না। প্রথমত আমার বাড়িটা মূল শহর থেকে দূরে, দ্বিতীয়ত আমার অ্যাপার্টমেন্টে কোনো রান্নার ব্যবস্থা নেই। খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে হবে আপনার। তাছাড়া, আমি কখন অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে যাই এবং কখন ঢুকি তার কিছুই ঠিক নেই।"

অর্চনা মাসিমার চিঠিটা রাধানাথ পড়েছিল। মাসিমা লিখেছেন, "তুমি আজও আমার জামাই আছো। তোমাকে একটা স্নেহ উপহার পাঠালাম। আমি ধরে নিয়েছি আমার মেয়ে নেই।"

চিঠি পড়ে রাধানাথ কোনো কথাই বললো না।

আমি জানি এরপরেও কয়েকটা লাইন আছে। মাসিমা লিখেছেন, "দোষটা তাঁরই। মেয়েকে নিশ্চয় ঠিকমতন শিক্ষা দেওয়া হয়নি।"

রাধানাথ আমার সঙ্গে বেশিক্ষণ সময় কাটায়নি। আমিও অস্বস্তি বোধ করেছি।

তারপর আজ এই প্রতীক্ষা। সত্যব্রত দত্তর বাড়িতে আমি কমলার জন্যে অপেক্ষা করেছি।

আমার মনে পড়ছে কমলার বিয়ের দিনের কথা। বর এল হই-হই করে। সানাই বাজল। আমিও বিয়েবাড়িতে অনেক কাজকর্ম করেছিলাম। কমলা মেয়েটি ভারি শান্ত, ভারি নরম, ভারি মিষ্টি।

গ্রিনকার্ড হোল্ডার জামাই রাধানাথ ক'দিন পরেই আমেরিকা ফিরে গিয়েছে। এবং অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে দেড়বছরের মাথায় কমলাকে নিয়ে গিয়েছে ওয়াশিংটনে। রাধানাথ ও কমলা তখন একসঙ্গে আমার কাছে চিঠি লিখত। "এবার এদেশে এলে অন্তত সাতদিন আমাদের বাড়িতে থাকতে হবে। বেশি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেবেন না—অনেক গল্পগুজব হবে।"

এরপরেও চিঠি এসেছে। "দেশের লোক দেখবার জন্যে আমরা পাগল। কেউ এদিকে আসবার কথা হলেই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। হোটেলে থাকবার কোনো দরকার নেই, আমাদের একটা গেস্টরুম আছে।"

সেইসব চিঠি আমি মাসিমাকে দেখাতাম, আর মাসিমা খুশি হতেন।

ইতিমধ্যে আমি উটকো বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে হঠাৎ আমেরিকান গ্রিনকার্ড হোল্ডার বিয়ে করে ঠকবার সম্ভাবনা সম্পর্কে কাগজে এক পরিচিতজনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা লিখেছি।

মাসিমা সে লেখাও পড়েছেন। এবং বলেছেন, "তুই মেয়ের বাপ-মায়েদের শুধু-শুধু ভয় পাইয়ে দিচ্ছিস। কত হিরের টুকরো ছেলে রয়েছে ওদেশে, তারা তোর গল্পের ওই দুষ্টু লোকটার মতন নিজের বউ ছেড়ে অন্য মেয়ের সঙ্গে ঘর করছে না।"

আমি কোনো উত্তর দিচ্ছিলাম না। মাসিমা বলেছিলেন, "তোর উচিত একবার ওখানে গিয়ে ক'দিন থেকে আমার রাধানাথ-কমলার কথাটাও লেখা—কেমন সুখে তারা ঘরসংসার করছে। কোথাও কোনো হাঙ্গামা নেই।"

মাসিমা খোঁজখবর করতেন, কে বিদেশে বেড়াতে যাচ্ছে। তাকে বলতেন, "ওয়াশিংটনে আমার মেয়ে-জামাই রয়েছে। পারলে খোঁজ কোরো।"

তারপর সেবার বিবেকের কথা নিজেই মেয়েকে লিখলেন। কমপিউটার লাইনের কী কাজ নিয়ে গ্রিনকার্ড পকেটে করে বিবেক দাশগুপ্ত যাচ্ছে প্রথমে ওয়াশিংটনে। মাসিমা বলেই দিয়েছেন, "তোমার কোনো অসুবিধে হবে না, সোজা গিয়ে উঠবে আমার মেয়ে-জামাইয়ের কাছে। যদ্দিন খুশি থাকবে। আমার জামাই ও মেয়ে দু'জনেই মানুষ ভালোবাসে। অতিথি পেলে খুব আনন্দ করে।"

এই পর্যন্ত ঠিকই ছিল। এ-নিয়ে লিখতে বসার কোনো প্রয়োজনও হত না। কিন্তু যেদিন প্রথম টেলিফোনটা এল আমার বাড়িতে তখন খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। মাসিমার বাড়িতে টেলিফোন নেই।

লং ডিসট্যান্সে রাধানাথ বললো, "শংকরদা, কমলার মাকে একটু আনিয়ে দিন, আমি আধঘণ্টা পরে আবার কল করবো। খুবই আর্জেন্ট।"

"কোনো বিপদ-আপদ নয় তো? সব খবর ভালো তো?" আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। ওদিক থেকে উত্তর এসেছিল, "শরীর কারও খারাপ নয়।"

মাসিমা আমার প্রতিবেশী বললেই চলে, পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ। মাসিমা এলেন এবং আধঘণ্টা পরে আবার টেলিফোন। একটু কথা বলেই মাসিমা তো ফোন ধরেই কাঁদতে লাগলেন। "না, এ হতেই পারে না।"

মাসিমা এরপর অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। রাধানাথ বলেছে, কমলা গতকাল বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে। ওই যে ছেলেটিকে মাসিমা এখান থেকে গেস্ট হিসেবে পাঠিয়েছিলেন বোধহয় তার সঙ্গেই। গ্রিনকার্ড হোল্ডার বিবেক দাশগুপ্ত।

"এ হতেই পারে না।" মাসিমা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না।

রাধানাথ জিজ্ঞেস করেছে, মাসিমা এ-সম্বন্ধে কিছু জানেন না কি?

"হা ঈশ্বর, আমি এ-সম্বন্ধে কী করে জানব? কমলা তো কখনও কিছু

বলেনি।”

কিন্তু ব্যাপারটা আর কাল্পনিক নয়। কমলা নিজেই স্বামীকে অফিসে টেলিফোনে জানিয়ে দিয়েছে, “আমি চললাম। আমি নিজের পথ দেখে নিচ্ছি। তোমার জিনিসপত্তর টাকাকড়ি ঘরসংসার যেমন ছিল তেমন রইল। আমি কিছুতেই হাত দিচ্ছি না।”

আমি যেদিন কলকাতা ছেড়ে বিদেশে বেড়াতে আসছি সেদিনও মাসিমা কাঁদতে লাগলেন। “আমি এসব এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। আমার মেয়ে উপবাস করত, পুজো করতো—সে কেমন করে এমন হবে?”

এইসব পুরনো কথা ভাবতে-ভাবতে দরজার বেল বেজে উঠল। “কমলা, এসো, এসো।”

কমলা ঠিক সেই আগেকার মতনই আছে, বরং শরীরটা আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। কমলা শ্যামাঙ্গিনী। মেরুন রঙের সিল্কের শাড়ি পরেছে। চোখে হাল ফ্যাশনের পাতলা ফ্রেমের চশমা। নিষ্পাপ দৃষ্টি দেখে কে বলবে স্বামীত্যাগিনী।

কমলাকে বললাম, “কিছু খাও। এখানে সব আছে।”

“দেশে সবাই খেতে চায়, কিন্তু খাবার নেই। আর এখানে সব আছে, কিন্তু কেউ খেতে চায় না। শরীর বেঢপ হয়ে যাওয়ার ভয়ে।”

“অর্থাৎ থাকলেও অশান্তি, না-থাকলেও অশান্তি। তবে তুমি আজ একটু খাও। এই খাওয়াতে আর একটু মোটা হলে কিছু এসে যাবে না।”

কমলা এবার আমাকে অবাক করে দিল। “আজ আমার উপোস, শংকরদা।”

স্বামীর ঘর ছেড়ে যে পরপুরুষের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে তারও আবার দেবদ্বিজে ভক্তি! তারও আবার উপোস!

“তুমি পুজোআচ্চায় এখনও বিশ্বাস করো কমলা?”

“ওমা! কী বলছেন? ঠাকুর-দেবতা, ভগবান এসব তো আমার নিজস্ব জিনিস। এসব কেন আমি ছাড়ব, শংকরদা?”

আমি কীভাবে শুরু করবো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। কমলাই আমার সুবিধে করে দিলো। “আমি এখনও বেঁচে আছি কি না, বেঁচে থাকলে আমি কত নিচেয় নেমে গিয়েছি তা দেখতেই নিশ্চয় আপনি এতদূর ছুটে এসেছেন, শংকরদা।”

আমি কী বলবো? আমি অস্বস্তি কাটাবার জন্যে অন্য প্রশ্ন করলাম। “এ-দেশটা কেমন লাগছে কমলা?”

কমলা হাসলো। “আপনি লিখেছেন এ-দেশে বিয়ে করতে এসে অনেক বাঙালি মেয়ে বিপদে পড়ে যায়। আপনি নিশ্চয় ঠিকই লিখেছেন। তবে আপনাকে বলতে পারি, এ-দেশে এসে অনেক মেয়ে আবার বেঁচে যায়।”

আমি তাকাচ্ছি কমলার দিকে। "এ-দেশকে দোষ দেওয়া খুব সহজ, শংকরদা। এ-দেশের খুঁত খুঁজে বেড়ানোটাও কিছু লোকের পেশা। একটা কথা বলতে পারি, এ-দেশের মানুষের এমন জিনিস আছে যা অন্য কারুর নেই। স্বাধীনতা জিনিসটা কী তা এ-দেশে এসেই বুঝতে পারলাম। আমার কোনো দুঃখ নেই।"

আমি এখনও চুপ করে আছি। কমলা বললো, "এখানে মস্ত গুণ কেউ কারও ব্যাপারে নাক গলায় না। এই যে আমি কার সঙ্গে ঘর করতাম, কেন তাকে ছেড়ে এলাম এ নিয়ে সিঁদুর-পরা বাঙালি মেয়ে ছাড়া কারও কোনো কৌতূহল নেই। এখানে মানুষের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়ে মানুষ বলে, জীবনটা তোমার, তুমি নিজেই ঠিক করো তুমি কেমনভাবে জীবন কাটাতে চাও। কোথাও কোনো শেকল নেই। শুধু বাঙালি বউদের ভয়েই আমি ওয়াশিংটন শহর থেকে এই ছোট্ট জায়গায় চলে এসেছি। এখানে আমার কোনো বাধা নেই। আমি চাকরি করি এবং নিজের মতন থাকি।"

আমি এখনও চুপচাপ বসে আছি। কমলা বললো, "আপনি তো জানতে চাইলেন না কেন আমি স্বামীর সংসার ছেড়ে চলে এলাম?"

আমি হাসলাম। "তুমি কেমন আছ সেটা জানাই আমার একমাত্র কাজ কমলা। আমার আর কোনো প্রশ্ন থাকবার কথা নয়।"

কমলা বললো, "আমাদের দেশে মা যখন ঠাকুরের সামনে মাথা খুঁড়ে বলতেন, ঠাকুর আমাকে মুক্তি দাও, তখন তার অর্থ বুঝতাম না। এ-দেশে এসে এখন আমি বুঝতে পারি কত বাঙালি মেয়ে জেলখানায় জন্মে, জেলখানাতেই ঘরসংসার করে, জেলখানাতেই জীবন শেষ করছে।"

আমি আবার কমলার মুখের দিকে তাকালাম। কমলার অনুরোধ, "মাকে বলবেন, ভীষণ কিছু হয়নি। ওকে আমার ভালো লাগলো না, তাই আমি চলে এসেছি। আমার মায়েরও ভালো লাগতো না আমার বাবার সংসার—কিন্তু তিনি মেনে নিয়েছিলেন। এ-দেশে এই মস্ত এক সুবিধে—যা ভালো লাগে না তা সহ্য করে নিজেকে সারাজীবন কষ্ট দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আপনি মাকে বলবেন, কমলা নিজেকে ঠকাতে চায়নি বলেই বেরিয়ে এসেছে।"

"আর বিবেক? সে কোথায়?"

কমলা বললো, "না, বিবেকের সঙ্গে আমি থাকি না। ও তো একটা নিমিত্তমাত্র। ও ওয়াশিংটনে আসার পরেই আমি বুঝতে পারলাম আমি নিজেকে ঠকাচ্ছিলাম। কিন্তু বিবেক ইজ ম্যারেড। ওর বউ দেশে গ্রিনকার্ডের জন্যে অপেক্ষা করছিল। আমি ওসব সম্পর্ক নষ্ট হতে দিইনি। আমি একলাই চলে এসেছি।"

কী ভীষণ নরম মেয়ে ছিল এই কমলা। একলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাসে হাওড়া স্টেশন আসতে পারতো না। সে এখন সুখে আছে কি না জানি না, কিন্তু অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব অর্জন করেছে।

আমি বললাম, "মা মুখে যাই বলুন, তোমার জন্যে সবসময়ই চিন্তা করেন।"

কমলা এবার উঠে পড়লো। বিদায় নেবার আগে বললো, "এ-দেশে না-এলে স্বাধীনতা কাকে বলে তা আমি বুঝতেই পারতাম না। মাকে বলবেন, যে একলা থাকতে ভয় পায় সে কখনও পুরো স্বাধীন হতে পারে না। এখানে একলা থাকার কোনো অসুবিধে নেই ; আমি বেশ ভালো আছি।"

একই জীবনে মানুষ কত বদলে যেতে পারে ভেবে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে রইলাম। তারপর অনেক সময় ধরে ভাবতে লাগলাম, কমলাকে আমি সফল না ব্যর্থ কোন তালিকায় ফেলবো?

সত্যব্রত বিকেলে ফিরে আসবার পরে তাকেও প্রশ্ন করেছিলাম। সত্যব্রত বলেছিলেন, "স্বাধীনতার সঙ্গে সুখের কোনো সম্পর্ক নেই। দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস, এ-কথা আপনার অর্চনা মাসিমাকে বুঝিয়ে বলবেন।"

এইসব কথার মধ্যেই ডিনার তৈরি হল। এবং ডিনারের মধ্যেই টেলিফোনটা বেজে উঠল। সত্যব্রত বললেন, "আজ আপিস থেকে নবগোপাল ব্যানার্জির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। উনি আপনার এপার বাংলা ওপার বাংলা পড়েছেন। আমি বলেছি, সামান্য কিছুক্ষণ কথা বলতে চান। উনি আজকেই খবর দেবেন বলেছেন।"

নবগোপাল ব্যানার্জিই ফোনে কথা বলছেন। ফোন নামিয়ে দিয়ে সত্যব্রত বললেন, "উনি আগামিকালই বাইরে চলে যাবেন। তাই আজকেই ওঁর বাড়িতে পৌঁছে দিতে বলেছেন। ওঁর ইচ্ছে আজ রাত্রিটা আপনি ওখানেই কাটান, কাল সকালে উনি আপনাকে এখানে নামিয়ে দিয়ে যাবেন।"

এ-দেশে মানুষের সময়ের দাম ভীষণ। অনেক আগে থেকে লোকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে থাকে। আমি হুট করে কারও সঙ্গে কোনো কথাবার্তা ঠিক না-করেই চলে এসেছি। সুতরাং আমার পক্ষে এইভাবেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে।

সত্যব্রত এবার গাড়ি বার করলেন। বললেন, "আপনি শুধু একটা পাজামা-পাঞ্জাবি নিন। টুথপেস্ট টুথব্রাশ নেবারও দরকার নেই। অতিথিবৎসল ইন্ডিয়ানরা আচমকা অতিথির জন্যে বাড়তি টুথব্রাশও বাড়িতে রেখে দেন। আপনার কোনো কষ্ট হবে না।"

মাইল কুড়ি দূরত্বকে এখানে কেউ দূরত্বই মনে করে না—যেন পাশের পাড়ায় গল্প করতে যাচ্ছে।

সত্যব্রত বললেন, "আপনি খুব লাকি লোক। নবগোপাল ব্যানার্জি যে আপনাকে বাড়িতে ডাকবেন তা ভাবতে পারিনি। উনি এখানকার ইন্ডিয়ান সমাজে মেশেন না। এতো বড় যে দুর্গাপুজো—দু'দিন এখানে যে মহোৎসব হয় তাতেও কখনও আসেন না। কিন্তু চাঁদা দেন। ফোন করা মাত্র সেক্রেটারির কাছে চেক পাঠিয়ে দেন। এবারে পাঁচশো ডলার দিয়েছেন, হায়েস্ট কনট্রিবিউশন, কিন্তু আসেননি।"

সত্যব্রতর মতে, "এই দুর্গাপুজোটাই আমাদের আইডেনটিটি বাঁচিয়ে রেখেছে। দুশো আড়াইশো মাইল দূর থেকে মানুষ চলে আসে, খিচুড়ি ভোগ খায়। আমরা খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো করি। আপনি হয়তো শুনে থাকবেন, নর্থ আমেরিকার কোনো-কোনো জায়গায় ছোটদের জন্যে 'বিফ' ভোগেরও প্রচলন হয়েছে। এখানকার বামারিকানরা মাংস ছাড়া অন্য কিছু খেতে পারে না। তর্কে এদের সঙ্গে পেরে উঠবেন না। প্রথম বক্তব্য—মা দুর্গা তো 'বাফেলো ডেমন' মহিষাসুরকে 'কিল' করেইছেন, সে-ক্ষেত্রে মাংস খেতে বাধা কোথায়? ইন্ডিয়ানরা এত গরিব হয়েও বেহিসেবি আর আমেরিকানরা ধনী হয়েও হিসেবি, অপচয় অথবা নষ্ট তাদের স্বভাবের বাইরে।"

ঘরের মেঝের মতন মসৃণ রাস্তা ধরে সত্যব্রতর জাপানি গাড়ি ডাটসুন ছুটে চলেছে। সত্যব্রতর মন্তব্য, "পুজোটাকে একটু আমেরিকানাইজ করে নিতে হয়েছে। আপনাদের এখানে মা আসেন পঞ্জিকার টাইম টেবিল ধরে, আমরা টাইম টেবিলের খবর রাখি, কিন্তু মা যদি সোমবারে বোধন চান তা হলে আমরা অপারগ। মায়ের অধম সন্তানদের তো উইক এন্ডটাই ভরসা। তাই শনি-রবির প্রয়োজনে কখনও আমেরিকান পুজো এগিয়ে যায় কখনও পিছিয়ে আসে। প্রয়োজনের তাগিদে রামচন্দ্রও তো অকালবোধন করেছিলেন, সুতরাং শুধু বামারিকানদের দোষ দেওয়া চলবে না।"

সত্যব্রত জানালেন, "আমরা আরও একটু স্বাধীনতা নিই। বোধন, অধিবাস থেকে সপ্তমী, মহাঅষ্টমী, মহানবমী, বিজয়া দশমী কিছুই বাদ দেওয়া হয় না, কিন্তু চার দিনের ব্যাপারটা স্যান্ডউইচ করে শনি-রবিতেই শেষ করে ফেলা হয়। তা ছাড়া উপায়ও নেই। কারণ আমরা যেসব কমিউনিটি হল ভাড়া করি তা অন্য দিনে পাওয়াও যায় না।"

"আপনি একবার পুজোর সময় আসতে পারেন। আমেরিকান নিপুণতার সঙ্গে ভারতীয় ভক্তির মিলন দেখে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। সবাই আসেন, হই-হই করেন। উল্লেখযোগ্য অনুপস্থিতি ওই আপনার কমলা চৌধুরীর এবং মিস্টার নবগোপাল ব্যানার্জির। পুজো আপনার বাউন দিয়েই করাবার চেষ্টা করা হয়, দু-একটা মুখুজ্যে বাঁড়ুজ্যে অনারারি পুরোহিত জুটেও যায়। গতবারে হঠাৎ

বাউন পুরুতের অভাব হলো—আমরা বাধ্য হয়ে নবগোপাল ব্যানার্জিকে লাস্ট মোমেন্টে ফোন করলাম। ভদ্রলোক স্রেফ বলেছিলেন, আজকেই তিনি আলাস্কায় চলে যাচ্ছেন, ফিরবেন পরে।"

"তখন কী হলো?"

"তখন অগত্যা গতির গতি নিউইয়র্কের প্রবীর রায়কে ফোন করা হলো। উনি শেষ মুহূর্তে ফ্লাই করিয়ে অনারারি এক গাঙ্গুলিকে পাঠিয়ে দিলেন। ওঁদের অসুবিধে হলো না এই জন্যে ওঁদের পুজোটা পরের উইকএন্ডে। অর্থাৎ আমেরিকাই হচ্ছে একমাত্র জায়গা যেখানে পরপর দুটো শনি রবিবারে মায়ের পুজো দেখতে পাবেন।"

দুর্গাপুজো সম্বন্ধে হাজার-হাজার পাতা লেখা হয়ে গিয়েছে, ও বিষয়ে এই মুহূর্তে আমার তেমন আগ্রহ নেই। হাতের মুঠোয় যে সামান্য সময় রয়েছে তা আমি কৃতী বাঙালিদের অনুসন্ধানে ব্যয় করতে চাই। আমাদের কলকাতায় যারা মাথা নীচু করে যদু-মধু হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যাদের সম্বন্ধে সবার ধারণা তারা অপদার্থ, তারা সুযোগ পেলে কী খেলা দেখাতে পারে আপাতত তাই আমার অনুসন্ধানের বিষয়।

এই রকম বাঙালি আমি কয়েক ডজন পেয়েছি ন্যুইয়র্কে, যারা কপর্দকহীন অবস্থায় এসে নিজের চেষ্টায় ভাগ্যকে জয় করেছে। আমি অ্যাকাউনটেন্ট প্রবীর রায়ের কথা আগেই লিখে ফেলেছি—যিনি চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট হয়েও জামাকাপড়ের দোকানে মোট বয়ে গ্রাসাচ্ছাদন করতেন। ন্যুইয়র্কে তিনিই এখন কেষ্টবিষ্টু লোক।

সেবার পেশাগত সাফল্যের কথা বলা হলেও প্রবীরবাবুর বঙ্গভবনের কথা উল্লেখ করা হয়নি। খোদ ন্যুইয়র্ক শহরের বুকের উপর ষাট-সত্তরটি পরিবারের বসবাসের উপযোগী বিশাল অট্টালিকা 'বঙ্গভবন,' যার মালিকানা বাঙালিদের হাতে, যেখানে বসবাসকারী প্রায় সবাই বাঙালি। খোদ কলকাতা শহরে যে দৃশ্য এখন বিরল তা দেখবার ইচ্ছে হলে আপনাকে পাসপোর্ট করিয়ে টিকিট কেটে এই ন্যু ইয়র্কে আসতে হবে। বাঙালির যা শ্রেষ্ঠ তা শেষ পর্যন্ত এই ইউ-এস-এ এবং কানাডা ছাড়া কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না!

সত্যব্রতর মন্তব্য : 'মিস্টার নবগোপাল ব্যানার্জিকে আপনি কৃতী বাঙালি বলতে পারেন। অন্য বাঙালিরা চাকরিতে আছে এবং ডাক্তারি ও অ্যাকাউনটেন্টের পেশায় আছে। ব্যবসায়ে নেই বললেই চলে। অথচ ঝটপট পয়সা তো ওই বিজনেসে। মিস্টার ব্যানার্জি একটা নামকরা ওষুধের দোকানের চেইন স্থাপন করেছেন। নামের মধ্যেও বাংলা গন্ধ রয়েছে—'বেমকো' দোকানের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।"

"ভদ্রলোক কি ডাক্তার?"

"না মশাই, এখানে ডাক্তাররা ওষুধের দোকানের মালিক হয় না। উনি কী তা আমি জানি না। শুধু এইটুকু জানি ওষুধের দোকান ছাড়াও রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায় হাত দিয়েছেন।"

"এই বস্তুটি কী?"

"জমি এবং সম্পত্তি কেনা-বেচার ব্যবসা বলতে পারেন। আমাদের কলকাতায় এই ব্যবসাটা তেমন সম্মানিত নয়, কিন্তু এখানে কোটি-কোটি ডলার খাটছে। যার কিছু বাড়তি পয়সা আছে সে রিয়েল এস্টেটের কিছু লগ্নি করবেই। এ এক অদ্ভুত দেশ মশাই! আমি নিজেই জমি কিনেছি ফ্লোরিডায় এবং স্পেনে।"

"এইসব সম্পত্তি বেড়া-ট্যাড়া দিয়েছেন তো?"

হাসলেন সত্যব্রত। "আমি ফ্লোরিডাতেও যাইনি, স্পেনেও যাইনি। জমির ডকুমেন্ট শুধু দেখেছি, বাকি সব শুনেছি এজেন্টের কাছে। ওই কোম্পানি সব জানে। মিস্টার নবগোপাল ব্যানার্জির শুনেছি এইটা ছিল অবসর বিনোদনের পেশা। কিন্তু যারা দূরদর্শী হয় তারা খেলার মাঠে খেলতে গিয়েও টাকা রোজগার করে ফেলে। টাকা যদি একবার ঠিক করে যে আপনার পিছনে ছুটবে তা হলে মুশকিলের ব্যাপার—কোথা থেকে আপনার ব্যাংক ব্যালান্স বেড়ে যাচ্ছে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন না। টাকা যে ডিম পাড়ে!"

"ধীরে, মিস্টার দত্ত, ধীরে। আমাদের দেশের লোকদের এসব কথা সহজে হজম হবে না। ভাববে, আমি বাড়িয়ে লিখছি। স্বদেশে বাঙালিরা শুধু জানে, দেনায় দেনা বাড়ে। বেশি টাকা আমাদের ধাতে সয় না। আমাদের ধারণা, অর্থই অনর্থের মূল।"

"একদম বাজে কথা, শংকরবাবু। আপনি এদেশে ভালো করে ঘুরে দেখুন। আপনারা যাকে কোটিপতি বলেন তা এখানে হাজারে-হাজারে নয় লাখে-লাখে পাবেন। অর্থ এদের স্বাস্থ্য, সুখ, সমৃদ্ধি এবং সুরক্ষা দিচ্ছে। কোনোরকম অনর্থ সৃষ্টি হচ্ছে না—আসলে দারিদ্র্য থেকে যত অনর্থ সৃষ্টি হয়, অর্থ থেকে তার শতকরা এক ভাগও হয় না।"

"অর্থের গুণগান আমাদের দেশে ফ্যাশনেবল নয়, সত্যব্রতবাবু। যারা অর্থবান সাধারণত তারা খারাপ লোক হয়, এমন একটা ধারণা সমাজের বহু স্তরে রয়েছে।"

"এখানে উলটো। দরিদ্রকেই অনেক সময় লোকে সন্দেহের চোখে দেখে। কারণ সীমাহীন সুযোগের এই দেশে কর্মহীন, অর্থহীন হয়ে থাকবার বিশেষ কোনো যুক্তি নেই, যদি-না আপনার ব্যক্তিগত কোনো ত্রুটি থাকে। ধনবানরা কুঁড়ে একথাও বলতে পারবেন না এই দেশে। যত বড়লোকই হোন না কেন,

নিজের রান্না নিজে করতে হবে, নিজের এঁটো বাসন নিজেকে মাজতে হবে, নিজের ময়লা কাপড় নিজেকে কাচতে হবে, নিজের গাড়ি নিজেকে চালাতে হবে। বাই-দি-বাই, গাড়িটা এখানে সমৃদ্ধির প্রতীক নয়—আমাদের দেশে যেমন প্রত্যেকের জন্য রবারের চটি, এদেশে তেমনি একখানা গাড়ি। যেকথা বলছিলাম আপনাকে, এদেশে যত ধনসম্পত্তি বাড়ে মানুষ তত পরিশ্রমী হয়ে ওঠে। অর্থ এখনও মানুষকে এদেশে অকেজো করতে পারেনি, বরং মানুষকে উদ্যম ও প্রাণশক্তি বাড়িয়েই চলেছে।"

সত্যব্রত বললেন, "এই নবগোপাল ব্যানার্জি মানুষটিও নিশ্চয় সেই রকম। শুনেছি তেরো-চোদ্দো ঘণ্টা পরিশ্রম করেন। ওঁর দোকানগুলোতে গণ্ডায়-গণ্ডায় সাদা চামড়ার সায়েব মেম কাজ করছে আর আমাদের নবগোপাল ব্যানার্জি দোর্দণ্ডপ্রতাপে কোম্পানি চালাচ্ছেন একথা আপনি নিশ্চয় লিখতে পারেন।"

চলমান গাড়িতেই আমি কয়েকটা পয়েন্ট নোট বইতে লিখে নিচ্ছি। কোনো অসুবিধে নেই—কারণ যেমন রাস্তা তেমন গাড়ি। বিন্দুমাত্র ঝাঁকুনি নেই। সত্যব্রত বললেন, "নিজের চেষ্টায় বড় হওয়ার অনেক গল্প আপনি এদেশে পাবেন। পাঁচ বছর আগেকার ফকির এখন রাজা হয়েছে এটা কোনো ব্যাপারই নয়।"

আমি বললাম, "আমাদের ঠিক উল্টো। দু চারটে সেকেলে বাঙালি রাজা কী করে ফকির হয়ে ভদ্রাসন পর্যন্ত লাটে তুলে দিচ্ছে তার খবরাখবর কলকাতায় পাবেন, কিন্তু কোনো মানুষের ভাগ্যই ফেরে না। যে গরিব সে ক্রমশ আরও গরিব হচ্ছে। কাউকে এরই মধ্যে একটু উঠে দাঁড়াতে দেখলেই মানুষ সন্দেহ করে, তারপর তাকে টেনে-হিঁচড়ে নামাতে চায়। অকারণে মানুষ যে কতখানি মানুষের শত্রু হতে পারে তা যদি কেউ দেখতে চায় তা হলে তাকে ভারতীয় উপমহাদেশে আসতেই হবে। দারিদ্র্য বড় সর্বনাশা জিনিস, সত্যব্রতবাবু। অভাবের অ্যাসিডে মনুষ্যত্ব অতি সহজে নষ্ট হয়ে যায়।"

"আপনি বলছেন, মানুষের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়?"

"আত্মবিশ্বাসের অভাব—আপনি ঠিকই ধরেছেন। অনেকটা শ্লথগতি প্যারালিসিসের মতন—ক্রমশ মানুষকে পঙ্গু করে দেয়। সেই জন্যেই তো আমি বিদেশে এসেও কৃতী দেশের মানুষের খোঁজ করছি। আমি বাঙালির আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিতে চাই। বলতে চাই, আমাদের বিশেষ কিছু দোষ নেই। সময়ও কিছু শেষ হয়ে যায়নি। দেখো, এই বেড়ালই বনে গিয়ে কেমন বাঘ হয়েছে! মগজ খাটালে এবং চেষ্টা করলে আমরা পারবো না এমন কিছু কাজ এই পৃথিবীতে নেই। এই ধরনের কথাই বিবেকানন্দ বলেছিলেন। কিন্তু এখন তাঁকে নিয়ে ভক্তি কেত্তন শুরু হয়েছে বুড়োদের—ছোকরাদের কানে তাঁর কথাগুলো একদমই

পৌঁছয় না।"

"আপনি ঠিক লোকের কাছেই যাচ্ছেন, শংকরবাবু। নবগোপালবাবু আপনার একটা আদর্শ চরিত্র হতে পারেন। কারণ যতদূর জানি, এই ভদ্রলোক কিছু পড়াশোনায় কৃতী ছিলেন না, নামের শেষে বড়-বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের টাইটেলও নেই, তবুও নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন।"

আমরা ইতিমধ্যে নবগোপাল ব্যানার্জির বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। বাড়ির নাম শ্রীদুর্গা! "তা হলে বোঝা যাচ্ছে দুর্গাভক্ত। এই বিদেশেও যখন মহিষাসুরমর্দিনীর পাবলিসিটি করছেন!"

"হতেও পারে, নাও হতে পারে। আপনাকে বললাম, উনি আমাদের পুজোয় কখনও আসেন না। চাঁদাটাই তো সব নয়। ভগবানের দয়ায় চাঁদা এখানে অনেকেই দিতে পারে, কিন্তু নিজের উপস্থিতিটাও একান্ত প্রয়োজন।"

বাড়িটা যে বিশাল সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। ক্লোজড সার্কিট টি-ভিতে আমাদের আসতে দেখেই নবগোপাল ব্যানার্জি বেরিয়ে এলেন।

নবগোপালের বয়স আমার থেকে অনেক কম, তবে চল্লিশ পেরিয়েছে। দেশে যাদের সায়েবদের মতন ফর্সা বলা হয় নবগোপাল তাঁদেরই একজন। লম্বায় অন্তত ছ'ফুট। গোলগাল মুখটি, কিন্তু শরীর সুশাসিত। চেষ্টা করে যে ওজন আয়ত্তে রাখা হয়েছে তার ইঙ্গিত ছড়িয়ে রয়েছে দেহে।

"আসুন, আসুন। আপনি অনেক মোটা হয়ে গিয়েছেন।" নবগোপাল প্রথমেই আমাকে সারপ্রাইজ দিলেন।

"আপনি আমাকে দেখেছেন?"

"অবশ্যই দেখেছি! আপনি তখন বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সে ধুতি শার্ট পরে আপিসে আসতেন, তখনও আপনি জগদ্বিখ্যাত হননি!"

"আমাকে আর লজ্জা দেবেন না। নিজের দেশেই ক'টা লোক চেনে তার ঠিক নেই, আপনি আবার জগতের কথা তুললেন।"

হা-হা করে হাসলেন নবগোপাল! "বাঙালি পাঠকরা সংখ্যায় যতই নগণ্য হোক সারা জগতে তারা ছড়িয়ে আছে—সুতরাং আপনাদের জগদ্বিখ্যাত বললে টেকনিক্যাল ভুল করা হয় না।"

সত্যব্রত অনুরোধ সত্ত্বেও ভিতরে ঢুকলেন না। বললেন, "আপনারা তা হলে তো পরস্পরকে চেনেন।"

"উনি চেনেন না, কিন্তু আমি ওঁকে চিনি। উনি আমাদের টিকিয়াপাড়ার বাড়িতেও এসেছেন।"

আমি সত্যিই আশ্চর্য হচ্ছি। "আসুন, আসুন—সমস্ত রাত পড়ে আছে,

অনেক কথা হবে।”

নবগোপালের বাড়িটা যেন একটা শিল্প সংগ্রহশালা। আমরা প্রথমে যে ঘরটিতে গেলাম সেখানে গ্রিস ও ইতালির প্রভাব। কত মূর্তি ও শিল্পকর্ম যে সেখানে শোভা পাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। দেওয়ালে রেনেসাঁসি ঢঙের তৈলচিত্রও রয়েছে। আমি চিত্র বিশেষজ্ঞ নই, কোন ছবি অরিজিন্যাল এবং কোন ছবি নকল না আমি বুঝে উঠতে পারি না।

আমি আরও অবাক হলাম, নবগোপাল-গৃহে একটি মেমসায়েব পরিচারিকা রয়েছেন। নবগোপাল বললেন, “আপনার জন্যেই জেনকে আজ সন্ধেবেলায় থাকতে রিকোয়েস্ট করেছি। না-হলে জেন সকালেই সব কাজকর্ম সেরে চলে যায়। আমি অবশ্যই রাঁধতে পারি। কিন্তু জেন আপনার জন্যে কিছু ইতালিয়ান খাবার করে ফেলেছে।”

জেনকে টেবিল তৈরি করতে অনুরোধ করে, নবগোপাল এব্যর আমাকে দোতলায় নিয়ে গেলেন। আগাগোড়া কার্পেটে মোড়া বাড়ি। সিঁড়িতেও কার্পেট। বলা বাহুল্য সমস্ত বাড়িটা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত।

পাশ্চাত্য থেকে যেন এবার প্রাচ্য দেশে চলে এলাম। দোতলাটা পুরোপুরি ভারতবর্ষ! এখানে কত রকমের শিল্পকর্ম যে জড়ো করা হয়েছে তা ভাবা যায় না।

একটা পোড়ামাটির পুতুল তুলে দিলেন নবগোপাল। “এদেশে ভারতীয় অ্যানটিকের সংগ্রহ নেই একথা ভাববেন না। অনেক ব্যক্তিগত কালেকশানে অনেক চমৎকার জিনিস আছে, তবে সবসময় কদর নেই। আপনি বিশ্বাস করবেন না, আমি দু’খানা যামিনী রায়ের ছবি কিনেছি জাংক সেল থেকে। বাড়ির কেউ হয়তো যুদ্ধের সময় কলকাতায় গিয়েছিল বিটউইন উনিশশো’ চল্লিশ এবং পঁয়তাল্লিশ। আর এই মহেঞ্জোদারোর পুতুল, এটাও আমি মাত্র দশ হাজার ডলারে তুলে নিয়েছিলাম। আসলে ইন্ডিয়া সম্বন্ধে এদের তেমন আগ্রহ নেই। ইজিপ্ট, ইটালি সম্বন্ধে এদের যতটা কৌতূহল তার একচুল নেই হরপ্পা মহেঞ্জোদারো সম্বন্ধে। ম্যাক্সিমাম ওই তাজ। এম্পারার শাজাহানের ব্যবহৃত জিনিস থাকলে আপনি হয়তো দাম পাবেন!”

“দোষ দেওয়া যায় না। ভারতীয়দের তো এরা বেশি দেখেনি। যেসব ভারতীয়রা এখন এদেশে থেকে গেছেন, তাদের ছেলেমেয়েরা যদি কৃতী হয় তারা হয়তো পুরনো ভারতীয় জিনিসের কদর করবে।”

“নাও হতে পারে।” হাসলেন নবগোপাল। “পুজোপার্বণের নাম করে এখানকার ইন্ডিয়ান বাবামায়েরা যেভাবে ইন্ডিয়ান কালচারের সালসা খাওয়াবার চেষ্টা করেন তাতে উল্টো ফলও হতে পারে!”

নবগোপালের 'ভারতবর্ষ' দ্রুত পরিভ্রমণ করে আমরা নিচে ডাইনিং টেবিলে ফিরে এলাম এবং 'সেকেন্ড' ডিনারে বসে পড়লাম। "আমারই ভুল। আমারই বলা উচিত ছিল আপনি এখানে এসে খাবেন" নবগোপাল শান্ত ভাবে বললেন।

ডিনার টেবিলের সামনের দেওয়ালে একখানা রঙিন ছবি। ওয়াটার কালার। দৃশ্যটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছে, কিন্তু বুঝতে পারছি না।

হাসলেন নবগোপাল। "হাওড়া টিকিয়াপাড়ার দৃশ্য। ভিউ ফ্রম বাঙালবাবুর ব্রিজ। একটা ফোটো তুলে এনেছিলাম। তারপর এখানে এক শিল্পীকে দিয়ে আঁকিয়ে নিয়েছি। ফোটোটা দেখলে মাঝে-মাঝে ভয় ধরতো, ওয়াটার কালারে তা হয় না। মনে হয় কোন দূর দেশের ছবি। আমার একটা পিক্যুলিয়র অবস্থা—না রাখতে পারি না ফেলতে পারি এই টিকিয়াপাড়ার জীবনটা।"

নবগোপাল এবার বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের রহস্যটা উদ্‌ঘাটন করলেন। "বাণীর বরপুত্র আপনি। কত সংগ্রাম করে, চেম্বারে কলম পিষতে-পিষতে আপনি লেখকজীবনে ঢুকলেন, রাত কলেজে বি-এ পাস করলেন এসব আমার জানা। আমার বাবা প্রায়ই আপনার কথা বলতেন।"

বাবার নাম ননীমাধব ব্যানার্জি।

"ননীবাবুর ছেলে আপনি। ও গড। ননীমাধববাবু তো চেম্বারে আমাদের ডিপার্টমেন্টেই হেড টাইপিস্ট হয়েছিলেন। খুব ভালো টাইপ করতেন। আরবিট্রেশন ডিপার্টমেন্টের আমাদের ভিনসেন্ট সায়েব, ফিলিপস সায়েব তো ননী বলতে অজ্ঞান ছিলেন।"

"আমরা থাকতাম টিকিয়াপাড়া ব্রিজের তলায় একটা ভাঙা বাড়িতে। যুদ্ধের আগে থেকে ভাড়া করা—আটাশ টাকা মাসে ভাড়া ছিল। সেসময় তাও দিতে বাবার কষ্ট হতো।"

আমার মনে পড়লো ননীমাধববাবুর অনেকগুলো ছেলেমেয়ে ছিল। বাধ্য হয়েই ওভারটাইমের জন্যে খুব চেষ্টা করতেন। ননীবাবু খুব ধার্মিক ছিলেন।

"বাবা শুধু ওভারটাইমই করতেন না, বাড়তি রোজগারের জন্যে পুরুতের কাজও করতেন, আপনার কাছে লুকবো না লক্ষ্মীপুজো, সরস্বতী পুজো, দুর্গাপুজো কিছুই বাদ যেতো না।"

"লুকোবেন কেন? মুখুজ্যে, বাঁড়ুজ্যে, চাটুজ্যেদের ওইটাই তো আদি পেশা। আপনার আমার লজ্জা করবার তো কিছু নেই।"

মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল নবগোপালের। "এদেশের অধ্যাপকের ছেলে অটোমেটিক অধ্যাপক হয় না, কিন্তু ইন্ডিয়াতে পুরুতের ছেলে হলেই পুরুত! কোনো ট্রেনিং, কোনো ডিপ্লোমা, কোনো সার্টিফিকেটের দরকার হয় না। বাবার

বাড়িতে নারায়ণ শিলা ছিল আর ছিল পুরোহিত দর্পণ। ওভারটাইম সেরে বাড়ি ফিরে এসে বাবাকে নারায়ণের নিত্যসেবা করতে দেখেছি। তখন হাসতাম, ভাবতাম প্রয়োজন কী? এখন বুঝি ব্যাটারি সার্ভিসের মতন, সময়মতো নিত্য সার্ভিস না করলে ব্যাটারি ডাউন হয়ে যায়।”

এই ননীমাধবের ছেলে নবগোপাল ব্যানার্জি। আমি ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না। ওঁদের টিকিয়াপাড়ার বাড়িতে আমি গিয়েছি।

ননীমাধববাবু সেবার অসুস্থ। বলেছিলেন, যে করে হোক ওভারটাইমের টাকাটা বাড়িতে পৌঁছে দিতে।

আমার মনে আছে ওভার টাইমের পঁচিশ টাকা নিয়ে ওখানে পৌঁছতে ননীবাবুর সে কী আনন্দ! বললেন, “ভাগ্যে তুমি আজকেই এলে। তোমার কাছে গোপন রাখবো না, আর দেরি হলে আজ বাজার হতো না।”

ননীমাধববাবু সবসময় সন্ধেবেলায় বাজার করতেন, আমাকেও তাই পরামর্শ দিতেন। বলতেন, “জিনিস হয়তো একটু শুকনো হয়, কিন্তু দাম সকালের চেয়ে কম। হাওড়া ব্রিজের উপর থেকে যদি কিনতে পারো তা হলে তো কথাই নেই। গাঁয়ের লোকগুলো তখন বাড়ি ফেরবার জন্যে অস্থির, একটু ধরাধরি করলেই দাম কমিয়ে দেয়।”

নবগোপাল বললেন, “আমাদের বাড়িতেই আপনাকে বেশ কয়েকবার দেখেছি। কিন্তু সামনাসামনি আসিনি। সাধারণ মানুষের সামনে যেতে আমার লজ্জা হতো। বাবার এতো কষ্ট, বিরাট এক সংসারের দায়িত্ব, আর আমি পড়াশোনায় ভালো নই। কোনোরকমে এক ক্লাস থেকে আর এক ক্লাসে উঠেছি। বাবা অবশ্য বলতেন, নবটার কিস্‌সু হবে না। অথচ ওর চোখের সামনে, আমাদের আপিসের শংকর-এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। চাকরি করে, ওভারটাইম করে, টিউশনি করে, তার উপর গপ্পো লেখে। এরই মধ্যে টুক করে নাইট কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষা দেওয়ার তোড়জোড় করছে।”

খুব লজ্জা পেলাম আমি। “সেসব দিন গিয়েছে বটে। কিন্তু সুদূর আমেরিকায় কেউ তা মনে রেখেছে ভাবতে আশ্চর্য লাগে।”

নবগোপাল বললেন, “তারপর আপনি তো বি-এ পাস করলেন, চেম্বারে টাইপিস্টের চাকরি ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন। বইটই লিখলেন। আমাদের বাড়িতে একটা গ্রুপ ছবি ছিল। কোন এক সায়েবের বিদায়সভায় নেওয়া। সেখানে আপনি বাবার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। বাবা ওই ছবি দেখে আমাকে লেকচার দিতেন, বলতেন আপনার মতন আমি হচ্ছি না কেন?”

“আমার জন্যে আপনি কষ্ট পেয়েছেন ভেবে আমি সত্যিই লজ্জা অনুভব করছি, মিস্টার ব্যানার্জি।”

আবার হা-হা করে হাসলেন নবগোপাল। "বাবা যত চাইছেন আমি ভালো হই, আমি তত খারাপ হয়ে যাচ্ছি। কোনো রকমে স্কুল ফাইনাল। তারপর গড়িয়ে গড়িয়ে আই-এস-সি। তাও ন্যারো এসকেপ! আর দুটো তিনটে নম্বর কম পেলেই ফেল হয়ে যেতাম। তারপর বি-এস-সির কথা আর বলবেন না। ফেল হয়ে গেলাম। বাবা গেলেন ভীষণ রেগে। বাবাকে অবশ্য দোষ দিই না। দুটো মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে অনেক টাকা দেনা বাধিয়ে বসেছেন। টিকিয়াপাড়ার বাড়িতে সমস্ত বর্ষাকালটা ছাদ দিয়ে জল পড়ে। বৃষ্টি শুরু হলেই আমরা থালা, বাটি, গামলা, হাঁড়ি সাজিয়ে বসে থাকতাম।"

আমি নবগোপালের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। নবগোপাল বললেন, "টু কাট এ লং স্টোরি শর্ট ইউ অয়ার মিজারেবল। এবং মাই লেট ল্যামেনটেড ফাদারের আমার উপর কোনো বিশ্বাসই ছিল না।"

মূল্যবান চিনামাটির প্লেট থেকে আমার দিকে রোস্টেড চিকেন এগিয়ে দিলেন নবগোপাল। "পুরনো সব কথা ভুলে যান, শংকরবাবু। ভালো করে চিকেন খান। আপনি শহরটা ভালো করে দেখেছেন? কাল আপনাকে আমি একটা গাড়ি দিয়ে দেবো।"

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই। নবগোপাল হাসলেন। "শোফার সমেত গাড়ি দিয়ে দেবো আপনাকে। যারা বলে, বড়ায় আমেরিকায় ঝি-চাকর-রাঁধুনি নেই, শোফার নেই, তারা পুরোপুরি সত্যি বলে না। সবই আছে, একটু কম পরিমাণে, এই যা। ভগবানের আশীর্বাদে আপনাকে শোফার ড্রিভন গাড়িতেই পাঠাতে পারব। একটা রাখতে হয়েছে। সায়েব আমেরিকান—আমাদের ডেলিভারি ভ্যান ড্রাইভ করে, আবার দরকার হলে কারও চালায়। আমি আবার মার্সিডিজ বেনজ-এর ভক্ত-যদিও একটা রোল্‌স রয়েস রাখতে হয়েছে—যাকে বলে কিনা টু কিপ আপ উইথ দ্য জোনস।"

"এসব এদেশে দরকার হয় নাকি?"

"খুব দরকার হয়, শংকরবাবু। এখানেও ব্যবসাবাণিজ্য করে জাতে ওঠবার একটা ব্যাপার আছে। ছোট অবস্থা থেকে বড় হয়ে অনেকে বাড়ি পালটায়, গাড়ি পালটায়, এমনকী বউও পালটায়। এই তিনটেই স্ট্যাটাস সিম্বল। বউ পালটানোর খরচ গাড়ি পালটানোর খরচের চেয়ে একটু বেশি, কিন্তু কিছু এসে যায় না। আফটার অল ডলার কী জন্যে? খরচ করবার জন্যে। না হয় বেঁটে মোটা বউকে হটিয়ে তন্বী সুদর্শনা দীর্ঘাঙ্গিনী ঘরে তুলবার জন্যে পুরনো বউকে কিছু মাসোহারা দিলে। আমি কিন্তু খুব বেঁচে গেয়েছি শংকরবাবু। আমি বাড়ি পালটাই, গাড়ি পালটাই, কিন্তু বউ পালটাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ আমার বউ নেই। টিকিয়াপাড়ায় একটি মেয়ের সঙ্গে আমার প্রেম হয়েছিল। কিন্তু বি-এস-

সি ফেল বেকার বখাটের সঙ্গে কে মেয়ের বিয়ে দেবে? মেয়েটা আই মাস্ট অ্যাডমিট, বলেছিল, আমাকে নিয়ে পালাও। কিন্তু আমার চাল নেই, চুলো নেই, আমি নিজে আছি হোটেল ডি পাপায়! আমার সাহস হলো না, আমি রিকোয়েস্ট করলাম, সময় দাও। তা কত আর সময় দেবে? আর বাবা মাও বা কত শুনবেন? একদিন জোর করে বিয়ে দিয়ে দিলেন। ছোঁড়াটা হাওড়া কোর্টের মুহুরি।"

"আজকাল মুহুরি কথাটা ব্যবহার হয় না। ল' ক্লার্ক।"

"ওই হলো, যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন। আমি ভেবেছিলাম, বিয়ের পরও একটা চিঠি দেবো। কিন্তু আমার বন্ধু পরামর্শ দিয়েছিল, ওই পথে যেও না। উকিলের বাবু—পুলিশের সঙ্গে গা শোঁকাশুঁকি। একেবারে হাজতে চালান করিয়ে দেবে, আর এইসব কেসে রাত্রে কচুয়া ধোলাই। পেঁদিয়ে বিন্দাবন দেখিয়ে দেবে!"

নবগোপাল ব্যানার্জি বললেন, "ফাঁসিতলার মোড়ে চণ্ডীডাক্তারের কাছে ক'দিন কম্পাউন্ডারের কাজও করেছিলাম। কিন্তু আমার কপাল খারাপ, পনেরো দিনের মাথায় চণ্ডীডাক্তার নিজেই পটল তুললো। অতবড় ডাক্তারখানা রাতারাতি উঠে গেল। উকিল ডাক্তারের এই এক মুশকিল—যতক্ষণ বেঁচে আছে ততক্ষণ ঠিক—কিন্তু চোখের পাতা বুজেছ কী সব শেষ!"

"আমি একবার ল'ক্লার্ক হবো ভেবেছিলাম। সুব্রত ব্যানার্জিকে গিয়ে ধরবো সব ঠিকঠাক। কিন্তু লাস্ট মোমেন্টে খেয়াল হলো ওইখানেই আমার প্রাক্তন প্রেয়সীর স্বামীর সঙ্গে রোজ দেখা হয়ে যাবে—মনটা সারাক্ষণ খচখচ করবে, কাজে মন দিতে পারব না। আমার পক্ষে কোনোদিন ভালো ল'ক্লার্ক হওয়া সম্ভব নয়। আমি আবার হাত গুটিয়ে বেকার বসে আছি। বাবা বহু কষ্টে, সায়েবের পায়ে ধরে আরও দু'বছর এক্সটেনশন ম্যানেজ করেছেন।"

আমার দিকে সুইট ডিশ এগিয়ে দিতে-দিতে নবগোপাল অনুরোধ করলেন, "এই ডিশটা মিস করবেন না। মিষ্টি তৈরি করে এর উপর ইটালিয়ান রেড ওয়াইন ছড়িয়ে দেওয়া হয়। জানেন, আপনাকে একটা মজার কথা বলি, খোদ ইটালিয়ান রিভিয়েরাতে বসে বাবা এই রেড ওয়াইন টেস্ট করলেন। মুখ বেঁকিয়ে স্বাদ নিলেন, বললেন এত নাম শুনেছি, কিন্তু সেরকম খেতে তো ভালো নয়। এর থেকে আমাদের দুলাল ঘোষের দই অনেক ভালো—শেষপাতে দুলালের দইয়ের কোনো তুলনা নেই।"

"বাবা সেবার ছিলেন খুব নামকরা হোটেলে। বাই দ্য বাই, মাই সেম ফাদার, যিনি একদিন।..." একটু থামলেন নবগোপাল। "ওহো, আপনাকে তো আসল কথাটাই বলা হয়নি। মা সেদিন মামার বাড়িতে গিয়েছেন, কী একটা কাজে। আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে বন্ধুর কাছ থেকে চেয়ে একটা সিগারেট টানছিলাম...বাই

দ্য বাই ধরা পড়ে গেলাম বাবার কাছে। বললেন, ফেলে দে সিগারেট। অতখানি সিগারেট...আমার মায়া হচ্ছিল, প্রাণ ধরে ফেলতে পারছিলাম না। দেখুন, কী আশ্চর্য ব্যাপার। সেদিন পিতৃ আজ্ঞা পালন করতে পারলাম না, আর এখন আমি সিগারেটই খাই না। দেশছাড়া হয়েই আমি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি ফর এভার।"

নবগোপাল ব্যানার্জি জানালেন, "শংকরবাবু, আমার যে কোম্পানি এখানে কিছুটা নাম করেছে তার নাম 'বেমকো'—বুঝতেই পারছেন স্বদেশকে আমি ভুলিনি। ওর মধ্যে রয়েছে বেঙ্গল মেডিক্যাল কোম্পানির ইঙ্গিত। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে চণ্ডীডাক্তারের ডিসপেনসারির ওই নাম ছিল। এখানকার বড়-বড় ফার্মাসির তুলনায় আমরা নগণ্য—তবে ইতিমধ্যেই বিক্রি কয়েক মিলিয়ন ডলার।"

এই মিলিয়ন ব্যাপারটা যেন এখানে ডাল-ভাত। যে আইসক্রিম বিক্রি করছে সে-ও মিলিয়নের মুখ দেখছে।

নবগোপাল বললেন, "আমার প্রতিষ্ঠানের এখন যথেষ্ট সুনাম। আমার পরিকল্পনা সারা দেশজুড়ে আমি শত-শত বেমকো সেন্টার খুলব। ওষুধ ছাড়াও মানুষ আসবে বেমকো ডায়াগনস্টিক সেন্টারে। টাকাটা এখানে কিছু নয়, যদি আপনি জানেন মানুষকে কীভাবে সন্তুষ্ট করতে হবে। আমি প্রথমে টাকা রোজগারের চেষ্টা না করে মানুষকে খুশি করার চেষ্টা চালিয়েছি, ফলও পেয়েছি হাতে-হাতে। আমার কোনো বেমকো সেন্টারেই খরিদ্দারের অভাব নেই।"

নবগোপাল নিজে এবার কফির কাপ এগিয়ে দিলেন। এই কাপগুলোর জন্ম যে ব্রাজিলে তাও জানতে পারলাম। "ব্রাজিলের কফির সঙ্গে ব্রাজিলের কাপ না-হলে মানায়? আপনি বলুন। যেমন আমাদের হাওড়া ময়দানের চা। ঘড়া থেকে ঢেলে খুরি থেকে না খেলে তার স্বাদই পাওয়া যায় না। আমার বেমকো সেন্টারের অ্যানিভারসারিতে ওই একটা ঘড়া উনুন সমেত দেশ থেকে বাই এয়ার আনিয়েছিলাম। সেই চা খেয়ে হই-হই পড়ে গেল, টি ভি এবং কাগজের লোকরা ছুটে এলো—নিউ ডাইমেনশন ইন ইট বিভারেজ বলে প্রোগ্রাম দেখালো। ভিডিও করা আছে, আপনাকে দেখাবো।"

কফির পাত্র নিয়ে আবার পুরনো দিনে ফিরে গেলেন নবগোপাল ব্যানার্জি। "টিকিয়াপাড়ার দিনগুলোই আমাকে তৈরি করেছে শংকরবাবু। এই যা দেখছেন তার জন্যে দায়ী আমার বাবা। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।"

কৌতূহল নিয়ে আমি ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। নবগোপাল আস্তে-আস্তে বললেন, "ওই যে রাস্তায় সিগারেট খাচ্ছিলাম, বাবা ওভারটাইম করে ফেরার পথে ধরে ফেললেন। হুকুম করলেন সিগারেট ফেলে দিতে, আমি মায়ায়

পড়ে সিগারেটটা ফেলতে দেরি করলাম। বাবা বললেন, বাড়ি এসো। আমি বাধ্য হয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। মা বাড়িতে থাকলে হয়তো ওই ধরনের কথা হতো না, আর আমারও ভাগ্য পাল্টাতো না। যা বলছিলাম আপনাকে, বাবা বুঝিয়ে দিলেন বাপের পয়সায় সিগারেট খাওয়াটা লজ্জার ব্যাপার। আমি বললাম, ওটা আমার বন্ধু অরূপের বাবার পয়সায় কেনা। বাবা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তাবপর অর্ডার দিলেন, খোদার খাসী আমি চিরদিন পুষতে পারবো না। হয় রোজগার করো, না-হলে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে।"

বাঙালি ঘরে এই ধরনের কথার কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে ভেবে আমি শংকিত হয়ে উঠলাম।

"টু কাট এ লং স্টোরি শর্ট, আমি সেদিনই সিদ্ধান্ত নিলাম। এবং আড়াই মাসের মাথায় দেশছাড়া হয়ে জার্মানিতে চলে এলাম। আমাদের পাড়ায় অনেকে তখন জার্মানি যাবার জন্যে অ্যাপ্লিকেশন পাঠাচ্ছে। আমার একটা অ্যাপ্লিকেশন লেগে গেল। প্লেনের টিকিট ছাড়া আমার কাছে মাত্র আট ডলার ছিল। টিকিটটাও মায়ের গহনা বেচা টাকায়। বাবাকে লুকিয়েই দাদুর দেওয়া একটা গহনা মা আমাকে দিয়েছিলেন, তুই মেয়ে হলে তোকে ওটা দিতেই হতো।"

"তারপর?"

"তার পরেরটা অনেকটা রূপকথার মতন। ওদেশে প্রচণ্ড স্ট্রাগল করেছি, শংকরবাবু। বাসে চড়বার পয়সা থাকতো না, সাইকেল চালিয়ে দোকানে আসতাম। আপনাকে বলা হয়নি, ওই চণ্ডীডাক্তারের ওখানে কম্পাউন্ডারির ওটাই মনে লেগে গেল। আমি ফার্মাসি পড়তে শুরু করলাম। পয়সার জন্য তখন ষোলো ঘণ্টা পর্যন্ত দোকানে ডিউটি দিয়েছি। তারও কয়েক বছর পরে জার্মানি ছেড়ে দিলাম। বুঝলাম, এখানে সারাজীবন থাকা যাবে না। তখন আমেরিকায় ফার্মাসিস্ট ঢুকতে দিচ্ছে—ওদেশের লোকেরা ওইসব আজেবাজে কাজ করতে চায় না। আমি একটা হাসপাতালে চাকরি পেয়ে গেলাম। হাজির হলাম এই দেশে।"

আমার মুখের দিকে তাকালেন নবগোপাল। "আমি কিন্তু চাকরি করার জন্যে এই দেশে আসিনি। সুযোগ খুঁজতে লাগলাম। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আমি মুন লাইটিং করতাম।"

"সেটা কী জিনিস?"

"যারা পয়সার অভাবে অথবা লোভে দুটো চাকরি করে। ষোলো ঘণ্টা ডিউটি তাদের কাছে ডাল-ভাত। আমি একটা ফার্মাসির দোকানে কাজ করতাম। মালিক ছিল এক পোল্যান্ডের ইহুদি। ইংরিজিটা খুব ভালো জানতো না। আর আমাকে ভালোবাসতো এই জন্যে যে আমার প্রিয় লেখক আইজাক সিঙ্গার।

আমি পয়সা পেলেই ওঁর বই কিনতাম। তারপর একদিন ওই ইহুদির কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে ওঁরই দোকান কিনলাম। বহুবছরের অমানুষিক পরিশ্রম এর মধ্যে হয়ে গিয়েছে। আমি নাম দিলাম বেমকো। তারপর প্রতিবছরে আমি একটু-একটু করে এগিয়েছি। বেমকো এখন এ-অঞ্চলের সবচেয়ে লম্বা চেইন— অনেকগুলো ব্রাঞ্চ হয়েছে, আরও হবে। কয়েক মিলিয়ন ডলার খাটছে এই বিজনেসে। তা ছাড়া আছে আমার জমিজমা কেনার শখ। প্রথমে সত্যিই শখ করে একটু-আধটু কেনা-বেচা করতাম। এখন এটাও ভালো চলছে। প্রতিবছর গোটা তিনেক সম্পত্তি কিনি আর গোটা তিনেক বেচি। আমি ঠিক সময়ে এ-লাইনে এসেছিলাম। এই স্টেটে এখন 'বুম' চলছে, নতুন বাড়ি-ঘরদোরে টাকা ঢালবার জন্যে মানুষ পাগল। আমি এখন ইনভেস্ট করছি ফ্লোরিডা এবং আলাস্কার সম্পত্তিতে। ওখানেও বুম আসছে। আমি ফ্লোরিডাতেও বেমকো চেইন খুলবো ভাবছি।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার এই সাফল্যের রহস্যটা কী?"

স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ে চুপ করে রইলেন নবগোপাল। আমি চাপ দিতে লাগলাম। "উত্তরটা আমাদের দেশের মানুষের প্রয়োজন, নবগোপালবাবু। তাদের তো বোঝাতে হবে, তারাও চেষ্টা করলে জীবনে সাফল্য অর্জন করতে পারে।"

নবগোপাল বললেন, "ঠিক সেইভাবে ভেবে দেখিনি কখনও। এতদিন মনে হয়েছিল, বাবা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন, বলেই ব্যাপারটা হল। আপনি ঠিকই বলেছেন, যে লোক টিকিয়াপাড়া থেকে বেরিয়ে এসে দমদমে জাহাজে চড়েছিল সে আর আজকের লোকটা এক নয়। বিদেশে আমি অনেক কিছু শিখেছি। আমি সুযোগ পেলেই মানুষকে অবজার্ভ করতাম। তারপর..."

"তারপর কী?"

"আমি বুঝেছি, এগোতে গেলে মানুষকে একটু মাথা ঘামাতে হয়। একটা লক্ষ্য ঠিক করে নিতে হয়। তারপর ভাবতে হয়, আমি দুনিয়ার কারও থেকে কম নই! আমি কেমন করে লক্ষ্যে পৌঁছবো তা ঠিক করে নিই। তারপর লেগে পড়ি। শরীরটা অদ্ভুত এক যন্ত্র। কত বাড়তি বোঝা যে দেহটা নিতে পারে তা মানুষ নিজেই জানে না। সেই সঙ্গে সেই পুরনো কথা। নিষ্ঠা চাই—চালাকির দ্বারা কোনো ভালো কাজ হয় না। চালাকি মানে লোকঠকানো অথবা নিজেকে ঠকানো। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, বোকামির দ্বারাও ভালো কাজ হয় না। বুদ্ধি চাই। আর..."

আমি আবার নবগোপালের মুখের দিকে তাকালাম। "আর কী?"

"অবশ্যই সুযোগ, অথবা ভাগ্য। তবে আমি দেখেছি ভিতর থেকে ছটফটানি থাকলে মাঝে-মাঝে সুযোগও এক-আধটা এসে যায়।"

আমি ভীষণ খুশি হলাম। আমার নোটবইতে লিখলাম আমার এখানে আসা

সার্থক হল। আমি একটা মানুষের মতন মানুষ খুঁজে পেয়েছি। নবগোপাল চুরি করেননি। ওষুধে ভেজাল মেশাননি, লুকিয়ে নিষিদ্ধ ড্রাগের চোরাচালান করেননি। তবু টিকিয়াপাড়ার সামান্য অবস্থা থেকে এদেশে বড় হয়েছেন।

"নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে আপনাকে তো কখনও কিছু করতে হয়নি," আমি দ্রুত নোট লিখতে-লিখতে নবগোপালকে বললাম।

"আমরা সামান্য লোক, এদেশে হাজার-হাজার নয়, লাখ-লাখ মানুষ পাবেন আমার মতন। আমাদের নিয়ে গল্প হয় না, শংকরবাবু।"

"গল্প আমি চাই না, আমি চাই আমার দেশের মানুষদের জন্য উদাহরণ। নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে কিছু না-করেই যে পৃথিবীতে বড় হয়েছে।"

আমি কোনো উত্তর প্রত্যাশা করিনি। রাত অনেক হয়ে গিয়েছে। নবগোপাল আমাকে ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন।

আলো জ্বালিয়ে রেখে আমি তখনও আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলাম। নিজের চোখে এইসব মানুষগুলো না-দেখলে আমার মানবতীর্থ পরিক্রমা অসম্পূর্ণ থেকে যেতো। কিন্তু হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল আমার সম্পাদকের কথা। সম্পাদক বলেছিলেন, প্রত্যেক মানুষেরই এক-আধটা খুঁত থাকে। সেই খুঁতটা আমি বিশ্বাসের আতিশয্যে খুঁজে বার করতে ভুলে যাই।

নবগোপালকে এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করা হলো কি?

কী বিষয়ে আমি জিজ্ঞাসা করতে পারতাম? বিবাহ? নবগোপালের গৃহ যে গৃহিণীশূন্য সে তো আমি দেখতেই পাচ্ছি। প্রেয়সী যে অন্য কারও গলায় মালা দিয়েছে সে তো নবগোপাল নিজেই বললেন। তারপর নবগোপাল বিয়ে করেছেন কি না, কিংবা করার পরে বিয়ে ভেঙেছে কি না, এটা আমার পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। আমার লক্ষ্য তো সীমিত—আমি দেশের ছেলেদের বোঝাতে চাই, তেমনভাবে লেগে পড়লে তোমাদের অসাধ্য কিছু নেই। এখনও সময় আছে।

তবু সম্পাদকের মন্তব্যটা খচখচ করছে। লিখি না লিখি, আরও কিছু খুঁত থাকলে তা জেনে নেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু নবগোপাল তো বলেছেন, তিনি অসৎপথে ব্যবসা করেননি।

নবগোপাল দ্য ম্যান? নবগোপাল কি সত্যিই বাবাকে শেষপর্যন্ত ক্ষমা করতে পেরেছিলেন? ওই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা। মনের মধ্যে একটা স্থায়ী ক্ষত থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়।

কিন্তু ওই তো নবগোপাল বললেন, বাবাকে ওয়ার্ল্ড ট্যুর করিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ল ননীমাধব ব্যানার্জি যখন মারা যান তখন তাঁর বড় ছেলে শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত ছিল না। কেন?

বিদেশে থেকে হয়তো যাওয়া সম্ভব হয়নি। আবার কেন?

ভোরবেলায় মার্সেডিজ-এ চড়িয়ে নবগোপাল আমাকে ফেরত নিয়ে চললেন সত্যব্রতর বাড়িতে। "ভালো ঘুম হয়নি মনে হচ্ছে। লেখক মানুষ, অনেকক্ষণ ধরে অনেক কিছু নোট করেছেন।"

"নোট করিনি, কিন্তু একটা ভাবনা এসে গিয়েছিল। এই যে আপনার অবিশ্বাস্য সাফল্য এর জন্যে কখনও আপনাকে বিবেকের বিরুদ্ধে কিছু করতে হয়নি? আমার সম্পাদক বয়সে আপনারই মতন। তাঁর ধারণা খুঁত ছাড়া কোনো কাজ হয় না।"

নবগোপাল কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। ড্রাইভিং-এ তাঁর মন নিবিষ্ট হয়ে রয়েছে।

আমি বললাম, "এই যেমন আপনার বাবার শ্রাদ্ধে আপনি অনুপস্থিত ছিলেন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন—পারলৌকিক কার্যে জ্যেষ্ঠ সন্তানের অনুপস্থিতি।"

কোনো উত্তর দিলেন না নবগোপাল। একটু পরে বললেন, "বাবা ও মায়ের নামে আমি একটা ছোট্ট প্রতিষ্ঠান করব—ননীমাধব-শ্রীদুর্গা ফাউন্ডেশন। ওই টাকায় টিকিয়াপাড়ায় কিছু বাড়ির ফুটো ছাদ সারানো হবে প্রতিবছর। মায়ের নামে আমি বাড়ির নামও রেখেছি শ্রীদুর্গা।"

তা হলে তো কিছু বলবারই থাকে না। সম্পাদক প্রশ্ন করলে, আমি বলবো, খোঁজ করেছিলাম, খুঁত পাইনি। প্রত্যেক মানুষের খুঁত থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই।

সত্যব্রতর হাতে আমাকে সমর্পণ করে নবগোপাল রসিকতা করলেন, "আপনার জিনিস আপনাকে ইনট্যাক্ট ফেরত দিয়ে গেলাম।"

দ্রুত ব্রেকফাস্ট শেষ করে সত্যব্রতও বেরিয়ে পড়লেন। আমি এবার নবগোপালের কাহিনীটি ঝটপট লিখে নেবো। কয়েকঘণ্টা পরে সত্যব্রত ফিরে আসবেন এবং আমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবেন। আমার পরবর্তী গন্তব্য ইলিনয়ের এক ছোট্ট শহর।

নবগোপালের কথাগুলো আমি লিখতে বসেছি। এমন সময় আবার টেলিফোন। "হ্যালো, শংকরবাবু", ওদিকে নবগোপালের গলা, মিনিট পঁচিশেক আগে যিনি আমাকে এখানে পৌঁছে দিলেন।

"বাড়ি ফিরেই আপনাকে ফোন করেছি।"

"সব ঠিক তো! দেশে আপনার মায়ের সঙ্গে দেখা করে সব বলবো। তিনি নিশ্চয় খুশি হবেন।"

নবগোপালের মতন কৃতী বিজনেসম্যানও একটু থতমত খেলেন। তারপর

"আপনার সম্পাদক আপনাকে খুঁত সম্পর্কে যা বলেছিলেন সেই প্রসঙ্গে আপনাকে একটা কথা বলি। আমি মাকে ভালোবাসি, কিন্তু ওঁর শ্রাদ্ধতেও আমি উপস্থিত থাকবো না।"

নবগোপালের মতন প্র্যাকটিক্যাল মানুষ এসব কী বলছেন আমি বুঝতে পারছি না।

"শুনুন শংকরবাবু, আমার মাকে আমার জীবনের সব কথাই বলেছি, কিছুই তাঁর অজানা নয়। কিন্তু একটা কথা বলা হয়নি।...আপনি ওই যে বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ বললেন...আপনি আমার হোল লাইফের ঘটনাগুলো অডিট করলে দেখবেন, জার্মানিতে একটা ফাঁক থেকে গিয়েছে। জার্মানিতে পৌঁছে আমার চাকরি চলে গিয়েছিল। তখন আমার দারুণ অর্থাভাব। তাছাড়া জব-পারমিটের গোলমাল। ওরা আমাকে তাড়িয়ে দিতো। সেই সময় বেঁচে থাকবার জন্যে অন্য কোনো পথ খুঁজে না-পেয়ে আমি হিন্দুধর্ম ছেড়ে খ্রিস্টান হয়েছিলাম। ফাদারদেরও দোষ নেই, কতকগুলো সুযোগ-সুবিধে ওঁদের খ্রিস্টানদের ছাড়া দেবার উপায় নেই। ব্যাপারটা আমি বাধ্য হয়েই করেছিলাম, তবে কাউকে না জানিয়ে।...তারপর আমি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আর্য সমাজ-টমাজ কোথাও গিয়ে আবার ব্যাক টু হিন্দু হতে পারতাম। কিন্তু সেটাও আমার বিবেকে লাগলো—মনে হলো ওটা লোক-ঠকানো হবে। কিন্তু শংকরবাবু, ব্যাপারটা আমার মা আজও জানেন না যে আমি বিধর্মী। আমি ওই জন্যে এখানকার দুর্গাপুজোয় যাই না, বাবার শ্রাদ্ধেও যাইনি, মায়ের শ্রাদ্ধেও যাব না। প্লিজ শংকরবাবু, আমার মা যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন ব্যাপারটা লিখবেন না। আমার মা কিন্তু ভীষণ কষ্ট পাবেন।"

গল্পটা অনেকদিন লেখা হয়নি। সম্প্রতি খবর পেলাম নবগোপালের মা দেহরক্ষা করেছেন। ছোটভাই আমাকে শ্রাদ্ধের যে চিঠি পাঠিয়েছে, তার শেষে সাতটি ভাগ্যহীন ও ভাগ্যহীনার তালিকায় প্রথমেই রয়েছে "নবগোপাল দেবশর্মণঃ।"

যথারীতি নবগোপাল শ্রাদ্ধবাসরে অনুপস্থিত।

আমি দায়িত্বমুক্ত হয়েছি, নবগোপালের খুঁতের গল্পটা এবার আমি লিখতে পারি।

বাল্মীকি কেন মহাভারত লিখতে রাজি হলেন না?

'এক কর্ম হইতে সর্বদাই আর এক কর্মের উৎপত্তি', আমার কুষ্টিতে এ খারাপ ইঙ্গিতটি আছে জেনেও কয়েক মাস আগে আই-আই-টি কানপুর তথা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজিতে দু'রাত যাপনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম।

মহা নামকরা জায়গা এই কানপুর আই-আই-টি। ছাত্র হিসেবে এখানে প্রবেশ করতে হলে সাতজন্ম তপস্যা করাও এমন কিছু বেশি নয়। সোনার সঙ্গে সোহাগা মিশিয়ে এই কর্মশালায় গিনি সোনার ঝকঝকে গহনা তৈরি করা হয়, তারপর হানড্রেড পার্সেন্টি বিদেশে এক্সপোর্ট করে দেওয়া হয়, কারণ সোনার গহনা চায় হিরের সঙ্গে সংযুক্ত হতে এবং সেই ফিনিশিং টাচ্ সম্ভব কেবল মার্কিন মুলুকের বিদ্যাস্থানগুলিতে। এই বাসনার নাম মণিকাঞ্চন বাসনা—যোগাবশিষ্ঠরামায়ণে বলা হয়েছে মণির মণিত্ব+কাঞ্চনে কাঞ্চনত্ব=সামথিং বাড়তি, যা মণিতেও নেই, কাঞ্চনেও নেই।

কানপুর ক্যামপাসের অতিথিশালায় আচমকা আমাকে দেখে আঁতকে উঠলেন ব্যান্ডোদা। আমারও বক্তব্য: "হ্যালো ব্যান্ডোদা! কী মধুর বিস্ময়! আপনি এখানে!"

ব্যান্ডোদা আমাকে দেখে বিস্মিত, তবু মধুরভাবে নয়। তিনি জানেন ছাত্র হিসেবে আমার ট্র্যাক রেকর্ড কীরকম, সাত কেন, সাতাশ অথবা সাতাত্তর জন্ম চেষ্টা করলেও আই আই টি কানপুরের ছাত্রত্ব সৌভাগ্য আমার কপালে জুটবে না। ব্যান্ডোদা বললেন, "আগে শুনি, তুই এখানে কী করে ইনভাইটেড হলি!" ব্যান্ডোদার আশঙ্কা, আই-আই-টি কানপুরের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ছিদ্র দেখা দিচ্ছে! মাছিকে ঢুকতে হলেও এখানে ডক্টরেট ডিগ্রি দেখাতে হয়।

আমার সঙ্গে ছিলেন আই-আই-টি খড়গপুরের প্রধান অমিতাভ ঘোষ। তিনিই আমাকে বেইজ্জতির হাত থেকে রক্ষা করার প্রাণপণ চেষ্টা করলেন নিতান্ত দয়াপরবশ হয়ে। প্রথমেই ব্যান্ডোদাকে স্বাগতম্ জানিয়ে তিনি বললেন, "বেভারলি হিল্স্ থেকে কবে এলেন? বিশ্বময় ম্যানেজমেন্ট পরামর্শ দিয়ে বেড়াচ্ছেন, অথচ আমরা আই-আই-টি খড়গপুরে আপনাকে একবারও পেলাম না।"

"ডাকলেই পাবেন আমাকে। বঙ্গ আমার, জননী আমার! শ্বেতাঙ্গ যবনরা

আমাকে ডলার অনেক দেয়, কিন্তু ভালোবাসা দেয় দেশের ছোকরারা,” এই বলে ব্যান্ডোদা আমার দিকে চোখের ইঙ্গিত দিলেন। “আমার সম্বন্ধে ভুলভাল লেখে, কিন্তু ওই লেখার জোরেই বাঙালিরা এখন আমাকে চেনে, এইটাই আনন্দ।”

কানপুর গেস্ট হাউসের ডাইনিংরুমে আমাকে এবার ব্যান্ডোদা সর্বসমক্ষে নিগৃহীত করতেন, তার ওয়ান পয়েন্ট এজেন্ডা হত, কী করে এই পবিত্র বিদ্যাকেন্দ্রে আমার অনুপ্রবেশ ঘটল ? অধ্যাপক অমিতাভ ঘোষ সাহস অবলম্বন করে অতিথিকে রক্ষা করার জন্যে বললেন, “অনেকদিন ধরে রিকোয়েস্ট করে তবে এবার শংকরবাবুকে পাওয়া গিয়েছে। উনি মুখ খুলতে রাজি হয়েছেন, অধ্যাপক ও শিক্ষকদের যৌথসভায়!”

“অ্যাঁ!” একটা কাতর আর্তনাদ বেরিয়ে আসতে চাইছিল ব্যান্ডোদার কণ্ঠ থেকে, কোনওক্রমে ঢোঁক গিলে নিজেকে সামলে নিলেন। ব্যান্ডোদার কণ্ঠ থেকে, কোনওক্রমে ঢোঁক গিলে নিজেকে সামলে নিলেন। ব্যান্ডোদা এসেছেন, রোবেটিক্স বিভাগে, কীসব শলাপরামর্শ দিতে। যেসব যন্ত্রশিশুর জন্ম হয় এই প্রসূতিআগারে তাদের কী করে রোজগেরে যুবকে পরিণত করা যায় সে সম্বন্ধে গোপন পরামর্শ দেওয়াই এবার তাঁর কাজ। রোবোটিক্স-এর নাকি বিরাট ভবিষ্যৎ, একদিন ইন্ডিয়া এর থেকে টুপাইস অর্জন করতে পারবে অতিসহজে। কারণ দুটো হাত নিয়ে জন্মালেও ধনীদেশের মানুষ আজকাল অনেক কাজ আর করতে চাইছেন না। ধনী দেশগুলোর কর্তারা ঝামেলায় পড়ে গিয়েছেন। অপরের শ্রম চাইলেও অন্য দেশের শ্রমিকদের তাঁরা ঘরে ঢুকতে দিতে চান না ; কী করে দুটি উদ্দেশ্য একই সঙ্গে সফল করা যায় তার জন্যেই ব্যান্ডোদার মতন ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ বহুমূল্যে ক্রয় করা হচ্ছে।

আমার ব্যাপারটা শুনে ব্যান্ডোদা একই সঙ্গে দুঃখ ও আনন্দ প্রকাশ করলেন। “আনন্দ এই জন্যে যে এক্সপোর্ট কোয়ালিটি গুরু এবং শিষ্যরা নিজেদের স্পেশালাইজেশনের বাইরেও যে বিরাট এক সৃষ্টির জগৎ রয়েছে তার সম্বন্ধে অবহিত হয়ে সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চাইছেন। আর দুঃখ এই জন্যে যে তোর মতন একজন লোক ছাড়া আর কাউকে পেল না!”

এরপর অবশ্য অমিতাভ ঘোষকে ব্যান্ডোদা বললেন, “মেঘে-মেঘে ওর বয়সও হচ্ছে, বইও লিখে চলেছে! এতগুলো বই যে লোক লিখেছে তাকে নেমন্তন্ন না করে আপনাদের উপায়ও নেই!”

আমি বললাম, “ব্যান্ডোদা, যারা বলে বাংলা লেখকদের দৌড় আসানসোল পর্যন্ত, তাদের মুখের উপর যোগ্য জবাব দেবার জন্যেই আমি কানপুরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি!”

আমার দুটো বক্তৃতার বিষয় শুনে ব্যান্ডোদা ফিক করে হাসলেন। বললেন,

"খুব খুশি হলাম, তুই বক্তৃতার শিরোনামেই নিজের অবস্থাটা স্বীকার করে নিয়েছিল—'কজন মফস্বল লেখকের জন্মকথা!' প্যারিসেও তোর বই বিক্রি হয়, সেই চান্স নিয়ে নিজেকে আন্তর্জাতিক লেখক বলে চালিয়ে দিলেও লোকে কিছু বলতে পারত না!"

দ্বিতীয় বক্তৃতার বিষয়ে ব্যান্ডোদা আরও মজা পেলেন। "'গল্পলেখক ও সিনেমা ডিরেক্টরের প্রেম ও মন কষাকষি সম্পর্ক!' এটা জমলেও জমতে পারে, তবে বক্তৃতাটা রুদ্ধদ্বার কক্ষে করিস, যাতে বিপদে পড়ে না যাস!"

আমি একটু আমতা-আমতা করছি, খোদ আই-আই-টি কানপুরে লেকচার দিতে আসাটা আমার পক্ষে একটু দুর্বিনীত হয়ে গিয়েছে। এইভাবে ব্যান্ডোদার কাছে হাতে-নাতে ধরা পড়ে যাব এইটাও ভাবতে পারিনি। বললাম, "ব্যান্ডোদা, এক কর্ম থেকে আরেক কর্ম ; এক সুযোগ থেকে আরেক সুযোগ কখন কুষ্ঠির খেয়ালে এসে যায় তার ঠিক নেই। আপনার কুষ্ঠিতেও তো ওই একই ওয়ার্নিং রয়েছে!"

ব্যান্ডোদা বললেন, "একসময় ওটা ছিল সৌভাগ্যের লক্ষণ! কলা বেচার পরে রথ দেখাও হয়ে গেল! এখন সারা দুনিয়া এই বহুমুখো নীতির বিরোধী, এখন আমরা সর্বত্র বলি, ফোকাস, ফোকাস! একটা জায়গায় আলো মারো, ভালো, ভাবো পৃথিবীতে আর কিছু নেই!"

"আপনার চিন্তাধারা ও কথামৃতের সঙ্গে আমার শংকরবাবুর লেখনীর মাধ্যমে পরিচিত।" বললেন অমিতাভ ঘোষ।

"যে যত ভুলভাল লেখে বাংলার বধূরা তাকে তত পছন্দ করে! ওইটাই আমার চিন্তা! ওই প্রত্যেক বইতে এবার থেকে একটা পরিশিষ্ট লিখে দেওয়া আমার কর্তব্য। ওর প্রকাশকের অবশ্য তাতে প্রবল আপত্তি, কারণ সাবধানী সত্যধানী সত্যদর্শী লেখক হিসেবেই বাজারে ওকে প্রচার করা হয়েছে!"

অমিতাভ ঘোষ ভাবলেন, এটাও ব্যান্ডোদার রসিকতা। কিন্তু আমি হাড়ে হাড়ে জানি ব্যান্ডোদার দুঃখ। একালের বাঙালি লেখকরা তেমন খোঁজ করে কলম ধরতে চায় না। এখানকার গোয়ালাদের দুধে জল আর লেখকদের লেখায় ভাঁওতা। দুটোই আর বেশিদিন চলবে না, এইটাই ব্যান্ডোদার সাবধান বচন।

রাত্রিবেলায় নির্দিষ্ট সময়ে সান্ধ্য আহারপর্ব শেষ করে শুনে পড়েছি, এই সময় দরজায় টোকা পড়ল। স্বয়ং ব্যান্ডোদা বিনা নোটিশে উপস্থিত।

সন্ধ্যায় তিনি আমার বক্তৃতা শুনেছেন, কিন্তু আড়ালে থেকে, কারণ আমাকে নার্ভাস করে দিতে চাননি। ব্যান্ডোদা উৎসাহ যোগালেন, "এখানকার পণ্ডিতগুলো সায়েবি ধরনের, নিজেদের সবজান্তা মনে করেন না। এঁরা বোঝেন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, সঙ্গীত শেষপর্যন্ত যে একই লক্ষ্যর দিকে ছুটে

যায় তার নাম সৃষ্টি। কোনও একটা সময়ে সমস্ত সৃষ্টি মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়, সেই জন্যেই বিজ্ঞানের সৃষ্টি সাহিত্যকে, সাহিত্যের সৃষ্টি বিজ্ঞানকে বুঝতে চায়। জানতে চায় কে কোন পথে অভীষ্টসিদ্ধি করবে?" ব্যান্ডোদা মজা করলেন, "গাইয়ে বাজিয়ে লিখিয়েদের একটা বিশেষত্ব এরা একটা পথ হাঁটে, এদের লক্ষ করলে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা এমন সব সত্যকে খুঁজে পায় যা আসল লোকটিও জানে না।"

ব্যান্ডোদা বললেন, "যেটা আমাকে ভাবিয়ে তুলল, তুই এর আগে কখনও কানপুরে আসিসনি, এখানে আসবার জন্যে তোকে সাড়ে ছয় দশক অপেক্ষা করতে হয়েছে, অথচ সেই ছোটবেলায় তোর মানকে কাকা বিয়ে এড়াবার জন্যে এবং আর্টিস্ট হবার জন্যে দেশ ছেড়ে এখানে পালিয়ে এসেছিলেন।"

আসলে ব্যান্ডোদা ভাবছেন, গ্রহণক্ষত্রদের কোনোরকম অপমান না করে কীভাবে এক কর্ম থেকে আরেক কর্মের উৎপত্তি সম্ভব করা যায়!

খুব ভোরবেলায় ব্যান্ডোদা বললেন, "দশ মিনিটের মধ্যে রেডি হতে হবে। অমিতাভ ঘোষকেও ফোন করে দিয়েছি। বিদগ্ধ অধ্যাপক, ভয়ঙ্কর সিনিয়ারিটি, তবু মনটা দড়কচা মেরে যায়নি, বললেন, "ব্যান্ডোদা, আপনার সব ইচ্ছা হচ্ছে আমাদের কাছে অর্ডার।"

কানপুর গেস্ট হাউসে একটাই মুশকিল, এখানে সময়ের নড়চড় নেই। গরম চা-কেও সময় মেনে চলতে হয়, বললেই যখন তখন চা মেলে না।

"এর লটা কিন্তু খুবই বিষময়!" মন্তব্য করলেন ব্যান্ডোদা। "স্বয়ং বাল্মীকিও এই হোটেলে বসে একলাইন লিখতে পারতেন না। শৃঙ্খলার মধ্যে বিশৃঙ্খলাকে এবং বিশৃঙ্খলার মাঝে শৃঙ্খলাকে খুঁজে পেতে হয় লেখকদের। সময়-অসময়ে চা-ই সেই সুযোগ জুটিয়ে দেয়।"

গেস্টহাউসের ভিতরের কর্তারা যতই নিয়মানুবর্তিতার ভক্ত হোন, বাইরের কোনও গুণগ্রাহী নাগরিক অভ্যাগতদের দুঃখ ঘোচাবার জন্যে নীল আকাশের নীচে গেটের কাছে একটি চায়ের স্টলের ব্যবস্থা করেছেন। প্রায় সারারাতই খোলা থাকে। ভোরবেলায় ওইখানেই ভাঁড়ে চায়ের অর্ডার দিয়ে ব্যান্ডোদা বললেন, "বেঁচে থাক এই খুরি—মহেঞ্জোদরোর আমল থেকে নিজের ব্যক্তিত্ব অটুট রেখে ইন্ডিয়াকে বাঁচিয়ে রেখেছে, অথরদের অনুপ্রেরণা জুগিয়ে চলেছে।"

গেটের সামনেই গাড়ি প্রস্তুত। গাড়ির সারথিও সামনে দাঁড়িয়ে। ব্যান্ডোদার অনুরোধে তিন ভাঁড় চা ইতিমধ্যেই সেবন করেছেন। ব্যান্ডোদার এইটাই সুরক্ষা পলিসি! "ভোরবেলায় যাত্রা করলে সারথিকে শ্রীকৃষ্ণের মতন সম্মান করে, গরম চায়ের সাহায্যে তাকে নিদ্রামোহ থেকে মুক্ত করতে হবে।"

কিন্তু কোথায় যাচ্ছি আমরা? ব্যান্ডোদা এখনও তা সিক্রেট রেখেছেন। মাঝেমাঝে শুধু অমিতাভ ঘোষের সঙ্গে একান্ত আলোচনা করছেন, আমি যে তিমিরে সেই তিমিরে! কৌতূহল প্রকাশে ফল ভালো হল না। ব্যান্ডোদা বললেন, "চল না, গুরুজনদের উপর ভরসা রাখ না একটু! অন্ধবিশ্বাস, অন্ধভক্তি, এসব পুরাকালে অসম্ভবকে সম্ভব করেছে।"

"আজকাল করে না, ব্যান্ডোদা। এটা যে যুক্তির যুগ, তা আই-আই-টি ক্যামপাসে মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই।"

"তুই, আমি তো এখানে থাকি না, আমাদের টিকি তো বাঁধা হাওড়ায়! টাকের প্রাদুর্ভাবে টিকি গৃহহারা হওয়ায় আমার বন্ধন টুটে গিয়েছে, ফলে একটু এদিক ওদিকে ঘুরে বেড়াই। আমি বিশ্বের ঘাটে ঘাটে জল খেয়ে বুঝেছি, যুক্তি ও তর্ক এক জিনিস নয়! বিশ্বাসীর যুক্তি আর তক্কোবাজের যুক্তিও এক নয়! তোর মা এবং আমার মা কুষ্ঠিতে বিশ্বাস করতেন, পয়সা খরচ করে আমাদের ছক করিয়েছিলেন, সেখানে লেখা হয়েছিল, জাতকের এক কর্ম থেকে আরেক কর্মের উৎপত্তি। সেইটা আমি দেখছি আজও হয়ে চলেছে, যুক্তি মানছে না।"

ব্যান্ডোদা হেঁয়ালি বজায় রেখেই একবার একতলার অফিসে চাবি জমা রাখতে চলে গেলেন। অমিতাভ ঘোষ ইতিমধ্যেই ব্যান্ডোদার ভক্ত হয়ে উঠেছেন। তিনি বললেন, "মজাদার মানুষ! আপনি তো রাত্রে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লেন, ব্যান্ডোদা আমার ঘরে এসে গল্প জমালেন। বললেন, হঠাৎ স্বপ্ন দেখে ওঁর ঘুম ভেঙে গিয়েছে। একজন দাড়িওয়ালা বুড়ো স্বপ্নের মধ্যে এসে ওঁর কাছে দুঃখ করলেন, ওরা কী করে বলে, কানপুরে তেমন কিছু দেখার নেই?"

ব্যান্ডোদা সবিনয়ে ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে বললেন, "এখানকার লোকরা বললো, যে লোক ইদানীং হাওড়া দেখেছে তার আর কানপুরে কিছু দেখার নেই। বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানা, তালামারা কাপড়ের কল, কম্বলের মিল, জুতোর কারখানা, এই সবই শহরটাকে উনিশ শতকের কবরখানা করে তুলেছে।"

"উনিশ শতক তো সে দিনের! উনিশ শতক থেকে তো মানুষের সভ্যতার সূচনা হয়নি!" বৃদ্ধলোকটি নাকি দুঃখ করে মন্তব্য করেছেন।

অমিতাভ ঘোষও চিন্তিত হয়ে উঠেছেন। জানতে চেয়েছেন, "স্বপ্নের মানুষটা কত বুড়ো?"

ব্যান্ডোদা: "বুড়োদের তিনটে গ্রেড্! সাধারণ বুড়ো, কুঁজো বুড়ো, আর খাটে ওঠার জন্যে রেডি বুড়ো! এই বৃদ্ধটি প্রথম স্তরের। বুদ্ধিবৃত্তি এবং ইন্দ্রিয়গুলি মোটামুটি কর্মক্ষম রয়েছে, একটু তেজও আছে।"

অমিতাভর প্রশ্নের উত্তরে ব্যান্ডোদা বলেছেন, "না, শার্ট প্যান্টপরা একালের সিনিয়র সিটিজান নন। তপোক্লিষ্ট শরীর, একটু শীর্ণই বলা চলতে পারে, ঊর্ধ্ব

শরীরে একটি উত্তরীয়। না মশাই, চোখে চশমা নেই, তার মানে চশমাপূর্ব যুগের মানুষ, কিন্তু বল্কলধারীও নন।"

"ফতুয়া বা গেঞ্জি ওই-ধরনের কিছু পরেছেন?" অমিতাভ ঘোষ জানতে চেয়েছিলেন।

"আরে মশাই, গেঞ্জি তো কালকা যোগী! ইংলন্ডের কাছে গারন্‌সি আইল্যান্ড না কোত্থেকে মাত্র একশ বছর আগে ইন্ডিয়ায় গেঞ্জি এলো! ফতুয়া অবশ্য অনেক পুরনো। কিন্তু সেলাইকরা কোনও বস্ত্রখণ্ড লোকটার শরীরে নেই।"

"তার মানে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, প্রাক মুসলিম যুগের লোক, কারণ ওঁরা আসবার পরেই আমরা সেলাইসুখ উপভোগ করলাম। তার আগে তো মালকোচা মেরে আমরা আলেকজান্ডারের সঙ্গেও লড়াই করেছি!" অমিতাভ ঘোষের কথা শুনে ব্যান্ডোদা মাঝরাতে ভাবিত হয়ে উঠেছিলেন। অমিতাভ যুক্তিবাদী। তাঁর প্রথম বক্তব্য, "আমরা এতদিন এখানে রয়েছি, যাতায়াত করছি, এই ধরনের কেউ তো স্বপ্নে যোগাযোগ করেননি।"

"হয়ত চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আপনারা তাঁর মেসেজ রিসিভ করেননি, কিংবা টেকনলজিস্টদের রকমসকম দেখে ভদ্রলোক সাহস পাননি! চিকিৎসাবিদ্যার কেন্দ্র হলে এমন হত না, ডাক্তাররা অনেক ঠেকে প্রাচীন বিষয়ে খোঁজখবর করছেন এমনকী আদিবাসীদের টোটকাগুলো যাচাই করেছেন। টেকনলজিস্টদের মেজাজ অন্য। তাঁরা এইট্টিনথ সেঞ্চুরির শিল্প বিপ্লবের আগে কোনও কিছু ছিল ভাবতেই পারেন না।"

ব্যান্ডোদা এরপর বলেছেন, "হয়ত আপনারা সাহিত্যিকদের নেমন্তন্ন করছেন, তাদের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করছেন, এইসব লক্ষ করে মানুষটি স্বপ্নপথে যোগাযোগের সাহস পেয়েছেন।"

ব্যাপারটা অমিতাভ ঘোষকেও চিন্তিত করে তুলেছে। ব্যান্ডোদা তো বাজে কথা বলবার লোক নন। বহুকাল অনাবাসী হয়ে রয়েছেন, পশ্চিমী সভ্যতার সমস্ত বিশ্বাস-অবিশ্বাস ওঁর নখাগ্রে। কিন্তু চিন্তার কারণ, সব লোকেই তো জানে, কানপুরে আই-আই-টি ছাড়া আর কিছুই দেখবার নেই। আগে লাল ইমলি কম্বলের কারখানা দেখতে আসত, কিন্তু সে কারখানার অবস্থা এখন শোচনীয়।

এরপরে আমরা শুধু জানি, ব্যান্ডোদা ওই কৃশতনু গম্ভীর গুরুদেবটির সঙ্গে আবার স্বাপনিক যোগাযোগ স্থাপনের জন্য নিজের ঘরে ফিরে গিয়েছেন। অমিতাভকে তাঁর একমাত্র অনুরোধ, দয়া করে ঘুমের ওষুধ খাবেন না, কামপোজখাওয়া স্বপ্নগুলো খুব বেয়াড়া হয়, কোনও মাথামুণ্ডু থাকে না।

তারপরেও নিশ্চয় অনেক কিছু ঘটেছে, কিন্তু আমরা তার বিশদ বিবরণ এখনও জানতে পারিনি। ব্যান্ডোদা শুধু আই-আই-টি গেস্ট হাউসের মেন গেটের

সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মনে মনে বলছেন, "রামের জন্মস্থান! এত কাছে এসেও রামের জন্মস্থান দেখে না যাওয়ার কোনও মনে হয় না।"

আমাদের গাড়ি ইতিমধ্যে চলমান হয়েছে। সুমো গাড়িতে ড্রাইভারের পাশে বসেছেন স্বয়ং ব্যান্ডোদা, যাতে তাঁর নির্দেশিত পথ ধরেই ড্রাইভার চলতে পারে। আমরা দু'জন পিছনের সিটে। অমিতাভ ঘোষ ফিস ফিস করে বললেন, "গাড়িতে তেল অনেক আছে। কিন্তু রাম জন্মভূমি সে তো অনেক দূরে, অযোধ্যা কি এখানে!" সেই কথা শুনে আমারও চিন্তা! এই গাড়িতে চড়ে হুট করে অযোধ্যা যাবার পরিকল্পনাটা পাগলামো। ব্যান্ডোদাকে মানিয়ে যায়, উনি যেখানে থাকেন, সেই আমেরিকায় দেড়শ মাইল ড্রাইভ করে লোকে কফি খেতে যায় পছন্দসই দোকানে! কিন্তু এখানে কী হবে?

অমিতাভর দুশ্চিন্তা অন্য কারণে। এই টাটা সুমো গাড়ি যেতে পারে না এমন অগম্যস্থান ভগবান এখনও তৈরি করতে পারেননি ; কিন্তু অযোধ্যা কি এখানে! নদী পেরুতে হতে পারে, যদিও ড্রাইভারদের ধারণা টাটা সুমো শুধু উড়তে পারে তা নয়, সাঁতারও কাটতে পারে। কিন্তু জলচর, খেচর যাই হোক, সময় তো লাগবেই, এবং আমার সিনেমা সংক্রান্ত বক্তৃতাটা দুপুর একটার সময় নির্ধারিত এবং সেই সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন।

অমিতাভ ঘোষ বেশ কিছুটা আতঙ্কিত। এই মিটিংয়ে কৌতূহলী কিছু গৃহবধূরাও আসবেন, তাঁরা উত্তমকুমারের সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের সম্পর্ক কেমন ছিল, সুচিত্রা সেন কেন সত্যজিতের কোনও ছবিতে পার্ট করলেন না, কোন্ কোন্ মহিলা চুক্তিপত্র সই করেও শেষ মুহূর্তে সত্যজিৎ রায়কে 'না' বলেছেন, এই সব জানতে সভায় আসছেন। তাঁদের ধারণা, অথররাই এসব ঘটনার হাঁড়ি হাটে ভাঙতে পারেন। আই-আই-টি ললনারা যদি মিটিংয়ে এসে বক্তাকে না দেখে ফিরে যান তা হলে অমিতাভ ঘোষের এই ক্যামপাসে ফিরে আসা আর সম্ভব হবে না।

আমিও অস্বস্তিতে পড়ে যাচ্ছি। ব্যান্ডোদা তো জানেনই আমার প্রোগ্রামের কথা। যারা রাহাখরচ দিয়ে বক্তা আনিয়েছে তার কাজ উশুল না করতে পারলে কী অবস্থায় পড়বে তা তো ব্যান্ডোদার অজানা নয়।

"রামের জন্মস্থান! আহা ভাবা যায় না, মুখুজ্যে! আই-আই-টি তো তবু আধডজন আছে, সব কটিই তীর্থস্থান, বাড়তে বাড়তে এই প্রতিষ্ঠানও শেষপর্যন্ত সতীর বাহান্ন পীঠ হবে, কিন্তু রাম তো একজনই। সাধে কি আর মহাত্মা গাঁধী থেকে তুলসীদাস পর্যন্ত সবাই রামধুন গেয়েছেন, জয়গান গেয়েছেন রঘুপতি রাঘব রাজা রামের, জয়ধ্বনি তুলেছেন পতিতপাবন সীতারামের!"

আমি বিরক্তিতে ফুঁসছি ; কারণ ড্রাইভার পুরোপুরি ব্যান্ডোদার কব্জায় চলে

গিয়েছে। ব্যান্ডোদা তাকে কী বশীকরণ মন্ত্র দিয়েছেন কে জানে। এই ড্রাইভারকে যদি আমরা বলি, কাছাকাছি একটু হাওয়া খেয়ে বৃটিশ ইন্ডিয়া কর্পোরেশনের ঐতিহাসিক বাড়িটা দেখে আমরা ফিরে আসব ও তা হলে শুনবেই না।

অমিতাভ ঘোষের গবেষণার বিষয় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং হলেও এই মুহূর্তে তার সঙ্গে কল্পনার রঙ মিশিয়ে বললেন, এই কানপুর আই আই টি ক্যামপাসটা রামের জন্মভূমি হলে আমরা বেঁচে যেতাম! ব্যান্ডোদা এখানেই পায়ে হেঁটে রামচন্দ্র সম্বন্ধে লেটেস্ট খবরাখবর সংগ্রহ করে নিতে পারতেন!"

আমিও একমত। কিন্তু দ্বিতীয়বার ভেবে বললাম, "রামের লেটেস্ট খবরগুলো তো ভালো নয়, অযোধ্যার নামটা ইদানীং সমস্ত পৃথিবী জেনে গেল। অয়োধিয়া যুগ যুগ ধরে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করে, এখন মুখ পুড়োচ্ছে!" এই ব্যান্ডোদাই আমাকে একবার বলেছিলেন, 'ভাগ্যে নামটা এমন কঠিন যে সায়েবরা উচ্চারণ করতে গিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে!'

যা হবার তা হবে! ভবিতব্যকে কে কলা দেখাতে পারে! যদি দ্বিতীয় বক্তৃতাটার সুযোগ ফস্কে যায়, তা হলে বুঝতে হবে ভগবান রামচন্দ্র এমনই চেয়েছিলেন! আই-আই-টির দুঃখে ব্যান্ডোদার সান্নিধ্য-সুখ ত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত হবে না।

"স্বপ্নের এই লোকটি কে, তা বুঝতে পারলেন, ব্যান্ডোদা?"

"স্বপ্নের প্রধান মুশকিল, কোনও ছবিতে ক্যাপশন থাকে না, চরিত্রগুলো কেউ ভিজিটিং কার্ডও দেয় না। আন্দাজ করে নিতে হয়, রোগা, তীক্ষ্ণ নাসা, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, কণ্ঠে একমুখী রুদ্রাক্ষ, ইনি নিশ্চয় কোনও মুনি। কিন্তু কোন মুনি হতে পারেন?"

"মোটা কোনও মুনিকে আমি কখনও স্বপ্নে দেখিনি, ব্যান্ডোদা। আপনি দেখেছেন?"

"খুব ইম্পর্টান্ট অবজার্ভেশন! কে বলে তুই বোকা! মুনিমাত্রই কেমন পাকাটে পাকাটে চেহারা। বহুক্ষণ তপস্যা করে শরীরকে ধকল দেয়, খায়দায় কম। তাই হাই লেভেলের মুনিরা বোধ হয় মোটা হয় না। আমার মুনিটিও শীর্ণ শরীর হলেও কথাবার্তা কাঠখোট্টা নয়। বললেন, এখানকার ব্যাপারস্যাপারগুলো নিজের চোখে দেখে যাবেন, কারণ গালগল্প বেড়েই চলেছে।"

ব্যান্ডোদা স্বীকার করলেন, "প্রথমে চিনতেই পারিনি ; পরে বুঝতে পারলাম তোদের লাইনেরই লোক! আগে ডাকাতি করতেন, পরে কবি হলেন।"

ভীষণ চটে গেলাম! "ব্যান্ডোদা, কোনও বাঙালি কবিই ডাকাত ছিলেন না ; বড়জোর দু'একটা আইডিয়া তাঁরা চুরি করেছেন।"

"চুরি আর ডাকাতির মধ্যে তফাত কী?" জানতে চাইছেন মৃদুহাস্য ব্যান্ডোদা।

"অপরের দ্রব্য না বলে নিলে চুরি, আর এই তো জিনিস কেড়ে নিলাম বললে, সেটা ডাকাতি!"

"চমৎকার একটা সংজ্ঞা দিয়েছিস! তাহলে প্রশ্ন হল, কৃত্তিবাস রচিত বাংলা রামায়ণ, তুলসীদাসকৃত হিন্দি রামায়ণ এসব ডাকাতি, এঁরা লুঠ করেছেন আদি কবি বাল্মীকিকে।"

"এই ধরনের বিচার খুব অন্যায় হবে ব্যান্ডোদা। কারণ এঁরাও জাম্বোসাইজের কবি এঁরা একটা ভাবনাকে গ্রহণ করে সেটা নিজের মতন করে নিয়ে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কিংবা রামচরিতামানস রচনা করেছেন।"

"তুই বলতে চাস, এগুলো বেআইনি চুরিও নয়, ডাকাতিও নয়।"

"ব্যান্ডোদা, এসব কবি খুবই উঁচুদরের, এঁরা খান খড়, কিন্তু বাঁট থেকে বেরোয় দুধ!"

আমার কথাগুলোয় ব্যান্ডোদা মজা পেলেন। "আমি হাঙ্গামা বাড়াতে চাই না, সে ইচ্ছে থাকলে বলতাম, আদি বাল্মীকি রামায়ণ কি তা হলে খড়? আমি বুঝছি, তোর বক্তব্যটা একটা উপমা মাত্র! সব পয়েন্টে মিলবে না, কোথাও থামতেই হবে!"

ড্রাইভার গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিয়েছে। সে কোনও নির্দেশও চাইছে না, ব্যান্ডোদা সব নিশ্চয় এমনভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে সে রাজধানী এক্সপ্রেসের মেজাজে বেপরোয়া হয়ে উঠছে।

ব্যান্ডোদা মুখ ফুটে নাম করেননি কে তাঁর স্বপ্নে উপস্থিত হয়েছিলেন। "ব্যান্ডোদা, ওয়ার্লডে এখনও পর্যন্ত একজন ডাকাতই কবি হতে পেরেছেন, তাঁর রচনা থেকেই এই অযোধ্যাকাণ্ডের উৎপত্তি, দেশটার হাড় জ্বালা জ্বালা হয়ে গেল!"

ব্যান্ডোদা মনে হচ্ছে বাল্মীকির প্রেমে পড়ে গিয়েছেন! বললেন, "খুব উদ্ধত দেবতারাও স্বপ্নে কেমন বিনম্র হয়ে যান, মুখুজ্যে। ওঁর কথা শুনে, কে বলবে সপ্তকাণ্ড রামায়ণটা উনিই লিখেছেন।"

অমিতাভ ঘোষের একটাই চিন্তা! ফিস ফিস করে বললেন, "রামের জন্মভূমিতে আগামী কাল গেলে ভালো হত না? অযোধ্যায় গিয়ে লাঞ্চের আগে কানপুরে ফিরে আসা একমাত্র হেলিকপ্টারেই সম্ভব!"

ব্যান্ডোদাকে আমি জানি। যা ঠিক করেছেন তা করবেনই। বাধা দিলে বলবেন, "তা হলে শ্রীলঙ্কায় রাবণের প্রাসাদটাও খোঁজ করে আসা যাক।" অতএব অন্যভাবে সামলাতে হবে, এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে হবে যাতে উনি নিজেই ড্রাইভারকে বলবেন, গাড়ি ফেরাও।

ব্যান্ডোদা সত্যিই বাল্মীকি সন্দর্শনে মোহিত। বললেন, "তোর সঙ্গে দেখা

হলেই ভালো হত। তুই অনেক কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারতিস। আমি তো সেই কোন্ আদ্যিকালে বালকবোধ রামায়ণ পড়ে দেশছাড়া হয়েছিলাম, রাম লোকটিকে তখন আকর্ষণীয় মনে হয়নি।"

"লোক নয়, ব্যান্ডোদা। বেনামে বিষ্ণু! লীলাখেলা দেখানোর জন্যে মর্তে চলে এসেছিলেন।"

ব্যান্ডোদা বললেন, "আমার সায়েব বন্ধুরা রাম চরিত্রটা বুঝতে চায় না, কেন সমস্ত দেশটা রামজন্মভূমিকে এত গুরুত্ব দিতে চায় তা তাদের মাথায় আসে না। তারা বলে, পুওর সীতা! স্বামীর হাতে নির্যাতিতা হয়ে ওইভাবে নিজেকে বেরিয়াল না দিয়ে উচিত ছিল স্বামীকে ডাইভোর্স করা।"

"ওসব কথা আমাদের মুখে আনতে নেই ব্যান্ডোদা! বেরিয়াল নয়, সীতার পাতালপ্রবেশ। সীতার মতন সতীরা কখনও স্বামীর মধ্যে কোনও দোষ খুঁজে পায় না, তবে না ঘরে ঘরে তাঁদের ছবি টাঙানো হয়েছে!"

রামসীতা অপেক্ষা রামায়ণের লেখক সম্বন্ধে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছেন ব্যান্ডোদা গত রাত থেকে। বললেন, "চমৎকার মানুষ। আই-আই-টি কানপুরের উপর একটু অভিমান আছে, এই যা। ওঁর সন্দেহ এখানে গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না, অত বড় গ্রন্থাগারে কোনও বাল্মীকি কর্নার নেই! সায়েবসুবোরাই গ্রন্থাগারের সব জায়গাটা অকুপাই করে বসে আছেন। গেঁয়ো যোগীদের এখানে ঠাঁই পেতে হলে ভায়া ইউরোপ অথবা আমেরিকা, নিদেনপক্ষে জাপান ঘুরে আসতে হয়!"

গাড়ি থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া খেয়ে ব্যান্ডোদা খুশ মেজাজে রয়েছেন। গতকাল রাতে সুযোগ পেয়ে তিনি রামায়ণ সম্বন্ধে অনেক গোপন খবর খোদ ঘোড়ার মুখ থেকে শুনে নিয়েছেন। তারই কিছু অংশ এবার ব্যান্ডোদার শ্রীমুখ থেকে জানা গেল।

"বাল্মীকির বাবার নাম জানা ছিল না। উনিই বললেন, প্রচেতা ঋষির বংশধর। দশম পুত্র। একটু লজ্জা পাচ্ছিলেন, আমি বললাম, আমাদের রবীন্দ্রনাথও বাবামায়ের চতুর্দশ সন্তান! তারপর যেসব সন্দেহ ছিল তা যাচাই করে নিলাম। স্বীকার করলেন, কম বয়সে বয়ে গিয়ে দুর্দান্ত ডাকাত হয়েছিলেন। ইস্কুলের ছেলেরাও জানে রত্নাকর ডাকাত বনের মধ্যে নিরীহ পথিককে খুন করে সর্বস্ব হরণ করত। তারপর একদিন নারদ ও ব্রহ্মা এই ডাকাতের খপ্পরে পড়ে গেলেন, নারদ তখন বললেন, তার পাপের ভাগ রত্নাকরের কোনও পোষ্যই নেবে না। এঁদের বেঁধে রেখে রত্নাকর বাড়ি ফিরে বাবা মা ছেলে মেয়ে সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, নারদই রাইট। কেউই ডাকাতির পাপের ভাগ নিতে রাজি নন। এরপরেই নারদের প্রেসক্রিপশন ; ষাট হাজার বার রাম নাম জপ করো। তারপর সেই পুরনো গপ্পো। তপস্যা করতে করতে সমস্ত শরীর উইতে ঢেকে ফেলায়

নাম হল বাল্মীকি।"

ব্যান্ডোদা বলেছিলেন, "ভাগ্যে ইউ পি-র বনে তপস্যা করেছিলেন, তাই অত সুন্দর নামটা পেলেন, কলকাতায় তপস্যা করলে স্রেফ ধুলো অথবা জঞ্জালে চাপা পড়ে যেতেন, নাম হয়ে যেত ধুলেশ্বর অথবা জঞ্জালা!"

ব্যান্ডোদা জিজ্ঞেস করলেন, "কবিবর, তমসাতীরবর্তী কাননে ব্যাধ কর্তৃক ক্রৌঞ্চ মিথুনের একটাকে হত্যা করায়, ইমোশনের মাথায় আপনি যে সৃষ্টির প্রথম শ্লোক রচনা করলেন—মা নিষাদ এট্‌সেটেরা—এটা সবাই আজও আওড়ায়, কিন্তু মানেটা কেউ তেমন বুঝতে পারে না। কী বলতে চেয়েছিলেন আপনি?"

বাল্মীকি বললেন, "আসলে আমি রেগে গিয়েছিলাম। রেগে গেলেও যে কবিতা বেরোয় এটা কবিদের ট্রেড সিক্রেট। আমি বলেছিলাম, 'ওরে নিষাদ, তুই যখন কামমোহিত বিহঙ্গম মিথুনের একটাকে হত্যা করলি, তখন অনন্তকাল তোর গতি হবে না! খুব হৈচৈ পড়ে গেল শ্লোক শুনে, ব্রহ্মা পর্যন্ত স্বীকার করলেন, কবিত্বশক্তি স্বরূপিণী দেবী বাণী স্বয়ং তোমার কণ্ঠে অবস্থান করছেন, কিন্তু এখন আমার সন্দেহ হয়, যাকে ভর্ৎসনা করা, সেই ব্যাধ ব্যাপারটা বুঝতে পারল না—অর্থাৎ ভস্মে ঘি ঢালা হল।"

ব্যান্ডোদা একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। তাঁর নিবেদন, "এই যে শুনে আসছি, মহাত্মাদের পূর্বশক্তিবশতই কবিত্বশক্তির জন্ম হয়। নীচ মুখে প্রকাশ পেলেও কবিতাকে অবমাননা করা উচিত নয়!"

বাল্মীকি : "গোড়ায় আমিও উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম, আমাকে বলা হল, একমাত্র শ্লোকই কাব্যমধ্যে পরিগণিত, আর আমি যে বিপুল বিষ্ণুলীলা বর্ণনা করব, তাই মহাকাব্য হবে।"

ব্যান্ডোদা : "বিপুল বলতে কত?"

বাল্মীকি : "আদি কবি এই টাইটেল নিশ্চিত করতে আমাকে নিজের হাতে চল্লিশ হাজারের বেশি শ্লোক লিখতে হয়েছে। বেদব্যাসের মতন গণেশকে অনুলেখক হিসেবে পাইনি, আমার দুঃখ, আদি কবি, কিন্তু কপিরাইটের সুবিধে পাইনি, যার যা খুশি তাই পরবর্তীগণ চেঞ্জ করে দিয়েছে। একজন তো মেয়েদের হাততালি পাবার জন্যে গল্পটা শেষের দিকে পালটে দেখিয়ে দিল, রাম নয়, স্বয়ং সীতাই সহস্রস্কন্ধ রাবণকে নিধন করলেন, এই বইয়ের নাম দেওয়া হল অদ্ভুত রামায়ণ। লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হল, কপিরাইটে আটকানো গেল না!"

ব্যান্ডোদা সত্যিই বুদ্ধিমান। স্বপ্নের মধ্যেই সুযোগ পেয়ে বাল্মীকির কাছ থেকে বেশ কিছু খবর সংগ্রহ করে নিয়েছেন। মানুষটি ডাকাত কেমন, কেমন করে ডাকাতি থেকে এই লেখার লাইনে এসে গেলেন। "শিষ্যগণকে সঙ্গে নিয়ে মুনিবর যখন তমসাতীরবর্তী কাননে বিচরণ করছিলেন তখন তাঁর মাথায় সোনালি

জটাজাল, হাতে কুশ এবং কটিতটে ব্যাঘ্রচর্ম। বোঝা যাচ্ছে তখনও ইন্ডিয়ায় কাপড়ের তেমন প্রচলন হয়নি। ব্যাধের শরে নিহত পাখির পত্নী যখন করুণস্বরে বিলাপ করছেন দেখে মুনিবর শোকাভিভূত হলেন। আকাশ থেকে দেবী সরস্বতী ভাবলেন, শোকও তো মোহ, বাল্মীকির অযোগ্য, তাই কবিত্বশক্তি রূপে ওঁর মুখের মধ্যে প্রবেশ করলেন। প্রথম কবিতার শ্লোক নির্গত হওয়ার পরেই ব্রহ্মা স্বয়ং এসে ওঁকে জানালেন, কবিত্ব-স্বরূপিণী দেবী সরস্বতী স্বয়ং তাঁর কণ্ঠে অধিষ্ঠান করছেন।"

আমি তো অবাক। ব্যান্ডোদা বললেন, "আই-আই-টি কানপুরে শাস্ত্র গ্রন্থ থাকলে একটু চেক করে নিতাম আজ সকালেই। ব্রহ্মা নিজে নাকি আদি কবিকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, কবির বর্ণিত বিষয় কখনও মিথ্যা হয় না, তিনিই নাকি অপর সৃষ্টিকর্তা! শুধু তাই নয়, কবিই ব্রহ্মা, কবিই বিষ্ণু এবং কবিই শিবস্বরূপ!"

"বুঝলি মুখুজ্যে, রামায়ণের কনট্রাক্ট হয়ে গেল। কবি যেভাবে রামলীলা বর্ণনা করবেন ভগবান বিষ্ণুও সেইরকম কাজ করবেন।"

"তা হলে ভিতরের কথা তেমন জানা গেল না, ব্যান্ডোদা। রামায়ণের সাফল্য সম্বন্ধে তো অনেক কথাই লোকমুখে প্রচারিত রয়েছে।"

এবার ব্যান্ডোদা সুখবর দিলেন। "স্কুপ করেছি বলব না, কিন্তু কয়েকটা অপ্রচলিত এবং অস্বস্তিকর খবর পাওয়া গেল! খোদ কানপুরে আদি কবির দাপট তেমন লক্ষ করা যায় না। আমি অবশ্য বললাম, জোড়াসাঁকোয়, চিৎপুর রোডে আর এক কবির জন্মভিটের কাছাকাছি অঞ্চলে একই অবস্থা। তারপরেই ব্যান্ডোদা বোমাটা ফাটালেন!"

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যান্ডোদা বললেন, "ভিতরের খবরটা শুনে রাখ। রামায়ণ প্রকাশিত হবার পরে তো হৈ হৈ পড়ে গেল! লেখকদের যা হয়, একখানা বড় সাফল্য হলেই পরের লেখাটার জন্যে প্রচণ্ড ধরাধরি শুরু হয়ে যায়। স্বয়ং ব্রহ্মা এসে বললেন, স্বয়ং সরস্বতী এতই খুশি যে তোমার মুখপদ্মে চিরতরে অবস্থান করতে চান। আমি যোগ্য সাবজেক্ট ভেবে রেখেছি, তোমার পরবর্তী বিষয় মহাভারত।"

"বলেন কি ব্যান্ডোদা!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সব ঠিকঠাক চললে, মহাভারতটাও লিখতেন বাল্মীকি। কিন্তু তা হল না, লিখলেন একজন জুনিয়র রাইটার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস।"

"সে কি! এত বড় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন কেন বাল্মীকি?"

"সেটা তো তোরা খুঁজে বার করবি। আমি এন আর আই বাঙালি, দুনিয়ার হাটে হাটে পরামর্শ বিক্রি করে আমাকে বেঁচে থাকতে হয়, আমি এসব খোঁজ করব কী করে?"

"আপনি ঠিক বলছেন ব্যান্ডোদা? বাল্মীকি সেকেন্ড বইটা লেখবার প্রস্তাব পেয়েছিলেন!"

"স্বয়ং বাল্মীকি স্বপ্নে এই অধমকে গত রাত্রে বলেছেন। কোন্ দুষ্প্রাপ্য ডকুমেন্টে তার উল্লেখ রয়েছে তাও উল্লেখ করলেন—বৃহদ্ধর্থপুরাণ। অফার পেয়ে সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করার সময়ে বাল্মীকি করজোড়ে ব্রহ্মাকে বললেন, আমি এখন মোহবিবর্জিত ও সংসার শূন্য, আমি কার জন্যে খাটব? আমার কাছে সমস্ত উদ্যমই এখন বৃথা।"

"তারপর কী হল, ব্যান্ডোদা?"

"এদেশে যা হয়ে থাকে। অন্তত একত্রিশজন মহর্ষি প্রবলভাবে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন মহাভারত রচনার দায়িত্ব পাবার জন্যে। এঁদের মধ্যে কশ্যপ এবং কপিল থেকে বৃহস্পতি, বিশ্বামিত্র, যাজ্ঞবল্ক্য কে না ছিলেন? বাল্মীকি এখনও গোপ্নে লোক, কীভাবে শেষপর্যন্ত বেদব্যাসের সিলেকশন হল তা আমাকে আর একদিন বলবেন বলেছেন। কিন্তু যা বললেন না, মহাভারত লেখায় কেন তাঁর অরুচি হয়ে গেল? এইটা চেষ্টা করলে তোরা এখনও খুঁজে বার করতে পারিস। কানপুর আই-আই-টি-র উচিত কাউকে এই কাজে সহযোগিতা করা।"

ক্যাম্পাস থেকে উত্তর পশ্চিম মুখো চলতে চলতে আমাদের টাটাসুমো হঠাৎ এক জায়গায় থামল। ব্যান্ডোদা নেমে পড়লেন। অমিতাভ ঘোষের উদ্বেগ তখন আরও বেড়ে গিয়েছে। কোন রুটে কীভাবে কত সময়ে রামজন্মভূমি অযোধ্যায় পৌঁছোন যাবে তার হিসেব করে চলেছেন। অমিতাভ বলে উঠলেন, "এ তো বিধুর! তার মানে কানপুর থেকে মাত্র কুড়ি-একুশ কিমি এসেছি আমরা। এইখানেই তো বাল্মীকি মুনির আশ্রম—আজকাল লোকজন তেমন আসে না।"

ব্যান্ডোদা বললেন, "দেখে নে। এইটেই তো তীর্থস্থান হওয়া উচিত, লেখার লাইনের গুরুদেব গঙ্গাতীরের এই আশ্রমেই জীবনযাপন করেছিলেন কিন্তু কেউ দেখতে আসে না।"

একজন মলিন বসন ভদ্রলোক ছুটে এলেন, আমাদের গাইড হতে চাইছেন। ভদ্রলোক বলতে আরম্ভ করলেন, "মস্ত জায়গা এই বাল্মীকি আশ্রম। কানপুরে সতীঘাটে লক্ষ্মণ সীতাকে রেখে চলে যান। সীতা বাল্মীকির এই আশ্রমে এসে ওঠেন। ওই যে পাতকুয়ো দেখছেন, দুঃখিনী সীতা ওইখানে থেকেই জল তুলতেন রোজ। লব কুশ ওইখানে খেলাধুলো করত, লেখার মাঝে মাঝে বাল্মীকি তাদের লেখাপড়া শেখাতেন। এখান থেকে আপনাদের ব্রহ্মাবর্ত ঘাটে নিয়ে যাব, ওখানে যে বাণে লব স্বয়ং রামচন্দ্রকে জখম করেছিলেন তাও দেখাব। এই আশ্রমের সামনের গঙ্গা থেকে ওই তির পাওয়া গেছে।"

আমার চিন্তা অন্য। কেবলই ভাবছি, আদি কবির জীবনে কী এমন ঘটল যে

আর লিখতে চাইলেন না?

ব্যান্ডোদা বললেন, "কয়েকটা সম্ভাবনা রয়েছে। দূরদর্শী কবি, অহেতুক ঝুঁকি নিতে চাইলেন না, অমর হওয়ার পক্ষে একখানা রামায়ণই যথেষ্ট। পরের বইটা পাঠকদের প্রত্যাশামতো না হলে প্রথম বইটাও মার খাবে। কে যেন বলে গিয়েছেন, লেখকজীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি তাঁকে ভালো, আরও ভালো লিখে যেতে হবে, একটু খারাপ হলেই পাঠকরা নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করবেন।"

বাল্মীকির আশ্রম ঘুরে ঘুরে দেখতে রোমাঞ্চ বোধ করছি। এসব সত্য? না কাল্পনিক? তা নিয়ে মাথা ঘামাতে মোটেই ইচ্ছে করছে না। সেকালের পাঠকরা বাস্তব ও কল্পনার কত সহজ সমাধান করে দিয়েছিলেন, কবিকে বলে দিয়েছিলেন, তুমি যা লিখবে তাই সত্য হবে।

"ব্যান্ডোদা, আপনার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দুটোই আমার থেকে অনেক বেশি। আজকের মিটিং চুলোয় যাক। আপনি কারণটা খুঁজে বার করুন, কেন বাল্মীকি করজোড়ে বললেন, রামায়ণ রচনা করেছি, এই যথেষ্ট। পরের বইটা যিনি লিখবেন তাঁকে পাঠিয়ে দেবেন, আমি যা জানি সব বলে দেব।"

ব্যান্ডোদা অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর চুপি চুপি আমাকে বললেন, "যদি আবার স্বপ্নদর্শন হয় তবে ব্যাপারটা একটু বাজিয়ে নিতে হবে: আমার ধারণা, মস্ত বড় ঋষি, মস্ত বড় কবি, স্বয়ং সরস্বতী সারাক্ষণ জিহ্বাগ্রে বিরাজ করছেন, কিন্তু নিজের অজান্তে আদি কবি তাঁর চরিত্রদের সঙ্গে একটু বেশি জড়িয়ে পড়েছিলেন। রাম সীতা লব কুশ যা করছে করুক, নিস্পৃহভাবে তাদের কথা মহাকাব্যে লিপিবদ্ধ করো, কিন্তু তাই বলে নিজেকেও নিজের বইয়ের একটা চরিত্র করে ফেলা! তুই হয়তো বলবি, মহাকাব্যে তো শুধু যুক্তিগ্রাহ্য নয়, এখানে নিয়তি ও পুরুষকারের দ্বন্দ্ব বড় ভূমিকায় উপস্থিত রয়েছে।"

আমাদের গাইড তখনও বলে যাচ্ছে, বাল্মীকির কোনও হাত ছিল না। স্বয়ং রামই নির্বাসিতা সীতাকে লক্ষ্মণ এই আশ্রমে রেখে যান। লব কুশের সমস্ত শিক্ষা বাল্মীকির হাতে। অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে ভয়ঙ্কর যুদ্ধের সময় বাল্মীকি তীর্থযাত্রায় গিয়েছিলেন, এখানে উপস্থিত ছিলেন না। যুদ্ধে রামচন্দ্ররা চারভাই যখন লব-কুশের হাতে নিহত হলেন তখন শোকে সীতা আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন। বাল্মীকি সেই সময় আশ্রমে ফিরে এসে চার ভাইকে বাঁচিয়ে অশ্বমেধের ঘোড়া ফিরিয়ে দেন।

ব্যান্ডোদা মাঝে মাঝে মনোযোগ দিয়ে লোকটির কথা শুনছেন। তারপর চুপি চুপি আমাকে বললেন, "বাল্মীকির বিরক্তির কারণটা এবার আন্দাজ করতে পারছি। নিজের সৃষ্ট চরিত্রগুলো যখন নিজেরাই হাঁটা-চলা আরম্ভ করে এবং লেখকের আয়ত্তের বাইরে চলে যায় তখন লেখকদের মনোকষ্টের সীমা থাকে

না। শুনেছি মূল বইতে লব-কুশের উপাখ্যান ছিল না। তুই দেখ শ্লোকসংখ্যা নিয়েও বিরোধ, উনি বোধহয় লিখেছিলেন পঁচিশ হাজার শ্লোক, সেটা হঠাৎ বেড়ে দাঁড়াল চল্লিশ হাজারে। খুবই বিচক্ষণ মুনি ছিলেন, তখনই ইনিংস ডিক্লেয়ার করার সিদ্ধান্ত নিলেন, হাজার অনুরোধেও মহাভারত রচনার দায়িত্ব নিলেন না।"

গাইডকে সন্তুষ্ট করে ব্যান্ডোদা আমাদের নিয়ে টাটাসুমোতে ফিরে এলেন। অমিতাভ ঘোষ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে এবার মোক্ষম চাল দিলেন। বললেন, "এবার তবে আই-আই-টি-তে ফেরা যাক।"

আমি বললাম, "সে কি! আমাদের তো যেতে হবে রামের জন্মস্থান অযোধ্যায়।"

অমিতাভ বললেন, "দেখুন, বাল্মীকির ফটো আমরা দেখিনি। কিন্তু আমরা রবীন্দ্রনাথের ফটো এবং কণ্ঠস্বর শুনেছি। তাঁকে বিশ্বাস করলে, এই বিধুর বাল্মীকি আশ্রমই রামজন্মভূমি।"

ব্যান্ডোদা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। "প্রফেসর ঘোষ তো ঠিক কথাই বললেন। আশ্রমাধ্যক্ষ কবি বাল্মীকির মনোভূমিই যে রামের জন্মস্থান এবং তা যে অযোধ্যার চেয়ে সত্য সে কথা আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় চিরদিনের জন্য প্রমাণ করে দিয়েছেন। এখানে বসেই বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেছিলেন, এই পবিত্র তীর্থ আমাদের দেখা হয়ে গিয়েছে, সুতরাং রামজন্মভূমির সন্ধানে অযোধ্যা যাওয়ার কোনও দরকার নেই। ব্যাপারটা আমি বাল্মীকিকে বুঝিয়ে বলব, আমার আশঙ্কা আজ রাতে তিনি আবার আই-আই-টি-তে আসবেন। ব্যাপারটা শুনে নিশ্চয় খুবই খুশি হবেন।"

এবার ড্রাইভারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন ব্যান্ডোদা। আমাদের সুমো মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে এবার কানপুরের দিকেই ছুটতে শুরু করল।

২০০৯ লন্ডন বুক ফেয়ার:
আর্লস কোর্টে ভাষণরত
লেখক শংকর।

Price : ₹ 200.00
ISBN : 978-81-7267-133-4
9 788172 671334
www.nirmalsahityam.com